হাদীস ও মাসাইলে আহনাফ

(প্রথম খণ্ড)

গবেষণা বিভাগ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হাদীস ও মাসাইলে আহনাফ

(প্রথম খণ্ড)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

গবেষণা বিভাগ

www.pathagar.com

হাদীস ও মাসাইলে আহনাফ (প্রথম খণ্ড)
লেখকমণ্ডলী
পৃষ্ঠা ৬৬২
ইফাবা গবেষণা ঃ ১১৪
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২৪২৩
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২৪

ISBN : 984-06-1100-2

গ্রন্থস্বত্ব ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০০৬
আষাঢ় ১৪১৩
জমাদিউস সানি ১৪২৭

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশক
আবদুল জলিল জমাদার
পরিচালক, গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রুফ রিডার
এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ শিল্পী
জসিম উদ্দিন

মূল্য : ২৭০.০০ টাকা মাত্র

HADIS O MASAELE AHNAFF (1st Volume) Written by some researchers and editted by editorial board and Published by Abdul Jalil Jamadar, Director, Research Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. June, 2006

E-mail:info@islamicfoundation-bd.org
Website:www. islamicfoundation-bd.org

Price : Tk. 270.00 ; US Dollar : 8.00

www.pathagar.com

মহাপরিচালকের কথা

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সকল মাস'আলার উপর আমল করি সেগুলোকে পরিভাষায় ফিক্‌হ বলে। ফিক্‌হের উপর আমল করা কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করারই নামান্তর। কেননা ফিকহ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আলাদা কিছু নয় বরং কুরআন ও সুন্নাহরই বাস্তব রূপ। অণু-পরমাণুতে আণবিক শক্তির অস্তিত্ব পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল কিন্তু জগতের মানুষের তা জানা ছিল না। অবশেষে বিজ্ঞানীরা তা আবিষ্কার করার পর সকলেই তা জানে ও ব্যবহার করে। লক্ষণীয় যে, বিজ্ঞানীরা মূলত অণুর মধ্যে আণবিক শক্তির সৃষ্টি করেননি বরং বিদ্যমান শক্তিটি গবেষণার দ্বারা খুঁজে বের করে এনেছেন। ফিক্‌হ তদ্রুপই মুজতাহিদ ইমামগণের নিজেদের সৃষ্ট কিছু নয় বরং তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিদ্যমান বিধানগুলো খুঁজে বের করে এনেছেন।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে চারটি ফিক্‌হ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে ফিকহে হানাফীর অনুসারী হল সর্বাধিক। হানাফী ফিক্‌হের ব্যাপকতা, যৌক্তিকতা, বস্তুনিষ্ঠতা এবং কুরআন ও সুন্নাহের সাথে অধিকতর ঘনিষ্ঠতার কারণেই এর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয়েছে। এই ফিকহ 'হানাফী মাযহাব' নামে পরিচিত হলেও এর গোড়াপত্তন করেন ৪০ জন সুবিজ্ঞ মুজতাহিদের নির্বাচিত একটি জামা'আত। দীর্ঘ ২২ বছর পর্যন্ত গবেষণা করে তাঁরা প্রায় ৮৩ হাজার মাস'আলা তথা প্রয়োজনীয় বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান রচনা করেন। তারপর মাস'আলার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে আরো বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫ লক্ষ মাসাইলে পৌঁছে হানাফী মাযহাবের ভিত্তি পূর্ণতায় পদার্পণ করে। এত ব্যাপক পরিসরে গোড়াপত্তন এবং পূর্ণতায় পৌঁছে চলমান ধারা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের এই বৈশিষ্ট্য অন্য কোন ফিকহের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না।

হানাফী ফিক্‌হের উপরোক্ত অনন্য বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও কেউ কেউ এই ফিক্‌হকে কিয়াস নির্ভর ফিক্‌হ বা হাদীস থেকে বিচ্ছিন্ন ফিক্‌হ বলে অভিযুক্ত করতে কার্পণ্য করেনি। ফলে এ ফিকহের উপর আমলকারী-দেরকে অনেক সময় অহেতুক বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় কিংবা বিভিন্ন প্রশ্নের কারণে মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকতে হয়, যা থাকা কখনও উচিত নয়। কেননা, দ্বিধা আমলের প্রাণশক্তি দুর্বল করে দেয়।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান হানাফী ফিকহের অনুসারী। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের আমলগুলো যেন সকল প্রকার দ্বিধা থেকে মুক্তভাবে পালন করতে পারে সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা বিভাগ 'হাদীস ও মাসাইলে আহনাফ' শীর্ষক গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গ্রন্থখানায় প্রধানত সেই সকল মাসাইলই পর্যালোচনা করা হয়েছে যেগুলোর ক্ষেত্রে কোন আলিম হাদীস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আপত্তি উত্থাপন করেছেন। গবেষকমণ্ডলী প্রয়োজনীয় উপাত্তসমূহ উদ্ধৃত করে বিস্তারিত পর্যালোচনাসহ প্রমাণ করেছেন যে, হানাফী ফিকহের এই সমাধানগুলো কারো নিরেট কিয়াস নির্ভর সমাধান নয় বরং সরাসরি হাদীস ও সুন্নাহর আলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত সমাধান; এই সমাধানের উপর আমল করা কুরআন ও সুন্নাহর উপরই আমল করার শামিল।

আমরা আশা করি গ্রন্থটি বাংলাদেশী মুসলমানদের মধ্যে ফিক্‌হের জ্ঞান চর্চায় প্রভূত উপকার সাধন করবে। বিশেষত হানাফী ফিকহের অনুসারী মুসলমানদের আমলের মান আরো বহুগুণে বৃদ্ধি করবে। মহান আল্লাহ আমাদের শ্রম কবুল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমানই হানাফী মাযহাবের অনুসারী। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) এই মাযহাবের শিরোমণি। তিনি মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ইমাম আযম উপাধিতে ভূষিত। হানাফী মাযহাব সহীহ্ হাদীস নির্ভর তা প্রমাণ করার জন্যই এই গ্রন্থখানা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ গ্রন্থে ইখতিলাফী মাস'আলাগুলো হাদীসের আলোকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে এই গ্রন্থে অন্যান্য মাযহাবের সাথে হানাফী মাযহাবের তুলনামূলক আলোচনাপূর্বক হানাফী মাযহাবের হাদীস নির্ভরতা প্রমাণ করা হয়েছে। তা ছাড়া হানাফী মাযহাবের প্রতি ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা, পাশাপাশি হাদীস ও কুরআনের উপর এই মাযহাবের নির্ভরতা এবং অন্যান্য মাযহাবের মতামতও তুলে ধরা হয়েছে।

এ ধরনের একটি গ্রন্থের চাহিদা বহুদিন থেকেই অনুভূত হচ্ছিল। তা বাস্তবায়নের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে 'হাদীস ও মাসাইলে আহনাফ' শিরোনামে গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আলোচ্য গ্রন্থখানা সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি বিশেষ করে মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকের জন্য খুব উপকারী বিবেচিত হবে। গ্রন্থটি পাঠক মহলে সমাদৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। গ্রন্থটি প্রমাদমুক্ত করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এরপরও ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। কোন ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে তা আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে নিরসন করার উদ্যোগ নেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

পাণ্ডুলিপি রচনা এবং সম্পাদনা পর্বে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আবদুল জলিল জমাদার
পরিচালক
গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সম্পাদনা কমিটি

মাওলানা ইমদাদুল হক
মরহুম মাওলানা ইসহাক ফরিদী
মাওলানা মুজিবুর রহমান
মাওলানা আবু সুফিয়ান যাকী
মাওলানা আহমদ মায়মূন
প্রফেসর মোঃ সাদুল্লাহ

লেখকমণ্ডলী

১. অধ্যাপক মাওলানা মনসুরুর রহমান
২. অধ্যাপক মাওলানা নূর মোহাম্মদ
৩. ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
৪. ড. আবদুর রহমান আনওয়ারী
৫. মরহুম মাওলানা ইসহাক ফরিদী
৬. ড. মাওলানা আবদুল জলিল
৭. ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ
৮. হাফেয মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ নূরুদ্দীন
৯. মাওলানা যুবায়ের আহমদ
১০. মাওলানা মুফতী মোহাম্মাদুল্লাহ
১১. মুফতী মুতিউর রহমান
১২. মাওলানা যাইনুল আবেদীন
১৩. মাওলানা খন্দকার মনসুর আহমদ
১৪. মাওলানা আ. খ. ম. আবদুল হক নোমানী
১৫. মাওলানা নোমান আহমদ
১৬. হাফেয মাওলানা মুফতী মুহিব্বুল্লাহিল বাকী
১৭. মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের হুসাইন
১৮. মাওলানা মুহাম্মদ হারুন
১৯. মাওলানা যাকারিয়া

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

- মিসওয়াক করা অযূর সুন্নাত/১৩
- অযূর মাসনূন তরীকা/১৯
- অযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব/২৯
- কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া অযূতে সুন্নাত ও গোসলে ওয়াজিব/৩৪
- মাথার চারভাগের এক ভাগ মাসেহ করা ফরয/৩৮
- পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করা সুন্নাত/৪১
- অযূতে পা ধৌত করা ফরয/৪২
- তায়াম্মুমে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কুনূই পর্যন্ত মাসেহ করা ফরয/৪৫
- মোজার উপর মাসেহ করার মুদ্দত/৪৬
- মোজার উপরিভাগের উপর মাসেহ করা আবশ্যক/৪৮
- জুমু'আর দিনে গোসল করা সুন্নাত/৪৯
- হায়েয ও নিফাসের মুদ্দত/৫২
- মহিলাকে স্পর্শ করলে অযূ ভঙ্গ হয় না/৫৪
- নিজ স্ত্রীকে চুম্বন করলে অযূ ভঙ্গ হয় না/৬৫
- প্রবল ঘুমের কারণে অযূ ভেঙ্গে যায়/৬৯
- শরীরের কোন স্থান থেকে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে অযূ ভেঙ্গে যায়/৭৩
- কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে পাত্রটি তিনবার ধৌত করা আবশ্যক/৮০
- কিবলামুখী হয়ে পেশাব পায়খানা করা জায়িয নয়/৮৬
- ইস্তিঞ্জায় তিন ঢেলা ব্যবহার করা সুন্নাত/৯৭
- বিড়ালের উচ্ছিষ্ট মাকরূহ/১০২
- শিশুদের পেশাবের বিধান ও তা পবিত্র করার নিয়ম/১০৯
- ভূমি পবিত্র করার নিয়ম/১১৭
- হালাল জন্তুর পেশাবও নাপাক/১২৭
- পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়/১৩৫
- ফজরের ওয়াক্ত/১৩৬
- যুহরের ওয়াক্ত/১৩৮
- আসরের ওয়াক্ত/১৪৫
- মাগরিবের ওয়াক্ত/১৪৫
- এশার ওয়াক্ত/১৪৮
- ফজর নামাযের মুস্তাহাব সময়/১৫১
- যুহর নামাযের মুস্তাহাব সময়/১৫৪

www.pathagar.com

- সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বিপ্রহরের সময় নামায আদায় করা নিষিদ্ধ/১৫৬
- আসর নামাযের মুস্তাহাব সময়/১৫৯
- আসর ও ফজরের ফরয নামাযের পর নফল পড়া মাকরূহ/১৬১
- মাগরিবের আযানের পর ফরযের আগে নফল পড়া মাকরূহ/১৬৬
- নামাযের কথা ভুলে গেলে কিংবা ঘুমিয়ে থাকলে এর বিধান/১৭১
- আযান ও ইকামত/১৭৫
- আযানের বাক্য ১৫টি/১৭৮
- আযানে তারজী না করা উত্তম/১৮৩
- ইকামতের বাক্য ১৭টি/১৯৫
- ওয়াক্তের আগে আযান দিলে পুনরায় আযান দিতে হবে/২০১
- তাকবীরে তাহরীমার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা ওয়াজিব/২১৫
- পুরুষ লোক নামাযে হাত নাভীর নিচে বাঁধবে/২১৭
- তাকবীরে তাহরীমা ও ফাতিহা পাঠের মাঝে ছানা পড়া মুস্তাহাব/২১৯
- আরাফা ও মুযদালিফা ছাড়া অন্যত্র দুই নামায একত্রে আদায় নিষেধ/২২২
- নামাযে 'বিসমিল্লাহ' নিঃশব্দে পড়া উত্তম/২২৭
- মুনফারিদের জন্য নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব/২৪০
- ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরা'আত পড়া জায়িয নয়/২৫১
- নামাযে ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই আমীন বলবে/৩০৭
- আমীন নিঃশব্দে বলা উত্তম/৩১২
- তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্যত্র 'রাফে' ইয়াদাঈন' না করা উত্তম/৩৩১
- নামাযে তা'দীলে আরকান ওয়াজিব/৩৭৩
- সিজদায় যাওয়ার সুন্নাত তরীকা/৩৭৪
- নামাযে হযরত ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত তাশাহ্হুদ পড়া উত্তম/৩৭৭
- 'আসসালামু আলাইকুম' বলে নামায শেষ করা ওয়াজিব/৩৮৩
- দু'দিকে সালাম ফিরানো ওয়াজিব/৩৮৫
- নামাযে ইসতিরাহাত সুন্নাত নয়/৩৮৭
- তাশাহ্হুদ পড়ার সময় বসার পদ্ধতি/৩৯০
- সাহু সাজদা সালামের পর আদায় করা উত্তম/৩৯৩
- নামাযে কোন সন্দেহ দেখা দিলে তা নিরসনের উপায়/৩৯৯
- সাজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব/৪০৪
- সাজদায়ে তিলাওয়াত চৌদ্দটি/৪১৪
- নামায দাঁড়িয়ে গেলেও ফজরের সুন্নাত পড়ার নিয়ম/৪২৯
- নামাযে কথা বললে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়/৪৩৩
- ওযরবশত বসে নামায আদায়কারীর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা জায়িয/৪৪৮
- নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা জায়িয নয়/৪৫৯
- নামাযীর সম্মুখ দিয়ে কোন কিছু অতিক্রম করলে নামায ভঙ্গ হয় না/৪৬৯

www.pathagar.com

- জামা'আতে মহিলাদের শরীক হওয়া মাকরূহ/৪৭৩
- বিতর নামাযের ওয়াজিব/৪৮৫
- বিতর নামায এক সালামে তিন রাকা'আত আদায় করা ওয়াজিব/৫০০
- সব সময় বিতর নামাযে দু'আ কুনূত পড়া ওয়াজিব/৫১৪
- বিতর নামাযে কুনূতের মাসনূন দু'আ/৫১৯
- দু'আ কুনূত রুকুর পূর্বে পড়া সুন্নাত/৫২৭
- ফজর নামাযে দু'আ কুনূত পড়া সুন্নাত নয়.../৫৩২
- কুনূতে নাযিলা শুধুমাত্র ফজর নামাযে সুন্নাত/৫৩৯
- বিতর ফউত হয়ে গেলে এর কাযা ওয়াজিব/৫৪৭
- জুমু'আর নামাযের সময়/৫৫৩
- গ্রামে জুমু'আর নামায জায়িয নয়/৫৫৫
- কি পরিমাণ দূর হতে জুমু'আয় শরীক হওয়া জরুরী/৫৫৮
- জুমু'আর উভয় খুতবা বিধান/৫৬০
- খুতবা দানকালে মসজিদে প্রবেশকারী তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বে না/৫৬২
- সফর অবস্থায় নামায কসর ওয়াজিব/৫৬৭
- ঈদের নামায ওয়াজিব/৫৮৩
- ঈদের নামাযে তাকবীর ছয়টি/৫৮৬
- সালাতুল ইসতিস্‌কা/৫৯১
- সালাতুল ইসতিস্‌কা আদায়ের নিয়ম/৫৯৫
- সালাতুল খওফ আদায়ের নিয়ম/৬০৫
- কুসূফ ও খুসূফের নামায/৬১৩
- জানাযার নামায আদায়ের নিয়ম/৬২৫
- গায়েবানা জানাযা জায়িয নয়/৬৩৭
- তারাবীহ নামায বিশ রাকা'আত/৬৪৩

www.pathagar.com

হাদীস ও মাসাইলে আহনাফ

(প্রথম খণ্ড)

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মিস্ওয়াক করা অযূর সুন্নাত

ইসলামী শরী'আতে মিস্ওয়াক[1] করা সুন্নাত। এ ব্যাপারে ফকীহগণের কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু মিস্ওয়াকের এ আমলটি অযূর সুন্নাত, না নামাযের সুন্নাত—এ বিষয়ে হাদীসের বক্তব্যে বিভিন্নতা আছে। অধিকাংশ হাদীসের বক্তব্য (المتن) প্রমাণ করে যে, মিস্ওয়াক করা অযূর সুন্নাত। বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ .

أخرجه مالك وأحمد والنسائى وصححه بن خزيمة وذكره البخارى تعليقًا كذا فى بلوغ المرام .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ আমি যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর হয়ে যাওয়ার আশংকা না করতাম তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক অযূর সঙ্গে মিস্ওয়াক করার আদেশ দিতাম।[2]

উপরোক্ত হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ করছে যে, মিস্ওয়াক অযূর সাথে সম্পর্কিত বিষয় এবং অযূর সুন্নাতসমূহের থেকে একটি সুন্নাত।[3] এটিই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও

---

১. আভিধানিকভাবে মিস্ওয়াক ও সিওয়াক অর্থ দাঁত মাজা। ফিকহের আভিধানিক পরিভাষায় মিস্ওয়াক শব্দটির প্রয়োগ দু'টি অর্থে পাওয়া যায়। ১. দাঁত পরিষ্কার করা, ২. গাছের সেই ডাল বা শিকড় যার দ্বারা মানুষ দাঁত পরিষ্কার করে থাকে। (সাইয়্যিদ মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, কাওয়াইদুল ফিকহ, আততা'রীফাতুল ফিকহিয়্যা অংশ, দেওবন্দ ঃ আশরাফী বুক ডিপো, ১৯৯১, পৃ. ৩২৯) আল্লামা ইউসুফ বিন্নোরী (১৯০৮-১৯৭৭) মিস্ওয়াকের সংজ্ঞা দিয়ে বলেন, মুখ গহ্বর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে ডাল বা ডাল জাতীয় কোন জিনিস দ্বারা দাঁত মাঁজাকে মিস্ওয়াক বলে। (শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নোরী, মা'আরিফুস সুনান, করাচী ঃ আল-মাকতাবাতুল বিন্নোরীয়্যা, তা. বি. খ. ১, পৃ. ১৪৩) মিস্ওয়াক করার উপকারিতা সত্তরের চেয়ে অধিক। তন্মধ্যে ন্যূনতম হল মুখের দুর্গন্ধ বিদূরিত হওয়া আর উচ্চতম হল মৃত্যুকালে কলেমা শাহাদত নসীব হওয়া (রাদ্দুল মুহতার, দেওবন্দ ঃ মাকতাবা যাকারিয়্যা, ১৯৯৬ খণ্ড-১, পৃ. ২৩৬)।

২. মু'আত্তা ইমাম মালিক, সুনানে নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ও সহীহ বুখারীর প্রাসঙ্গিক উপস্থাপন। দ্র: আল্লামা যাফর আহ্মাদ উসমানী, ই'লাউস সুনান—তাহারাত অধ্যায়, মিস্ওয়াক অনুচ্ছেদ, করাচী ঃ ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামিয়্যা, ১৪১৫ হি. হাদীস নং ১৩, খণ্ড ১, পৃ. ৭১।

৩. আবূ নু'আয়ম ইস্পাহানী (মৃ. ৪৩০ হি.) বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে,

اَلسِّوَاكُ وَاجِبٌ وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মিস্ওয়াক করা ওয়াজিব এবং জুমু'আর দিন গোসল করা ওয়াজিব। الجامع الصغير গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য হাদীসটির বক্তব্য আপাত দৃষ্টিতে উপরোক্ত অভিমতের সাথে

www.pathagar.com

হানাফী ফকীহগণের অভিমত।[৪] এ ব্যাপারে আরো বহু হাদীস থেকেও সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন ঃ

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا كَانَ رَسُوْلُ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ لِشَيْءٍ مِّنَ الصَّلٰوَاتِ حَتّٰى يَسْتَاكَ .

رواه الطبرانى باسناده لا بأس به كذا فى الترغيب ج ١ ، ص ٤٣ ومجمع الزوائد للهيثمى ورجاله الموثقون ، ج ١ ، ص ١٨١

হযরত যায়িদ ইবন খালিদ আল-জুহানী, (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মিস্ওয়াক করা ব্যতিরেকে কোন ধরনের নামায আদায়ের জন্য গৃহ থেকে বের হতেন না।[৫]

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوْءِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ .

رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه ابن اسحاق وهو ثقة مدلس وقد صرح بالتحديث واسناده حسن ورواه مجمع الزوائد ج ١ ، ص ٨٩ باب فى السواك

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ যদি আমি..... প্রত্যেক অযূর সঙ্গে মিস্ওয়াক করার আদেশ দিতাম।[৬]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوْءِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ . رواه ابن حبان فى صحيحه كذا فى التخليص الحبير ج ١ ، ص ٢٣

অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে দেখা যায়। এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ বলেন, আবূ নু'আয়েমের উপরোক্ত হাদীস সনদের দিক থেকে দলীল হিসাবে পেশ করার উপযুক্ত মানসম্পন্ন নয়। আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী (মৃ. ৮৫২ হি.) হাদীসটির সনদ সম্পর্কে বলেন, اسناده واه এটির সনদ অনির্ভরযোগ্য। দ্বিতীয়ত, উপরোক্ত হাদীসে যে ওয়াজিব বলা হয়েছে সেটি ফিকহের পরিভাষায় ব্যবহৃত ওয়াজিব নয় বরং আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত ওয়াজিব। এ ওয়াজিবের অর্থ হল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কোন সন্দেহ নেই যে, মিস্ওয়াক করা সকল মাযহাবেই গুরুত্বপূর্ণ আমল হিসাবে বিবেচিত বিধায় উপরোক্ত ফিকহী অভিমতের সাথে হাদীসের বৈপরীত্য অবশিষ্ট থাকে না। (মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩; ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২; আল্লামা তাকী উসমানী, দরসে তিরমিযী, মাওলানা রশীদ আশরাফ সংকলিত, করাচী ঃ মাকাতাবা দারুল উলূম, ১৪০৯ হি. খণ্ড ১, পৃ ২২২)

৪. শায়খুল ইসলাম মুরগীনানী, আল-হিদায়া, দেওবন্দ ঃ কুতুবখানা রশীদিয়্যা, তা. বি. খণ্ড ১, পৃ. ১৮।

৫. প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন অযূ আবশ্যক নয়। একই অযূ দ্বারা একাধিক নামায পড়া যায়। তবে অযূ থাকা সত্ত্বেও নতুনভাবে অযূ করে নামায পড়া মুস্তাহাব।

৬ ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৫, খণ্ড ১, পৃ. ৭২।

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ আমি যদি... তাহলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় অযূর সঙ্গে মিস্‌ওয়াক করার আদেশ দিতাম।[৭]

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا السِّوَاكُ مِطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَمُرْضَاةٌ لِلرَّبِّ . رواه أبو يعلى باسنادين في أحدهما ابن إسحاق وهو ثقة مدلس ورجال الاخر رجال الصحيح كذا في مجمع الزوائد ورواه أحمد والنسائي باسناد صحيح والبخاري تعليقًا كذا في اثار السنن .

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ মিস্‌ওয়াক মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি আনয়নের উপায়।[৮]

উপরোক্ত হাদীসগুলো কোন প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই স্পষ্ট নির্দেশ করছে যে, মিস্‌ওয়াক করা অযূর সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস এমনও আছে যেখানে মিস্‌ওয়াকের সংশ্লিষ্টতা অযূর সাথে—একথা স্পষ্ট বলা হয়নি। তবে ঐ সকল স্থানে হাদীসগুলোকে প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির সাথে মিলিয়ে চিন্তা করলে অযূর সংশ্লিষ্টতাই ফুটে উঠে। যেমন ঃ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ . أخرجه الترمذى وقال هذا حديث صحيح ، كذا في نيل الأوطار – ج ١ ، ص ١٠١

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, আমি যদি, ... তা হলে তাদেরকে আমি প্রত্যেক নামাযের সময়ে মিস্‌ওয়াক করার আদেশ দিতাম।[৯]

এ হাদীসে মিস্‌ওয়াক-এর আমল 'নামাযের সময়ে' সম্পাদনের কথা বলা হয়েছে।[১০] মুহাদ্দিসগণ বলেন, এখানে 'নামাযের সময়ে' বলা হলেও বাক্যটির প্রকৃত বক্তব্য হল 'নামাযের অযূর সময়ে'। অর্থাৎ كُلُّ صَلٰوةٍ শব্দের পূর্বে একটি مضاف উহ্য আছে। মূল বাক্যটি হল عِنْدَ وُضُوْءِ كُلِّ صَلٰوةٍ (প্রত্যেক নামাযের অযূর সময়ে)। অতএব উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সাথে পূর্বে বর্ণিত হাদীসগুলোর কোন বৈপরীত্য অবশিষ্ট থাকে না।

হাদীসটির মতনে مضاف উহ্য থাকার মর্মে মুহাদ্দিসগণ কয়েকটি প্রমাণ পেশ করে থাকেন। যেমন ঃ ১. এই হাদীস মুস্তাদরাকে হাকিম গ্রন্থেও (খণ্ড-১, পৃ. ১৪৬) বর্ণিত হয়েছে। সেখানে মতনটির রূপ হল ঃ

৭. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৬, পৃ. ৭৩।

৮. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৭, পৃ. ৭৩।

৯. সুনানে তিরমিযী, তাহারাত অধ্যায়, সিওয়াক অনুচ্ছেদ।

১০. ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমত গ্রহণ করেছেন। দ্র. আল-হিদায়া, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ১৮।

www.pathagar.com

لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكُ مَعَ الْوُضُوْءِ ـ

আমি যদি .... তাহলে আমি তাদের উপর অযূর সঙ্গে মিস্ওয়াক করা ফরয ঘোষণা দিতাম।

হাদীসখানার সনদ সম্পর্কে হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী (মৃ.৭৪৮ হি.) বলেন, هو على شرطهما ليس له علة এটি সহীহদ্বয়ের (বুখারী ও মুসলিম) শর্তে উন্নীত হাদীস, তাতে কোন ধরনের ত্রুটি (علة) নেই। অনুরূপ এই হাদীস হযরত আয়েশা (রা)-এর সূত্রে সহীহ ইবন হিব্বান গ্রন্থে এবং হযরত আলী (রা)-এর সূত্রে মু'জামে তাবরানী গ্রন্থে বর্ণিত আছে। সে সব বর্ণনায় নামাযের সাথে অযূর কথাও উল্লেখ রয়েছে। কাজেই একই রিওয়ায়াতের অন্যান্য সূত্রে যেহেতু অযূর কথা বলা আছে সেহেতু এ বর্ণনার মধ্যেও অযূর বিষয়টি উহ্য (محذوف) আছে বলে ধরে নেওয়া স্বাভাবিক। তাতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না।[১১]

সুনানে নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ, মুস্তাদরাকে হাকিম, সহীহ ইবন খুযায়মা, সহীহ ইবন হিব্বান প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসগুলোর কোনটিতে একই সঙ্গে অযূ ও নামায উভয়ের কথা উল্লেখ আছে। মুহাদ্দিসগণ এ ধরনের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে মর্মার্থ নির্ণয়ের জন্য সমন্বয়করণ-এর নীতি অবলম্বন করে থাকেন। আলোচ্য হাদীসে সে নীতি প্রয়োগ করতে হলে كل صلوة-এর পূর্বে مضاف উহ্য থাকার বিষয়টি অবশ্যই মেনে নিতে হয়।

আল্লামা মোল্লা আলী কারী হানাফী (মৃ. ১০১৪ হি.) বলেন, সামগ্রিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, এখানে হাদীসের মতনগুলো (মূলপাঠ) প্রধানত দুই রকমের।

এক. عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ-এর নির্দেশকারী, দুই. مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ -এর নির্দেশকারী। তন্মধ্যে ফকীহগণ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ-কে প্রাধান্য দিয়ে এটিকে মূল (اصل) তথা প্রকৃত বক্তব্য এবং عند كل صلوة-কে প্রাধান্য দেওয়া এবং এটিকে মহানবী (সা)-এর প্রকৃত বক্তব্য নিরূপণের কয়েকটি প্রমাণ আছে। যেমন ঃ

এক. আরবী ব্যাকরণে مَعَ ও عِنْدَ উভয় শব্দই 'মুকারানাহ' অর্থাৎ 'সাথে'-এর অর্থ বুঝায়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, مَعَ বুঝায় হাকীকী মুকারানাহ, যথা مَعَ زَيْدٍ অর্থ যায়দের সঙ্গে; অর্থাৎ যায়দের সাথে সংযুক্ত ও মিলিত। পক্ষান্তরে عِنْدَ বুঝায় ইযাফী মুকারানা; যথা عِنْدَ زَيْدٍ অর্থ যায়দের নিকট; অর্থাৎ যায়দের কাছে ও অধিকারে। এখানে অর্থ যায়দের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া জরুরী বোঝায় না। নিয়ম অনুসারে হাকীকী ও ইযাফী অর্থের মধ্যে ইখতিলাফ দেখা দিলে হাকীকী অর্থকে প্রাধান্য দিতে হয় বিধায় হাকীকী অর্থ নির্দেশকারী হাদীস مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ-কে মূলপাঠ সাব্যস্ত করা হবে এবং ইযাফী অর্থের নির্দেশকারী হাদীস, عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ-কে প্রাসঙ্গিক পাঠ নির্ণয়পূর্বক উপযুক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে মূল পাঠের অনুকূলস্থ করা হবে।

---

১১. এ বক্তব্যের সমর্থনে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে মুসনাদে আহমদে বর্ণিত অপর একখানা হাদীস উল্লেখ করা যায়। সেখানে অযূ ও নামায উভয়কে একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে বলা হয়েছে,

لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ .... عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ بِوُضُوْءٍ وَمَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ بِسِوَاكٍ ـ

আমি যদি ..... তা হলে আমি তাদেরকে প্রত্যেখ নামাযের সময়ে অযূ করতে এবং প্রত্যেক অযূর সঙ্গে মিস্ওয়াক করতে আদেশ দিতাম। (নূরুদ্দীন হায়সামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, বাবুন ফিস সিওয়াক, খণ্ড ১, পৃ. ২২১)

www.pathagar.com

দুই. অযূ ও নামায দুটি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আমল। উভয় আমলের প্রকৃতি ও গঠন ভিন্ন ভিন্ন। অযূ হল পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সংশ্লিষ্ট আমল। পক্ষান্তরে নামায হল ইবাদত পর্যায়ের আমল। এখন বিবেচনা করতে হবে যে, মিস্ওয়াকের আমল-এতদুভয়ের মধ্যে কোনটির সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। নিরপেক্ষ বিচারে বুঝা যায় যে, মিস্ওয়াক প্রত্যক্ষভাবে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার সাথেই সম্পর্কিত একটি আমল। এটি ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও সেটা সম্পূর্ণ পরোক্ষভাবে। মিস্ওয়াক পবিত্রতা বিষয়ের সাথে সংযুক্ত আমল-এর দলীল মহানবী (সা)-এর হাদীস থেকেও পাওয়া যায়। হাদীসে মহানবী (সা) মিস্ওয়াকের প্রকৃতি নির্দেশ করে বলেছেন ঃ

اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِّلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

মিস্ওয়াক মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উপায়।

এ ব্যাখ্যা থেকেও বুঝা যায় যে, مَعَ كُلِّ وَضُوْءٍ-এর বর্ণনাই মুলপাঠ বিবেচিত হওয়ার জন্য অগ্রাধিকার প্রাপ্তির উপযুক্ত।

তিন. অযূর সময়ে মিস্ওয়াক করার মধ্যে কোন ঝুঁকি নেই। পক্ষান্তরে অযূর পরে নামাযে দাঁড়ানোর পূর্বক্ষণে মিস্ওয়াক করার মধ্যে যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে। কারণ মিস্ওয়াকের ফলে কখনো কখনো মাড়ি থেকে রক্ত বেরিয়ে পড়ে। আর হানাফী ফিক্হ অনুসারে শরীরের কোন স্থান থেকে রক্ত বের হলে অযূ ভেঙ্গে যায়।[12] এমতাবস্থায় নামাযে দাঁড়িয়ে মিস্ওয়াক করার অর্থ হল—অযূ, নামাযের তাকবীরে উলা এবং পরিচ্ছন্ন মুখে নামায আদায়-এর মত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়া। কেননা ঘটনাক্রমে যদি মাড়ি থেকে রক্ত বেরিয়ে পড়ে তা হলে অযূ ভেঙ্গে যাবে। আর অযূ করতে গেলে তাকবীরে উলা ছুটে যাবে। এমনকি অযূ না ভাঙ্গলেও অন্তত অপরিচ্ছন্ন মুখ নিয়ে নামায পড়তে হবে। এটি মাকরূহ। কাজেই ইখতিলাফী মতনের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যায় এমন কোন বিকল্প অবলম্বন করা যায় না যে, বিকল্প অবলম্বন করলে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতির দিক প্রবল হয়ে যায়। এ হিসাবেও مَعَ كُلِّ وَضُوْءٍ-কে প্রাধান্য দিতে হয়।

চার. হাদীস বিজ্ঞানের নীতি হল, جمع بين الروايات-এর উপর আমল করা। অর্থাৎ কোথাও মতনের ইখতিলাফ দেখা দিলে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্য থেকে এমন একখানা হাদীসকে মূল হাদীস নির্ধারণ করা যার অনুকূলে অন্যান্য হাদীসকে দ্বিধাহীনভাবে মিলানো যায়। আলোচ্য হাদীসে সেই নীতি প্রয়োগ করতে হলেও مَعَ كُلِّ وَضُوْءٍ-এর মতনকেই মূল পাঠ হিসাবে প্রাধান্য দিতে হয়।

পাঁচ. মতনের ইখতিলাফ দেখা দিলে এর সমাধানের জন্য মহানবী (সা)-এর সীরাত তথা বাস্তব জীবনের আমল কিরূপ ছিল তা লক্ষ্য করা হয়। তাতেও দেখা যায় যে, মহানবী (সা) অযূর পূর্বে মিস্ওয়াক সর্বদা করেছেন বলে উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু নামাযের পূর্বে অযূ না করে শুধু মিস্ওয়াক করে নামায আদায় করেছেন-এমন একটি উদ্ধৃতিও কোথাও পাওয়া যায় না। মহানবী (সা)-এর এ আমলী দলীল থেকেও مَعَ كُلِّ وَضُوْءٍ-এর প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়।[13]

১২. আল-হিদায়া, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ১৮।

১৩. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ২২৪।

www.pathagar.com

আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (মৃ. ১৩৫২ হি.) উপরোক্ত মতভিন্নতার একটি সমন্বয়মূলক সমাধান পেশ করেছেন। তিনি বলেন, মিস্ওয়াক নামাযের সুন্নাত, না অযূর সুন্নাত—এর ব্যাপারে ফকীহ্গণের মতভিন্নতা বস্তুত আক্ষরিক মতভিন্নতা।[১৪] এটিকে প্রকৃত মতভিন্নতা বলা যায় না। হাদীসে মিস্ওয়াক করার বিষয়টি অযূ ও নামায উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্টভাবে পাওয়া যায়। তাই মিস্ওয়াক করার উদাহরণ এ জন্য পাওয়া যায় না যে, মহানবী (সা) কখনো পুরাতন অযূ দ্বারা নামায পড়তেন না। অযূ ভেঙ্গে না থাকলেও প্রত্যেক নামায তিনি নতুন অযূর মাধ্যমে আদায় করতেন।[১৫]

ফকীহগণের মতভিন্নতা[১৬] আক্ষরিক বলে দাবী করার কারণ হল যে, হানাফী ফকীহগণের সামগ্রিক বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁদের মতে মিস্ওয়াক করা অযূর সুন্নাত। আর নামাযে দাঁড়ানোর পূর্বে পুনরায় মিস্ওয়াক করে মুখ পরিস্কার করে নেওয়া মুস্তাহাব।[১৭] উল্লেখ্য যে, সুন্নাত আর মুস্তাহাবের মধ্যে মৌলিক কোন তফাৎ নেই। কেননা মুস্তাহাব মূলত সুন্নাতেরই একটি বর্ধিত শাখা। কাজেই হানাফী ফকীহগণ যখন নামাযের পূর্বেও মিস্ওয়াকের ব্যবহার স্বীকার করে নিচ্ছেন তখন মিস্ওয়াক অযূর সময় করা হবে, না নামাযের সময় করা হবে–এ নিয়ে বিতর্কের কোন সুযোগই থাকে না। বরং বলা হবে যে, মিস্ওয়াক অযূ ও নামায উভয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট। কাজেই যেভাবে অযূর পূর্বে করা হবে সেভাবে নামাযের পূর্বেও করা হবে।[১৮] এটিই মহানবী (সা)-এর হাদীসে ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।

---

১৪. মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ১৪৪।

১৫. হযরত আনাস (রা) সূত্রে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন,

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ طَاهِرَةً اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسٍ وَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ اَنْتُمْ قَالَ كُنَّا نَتَوَضَّؤُ وُضُوْءً وَاحِدًا قال الترمذى حديث انس حديث حسن غريب

মহানবী (সা) অযূ কিংবা বে-অযূ যে অবস্থায় থাকতেন না কেন প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুনভাবে অযূ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত আনাসকে জিজ্ঞাসা করলাম, তৎকালে আপনার কেমনভাবে আমল করতেন? তিনি বললেন, আমরা (সাহাবীগণ) এক অযূ দিয়েই একাধিক নামায আদায় করতাম। (সুনানে তিরমিযী, তাহারাত অধ্যায়, আল-অযূ লিকুল্লি সালাত অনুচ্ছেদ)

১৬. ফকীহগণের বিস্তারিত অভিমত-এর জন্য দেখুন المغنى لابن قدامة খণ্ড ১, পৃ. ৭৮; شرح المهذب, খণ্ড ১, ২৭১; عمدة القارى للعينى, খণ্ড ১, পৃ. ২৫৬।

১৭. আল্লামা কামালুদ্দীন ইবন হুমাম (আল-হানাফী) বলেন, পাঁচটি স্থানে মিস্ওয়াক করা মুস্তাহাব। দাঁত বিবর্ণ হয়ে গেলে, নিঃশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত হলে, নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর, নামাযে দাঁড়ানোর সময় এবং অযূর সঙ্গে। (ফাতহুল কাদীর, খণ্ড ১, পৃ. ১৬) শায়খ বিন্নৌরী (র) বলেন, মুস্তাহাব স্থান উপরোক্ত পাঁচটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নতুবা গৃহে প্রবেশের পর, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করার পূর্বে, অধিক পরিমাণ কথনের পর এবং দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকার পরেও মিস্ওয়াক করা মুস্তাহাব। (মা'আরিফ সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ১৪৫, পাদটীকা)

১৮. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (মৃ. ৮৫৫ হি.) বলেন, মিস্ওয়াক করা কোন কোন ফকীহের মতে নামায কিংবা অযূর সঙ্গে যুক্ত সুন্নাত নয় বরং মুতলাক দীনের সুন্নাত। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) থেকে এ অভিমত বর্ণিত আছে। (উমদাতুল কারী, খণ্ড ৩, পৃ. ২৫৬; আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী, ফাতহুল মূলহিম লি শারহে সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১, পৃ. ৪১৬)

www.pathagar.com

অযূর মাসনূন তরীকা

কুরআন ও হাদীস পর্যালোচনা করলে অযূর মাসনূন তরীকা পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ ঃ

১. উত্তমরূপে মিসওয়াক করা,

২. কিবলামুখী হয়ে বসা,

৩. উভয় হাত তিনবার কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা, ঘুম থেকে উঠে থাকলে বড় পাত্রে হাত প্রবেশের আগে বাইরে তা ধুয়ে নেওয়া,

৪. তিনবার কুলি করা,

৫. তিনবার নাকে পানি দেওয়া। কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ নাসারন্ধ্রের ভিতর প্রবেশ করানো এবং নাক ঝেড়ে সাফ করা,

৬. তিনবার মুখমণ্ডল ধোয়া, মুখমণ্ডলের সীমানা হল ঃ লম্বালম্বিভাবে কপালের চুলের গোড়া থেকে থুতনীর নিচ পর্যন্ত, আর চওড়াভাবে এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত,

৭. দাড়ি খিলাল করা,

৮. উভয় হাত কনুই সহ তিনবার ধৌত করা,

৯. সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করা। হাতের অবশিষ্ট পানি দিয়েও করা যায় তবে নতুন পানি নেয়া উত্তম,

১০. উভয় পা গিরাসহ তিনবার করে ধৌত করা,

১১. হাত ও পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা,

১২. অযূ শেষ করে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাঁকিয়ে এই দু'আ পড়া ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَجَعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ.

অযূর মাসনূন তরীকার দলীল

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সালাত আদায়ের জন্য অযূর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা ফরয। মহান আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে সালাতের পূর্বে অযূর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন কারার নির্দেশ দিয়ে কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ.

www.pathagar.com

"হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে।" (সূরা আল-মায়িদা, ৫ ঃ ৬)

রাসূল কারীম (সা) অযূ তথা পবিত্রতা অর্জন করাকে সালাতের চাবি রূপের আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন,

مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرِ - رواه الترمذى

"সালাতের চাবি হল, পবিত্রতা অর্জন করা।"[১]

অন্য হাদীসে আছে অযূ ছাড়া সালাত কবুল হয় না।

اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ لاَ تُقْبَلُ صَلٰوةُ مَنْ اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِّنْ حَضَرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ اَوْ ضُرَاطٌ - رواه البخارى ومسلم

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তির হাদাস হয় তার সালাত কবূল হবে না যতক্ষণ না সে অযূ করে, তখন হাযরামাওতের এক ব্যক্তি বলল, হে আবূ হুরায়রা! হাদাস কি? তিনি বললেন, নিঃশব্দে বা সশব্দে বায়ু নির্গত হওয়া।[২]

কুরআন মজীদে অযূর চারটি রুকনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ (সা) বাস্তব জীবনে অযূ করে তার পূর্ণাঙ্গ বিধান সাহাবায়ে কিরামকে শিক্ষা দিয়েছেন, যার পদ্ধতি হাদীস গ্রন্থসমূহে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

عَنْ حَمْرَانَ مَوْلٰى عُثْمَانَ اَنَّهُ رَاى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِانَاءٍ فَافْرَغَ عَلٰى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ اَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِىْ الاِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ مَنْ تَوَضَّاَ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . رواه البخارى وروى الترمذى وقال حسن صحيح

১. উসমান (রা)-এর মুক্ত করা ক্রীতদাস হুমরান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে দেখেছেন যে, তিনি পানির পাত্র আনিয়ে উভয় হাতের তালুতে তা তিনবার

১. ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী, আল জামি' (দারু ইহ্‌ইয়াই তুরাস আল আরাবী, বৈরুত লেবানন, তারিখ বিহীন), বাব মাজা'আ আন্না মিফতাহাস-সালাতি ও তুহুর, হাদীস নং ৩।

২ আল-বুখারী, আস সাহীহ, (দারুস সালাম, রিয়াদ ১৪১৭/১৯৯৭), ১ম সং, অযূ অধ্যায়, হাদীস নং ১৩৫; মুসলিম, আস-সাহীস (কুতুবখানায়ে রাহীমিয়া, দেওবন্দ ইউ. পি., তারিখ বিহীন, হাদীস নং ৪২৮।

www.pathagar.com

ঢেলে উভয় হাত ধুয়ে নিলেন। এরপর ডান হাত পাত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন। তার পর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধুয়ে নিলেন এবং দুই হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিলেন। এরপর মাথা মাসেহ্ করলেন। তারপর উভয় পা গিরা পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিলেন। পরে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার মত এ রকম অযূ করবে তারপর দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে যাতে দুনিয়ার কোন খেয়াল করবে না, তার পূর্বের সমুদয় গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।[৩]

اِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ دَعَانِيْ اَبِيْ عَلِيٌّ بِوَضُوْءٍ فَقَرَّبْتُهُ لَهُ فَبَدَاَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ اَنْ يُّدْخِلَهُمَا فِيْ وَضُوْئِهِ ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى كَذٰلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى كَذٰلِكَ ثُمَّ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ : نَاوِلْنِيْ فَنَاوَلْتُهُ الْاِنَاءَ الَّذِيْ فِيْهِ فَضْلُ وَضُوْئِهِ فَشَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوْئِهِ قَائِمًا فَعَجِبْتُ فَلَمَّا رَاٰنِيْ قَالَ : لَا تَعْجَبْ فَاِنِّيْ رَاَيْتُ اَبَاكَ لِنَبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا رَاَيْتَنِيْ صَنَعْتُ يَقُوْلُ لِوُضُوْئِهِ هٰذَا وَشَرِبَ فَضْلَ وُضُوْئِهِ قَائِمًا .

২. হুসায়ন ইব্ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আলী (রা) আমাকে অযূর পানি আনতে বললেন। আমি তাঁর নিকট পানি এনে দিলাম। তিনি অযূ করতে আরম্ভ করলেন। অতঃপর তিনি অযূর পানিতে হাত ঢুকবার পূর্বে হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিলেন। এরপর তিনবার কুলি করেন এবং তিনবার পানি দিয়ে নাক ঝাড়েন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন। এরূপভাবে বাম হাত ধৌত করেন এবং একবার মাথা মাসেহ করেন। এরপর গোড়ালি পর্যন্ত ডান পা তিনবার এবং এরূপভাবে বাম পা ধৌত করেন। পরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, (পানির পাত্রটা) আমার হাতে দাও। আমি তাঁর অযূর অবশিষ্ট পানি যে পাত্রে ছিল সেটি এগিয়ে দিলাম। তিনি অযূর অবশিষ্ট পানি থেকে কিছু পরিমাণ দাঁড়িয়ে পান করলেন। আমি তা দেখে অবাক হলাম। তিনি আমাকে এরূপ দেখে বললেন, অবাক হয়ো না। তুমি আমাকে যেরূপ করতে দেখলে আমিও তোমার নানা নবী (সা)-কে এরূপ করতে দেখেছি অর্থাৎ তিনি এভাবেই অযূ করেছিলেন এবং এভাবেই দাঁড়িয়ে অযূর অবশিষ্ট পানি পান করেছিলেন।[৪]

৩. ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ্, প্রাগুক্ত, কিতাবুল অযূ, বাবুল অযূ সালাসান সালাসান, হাদীস নং ১২৫। একই হাদীস ইমাম মুসলিম তাঁর আস-সহীহ গ্রন্থে শব্দের সামান্য, পার্থক্য সহ উল্লেখ করেছেন। দ্র. বাবু সিফাতিল অযূ ওয়া কামালিহি, হাদীস নং ৪২৯।

৪. ইমাম নাসাঈ, আস-সুনানুল কুব্রা, (দারুস সালাম, রিয়াদ ১৪২০/১৯৯৯), ১ম সংস্করণ, কিতাবুল অযূ, বাবু সিফাতিল অযূ, হাদীন নং ৯৫।

www.pathagar.com

এ সব হাদীস থেকে অযূর যে পদ্ধতি পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ ঃ

১. উত্তমরূপে মিসওয়াক করা। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য মিসওয়াকের বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

২. কিবলামুখী হয়ে বসা

৩. বিসমিল্লাহ্ বলে অযূ শুরু করা।

عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِیْ سُفْیَانَ بْنِ حُوَیْطِبٍ عَنْ جَدَّتِهٖ عَنْ اَبِیْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ یَقُوْلُ لاَ وَضُوْءَ لِمَنْ لَّمْ یَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ رواه الترمذی وأحمد وقال أحمد لا أعلم فی هذا الباب حدیثا له اسناد جید وفیه ابو ثقال قال البخاری فی حدیثه نظر وبقیة رجاله رجال الصحیح (مجمع الزوائد ۱/۸۲)

রাবাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবু সুফিয়ান ইব্ন হুওয়ায়তিব (র) তাঁর দাদী থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমার পিতা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি অযূতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে না তার অযূ হবে না।[৫]

৫. উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা। তা এভাবে যে, পাত্র থেকে পানি ঢেলে প্রথমে হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার এবং পরে বাম হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা। এরপর বড় পাত্র থেকে ডান হাতে পানি নিয়ে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা। এ সম্পর্কে উপরে উল্লিখিত হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা) বর্ণিত হাদীস প্রণিধানযোগ্য।

৬. তিনবার কুলি করা। এর দলীল প্রাগুক্ত ও উক্ত হাদীসদ্বয়।

৭. তিনবার নাকে পানি দেওয়া এবং বাম হাতের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে নাক সাফ করা, অতঃপর নাক ঝেড়ে ফেলা। এ ব্যাপারে উক্ত হাদীসদ্বয় ছাড়াও অন্য হাদীসে বিভিন্নভাবে এর বর্ণনা রয়েছে যথা ঃ

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ فَلْیَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْیُوْتِرْهُ . رواه البخاری فی الصحیح

১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি অযূ করে সে যেন নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে, আর যে ইস্তিনজা করে সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে।[৬] অনুরূপ একটি হাদীস সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ ইমাম মুসলিম ও রিওয়ায়াত করেছেন। তাহল ঃ

৫. আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তাহারাত, বাবুত তাসমিয়া ইনদাল অযূ, হাদীস নং ২৫ ; ইব্ন মাজাহ, আস-সুনান (দার ইহ্ইয়াইত তুরাস আল-আরবী মিসর ১৩৯৫/১৯৭৫), কিতাবুত তাহারাত ওয়া সুনানিহা, বাবুত তাসমিয়া ফিল অযূ, হাদীস নং ৩৯৮ আবূ সাঈদ (রা) থেকেও অনুরূপ একটি রিওয়ায়াত তিনি উদ্ধৃত করেছেন। দ্র. হাদীস নং ৩৯৭।

৬ সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, বাবুল ইসতিনসার ফিল অযূ, হাদীস নং ১৬১; আন নাসাঈ, প্রাগুক্ত, আল-আমর বিল ইসতিনসার, হাদীস নং ৮৮; মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৫৩।

www.pathagar.com

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَجْمَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا وَاِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِىْ اَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ

رواه مسلم فى الصحيح

২. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত নবী (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ঢিলা ব্যবহার করবে তখন সে বেজোড় সংখ্যক ঢিলা নেবে। আর যখন অযূ করবে তখন নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে ফেলবে।[৭]

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ . رواه مسلم فى صحيحه

৩. হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এগুলো হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আমাদের কাছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেন। তার মধ্যে এ-ও ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা যখন অযূ করবে তখন দুই নাসারন্ধ্রে পানি টেনে নিবে, এরপর ঝেড়ে ফেলবে।[৮]

বাম হাতে নাক পরিষ্কার করা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرٰى فَفَعَلَ هٰذَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ هٰذَا طَهُوْرُ نَبِىٍّ ﷺ رواه النسائى فى سننه الكبرى .

৪. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পানি আনতে বললেন। পরে তিনি কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। বাম হাতে নাক ঝাড়লেন তিনবার এরূপ করলেন। পরে বললেন, এরূপই হচ্ছে নবী (সা)-এর অযূ।[৯]

৮. তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করা; লম্বালম্বিভাবে মাথার অগ্রভাগ থেকে থুতনীর নিচ পর্যন্ত আর চওড়াভাবে এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত। পূর্বে উল্লিখিত আয়াত এবং হযরত উসমান ও আলী (রা)-এর হাদীসদ্বয় থেকে একথা প্রমাণিত।

৯. দাড়ি খিলাল করা। এ সময় নতুনভাবে ডান হাতে পানি নিয়ে তা দাড়িতে লাগিয়ে খিলাল করা। দাড়ি খিলাল করা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ حَسَّانَ بْنَ بِلاَلٍ قَالَ رَاَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ فَقِيْلَ لَهُ اَوْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اَتُخَلِّلُ لِحْيَتَكَ قَالَ وَمَا يَمْنَعُنِىْ وَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ

---

৭. মুসলিম, আস-সাহীহ, প্রাগুক্ত, বাবুল ঈতার ফিল ইসতিনসার ওয়াল ইসতিজমার, হাদীস নং ৪৫১।
৮. মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৫২।
৯. আন-নাসাঈ, প্রাগুক্ত, বি আয়্যিল ইয়াদায়নি ইয়াসতানসিরু, হাদীস নং ৯১।

www.pathagar.com

اللّٰهِ ﷺ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ . رواه الترمذى فى جامعه ورواه ابن ماجة عن ابن ابى عمر ورواه الحاكم فى مستدرك .

১. হাস্‌সান ইব্‌ন বিলাল (র) বর্ণনা করেন, আমি আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)-কে দেখলাম তিনি অযূ করছেন। সে সময় তিনি দাড়িও খিলাল করেছেন। আমি তাকে বললাম (বর্ণনান্তরে তাঁকে বলা হল), আপনি দাড়ি খিলাল করছেন? তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দাড়ি খিলাল করতে দেখেছি। সুতরাং আমি তা থেকে বিরত থাকব কেন?[১০]

عَنْ عُثْمَانَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ . رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح وفى بلوغ المرام : وصحيحه ابن خزيمة

২. হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) অযূ করলেন এবং তিনি তাঁর দাড়ি খিলাল করলেন।[১১]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذا تَوَضَّاَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعِرْكِ ثُمَّ شَبَّكَ لِحْيَتَهُ بِاَصَابِعِه مِنْ تَحْتِهَا . رواه ابن ماجة فى سننه .

৩. ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন অযূ করতেন, তখন তিনি তাঁর কপালের দুই পাশ ধীরে ধীরে রগড়াতেন। অতঃপর তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে নিচের দিক থেকে দাড়ি খিলাল করতেন।[১২]

১০. উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত (কনুইয়ের গিরাসহ) তিনবার ধৌত করা। এ ব্যাপারে কুরআন কারীমের পূর্বোক্ত আয়াত এবং হযরত উসমান ও আলী (রা)-এর হাদীস দু'টি সুস্পষ্ট প্রমাণ।

১১. নতুনভাবে পানি নিয়ে সমস্ত মাথা একবার মাসেহ করা। মাসেহ-এর পদ্ধতি হল ঃ প্রথমে উভয় হাতের তালু মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে পিছনের দিকে নেবে। অতঃপর পিছন দিক থেকে তা আবার সামনের দিকে এনে যেখান থেকে শুরু করেছিল সেখানে এসে শেষ করা। অতঃপর উভয় হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা উভয় কানের ভিতরের অংশ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির পেটের দিক দিয়ে কানের বাইরের অংশ মাসেহ করবে। এরপর উভয় হাতের উপরিভাগ দ্বারা ঘাড় মসেহ করবে।

পূর্ণ মাথা মাসেহ করা সম্পর্কে হাদীসের ভাষ্য এরকম ঃ

عَنْ يَحْىَ الْمَازِنِىِّ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْىٰ اَتَسْتَطِيْعُ اَنْ تُرِيَنِىْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّا فَقَالَ عَبْدُ

১০. আত্ তিরমিযী, প্রাগুক্ত, বাব ফী তাখলীলিল্ লিহ্য়াতি, হাদীস নং ২৯; ইব্‌ন মাজা, প্রাগুক্ত, বাবু ফী তাখলীলিল্ লিহ্ইয়া, হাদীস নং ৪২৯।

১১. আত্ তিরমিযী, প্রাগুক্ত, বাব ফী তাখলীলিল্ লিহ্য়াতি, হাদীস নং ৩১; ইব্‌ন মাজা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৩০। হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক ও আবূ আইউব আনসারী (রা) থেকেও সামান্য শব্দের পার্থক্য সহ অনুরূপ বর্ণিত আছে। দ্র. হাদীস নং ৪৩১, ৪৩৩।

১২. ইব্‌ন মাজা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৩২।

www.pathagar.com

اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَاْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَاَ بِمُقَدَّمِ رَاْسِهِ حَتّٰى ذَهَبَ بِهِمَا اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا اِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ . رواه البخارى فى صحيحه وروى ايضا الترمذى وقال حديث عبد الله بن زيد أصح شئ فى الباب وأحسن .

ইয়াহইয়া আল-মাযনী (র) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ (রা)-কে (তিনি আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার দাদা) জিজ্ঞাসা করল ঃ আপনি কি আমাদেরকে দেখাতে পারেন, কিভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অযূ করতেন? আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ (রা) বললেন, হ্যাঁ, তারপর তিনি পানি আনলেন। হাতের উপর সে পানি ঢেলে দু'বার তাঁর হাত ধৌত করলেন। তারপর কুলি করলেন এবং তিনবার নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করলেন। এরপর চেহারা তিনবার ধৌত করলেন। তারপর দু'হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার করে ধৌত করলেন। তারপর দু'হাত দিয়ে মাথা মাসেহ করলেন। অর্থাৎ হাত দু'টি সামনে এবং পিছনে নিলেন মাথার সম্মুখে ভাগ থেকে শুরু করে উভয় হাত গর্দান পর্যন্ত নিলেন। তারপর আবার যেখানে থেকে নিয়েছিলেন, সেখানেই ফিরিয়ে আনলেন। তারপর দু' পা ধৌত করলেন।"[১৩]

নতুনভাবে পানি নেয়া সম্পর্কে হাদীসে উক্ত হয়েছে ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّاَ وَاَنَّهُ مَسَحَ رَاْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ . رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح

আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অযূ করতে দেখেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হাতে লেগে থাকা পানি ছাড়াও অন্য পানি নিয়ে সে সময় তাঁর মাথা মাসেহ করলেন।[১৪]

কানের সম্পর্ক মাথার সাথে। তা মাথারই অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য উভয় কান ও মাসেহ করতে হবে। এ ব্যাপারে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলও হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। এতদ্সম্পর্কিত হাদীসগুলি নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ تَوَضَّاَ النَّبِىُّ ﷺ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَاْسِهِ وَقَالَ الْاُذُنَانِ مِنَ الرَّاْسِ .

১. আবূ উমাম (রা) থেকে বর্ণিত নবী (সা) অযূ করার সময় তার চেহারা ও হাত তিনবার ধৌত করলেন। আর মাথা মাসেহ করলেন। পরে বললেন, কান মাথারই অংশ।[১৫]

১৩. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, বাবু মাসহির রাসি কুল্লিহি, হাদীস নং ১৮৫; ইব্ন মাজাহ প্রাগুক্ত, বাবু ফী মাস্হির রাসি, হাদীস নং, ৪৩৪; আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, বাবু ফী মাস্হির রা'সি, হাদীস নং ৩২।

১৪. আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, বাবু আল্লাহু ইয়া'খুযু লিরা'সিহি মা'আন জাদীদ, হাদীস নং ৩৫।

১৫. আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, বাবু আন্নাল-অযুনাইনি মিনার-রা'সি, হাদীন নং ৩৭; ইব্ন মাজাহ্, প্রাগুক্ত, বাবুল অযুনাইনি মিনার রা'সি, হাদীস নং ৪৪৪।

www.pathagar.com

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاُذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ رواه الترمذى وقال حديث حسن ليس اسناده بذالك القائم .

২. আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।[১৬]

কান মাসেহ এর আমল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاُذُنَيْهِ ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهِمَا رواه الترمذى وقال حديث ابن عباس حديث صحيح .

৩. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মাথা এবং উভয় কান পশ্চাৎ ও সম্মুখভাগসহ মাসেহ করেছেন।[১৭]

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَظَاهِرِهُمَا بِاِبْهَامَيْهِ . الحديث .

৪. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অযূ করলেন (অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধোয়ার পর) তারপর মাথা ও কান মাসেহ করলেন। কানের ভেতরের দিক শাহাদাত অঙ্গুলি এবং বাইরের দিক বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে মাসেহ করলেন-- ।[১৮]

عَنِ الرُّبَيِّعِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّاَ فَمَسَحَ ظَاهِرَ اُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا ، أخرجه الطحاوى رجاله ثقات وابن الهيعة وثقه أحمد وحسن له الترمذى .

৫. রাবী (রা) থেকে বর্ণিত , নবী (সা) অযূ করলেন এবং তিনি তাঁর উভয় কানের ভেতর ও বাইরের অংশ মাসেহ করলেন।[১৯]

১২. উভয় পায়ের গিরাসহ তিনবার ধৌত করা। পূর্বোল্লিখিত কুরআন মজীদের আয়াত এবং উসমান ও আলী (রা) -এর হাদীস এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। এ ছাড়াও পূর্বে বর্ণিত আরো বেশ কিছু হাদীসেও গিরাসহ পা ধৌত করার বিষয়টি স্থান পেয়েছে।

পায়ে চামড়ার মোজা থাকলে তার উপর মাসেহ করা জায়িয। তবে খালী পা উভয় পায়ের গিরা সহ ধৌত করার ব্যাপারে সকল সাহাবী ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[২০]

১৩. উভয় হাত ও পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা। এ সম্পর্কে হাদীসে উক্ত হয়েছে।

---

১৬. ইবন মাজা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৪৩।

১৭. জামি তিরমিযী, প্রাগুক্ত, বাবু ফী মাস্‌হিল-অযূনাইন জাহিরিহিমা ওয়া বাতিনিহিমা, হাদীস নং ৩৬।

১৮. সুনানে নাসাঈ, প্রাগুক্ত, বাব মাসহিল-অযূনাইনি মা'আর-রা'সি ওয়ামা ইউসতাদালুবিহি 'আলা আন্নাহুমা মিবনার গ্রন্থে সামান্য শব্দের পরিবর্তনসহ উল্লেখ করেছেন। দ্র. বাবু ফী মাসহিল অযূনাইনি, হাদীস নং ৪৩৯।

১৯. ইব্‌ন মাজাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৪১।

২০. আস-সায়্যিদ সাবিক, ফিকহুস সুন্নাহ, (দারুল ফাত্‌হ লিল-ই'লামিল আরবী, কায়রো মিসর ১৪১৮.১৯৯৮), ১ম সংস্করণ, ১খ, ৫৫ পৃ.।

www.pathagar.com

عَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ الاَصَابِعَ .

رواه الترمذى وقال حديث صحيح .

১. লাকীত ইব্‌ন সাবুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ তুমি যখন অযূ করবে তখন অঙ্গুলি খিলাল করবে।[২১]

ইমাম নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজাহ (র) ও হযরত লাকীত ইব্‌ন সাবুরা (রা)-এর এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাঁদের উভয়ের বর্ণনাতেই اَسْبِغْ الْوَضُوْء (পূর্ণরূপে অযূ করার) শীর্ষক বাক্যটি রয়েছে,[২২] যা ইমাম তিরমিযী (র)-এর বর্ণনায় স্থান পায়নি।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ اَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ . رواه الترمذى وقال هذا حديث غريب .

২. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ অযূ করার সময় তোমার হাত ও পায়ের অঙ্গুলি খিলাল করবে।[২৩]

ইমাম ইব্‌ন মাজাহ এ হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا قُمْتَ الَى الصَّلٰوةِ فَاسْبِغِ الْوَضُوْءَ وَاجْعَلِ الْمَاءَ بَيْنَ اَصَابِعِ رِجْلَيْكَ وَيَدَيْكَ .

ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন তুমি সালাত আদায়ের ইচ্ছা করবে তখন পূর্ণভাবে অযূ করবে এবং তোমার হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহের মাঝখানে পানি পৌঁছাবে।[২৪]

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ الْفِهْرِىِّ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اذَا تَوَضَّأَ دَلَكَ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ . رواه الترمذى وقال هذا حديث غريب

৩. মুসতাওরিদ ইব্‌ন শাদ্দাদ আল-ফিহ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-কে অযূ করার সময় (হাতের) কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দিয়ে পায়ের অঙ্গুলি মলতে দেখেছি।[২৫]

ইমাম তিরমিযী (র) ১নং হাদীসটি সম্পর্কে বলেছেন, এটি হাসান-সাহীহ এবং ২ ও ৩ নং হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, হাসান গারীব। তাই হাসান-সাহীহ হাদীসের মর্ম অনুযায়ী শুধু পায়ের অঙ্গুলি খিলাল করাকেই তিনি আলিমগণের মতে সুন্নাত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, হাত ও পায়ের অঙ্গুলি খিলাল করার বিধান দিয়েছেন ইসহাক (র)।[২৬]

---

২১. জামে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, বাবু ফী তাখলীলিল-আসাবি', হাদীস নং ৩৮।

২২. আন-নাসাঈ, আল-আমর বি তাখলীলিল-আসাবি', হাদীস নং ১১৪; ইব্‌ন মাজা, বাবু তাখলীলিল-আসাবি', হাদীস নং ৪৪৮।

২৩. জামে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৯।

২৪. সুনানে ইব্‌ন মাজাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৪৭।

২৫. জামে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪০; ইব্‌ন মাজা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং, ৪৪৬।

২৬. সংশ্লিষ্ট হাদীসের পর বর্ণিত ইমাম তিরমিযী (র)-র অভিমত দ্র.।

www.pathagar.com

১৪. অযূ শেষে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করা অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করা ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ .

হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারীদের মধ্যে শামিল কর এবং পবিত্রদের অন্তর্ভুক্ত কর।

এ সম্পর্কে হাদীসে উক্ত হয়েছে ঃ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْاِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِىْ فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِىٍّ فَاَدْرَكْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَاَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وَضُوْئَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ مَا اَجْوَدَ هٰذِهِ فَاِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَىَّ يَقُوْلُ الَّتِىْ قَبْلَهَا اَجْوَدُ فَنَظَرْتُ فَاِذَا عُمَرُ قَالَ اِنِّىْ قَدْ رَاَيْتُكَ جِئْتَ اٰنِفًا قَالَ مَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ يَّتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ اَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ اِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ .

১. উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের উপর উট চরানোর দায়িত্ব ছিল। একদা আমার পালা এলে আমি উট চরিয়ে বিকেলে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পেলাম, তিনি দাঁড়িয়ে লোকদের সাথে কথা বলছেন। আমি তাঁর একথা শুনতে পেলাম যে, "যে মুসলমান সুন্দররূপে অযূ করে তারপর দাঁড়িয়ে দেহ মনকে পুরোপুরি তাঁর প্রতি নিবদ্ধ রেখে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।" উকবা (রা) বলেন, কথাটি শুনে আমি বলে উঠলাম ঃ ওহ্, কথাটি কত উত্তম! তখন আমার সামনের একজন বলতে লাগলেন,আগের কথাটি আরো উত্তম। আমি সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি উমর। তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে দেখেছি এই মাত্র এসেছ। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগে বলেছেন, তোমাদের যে ব্যক্তি কামিল বা পূর্ণরূপে অযূ করে এই দু'আ পাঠ করবে ঃ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছিয়ে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল"--তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।[২৭]

২. উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি খুব ভাল করে অযূ করে এই দু'আ পড়ে তবে জান্নাতের আটটি দরজাই তার জন্য খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়েই সে ইচ্ছা করবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

দু'আটি হল ঃ

২৭. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, বাবু-যিকরিল মুসতাহাব আকিবাল অযূ, হাদীস নং, ৪৪৪;মুসলিমের অপর এক রিওয়ায়াতে 'وحده لا شريك له' কথাটির উল্লেখ রয়েছে। দ্র. হাদীস নং ৪৪৫। আনাস ইবন মালিক (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

www.pathagar.com

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةَ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ .

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারীদের মধ্যে শামিল করুন এবং পবিত্রদের অন্তর্ভুক্ত করুন।[২৮]

অযূর শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলা মুসতাহাব

অযূ শুরু করার পূর্বে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলার বিধান হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে এটা কি সুন্নাত, মুসতাহাব না ওয়াজিব, সে সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক ও হাম্বলীদের পক্ষ থেকে তুই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ ১. সুন্নাত, ২. মুসতাহাব।

হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব আল-হিদায়ার লেখক শায়খ বুরহানুদ্দীন মুরগীনানী (মৃ. ৫৯৩ হি./১১৯৭ খৃ.) একে সুন্নাতের মধ্যে উল্লেখ করলেও মুস্তাহাব হবার বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন ঃ والاصح انها مستحبة অর্থাৎ অধিকতর সঠিক হল, অযূতে বিস্‌মিল্লাহ বলা মুস্তাহাব।[২৯] হানাফী মাযহাবের অপর এক বিজ্ঞ আলিম শায়খ ইব্‌ন হুমাম (মৃ. ৮৬১/১৪৫৭) অযূতে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলা ওয়াজিব বলে মত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তাঁরই বিশিষ্ট ছাত্র আল্লামা কাসিম ইব্‌ন কুত্‌লুবুগা (মৃ. ৮৭৯/১৪৭৪) এটাকে তাঁর শায়খের স্বতন্ত্র অভিমত, যা গ্রহণযোগ্য নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৩০]

ইমাম মালিক (র) থেকে সুন্নাত ও মুসতাহাব হবার মত বর্ণিত আছে; ইমাম শাফিঈ ও মালিক (র)-এর সঠিক মত হল, অযূর শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ বলা সুন্নাত। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-এর দুই রিওয়ায়াতের মধ্যে ইব্‌ন কুদামা (মৃ. ৬২০/ ১২২৩) যিনি হাম্বলী ফিক্‌হ-এর সবচে নির্ভরযোগ্য রাবী তিনি মুসতাহাব হওয়ার রায়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেউ কেউ ইমাম আহমদ-এর প্রতি ওয়াজিব হবার মত আরোপ করলেও তা সঠিক নয়। কারণ ইবন কুদামা দু'টি রিওয়ায়াতই উল্লেখ করেছেন, অতঃপর শেষোক্তটি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায়াহ (মৃ. ৩৩৭/৯৪৯) ও কোন কোন আহলে যাহের একে ওয়াজিব বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের দলীল হল 'অযূর মাসনূন তরীকা' শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীস, لاَ وَضُوْءَ لِمَنْ لَّمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ যে বিস্‌মিল্লাহ বলবে না, তার অযূ হবে না।[৩১]

২৮. জামে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, বাব ফীমা ইউকালু বা'দাল অযূ, হাদীস নং ৫৫।

২৯. বুরহানুদ্দীন আল-মুরগীনানী, আল-হিদায়া, কুতুবখানায়ে রাহীমিয়া দেওবন্দ, (ইউ. পি.) তারিখ বিহীন, ১ম খণ্ড, ৬ পৃ.।

৩০. ইব্‌ন কুদামা, আল-মুগনী, (মাকতাবা ইব্‌ন তায়ামিয়া, মিসর তারিখ বিহীন), ১ খণ্ড, ১০২-১৯=০৩ পৃ.।

৩১. জামে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, বাবুত তাসমিয়া ইনদাল অযূ, হাদীস নাং ২৫; ইব্‌ন মাজাহ, প্রাগুক্ত, বাবুত-তাসমিয়া ফিল অযূ, হাদীস নং ৩৯৮।

www.pathagar.com

তাদের মতে কেউ জেনে শুনে, ইচ্ছাকৃতভাবে বিস্‌মিল্লাহ ত্যাগ করলে তাঁর অযূ হবে না, পুনরায় অযূ করতে হবে। আর ভুলবশত না পড়লে তা মাফ হয়ে যাবে।

জমহূর উলামায়ে কিরাম অন্যান্য হাদীসের আলোকে উল্লিখিত হাদীসের এই অর্থ করেন যে, 'বিসমিল্লাহ' না বললে অযূ হবে না অর্থ পূর্ণাঙ্গ অযূ হবে না, যেমন এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ صَلٰوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ اِلاَّ فِىْ الْمَسْجِدِ .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মসজিদের প্রতিবেশীর জন্য মসজিদে ছাড়া সালাত হয় না।[৩২]

এর বিশ্লেষণ নিম্নরূপ ঃ

১. অযূর শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ বলা ওয়াজিব হওয়া কোন শক্তিশালী রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত নয়। উল্লিখিত হাদীসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল। যেমন ইমাম আহমদ (র)-এর মন্তব্য ইমাম তিরমিযী (র) উদ্ধৃত করেছেন যে,

قَالَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لاَ اَعْلَمُ فِىْ هٰذَا الْبَابِ حَدِيْثًا لَهُ اِسْنَادٌ جَيِّدٌ .

আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র) বলেন, এ বিষয়ে এমন কোন হাদীস আমার জানা নেই, যে হাদীসটির সনদ জায়্যিদ বা উত্তম বলা যেতে পারে।[৩৩]

হাদীস দুর্বল হবার কারণ হল, এ হাদীসের মূলভিত্তি রাবাহ ইব্‌ন আবদুর রাহমান-এর উপর। হাফিয ইব্‌ন হাজার আসকালানী (মৃ. ৮৫২/১৪৪৯) তাঁর (التلخيص الحبير) গ্রন্থে তাকে মাজহূল বা অজ্ঞাত পরিচয় রাবী বলে উল্লেখ করেছেন। উপরন্তু তিনি আবূ যুর'আ (মৃ. ৮২১/১৪২৩) ও আবূ হাতিম (মৃ. ৩২২/৯৩৩) এর উক্তি ও বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা রাবাহকে মাজহূল বলেছেন।[৩৪]

ইব্‌ন হিব্বান (মৃ. ৩৫৪.৯৬৫) অবশ্য তাঁর 'কিতাবুস সিকাত' (كتاب الثقات) গ্রন্থে রাবাহকে স্থান দিয়েছেন।[৩৫] কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আল্লামা সুয়ূতী (মৃ. ৯১১/১৫০৫) তাঁর তাদরীবুর রাবী (تدريب الراوى) গ্রন্থে এ কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ইব্‌ন হিব্বানের পরিভাষা জমহূর মুহাদ্দিসের পরিভাষা থেকে ভিন্ন। তাঁর মতে কোন বিশ্বস্ত রাবী কারো কাছ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করলে সে ব্যক্তি (তার কাছ থেকে রিওয়ায়াত করা হচ্ছে) মাজহূল থাকা সত্ত্বেও বিশ্বস্ত রাবী বলে বিবেচিত হবেন।[৩৬] তাই ইব্‌ন হিব্বান-এর কিতাবুস-সিকাত-এ উল্লেখ থাকলেই সে রাবী প্রকৃত বিশ্বস্ত হয়ে যাবেন না।

---

৩২. আদ-দারা কুতনী, আস-সুনান, (দারা নাশরিল কুতুবিল ইসলামিয়্যা, লাহোর তারিখবিহীন), ১খ, ৪২০, বাবুল-হাসসি লিজারিল মাসজিদি আলাস সালাত ফীহি।

৩৩. জামে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ২৫ নং হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্তব্য দ্র.।

৩৪. যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস-সুনান, ১খ, পৃ. ২৬; মুহাম্মদ তাকী উসমানী, দারস-ই-তিরমিযী, ১খ, পৃ. ২৩১-২৩২।

৩৫. ইব্‌ন হাজার আসকালানী, তাহাযীবুত তাহযীব, (দারুল মারিফা বৈরুত, লেবানন, ১৯৬৮খৃ.) ৩খ, পৃ. ২৩৪; যাফর আহমদ উসমানী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ২৬।

৩৬. দারস-ই-তিরমিযী, ১খ, ২৩২ পৃ.।

www.pathagar.com

হাদীসটিতে দ্বিতীয় দুর্বলতা হল, তাতে আবূ ছিফাল আল-মুররীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। তার সম্পর্কে আল-হায়সামী (মৃ. ৮০৭ হি.) স্বীয় গ্রন্থ 'মাজমা'উয যাওয়াইদ' এ লিখিছেন যে, قال البخاری فی حديثه نظر অর্থাৎ ইমাম বুখারী (র) বলেছেন তার হাদীসে দুর্বল ও আপত্তি রয়েছে।[৩৭]

২. বহু সাহাবী অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অযূর বিবরণ দিয়েছেন। এসবের কোথাও 'বিস্‌মিল্লাহ' বলার উল্লেখ পাওয়া যায় না। 'উযূর মাসনূন তরীকা' শীর্ষক আলোচনা উল্লিখিত হযরত উসমান ও হযরত আলী (রা)-এর বর্ণিত হাদীসদ্বয় ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকেও এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ

عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِیْ حَسَنٍ سَاَلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ وَضُوْءِ النَّبِیِّ ﷺ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِّنْ مَّاءٍ فَتَوَضَّاءَ لَهُمْ وَضُوْءَ النَّبِیِّ ﷺ فَاَكْفَا عَلٰى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِی التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ غُرْفَاتٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَاْسَهُ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ مَرَّةً وَّاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ .

আমর উব্‌ন আবূ হাসান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়িদ (রা) কে নবী (সা)-এর অযূ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি তখন এক পাত্র পানি আনালেন এবং তাদের (দেখাবার) জন্য নবী (সা)-এর মত অযূ করলেন। তিনি পাত্র থেকে দু'হাতে পানি ঢাললেন।। তা দিয়ে হাত দু'টি তিনবার ধুলেন। তারপর পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তিন আঁজলা পানি নিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন। তারপর আবার হাত ঢুকালেন। তিনবার তাঁর মুখমণ্ডল মুবারক করলেন। তারপর আবার হাত ঢুকিয়ে (পানি নিয়ে) দুই হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার ধুলেন। তারপর আবার হাত ঢুকিয়ে উভয় হাত দিয়ে সামনে এবং পিছনে একবার মাত্র মাথা মাসেহ করলেন। তারপর দু' পা গিরা পর্যন্ত ধুলেন।[৩৮]

সুতরাং 'বিস্‌মিল্লাহ' বলা যদি ওয়াজিবই হত তবে এ সব হাদীসে অবশ্যই তার উল্লেখ থাকত।

৩. দারা কুতনী ও বায়হাকীতে হযরত ইব্‌ন উমর (র) থেকে মারফূ'রূপে (অর্থাৎ যার সূত্র রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌছেছে) বর্ণিত আছে যে,

مَنْ تَوَضَّاَ فَذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى وَضُوْئِهِ كَانَ طَهُوْرًا لِجَسَدِهِ قَالَ وَمَنْ تَوَضَّاَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَانَ طَهُوْرًا لِاَ عْضَائِهِ . رواه الدار قطنى فى سننه

---

৩৭. আল-হায়সামী, মাজমা'উস যাওয়াইদ ওয়া মামবা'উল ফাওয়াইদ, (দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরুত লেবানন ১৪০৮/১৯৮৮), ১খ, ২২৮ পৃ.; (যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামিয়্যা, করাচী, তারিখ বিহীন, ১খ. ২৬ পৃ.।

৩৮. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, বাবু গাসলির-রিজলাইনি ইলাল-কা'বাইন, হাদীস নং ১৮৬।

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি অযূ করল এবং তার অযূতে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলল তার পূর্ণ শরীর পবিত্র হয়ে গেল। আর যে অযূ করল অথচ 'বিস্‌মিল্লাহ' বলল না তার কেবল (অযূর) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোই পবিত্র হল।[৩৯] বায়হাকীতে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ تَطَهَّرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ لَمْ يَتَطَهَّرْ اِلاَّ مَوْضَعَ الْوَضُوْءِ .

رواه البيهقى فى سننه الكبرى

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অযূ করল এবং 'বিস্‌মিল্লাহ' বলল, তার পূর্ণ শরীর পবিত্র হয়ে গেল। আর যে অযূ করল এবং 'বিস্‌মিল্লাহ' বলল না, তার অযূর অঙ্গ ছাড়া আর কিছুই পবিত্র হল না।[৪০]

এ হাদীসদ্বয় থেকে, বুঝা যায়, 'বিস্‌মিল্লাহ' বলা ছাড়াও অযূ গ্রহণযোগ্য হয়। কেউ কেউ অবশ্য এ হাদীসকে যাঈফ (দুর্বল) বলেছেন। কারণ আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এ হাদীসে রাবী সিরদাস ইব্‌ন মুহাম্মদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়েই মাজহূল (অজ্ঞাত)। এই রিওয়ায়াতটি দারা কুতনী ও বায়হাকী হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকেও রিওয়ায়াত করেছেন। তার মধ্যে রাবী আবূ বকর আদ-দাহিরী হাদীসের ক্ষেত্রে মাতরূক (متروك) বা পরিত্যক্ত। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি মনগড়া হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বায়হাকী ও দারা কুতনী এই রিওয়ায়াতটি হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন। তাঁর সনদে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাশিম সিমসার মাতরূক। এই হাদীসটিই আবদুল মালিক ইব্‌ন হাবীব ইসমাঈল ইব্‌ন আইয়াশ থেকে, তিনি আবান থেকে মুরসালরূপে রিওয়ায়াত করেছেন; কিন্তু তা একটি দুর্বলতম মুরসাল। ইব্‌ন আবু শায়বা (মৃ. ২৩৫/৮৪৯) এ শব্দগুলিই আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তার সনদে লায়স ইব্‌ন আবু সুলায়ম ও হাসান ইব্‌ন উমারা বিতর্কিত ব্যক্তি। তাই এ রিওয়ায়াত যাঈফ বা দুর্বল। এ অভিযোগের জবাবে বলা হয় যে, এ অধ্যায়ের প্রথম হাদীসটি যাঈফ হওয়া সত্ত্বেও কয়েকভাবে ও কয়েক পন্থায় রিওয়ায়াত হবার কারণে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। তেমনিভাবে এ হাদীসও বিভিন্ন পন্থায় বর্ণিত হবার কারণে حسن لغيره এর পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। তাই তা গ্রহণযোগ্য।

৪. আল-হায়সামী আত-তাবারানীর 'মু'জামুস সাগীর' গ্রন্থের বরাতে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি এ রকম ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاِنَّ حَفَظَتَكَ لاَ تَبْرَحُ تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتّٰى تُحْدِثَ مِنْ ذٰلِكَ الْوَضُوْءَ . قال البيهقى اسناده حسن .

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আবূ হুরায়রা! তুমি যখন অযূ করবে তখন বিস্‌মিল্লাহ ও আল হামদুলিল্লাহ বলবে। কারণ তা বললে তোমার নিরাপত্তায় নিয়োজিত ফিরিশ্‌তাগণ উক্ত অযূ ভঙ্গ না করা পর্যন্ত তোমার জন্য নেকী লিখতে থাকবে।"[৪১]

৩৯. দারা কুতনী, আস সুনান, ১খ. ৭৪-৭৫, বাবুত তাসমিয়া আলাল অযূ, হাদীস নং ১৩।

৪০. আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল-কুবরা, (দারুল-মা'য়িদা, বৈরুত, লেবানন ১৩৪৪ হি.), ১ম সংস্করণ, বাবুত তাসমিয়া 'আলাল অযূ, ১খ. ৪৪ পৃ.।

৪১. আল-হায়সামী, মাজমা'উস যাওয়াইদ ওয়া মামবা'উল ফাওয়াইদ, বাবুত তাসমিয়া ইনদাল অযূ, ১খ, ২২০ পৃ.; যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান,প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ২৭।

www.pathagar.com

হাদীসটি আল-হায়সামী তাঁর 'মাজমা'উস যাওয়াইদ' গ্রন্থে উল্লেখ করার পর এর সনদ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, اسناده حسن এর সনদ হাসান পর্যায়ের।[৪২]

এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, 'বিস্মিল্লাহ' বলা মুস্তাহাব। কারণ এ হাদীসে বিসমিল্লাহর সাথে সাথে আল-হামদুলিল্লাহ বলার কথাও উল্লেখ আছে। আর কেউ আল-হামদুলিল্লাহ বলাকে ওয়াজিব বলেন না।

মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী (র) তাঁর 'ই'লাউস সুনান' গ্রন্থে বিস্মিল্লাহ বলা মুস্তাহাব বলেছেন এবং তার পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন ঃ

عَنِ الْبَرَاءِ مَرْفُوْعًا مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ حِيْنَ يَتَوَضَّأُ بِسْمِ اللّٰهِ ثُمَّ يَقُوْلُ بِكُلِّ عُضْوٍ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ حِيْنَ يَفْرَغُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ اِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ اَيُّهَا شَاءَ فَاِنْ قَامَ مِنْ فَوْرِهٖ ذٰلِكَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيْهِمَا وَيَعْلَمُ مَا يَقُوْلُ انْفَتَلَ مِنْ صَلٰوتِهٖ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ اِسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ . قال المستغفرى هذا حديث حسن غريب

হযরত বারা ইবন আযিব (রা) থেকে মারফূরূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে বান্দা অযূর সময় 'বিস্মিল্লাহ' বলবে অতঃপর প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় বলবে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল)। অতঃপর অযূ শেষে করে বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ .

(হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং পবিত্রদের শামিল করে নাও) তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে যাবে। সে যে দরজা দিয়েই ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে। অযূ শেষ করার পরপরই যদি সে দাঁড়িয়ে দু'রাক'আত সালাত এমনভাবে আদায় করে যাতে কিরা'আত পাঠ করে এবং যা সে বলছে তা জানতে পারে অর্থাৎ সালাতের প্রতি পূর্ণমাত্রায় তার মনোযোগ থাকে তাহলে সালাত শেষ করার সাথে সাথেই সে ঐ শিশুর ন্যায় (নিষ্পাপ) হয়ে যায় যেন তার মা তাকে আজকে জন্ম দিয়েছে এবং তাকে বলা হয়, তুমি আবার নতুন করে আমল শুরু কর।[৪৩]

---

৪২. আল-হায়সামী, প্রাগুক্ত।

৪৩. যাফর আহমদ উসমানী, প্রাগুক্ত, ১খ, ২৭, বাবু ইসতিহবাবুত তাসমিয়া ইনদাল অযূ। আল-মুসতাগফিরী বলেন, এ হাদীসটি হাসান-গারীব।

www.pathagar.com

৬. ইমাম তাহাভী তাঁর 'শারহ মা'আনিল-আসার' গ্রন্থে বিসমিল্লাহ ওয়াজিব না হবার পক্ষে মুহাজির ইব্‌ন কুনফুয (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, হাদীসটি হল :

عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وَضُوْئِهِ قَالَ اِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ اِلاَّ اَنِّيْ كُنْتُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ . (أخرجه أبو داؤد وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك باختلاف فى اللفظ)

হযরত মুহাজির ইব্‌ন কুনফুয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অযূ করতে দেখলাম। তখন আমি তাঁকে সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি আমার সালামের কোন উত্তর দিলেন না। অযূ শেষ করে বললেন, তোমার সালামের উত্তর আমি এ জন্য দিইনি যে, আমি তখন অপবিত্র অবস্থায় ছিলাম।[88]

লক্ষণীয় যে, সালামের উত্তরে যে ওয়া আলাইকুমুস সালাম (وعليكم السلام) বলা হয় তাতে সালাম শব্দটি আল্লাহর নাম নয়; এতদ্‌সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা) তা ত্যাগ করেছেন। আর বিসমিল্লাহ তো সরাসরি আল্লাহ্‌র নাম। তা রাসূলুল্লাহ (সা) বিনা অযূতে কিভাবে নিবেন।

অবশ্য একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এই রিওয়ায়াত দ্বারা তো অযূর সময় বিসমিল্লাহ বলা মাকরূহ বলে প্রতীয়মান হয়। অথচ কেউ, এর প্রবক্তা নয়। এ প্রশ্নের জওয়াবে হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেছেন যে, এ রিওয়ায়াত দ্বারা ইমাম তাহাভী (র)-র আসল উদ্দেশ্য হল বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব নয় তাই প্রমাণ করা। বাকী তা সুন্নাত বা মুস্তাহাব হবার বিষয়টি এ রিওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় না। তা প্রমাণের জন্য অন্য হাদীস রয়েছে, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে ইনসাফের কথা এই যে, এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা দুর্বল। কারণ দলীল পেশকারী উলামায়ে কিরাম এটাকে সেই যুগের সাথে সম্পৃক্ত বলে উল্লেখ করেছেন, যখন বিনা অযূতে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা জায়িয ছিল না। পরবর্তীকালে তা জায়িয হয়ে গেছে। তাই হতে পারে যে, অযূর শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ পড়ার বিষয়টি এ ঘটনার পর হয়েছে।[৪৫]

কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া অযূতে সুন্নাত এবং গোসলে ওয়াজিব

উযূর মধ্যে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার বিধান হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, যা পূর্ববর্তী অধ্যায় হযরত উসমান ও হযরত আলী (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে। তবে অযূ ও গোসলের মধ্যে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া হুকুম সম্পর্কে ফিক্‌হবিদগণের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। ইব্‌ন আবু লায়লা, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইসহাক (র)-এর মতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া অযূ ও গোসল উভয়টিতে ওয়াজিব। এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস নিম্নরূপ :

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَثِرْ وَاِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَاَوْتِرْ . قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح

৪৪. আবূ জাফর আত-তাহাভী, শারহ মা'আনিল-আসার, (দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরুত লেবানন, তারিখ বিহীন), বাবুত তাসমিয়া আলাল অযূ, ১খ. পৃ. ২৭।

৪৫. মুহাম্মদ তাকী উসমানী, দারসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ২৩৪।

www.pathagar.com

হযরত সালমা ইব্‌ন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যখন অযূ করবে তখন নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে ফেলবে। আর কুলুখ ব্যবহার করার সময় তা বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করবে।[৪৬]

উল্লিখিত হাদীসে নাকে পানি দেওয়া সম্পর্কে امـر। তথা নির্দেশসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার দ্বারা নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব বলে প্রতীয়মান হয়। ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ

اذا تَوَضَّاْتَ فَمَضْمِضْ . رواه أبو داؤد

২. যখন তুমি অযূ করবে তখন কুলি করে নিও।[৪৭] হাফিয ইব্‌ন হাজার (র) এ হাদীসটিকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। এ হাদীস দ্বারা কুলি করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়।[৪৮]

ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া অযূ ও গোসল উভয় ক্ষেত্রেই সুন্নাত। তাঁদের দলীল হল, হাদীসে দশটি বিষয়কে 'ফিতরাত' বা স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার কথা বিধৃত রয়েছে।[৪৯] যেমন ঃ

عَنْ عَمَّارِ ابْنِ يَاسِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةَ وَالْاِسْتِنْشَاقَ رواه أبو داؤد فى سننه

হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত।"[৫০]

আবূ দাউদ-এ আরো একটি হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এক বেদুঈনকে বলেছিলেন, توضـأ كـمـا امـرك الله অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেরূপ নির্দেশ দিয়েছেন সে রূপেই অযূ কর।[৫১] অযূ সম্পর্কিত কুরআন কারীমের যে আয়াত ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার কথা উল্লেখ নেই। এতে বুঝা যায় তা ওয়াজিব নয়। তাই হাদীসে উল্লিখিত কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সম্পর্কিত নির্দেশকে তাঁরা সুন্নাত সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা ও সুফিয়ান সাওরী (র) প্রমুখের মতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া অযূতে সুন্নাত এবং গোসলে ওয়াজিব। অযূর ক্ষেত্রে তাঁদের দলীল ইমাম মালিক ও শাফিঈ (র)-এর অনুরূপ। গোসলে তা ওয়াজিব হবার বেশ কিছু দলীল রয়েছে। যথা ঃ

১. মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে একটি মুরসাল[৫২] হাদীস বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ

---

৪৬. আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, বাবু ফিল মাযমাযাতি ওয়াল ইসতিনশাক, হাদীস নং ২৭।

৪৭. আবূ দাঊদ, আস-সুনান, কুতুবখানায়ে রাহীমিয়া দেওবন্দ তা. বি. বাবুন ফিল ইসতিনসার, ১খ., ৩০ পৃ.।

৪৮. আশ-শাওকানী, নায়লুল আওতার (দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন ১৪০৩/১৯৮৩) দ্বিতীয় সংস্করণ, বাবুল মুবালাগা ফিল ইসতিনসার, ১খ., ১৮০ পৃ.।

৪৯. আল-মুরগীনানী, আল হিদায়া, ১খ., ১২।

৫০. আবু দাউদ, আস-সুনান, প্রাগুক্ত, বাবুস-সিওয়াক মিনাল ফিতরাতি, ১খ., ১৮।

৫১. আবূ দাঊদ, প্রাগুক্ত।

৫২. মুরসাল সেই হাদীসকে বলে যার বর্ণনাকারী তাবিঈ সাহাবীর নাম উল্লেখ করা ছাড়াই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা বা কাজের বর্ণনা দিয়ে থাকেন।

www.pathagar.com

أَمَـرَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْاِسْـتِـنْشَـاقِ مِنَ الْـجَنَابَـةِ ثَلَاثًـا . رواه الدار قطنى وقال سند صحيح

রাসূলুল্লাহ (সা) বড় নাপাকী থেকে পবিত্র হবার জন্য তিনবার নাকে পানি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[৫৩]

এ হাদীসটির সনদ সহীহ্ যা ইমাম দারা কুতনীও প্রত্যয়ন করেছেন। হানাফী মাযহাবের উসূল অনুযায়ী মুরসাল হাদীসও দলীলরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। বিশেষত মুহাম্মদ ইব্ন সীরীনের মুরসাল হল শক্তিশালী মুরসাল। আল্লামা ইব্ন তায়মিয়া (র) তাঁর 'মিনহাজুস সুন্নাহ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ مِنْ اَوْرَعِ النَّاسِ فِىْ مَنْطِقِهٖ وَمَرَاسِيْلُهُ مِنْ اَصَحِّ الْمَرَاسِيْلِ .

কথাবার্তার ক্ষেত্রে মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) একজন উঁচু পর্যায়ের পরহেযগার ব্যক্তি। আর তাঁর বর্ণিত মুরসাল হাদীসগুলো অধিকতর বিশুদ্ধ।[৫৪]

এ জন্যই ইমাম শাফিঈ (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন সীরীনের মুরসাল গ্রহণ করেছেন বলে আল্লামা নাওয়াবী (র) তাঁর 'মুকাদ্দিমা শারহুল মুহায্যাব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৫৫]

উল্লিখিত হাদীসে من الجنابة শব্দটি দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, জানাবাত তথা নাপাকী দূর করার জন্য যে গোসল করা হয়, তাতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার বিধান অযূর মধ্যে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার বিধান থেকে উঁচু পর্যায়ের হবে। অযূতে উভয় কাজ কমপক্ষে সুন্নাত—এ ব্যাপারে সকলেই একমত। তাই গোসলের মধ্যে উভয়টি ওয়াজিব হবে এটাই স্বাভাবিক।

২. ইমাম দারা কুতনী তাঁর সুনান গ্রন্থে আবূ হানীফা ইব্ন রাশিদ আয়শা বিন্ত আজরাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, বড় নাপাকী থেকে গোসলকারী ব্যক্তি যদি কুলি করতে এবং নাকে পানি দিতে ভুলে যায়, তার সম্পর্কে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ

يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيُعِيْدُ الصَّلٰوةَ .

সে কুলি করবে ও নাকে পানি দিবে এবং পুনরায় সালাত আদায় করবে।[৫৬]

---

৫৩. দারা কুতনী, আস-সুনান, বাবু মা রুবিয়া ফিল মাযমাযাতি ওয়াল ইসতিনশাক ফী গুসলিল জানাবাতি, ১খ., ১১৫ হাদীস নং ৪।

৫৪. মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, ১খ, ২৩৬।

৫৫. প্রাগুক্ত।

৫৬. দারা কুতনী, আস-সুনান, প্রাগুক্ত, ১খ., ১১৬ পৃ.।
ইমাম দারা কুতনী অবশ্য এ হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে আপত্তি করেছেন। তিনি বলেন ঃ عائشة بنت عجرد لا تقوم بها حجة আয়েশা বিনত আজরাদ এর দ্বারা দলীল পেশ করা সঙ্গত নয়। (দ্র. বাবু মারুবিয়া ফিল মাযমাযাতি ওয়াল ইসতিনশাক ফী গুসলিল জানাবাতি শীর্ষক অধ্যায়ের ৫ নং হাদীসের সংশ্লিষ্ট মন্তব্য।) তবে তাঁর এ আপত্তির ফলে উক্ত হাদীস দলীল হবার ক্ষেত্রে কোনরূপ অসুবিধা নেই। তার সে আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আয়েশা বিনত আজরাদ সাহাবী, না তাবিঈ-এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হাফিয আয-যাহাবী (র) তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে এবং হাফিয আসকালীন (র) তাঁর 'লিসানুল মীযান গ্রন্থে বলেন ঃ

www.pathagar.com

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর এ উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, গোসলের মধ্যে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব। তা না হলে তিনি পুনরায় সালাত আদায় করার কথা বলতেন না।

৩. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীস যা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوْا الشَّعْرَ وَانْقُوْا الْبَشَرَ . رواه الترمذى وقال حديث الحرث بن رجيه حديث غريب

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বুর্ণত, নবী (সা) বলেছেন, প্রতিটি পশমের নিচে অপবিত্র থাকে। সুতরাং তোমরা পশম (বা চুল) ধুয়ে নিবে এবং শরীরের চামড়া ভাল করে পরিষ্কার করবে।[৫৭]

নাকের ভিতরে ও পশম রয়েছে। তাই সেটি ধোয়া ও ওয়াজিব। আর নাকে পানি দেওয়া যদি ওয়াজিব প্রমাণিত হয় তবে কুলি করাও ওয়াজিব হবে। কারণ এ দু'টি বিধানের মধ্যে কেউই পার্থক্য করেন নি।

رَوَى عَنْهَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَرَوَى عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ رَاشِدٍ عَنْهَا وَيُقَالُ لَهَا صُحْبَةٌ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَالِكَ .

"আবু হানীফা তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেন। উসমান ইব্‌ন আবু রাশিদ (র) ও তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। বলা হয় যে, তিনি সাহাবিয়া। কিন্তু তা সুপ্রমাণিত নয় (ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, লিসানুল মীযান, ইদারা তালীফাত-ই আশরাফিয়া, মুলতান, তারিখ বিহীন, ৩খ., ২২৭ পৃ.) তাঁরা উভয়েই তাঁর সাহবিয়া হবার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন।

তিনি যদি সাহাবিয়া হয়ে থাকেন তবে তাঁর সম্পর্কে কোন অভিযোগ নেই। কারণ الصحابة كلهم عدول সাহাবীগণ সকলেই ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত-। আর যদি তিনি তাবিঈয়া হয়ে থাকেন তবুও তিনি বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য হবার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) তাঁর থেকে শুধুমাত্র হাদীস বর্ণনাই করেন নি বরং এ মাস'আলার ব্যাপারে তাঁর রিওয়ায়াতকেই তিনি মূলভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম দারা কুতনী, ইমাম শাফিঈ, হাফিয যাহাবী বা হাফিয ইব্‌ন হাজার আসকালানী প্রমুখ তাঁর সম্পর্কে বেশির বেশি একটুকু বলতে পারেন যে, তাঁর অবস্থা জানা নেই; কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) সরাসরি তাঁর থেকে হাদীস শুনেছেন। তাই তিনি আয়েশা বিনত আজরাফ সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞাত থাকবেন, অন্য কেউ তাঁর সম্পর্কে ততটুকু জ্ঞাত হতে পারেন না। তাই অন্যান্যের নিকট তিনি অজ্ঞাত হতে পারেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-র নিকট অজ্ঞাত নন। সুতরাং তাঁর ও তাঁর বর্ণিত হাদীসের দলীল হবার ব্যাপারে কোনরূপ সমস্যা হতে পারেনা। এতদ্ব্যতীত আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী (র) তাঁর ই'লাউস-সুনান গ্রন্থে লিখেছে-হাফিয যাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আযম আবূ হানাফী (র) ছাড়াও হাজ্জাজ ইব্‌ন আরতাত ও আয়েশা বিনত আজরাফ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (আয-যাহাবী তাজরীদ আসমাইস-সাহাবা, দারুল মা'রিফা, বৈরুত, তারিখ বিহীন, ২খ., ৩০২ পৃ.ই'লাউস সুনান, ১খ., ১৩৩-১৩৫ পৃ.।

উসূলে হাদীসের বিধান হল, যার থেকে দু'জন রাবী হাদীস বর্ণনা করবে তিনি অজ্ঞাত (مجهول) হবার দোষ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। উপরন্তু খ্যাতনামা হাদীস বিশারদ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুঈন (র) আয়েশা বিন্‌ত আজরাদকে 'পরিচিত' (معروف) রাবী বলে মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন لها صحبة অর্থাৎ আয়েশা বিন্‌ত আজরাদ একজন সাহাবী (তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, ১খ., ২৩৭) এসব কারণে দলীলটি গ্রহণযোগ্য হবার পথে কোন অন্তরায় নেই।

৫৭. জামে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, বাব তাহ্‌তা কুল্লি শা'রাতিন জানাবাতুন, হাদীস নং ১০৬।

www.pathagar.com

৪. তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা) গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার আমল সর্বদাই করেছেন। কখনো ত্যাগ করেননি। এভাবে গুরুত্বের সাথে কোন আমল সম্পাদন করা ওয়াজিব হবার প্রমাণ বহন করে।

অবশ্য এখানে এ প্রশ্ন আসতে পারে যে, অযূর ক্ষেত্রে ও তো তিনি কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার আমল সর্বদা করেছেন, কখনো পরিত্যাগ করেন নি। তাহলে অযূর ক্ষেত্রেও তা ওয়াজিব হবে। এর উত্তর হল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ আমল সর্বদা করার বিষয়টি খবরে ওয়াহিদ خبر الواحد[৫৮] দ্বারা প্রমাণিত। এর উপর ভিত্তি করে অযূর মধ্যেও যদি কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার বিধানকে ওয়াজিব বলে গণ্য করা হয় তবে খবরে ওয়াহিদ-এর দ্বারা আল্লাহ্র কিতাব কুরআন কারীমের উপর অতিরিক্ত কোন বিধান আরোপ করা হয়ে যায়, যা বিধি সম্মত নয়। কারণ অযূতে যে সব অঙ্গ ধৌত করা জরুরী, তা কুরআন কারীমে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার কোন কথা নেই (দৃ. ৫ ঃ ৬)।

পক্ষান্তরে গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত করার দ্বারা কিতাবুল্লাহ্র উপর অতিরিক্ত কিছু আরোপ করা হয় না। কারণ কুরআন মজীদ গোসলের বিস্তারিত বর্ণনা এবং ধৌত করার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা নির্ধারণ করে দেয়নি। বরং তাতে শুধুমাত্র এ কথা বলা হয়েছে ঃ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا .

"যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে।" (৫ ঃ ৬)। আর এ শব্দ ওয়াজিব হওয়াই নির্দেশ করে। সুতরাং এ শব্দ খবরে ওয়াহিদ-এর ব্যাখ্যা বলে সাব্যস্ত হবে।[৫৯]

মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ্ করা ফরয

অযূ সম্পর্কিত আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে ঃ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ "তোমরা তোমাদের মাথা মাসেহ করবে।" (সূরা আল-মায়িদা, ৫ ঃ ৬)। এ আয়াত দ্বারা মাথা মাসেহ করা ফরয বলে প্রতীয়মান হয়। তবে মাথার কতটুকু অংশ মাসেহ করা ফরয সে ব্যাপারে ফকীহগণের কিছুটা মতভেদ রয়েছে।

ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ-এর প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে পূর্ণ মাথা মাসেহ্ করা ফরয।

সুফিয়ান সাওরী, হাসান, আওযাঈ, ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিকের কতিপয় সঙ্গী ও ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আহমদের এক বর্ণনা মতে মাথার কিছু অংশ মাসেহ্ করা ফরয।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে মাসেহ-এর মধ্যে কোন সীমা নেই। যার দ্বারা মাসেহ করা হয় অর্থাৎ হাত-এর ব্যাপারে যেমন কোন শর্ত নেই, তদ্রূপ যা মাসেহ করা হয় অর্থাৎ মাথা তার ব্যাপারেও কোন শর্ত নেই।

ইমাম আযম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ ইবনুল হাসান শায়বানী (র)-এর মতে মাথার চার ভাগের এ ভাগ মাসেহ করা ফরয। এর সাথে হাত দ্বারা মাসেহ করা শর্ত। কেউ যদি তিন আঙ্গুল দিয়ে মাসেহ করে তবে তার মাসেহ শুদ্ধ হবে না।[৬০]

ইমামগণের মধ্যে এ মতভেদের মূল হল আয়াতে উল্লিখিত بِرُؤُوْسِكُمْ এর মধ্যে ব্যবহৃত باء বর্ণের ব্যবহার পদ্ধতি নিয়ে। আরবী ভাষায় باء বর্ণটি কখনো 'অতিরিক্ত' হিসেবে ব্যবহৃত হয় যার

৫৮. মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় প্রত্যেক যুগে এক দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহিদ বলে।

৫৯. মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, ১খ. ২৩৮ পৃ.।

৬০. আল-হিদায়া, প্রাগুক্ত, খ., ৬ পৃ.; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

কোন অর্থ থাকে না। যেমন বলা হয়েছে, تنبت بالدهن 'উৎপন্ন হয় তেল' (সূরা মু'মিনূন ২৩ঃ ২০)। আর কখনো 'কিছু অংশ' (تبعيض) অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটা কূফাবাসী ব্যাকরণবিদদের অভিমত। যেমন বলা হয় اخذت بثوبه وبعضده। "আমি তার কাপড়ের ও বাহুর কিছু অংশ ধরেছি।"

ইমাম মালিক প্রমুখ باء কে 'অতিরিক্ত' অর্থে গ্রহণ করেন। সুতরাং তিনি পূর্ণ মাথা মাসেহ-এর অভিমত দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন رؤوس (যা رأس শব্দের বহুবচন)-এর প্রকৃত (حقيقى) অর্থ পূর্ণমাথা। আর রূপক। (مجازى) অর্থ হল মাথার কিছু অংশ। সুতরাং প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত।[৬১]

ইমাম আযম আবূ হানীফা ও শাফিঈ (র) প্রমুখ باء বর্ণটিকে 'কিছু অংশ' অর্থেই গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তাঁরা মাথার কিছু অংশ মাসেহ এর পক্ষে ফয়সালা দিয়েছেন।[৬২]

মাথা মাসেহ -এর ব্যাপারে হাদীসের বক্তব্য বিভিন্ন ধরনের। তার মধ্যে চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ করার বিষয়টিই শক্তিশালী বলে প্রতীয়মান হয়। নিম্নে পর্যায়ক্রমে সেগুলো উল্লেখ করা হলো ঃ

পূর্ণ মাথা মাসেহ করা সম্পর্কিত হাদীস হল ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَزَانِىُّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ، بَدَاءَ بِمُقَدَّمِ رَاْسِهٖ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ . رواه الترمذى

অতঃপর দু'হাত দিয়ে মাথা মাসেহ করলেন। অর্থাৎ হাত দু'টি সামনে এবং পেছনে নিলেন। মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে শুরু করে উভয় হাত গর্দান পর্যন্ত নিলেন। অতঃপর আবার যেখানে থেকে নিয়েছিলেন, সেখানেই ফিরিয়ে আনলেন। তারপর দু'পা ধুলেন।[৬৩]

মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা সম্পর্কিত হাদীস নিম্নরূপ ঃ

عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّاَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهٖ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ . رواه مسلم فى صحيحه

১. হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) একদা অযূ করলেন, তখন তিনি মাথার সম্মুখভাগ এবং পাগড়ী ও উভয় মোযার উপর মাসেহ করলেন।[৬৪]

উল্লেখ্য যে, হাদীসে উল্লিখিত ناصية শব্দের অর্থ মাথার অগ্রভাগ। আর তার পরিমাণ হল এক-চতুর্থাংশ।

---

৬১. আশ-শাওকানী, নায়লুল আওতার, প্রাগুক্ত, ১খ., ১৯৩ পৃ.।

৬২. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, প্রাগুক্ত।

৬৩. দীর্ঘ হাদীসের এখানে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত অংশটুকু উল্লেখ করা হল। দ্র. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল উযূ, বাবু মাসহির রা'সি কুল্লিহি, হাদীস নং ১৮৫; মুসলিম, প্রাগুক্ত, বাব ফী অযূ ইন্ নবী (সা), ১খ., ২১১, হাদীস নং ২৩৫; আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, বাবু ফী সিফাতি অযূইন নাবী (সা) হাদীস নং ১১৮; নাসাঈ, প্রাগুক্ত, বাব হাদ্দিল-গাসলি, হাদীস নং ৯৭; আত-তিরমিযী, বাব মাজাআ ফী মাসহির রা'সি, হাদীস নং ৩২; ইব্ন মাজা, প্রাগুক্ত বাব ফী মাসহির রাস, হাদীস নং ৪৩৪।

৬৪. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, বাবুল মাসহি আলাল খুফ্‌ফাইন, হাদীস নং ৫২৭।

www.pathagar.com

عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قَطَرِيَّةٌ فَادْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ . رواه أبو داؤد فى سننه

২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদা অযূ করছিলেন তখন তাঁর মাথায় কাতারী পাগড়ী ছিল। অতঃপর তিনি পাগড়ীর নিচে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মাথার সম্মুখভাগ মাসেহ করলেন, কিন্তু পাগড়ী খুললেন না।[৬৫]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ رَفَعَ الْقَلَنْسُوَةَ وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ . رواه الدار قطنى فى سننه

৩. হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি যখন মাথা মাসেহ করতেন তখন টুপি উপরে উঠিয়ে মাথার সম্মুখ ভাগ মাসেহ করতেন।[৬৬]

عَنْ عَطَاءٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَحَسَرَ الْعِمَامَةَ وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ اَوْ قَالَ نَاصِيَتَهُ بِالْمَاءِ . رواه الشافعى فى مسنده

৪. হযরত আতা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদা অযূ করলেন। অতঃপর তিনি পাগড়ী সরিয়ে পানি দ্বারা মাথার সম্মুখভাগ মাসেহ করলেন।[৬৭]

عَنْ عُثْمَانَ اَنَّهُ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ بِيَدِهِ مَرَّةً وَّاحِدَةً وَّلَمْ يَسْتَأْنِفْ لَهُ مَاءً جَدِيْدًا .

৫. হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মাথার সম্মুখভাগ হাত দিয়ে একবার মাসেহ করলেন এবং তার জন্য নতুন পানি নিলেন না।[৬৮] কুরআন কারীমের আয়াতের ব্যাখ্যা ছাড়াও এ সব হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হল যে, মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরয। পক্ষান্তরে যে হাদীসে পূর্ণ মাথা মাসেহ করার কথা উল্লিখিত হয়েছে, তাকে সুন্নাত হিসাবে ধরাই যুক্তিযুক্ত।

---

৬৫. আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, বাবুল মাসহি আলাল আমামা, ১খ., ৩০-৩১ পৃ.।

৬৬. দারা কুতনী , প্রাগুক্ত, বাব মা রুবিয়া মিন কাওলিল নাবিয়্যি (সা) আল-উযুনানি মিনার রা'সি, হাদীস নং ৫৫, ১খ., ১০৭ পৃ.।

৬৭. যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস-সুনান, প্রাগুক্ত, ১খ, ৮ পৃ.।

৬৮. ইব্ন কুদামা, আল-মুগনী, প্রাগুক্ত, ১খ., ১২৫ পৃ.।

www.pathagar.com

অযূতে পূর্ণ মাথা মাসেহ্ করা সুন্নাত

অযূর ফরয চারটি, তন্মধ্যে মাথা মাসেহ্ করাও একটি ফরয। এর দলীল وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ "তোমরা তোমাদের মাথা মাসেহ্ কর।"[১]

মাথা মাসেহ করার আদেশ পবিত্র কুরআনে রয়েছে। তবে মাথার কতটুকু অংশ মাসেহ করতে হবে তার উল্লেখ নেই। যেমনটি রয়েছে হাত ও পা ধৌত করার ক্ষেত্রে।

হাত ধৌত করার ক্ষেত্রে اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ। উভয় কনুই পর্যন্ত আর পা ধৌত করার ক্ষেত্রে اِلَى الْكَعْبَيْنِ। উভয় পা গিরা পর্যন্ত বলা হয়েছে। তাই উভয় কনুই পযন্ত হাত ধৌত করা আর উভয় গিরা পর্যন্ত পা ধৌত করা ফরয।

মাথা মাসেহ করার ক্ষেত্রে সহীহ হাদীসের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা) কখনও নাসিয়া 'মাথার অগ্রভাগ' বা 'এক চতুর্থাংশ' মাসেহ্ করেছেন। আবার কখনও কখনও পূর্ণ মাথা মাসেহ করেছেন। তাই হানাফী ফকীহগণ বলেছেন, অযূর জন্য মাথার অগ্রভাগ বা একচর্তুথাংশ মাসেহ করা ফরয আর পূর্ণ মাথা মাসেহ করা সুন্নাত।

মাথার অগ্রভাগ অথবা এক চতুর্থাংশ মাসেহ্ সম্পর্কিত হাদীস

عَنْ ابْنِ مُغِيْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَةِ

মুগীরা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উভয় মোজার উপর এবং মাথার সম্মুখ ভাগ ও পাগড়ির উপর মাসেহ করেছেন।[২]

وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ ابْنِ الْمُغِيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأْ فَمَسَحَ بِنَا صِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ .

বর্ণনাকারী বলেন ঃ ইব্ন মুগীরা থেকে আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) অযূ করেছেন। তখন তিনি মাথার সম্মুখভাগ এবং পাগড়ী ও উভয় মোজার উপর মাসেহ করেন।[৩]

---

১. সূরা আল-মায়িদা ঃ ৬।

২ ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, অধ্যায় তাহারাত المسح على الخفين। প্রকাশক মুখতার এণ্ড কোং দেওবন্দ খ.১, পৃ. ১৩৫; ইমাম আবূ দাউদ, সুনানে আবূ দাঊদ, অধ্যায় ঃ তাহারাত, পরিচ্ছেদ ঃ মোজার উপর মাসেহ, প্রকাশক ঃ আল-মাকাতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ খ. ১, পৃ. ২০, ইমাম হাকিম, আল মুসতাদরাক, অধ্যায় ঃ তাহারাত, প্রকাশক, দারুল কুতুব, আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, খ. ১,পৃ. ২৪৯।

৩. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ঃ তাহারাত, পরিচ্ছেদ ঃ মোজার উপর মাসেহ, প্রকাশক ঃ মুখতার এণ্ড কোং দেওবন্দ, খ,১, পৃ. ১৩৪।

www.pathagar.com

বর্ণিত হাদীসসমূহের আলোকে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত এই যে অযূতে মাথার অগ্রভাগ অর্থাৎ এ চতুর্থাংশ পরিমাণ মাসেহ করা ফরয।[৪]

পূর্ণ মাথা মাসেহ করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ

ইমাম বুখারী (র) আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবন যায়িদ (রা)-কে বলল, আপনি কি আমাদেরকে দেখাতে পারেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কিভাবে অযূ করতেন?

فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتّٰى ذَهَبَ بِهِمَا اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

তখন আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ বললেন, হ্যাঁ! তারপর তিনি পানি আনালেন এবং হাতের উপর সে পানি ঢেলে দু'বার হাত ধুইলেন। তারপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে তিনবার পরিষ্কার করলেন। তারপর মুখমণ্ডল তিনবার ধুইলেন তারপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার করে ধুইলেন। তারপর উভয় হাত দিয়ে মাথা মাসেহ করলেন। এভাবে যে, উভয় হাত সামনে থেকে পিছনে নিলেন মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে শুরু করে উভয় হাত গর্দান পর্যন্ত নিলেন। তারপর আবার সেখানে আনলেন যেখানে থেকে নিয়েছিলেন। তারপর উভয় পা ধৌত করলেন।[৫]

এসব হাদীসের নির্দেশ অনুসারে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে অযূর মধ্যে পূর্ণ মাথা মাসেহ করা সুন্নাত।[৬]

অযূতে পা ধৌত করা ফরয

অযূর চারটি ফরযের মধ্যে গিরা পর্যন্ত উভয় পাত ধৌত করা একটি ফরয।

রাসূলুল্লাহ (সা) অযূ করার সময় সর্বদাই গিরা পর্যন্ত উভয় পা ধৌত করেছেন। তবে পায়ে বিশেষ প্রকারের মোজা পরিহিত থাকলে ঐ মোজার উপর মাসেহও করেছেন। মোজা বিহীন

৪. আল্লামা বুরহানুদ্দীন হিদায়া, অধ্যায় ঃ তাহারাত, প্রকাশক ঃ আল-মাকতাবুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, খ. ১, পৃ. ১৭। নামাযের মসনুন উদ্ধৃতিসহ শারহে নিকায়া খ. ১, পৃ. ৪।

৫. ইমাম বুখারী ঃ সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় ঃ অযূ, পরিচ্ছেদ ঃ পূর্ণ মাথা মাসেহ করা, প্রকাশক আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ খ. ১, পৃ. ৩১ ; ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ঃ তাহারাত, পরিচ্ছেদ ঃ অযূর সিফাত, মুখতার এণ্ড কোং দেওবন্দ খ. ১, পৃ. ১২৩; ইমাম তিবরিযী ঃ মিশকাত, অধ্যায় ঃ তাহারাত, পরিচ্ছেদ ঃ অযূর সুন্নাত; ইমাম তিরমিযী, জামে তিরমিযী ঃ অধ্যায় ঃ তাহারাত, পরিচ্ছেদ ঃ মাথা মাসেহ, প্রকাশক ঃ আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, খ. ১, পৃ. ১৫।

৬ আল্লামা বুরহানুদ্দীন, হিদায়া, অধ্যায় ঃ তাহারাত, প্রকাশক, আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া খ. ১, পৃ. ৬।

www.pathagar.com

অবস্থায় খালি পা কখনও মসেহ করেননি। তাই অযূতে গিরা পর্যন্ত উভয় পা ধৌত করার বিষয়ে সমস্ত ফকীহগণের ঐকমত্য রয়েছে। এবং এ ব্যাপারে সাহাবীগণের ঐকমত্য রয়েছে। বুখারীর প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (র) আবদুর রহমান ইবন আবু লায়লা (র)-এর অভিমত উদৃত করেছেন ঃ

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى اَجْمَعَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ . (فتح البارى)

আবদুর রহমান ইবন আবু লায়লা (র) বলেন, অযূতে পা ধৌত করার বিষয়ে সমস্ত সাহাবীগণ একমত ছিলেন।[৭]

ইমাম বুখারী (র) باب غسل الرجلين الى الكعبين 'উভয় পা গিরা পর্যন্ত ধৌত করা' শীর্ষক পরিচ্ছেদ স্থাপন করে এ সম্পর্কিত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْهِ شَهِدْتُّ عَمْرَو بْنَ اَبِىْ حَسَنٍ سَاَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِّنْ مَّاءٍ فَتَوَضَّاَ لَهُمْ وُضُوْءَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَكْفَاَ عَلٰى يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَيْهِ فِى التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ غُرْفَاتٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَيْهِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَاْسَهُ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ مَرَّةً وَّاحِدَةً وَثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ .

ইমাম বুখারী (র) তাঁর উস্তাদ মূসা (র)-এর সূত্রে আমর ইবন আবু হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমর ইবন আবু হাসান আবদুল্লাহ ইবন যায়িদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অযূ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন তখন আবদুল্লাহ ইবন যায়িদ (রা) এক পাত্র পানি আনালেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যে ভাবে অযূ করতে তিনি দেখেছেন ও শিখেছেন ওই রকম অযূ প্রশ্নকারীকে শিখাবার জন্য অযূ করা আরম্ভ করলেন।

প্রথমে পাত্র থেকে উভয় হাতে পানি ঢাললেন এবং তা দিয়ে উভয় হাত ধৌত করলেন। তারপর পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তিন আজলা পানি দিয়ে কুলি করলেন, নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন। তারপর আবার হাত ঢুকালেন। তিনবার মুখমণ্ডল মুবারক ধৌত করলেন। তারপর আবার হাত ঢুকিয়ে পানি নিয়ে ঐ পানি দ্বারা উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার ধৌত করলেন। তারপর আবার হাত ঢুকিয়ে পানি নিয়ে উভয় হাত দিয়ে সামনে ও পিছনে একবার মাথা মাসেহ করলেন। তারপর উভয় পা গিরা পর্যন্ত ধৌত করলেন।[৮]

---

৭. আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, অধ্যায় ঃ তাহারাত, খ. ১, পৃ. ১৩৩।

৮. ইমাম বুখারী (র) সহীহ বুখারী, প্রকাশক ঃ আল মাক্তাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ , অধ্যায় ঃ অযূ, পরিচ্ছেদ ঃ গিরা পর্যন্ত পা ধৌত করা, খ.১, পৃ. ৩১।

www.pathagar.com

উদ্ধৃত এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ (সা) অযূতে উভয় পা ধৌত করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) বুখারী শরীফে একই অধ্যায়ে পৃথক আরো একটি পরিচ্ছেদ নির্ধারণ করেছেন। ঐ পরিচ্ছেদের শিরোনাম হলো ঃ

باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين

'উভয় পা ধৌত করবে আর পদদ্বয়ের উপর মাসেহ করবে না' পরিচ্ছেদ ঃ এই পরিচ্ছেদের মর্ম হচ্ছে অযূতে পা অবশ্যই ধৌত করতে হবে তাতে মাসেহ করা নিষেধ। এটা পা ধোওয়ার ক্ষেত্রে আরো দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট। ইমাম বুখারী (র) আবদুল্লাহ ইবন আম্‌র (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দলীল রূপে উল্লেখ করেছেন।

قَالَ تَخَلَّفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنَّا فِيْ سَفَرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَاَدْرَكْنَ فَقَدْ اَرْهَقْنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلٰى اَرْجُلِنَا فَنَادٰى بِاَعْلٰى صَوْتِهِ "وَيْلٌ لِّلاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا

সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এক সফরে আমাদের পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন। পরে তিনি আমাদের নিকট পৌঁছে যান। আমরা আসরের সালাত আদায় করতে বিলম্ব করে ফেলেছিলাম। তাই আমরা অযূ করে নিচ্ছিলাম এবং (তাড়াতাড়ির কারণে) আমরা আমাদের পা মাসেহ করার ন্যায় হালকাভাবে ধূয়ে নিচ্ছিলাম। তখন রাসূলল্লাহ (সা) তা দেখে উচ্চস্বরে ডেকে বললেন ঃ পায়ের গোড়ালীগুলোর জন্য দোযখের আযাব রয়েছে। দু'বার অথবা তিনবার তিনি একথা বললেন।[৯]

ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসাঈ (র) আনাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি অযূ করলেন তার পায়ে নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌঁছেনি। তা দেখেই রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ ব্যক্তিকে বললেন; اِرْجِعْ فَاَحْسِنْ وَضُوْءَكَ। 'ফিরে যাও অযূ উত্তমরূপে করে আস।

ইমাম মুসলিম (র), আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন ঃ

رَاٰى رَجُلاً لَمْ يَغْسِلْ عَقْبَيْهِ فَقَالَ وَيْلٌ لِّلاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে অযূ করতে দেখলেন যে, সে তার গোঁড়ালি ধৌত করেনি। তাতে রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন যে, এই গোঁড়ালীগুলো আগুন দ্বারা ধ্বংস হবে।[১০]

বস্তুত অযূতে পা ধৌত করা সম্পর্কিত হাদীস মুতাওয়াতিরভাবেই বর্ণিত হয়েছে, যা সিহাহ সিত্তাহ সহ প্রত্যেকটি হাদীস গ্রন্থেই উল্লেখিত রয়েছে এবং এসব হাদীসের সংখ্যাও অনেক। আর এ বিষয়ে সাহাবীদের ঐক্যমতের কথাও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

৯. ইমাম বুখারী (র) সহীহ বুখারী, প্রকাশক ঃ প্রাগুক্ত, অধ্যায় ঃ অযূ , পরিচ্ছেদ ঃ গিরা পর্যন্ত পা ধৌত করা খ.১, পৃ. ২৮।

১০. ইমাম মুসলিম (র), সহীহ মুসলিম, প্রকাশক ঃ মুখতার এণ্ড কোং, অধ্যায় ঃ তাহারাত, পরিচ্ছেদ ঃ অযূর পূর্ণ অঙ্গ ধৌত করা, খ.১, পৃ. ১২৫।

www.pathagar.com

তায়াম্মুমে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করা ফরয

তায়াম্মুমে মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তুর উপর হাত মেরে তদ্বারা প্রথমে মুখমণ্ডল মাসেহ করতে হবে তারপর পুনরায় মাটিতে হাত মেরে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।

ফকীহগণের মধ্যে মাটিতে একবার বা দুই বার হাত মারা এবং হাতের কনুই অথবা কব্জি পর্যন্ত মাসেহ সংক্রান্ত বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

ইমামগণের মধ্যে ইমাম আযম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফিঈ (র) সহ আরো অনেক ফকীহ মুখমণ্ডলের জন্য একবার ও উভয় হাতের জন্য একবার মোট দু'বার হাত মেরে মাটি গ্রহণ অপরিহার্য মনে করেন। এই মতের পক্ষে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত রয়েছে ঃ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِّلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِّلْيَدَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তায়াম্মুমে 'দুই দরবা' অর্থাৎ দুইবার মাটিতে হাত মারতে হবে। একবার মুখমণ্ডলের জন্য আর একবার কনুই পর্যন্ত উভয় হাত মাসেহ করার জন্য।[১১]

ইমাম দারা কুতনী জাবির (রা) সূত্রেও এই একই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِّلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .

জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তায়াম্মুমের মধ্যে একবার মাটিতে হাত মারা মুখমণ্ডলের জন্য আর এরেক বার হাত মারা কনুই পর্যন্ত উভয় হাত মাসেহ করার জন্য।[১২]

ইবন উমার (রা) থেকে বিভিন্ন সূত্রে হাদীসের ইমামগণ (যেমন ঃ মুসতাদরাক হাকেম ১ ঃ ১৭৯, জামি১উল মাসানীদ ১ ঃ ২৩, ইমাম তাহাভী ১ ঃ ৮১) তায়াম্মুমে মুখমণ্ডল মাসেহ করার জন্য একবার উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার জন্য দ্বিতীয় বার মাটিতে হাত মারা সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে ঃ

عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ قَالَ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِّلذِّرَاعَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .

আলী (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে তিনি বলেন ঃ তায়াম্মুমে দুইবার মাটিতে হাত মারতে হবে। একবার মুখমণ্ডল মাসেহ করার জন্য আরেক বার উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার জন্য।[১৩] তাউস (র) বলেন ঃ

১১. ইমাম দারা কুতনী, সুনানে দারা কুতনী, প্রকাশক দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, অধ্যায় ঃ তাহারাত, পরিচ্ছেদ ঃ আত্ তায়াম্মুম, খ. ১, পৃ. ১৮৮।

১২. ইমাম দারা কুতনী, সুনানে দারা কুতনী, প্রকাশক প্রাগুক্ত, অধ্যায় ঃ তাহারাত, খ. ১, পৃ. ১৮৯। ইমাম হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, প্রকাশক ঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরুত, অধ্যায় ঃ তাহারাত, খ. ১, পৃ. ২৮৮।

১৩. মুসনাদে ইমাম যায়িদ, পৃ. ৭৭।

www.pathagar.com

اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِّلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلزِّرَاعَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ٠

তায়াম্মুমের জন্য দু'টি 'দর্‌বা' রয়েছে একটি হলো মুখমণ্ডলের জন্য আরেকটি হল কনুই পর্যন্ত উভয় হাতের জন্য।"[১৪]

বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, তায়াম্মুমের মধ্যে দু'বার হাত মেরে মাটি গ্রহণ করতে হবে একবার মুখমণ্ডলের জন্য আর একবার উভয় হাতের জন্য। এই সব হাদীসগুলোর মধ্যে কনুই পর্যন্ত উভয় হাত মাসেহ করার কথাও উল্লেখ রয়েছে। তাই উভয় হাত কনুই পর্যন্তই মাসেহ করতে হবে।

এই অভিমতই গ্রহণ করেছেন ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)। সাহাবীদের মধ্যে আলী (রা) আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) জাবির (রা) এবং তাবিঈদের মধ্যে হাসান বাসরী (র) যুহরী (র) ইব্‌রাহীম নাখঈ (র) তাউস (র) যুহরী (র) এই মত পোষণ করেছেন।

মোজার উপর মাসেহ্‌ করার মুদ্দত

মোজার উপর মাসেহ করার মুদ্দত হলো মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত আর মুকীম ব্যক্তির জন্য একদিন একরাত। সাফওয়ান ইবন আস্‌সাল (রা) বলেন ঃ

اَمَرَنَا يَعْنِىْ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ اِذَا نَحْنُ اَدْخَلْنَا هُمَا عَلَى طُهْرٍ ثَلاَثًا اِذَا سَافَرْنَا وَيَوْمًا وَلَيْلَةً اِذَا اَقَمْنَا وَلاَ تَخْلَعُهُمَا اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ . رواه ابن خزيمة والترمذى والنسائى وصححاه

রাসূলুল্লাহ (সা) মোজার উপর মাসেহ সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদেরকে আদেশ করেছেন যখন আমরা অযূ অবস্থায় মোজা পরিধান করি তখন সফর অবস্থায় যেন তিন দিন তিন রাত মাসেহ করি। আর জুনুবী না হলে যেন মোজা না খুলি।[১৫]

ইবন খুযাইমা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী ও নাসাঈ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন, হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম (র) তাঁর উস্তাদ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম আল-হানযালী (র) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন যে, শুরায়হ ইবন হানী (র) বলেন ঃ

اَتَيْتُ عَائِشَةَ اَسْاَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ بِابْنِ اَبِىْ طَالِبٍ فَسَلْنَاهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِهِنَّ لِلْمُسَفِرِيْنَ

১৪. ইমাম মুহাম্মদ ইবন আবু শায়বা (র) মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বাহ, প্রকাশক ঃ মাকতাবায়ে ইমদাদিয়া, মুলতান, পাকিস্তান, অধ্যায় ঃ তাহারাত, পরিচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুম কিভাবে করা হবে? খ. ১, পৃ. ১৮৫।

১৫. ইমাম ইবন খুযায়মা, সহীহ ইবন খুযায়মা, প্রকাশক ঃ আল মাকতাবুল ইসলামী, অধ্যায় ঃ তাহারাত খ. ১ পৃ. ৯৭ ; ইমাম তিরমিযী, জামি তিরমিযী, প্রকাশক ঃ আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া দেওবন্দ, হিন্দুস্তান, অধ্যায় ঃ তাহারাত, পরিচ্ছেদ ঃ মোযার উপর মাসেহ, খ. ১, পৃ. ২৭ ; ইমাম নাসাঈ, সুনানে নাসাঈ, প্রকাশক ঃ আল-মুকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, হিন্দুস্তান, অধ্যায় ঃ তাহারাত, পরিচ্ছেদ ঃ মোজার উপর মাসাহ করার মুদ্দত, খ. ১, পৃ. ১৭।

www.pathagar.com

وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِّلْمُقِيمِ . رواه مسلم رقم الحديث : ٥٣٠ والترمذى ، والنسائى وابن ماجه وقال البيهقى هو أصح ما روى فى هذا الباب .

আমি মোজার উপর মাসেহ করার মাস'আলা জিজ্ঞাসা করার জন্য আয়েশা (রা)-এর নিকট এলাম। আয়েশা (রা) আমাকে বললেন ঃ তুমি আবু তালিবের পুত্র (আলী রা)-এর নিকট যাও। তাকে এই মাস'আলা জিজ্ঞাসা কর। কেননা তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সফর করে থাকেন। সাহাবী বলেন ঃ আমি আলী (রা)-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত আর মুকীম ব্যক্তির জন্য একদিন একরাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।[১৬]

ইমাম বায়হাকী হাদীসটি সম্পর্কে তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, هو أصح ما روى فى هذا الباب এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে এই হাদীসটি সর্বাধিক সহীহ।

ইমাম মুসলিম (র) শুরায়হ ইবন হানী (র) সূত্রে মুসলিম শরীফে একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন যার একটি সূত্রের বর্ণনা হলো।[১৭]

قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ فَقَالَتْ سَلْ عَلِيًّ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِهٰذَا مِنِّىْ وَكَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمُسَافِرِيْنَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ رواه مسلم

ইমাম তাহাভী (র) সুয়াইদ ইবন গাফালা (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করে উমার (রা)-এর অভিমত উদ্ধৃত করেছেন ঃ

لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

মোজার উপর মাসেহ মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত আর মুকীম ব্যক্তির জন্য একদিন এক রাত।[১৮]

আল্লামা আবু বকর জাস্সাস (র) উমর (রা)-এর আরেকটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। একবার ইবন উমর ও সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর মধ্যে মোজার উপর মাসেহ করার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় তখন উমর (রা) নিজ পুত্র ইবন উমরকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

---

১৬. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রকাশক ঃ মুখতার এণ্ড কোং দেওবন্দ, হিন্দুস্তান, অধ্যায় তাহারাত, পরিচ্ছেদ ঃ মোযার উপর মাসেহ, খ. ১, পৃ. ১৩৫ ; ইমাম তিরমিযী (র) জামে তিরমিযী, প্রকাশক ঃ আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়া দেওবন্দ, হিন্দুস্তান, অধ্যায় ঃ তাহারাত, পরিচ্ছেদ ঃ মোজার উপর মাসেহ, খ. ১, পৃ. ২৭ ; ইমাম ইবন মাজাহ, সুনানে ইবন মাজাহ, প্রকাশক ঃ আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, হিন্দুস্তান, অথ্যায় ঃ তাহারাত, পরিচ্ছেদ ঃ মুকীম ও মুসাফিরের জন্য মোজার উপর মাসেহ করার মুদ্দত, খ. ১, পৃ. ৪২০; ইমাম নাসায়ী, সুনানে নাসাঈ শরীফ, প্রকাশক ঃ আল-মুকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, হিন্দুস্তান, অধ্যায় ঃ তাহারাত, পরিচ্ছেদ ঃ মোজার উপর মাসেহ করার মুদ্দত, খ. ১, পৃ. ১৭।

১৭. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রকাশক ঃ মুখতার এণ্ড কোং দেওবন্দ, হিন্দুস্তান, অধ্যায় তাহারাত, পরিচ্ছেদ মোজার উপর মাসেহ করার সময় সীমা, হাদীস নং ৫৩০, খ. ১, পৃ. ১৩৫।

১৮. ইমাম তাহাভী, শারহে মা'আনিল আসার, খ. ১, পৃ. ৬২।

www.pathagar.com

يَا بُنَىَّ عَمُّكَ اَفْقَهُ مِنْكَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ .

হে পুত্র, তোমার চাচা তোমার চেয়ে অধিক ফিকহের জ্ঞানী, মুসাফিরের মুদ্দত হলো তিন দিন তিন রাত আর মুকীমের মুদ্দত হলো এক দিন এক রাত।

মোজার উপরিভাগে মাসেহ্ করা আবশ্যক

মোজার উপরি ভাগে মাসেহ করতে হবে, নিচের অংশে নয়। এ বিষয়ে সহীহ হাদীসে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে।

ইমাম মুসলিম, মুসলিম শরীফে মোজার উপর মাসেহ করা "মোজার উপর মাসেহ করার মুদ্দত" শীর্ষক দু'টি অনুচ্ছেদে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত বিশটির মত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যার মধ্যে اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ। মোজার উপরে মাসেহ করার কথা স্পষ্টতঃই উল্লেখ রয়েছে।[১৯]

ইমাম আবূ দাউদ, দারা কুতনী সহ আরো অনেক হাদীসের ইমাম হযরত আলী (রা) থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা আরো স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন।

وَعَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْىِ لَكَانَ اَسْفَلُ الْخُفِّ اَوْلٰى بِالْمَسْحِ مِنْ اَعْلَاهَا وَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلٰى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ .

আলী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ দ্বীনের কার্যসমূহ যদি শুধুই যুক্তি নির্ভর হতো তাহলে মোজার উপরিভাগ বাদ দিয়ে নিচের অংশে মাসেহ করাই অধিক যৌক্তিক হতো। আমি নিজে (আলী (রা) দেখেছি রাসূলুল্লাহ (সা) মোজার উপরিভাগে মাসেহ করছেন।[২০]

প্রখ্যাত সাহাবী মুগীরা (রা) থেকেও এরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন ঃ

رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلٰى ظَاهِرِ الْخُفَّيْنِ .

এ সব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মোজার উপরের অংশেই মাসেহ করতে হবে, নিচের অংশে নয়। আর এটাই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত।[২১]

---

১৯. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রকাশক ঃ মুখতার এণ্ড কোং দেওবন্দ, হিন্দুস্তান, অধ্যায় তাহারাত, পরিচ্ছেদ ঃ মোজার উপর মাসেহ করা, মোজার উপর মাসেহ করার সময়, খ. ১, পৃ. ১৩২-১৩৫।

২০. ইমাম আবূ দাউদ, সুনানে আবূ দাউদ, প্রকাশক ঃ আল-মুকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, হিন্দুস্তান, অধ্যায় ঃ তাহারাত, পরিচ্ছেদ ঃ মাসেহ্ কিরূপ, খ. ১, পৃ. ২২; ইমাম ইবন আবু শায়বাহ, মুসান্নাফে আবী শায়বাহ, প্রকাশক ঃ মাকতাবায়ে ইমদাদিয়া, মুলতান পাকিস্তান, অধ্যায় ঃ তাহারাত, খ. ১, পৃ. ২০৮; ইমাম দারা কুতনী, সুনানে দারা কুতনী, প্রকাশক ঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরুত, অধ্যায় ঃ তাহারাত, খ. ১, পৃ. ২০৭।

২১. ইমাম আবূ দাউদ, সুনানে আবূ দাউদ, প্রকাশক ঃ আল-মুকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, হিন্দুস্তান। ইমাম তিরমিযী (র) জামে তিরমিযী, প্রকাশক, আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া দেওবন্দ, হিন্দুস্তান, অধ্যায় ঃ তাহারাত, পরিচ্ছেদ ঃ মোজার উপরি অংশে মাসেহ করা, খ. ১, পৃ. ২৮।

www.pathagar.com

জুমু'আর দিন গোসল করা সুন্নাত

১. সকল ইমাম, ফকীহ ও আলিম এ কথায় একমত যে, জুমু'আর দিন গোসল করা সুন্নাত, ওয়াজিব নয়।

সুন্নাত হওয়ার দলীল নিম্নরূপ ঃ

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعِمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ قَالَ أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن .

হযরত সামুরাহ ইব্ন জুনদুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে জুমু'আর দিন অযূ করল তার সে অযূ করা যথেষ্ট এবং ভালো। তবে যে গোসল করিল তার গোসল করাই হচ্ছে উত্তম।[১]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوَضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন উত্তমরূপে অযূ করে এবং তারপর ইমামের নিকটবর্তী স্থানে এসে বসে, ইমামের খুতবা শুনে মনোযোগ সহকারে এবং (শোনার সুবিধার্থে) নিরবতা অবলম্বন করে তার এ জুমু'আ থেকে অপর জুমু'আ পর্যন্ত (এক সপ্তাহের) অতিরিক্ত তিনদিনের (মোট দশ দিনের) যাবতীয় (সগীরা) গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।[২]

উপরে উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটিতে অযূ করাকে যথেষ্ট বলে অভিহিত করা হয়েছে, গোসল করাকে বলা হয়েছে উত্তম। এতে প্রতীয়মান হয় যে, গোসল করা জরুরী নয়। দ্বিতীয় হাদীসটিতে অযূ করার জন্য দশ দিনের গোনাহ মাফের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, গোসল করার কোন আলোচনাই তাতে করা হয় নাই। তাতেও বুঝা যায় যে, গোসল করা জরুরী নয়।

১. জামে' তিরমিযী, বাবুন ফিল অযূ ইয়াওমাল জুমু'আহ, খ. ১, পৃ. ১১১।

২ জামে তিরমিযী, বাবুন ফিল অযূ ইয়াওমাল জুমু'আহ, খ. ১, পৃ. ১১২।

www.pathagar.com

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَعَرَضَ بِهِ عُمَرُ فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُوْنَ بَعْدَ النِّدَاءِ فَقَالَ عُثْمَانُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا زِدْتُّ حِيْنَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ اَنْ تَوَضَّأْتَ ثُمَّ اَقْبَلْتَ فَقَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوْءُ اَيْضًا اَلَمْ تَسْمَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ .

৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) জুমু'আর দিন লোকজনের উদ্দেশ্যে খুতবা দিচ্ছিলেন। এ সময় হযরত উসমান (রা) মসজিদে এসে উপস্থিত হলেন। উমর (রা) তাঁকে ইঙ্গিত করে বললেন, লোকজনের কি হল যে, তারা এত বিলম্ব করে মসজিদে আসে। তখন উসমান (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আযান শোনার পর আমি আর বিলম্ব করিনি, অযূ করেই মসজিদে চলে এসেছি। উমর (র) বললেন, অযূ করেই (চলে আসা) কেন তোমরা কি এ কথা শুননি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি জুমু'আর নামাযে হাযির হয় তার উচিত গোসল করে আসা।[৩]

এ হাদীস দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, জুমু'আর দিন গোসল করা জরুরী নয়। কেননা, যদি গোসল করা ফরয বা ওয়াজিব হত তাহলে হযরত উসমান (রা) গোসল না করে কেবল অযূ করে জুমু'আর নামায আদায় করার জন্য মসজিদে আসতেন না। যদি তিনি অজ্ঞতাবশত গোসল ব্যতীত চলে আসতেন, অথচ গোসল করা জরুরী হত, তাহলে হযরত উমর (রা) তাঁকে শুধু হাদীস শুনিয়ে ক্ষান্ত হতেন না, বরং গোসল করার জন্য ফেরত পাঠাতেন। এটিই ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র)-এ অভিমত।

জমহুর আলিমগণের বিপরীতে 'আসহাবুয যাহির' আলিমগণ গোসল করাকে ওয়াজিব মনে করেন। তাঁরা তাদের মতের সপক্ষে নিম্নোক্ত দলীল পেশ করে থাকেন।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

১. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর জুমু'আর দিন গোসল করা ওয়াজিব।[৪]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ .

---

৩. আস সহীহ ইমাম মুসলিম, খ. ১, পৃ. ২৮০। শব্দের সামান্য তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে, সুনানু তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ১১১, বাবু মাজাআ ফিল ইগতিসাল ফী ইয়াওমিল জুমু'আ।

৪. আস সহীহ, ইমাম বুখারী, কিতাবুল জুমু'আ, বাবু ফাযলিল গুসলি ইয়াওমাল জুমু'আ; আস-সহীহ, ইমাম মুসলিম, কিতাবুল জুমু'আ, খ. ১, পৃ. ২৮০।

www.pathagar.com

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বরে অধিষ্ঠিত হয়ে ইরশাদ করেন তোমাদের কোন ব্যক্তি জুমু'আর নামাযে আগমন করলে যেন (আসারপূর্বে) গোসল করে নেয়।[৫]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ .

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) নবী করীম (সা) বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর নামায পড়তে (মসজিদে) আগমন করে সে যেন গোসল করে নেয়।[৬]

লক্ষণীয় উপরিউক্ত তিনটি হাদীসেই فَلْيَغْتَسِلْ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি আদেশ সূচক শব্দ, আর সাধারণভাবে আদেশসূচক শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন বিষয় ফরয বা ওয়াজিব হয়ে থাকে, তাই জুমু'আর দিন গোসল করা ওয়াজিব বলে ধর্তব্য হবে।

গোসল ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে প্রদত্ত দলীলগুলোর জবাব

গোসল ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে যাহির মতাবলম্বী আলিমগণ যে সকল দলীল প্রদান করেছেন সেগুলোর জবাবে বলা হয় যে জুমু'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার পর প্রাথমিক পর্যায়ে গোসল করা ওয়াজিব করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সে প্রেক্ষাপট বহাল না থাকায় তা আর ওয়াজিব থাকেনি। মুসনাদে আহমাদ এর একটি বর্ণনার দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, জুমু'আর দিন গোসল করা কি ওয়াজিব? ইবন আব্বাস (রা) এ প্রশ্নের জবাবে বললেন, না, তবে তো তোমাকে গোসলের সূচনা সম্পর্কে বলছি । পূর্বে মানুষ ছিল অভাবী, তারা মোটা পশমী কাপড় পরিধান করত এবং পিঠে পানি বহন করে খেজুর বাগানে তা সিঞ্চন করত। অপর দিকে মসজিদে নব্বীর পরিসর ছিল সংকীর্ণ , নিচু ছাদবিশিষ্ট। লোকেরা পশমী কাপড় পরে মসজিদে যাওয়ার পর ঘেমে যেত। নবী করীম (সা) -এর মিম্বর ছিল ছোট তিন সিঁড়ি বিশিষ্ট। লোকেরা ঘেমে যাওয়ার দরুন তাদের কাপড় থেকে পশমের গন্ধ বের হয়ে মসজিদে ছড়িয়ে পড়ত এবং এজন্য লোকজনের কষ্ট হত। নবী (সা) তা অনুভব করতে পেরে লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা যখন জুমু'আর নামাযে আসবে তখন গোসল করে নিজ নিজ সাধ্যমত উত্তম সুগন্ধী ব্যবহার করে আসবে।[৭]

এ জন্য পরবর্তী উলামায়ে কিরাম বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে যে পরিবেশ বিরাজিত ছিল সে পরিবেশে গোসলের নির্দেশ ছিল একটি সাময়িক ব্যবস্থা জরুরী ভিত্তিক। কিন্তু

---

৫. আস সহীহ,, ইমাম মুসলিম, কিতাবুল জুমু'আ, খণ্ড ১, পৃ. ২৭৯।

৬ জামে তিরমিযী, আবওয়াবুল জুমু'আ, বাবু মা জাআ ফিল ইগতিসাল ফী ইয়াওমিল জুমু'আ, খণ্ড ১, পৃ. ১১১।

৭. নূরুদ্দীন হায়সামী, মাজমাউয যাওয়াউদ, বাবু হুকুকিল জুমু'আ মিনাল গুসল ওয়াত ত্বীর, খণ্ড ২, পৃ. ১৭২।

www.pathagar.com

বর্তমানে সে পরিবেশ বিদ্যমান না থাকায় তা জরুরী নয়। তাই, বর্তমানে জুমু'আর দিন গোসল করা সুন্নাত, কারো কারো মতে মুস্তাহাব।[৮]

হায়িয ও নিফাসের মুদ্দত

حَيْضٌ (হায়িয) শব্দটি আরবী ধাতুরূপ, শব্দটির অর্থ প্রবাহিত হওয়া। যেমন বলা হয় حَاضَ الْوَادِىْ উপত্যকায় পানি বয়ে গেছে। ফিকহী পরিভাষায়, হায়িয হচ্ছে, دَمٌ يَنْفُضُهُ رَحِمُ امْرَاَةٍ بَالِغَةٍ مِّنْ غَيْرِ دَاءٍ "কোন রোগ ব্যতীত প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার গর্ভাশয় থেকে নিয়মিত ধারায় যে রক্ত নির্গত হয় তাকে হায়িয বা মাসিক ঋতুস্রাব বলে।"

نِفَاسٌ (নিফাস) শব্দটিও আরবী ধাতুরূপ, এর শাব্দিক অর্থ সন্তান জন্মদান। শরী'আতের পরিভাষায় নিফাস হচ্ছে, دَمٌ يَنْفُضُهُ رَحِمُ امْرَاَةٍ عَقِبَ الْوِلاَدَةِ "সন্তান প্রসবান্তে মহিলার গর্ভাশয় থেকে যে রক্ত বের হয়ে আসে তা হচ্ছে নিফাস।"[৯]

আল্লামা ইবনু রুশদ্ 'আল বিদায়াহ' গ্রন্থে, ইবনু কুদামাহ 'আল মুগনী' গ্রন্থে এবং আল্লামা নাওয়াভী 'আল মাজমূ' গ্রন্থে লিখেছেন যে, হায়িযের সর্বনিম্ন ও সর্বাধিক মুদ্দত এবং নিফাসের সর্বনিম্ন ও সর্বাধিক মুদ্দত এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনাপূর্ণ কোন রিওয়ায়াত না থাকায় ইমামগণ নিজস্ব গবেষণা, অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন মত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত আলিম নাসবুর রায়াহ গ্রন্থের গ্রন্থকার আল্লামা যাইলাঈ (র) বলেন, এ বিষয়গুলো সম্পর্কে বিভিন্ন রিওয়ায়াত রয়েছে, যেগুলো উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা, মু'আয ইবন জাবাল, আনাস, ওয়াসিলাহ ইবন আসকা' (রা) প্রমুখ সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ বর্ণনাগুলোতে স্বতন্ত্রভাবে দুর্বলতা থাকলেও সামগ্রিকভাবে সেগুলো 'হাসান' পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবে। নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করার পরিবর্তে আহনাফের আলিমগণ এ হাদীসগুলোকেই আলোচিত মাস'আলাগুলো দলীল হিসাবে করেছেন।[১০]

তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হয় ঃ

قَالَ سُفْيَانُ بَلَغَنِيْ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَدْنَى الْحَيْضِ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ رواه الدارمى فى سننه قلت رجاله رجال مسلم والموقوفات فى مثل هذا مما لا يدرك بالراى كالمرفوعات .

১. হযরত আনাস (রা) বলেন হায়যের সর্বনিম্ন সময়সীমা হচ্ছে তিন দিন।[১১]

---

৮. আল্লামা তাকী উসমানী, দরসে তিরমিযী, মাওলানা রশীদ আশরাফ সংকলিত, দেওবন্দ, ভারত ঃ যাকরিয়া বুক ডিপো, ১৯৯৮, খণ্ড ২, পৃ. ২৬৫।

৯. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১ম, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯।

১০. মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৪১২; দরসে তিরমিযী; প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩৬০।

১১. মুসনাদে দারিমী, খণ্ড ১, পৃ. ১৭২, সূত্র : আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, দেওবন্দ ভারত, আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়্যা, ২০০০ খৃ., খ. ১, পৃ. ৩৫১।

www.pathagar.com

উল্লিখিত হাদীসটি মারফূ' নয়, বরং মাওকূফ অর্থাৎ সাহাবীর উক্তি, কিন্তু বিষয়টি এমন যে, এখানে গবেষণার কোন অবকাশ নেই। এরূপ ক্ষেত্রে মাওকূফ হাদীসই মারফূ' বলে গণ্য হয়। অর্থাৎ সাহাবী নবী করীম (সা)-এর নিকট তা শোনেই বর্ণনা করেছে বলে ধর্তব্য হয়।[১২]

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِيْ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ الْحَائِضُ اِذَا جَاوَزَتْ عَشَرَةَ اَيَّامٍ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيْ . رواه الدار قطني قال البيهقي بعد نقل هذا الاثر لا بأس باسناده : الجوهر النقي ج ١ ص ٨٦

২. হযরত উসমান ইবন আবুল আস(রা) বলেন, হায়িয বিশিষ্ট মহিলার রক্তস্রাব যদি দশ দিন অতিক্রম করে তবে সে 'মুস্তাহাযাহ্' বলে গণ্য হবে। এ অবস্থায় তাকে গোসল করে নামায পড়তে হবে।[১৩]

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اَدْنَى الْحَيْضِ ثَلٰثَةٌ وَّاَقْصَاهُ عَشَرَةٌ قَالَ وَكِيْعٌ الْحَيْضُ ثَلٰثٌ اِلٰى عَشَرٍ فَمَا زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، أخرجه الدار قطني ورجاله ثقات غير جلد بن أيوب فضعفه الناس وروى عنه الائمة .

৩. হযরত আনাস (রা) বলেন, হায়িযের সর্বনিম্ন মেয়াদকাল তিনদিন আর সর্বোচ্চ মুদ্দতকাল হলো দশ দিন। ওয়াকী বলেন, হায়িযের মেয়াদ হচ্ছে দশ দিন। এর অতিরিক্ত হলে সে মহিলা মুসতাহাযাহ।[১৪]

عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ وَاَكْثَرُهُ عَشَرَةُ اَيَّامٍ ، رواه الدار قطني وقال ابن منهال مجهول ومحمد بن أحمد ضعيف .

৪. হযরত ওয়াসিলা ইবনু আসকা' (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন হায়িযের সর্বনিম্ন মেয়াদ হচ্ছে তিনদিন এবং সর্বোচ্চকাল দশদিন।[১৫]

উপরিউক্ত হাদীসসমূহের প্রেক্ষিতে হানাফী ফকীহগণ বলেন, হায়িযের সর্বনিম্ন মুদ্দত তিন দিন তিন রাত এবং সর্বাধিক মেয়াদ দশ দিন দশ রাত। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, দুই দিন এবং তৃতীয় দিনের অধিকাংশ সময় স্রাব হলে তাও তিন দিন বলেই গণ্য হবে।

১২ ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩৫১।

১৩. দারা কুতনী, খণ্ড ১ পৃ. ২০৯। হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেছেন, হাদীসটির সনদে কোন দুর্বলতা নাই। সূত্র : ই'লাইস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩৫২।

১৪. দার কুতনী, খণ্ড ১, পৃ. ২০৯, সূত্র : ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩৫২।

১৫. দারা কুতনী, খণ্ড ১, পৃ. ১৮১, সূত্র : ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩৫৩।

www.pathagar.com

হায়িযের ন্যায় নিফাযের জন্যও একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদকাল রয়েছে। এ মর্মে নিম্নে নিফাস সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা হলো :

عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقْتُ النِّفَاسِ اَرْبَعُوْنَ اِلاَّ اَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذٰلِكَ أخرجه الدار قطنى

১. হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নিফাসের মেয়াদ হচ্ছে চল্লিশ দিন। তবে যদি এর পূর্বেই সে পবিত্র হয়ে যায় (তবে তাও হতে পারে।)[১৬]

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَلَتْ كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا .

২. উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (র) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে প্রসূতি মহিলারা চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামায রোযা থেকে বিরত থাকত।[১৭]

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لِنِسَائِهِ اِذَا نَفِسَتِ امْرَاَةٌ مِّنْكُنَّ فَلاَ تَقْرَبْنِىْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اِلاَّ اَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذٰلِكَ أخرجه الدار قطنى

৩. হযরত উসমান ইবন আবুল আস (রা) নিজ স্ত্রীদেরকে বলতেন, তোমাদের কারো যখন নিফাস থাকে তখন সে যেন চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমার নিকটে না আসে। তবে যদি এর পূর্বেই সে পবিত্র হয়ে যায় (তবে পূর্বেই আসতে পারে।)[১৮]

উপরোক্ত হাদীসগুলোর প্রেক্ষিতে সকল ইমাম ও আলিমগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, নিফাসের সর্বনিম্ন কোন সময়সীমা নাই। এবং এর সর্বোচ্চ মেয়াদকাল চল্লিশ দিন, এটিই হানাফীগণের মত। সেই সাথে আহমাদ ইবন হাম্বল, ইসহাক, আবদুল্লাহ ইবন মুবারক ও সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ মনীষীগণও অনুরূপ মত পোষণ করেন।[১৯]

মহিলাকে স্পর্শ করলে অযূ ভঙ্গ হয় না

হানাফী মাযহাবের ফকীহ ও আলিমগণের মতে মহিলাকে স্পর্শ করার কারণে পুরুষ বা মহিলা কারোই অযূ ভঙ্গ হয় না। এ মাস'আলায় নিম্নলিখিত হাদীসসমূহ প্রাণিধানযোগ্য ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَمُدُّ رِجْلِىْ فِىْ قِبْلَةِ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِىْ فَرَفَعْتُهَا فَاِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا

১৬. দারা কুতনী, খণ্ড ১, পৃ. ১৮১, সূত্র : ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩৫৫।
১৭. জামে তিরমিযী, আবওয়াবুত তাহারাত, বাবু মা জাআ ফী কাম তামকুছুন নুফাসাউ, খণ্ড ১, পৃ. ৩৬।
১৮. দারা কুতনী, খণ্ড ১, পৃ. ১৮২, সূত্র : ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩৫৬।
১৯. মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৪৬৪; দরসে তিরমিযী ,প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩৭৯।

www.pathagar.com

১. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাহাজ্জুদের সময় আমি নবী করীম (সা)-এর সামনে আমার পা লম্বা করে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন সিজ্‌দায় যেতেন আমার পায়ে মৃদু চাপ দিতেন, তখন আমি পা গুটিয়ে নিতাম। অতঃপর তিনি দণ্ডায়মান হলে আমি তা প্রসারিত করতাম।[২০]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِجْلاَىَ فِىْ قِبْلَتِهٖ فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِىْ فَقَبَضْتُ رِجْلِىْ وَاِذَا قَامَ بَسَطْتُّهَا قَالَتْ وَالْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ .

২. হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে ঘুমিয়ে থাকতাম, তখন আমার পা থাকত নবী (সা)-এর সিজ্‌দার স্থানে ছড়ানো। তিনি যখন সিজ্‌দায় যেতেন হাত দ্বারা আমার পায়ে মৃদু চাপ দিতেন আমি পা গুটিয়ে নিতাম। তিনি সিজ্‌দা থেকে উঠে গেলে পুনরায় পা লম্বা করে দিতাম। তখন ঘরে বাতি থাকত না।[২১]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً مِّنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِىْ عَلٰى بَطْنِ قَدَمِهٖ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ .

৩. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বিছানার (নির্দিষ্ট স্থানে) না পেয়ে তাঁকে (হাত দিয়ে) খুঁজতে লাগলাম। এ সময় আমার হাত তাঁর পা মোবারকের তলায় পতিত হয়। তিনি তখন সিজ্‌দায় রত ছিলেন এবং তাঁর পা দু'টো খাড়া অবস্থায় ছিল। তিনি বলছিলেন : (অনুবাদ) হে আল্লাহ্! আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে ক্রোধ থেকে পানাহ চাচ্ছি।[২২]

উপরোক্ত হাদীসগুলোতে দেখা যাচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে রত অবস্থায় আয়েশা (রা)-কে হাত দিয়ে মৃদু চাপ দিয়েছেন তাঁর পা সরিয়ে নেয়ার জন্য। আয়েশা (রা) পা সরিয়ে নিয়েছেন এবং সিজ্‌দা শেষে পুনরায় পা ছড়িয়ে দিয়েছেন। পরবর্তী রাক'আতে ও এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। যদি মহিলাকে স্পর্শ করা দ্বারা অযূ ভেঙ্গে যায়, তাহলে বলতে হয় যে, নবীজীর নামাযটি অসম্পূর্ণ থেকেছে। আর এরূপ বলার আদৌ কোন সুযোগ নেই। তেমনিভাবে তৃতীয় হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে থাকাকালে আয়েশা (রা)-এর হাত তাঁর পা মোবারকের তলা স্পর্শ করেছে। যদি স্পর্শ অযূ ভঙ্গ হওয়ার কারণ হত তবে নবী করীম (সা) সে সময় সিজ্‌দায় থাকতেন না, বরং নুতন করে অযূ

২০. ইমাম বুখারী আস সহীহ, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, বাবু মা ইয়াজূযু মিনাল আমল ফিস সালাত, খ ১, পৃ ১৬১।

২১. ইমাম মুসলিম, আস সহীহ, কিতাবুস সালাত, খণ্ড ১, পৃ. ১৯৮।

২২. মুসলিম শরীফ, খণ্ড ১, পৃ. ১৯২।

www.pathagar.com

করার জন্য উঠে পড়তেন। কিন্তু হাদীসের কোথাও এর কোন আভাসও পাওয়া যায় না। সুতরাং এ সকল হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, পুরুষ ও মহিলা একে অপরকে স্পর্শ করার দরুন অযূ ভঙ্গ হয় না, হানাফীগণ এই অভিমতকেই তাঁদের মাযহাব হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

এর বিপরীতে অন্যান্য ইমামগণ বলেন যে এ অবস্থায় অযূ ভেঙ্গে যাবে। এ সম্পর্কে তারা যে দলীল প্রদান করেন তা মূলত পুরুষ মহিলাকে স্পর্শ করা সম্পর্কিত কোন আয়াত বা হাদীস নয়, বরং সেটি নারী পুরুষের মিলন সম্পর্কিত, একটি আয়াতের অংশমাত্র। শরীর অপবিত্র হয়ে যাওয়ার দরুন অযূ করা জরুরী এমন কতক অবস্থায় বর্ণনা প্রদান করার পর মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ। 'অথবা তোমরা মহিলাদের সাথে মিলিত হলে (তোমাদের পবিত্রতা বিনষ্ট হবে।)'[২৩] এ আয়াতাংশের অপর মুতাওয়াতির কিরা'আত হচ্ছে, أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ। "অথবা তোমরা মহিলাদের স্পর্শ করলে"। উক্ত ফকীহগণ মহিলাকে স্পর্শ করা অযূ ভঙ্গের কারণ হিসাবে বিবেচনা করেন বলে তাঁরা উল্লিখিত আয়াতের এ কিরা'আতটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন।এ রায় বহাল রাখার জন্য أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ। পড়ার সময়ও এর অর্থ ধরেন, 'স্পর্শ করা', মিলন নয়।[২৪]

পক্ষান্তরে হানাফী ফকীহ্ ও আলিমগণ উক্ত মতাবলম্বী ফকীহগণের দলীল ও বক্তব্যের জবাবে বলেন যে, কুরআনুল করীমে أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ বাক্যটি তায়াম্মুম-এর আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর পূর্বে বলা হয়েছে ঃ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ-'যদি তোমাদের কেউ শৌচস্থল থেকে ফিরে আসে'। এটি حدث اصغر 'হাদাসে আসগার বুঝায়, আর হাদাসে আসগার অযূ জরুরী করে। অতএব এ অবস্থায় উক্ত তায়াম্মুম করার বৈধতা প্রতীয়মান হয়। যদি আয়াতের পরবর্তী অংশ لَمَسْتُمْ দ্বারা 'স্পর্শ করার' অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে দ্বারার হাদাসে আসগার বুঝাবে। তখন হাদাসে আকবার যা গোসল জরুরী করে, এরূপ হাদাসের বেলায় তায়াম্মুম করার বৈধতা সম্পর্কে এ আয়াত থেকে কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। কিন্তু যদি لَامَسْتُمْ-এর অর্থ গ্রহণ করা হয় 'স্বামী-স্ত্রীর মিলন' তাহলে হাদাসে আকবারের পরিস্থিতিতেও যে তায়াম্মুম কার্যকরী হয় তা আয়াতের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সকল ইমাম ও আলিম এ কথায় একমত যে, হাদাসে আকবার ও হাদাসে আসগার উভয় পরিস্থিতিতেই তায়াম্মুম করা বৈধ। তাই لَامَسْتُمْ-এর অর্থ মিলন ধরা হলে কুরআনেও এ কথার স্বাক্ষ্য ও সমর্থন পাওয়া যায় যা এ জাতীয় নির্দেশ না থাকার চাইতে অবশ্যই উত্তম। তা ছাড়া, لَامَسْتُمْ শব্দটি باب مفاعلة-এর শব্দ। আরবী ভাষাবিদ মাত্রই জানেন যে, مفاعلة-এর একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হচ্ছে مُشَارَكَتْ অর্থাৎ বাক্যের কর্তা ও কর্ম সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াতে উভয়ের শরীক থাকা। 'মিলন' বা সঙ্গম অর্থ গ্রহণে ও বিশেষত্ব বাস্তবসম্মত হয়। কিন্তু 'স্পর্শ করা' অর্থে এর মধ্যে উভয়ের শরীক থাকা বুঝা যায় না। যদি উল্লিখিত শব্দটিকে 'একে অপরকে স্পর্শ করা', অর্থে গ্রহণ করা হয় তবে তা

২৩. সূরা মায়িদা ঃ ৬।
২৪. আল্লামা তাকী উসসানী, দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১১।

www.pathagar.com

দ্বারাও 'মিলনই বা সঙ্গমই 'বুঝিয়ে থাকে। এ ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে উল্লিখিত শব্দটিকে এ ক্ষেত্রে মিলন বা সঙ্গম অর্থে গ্রহণ করাই যথাযথ ও বাস্তবসম্মত।[২৫]

হানাফী মাযহাবের আলিমগণ বলেন, দ্বিতীয় মুতাওয়াতির কিরা'আতটি গ্রহণ করা হলেও এ আয়াতাংশের অর্থ হবে মিলন বা সঙ্গম, স্পর্শ করা নয়। হাফিয ইবন জারীর (র) তাফসীর গ্রন্থে সহীহ সনদ সংশ্লিষ্ট আয়াত সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর প্রদত্ত ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, এখানে لَمَسْتُمْ শব্দটি স্পর্শ করা অর্থে গ্রহণ না করে মিলন বা সঙ্গম অর্থে গ্রহণ করতে হবে। তিনি এ ব্যাখ্যার স্বপক্ষে কুরআনের সে সকল আয়াত উপস্থাপন করেছেন। বাহ্যিকভাবে যেগুলোর অর্থ হয় স্পর্শ করা, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেগুলো মিলন অর্থই গৃহীত হয়ে থাকে। যেমন ঃ وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ যদি তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে (অর্থাৎ মিলন সংঘটনের পূর্বে) তাদেরকে তালাক দাও।-[২৬]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ আয়াতাংশ -এর সাথে আলোচ্য মাস'আলাটি মোটেই সম্পর্কিত নয়, বরং তার সম্পর্ক অন্য মাস'আলার সাথে। এর বিপরীতে উল্লিখিত হাদীসগুলো আলোচিত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত এবং নিজ বক্তব্যে সুস্পষ্ট। তাই স্বভাবিকভাবে এক্ষেত্রে হাদীসের দলীল এবং তার দ্বারা সাব্যস্তকৃত রায়ই প্রাধান্য পাওয়ার উপযোগী বলে বিবেচিত হবে।[২৭]

লিঙ্গ স্পর্শ করল অযূ ভঙ্গ হয় না

পুরুষ তার নিজের লিঙ্গ স্পর্শ করলে অযূ ভঙ্গ হবে কি না সে বিষয়ে পরস্পর বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত দু'টি হাদীস পাওয়া যায়। নিম্নে হাদীসগুলো পেশ করা হলো ঃ

১. তলক ইবন আলী (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস :

عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَلْ هُوَ اِلاَّ مُضْغَةٌ مِّنْهُ اَوْ بَضْعَةٌ مِّنْهُ رواه الترمذى وقال حديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن وهذا الحديث أحسن شئ روى فى هذا الباب .

প্রখ্যাত সাহাবী তল্‌ক ইবন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) (এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে) ইরশাদ করেন, এটি তোমার শরীরের একটি অংশ বৈ আর কিছু নয়?[২৮]

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেছেন, এ সম্পর্কিত সকল হাদীসের মাঝে এটিই সনদ হিসাবে সর্বাধিক সুন্দর। উপরোক্ত হাদীসটি অপরাপর হাদীস গ্রন্থে কিছুটা বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

---

২৫. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১১।
২৬. সূরা বাকারা : ২৩৭।
২৭. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩১১।
২৮. জামে' তিরমিযী, আবওয়াবুত তাহারাত, বাবু তারকিল অযূ মিম মাসসিয যাকার, খ. ১, পৃ. ২৫।

www.pathagar.com

عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مَسِسْتُ ذَكَرِىْ اَوْ قَالَ الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِى الصَّلٰوةِ اَعَلَيْهِ وُضُوْءٌ ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ اِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِّنْكَ . أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المدينى هو أحسن من حديث بسرة رضي الله عنها .

খ. তল্‌ক ইবন আলী (রা) বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করল নামাযে রত থাকা অবস্থায় আমি লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে বা (বর্ণনাকারী সন্দেহ) কোন লোক তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে তাকে পুনরায় অযূ করতে হবে কি? রাসূলুল্লাহ (সা) তার জবাবে বললেন, না, সেটি তোমার শরীরের একটি অংশ বৈ আর কিছু নয়।[২৯]

২. বুসরাহ বিনত সাফওয়ান (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ مَّسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَلِّ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح .

বুসরাহ বিনতে সাফওয়ান (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করে সে যেন অযূ করা ব্যতীত নামায না পড়ে।[৩০]

উপরে উল্লখিত তল্‌ক ইবন আলী ও বুসরাহ বিন্‌ত সাফওয়ান (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বয় সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম একাধিক দিক থেকে আপত্তি উস্থাপন করেছেন, এবং সেগুলোর জবাবও দেওয়া হয়েছে ঃ

হযরত তল্‌ক ইবন আলী (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আপত্তি এবং সেগুলোর জবাব

যারা এ হাদীসটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেননি তাঁরা এ হাদীসটিতে দু'টি আপত্তি উত্থাপন করেছেন ঃ

১. উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আইয়ুব ইবন উতবাহ এবং মুহাম্মদ ইবন জাবির। এ উভয় ব্যক্তিই 'যাঈফ'বা দুর্বল শ্রেণীর বর্ণনাকারী। সুতরাং হাদীসটিও 'যাঈফ'।

এই আপত্তির জবাবে বলা হয়, আলোচিত এই দুইজন ব্যতীত মুলাযিম ইবন আমর এবং আবদুল্লাহ ইবন বাদারও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আবূ দাউদ এ দুইজনের সনদেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা প্রত্যেকে হাদীসটিকে 'সহীহ' বল মত প্রদান করেছেন। তা ছাড়া সহীহ ইবন হিব্বান গ্রন্থে হাদীসটি তল্‌ক ইবন আলী--তাঁর পুত্র কায়স ইবন তল্‌ক--তার থেকে ইকরিমাহ ইবন আম্মার-তার থেকে হুসাইন ইবনুল ওয়ালীদ

---

২৯. আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাইস সুনান, কিতাবুত তাহারাত, বাবু আন্না মাসসায যাকার গাইরু নাকিস, দেওবন্দ, ভারত : আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়্যা, ২০০০ ঈসায়ী, খণ্ড ১, পৃ. ১৮৬।

৩০. জামে তিরমিযী, আবওয়াবুত তাহারাত, বাবুল অযূ মিম মাসসিয যাকার, খণ্ড ১, পৃ. ২৫।

www.pathagar.com

সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু হাদীসটির বর্ণনায় আইয়ুব ইবন উতবাহ ও মুহাম্মদ ইবন জাবির -এর সাথে আরো অনেক বর্ণনাকারী শামিল রয়েছেন। সেহেতু আলোচিত এ দু'জনের দুর্বলতা আর থাকছে না বা দুর্বলতা থাকলেও দলীল হওয়ার ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা কোন সমস্যার সৃষ্টি করছে না।[৩১]

২. তল্‌ক ইবন আলী (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটি যে কয়টি সনদে বর্ণিত হয়েছে সে সব যে নামে এসে এক হয়েছে (مدار اسناد) তিনি হচ্ছেন কায়স ইবন তল্‌ক। তল্‌ক ইবন আলীর পুত্র কায়স রাবী হিসাবে দুর্বল, তাই তার সনদে বর্ণিত সকল হাদীসেই দুর্বল হিসাবে গণ্য হবে এবং সেটি পরিত্যাজ্য হবে।

হাদীস বিশারদগণ এ আপত্তির জবাবে বলেছেন, কায়স ইবন তল্‌ক দুর্বল নন, বরং বিতর্কিত রাবী। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, আবূ যুর'আহ ও আবূ হাতিম তাঁকে দুর্বল বললেও ইমাম আজালী ও আলী ইবন মাদীনী তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। অপর এক প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ইয়াহইয়া ইবন মুঈন (র) কোথাও কায়েসকে দুর্বল বলেছেন, আবার কোথাও তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। এ অবস্থার সৃষ্টি হলে উলামায়ে কেরাম বলেন, বিতর্কিত রাবীর রিওয়ায়াত কবুল করা হবে এবং দলীল হিসাবে বিবেচিত হবে। তাই, ইবন কাত্তান (র) এ সম্পর্কে ফয়সালা প্রদান করেছেন। يَقْضِى اَنْ يَكُوْنَ خَبَرُهُ حَسَنًا لاَ صَحِيْحًا তাঁর বর্ণিত হাদীসটি সহীহ না হলেও হাসান বলে বিবেচিত হবে। হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী (র) তাঁর 'মীযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থের ৩য় খণ্ড ৩৯৭ পৃষ্ঠায় এ আপত্তি এবং তার জবাব বিস্তারিতভাবে লেখার পর ইবন কাত্তান এর এ ফয়সালাটি উল্লেখ করেন। তাতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লামা যাহাবীও ইবন কাত্তান-এর মতটিকে সমর্থন করেন।[৩২]

বুসরাহ বিনত সাফওয়ান (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিতে আপত্তি এবং তার জবাব

বুসরাহ বিনত সাফওয়ান (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির বর্ণনা সম্পর্কিত একটি ঘটনা রয়েছে যা সুনানে নাসাঈ[৩৩] এবং ইমাম তাহাভী (র) কৃত শারহু মা'আনিল আসার গ্রন্থে [৩৪] বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৫]

মারওয়ান ইবনুল হাকাম খলীফা থাকাকালে একবার উরওয়াহ ইবন যুবায়ের (র)-কে তলব করেন। দরবারে উপস্থিত হওয়ার পর খলীফা তাঁর সাথে 'অযূ ভঙ্গের কারণ' নিয়ে আলোচনা করেন। এক পর্যায়ে খলীফা লিঙ্গ স্পর্শ করাকে অযূ ভঙ্গের কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন। কিন্তু উরওয়াহ ইবন যুবায়ের তা অস্বীকার করেন। খলীফা মারওয়ান বুসরাহ বিনত সাফওয়ান (রা) কর্তৃক বর্ণিত উল্লিখিত হাদীসটি দলীল হিসাবে বর্ণনা করলেন। সেই সাথে

---

৩১. আল্লামা তাকী উসমানী, দরসে তিরমিযী, মাওলানা রশীদ আশরাফ সংকলিত, দেওবন্দ ভারত : যাকারিয়া বুক ডিপো, ১৯৯৮ ঈসায়ী, খণ্ড ১, পৃ. ৩০১।

৩২. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩০৩।

৩৩. খ-১, পৃ. ৩৮, আল অযূ মিম মাসসিস যাকার।

৩৪. কিতাবুত তাহারাত, বাব মাসসুয যাকার।

৩৫. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩০৩।

www.pathagar.com

সত্যায়নের জন্য বুসরাহ বিনত সাফওয়ান এর নিকট এক পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রেরণ করলেন। পুলিশ কর্মকর্তা বুসরার নিকট হাদীসটি শুনে এসে তা মজলিসে বিবৃত করে। ফলে উরওয়াহ ইবন যুবায়ের হাদীসটি একই মজলিসে দুইবার শ্রবণ করেন ঃ একবার মারওয়ান-এর মুখে দ্বিতীয়বার জনৈক পুলিশ কর্মকর্তার মাধ্যমে।

বুসরার হাদীসে আপত্তিকারীগণ এ পর্যায়ে বলেন যে, উরওয়াহ ইবন যুবায়ের একই মজলিসে এ হাদীসটি দুইবার শুনলেও বুসরাহ বিনত সাফওয়ান যিনি হাদীসটির মূল বর্ণনাকারী তাঁর নিকট থেকে একবারও শুনেন নি। দুই ব্যক্তির মাধ্যমে শোনার দরুন যে দুইটি সনদ হয়েছে এ দু'টি সনদেই আপত্তির উপাত্ত রয়েছে।

প্রথম সনদটিতে আপত্তির বিষয় হচ্ছে, মারওয়ান ইবনুল হাকাম রাবী হিসাবে যথেষ্ট বিতর্কিত ব্যক্তি। কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করলেও অনেকে তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম সর্বশেষ যে রায় প্রদান করেছেন তা হল, মারওয়ান তার খিলাফতকালে হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের (রা)-এর সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার বর্ণিত রিওয়য়াতসমূহ কবুল করা হবে; যেহেতু তখন তার মাঝে 'আদালত' (দীনদারী) পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত ছিল। ইমাম বুখারী (র) এ হিসাবেই তাঁর 'জামে সহীহ' গ্রন্থে মারওয়ানের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেকার বর্ণনা হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার পর যেহেতু তার 'আদালত' আর কাঙ্খিত মানে ছিল না, তাই তার যুদ্ধ পরবর্তী রিওয়ায়াতগুলো কবুল করা হবে না। আলোচ্য হাদীসটি যার মূল রাবী বুসরাহ যেহেতু যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের বর্ণনা, তাই মারওয়ানের এ বর্ণনাটি কবুল করা হবে না।

দ্বিতীয়বার উরওয়াহ হাদীসটি জনৈক পুলিশ অফিসারের নিকট, যার নাম বা পরিচয় কিছুই আমাদের জানা নাই। সুতরাং এই মাধ্যমে শ্রুত হাদীসটিও দলীল হিসাবে গৃহীত হতে পারে না।

বুসরার হাদীস অনুসারীগণ উল্লিখিত আপত্তির জবাবে বলেন যে, পরবর্তী সময়ে উরওয়াহ ইবন যুবায়ের এ হাদীসটি বুসরার নিকট থেকে সরাসরি শুনেছেন, সে সময় বুসরাহ মারওয়ানের সত্যায়ন করে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সহীহ ইবন খুযাইমাহ ও সহীহ ইবন হিব্বান—উভয় গ্রন্থে মারওয়ানের বর্ণনা, পরবর্তীতে পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক বুসরার নিকট শুনে এসে তা বর্ণনা করা --এ সকল উল্লেখ করার পর এ কথাও বলা হয়েছে, উরওয়াহ ইবন যুবায়ের হাদীসটি পরবর্তী সময়ে বুসরার নিকট সরাসরি শুনেছেন। এ পর্যায়ে হাদীসটি গ্রহণ করার ব্যাপারে আর কোন বিপত্তি থাকতে পারে না।[৩৬]

বুসরার হাদীস প্রত্যাখ্যানকারীগণ উক্ত বক্তব্য করে বলেন, উরওয়াহ সরাসরি বুসরার নিকট শুনেছেন—এ বক্তব্যটি সঠিক বলে প্রমাণিত নয়। যদি তাই হতো তা হলে ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি তাঁর শর্ত অনুযায়ী হওয়ার ভিত্তিতে স্বীয় 'জামি' গ্রন্থে উল্লেখ করতেন এবং এই শেষোক্ত বক্তব্য তাতে উল্লেখ করতেন। অথচ তিনি অযূ ভেঙ্গে যাওয়ার মত অনুসরণ করলেও এ হাদীসটি তাঁর 'জামি' গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। ইমাম বায়হাকী (র) বলেন, বুসরার নিকট

৩৬. আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী, মা'আরিফুস সুনান, খণ্ড ১, পৃ. ২৯৪।

www.pathagar.com

থেকে উরওয়াহ্-এর সরাসরি শোনার বিষয়টি সন্দেহপূর্ণ, তাই ইমাম বুখারী হাদীসটি তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন নি।[৩৭]

সরাসরি শোনার বিষয়টি যে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয়, তার সপক্ষে একটি ঘটনা ও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। ঘটনাটি মুসতাদরাক[৩৮] সুনানু দারা কুতনী[৩৯] ও বায়হাকীকৃত সুনানু কুবরায়[৪০] বর্ণিত হয়েছে। একবার মসজিদে খায়ফ-এ ইয়াহ্ইয়া ইবন মুঈন, আলী ইবন মাদীনী ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) একত্রিত হন। এ সময় ইয়াহইয়া ইবন মুঈন ও আলী ইবন মাদীনী লিঙ্গ স্পর্শ করা অযূ ভঙ্গ করে কি না তা নিয়ে বিতর্ক করেন। তাঁরা উভয়ে আহমদ ইবন হাম্বলকে বিচারক সাব্যস্ত করেন। ইয়াহ্ইয়া ইবন মুঈন (র) বুসরাহ্ বিনত সাফওয়ানের হাদীস সমর্থনকারী হিসাবে অযূ ভেঙ্গে যাওয়ার পক্ষ অবলম্বনকারী ছিলেন। অপর দিকে আলী ইবন মাদীনী (র) তল্ক ইবন আলীর হাদীসের সমর্থক ছিলেন এবং অযূ বহাল থাকার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। বিতর্কে ইয়াহইয়া ইবন মুঈন লিঙ্গ স্পর্শ করলে অযূ ভেঙ্গে যাওয়ার মত ব্যক্ত করে দলীল হিসাবে বুসরাহ্ বিনত সাফওয়ান (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটি পেশ করেন। অপর দিকে আলী ইবন মাদীনী (র) এতে অযূ বহাল থাকবে বলে মত প্রকাশ করে তল্ক ইবন আলী (রা)-এর হাদীসটি উল্লেখ করেন। সে সময় তারা একে অপরের দলীলের উপর আপত্তি করেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ দলীলের উপর উত্থাপিত আপত্তিসমূহের যথা সম্ভব জবাব প্রদান করেন উভয়ের যুক্তি তর্ক শুনার পর ইমাম আহমাদ (র) বলেন, দলীল হিসাবে উভয় হাদীস সমপর্যায়ের তাই কোনটি অপরটির তুলনায় প্রাধান্য পাওয়ার উপযোগী নয়।

বিতর্ক সভায় যখন মারওয়ান বা পুলিশ অফিসারের মাধ্যম নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করা হলো তখন ইয়াহ্ইয়া ইবন মুঈন (র) এ কথা বলেন নি যে, উরওয়াহ ইবন যুবায়ের পরবর্তীতে হাদীসটি বুসরার নিকট থেকে সরাসরি শুনেছেন। এই বিতর্ক মজলিস থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াহইয়া ইবন মুঈন, আলী ইবন মাদীনী, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল এবং ইমাম বুখারী পর্যন্ত কোন খ্যাতনামা হাদীস বিশারদই এ কথাটি জানতেন না যে, উরওয়াহ হাদীসটি সরাসরি বুসরার নিকট শুনেছেন। অতএব সরাসরি শোনার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। কিন্তু কেবল তাদের কোন বিষয় না জানাই তা প্রত্যাখ্যান করার উপযুক্ততা প্রমাণ দেয় না। কেননা, কোন বর্ণনা বা বর্ণনার অংশ যদি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়ে থাকে, তবে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। বিশেষত এ কথাটুকু (উরওয়াহ-এর সরাসরি শোনা) উপরোক্ত হাদীসবিদগণ ব্যতীত অন্য আরো কতক হাদীস বিশারদ কবুল করেছেন। এবং এ কথাটুকু 'সহীহ' বলে মতপ্রকাশ করেছেন। যেমন, দারা কুতনী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বুসরাহ থেকে উরওয়াহ যে সরাসরি হাদীসটি শ্রবণ করেছেন তা বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত করেছেন। এবং এ অংশটুকুসহ হাদীসটিকে 'সহীহ' বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইবন

৩৭. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩০৪।

৩৮. মুসতাদরাক লিল হাকিম, খণ্ড ১, পৃ. ১৩৯।

৩৯. মুসতাদরাক লিল হাকিম, খণ্ড ১, পৃ. ৫৫।

৪০. মুসতাদরাক লিল হাকিম, খণ্ড ১, পৃ. ১৩৬।

www.pathagar.com

খুযায়মাহ ও সরাসরি শোনার কথা 'সহীহ' বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তা ছাড়া এ বিতর্ক মজলিসের আলোচনা মুসতাদরাকে হাকিম গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে। তাতে উল্লেখ রয়েছে যে, বুসরার রিওয়ায়াতটিকে দলীল হিসাবে উল্লেখ করার পর আলী ইবন মাদীনী (র) তাতে আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, উরওয়াহ এ হাদীসটি বুসরার নিকট থেকে সরাসরি শোনেন নাই। জবাবে ইয়াহইয়া ইবন মুঈন (র) বলেন, কিছুদিন পরই উরওয়াহ বুসরার নিকট এসে হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন বুসরাহ তাঁর সম্মুখে হাদীসটি বিবৃত করেন। অতএব এ শেষ অংশটুকুও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।[৪১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতিভাত হয় যে, তল্ক ইবন আলী এবং বুসরাহ বিনত সাফওয়ান কর্তৃক উভয় হাদীসই দলীল হওয়ার উপযুক্ত, যদিও উভয়ের বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে কিছু কিছু আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে এবং যথাসাধ্য সেগুলোর জবাবও প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু কোন পক্ষের জবাবই যথেষ্ট ও মজবুত নয়। তাই, এ সকল আপত্তির প্রেক্ষিতে দুইটি হাদীসই দুর্বল হয়ে গেছে। সে কারণে এ দু'টি হাদীসের কোন একটিকে অপরটির তুলনায় প্রাধান্য পাওয়ার উপযোগী বলা খুবই কষ্টকর। এ দুর্বলতার কারণেই ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম নিজ নিজ হাদীস গ্রন্থে এ দু'টো হাদীসের কোনটিই উল্লেখ করেন নি।

কেউ কেউ বর্ণিত হাদীস দু'টির একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়ার উদ্দেশ্য অপর হাদীসটি মানসূখ (রহিত) তল্ক ইবন আলীর হাদীস সম্পর্কেও করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব বিষয় হল কোন হাদীসকে মানসূখ বলার জন্য যে পরিমাণ দলীল প্রয়োজন সে পরিমাণ দলীল কারো নিকটই উপস্থিত নেই।

যারা বলেন, তল্ক ইবন আলীর রিওয়ায়াতটি মানসূখ হয়ে গিয়েছে। তাদের বক্তব্য হল, তল্ক প্রথম হিজরীতে মসজিদে নব্বী নির্মাণকালে মদীনায় এসেছিলেন , পরে মদীনা থেকে চলে যান। সুতরাং তল্ক-এর বর্ণিত হাদীস হচ্ছে প্রথম হিজরীর। অপরদিকে বুসরাহ বিনত সাফওয়ান (র) যে হাদীসটি করেছেন এ মর্মের হাদীস আবু হুরায়রা (রা) হতেও বর্ণিত হয়েছে। এ কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, আবু হুরায়রা (রা) সপ্তম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতএব তাঁর হাদীস এবং সেই সাথে এই মর্মের সবগুলো হাদীস 'নাসিখ' (রহিতকারী) বলে গণ্য হবে।

কিন্তু তাদের এ দাবী যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। কেননা, তল্ক ইবন আলীর জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় তিনি নবম হিজরীতে পুনরায় মদীনায় এসেছিলেন। তাই তাঁর শ্রুত এ হাদীস প্রথম হিজরীর না হয়ে নবম হিজরীরও হতে পারে। তা ছাড়া, কোন সাহাবীর পরে মুসলমান হওয়া তাঁর রিওয়ায়তটিও পরবর্তীকালের হওয়া প্রমাণিত করে না। কেননা এমন অনেক রিওয়ায়াত রয়েছে যেগুলো এক সাহাবী অপর সাহাবী থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন।

যারা বুসরাহ বিনতে সাফওয়ানর হাদীসটি মানসূখ বলেন, তাদের যুক্তি হল, ইসলামের ইতিহাসে এমনটি দেখতে পাওয়া যায় যে, প্রথমে কোন বিষয়কে অযূ ভঙ্গকারী বলে ঘোষণা

৪১. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩০৪।

www.pathagar.com

প্রদান করা হয়েছে, পরবর্তী সময়ে সে ঘোষণা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। যেমন, আগুনে রান্নাকৃত খাবার খেলে অযূ নষ্ট হওয়ার বিধান, যা পরে মানসূখ হয়ে যায়। কিন্তু এর বিপরীত, কোন বিষয়কে 'অযূ ভঙ্গকারী নয়' বলার পর তা মানসূখ হয়ে পরবর্তী সময়ে 'ভঙ্গকারী' বলে বিবেচিত হয়নি। তাই, আলোচ্য মাস'আলাটিতে তল্কের হাদীসটিকে বুসরার হাদীস মানসূখ করে দিয়েছে, এ কথা বলা সঠিক হবে না। বরং তল্কের হাদীস দ্বারা বুসরার হাদীস মানসূখ হওয়া যথার্থ হতে পারে।

কিন্তু কোন হাদীসকে মানসূখ বলার জন্য একটুকু বক্তব্যই যথেষ্ট নয়। এমনি সমপর্যায়ের পরস্পর বিপরীত হাদীসদ্বয়ের মাঝে হানাফীগণ হযরত তল্ক ইবন আলী (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন এবং সে হিসাবে তাঁরা বলেন, লিঙ্গ স্পর্শ করার দরুন অযূ ভঙ্গ হয় না। এর বিপরীতে অন্য ইমামগণ বুসরাহ বিনতে সাফওয়ান (রা)-এর হাদীসটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে বলেন, লিঙ্গ স্পর্শ করলে অযূ ভঙ্গ হবে।

হানাফীগণ কর্তৃক তল্ক-এর হাদীসটিকে প্রাধান্য প্রদান

উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, লিঙ্গ স্পর্শ করা অযূ ভঙ্গকারী কি না—এ বিষয়ে পরস্পর বিরোধী যে দুইটি মত নির্ধারিত হয়েছে, এ মতগুলোর প্রবক্তা আলিম ও ইমামগণের কারো নিকট মত নির্ধারিত কোন আয়াত দলীল হিসাবে নাই, নতুবা তারা সে আয়াত উল্লেখ করতেন। সর্বস্বীকৃত কোন 'সহীহ' হাদীসও তাঁদের কারো কাছে নাই। বরং তাঁদের প্রত্যেকের দলীল হচ্ছে এমন হাদীস যেগুলোতে রয়েছে যথেষ্ট দুর্বলতা ও গ্রহণযোগ্য আপত্তি। অবশ্য আপত্তিসমূহের যথাযথ জবাব ও সমাধানও বিবৃত হয়েছে এবং একই মর্মের হাদীস একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে, ফলে হাদীসগুলো আর 'যাঈফ' স্তরে থাকেনি, 'হাসান' বলে বিবেচিত হয়েছে।

দেখা যায়, বুসরাহ বিনত সাফওয়ানা (রা) যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তার সমর্থনে অধিক সংখ্যক সাহাবীর বর্ণনা রয়েছে, এর বিপরীতে তল্ক ইবন আলী (রা) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার সমর্থনে বর্ণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা অল্প। এতদসত্ত্বেও হানাফী ফকীহগণ একাধিক কারণে তল্কের হাদীসটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

নিম্নে সে সব কারণগুলো পেশ করা হলো ঃ

১. যদি বুসরাহ বিনত সাফওয়ান এর হাদীসটিকে গ্রহণ করা হয় তাহলে তল্ক ইবন আলীর রিওয়ায়তটি পুরোপুরি বর্জনে করতে হয়, অথচ সনদ হিসাবে তল্কের হাদীসটিও দলীল হওয়ার উপযুক্ত এবং বুসরার রিওয়ায়াতে সমপর্যায়ের। এর বিপরীতে যদি তল্কের হাদীসটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে বুসরার রিওয়ায়াতটিকে বর্জন করতে হয় না। বরং এভাবে উভয় হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, বুসরার হাদীসটিকে অযূ করতে বলা হয়েছে সতর্কতা হিসাবে এবং তাই তা মুস্তাহাব। অপরদিকে তল্কের হাদীস দ্বারা এ কথাই প্রতিভাত হয়েছে যে, নতুনভাবে অযূ করা ওয়াজিব নয়। এভাবে পরস্পর বিপরীত মর্মার্থক দু'টি হাদীসের মাঝে গ্রহণযোগ্য উপায়ে সমন্বয় সাধন করে দলীল হিসাবে উভয়টিকে

www.pathagar.com

কার্যকর রাখা যে কোন একটিকে পুরোপুরি বর্জন করা থেকে অবশ্যই উত্তম, হাদীস শাস্ত্রে এরূপ সমন্বয় সাধন একটি সুবিদিত বিষয় হিসাবে স্বীকৃত।

২. তুলনা করলে দেখা যায়, তল্‌কের হাদীসটিতে কোন অস্পষ্টতা বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কোন অবকাশ নাই, অথচ বুসরার হাদীসটিতে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রয়েছে এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। লিঙ্গ স্পর্শ করলে অযূ ভঙ্গ হবে—এ কথায় বুসরার রিওয়ায়াতটিতে কোন শর্তের উল্লেখ নাই। তাই, যারা এ বিষয়টিকে অযূ ভঙ্গকারী বলে বিবেচনা করেন তাদের মাঝেই যথেষ্ট মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে স্পর্শ কি আবরণহীন হতে হবে না কি আবরণসহ হলেও তা বিবেচ্য হবে, কামোত্তেজনার সাথে স্পর্শ করাই শুধু বিবেচিত হবে না কি নিছক স্পর্শ হলেই তা অযূ ভঙ্গকারী বলে গণ্য হবে? ইত্যকার বিষয়ে ফকীহগণের মাঝে অনেক মতভেদ হয়েছে। অথচ তল্‌কের হাদীসটিতে এ ধরনের কোন অস্পষ্টতা নেই। ফলে তার মর্ম নিয়ে এ ধরনের কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না।

৩. বুসরাহ বিনত সাফওয়ান (রা)-এর এ সম্পর্কিত কোন কোন রিওয়ায়াত ব্যাখ্যা করার সময় ইমাম শাফিঈ (র) ও অযূ করা ওয়াজিব বলেন নি , বরং মুস্তাহাব বলেছেন। যেমন, অণ্ডকোষ স্পর্শ করা সম্পর্কিত হাদীস, যা সনদ হিসাবে সহীহ, অথচ ইমাম শাফিঈ (র) এক্ষেত্রে অযূ করাকে মুস্তাহাব বলেছেন। মু'জামে কাবীর ও মু'জামে আওসাতে আল্লামা তাবারানী (র) বুসরার যে রিওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ اَوْ اُنْثَيَيْهِ اَوْ رُفْغَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ .

হযরত বুসরাহ বিনত সাফওয়ান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (পুরুষ) স্বীয় লিঙ্গ অথবা অণ্ডকোষ অথবা উরুর গোড়া স্পর্শ করে সে যেন নামাযের অযূর ন্যায় অযূ করে নেয়। মাজমাউয যাওয়াইদ প্রণেতা আল্লামা হায়সামী (র) এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ رجاله رجال الصحيح 'এ হাদীসের রাবীগণ সহীহ হাদীসের রাবী। (খ-১, পৃ. ২৪৫) অথচ ইমাম শাফিঈ (র) অণ্ডকোষ ও উরুর গোড়া স্পর্শের ক্ষেত্রে অযূ করা মুস্তাহাব বলেছেন। এ প্রসঙ্গে হানাফী উলামায়ে কিরাম বলেন, একই সাথে তিনটি অঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে শেষ দুইটিতে যে বিধান কার্যকর রয়েছে প্রথমটিতেও সেই বিধান কেন কার্যকর হবে না? অতএব, প্রথমটিতেও অযূ করা মুস্তাহাব বলে বিবেচিত হবে। তারা পরবর্তী দু'টি অঙ্গের বেলায় যে ভিত্তিতে অযূ করা মুস্তাহাব বলেন, হানাফীগণ সে ভিত্তিতেই লিঙ্গ স্পর্শ করার ক্ষেত্রেও অযূ করা মুস্তাহাব বলছেন।

সমপর্যায়ের দু'টি হাদীসে বৈপরিত্য পরিদৃষ্ট হলে তার সমাধানের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে ঃ

ক. সাহাবায়ে কিরামের আমল ও ইরশাদ ; খ. কিয়াস।

www.pathagar.com

ক. এ পর্যায়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অধিকাংশ সাহাবী তল্‌ক (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আমল করেছেন। এমন কি ইমাম তাহাভী (র) তো এ পর্যন্ত দাবী করেছেন যে, এ ক্ষেত্রে অযূ ওয়াজিব হওয়ার রায় একমাত্র হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) প্রদান করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ, আলী, সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস, আবূ মূসা আশ'আরী, আম্মার ইবন ইয়াসির, হুযায়ফাহ্, আনাস ও ইমরান ইবন হুসাইন (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী লিঙ্গ স্পর্শ করাকে অযূ ভঙ্গকারী বলে গণ্য করেন নি।

খ. কিয়াস দ্বারাও হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য সম্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে একটি কিয়াস তো নবী করীম (সা) স্বয়ং করেছেন। তিনি বলেছেন, এটিকে তোমার শরীরের একটি অঙ্গ নয়? অর্থাৎ শরীরের অন্য যে কোন অঙ্গ স্পর্শ করলে যেমন অযূ ভঙ্গের কোন প্রশ্ন উদয় হয় না, তেমনি লিঙ্গ স্পর্শ করার কারণেও অযূ নষ্ট হবে না। উলামায়ে কিরাম এক্ষেত্রে আরো একাধিক কিয়াস করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কিয়াসটি লক্ষণীয়, মলমূত্র নাপাক হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো হাতে লাগলে অযূ নষ্ট হয় না। তাহলে নিজ লজ্জাস্থান, যা সাধারণত পাক পবিত্রই থাকে, তা স্পর্শ করলে অযূ নষ্ট হবে কেন?[৪২]

হানাফী বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম বলেন, যদিও তল্‌ক ইবন আলী (রা)-এর হাদীসটি এভাবে বিভিন্নভাবে প্রাধান্য পাওয়ার উপযোগী, কিন্তু সতর্কতা হিসাবে পুনরায় অযূ করে নেওয়াই উত্তম। বিশেষত এক্ষেত্রে অযূ করার দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কামভাব হ্রাস পাবে এবং এর ফলে নিজ নিজ লিঙ্গ স্পর্শ করার প্রবণতা কমে যাবে। হানাফীগণের পরবর্তী উলামায়ে কিরাম এভাবে আমল করা পছন্দ করেছেন।[৪৩]

নিজ স্ত্রীকে চুম্বন করলে অযূ ভঙ্গ হয় না

হানাফী উলামায়ে কিরামের মতে নিজ স্ত্রীকে চুম্বন করলে অযূ ভঙ্গ হয় না। কিন্তু অন্যান্য ইমামগণের মতে এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

এ সম্পর্কিত বিষয়ে নিম্নোক্ত দলীল পেশ করেন ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهٖ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ قُلْتُ مَنْ هِيَ اِلاَّ اَنْتِ فَضَحِكَتْ

১. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) হতে তাঁর ভাগনে উরওয়াহ ইবন যুবায়ের (রা) বলেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) একদা তাঁর কোন এক স্ত্রীকে চুম্বন দেওয়ার পর নামাযের উদ্দেশ্য গমন করেন। কিন্তু এ সময় তিনি নতুন করে অযূ করেন নি। উরওয়াহ বলেন, আমি তাঁকে বললাম, সেই মহিলা আপনিই, তাই না? শুনে তিনি কেবল হাসলেন।[৪৪]

---

৪২. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩০৯।

৪৩. মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ২৯৬।

৪৪. জামে তিরমিযী, খণ্ড ১. পৃ. ২৫।

www.pathagar.com

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَجُلاً اَقْبَلَ اِلَى الصَّلٰوةَ فَاسْتَقْبَلَتْهُ اَمْرَاَتُهُ فَاَكَبَّ عَلَيْهَا فَتَنَاوَلَهَا فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَذٰلِكَ لَهُ فَلَمْ يَنْهَهُ .

২. হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা)-এর বর্ণনা । তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি নামাযের জন্য বের হচ্ছিল, তখন তার স্ত্রী সামনে পড়ে গেল। সে স্ত্রীর উপর ঝুঁকে পড়ল এবং তাকে জড়িয়ে ধরল। এরপর নবী করীম (সা)-এর নিকট এসে তার কাছে ঘটনাটির কথা ব্যক্ত করল। কিন্তু নবী (সা) তাকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেন নি। (অর্থাৎ এ অবস্থায় চুম্বন করা নুতন কোন সমস্যা বা প্রশ্নের সৃষ্টি করবে না, এবং এতে অযূ নষ্ট হবে না।)[৪৫]

এ হাদীসটি সনদে সামান্য দুর্বলতা থাকলেও এ মর্মের আরো হাদীস রয়েছে। সেহেতু এ হাদীসটিও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ ثُمَّ يَخْرُجُ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلاَ يَحْدُثُ وُضُوْءً .

৩. উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ(সা) (তাঁকে) চুম্বন করতেন এবং এরপর নামাযে বের হয়ে যেতেন, নতুন করে আর অযূ করতেন না।[৪৬]

এ হাদীসের সনদে ইয়াযীদ ইবন সিনান রাহাভী নামক একজন রাবী রয়েছেন। তিনি দুর্বল বলে মন্তব্য রয়েছে। কিন্তু ইমাম আহমাদ (র) ইয়াহইয়া ইবন মুঈন ও আলী ইবন মাদীনীর ন্যায় অনেকে যেমন তাকে দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন, তেমনি ইমাম বুখারী আবূ হাতিম ও মারওয়ান ইবন মু'আবিয়া-এর ন্যায় অনেকে তাকে গ্রহণযোগ্য বলেও মত প্রকাশ করেছেন। মুহাদ্দিসদের মাঝে এ কথা স্বীকৃত যে, কোন রাবী বিতর্কিত হলে তার বর্ণনা গ্রহণীয় হয়ে থাকে। এমনিভাবে এ বিষয়ে বিভিন্ন রিওয়ায়াত থাকার প্রেক্ষিত হানাফী মাযহাবের আলিমগণ এই মত গ্রহণ করেছেন যে, নিজ স্ত্রীকে চুম্বন করলে অযূ ভঙ্গ হয় না। তারা বলেন, বিভিন্ন রিওয়ায়াত থাকার দরুন এই মতটি যথেষ্ট মজবুত, গ্রহণীয় ও আমলযোগ্য।

এর বিপরীতে অন্য সকল ইমাম এ অবস্থায় অযূ ভেঙ্গে যাওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন। তারা এ সম্পর্কে যে দলীল প্রদান করেন বস্তুত তা চুম্বন সম্পর্কিত কোন আয়াত বা হাদীস নয়, বরং সেটি নারী-পুরুষের মিলন সম্পর্কিত, একটি আয়াতের অংশ। শরীর অপবিত্র হয়ে যাওয়ার দরুন যে সকল অবস্থায় অযূ করা জরুরী সে সকল অবস্থার বর্ণনা প্রদানকালে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ অযথা

৪৫. আল্লামা তাবারানী কৃত মু'জামে আওসাত, সূত্র : আল্লামা নূরুদ্দীন হায়সামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, বাবু ফীমান কাব্বালা আওলামাসা, খণ্ড ১, পৃ. ২৪৭।

৪৬. তাবারানী কৃত মু'জামে আওসাত, সূত্র : মাজমাউয যাওয়াইদ, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ১৪৭।

www.pathagar.com

তোমরা মাহিলাদের সাথে মিলিত হলে (তোমাদের পবিত্রতা বিনষ্ট হবে।)[৪৭] এ আয়াতাংশের অপর মুতাওয়াতির কিরা'আত হচ্ছে لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ 'তোমরা মহিলাদেরকে স্পর্শ করলে'। যারা চুম্বন প্রদানকে অযূ অঙ্গকারী বলে বিচেনা করেন তারা পরবর্তী এ কিরা'আতটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। পরে স্পর্শজনিত সকল ক্ষেত্রেই তারা অযূ ভেঙ্গে যাওয়ার রায় প্রদান করেন। চুম্বনেও অবশ্যই স্পর্শ ঘটে থাকে, এ দিক লক্ষ্য করে তারা নিজ স্ত্রীকে চুম্বন প্রদান করাকেও ভঙ্গের কারণ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। এ রায় বহাল রাখার স্বার্থে لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ পড়ার সময়ও তারা এর অর্থ করেন 'স্পর্শ করা' 'মিলন' নয়।[৪৮]

হানাফী ফকীহ ও আলিমগণ তাঁদের এ বক্তব্য ও দলীলের জবাবে বলে থাকেন, لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ কথাটি তায়াম্মুমের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর পূর্বে বলা হয়েছে, أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ 'যদি তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে ফিরে আসে, যা حدث اصغر (হাদাসে আসগার) বুঝায়, আর হাদাসে আসগর অযূ জরুরী করে। অতএব হাদাসে আসগারের অবস্থায় তায়াম্মুম করার বৈধতা আয়াতের এ অংশের দ্বারা প্রতীয়মান হয়। যদি পরবর্তী অংশ لَمَسْتُمْ এর দ্বারা স্পর্শ করার অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে তা দ্বারাও হাদাসে আসগার প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু হাদাসে আকবারের অবস্থায় যখন গোসল করা জরুরী সে অবস্থায় তায়াম্মুম করার বৈধতা সম্পর্কে আয়াতে কোন বক্তব্য থাকে না। যদি لَمَسْتُمُ শব্দটিকে 'স্বামী স্ত্রীর মিলনার্থে ধরা হয় তাহলে হাদাসে আকবার-এর সময়েও যে তায়াম্মুম কার্যকর হতে পারে তা আয়াতের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আর সকল ইমাম ও আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, হাদাসে আকবার ও হাদাসে আসগার উভয় পরিস্থিতিতেই তায়াম্মুম করা বৈধ। তাই لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ আয়াতাংশটিকে 'মিলন' অর্থে গ্রহণ করা হলে কুরআনেরও এ কথার সাখ্য ও দলীল হিসাবে প্রতিপন্ন হবে, যা এ বিষয়ে কোন দলীল না পাওয়ার চাইতে অবশ্যই উত্তম। তা ছাড়া لَمَسْتُمُ শব্দটি باب مفاعلة এর শব্দ। আরবী ভাষাবিদ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, باب مفاعلة এর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো مُشَارَكَتْ (মুশারাকাত), অর্থাৎ বাক্যের কর্তা ও কর্ম সংশ্লিষ্ট ক্রিয়ায় শরীক থাকা। 'মিলন' অর্থ গ্রহণে এ বিশেষত্ব বাস্তবসম্মত হয়, এর বিপরীতে স্পর্শ করা অর্থ গ্রহণ করা হলে কোন মুশারাকাত বুঝায় না। আর যদি একে অপরকে স্পর্শ করার অর্থ গ্রহণ করা হয় তা হলে তা দ্বারাও এই মিলন অর্থই প্রতিভাত হবে। ভাষাগত এ বৈশিষ্ট্যের জন্যও এক্ষেত্রে এ শব্দটিকে 'মিলন' অর্থে নেওয়াই যথাযথ ও বাস্তব সম্মত বলে মনে হয়।[৪৯]

হানাফী মাযহাবের আলিমগণ বলেন, দ্বিতীয় মুতাওয়াতির কিরা'আতটি গ্রহণ করা হলেও উল্লিখিত আয়াতাংশের অর্থ হবে 'মিলন,' 'স্পর্শ করা' নয়। হাফিয ইবন জারীর (র)

৪৭. সূরা মায়িদা ঃ ৬।

৪৮. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩১১।

৪৯. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩১১।

www.pathagar.com

তাঁর তাফসীর গ্রন্থে সহীহ্ সনদে এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, এখানে لَمَسْتُمْ শব্দটিকে অর্থ 'স্পর্শ করার পরিবর্তে মিলন বা সঙ্গম' অর্থে ধরা হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) উল্লিখিত শব্দটির এ ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন। তিনি তাঁর এ কথার পক্ষে কুরআনের সে সকল আয়াত উপস্থাপন করেছেন বাহ্যিকভাবে যেগুলোর হয় 'স্পর্শ করা', কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সেগুলো থেকে 'মিলন' অর্থই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন ঃ وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ "যদি তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে (অর্থাৎ মিলন সংঘটনের পূর্বে) তালাক দিয়ে দাও- - -।"[৫০]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ আয়াতাংশের সাথে আলোচ্য মাস'আলাটি মোটেই সম্পর্কিত নয়, বরং তার সম্পর্ক অন্য মাস'আলার সাথে। এর বিপরীতে, উল্লিখিত হাদীসগুলো আলোচিত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত এবং নিজ বক্তব্যে সুস্পষ্ট। তাই, স্বাভাবিকভাবে এক্ষেত্রে হাদীসের দলীল এবং তার দ্বারা সাব্যস্তকৃত রায়ই প্রাধান্য পাওয়ার উপযোগী বলে বিবেচিত হবে।[৫১]

---

৫০. সূরা বাকারা : ২৩৭।

৫১. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩১১।

www.pathagar.com

প্রবল ঘুমের কারণে অযূ ভেঙ্গে যায়

যে সমস্ত কারণে অযূ ভঙ্গ হয় প্রবল ঘুম (نوم غـالب) তার একটি। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ চার ইমাম সহ অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেন। ঘুম প্রকৃতপক্ষে অযূ ভঙ্গের কারণ নয়। পিছনের রাস্তা দিয়ে বায়ূ নির্গত হওয়াই আসল কারণ। যেহেতু প্রবল ঘুমের মুহূর্তে শরীরের গ্রন্থিসমূহ ঢিলা ও শিথিল হয়ে পড়ে ফলে বায়ু নিসঃরণের আশংকা বিরাজ করে বিধায় তারই ভিত্তিতে প্রবল ঘুমকে অযূ ভঙ্গের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে نوم خَـفِـيف তথা হাল্‌কা ঘুমের কারণে বায়ু নিসঃরণের আশংকা অতি ক্ষীণ বিধায় তা অযূ ভঙ্গের কারণ বলে বিবেচিত নয়।

হাল্‌কা ঘুমের ন্যায় نوم غـالب তথা প্রবল ঘুমও মানুষের বিভিন্ন অবস্থায় হতে পারে। তন্মধ্যে কিছু অবস্থা এমনও রয়েছে যে প্রবল ঘুমেও অযূ ভঙ্গ হয় না। আবার কিছু অবস্থায় অযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। সুতরাং কোন অবস্থায় প্রবল ঘুমের শিকার হলে অযূ ভঙ্গ হবে আর কোন অবস্থায় হবে না এ বিষয়ে ফকীহগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেন। তদসংশ্লিষ্ট হাদীস সমূহের আলোকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, নামাযের অবস্থাবলী অর্থাৎ দাঁড়ানো, বসা, রুকূ' ও সিজ্‌দার মাসনূন অবস্থায় প্রবল ঘুমে লিপ্ত হলে—নামাযের ভিতরে বা নামাযের বাইরে অযূ ভঙ্গ হবেনা। অবশ্য চিৎ বা কাৎ বা হেলান দিয়ে ঘুমালে অযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে।[১]

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ عَلٰى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وَضُوْءٌ حَتّٰى يَضْطَجِعَ، فَانَّهُ اِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ.

رواه أحمد وأبويعلى ورجاله موثوقون كذا فى مجمع الزوائد للهيثمى ج ١، ص ١٠١

---

১ শাইখুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন মুরগীনানী : আল-হিদায়া, ইয়াসির নাদীম এন্ড বোগদাদী, দেওবন্দ, ভারত, অধ্যায়: তাহারাত, অনুচ্ছেদ অযূ ভঙ্গের কারণসমূহ, খণ্ড ১, পৃ. ২৫; আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী : রাদ্দুল মুহতার, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ, ভারত, অধ্যায় : তাহরাত, খণ্ড ১, পৃ. ২৭২-২৭৩; বাদশাহ্ মুহীউদ্দীন আওরঙ্গযেব আলমগীর, ফাতাওয়া আলমগীরী, মাকতাবা রশিদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান, অধ্যায় : তাহারাত, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, অযূ ভঙ্গের কারণসমূহ, খণ্ড ১. পৃ. ১২; আল্লামা আলাউদ্দীন কাসেমী : বাদাইউস্ সানায়ে, কুতুবখানা নাঈমিয়্যা, দেওবন্দ, অধ্যায়, তাহারাত, অনুচ্ছেদ : অযূ ভঙ্গের কারণ সম্পর্কে, খণ্ড ১. পৃ. ১৩৩. ১৩৪, ১৩৫; আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী : বযলুল মাজহূদ : মাকতাবা খলীলিয়্যাহ্, মাজাহিরে উলূম, সাহারানপুর, ভারত, অধ্যায় : তাহারাত, অনুচ্ছেদ : ঘুমের কারণে অযূ প্রসঙ্গে, খণ্ড ১, পৃ. ১২৫, ১২৬। আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী: ইলাউস সুনান, করাচী, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামিয়্যা, অধ্যায় : তাহারাত, অনুচ্ছেদ : শরীরের গ্রন্থিসমূহ ঢিলাবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তির উপর অযূর আবশ্যকতা। হাদীস নং ১০৬, খণ্ড ১, পৃ. ১৫৫।

www.pathagar.com

হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সিজ্‌দাবস্থায় নিদ্রা যায় তার অযূর প্রয়োজন নেই। তবে যদি পার্শ্ব দেশে ভর দিয়ে (কাৎ হয়ে) ঘুমায় তাহলে অযূ করতে হবে। কেননা, কাৎ হয়ে নিদ্রা গেলে শরীরের গ্রন্থিসমূহ (বাঁধন) ঢিলা হয়ে যায়।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتّٰى غَطَّ اَوْ نَفَخَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّكَ قَدْ نِمْتَ! قَالَ اِنَّ الْوَضُوْءَ لاَ يَجِبُ اِلاَّ عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا، فَاِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ. رواه أبوداؤد والترمزى. وقال العلامة يوسف البنورى : عون مَذاهب الفقهاء كحماد ابن أبى سليمان وأبى حنيفة، الثورى، والشافعى، وابن المبارك وغيرهم على وفق هذا الحديث فى الجملة يدل على تلقية بالقبول عندهم، فيلزم منه تصحيحهم لهذا الحديث، وتصحيح مثل هولاء الكبارمن الفقهاء ينبغى ان يقدم على تعليل هولاء المحدثين البتة. على أن الدالانى وثقه ابن معين والنسائى وأحمد بن حنبل وقاالحاكم : ان لائمة المتقدمين شهدوا له بالصدق والاتقان عمافى التهذيب من الكنى والله أعلم. ولعله لاجل عنه الوجود صححها بن جرير الطبرى.

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি দেখলেন যে নবী করীম (সা) সিজ্‌দা অবস্থায় নাক ডেকে ঘুমিয়েছেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলেন। (নামাযের পর) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো ঘুমিয়েছিলেন! তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি পার্শ্বদেশ ভর করে (কাৎ হয়ে) নিদ্রা যায় কেবল তারই উপর অযূ করা ওয়াজিব। কেননা, পার্শ্বদেশে ভর দিয়ে ঘুমালে শরীরের বাঁধন ঢিলা হয়ে যায়।[২] অনেকে হাদীসকে দোষযুক্ত সাব্যস্থ করেছেন, যেমন ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী, আবু দাউদ ও ইবরাহীম হরবী (র)। কেননা এর ভিত্তি হলো, আবু খালিদ ইয়াযীদ ইবন আব্দুর রহমান দালানী (র)-এর উপর। তিনিই এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তার সম্পর্কে দুর্বল রাবী বলে মন্তব্য করা হয়েছে। তাছাড়া তিনি এই হাদীসটি তাঁর উস্তাদ কাতাদাহ (র) থেকে শ্রবণ করেননি। অথচ এখানে শ্রবণের কথা উল্লেখ আছে। কেননা, দালানী (র) কাতাদাহ (র) থেকে মোট চারটি হাদীস শ্রবণ করেছেন। এই হাদীসটি সে চারটির অন্তর্ভুক্ত নয়।[৩] আসলে

---

২ ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ঈসা : সুনানে তিরমিযী, কুতুবখানায়ে রশিদিয়্যা, দিল্লী, ভারত, অধ্যায় : তাহারাত, অনুচ্ছেদ : ঘুমের কারণে অযূ প্রসঙ্গে, খণ্ড ১, পৃ. ১২।

৩. আল্লামা তাকী উসমানী : দরসে তিরমিযী: রশিদ আশরাফ সংকলিত, করাচী, মাকতাবা দারুল উলুম,

www.pathagar.com

হাদীসটি সহীহ্ অথবা ন্যূনতম পক্ষে হাসান। কেননা, হাদীসটি আলাউদ্দিন (র) আল-জাওহারুন নাকীতে (বায়হাকী শরীফের পরিশিষ্টে মুদ্রিত ১ম খণ্ড ১২১ পৃ.) উল্লেখ করেছেন যে, ইবনে জারীর তাবারী (র) 'তাহযীবুল আসার' গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[8]

যে ভিত্তিতে হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা হয়েছে তা অনেকটা গুরুত্বহীন ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা, আবু খালিদ দালানী একজন এমন রাবী যার সম্পর্কে ভাল-মন্দ উভয় প্রকার মন্তব্য পরিলক্ষিত হয়। কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিসীন তাঁকে দুর্বল বলেন। আর অনেক বড় বড় মুহাদ্দিসীনে কিরাম তাঁর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখ করেছেন। যেমন ইমাম আবু হাতিম ইবন জারীর তাবারী, আহমাদ, নাসাঈ ও ইবনে মুঈন (র) প্রমুখ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। প্রখ্যাত হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমাম যাহাবী (র) তাহযীব ফিল আসমা-ই-ওয়াল কুনার ১২ তম খণ্ডে বলেন, তাঁর হাদীস হাসানের অন্তর্ভুক্ত।[৫] নিম্নে উল্লেখকৃত হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা তা সমর্থিত হয়।[৬] বাকি রইল কাতাদাহ্ (র)-এর আবুল আলিয়া (র) থেকে শুধুমাত্র চারটি হাদীস শ্রবণের বিষয়..... এটা কোন জটিল বিষয় না।

কেননা, যদি আবু খালিদ দালানীকে ثقة বা নির্ভরযোগ্য রাবী বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তাহলে উক্ত হাদীসটি পঞ্চম হাদীস হিসাবে গণ্য হবে যা তিনি আবুল আ'লিয়া থেকে শ্রবণ করেছেন। সুতরাং ন্যূনতম পক্ষে হাদীসটিকে হাসান বলতেই হবে।[৭]

عَنْ يَزِيْدَبْنِ قُسَيْطٍ اَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَبِى النَّائِمِ وَلاَ عَلَى الْقَائِمِ النَّائِمِ وَلاَ عَلَى السَّاجِدِ النَّائِمِ وَضُوْءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ فَاِذَا اضْطَجَعَ تَوَضَّأَ . رواه البيهقى واسناده جيد موقوف التلخيص الحبير . ج ١ ، ص ٤٤

৩. ইয়াযীদ ইবনে কুসাইত (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে পা-ও পিঠ জড়ো করে বসা অবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তি, দাড়ানো অবস্থায় ঘুমন্ত ব্যক্তি এবং সিজ্‌দাবস্থায় ঘুমন্ত ব্যক্তির জন্য অযূ ওয়াজিব নয়।[৮]

উপরোক্ত হাদীস সমূহের আলোকে কয়েকটি বিষয় প্রতিভাত হয়।

ক. প্রবল ঘুমে অযূ ভঙ্গ হয়ে যায়।

খ. ঘুম প্রকৃতপক্ষে অযূ ভঙ্গের কারণ নয় বরং প্রবল ঘুমের কারণে শরীরের গ্রন্থিসমূহ ঢিলা হওয়ার নিমিত্তে মলদ্বার দিয়ে বায়ু নিসঃরণের প্রবল আশংকার বিদ্যমানতা মূল হেতু।

অধ্যায় : তাহারাত, অনুচ্ছেদ : ঘুমের কারণের অযূ, খণ্ড ১, পৃ. ২৯৫; আল্লামা ইউসুফ বিন্নোরী, মা'আরিফুস সুনান. মাকতাবা আশরাফিয়া দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত, অধ্যায় : তাহারাত, অনুচ্ছেদ : ঘুমের কারণে অযূ প্রসঙ্গে, খণ্ড ১, পৃ. ২৮৪।

৪. মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত।

৫. প্রাগুক্ত, দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত।

৬ মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ২৮৬।

৭. দরসে তিরমিযী : প্রাগুক্ত।

৮. ই'লাউস-সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১০৮, খণ্ড ১, পৃ. ১৫৬-১৫৭।

www.pathagar.com

গ. সাধারণত চিৎ বা কাৎ বা হেলান দিয়ে ঘুমালে শরীরের বাঁধন ঢিলা ও শিথিল হয়ে থাকে। দাঁড়ানো, বসা, রুকু' (মাসনূন ত্বরীকায়) সিজ্‌দা বা আসঞ্জিত হয়ে বসা অবস্থায় এরূপ হয় না।[৯]

কিছু হাদীস এমনও রয়েছে যার দ্বারা বুঝা যায় যে, ঘুম প্রবল হলেও তাতে অযূ ভঙ্গ হয় না। কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, উপরোল্লিখিত হাদীসের সাথে সে সমস্ত হাদীসের প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ (বা تعـارض) নেই, বরং উভয় প্রকারের হাদীসের সারমর্ম ও মূল বিষয়বস্তু একই জিসিনের উপর ভিত্তি করে। যা নিম্নের পর্যালোচনা দ্বারা দিবালোকের ন্যায় ফুটে উঠে।

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰه صَلَّى اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى عَهْدِهٖ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ حَتّٰى تَخْفِقَ رُؤُسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلاَ يَتَوَضَّؤُنَ. أخرجه أبواؤد وصححه الدارقطنى واصله فى مسلم.

১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে সাহাবা কিরাম (রা) এশার নামাযের অপেক্ষা করতে গিয়ে ঘুমিয়ে যেতেন। এমনকি ঘুমে তাঁদের মাথা দু'দুল। অতঃপর তারা অযূ না করেই নামায পড়তেন।[১০]

হানাফী ফকীহ্‌গণ বলেন, এ হাদীসের মর্ম হলো, সাহাবায়ে কিরাম বসে ঘুমাতেন। কেননা, ঘুমিয়ে মাথা দোলার বিষয়টি একমাত্র বসা অবস্থায়ই হতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে যে, অসঞ্জিত হয়ে বা নামাযের অবস্থায় বসে ঘুমালে উযু ভঙ্গ হয় না।[১১] তাছাড়া হতে পারে সাহাবাদের এ ঘুমটি হাল্‌কা ঘুম ছিল। কেননা, হাদীসে বলা হয়েছে সাহাবায়ে কিরাম এশার অপেক্ষায় থাকতেন। আর একথা স্পষ্ট যে নামাযের অপেক্ষারত অবস্থায় প্রবলভাবে ঘুমের বিষয়টি অতি ক্ষীণ।[১২] অধিকন্তু মাথা দুলে ঘুমানোর কথাও হাদীসে উল্লেখ আছে। এটা তো তন্দ্রার অন্তর্ভুক্ত যাকে আমরা হাল্কা ঘুম বলেই জানি। আর আগেই বলা হয়েছে যে, হাল্কা ঘুমের কারণে অযূ ভঙ্গ হয় না। কাজেই হাদীসটির উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহের সাথে কোন تعارض বা দ্বন্দ্ব নেই।

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰه عَنْهُ اَنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا يَضَعُوْنَ جُنُوْبَهُمْ فَيَنَامُوْنَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ وَمِنْهُمْ مَنْ لاَيَتَوَضَّأُ. ورجاله رجال الصاح

৯. মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ২৮৪; বাযলুল মাজহূদ, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ১২৫; সুলাইমান ইবনে আশ'আস সিজিস্তানী : সুনানে আবূ দাউদ, কুতুবখানা রশিদিয়া ঢাকা, অধ্যায় তাহারাত: অনুচ্ছেদ: ঘুমের কারণে অযূ সম্পর্কে, খণ্ড ১. পৃ. ২৬; ই'লাউস সুনান : প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ১৫৬।

১০. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ১৫৭।

১১. প্রাগুক্ত

১২. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ২৯৬ : সূত্র : ফাতহুল মুলহিম : শারহু মুসলিম শরীফ।

www.pathagar.com

২. হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ কাত হয়ে ঘুমাতেন। অতঃপর তাদের কেউ (নামাযের জন্য) অযূ করতেন আবার কেউ অযূ করতেন না।[১৩]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয় সাহাবাদের মধ্যে যাদের ঘুম প্রবল হতো তাঁরা অযূ করতেন, আর যাদের প্রবল ঘুম হতো না তারা অযূ করতেন না।

٣. عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ اَصْحَابَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْقَظُوْنَ لِلصَّلَاةِ حَتّٰى اَنِّى لَاسَمَعَ لِاَحَدِهِمْ غَطِيْطًا ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلَايَتَوَضَّؤُوْنَ.

قال ابن المبارك هذا عندنا وهم جلوس (صحيح) رواه الدارقطنى باب ماروى فى النوم قاعدًا الا ينقض الوضوء ح ض ١٣٠/١٣١.

৩. হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখেছি যে, (রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর) সাহাবীদের নামাযের জন্য জাগানো হতো তখন আমি কারো কারো ঘুমে নাক ডাকার আওয়াজ শুনতে পেতাম। অতঃপর তাঁরা অযূ না করেই নামায আদায় করতেন।[১৪]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, নাক ডেকে ঘুমানো যদিও প্রবল ঘুমের নিদর্শন তবুও এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে বসা অবস্থায় ঘুম। কেননা অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, অসজ্জিত হয়ে বসা অবস্থায় ও মানুষ নাক ডেকে ঘুমায়।[১৫]

আত্তাহিয়্যাতুর সূরতে বসেও নাকে ডেকে ঘুমানোর বিষয়টি বাস্তব। আর এরূপ বসে কেউ প্রবল ঘুমে লিপ্ত হলে শরীরের বাঁধন সঠিক থাকে, ফলে বায়ু নিসঃরণ না হওয়াই স্বাভাবিক।

শরীরের কোন স্থান হতে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে অযূ ভেঙ্গে যায়

অযূ ভঙ্গের আরেকটি কারণ হলো শরীরের কোন জায়গা হতে রক্ত, পুঁজ বের হয়ে গড়িয়ে পড়া। অধিকাংশ হাদীস দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, রক্ত প্রবাহিত হয়ে গড়িয়ে পড়লে অযূ ভেঙ্গে যায়। কিন্তু সামান্য রক্ত বের হলে (যা প্রবাহিত নয়) অযূ ভঙ্গ হবে না।[১৬]

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰه عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصَابَهُ قَيْئٌ اَوْرُعَافٌ أَوْقَلَسٌ اَوْمَذِىٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّا ثُمَّ لِيَبْنَ عَلٰى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِىْ ذَالِكَ لَايَتَكَلَّمَ.

১৩. মাতালিবুল আ'লিয়া : হাদীস নং ১৫৩ খণ্ড ১. পৃ. ৪৪ (মত্র : দরসে তিরমিযী, খণ্ড ১, পৃ. ২৯৬)

১৪. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, (সূত্র : দারু কুতনী : অধ্যায় বসে ঘুমালে অযূ ভঙ্গ না হওয়া প্রসঙ্গে, খণ্ড ১. পৃ. ১৩০-১৩১)

১৫. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ১৫৭।

১৬. শাইখুল ইসলাম মুরগীনানী, আল-হিদায়া, ইয়াসির নাদিম এণ্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, অধ্যায় : তাহারাত, অনুচ্ছেদ : অযূ ভঙ্গের কারণসমূহ, খণ্ড ১, পৃ. ২৩।

১০—

www.pathagar.com

رواه ابن ماجه فى باب ماجاء فى البناء على الصلاة من ـ كتاب الصلاة (١ : ٨٨) والصحيح انه مرسل صحيح الا سناد لكن بغير هذا الاسناد المذكور فى الحاشية .

১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যদি কারো বমি হয় কিংবা নাক দিয়ে রক্ত ক্ষরণ হয় অথবা মযী নির্গত হয় তাহলে সে যেন ছুটে গিয়ে অযূ করে এবং পূর্বে নামাযের উপর বিনা করে নেয়। তবে এ অবস্থায় সে কথা বলতে পারবে না।[১৭]

عَنْ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْوَضُوْءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ.

أخرجه ابن عدى فى الكامل فى ترجمة أحمد وقال هذا حديث لانعرفه الامن حديثه أحمد وهوممن لايحتج بحديثه ، ولكنه يكتب، فان الناس مع ضعفه قد احتملوا حديث، انتهى

وقال ابن أبى حاتم فى كتاب العلل : أحمد بن الفرج كتبنا عنه، ومحله عندنا الصدق اه (من الزيلعى ١ : ٤١) قلت : فهو من رجال الحسن والباقون كلهم ثقات، أما بقية فلا علة له سوى التدليس، وقد صرح بالتحديث، وشعبة، ومحمد بن سليمان ثقة لان شعبة روى عنه، ومولايروى الاعن ثقة، وعبد الرحمن بن آبان من رجال الأربعة، ثقه، كما فى التقريب ص ١١٨ فالحديث حسن.

হযরত যায়িদ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন সর্বপ্রকার প্রবাহিত রক্তের কারণেই অযূ ওয়াজিব হয়।[১৮]

---

১৭. আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী (র), ই'লাউস সুনান, করাচী : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামিয়্যা, অধ্যায় : তাহারাত, অনুচ্ছেদ : প্রবাহিত রক্ত, মযী, ওয়াদী, বমি এবং নাক থেকে রক্ত ক্ষরণ ইত্যাদির কারণে অযূ ভঙ্গ হওয়া প্রসঙ্গ, খণ্ড ১, পৃ. ১৪১-১৪২, হাদীস নং ৯২।

১৮. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১০৪, খণ্ড ১, পৃ. ১৫৪।
আবূ আবদুল্লাহ্ ইসমাঈল বুখারী : সহীহ বুখারী : মুখতার এণ্ড কোম্পানী : দেওবন্দ, ভারত। অধ্যায়: অযূ, অনুচ্ছেদ : রক্ত ধৌত করা প্রসঙ্গে, খণ্ড ১. পৃ. ৩৬; ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৯৭, খণ্ড ১, পৃ. ১৪৪; ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, কুতুবখানায়ে রশীদিয়া : দিল্লী, ভারত, অধ্যায় : তাহারাত, অনুচ্ছেদ: মুস্তাহাযা প্রসঙ্গে, খণ্ড ১. পৃষ্ঠা ১৮; আবু দাঊদ সুলাইমান ইবনে আশ'আস সিজিস্তানী : সুনানে আবূ দাউদ, কুতুবখানা রশিদিয়া, ঢাকা : অধ্যায় : তাহারাত, অনুচ্ছেদ, ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলাদের ঋতুস্রাবান্তে গোসল সম্পর্কে, খণ্ড ১, পৃ. ৪১-৪২।

www.pathagar.com

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَكَ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِىْ حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنِّى امْرَاةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ ؟ قَالَ: لاَ ! انَّمَا ذَالِكَ عِرْقٌ لَيْسَ بِحَيْضٍ، فَاذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكَ فَدَعِى الصَّلاَةَ، وَاذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّىْ. قَالَ (هشام بن عروة) : وَقَالَ أَبِىْ : ثُمَّ تَوَضِئِى لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يَجِئَى ذَالِكَ الْوَقْتُ. رواه الْبُخَارِىُّ والترمزى وآبوداؤد. وقال الترمزى حديث عائشة حديث حسن صحيح.

২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমা বিনত আবু হুবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ইস্তেহাযাগ্রস্ত (রক্ত প্রদর রোগে আক্রান্ত) মহিলা। ফলে আমি পবিত্র হতে পারছি না। এ সময় কি আমি নামায ছেড়ে দিব? জবাবে তিনি বললেন, না, এটা বিশেষ শিরা হতে নির্গত রক্ত হায়েযের রক্ত নয়, অতএব তোমার যখন হায়েযের নির্ধারিত সময় উপস্থিত হবে তখন নামায ত্যাগ করবে এবং ঐ সময় অতিক্রান্ত হলে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে রক্ত ধৌত করে (অযূ করে) নামায আদায় করবে। হিশাম ইবন উরওয়া (র) বলেন, আমার পিতা (হাদীসের আরেকটু অংশ) অতঃপর সে সময় আসা পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের জন্য অযূ করবে।

উপরোক্ত হাদীসে ফামিতা বিনতে আবু হুবায়শ (রা)-কে প্রতি ওয়াক্তে অযূর হুকুম প্রদানের ইল্লত বা কারণ হিসাবে বলা হয়েছে اِنَّمَا ذَالِكَ عِرْقٌ অর্থাৎ এটা তো শিরা থেকে নির্গত রক্ত। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রবাহিত রক্ত অযূ ভঙ্গের কারণ।[১৯]

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ فِىْ الْقَطْرَةَ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وَضُوْءٌ حَتَّى يَكُوْنَ دَمًا سَائِلاً - رواه الدار قطنى، ومحمد بن الفضل وان تكلم فيه ولكنه قال يحى بن معين انه صدوق، وذكره ابن حبان فى الثقات، وقال انه مستقيم الحديث.

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, একফোটা বা দু'ফোটা রক্ত বের হলে অযূ ভঙ্গ হয় না। যতক্ষণ না তা প্রবাহিত হয়ে গড়িয়ে পড়বে।[২০]

حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ : اَبْصَرْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ صَلَّى صَلاَةَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً ثُمَّ رَعَفَ، فَخَرَجَ فَتَوَضَّا ثُمَّ بَنَى عَلَى مَا بَقِىْ مِنْ

---

১৯. আল্লামা তাকী উসমানী, দরসে তিরমিযী, মাওলানা রশীদ আশরাফ সাইফী সংকলিত, করাচী. মাকতাবা দারুল উলূম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৯; বাদাইউস্ সানাই : প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২০।

২০. হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাসান : তানযীমুল আশতাত, বাংলা ইসলামিক একাডেমী, দেওবন্দ, ভারত, অধ্যায়, তাহারাত, অনুচ্ছেদ: যে সব কারণে অযূ আবশ্যক, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৮।

www.pathagar.com

صَلَاتِه. أخرجه ابن شيبت فى المصنف وصححه فى جوهر النقى . ج ١- ص ٣٩

আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালিম ইবন আবদুল্লাহ্ (র) কে দেখলাম যে, ফজরের নামায আদায় করা অবস্থায় তার নাক দিয়ে রক্ত ক্ষরণ হতে লাগলে তিনি ছুটে গেলেন এবং অযূ করে এসে পূর্বের নিয়্যতের উপর ভিত্তি করত অবশিষ্ট নামায আদায় করেন।[২১]

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) এবং তাঁর শিষ্যগণ এ অভিমতই পোষণ করেন। তবে কোন কোন হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, রক্ত বের হয়ে যতই গড়াক তাতে অযূ ভঙ্গ হবে না। যেমন-

وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِىْ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِىَ رَجُلٌ صَحَابِىٌّ بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِىْ صَلَاتِهِ.

১. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, যখন যাতুর্‌রিকা নামক যুদ্ধে নবী করীম (সা) ছিলেন। তখন জনৈক সাহাবীকে বর্শাঘাত করা হলে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। এমতাবস্থায় তিনি রুকু' সিজ্‌দা আদায় করত নামায শেষ করলেন।[২২]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রক্ত বের হলে অযূ ভাঙ্গবে না। কেননা, সাহাবী ছিলেন নামায অবস্থায় এবং বর্শাঘাতে তীব্র বেগে রক্ত প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও রুকু' সিজ্‌দার সাথে নামায সম্পন্ন করেছেন। এতদসংশ্লিষ্ট ঘটনা আবূ দাউদ শরীফে (১ম খণ্ড, ২৬ পৃ.) বিস্তারিত বর্ণিত রয়েছে।

যার সংক্ষেপ হলো ঃ

একদা নবী করীম (সা) রাতে বিশ্রামের জন্য এক স্থানে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আছে যে আমাদের পাহারা দিবে? তখন আব্বাদ ইবন বিশর (রা) নামক এক আনসারী এবং আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) নামক এক মুহাজির সাড়া দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা দু'জন গিরিপথে চূড়ায় বসে পাহারা দিবে। অতঃপর ব্যক্তিদ্বয় সেখানে হাজির হওয়ার পর মুহাজির সাহাবী বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়েন আর আনসারী সাহাবী নামাযে রত হন। এমতাবস্থায় শত্রু পক্ষের এক ব্যক্তি আনসারী সাহাবীর শরীরে তীর বিদ্ধ করে। তিনি তা দেহ থেকে বের করে ফেললেন। শত্রু এভাবে পরপর তিনটি তীর নিক্ষেপ করে। অতঃপর তিনি রুকু' সিজ্‌দা করে নামায শেষ করার পর সাথীকে জাগ্রত করেন।[২৩]

হানাফী হাদীস বিশারদ উলামায়ে কিরাম এই ঘটনার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। যেমন-

---

২১. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৯৯, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪৬-১৪৭।

২২. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫।
আবু আবদুল্লাহ্ ইসমাঈল : সহীহ্ বুখারী শরীফ, মুখ্‌তার এণ্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, ভারত : অধ্যায় : অযূ অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি বলে যে, পায়খানা-পেশাবের রাস্তা ব্যতীত অন্য কোথাও হতে নাপাক বের হলে অযূ করতে হবে না, খণ্ড ১, পৃ ২৯।

২৩. ইমাম আবূ দাঊদ সিজিস্তানী : সূনানে আবূ দাঊদ, কুতুবখানায়ে রশীদিয়্যা, ঢাকা, তাহারাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : রক্ত বের হলে অযূ করা সম্পর্কে, খণ্ড ১, পৃ. ২৬।

www.pathagar.com

১. আনসারী সাহাবী আব্বাদ ইবন বিশর (রা) এর উক্ত আমলের সপক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক কোন 'তাকরীর' অনুমোদন বা সমর্থন পাওয়া যায়নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাকরীর ব্যতীত অন্যান্য হাদীসের মুকাবিলায় কোন সাহাবীর ব্যক্তিগত আমল কোন মাস'আলায় প্রমাণ্য দলীল গৃহীত হতে পারে না।[২৪]

সর্বোপরি রক্ত বের হলে অযূ ভঙ্গ হয় না। এ বিষয়টি যদি উক্ত হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয় তবে রক্ত পবিত্র একথাটিও এর দ্বারা প্রমাণ করার প্রয়াস পাওয়া যাবে। কারণ উপরোক্ত ঘটনায় বলা হয়েছে, পরপর তিনটি বর্শাঘাত করা হয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট সাহাবীর কাপড় রক্তাক্ত হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তারপর সে সাহাবী নিজ শরীরের রক্তাক্ত কাপড়সহ রুকু' সিজ্দা আদায়ের সাথে নামায সম্পন্ন করেছেন। তাহলে কি বলা হবে, রক্ত পবিত্র? না, রক্ত নাপাকই। তবে এটি সাহাবীর ব্যক্তিগত আমল ছিল-যা অন্যান্য হাদীসের মোকাবিলায় প্রমাণ হিসাবে দাঁড়া করানো যাবে না। অনুরূপ বক্তব্য প্রযোজ্য হবে রক্ত বের হওয়া সত্ত্বেও নামায পড়ার ক্ষেত্রে।[২৫]

২. প্রবাহিত রক্ত অযূ ভঙ্গের কারণ এ মাস'আলা হয়ত সে সাহাবীর জানার বহির্ভূত ছিল বিধায় সে অবস্থায় নামায সম্পন্ন করতে কোন বাধা বা সংকোচ মনে করেন নি।[২৬]

৩. কিংবা তিনি উক্ত মাস'আলা সম্পর্কে অবগত ছিলেন বটে কিন্তু মহান আল্লাহ্র ইবাদত গভীরতর আত্মনিমগ্নতার দরুন, অন্যসব কিছু তাঁর খেয়ালের বাহিরে ছিল.। এমন কি পরপর তিনটি বর্শাঘাতের দরুন যাতনাও তাঁর ইবাদতের স্বাদে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত উল্লেখিত ঘটনার শেষ অংশটুকু দ্বারা তাই প্রমাণিত হয়।

فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِى.مَا بِالْاَنْصَارِيِّ مِنَ الدَّمَاءِ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰه اَلَمْ اَنْبَهْتَنِي اَوَّلَ مَارَمِي؟ قَالَ اِنْ كُنْتُ فِي سُوْرَةِ اَقْرَؤُهَا فَلَمَّا اُحِبَّ اَنْ اَقْطَعَهَا.

পরবর্তীতে মুহাজির সাহাবী আনসার সাহাবীর রক্তাক্ত অবস্থা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ্! শত্রুপক্ষের প্রথম তীর নিক্ষেপের সময় আপনি আমাকে সতর্ক কেন করেন নি?

জবাবে তিনি বললেন আমি নামাযের মধ্যে (তন্ময়তার সাথে) এমন একটি সূরা পাঠ করছিলাম যা শেষ না করে নামায পরিত্যাগ করা পছন্দ করিনি।[২৭]

ঘটনার এ অংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআন তিলাওয়াতে ও ইবাদতের চরম স্বাদে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার বিষয়টি তিনি টের পাননি। আর টের পেলেও তিলাওয়াত ও ইবাদতের অতি

২৪. আল্লামা তাকী উসমানী : দরসে তিরমিযী : মাওলানা রশীদ আশরাফ সংকলিত, মাকতাবা দারুল উলূম, করাচী, পরিচ্ছেদ : বমি এবং নাক থেকে রক্তক্ষরণের কারণে অযূ ভঙ্গ হওয়া প্রসঙ্গে, খণ্ড ১, পৃ. ৩৩৯।

২৫. প্রাগুক্ত।

২৬. ইলাউস সুনান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫-১৪৬, সূত্র : তাবিউল আসার, পৃ. ৬৮।

২৭. আবূ দাউদ শরীফ, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

তৃপ্তি সহকারে নিমগ্নতার কারণে তিনি নামায পরিত্যাগ করেন নি। অতএব, এরূপ অবস্থা দ্বারা শারঈ কোন মাস'আলার প্রমাণ পেশ করা যাবে না। অপর এক হাদীসে আছে ঃ

روى البخارى تعليقا عن الحسن : مَا زَالَ الْمُسْلِمُوْنَ فِىْ جِرَاحَاتِهِمْ

২. ইমাম বুখারী (র) হযরত হাসান (র) থেকে تعليقًا বর্ণনা করেন যে, মুসলমানগণ অর্থাৎ সাহাবীগণ নিজেদের যখম অবস্থায় সদা নামায আদায় করতেন।[২৮] আর একথা স্পষ্ট যে, যখম থেকে রক্ত ক্ষরণ স্বাভাবিক।

এ হাদীসটি বাহ্যিকভাবে হানাফী মাযহাবের পরিপন্থী দেখা গেলেও বাস্তবে তা নয়। কেননা, যখম যদি ভাল না হয় এবং এর থেকে সদা রক্ত ক্ষরণ হতে থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তি মাযূরের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় রক্ত বের হওয়া অযূ ভঙ্গের কারণ বলে বিবেচিত নয়। তাছাড়া হযরত হাসানের বক্তব্যে এ কথা স্পষ্টাকারে বুঝা যায় না যে, তাঁরা রক্ত প্রবাহ অবস্থায়ই নামায আদায় করেছেন। এখানে এ সম্ভাবনাও বিদ্যমান যে, তারা যখমের উপর কাপড় বা পট্টি বেঁধে নামায পড়তেন। তখন গড়িয়ে না পড়াই স্বাভাবিক।

এ হাদীস দ্বারা হযরত হাসান বসরীর উদ্দেশ্য হলো রক্ত প্রবাহিত না হাওয়া অবস্থায় নামায পড়া। কারণ প্রবাহিত রক্ত তার নিকট অযূ ভঙ্গ হওয়ার কারণ। এর প্রমাণ হল, মুসান্নিফে ইবনে আবু শাইবায় বিশুদ্ধ সনদের সাথে বর্ণিত আছে।

اَنَّهٗ كَانَ لاَيَرَى الْوَضُوْءَ مِنَ الدَّمِ اِلاَّ مَاكَانَ سَائِلاً.

শুধু প্রবাহিত রক্তের কারণে অযূ করা তার অভিমত।[২৯]

رَوَى الْبُخَارِى تَعْلِيْقًا عَصَرَابْنِ عُمَرَ بَثْرَةً فَخَرَةَ مِنْهَا الدَّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّا.

ইমাম বুখারী (র) تَعْلِيقًا বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্‌ন উমর (রা) একটি ফোঁড়া গাললে তার থেকে রক্ত বের হয় কিন্তু এরপর তিনি অযূ করেন নি।[৩০] এর থেকেও বুঝা যায় যে, রক্ত বের হলে অযূর প্রয়োজন নেই।

এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, ফোঁড়া থেকে বের হওয়া রক্ত হয়ত অনপ্রবাহিত সামান্য রক্ত ছিল বিধায় অযূ করা নিষ্প্রয়োজন ছিল। এর প্রমাণ হল, মুসান্নিফে ইবন আবু শাইবায় বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে ঃ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ التَّيْمِى عَنْ بَكْرٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنِ عُمَرَ عَصَرَ بَثْرَ فِىْ وَجْهِهٖ فَخَرَجَ مِنْهَا شَىْءٌ مِّنْ دَمٍ فَحَكَّهٗ بَيْنَ اَصْبَعَيْهِ ثُمَّ صَلَّى (كذا فى عمدة القارى ، ص ٧٩٧)

আব্দুল ওয়াহহাব (র) সুলাইমান ইবন তায়মী (র)-এর সূত্রে বকর (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি দেখলাম যে ইবন উমর (রা) তাঁর চেহারার একটি ফোঁড়া টিপে

২৮. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ১৫২; বুখারী শরীফ, প্রাগুক্ত,।

২৯. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩২০; ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ১৫২।

৩০. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত ও বুখারী শরীফ, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

গালেলেন। অতঃপর তার থেকে একটু রক্ত বেরুল তিনি দুই আঙ্গুল দ্বারা তা ঘষে ফেলে দিলেন। অতঃপর নামায পড়লেন।[৩১] এ হাদীসের ভাষ্য দ্বারা স্পষ্ট বুঝে আসে যে, রক্ত অতি সামান্য ছিল।

তাছাড়া এটি একটি বিশেষ ঘটনা যা ব্যাপক কোন নীতি হতে পারে না। সাথে সাথে তাতে বিভিন্ন সম্ভাবনাও বিদ্যমান আছে।

বস্তুত ইবন উমর (রা) থেকে এ বিষয়ে দু'ধরনের বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। একটি মৌখিক থাকে قولى হাদীস বলা হয়। আরেকটি কার্যমূলক থাকে فعلى হাদীস বলা হয়। একটি নিয়ম হলো : কোন রাবী থেকে বর্ণিত قولى এবং فعلى দু'ধরনের হাদীসের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তা সমাধান কল্পে قولى হাদীসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সুতরাং ইবন উমর (রা)-এর قولى হাদীসটিই প্রাধান্য দেওয়া হবে এবং এ হুকুমই বলবৎ থাকবে যে প্রবাহিত রক্তের কারণে অযূ ভঙ্গ হয়ে যায়।[৩২]

ইমাম বুখারী (রা) تعليقًا আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেন ঃ

بَزَقَ ابْنُ اَبِىْ اَوْفٰى دَمًا فَمَضٰى فِىْ صَلَاتِهٖ

হযরত ইবন আবু আওফা (রা) থুথুর সাথে রক্ত ফেললেন, অতঃপর নামায আদায় করলেন। বাহ্যত এর দ্বারাও বুঝা যায় যে, রক্ত বের হওয়ায় অযূ আবশ্যক নয়। এ রিওয়ায়েতের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, যে এটি হানাফী মাযহাবের সাথে এর কোন বিরোধ নেই।

কেননা, মুখ থেকে নিঃসৃত রক্তের দুই অবস্থা ১. পেট থেকে আগত, ২. গলার অগ্রভাগ বা দাতের মাড়ি কিংবা মুখের অভ্যন্তরীণ স্থান থেকে আগত। পেট থেকে আগত রক্ত মুখভরে না বেরুলে অযূ ভঙ্গ হয় না। অতএব ইবন আওফা (রা)-এর মুখ থেকে নিঃসৃত রক্ত কি মুখ ভরে হয়েছিল? এ ব্যাপারে বিষয়টি অস্পষ্ট। দাঁতের মাড়ি বা তার আশপাশ থেকে রক্ত বেরুলে রক্ত এবং থুথুর মধ্যে যার পরিমাণ অধিক সেটাই প্রাধান্য পাবে। থুথুর পরিমাণ বেশী হলে অযূ ভাঙ্গবে না আর রক্তের পরিমাণ বেশী হলে অযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে বর্ণনাকারী এ বিষয়টিকেও অস্পষ্ট রেখেছে। অতএব, উক্ত রিওয়ায়েত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, রক্ত বের হওয়ায় অযূ ভঙ্গ হয় না।[৩৩]

মোটকথা এ সকল آثار দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হওয়ায় অযূ ভঙ্গ না হওয়ার বিষয়টি বাহ্যিক পলিক্ষিত হলেও বাস্তবে তা এ রূপ নয়। তাছাড়া আরো অনেক সাহাবী ও তাবিঈ এমন রয়েছেন যাঁদের آثار এর মধ্যে রক্ত বের হওয়ায় অযূ ভঙ্গ হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট। এ সকল বিষয়েও ইমাম ইবন আবু শায়বার স্বরচিত গ্রন্থ মুসান্নাফে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া সামগ্রিক বিচারে সাহাবী ও তাবিঈগণের আমল এবং উক্তি মারফূ' হাদীসের মোকাবিলায় দুর্বল বলে বিবেচিত। কাজেই সাহাবী ও তাবিঈর আমল ও উক্তির ক্ষেত্রে সহীহও মারফূ' হাদীসে বর্ণিত মাস'আলা অনুযায়ী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়।[৩৪]

---

৩১. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

৩২. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ১৫৩; বুখারী, প্রাগুক্ত।

৩৩. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত।

৩৪. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩৩৯।

www.pathagar.com

কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে পাত্রটি তিনবার ধৌত করা আবশ্যক

কুকুরের ঝুটা নাপাক।[৩৫] কেননা, হাদীসের মধ্যে কুকুরে মুখ দেওয়া পাত্রস্থ বস্তু ঢেলে দিয়ে পাত্রটি একাধিকবার ধৌত করার ফরমান দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে কুকুরের ঝুটা যদি পাক হতো তাহলে এরূপ হুকুম আরোপ করা হতো না।

অনুরূপভাবে কুকুরের মুখ দেয়া পাত্রও নাপাক। তা ধুয়ে পরিষ্কারও পবিত্র করা আবশ্যক। তবে কতবার তা ধৌত করতে হবে এ সম্পর্কে হাদীসে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। তবে একাধিক হাদীসে তিনবার ধৌত করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي الْكَرَابِيْسِي حَدَّثَنَا اسْحَاقَ الْاَزْرَقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

أخرجه ابن عدى فى الكامل، وقال لم يرفعه غير الكرابيسى، والكربيسى لم اجد له حدثنا منكرا غير هذا، وإنما حمل عليه آحمد من جهة اللفظ بالقران. فاما فى الحديث فلم أربه بأسًا الزيلعى ١: ٦٨ قلت :لاباس به ونحوه من الفاظ التعديل كما قال فى الرفع والتكميل عن الذهبى وغيره ص ١١ ونكارة حديث غير الضعيف يطلق على مطلق التفرد كما قال فى الرفع ايضًا (ص٢١) عن ابن عدى "والرفع زيادة فتقبل من الثقة فالحديث إذن غير مقدوح ورفعه ، قلت : والباقون كلهم ثقات من رجال مسلم.

১. হুসাইন ইবন আলী আল-কারাবাসী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসহাক আল-আযরাক (র) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আব্দুল মালিক হযরত আতা (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, যদি তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর লেহন করে (খায় বা পান করে) তাহলে পাত্রস্থ বস্তু ঢেলে দিয়ে পাত্রটি তিনবার ধৌত করে নিবে।[৩৬]

---

৩৫. শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুরগীনানী, আল-হিদায়া, দেওবন্দ, ইয়াসির এন্ড নাদীম কোম্পানী, অধ্যায় : তাহারাত, অনুচ্ছেদ : ঝুটা প্রসঙ্গ, খণ্ড ১, পৃ. ৪৫; আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী : দুর্‌রে মুখ্‌তার, এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানী : করাচী, তাহারাত অধ্যায়, খণ্ড ১, পৃ. ৪০।

৩৬. আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী (র) ই'লাউস সুনান : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামিয়্যা, করাচী, অধ্যায় : তাহারাত, পরিচ্ছেদ: কুকুরের মুখ দেওয়া পাত্র তিনবার ধৌত করা। হাদীস নং ২৪৯, খণ্ড ১, পৃ. ২৮৯; আল্লামা ইউসুফ বিন্নোরী : মা'আরিফুস্ সুনান, আশরাফী বুক ডিপো দেওবন্দ, অধ্যায় তাহারাত, পরিচ্ছদ : কুকুরের ঝুটা প্রসঙ্গে, খণ্ড ১, পৃ. ৩২৫।

www.pathagar.com

এ হাদীসের মধ্যে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে কুকুরের মুখ দেওয়া পাত্র তিনবার ধৌত করা আবশ্যক। তাতেই পাত্রটি পাক হয়ে যাবে। যদি এর চেয়ে বেশী ধোয়ার প্রয়োজন হতো তাহলে অবশ্যই তা রাসূলুল্লাহ্ (সা) উল্লেখ করতেন।

এটি ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী যা আবু হুরায়রা (রা) সমগ্র উম্মাতের সামনে পেশ করেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) স্বয়ং এ অনুযায়ী ফাত্ওয়া প্রদান করেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো ঃ

عن عطا عن أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الْاِنَاءِ فَأَهْرِقْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

هذا موقوف ولم يروه هكذا غير عَبْدُ الملك عن عطاء قاله الدارقطنى : (١ : ٦٤) وفى نصب الراية (١ : ٦٨) قال الشيخ تقى الدين فى الامام : وهذا سند صحيح وفى رواية الطحاوى

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ الْاِنَاءِ وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ اَوْالْهِرُّ قَالَ يُغْسَلُ ثَلَاثَ مِرَارٍ.

২. হযরত আতা (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যদি কুকুর পাত্রে লেহন করে তাহলে তন্মধ্যস্থ সবকিছু ফেলে দিবে এবং পাত্রটি তিনবার ধৌত করে নিবে।[৩৭]

ইমাম তাহাভী (র)-এর বর্ণনায়, আতা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবু হুরায়রা (রা)কে কুকুর অথবা বিড়ালের মুখ দেওয়া পাত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তিনবার ধৌত করতে হবে।[৩৮]

এত ছিল হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর ফাত্ওয়া। তিনি ব্যক্তিগত আমলও এ অনুযায়ী করেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো ঃ

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِىْ الْإِنَاءِ اَهْرَقَهُ غَسَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . رواه الدار قطنى واسناده صحيح اثار السنن (١٢:١١) قلت وروى الدار قطنى الطحاوى ذلك عن ابى هريرة ايضًا قولاً واسناده صحيح كمامر عن اثار السنن ايضًا.

৩. হযরত আতা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, কুকুর পাত্রে মুখ দিলে তিনি পাত্রস্থ বস্তু ফেলে দিয়ে পাত্রটি তিনবার ধৌত করতেন।[৩৯]

---

৩৭. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২, খণ্ড ১, পৃ. ২৮৮।

৩৮. ইমাম আবু জাফর তাহাভী : তাহাভী শরীফ : মাকতাবায়ে আশরাফিয়া : দেওবন্দ, অধ্যায়: তাহারাত: অনুচ্ছেদ: কুকুরের ঝুটা প্রসঙ্গে, খণ্ড ১, পৃ. ২১।

৩৯. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৫০, খণ্ড ১, পৃ. ২৯১; ইমাম আবু জাফর, তাহাভী শরীফ : মাকতাবায়ে আশরাফিয়্যা, দেওবন্দ, অধ্যায় : তাহারাত, পরিচ্ছেদ : কুকুরের ঝুটা প্রসঙ্গে, খণ্ড ১, পৃ. ২১; আল্লামা আবুল হাসান চাটগামী: তান্‌যীমুল আশ্‌তাত।

www.pathagar.com

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত এ সমস্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কুকুরের মুখ দেওয়া পাত্র তিনবার ধোয়া ওয়াজিব। এটিই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত।

তবে কোন কোন হাদীসে সাতবার, পাঁচবার ও আটবারের কথাও উল্লেখ আছে। তা মুস্তাহাব বলে বিবেচিত।

মোটকথা : تثليث অর্থাৎ তিনবার ধৌত করা ওয়াজিব।
تسبيع অর্থাৎ সাতবার ধোয়া মুস্তাহাব।

تثليث এর সমর্থনে বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ ও সমর্থন পাওয়া যায় বিধায় তাই গ্রহণযোগ্য ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত। নিম্নে সে সকল وجوه ترجيح এর দিক গুলো তুলে ধরা হলো।

১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে تثليث ও تسبيع উভয় রিওয়ায়েতই বর্ণিত আছে। অথচ তাঁর ব্যক্তিগত আমল ও ফাতওয়া হলো تثليث।

সুতরাং হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর আমল ও ফাতওয়া প্রমাণ করে যে, تثليث এর হাদীসটি সঠিক এবং প্রকৃতপক্ষে তিনবার ধোয়া ওয়াজিব। আর ততোধিক পাঁচবার বা সাতবার ধোয়া মুস্তাহাব।

দ্বিতীয় হাদীসটির উপর ইমাম দারা কুতনী (র) এমনটি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, এ রিওয়ায়েতটি আবদুল মালিক এককভাবে বর্ণনা করেন। এতে হাদীসের মান কমে যায়, তাতে হাদীসটির প্রামাণ্যতার দিক অতি ক্ষীণ সাব্যস্ত হয়।

ইমাম দারা কুতনীর উক্ত প্রশ্ন নিতান্তই গুরুত্বহীন। কেননা, আবদুল মালিক সর্বসম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য আর নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে বর্ণিত হাদীস মানগতভাবে উন্নত ও আমলী ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, اَلْعِبْرَةُ بِمَا رَوٰى لَابِمَا رَاٰى (যে রিওয়ায়েত করা হবে তাই গ্রহণযোগ্য। যা দেখা হবে তা নয়) এ মূলনীতি অনুযায়ী আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত تسبيع এর রিওয়ায়েতটি গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিৎ। তদুত্তরে বলা হবে, তিনি تثليث এর হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন এবং তদানুযায়ী ফাতওয়া প্রদান করেছেন। এতদার্থে যে, تثليث ওয়াজিব, পবিত্রতার জন্য তিনবার ধোয়াই যথেষ্ট। আর تسبيع মুস্তাহাব। তদানুযায়ী আমল না করলে অসুবিধা নেই।

এখানে হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (র) একটি প্রশ্ন দাঁড় করিয়েছেন যে, দারা কুতনীর মধ্যেই হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক تسبيع এর ফাতওয়া উল্লেখ রয়েছে। তার উত্তর হলো : تثليث এর ফাতওয়া ওয়াজিব আর تسبيع ফাতওয়া মুস্তাহাব। অতএব দুই রিওয়ায়েতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।[৪০] হযরত আতা ইবন ইয়াসার (র)-এর ফাতওয়া দ্বারা বুঝা যায় যে, পাঁচবার ও সাতবার ধৌত করার বিষয়টি অপরিহার্য নয় এবং এটি ইখতিয়ারী বিষয়। যেমন বর্ণিত আছে যে,

---

৪০. আল্লামা তাকী উসমানী : দরসে তিরমিযী : মাওলানা রশীদ আশরাফ সংকলিত, করাচী, মাকতাবা দারুল উলূম, অধ্যায় : তাহারাত, পরিচ্ছেদ: কুকুরের ঝুটা প্রসঙ্গে, খণ্ড ১, পৃ. ৩২৪।

www.pathagar.com

عَنْ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ يُغْسَلُ الْاِنَاءُ الَّذِىْ وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ؟ قَالَ : كُلُّ ذٰلِكَ سَمِعْتُ سَبْعًا وَخَمْسًا وَثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

ইবন জুরায়জ (র) বলেন, আমি আতা (র)কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কুকুরে মুখ দিলে এ পাত্র কতবার ধৌত করতে হবে? জবাবে তিনি বলেন, সাতবার, পাঁচবার এবং তিনবার সব কথাই আমি শুনেছি। উল্লেখ্য যে, সেই আতা যার থেকে تسبيع এর হাদীস বর্ণিত রয়েছে। যদি تسبيع ওয়াজিব হতো তাহলে তিনি তিনবার ধৌত করার ফাতওয়া দিতেন না।[৪১]

৩. تسبيع এর রিওয়ায়েত অনুযায়ী ওয়াজিবের হুকুম আরোপ করলে تثليث এর হাদীস অনুযায়ী আমল করা مَنْسُوْخ বা রহিত হয় অথচ تثليث এর হাদীস সনদের দিক থেকে বিশুদ্ধ ও যুক্তি সঙ্গত।

পক্ষান্তরে تثليث এর রিওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করলে تثليث এর হাদীস অনুযায়ী আমল রহিত হয় না। এতদার্থে যে تثليث ওয়াজিব আর تسبيع মুস্তাহাব।[৪২]

শরী'আতে কুকুরের ব্যাপারে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, تسبيع এর হাদীস تثليث দ্বারা منسوخ বা রহিত। কেননা, কুকুরের ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে। পরবর্তীতে তাতে কিছু শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়েছে। কঠোরতার সময় تسبيع এর হুকুম বিদ্যমান ছিল। আর সহজতার প্রাক্কালে تثليث এর বিধান আরোপিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

عَنْ عَبْدِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟ ثُمَّ رَخَّصَ فِىْ كَلْبِ الصَّيْدِ وَ كَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ اِذَ وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الْاِنَاءِ فَاغْسِلُوْاهُ سَبْعَةً مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةُ بِالتُّرَابِ (رواه مسلم اثار السنن ١ : ١١)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুকুর হত্যার ফরমান জারী করেন। অতঃপর বলেন, তাদের কি হলো এবং কুকুরের কি হলো? অতঃপর তিনি শিকার ও পাহারা দেওয়ার জন্য প্রতিপালন করার অনুমতি প্রদান করেন এবং বলেন, কোন পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত কর এবং অষ্টমবার মাটি দ্বারা ঘষা মাজা করে ধৌত করবে। এ হাদীসের আলোকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, تسبيع এর বিধান কুকুরের ব্যাপারে কঠোরতার বিধান আরোপের সাথে সম্পৃক্ত।[৪৩]

তাছাড়া উক্ত হাদীসে সাতবার ধৌত করার পর অষ্টমবার মাটি দ্বারা ঘষা মাজা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ অষ্টম বার মাটি দ্বারা ঘষা মাজা করা ওয়াজিব একথা কেউই

৪১. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩২৫।

৪২. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩২৫।

৪৩. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৪।

www.pathagar.com

বলেন না। নিয়ম তো ছিল, হাদীসে যা কিছু বর্ণিত থাকবে তদনুযায়ী আমল করা। আর এটাই হলো উত্তম।

কাজেই আবদুল্লাহ্ ইবন মুগাফ্‌ফাল (রা) এর হাদীস তদনুযায়ী আমল করা উচিত। অথচ এ হাদীসের উপর ওয়াজিব হিসেবে আমল করা হয় না বরং মুস্তাহাব হিসাবে আমল করা হয়। সুতরাং আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত تسبيع এর হাদীসের উপরও ওয়াজিব হিসাবে আমল করা হবে না বরং মুস্তাহাব হিসাবে করা হবে।[৪৪]

৫। কিয়াসের দাবীও হলো تثليث ওয়াজিব, تسبيع নয়। কেননা, নাজাসাতে গলীযা যা অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত থাকে। মানুষ স্বাভাবত ঘৃণা করে যেমন মলমূত্র ইত্যাদি এমনকি কুকুরের পেশাব পায়খানাও। এগুলো কোন পাত্রে লাগলে তা তিনবার ধৌত করলে পাত্রটি সর্বসম্মতিক্রমে পবিত্র হয়ে যায়।

তাহলে কুকুরের ঝুটা যা লঘু নাপাক এবং অন্যান্য নাপাকির ন্যায় ততটা ঘৃণিত নয় তাতে কোন পাত্র সাতবার ধোয়ার আবশ্যকতার বিষয়টি নিতান্তই যুক্তিহীন। কাজেই تسبيع মুস্তাহাব। যেহেতু কুকুরের লালায় বিষাক্ত জীবানু বিদ্যমান থাকে এবং তা কোন বস্তুতে লাগলে সহজে দূর হয় না। তাই বিষাক্ত পদার্থ নিশ্চিতভাবে বিদূরিত করার লক্ষ্যে হাদীসে সাতবার ধোয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এতুদ্দেশ্যেই সতর্কতা স্বরূপ মাটি দ্বারা ঘষা-মাজা করারও আদেশ দেওয়া হয়েছে।[৪৫]

আল্লামা ইবন রুশদ (র) 'বিদায়া' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, تسبيع এর হুকুম চিকিৎসা শাস্ত্রীয় নীতির ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। কুকুরের ঝুটা বা লালা নাপাক এ কারণে নয়, বরং কুকুরের বিষাক্ত লালা লেহনকৃত পাত্রের মধ্যে লেগে যাওয়ার দরুন তা উত্তমরূপে বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে تسبيع এর হুকুম প্রদান করা হয়েছে।

আর সাত এর সংখ্যাটি শরী'আতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে বহু জায়গায় প্রযোজ্য। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, কুকুরের লালার বিষাক্ত জীবাণু মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করলে অতি সহজেই দূর হয়ে যায়। তাই তো অনেক খৃস্টান চিকিৎসক ডাক্তারি গবেষণা মোতাবিক হাদীসের বর্ণিত হুকুমটি যথাযথ বলে স্বীকার করেছেন। কাজেই পবিত্রতার জন্য তিনবার ধোয়াই যথেষ্ট[৪৬] (ফাতহুল মুলহিম) মূল মাস'আলার প্রমাণে বর্ণিত প্রথম হাদীসটিকে দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করার জন্য কেউ কেউ নিরর্থক প্রয়াস চালিয়েছেন এ বলে যে, হাদীসটির রাবী হুসাইন ইবন আলী কারাবীসী একজন বিতর্কিত ব্যক্তি। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) তার তীব্র সমালোচনা করেন।

তাছাড়া উক্ত হাদীসটি কারাবীসী এককভাবে বর্ণনা করেন যা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য (ثقه) রাবীগণ বর্ণনা করেননি। কেননা তিনিই একমাত্র تثليث এর কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য রাবীগণ تسبيع এর কথা উল্লেখ করেছেন।

---

৪৪. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯২; তানযীমুল আশ্‌তাত, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯০; তাহাভী শরীফ, প্রাগুক্ত।

৪৫. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২৫-৩২৬।

৪৬. তানযীমুল আশতাত, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

অতএব হাদীসের সুনির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী কারাবীসীর হাদীস সহীহ্ হাদীসের মুকাবিলায় অগ্রহণযোগ্য। অতএব منكر এর হুকুমই ওয়াজিব বলে স্বীকৃতি পাবে।[৪৭]

এর উত্তর হলো, কারাবীসী একজন পরহেযগার, ইনসাফগার ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস তিনি হাদীসের ইমামরূপে খ্যাতি লাভ করেন। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ ইসমাঈল বুখারী ও দাঊদ যাহিরী প্রমুখ হাদীস বিশেষগণের উস্তাদ ছিলেন তিনি।[৪৮]

তাকরীবুত তাহযীব (৪১ পৃ) এ হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (র) বলেন তিনি, সত্যবাদী ও উঁচুমানের ব্যক্তিত্ব।[৪৯] তিনি 'লিসানের' মধ্যে ইবনে আদী (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কারাবীসী (র)-এর স্বরচিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে, তাতে তিনি ইখতিলাফ বিষয়ক প্রচুর হাদীস উল্লেখ করেছেন--আর এগুলো সবই তাঁর মুখস্থ ছিল।[৫০]

হাফেয ইবন হাজার আসকালানী (র) আরো বলেন,

وَ وَقَفْتُ عَلٰى كِتَابِ الْقَضَاءِ لِلْكَرَابِيْسِىْ فِى مُجَلَّد ضَغْمٍ فِيْهِ اَحَادِيْثُ كَثِيْرَةٌ وَاٰثَارَ وَمُبَاحِثُ مَعَ الْمُخَالِفِيْنَ وَفَوَائِدُ جَمَّةٌ تَدُلُّ عَلٰى سَعَةِ عِلْمِهِ وَتَبَحُّرِهِ ٠

আমি কারাবীসী (র)-এর মোটা ভলিয়মের 'আল-কাযা' কিতাবখানা দেখিছি, তাতে প্রচুর হাদীস ও আসার রয়েছে। আরো রয়েছে এতে মত বিরোধপূর্ণ অনেক মাসাইল। কিতাবটি নানা ধরনের ফায়দায় ভরপুর। গ্রন্থখানা প্রমাণ করে যে, তিনি একজন সুপণ্ডিত ও বিদগ্ধ আলিম ছিলেন।[৫১]

স্বয়ং ইমাম আহমাদ (র) বলেন لَهُ اَخْبَارٌ كَثِيْرَةٌ هُوَ حَافِظُهَا তাঁর অনেক হাদীস রয়েছে যা তাঁর পরিপূর্ণরূপে মুখস্থ ছিল।

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) যে কারণে কারাবীসীকে جرح করেছেন তা বাস্তবে جرح এর কারণ বলে সাব্যস্ত হতে পারেনা। কেননা তিনি একজন নির্ভরযোগ্য, শক্তিশালী عادل রাবী। বস্তুত কারাবীসী (র) খলকে কুরআনের মাস'আলা সম্পর্কে কৌশলগতভাবে একটি অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, لفظه بالقرآن অর্থাৎ "আক্ষরিক কুরআন আল্লাহ্র মাখলূক" এতে প্রতিপক্ষ তাঁর ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করে এবং তাঁর ক্ষতিসাধন করা থেকে বিরত থাকে। হয়ত ইমাম আহমাদ (র) এ বিষয়কে কেন্দ্র করেই তাঁর উপর جرح করেছেন। তকীউদ্দীন ইবন দাকীকুল ঈদ (র) বলেন, অনুরূপ ঘটনা ইমাম বুখারী (র) এর সাথে ঘটেছে বলেও বর্ণিত রয়েছে। তাতে ইমাম যুহালী ইমাম বুখারীকে আক্রান্ত করে جرح করেন যা কারো কাছে স্থান পায়নি। এবং কেউ এর গুরুত্বও দেয়নি।

৪৭, দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২৩।

৪৮. প্রাগুক্ত।

৪৯. প্রাগুক্ত।

৫০. ই'লাউস্ সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ২৮৯।

৫১. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ২৮৯।

www.pathagar.com

খলকে কুরআনের মাস'আলায় এ ধরনের পক্রিয়া ইমাম শাফিঈ (র) সহ আরো অনেকেই করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে কেউ সমালোচিত হননি। অতএব এ ধরনের জায়িয প্রক্রিয়ামূলক কর্মকে কেন্দ্র করে কারাবীসী (র)-কে আক্রান্ত করে তাঁর রিওয়ায়েতকে দুর্বল সাব্যস্ত করে রদ করা নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় অথচ হাদীসের মূল রাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর আমল ও ফাতওয়াও এর যথাযথ সমর্থন করছে।[৫২]

হাফিয ইবন আদী 'আল কামিল' গ্রন্থে উক্ত হাদীস উল্লেখ করার পর হাদীসটি সম্পর্কে যে মন্তব্য পেশ করেছেন তা হলো ঃ

لم يرفعه غير الكرابيسي والكرابيسي لم اجد له حَدِيْثًا مُنْكَرًا غَيْرَ هٰذَا

এ হাদীসটি কারাবীসী ব্যতীত অন্য কেউ মারফূরূপে বর্ণনা করেননি। এ হাদীস ছাড়া তার আর কোন হাদীস منكر রূপে আছে বলে আমার জানা নেই।

বুঝা যায় যে কারাবীসী (র)-এর রিওয়ায়াত তার নিকট অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।[৫৩]

অবশ্য হাফিয ইবন আদী (র)-এর উক্ত হাদীসকে মুনকার বলে আখ্যায়িত করা অনুচিত ও বেইনসাফী। কেননা মুনকার হাদীস বলা হয়, যে হাদীসের মধ্যে দুর্বল রাবী ثقة রাবীর বিপরীত কিছু উল্লেখ করেন।

ইতোপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে যে কারাবীসী (র) একজন শক্তিশালী ثقة রাবী। সুতরাং উক্ত হাদীসকে মুনকার কিভাবে বলা যেতে পারে? অবশ্য হাদীসটিকে شاذ (শায্) বলা যেতে পারে। কেননা এখানে এক ثقة রাবী অপর ثقة রাবীর বিপরীত বর্ণনা করেছেন। হাদীসের পরিভাষায় একেই শায্ বলা হয়।

এ কথা নিশ্চিত যে, কোন হাদীস শায হয়েও সহীহ হতে পারে। কেননা শায হাদীসের রাবী ثقة (নির্ভরযোগ্যই)। উসমানী (র) ফাতহুল মুলহিমের মুকাদ্দামায় হাফিয সাখাবী ও হাফিয ইবন হাজার আসকালানীর (র) বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত করেছেন। তার সারমর্ম হলো, শায্ হাদীস সহীহ হওয়ার পরিপন্থী নয়। তবে شاذ হওয়ার দরুন হাদীসটি স্থগিত থাকবে। পরবর্তীতে তার সমর্থনে কোন প্রমাণ যুক্তি এবং আমল পাওয়া গেলে তা গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় মূল বক্তব্যে কারাবীসী (র) রিওয়ায়েত শায্ এবং সহীহ। আর এর সমর্থনে অনেক যুক্তি প্রমাণ রয়েছে। খোদ মূল রাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর আমল এবং ফাতওয়া এর সমর্থন করে যা ইতোপূর্বে স্পষ্টাকারে বর্ণনা করা হয়েছে।[৫৪]

কিবলামুখী হয়ে পেশাব ও পায়খানা করা জায়িয নয়

কিবলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। অতএব কিবলার সম্মানের পরিপন্থী কার্যকলাপ পরিহার করে চলা আবশ্যক। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন, পায়খানা ও পেশাবের বিভিন্ন আদব রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো

৫২. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২৩।

৫৩. প্রাগুক্ত।

৫৪. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

কিবলার প্রতি সম্মান করত তার দিকে মুখ করে বা পিঠ দিয়ে না বসা।[৫৫] যেহেতু কিব্‌লার দিকে মুখ করে বা পিঠ দিয়ে বসে পেশাব ও পায়খানা করা তার সম্মানের পরিপন্থী এবং এক প্রকার বে-আদবী। তাই হানাফী ফকীহগণ একে মাকরূহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ হুকুমটি সমগ্র উম্মাতের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। আবাদীতে (ঘর বাড়ি দালান কোঠায়) হোক বা খোলা ময়দানে হোক অথবা কা'বার নিকটে হোক কিংবা দূরে হোক চাই কা'বা ও ব্যক্তির মাঝে কোন আড় থাকুক বা না থাকুক, সর্বাবস্থায় উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। তাতে কোন পার্থক্য হবেনা।[৫৬] একাধিক হাদীস থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

এ ক্ষেত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : إِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوْا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا . قَالَ اَبُوْ اَيُّوْبَ : فَقَدِمْنَا الشَّامَ ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةَ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ (رواه مسلم : ١/١٣٠)

হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন কখন তোমরা পায়খানায় আসবে তখন কিবলার দিকে মুখ করে বা পিঠ দিয়ে পেশাব ও পায়খানা করবে না, বরং তোমরা পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হয়ে পেশাব ও পায়খানা করবে। আবু আইউব (রা) বলেন, অতঃপর আমরা শামে (সিরিয়া) উপনীত হলাম, সেখানে দেখতে পেলাম যে, পেশাব পায়খানার ঘরগুলো কেবলামুখী করে বানানো। সুতরাং আমরা উক্ত স্থানে পেশাব পায়খানা করার সময় একটু মোড় দিয়ে বসতাম এবং আল্লাহ্‌র নিকট এ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম।[৫৭] (মুসলিম)

এ হাদীসের মধ্যে সর্বাবস্থায় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে পেশাব পখানা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

---

৫৫. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র), হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, মাকতাবা আশরাফিয়া দেওবন্দ, ভারত, বাব আদাবুল খালা, খণ্ড ১, পৃ. ১৮১।

৫৬. আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী ঃ দুররে মুখতার, এইচ. এম সাঈদ কোম্পানী করাচী পাকিস্তান অধ্যায় : তাহারাত, পরিচ্ছেদ ঃ নাপাক প্রসঙ্গে, অনুচ্ছেদ, ইস্তিঞ্জা, খণ্ড. ১, পৃ. ৫৭।

* ইবন আবেদীন শামী ঃ রাদ্দুল মুহ্‌তার, মাকতাবা যাকারিয়্যা, দেওবন্দ , ভারত, অধ্যায় ঃ তাহারাত অনুচ্ছেদ ইস্তিঞ্জা ঃ খণ্ড ১, পৃ. ৫৫৪

* বাদশাহ মুহিউদ্দীন আলমগীর ঃ ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, মাকতাবা রাশিদিয়্যা, কোয়েট, পাকিস্তান ঃ অধ্যায় ঃ তাহারাত ঃ তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিঞ্জা সম্পর্কে, খণ্ড ১, পৃ. ৫০। সূত্র ঃ

আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী ঃ মা'আরিফুস সুনান ; মাকতাবা আশরাফিয়া দেওবন্দ, ভারত, অধ্যায় : তাহারাত, অনুচ্ছেদ কিবলামুখী হয়ে পেশাব পায়খানা করার অবকাশ সম্পর্কে খণ্ড ১, পৃ. ৯৩।

৫৭. আল্লামা যফর আহ্‌মাদ উসমানী ঃ ই'লাইস সুনান, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামিয়্যাহ, অধ্যায় : তাহারাত ঃ অনুচ্ছেদ কেবলার দিকে মুখ বা পেঠ করে পেশাব পায়খানা করা নিষেধ, হাদীস নং ৪১৬ খণ্ড ১, পৃ. ৪২৪-৪২৫।

www.pathagar.com

বাহ্যত এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে উক্ত হুকুম মদীনা বাসীদের সাথে সম্পর্কিত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকেই লক্ষ্য করে বলেছেন (وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا) বরং তোমরা পূর্ব কিংবা পশ্চিমমুখী হয়ে পেশাব ও পায়খানা করবে।

প্রকৃটপক্ষে এ হুকুম গোটা বিশ্বের সমগ্র উম্মতের জন্য প্রযোজ্য কিন্তু যেহেতু মদীনাবাসীদের কিবলা দক্ষিণে অবস্থিত তাই তাদেরকে পূর্ব বা পশ্চিম মুখী হতে বলা হয়েছে। অতএব যাদের কিবলা পূর্ব বা পশ্চিমে তারা উত্তর দক্ষিণ হয়ে বসবে। অতএব وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا এর শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নয় বরং ব্যাপক অর্থ বুঝানোই উদ্দেশ্য অর্থাৎ কিবলার দিক ছাড়া অন্যদিকে মুখ করে পেশাব ও পায়খানা করবে।

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ اَبِىْ مَعْقِلِ الْاَسَدِىْ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ . رواه أبو داؤد (١ : ٧) وسكت عنه

২. হযরত মা'কিল ইবন আবু মা'কিল আল-আসাদী (রা) থেকে, বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) উভয় কিবলামুখী হয়ে পেশাব ও পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন।[৫৮]

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ اُعَلِّمُكُمْ فَاِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَلاَ يَسْتَطِبْ بِيَمِيْنِهِ ، وَكَانَ يَاْمُرُ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ وَّ يَنْهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ.

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেন, আমি ত তোমাদের জন্য পিতৃতুল্য। আমি (দীনের বিষয়সমূহ) তোমাদের কে শিক্ষা দিয়ে থাকি। অতএব তোমাদের কেউ যদি পায়খানায় যায় সে যেন কিবলার দিকে মুখ করে বা পিঠ দিয়ে না বসে। এবং ডান হাত দ্বারা যেন ইসতিনজা না করে। তাছাড়া তিনি আমাদেরকে তিনটি (পাথরের ঢেলার) সাহায্যে ইস্তিঞ্জা করার আদেশ দিতেন এবং সর্বপ্রকার নাপাক বস্তু ও জরাজীর্ণ হাঁড়ের দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতেও নিষেধ করতেন।

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيْلَ لَهُ لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَئٍ حَتّٰى الْخِرَاءَةَ؟ قَالَ : أَجَلْ ، لَقَدْ نَهَانَا ﷺ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ .

হযরত সালমান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাকে বলা হলো যে, নিশ্চয়ই তোমাদের নবী (সা) তোমাদেরকে সব কিছু শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এমনকি পায়খানা প্রস্রাবের রীতিনীতি সম্পর্কেও? তদুত্তরে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নবী কারীম (সা) আমাদেরকে কিবলামুখী হয়ে পেশাব ও পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন।

উপরোক্ত হাদীস সমূহে মাস'আলার ব্যাপারে ব্যাপক হুকুম প্রদান করা হয়েছে। তবে কোন কোন হাদীসে এর বিপরীত বক্তব্যও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এই হাদীসগুলো ব্যাপক নয়

৫৮. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪১৭ খ ১, পৃ. ৪২৫, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবন মাজাহ; সুনান ইবন মাজাহ শরীফ, দিল্লী, কুতুবখানায়ে রশিদিয়া অধ্যায় ঃ তাহারাত : বাব : কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে পেশাব পায়খানা করার নিষেধ, খ. ১, পৃ. ২৭।

www.pathagar.com

বরং বিশেষ কোন ঘটনা বা অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। এ সমস্ত হাদীস যথোচিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো ঃ

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَقِيْتُ يَوْمًا عَلٰى بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلٰى حَاجَتِهٖ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ . رواه الجماعة ، كذا فى نيل الاوطار (١ : ٧٨)

وَفِىْ فَتْحُ الْبَارِىْ (١-٢١٧) وللحكيم الترمذى بسند صحيح فرأيته فى كنيف وَقَالَ التِّرْمِذِىْ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১. হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি হাফসা (রা)-এর গৃহের উপরে উঠে দেখলাম যে, নবী কারীম শামের দিকে (বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতি) মুখ করে এবং কা'বার দিকে পিঠ দিয়ে পেশাব পায়খানা করছেন।[৫৯]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আবাদী তথা ঘর বাড়িতে কিবলার দিকে পিঠ করে বসা জায়িয। এর ভিত্তিতে কিবলামুখী হয়ে বসাও জায়িয হওয়ার কথা কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে এই হাদীসের প্রেক্ষিতে উক্ত বিষয়ের উপর استدلال করা ঠিক নয়। কেননা ঃ

(ক) উক্ত রিওয়ায়েতটি যদিও সহীহ্ তবে তা হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা)-এর হাদীসের তুলনায় নিম্ন পর্যায়ের, কাজেই এক্ষেত্রে আবূ আইউব আনসারী (রা)-এর হাদীসটিই গ্রহণযোগ্য।[৬০]

(খ) বাস্তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিবলার দিকে পিঠ করে বসেননি। বরং ইবন উমর (রা) দেখামাত্র লজ্জাবশত নিজ অবস্থা থেকে মোড় দিতে গিয়ে কিবলা তাঁর পিছনে পড়ে যায়। এতেই ইবন উমর (রা) বুঝেছিলেন যে, তিনি কিবলার দিকে পিঠ করে নিজ হাজতপূরণ করেন।[৬১]

(গ) রাসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্ণাকারে কিবলার দিকে পিঠ করেননি বরং কিছুটা অন্যদিকে মোড় দিয়ে বসেছিলেন ইবন উমর (রা) দূর খেকে তা ঠাওর করতে পারেননি। কিংবা এইটুকু মোড়কে মামূলী মনে করত কোন গুরুত্ব দেননি এবং একে নামাযের মধ্যে কিবলামুখী হওয়ার মাস'আলার সাথে কিয়াস করে বলেছেন যে, আমি তাকে কিবলার দিকে পিঠ করে বসে ইস্তিঞ্জা করতে দেখেছি।

---

৫৯. ই'লাউস সুনান, প্রগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৪২৫
১. ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন্ ঈসা ঃ সুনানে তিরমিযী, কুতুবখানায়ে রশিদিয়া, দিল্লী, ভারত, অধ্যায় : তাহারাত, অনুচ্ছেদ ঃ কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব পায়খানা করার অবকাশ প্রসঙ্গ, খণ্ড ১, পৃ. ৩।

৬০, আল্লামা তাকী উসমানী ঃ দরসে তিরমিযী ঃ রশিদ আশরাফ সাইফী সংকলিত, করাচী ঃ মাকতাবা দারুল উলূম, তাহারাত অধ্যায় : অনুচ্ছেদ : কিবলামুখী হয়ে পেশাব পায়খানা করা নিষেধ, খণ্ড ১, পৃ. ১৮৯।

৬১. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

(ঘ) এটা রাসূলুল্লাহ (সা) এর বৈশিষ্ট্য। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার আসকালানী ও আল্লামা ইবন আবেদীন শামী (র) প্রমুখ উলামায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মল-মূত্র-ঘাম ইত্যাদির পবিত্রতা বিভিন্ন দলীল দ্বারা প্রমাণিত করেছেন যে, তাঁর বৈশিষ্ট্য। অতএব রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ক্ষেত্রে কা'বার দিকে মুখ করা বা পিঠ দেওয়া মাকরূহ হবেনা। কেননা এতে কা'বা শরীফের সম্মান অক্ষুণ্ন থাকে।

(ঙ) রাসূলুল্লাহ (সা) কা'বা থেকে উত্তম ছিলেন, অতএব এরূপ করা তাঁর ক্ষেত্রে মাকরূহ নয়।

(চ) নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ করেছেন। কাজেই কোন আপত্তি নেই।

(ছ) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য (মূল কিবলা) অর্থাৎ কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে বা পিঠ দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা মাকরূহ হলেও ব্যাপকভাবে কেবলার দিকে মুখ করে বা পিঠ দিয়ে বসা মাকরূহ নয়। পক্ষান্তরে সমগ্র উম্মাতের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে ইস্তিঞ্জা করা মাকরূহ। ইবন উমরের হাদীস অনুযায়ী নবী কারীম (সা)-এর পিঠ কিবলার দিকে থাকলেও কা'বার দিকে ছিলনা। অতএব কোন দোষ নেই।[৬২]

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ مَرْوَانَ الْاَصْفَرِ قَالَ : رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُوْلُ اِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ ! أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْ هٰذَا ؟ قَالَ : بَلٰى وَاِنَّمَا نُهِىَ عَنْ ذٰلِكَ فِى الْفَضَاءَ فَاِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَىْءٌ يَسْتُرُكَ فَلاَ بَأْسَ .

হাসান ইবন যাকওয়ান (রা) বর্ণনা করেন, মারওয়ান আল-আসফার থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি হযরত ইবনে উমর (রা)-দেখিছি যে তিনি কিবলার দিকে মুখ করে তাঁর উটটি বসিয়ে পরে সে উটের দিকে মুখ করে পেশাব করেছেন। তখন আমি তাকে বললাম, হে আবূ আবদুর রহমান! কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব পায়খানা করার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়নি কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ ! তবে এ নিষেধাজ্ঞা খোলা মাঠের ব্যাপারে প্রযোজ্য। অতএব যখন তোমার ও কিবলার মাঝে আড় স্বরূপ কিছু থাকে সে অবস্থায় কোন দোষ হবে না।[৬৩]

এ হাদীস দ্বারাও বুঝা যায় যে, খোলা ময়দানে ইস্তিক্বাল استقبال। (কিবলামুখী হয়ে পেশার পায়খানা করা) ও ইস্তিদবার استدبار। (কিবলার দিক পিঠ করে পেশাব পায়খানা করা) জায়িয নেই। তবে ঘর বাড়িতে তার অবকাশ রয়েছে। এজন্য হানাফী ফকীহগণ এ হাদীসের ব্যাপারে কিছু সুচিন্তিত মতামত পেশ করেছেন।

১. আল্লামা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (র) বাযলুল মাজহূদে বলেন, এ হাদীসটি দুর্বল। কেননা এর ভিত্তিমূলে রয়েছে হাসান ইবন যাক্ওয়ান নামক একজন সমালোচিত রাবী, যাকে

---

৬২. বায্লুল মাজহূদ, প্রাগুক্ত; তানযীমুল আশতাত, প্রাগুক্ত।

৬৩. আবু দাউদ শরীফ, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ইয়াহইয়া ইবন মুঈন, ইমাম নাসাঈ, ইবন আদী এবং ইমাম আহমাদ (র) প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কিরাম দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

অতএব ইস্তিকবাল ও ইস্তিদ্‌বারের মাস'আলায় উক্ত হাদীস প্রমাণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য নয়।[৬৪]

২. এটি হযরত ইবন উমর (রা)-এর ব্যক্তিগত আমল। এটি সে সকল মারফূ' হাদীস সমূহের পরিপন্থী--যাতে খোলা ময়দান ও আবাদীর পার্থক্যের কথা উল্লেখ নেই। তাছাড়া কোন সাহাবীর ইজতিহাদ যখন তার বিপরীতে অন্যান্য সাহাবার বাণী ও আমল পাওয়া যায়। এবং যা মারফূ' ও বিশুদ্ধ হাদীসের পরিপন্থী হয় তখন তা হুজ্জত নয়। সর্বোপরি ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকেও ইবন উমর (রা)-এর উক্ত ইজতিহাদ অত্যন্ত দুর্বল বলে বিবেচিত। কেননা মাকরূহ হওয়া না হওয়ার বিষয়টি যদি ব্যক্তি এবং কা'বার মাঝে আড় থাকা না থাকার উপর ভিত্তি করে হয় তাহলে মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি শুধু হরম শরীফেই হতে পারে অন্য কোথাও নয়। কেননা ব্যক্তি যেখানেই থাকুক বিল্ডিং দেয়াল, বৃক্ষ পাহাড় ইত্যাদি কোন না কোন আড় তারও কা'বার মাঝে অবশ্যই বিদ্যমান আছে। অতএব মাকরূহও হবে না। কাজেই কেউ যদি হরমের বাহিরে অবস্থিত কোন খোলা ময়দানে কিবলামুখী হয়ে পেশাব পায়খানা করে তবে তা জাযির হওয়া উচিত। কেননা তার ও কা'বার মাঝে কোন না কোন আড় তো অবশ্যই আছে।[৬৫]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : نَهٰى نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَرَاَيْتُهُ قَبْلَ اَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا . رواه أبو داؤد والترمذى وغيرهما واسناده حسن ، شرح مسلم للنووى (١ : ١٣٠)

মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার-----------হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা) কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন, পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের এক বছর পূর্বে আমি তাকে কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব করতে দেখেছি।[৬৬]

বাহ্যিকভাবে এ হাদীসখানাও উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইস্তিকবালে কিবলা জায়িয।

ফুকাহায়ে কিরাম এ হাদীস সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা পেশ করেছেন।

১. অনেকে যদিও জাবিরের হাদীসকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু ইমাম বায্‌যার (র) বলেন আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানিনা। আবূ উমর 'তামহীদ' নামক গ্রন্থে বলেছেন।[৬৭] আহমদ ইবন হাম্বল (র) জাবির (রা)-এর উক্ত হাদীসকে প্রত্যাখান করেছেন।

---

৬৪. তানযীমুল আশ্‌তাত, প্রাগুক্ত; দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত; বাযলুল মাজহূদ (প্রাগুক্ত), আধ্যায় : তাহারাত অনুচ্ছেদ ঃ কিবলামুখী হয়ে ইস্তিঞ্জা করা মাকরূহ, খ. ১, পৃ. ৮।

৬৫. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১. পৃ. ১৯১; মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত।

৬৬. আবূ দাউদ শরীফ, প্রাগুক্ত।

৬৭. তানযীমুল আশতাত, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১. পৃ. ১৩৯।

www.pathagar.com

এ হাদীসের সনদে দুইজন রাবী এমন রয়েছেন যারা বিতর্কিত ১. আবান ইবন মালিহ ২. মুহাম্মদ ইবন ইসহাক। আল্লামা ইবন হায্‌ম (র) বলেছেন, আবান ইবন মালিহ অজ্ঞাত (مجهول) তিনি রাবী হিসাবে দুর্বল হওয়ার ভিত্তিতে আল্লামা ইবন আবদুল বার্‌র 'তামহীদ' গ্রন্থ উক্ত হাদীসকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী (র) বলেন, তার কথা দ্বারা হুজ্জত পেশ করা যাবেনা।

সুলাইমান তাইমী (র) বলেন, সে মারাত্মক মিথ্যুক।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, সে মুনকার হাদীস বর্ণনায় অভ্যস্ত। ইমাম মালিক (র) বলেছেন, আমাকে যদি হাজার আসওয়াদ এবং বায়তুল্লার দরজার মধ্যখানে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় তখনও আমি বলব সে বড় মিথ্যাবাদী ও ধোঁকাবাজ।

এ সকল কারণে হাদীসটির সনদে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই সংশ্লিষ্ট মাস'আলার ক্ষেত্রে এ হাদীস প্রমাণযোগ্য হতে পারে না। তবে সার্বিক দিকে লক্ষ্য করলে মূলত এ হাদীসটি দুর্বল নয় বরং তা হাসান ও সহীহ। কেননা আবান ইবন মালিক (র)-কে হাফিয ইবন আবদুল বারর এবং আল্লামা ইবন হায্‌ম (র) ব্যতীত অন্য কেউ جرح করেনি। এদের পূর্বে কেউ তার সমালোচনা করেননি। এজন্যই মুহাক্কিক উলামায়ে কিরাম বলেন, তার উপর جرح করা তাদের গাফলতীর কারণেই হয়েছে।

বাকী রইলেন মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) তিনি যদিও একজন সমালোচিত ও বিতর্কিত ব্যক্তি। কিন্তু অনেকে তার প্রশংসা ও করেছেন এবং তার নির্ভরযোগ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন। হযরত শু'বা তার সম্পর্কে বলেন, তিনি 'আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস'। মোট কথা মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র)-কে কেউ কেউ দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ তাকে শক্তিশালীও নির্ভরযোগ্য রাবী বলেও ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী(র) তার সম্পর্কে একটি সূক্ষ্ম ও সুন্দর ফায়সালার প্রতি নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, আসলে মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র)-এর শ্রবণশক্তি ও মুখস্থ শক্তি দুর্বল ছিল। তবে আদালতের দিক থেকে তিনি ছিলেন একজন গ্রহণযোগ্য। অতএব তিনি হাসান হাদীসের রাবীদের অন্তর্ভূক্ত। অবশ্য হাদীসের ক্ষেত্রে তার تدليس কারার অভ্যাস আছে। এ জন্য যে সকল হাদীস তিনি عن দ্বারা বর্ণনা করবেন তা সন্দেহযুক্ত বলে গণ্য হবে। অনেকে তার ব্যাপারে এ উক্তিও পেশ করেছেন যে, যে হাদীস তার থেকে حدثنا এর সাথে বর্ণিত হবে তা গ্রহণযোগ্য হবে, আর যা عن এর সাথে বর্ণিত হবে (যাকে হাদীসে মু'আনআন বলা হয়) তা গ্রহণযোগ্য নয়। উক্ত হাদীস তিরমিযী, আবূ দাউদ ও অন্যান্য কিতাবে যদিও عن দ্বারা বর্ণিত রয়েছে। তবে দারা কুতনীতে এ হাদীসটি حدثنا দ্বারা বর্ণিত আছে। এ কারণেই ইমাম তিরমিযী (র) উক্ত হাদীসকে হাসান বলে স্বীকৃত দিয়েছেন। ইমাম তিরমিযী (র) কর্তৃক রচিত ইলালে কাবীরে উল্লেখ আছে যে,

سألت محمد بن أسماعيل عن هذا الحديث فقال صحيح

আমি মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (বুখারী)-এর নিকট এ হাদীস সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি উত্তরে বললেন, হাদীসটি সহীহ্। হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (র) 'তালখীসুল হাবীর' হাদীসটি তাফসীলের সাথে বর্ণনা করেন। তথায় তিনি হাদীসটির গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত করেছেন।

www.pathagar.com

কাজেই সনদের দিক থেকে হাদীসটি একেবারে ফেলে দেবার মত নয়। সর্বোপরি এ হাদীসের ক্ষেত্রে ঐ সকল ব্যাখ্যা প্রযোজ্য যা ইতোপূর্বে হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটির ক্ষেত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।[৬৮]

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِىْ الصَّلْتِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَوْمٌ يَكْرَهُوْنَ اَنْ يَّسْتَقْبِلُوْا بِفُرُوْجِهِمُ الْقِبْلَةَ فَقَالَ اَرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوْاهَا اسْتَقْبِلُوْا بِمَقْعَدَتِىْ الْقِبْلَةَ .

আবু বকর ইবন আবু শায়বা---------হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এক কাওম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো যারা নিজেদের লজ্জাস্থানসহ কিবলামুখী হওয়াকে মাকরূহ মনে করে। তখন তিনি বললেন, আমার মনে হয় তারা এরূপে করেছে। অতএব তোমরা আমার আসনটি কিবলামুখী করে দাও।[৬৯]

এ হাদীসের আলোকে কেউ কেউ এ উক্তি করেছেন যে, কিবলার দিকে মুখ করে বা পিঠ করে পেশাব পায়খানা করা জায়িয। পক্ষান্তরে বিষয়টি এমন নয়।

তাই তা হানাফী ফকীহগণ এর যুক্তি সিদ্ধ ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন ঃ

১. হাদীসটি সনদ এবং মতন (মূলপাঠ) উভয়টি বিতর্কিত। আল্লামা যাহাবী (র) নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি কারণে এ হাদীসকে মুনকার বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ক. এ হাদীসের সনদে اضطراب রয়েছে। এক সনদে আছে عن خالد الحذاء عن عراك بن مالك عن عائشة আরেক সনদে আছে عن خالد الحذاء عن رجل عن عراك عن عائشة অন্য সনদে عن خالد الحذاء عن خالد بن أبى الصلت عن عراك عن عائشة

খ. সনদের একজন রাবী হলেন, খালিদ ইবন আবু সাল্‌ত। আল্লামা ইবন হায্‌ম (র) তাকে مجهول রাবী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

গ. ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইরাক ইবন মালিক (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন তার প্রমাণ নেই। এ কারণেই ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) হাদীসটিকে معلول গণ্য করেছেন।[৭০]

এছাড়া, মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসটিকে مَوْقُوْف (মাওকূফ হাদীস) বলে অভিহিত করেছেন। তাই তো ইবন আবু হাতিম (র) জাফর ইবন রাবিয়াহ ইরাক ইবন মালিক থেকে তিনি আয়েশা (রা) থেকে হাদীসটিকে মাওকূফ রূপে বর্ণনা করেন[৭১]

৬৮. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১. পৃ. ১৯৩।

৬৯. সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ, প্রাগুক্ত।

৭০. তানযীমুল আশতাত, প্রাগুক্ত; দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত; মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ১০১।

৭১. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

সারকথা হলো এ হাদীসটি কারো মতে মুনকার, কারো মতে মুনকাতি', আবার কেউ বলেন মাওকূফ। পক্ষান্তরে আবু আইউব আনসারী (র) আবূ হুরায়রা এবং সালমান ফারসী (র) বর্ণিত প্রমুখের হাদীসগুলী সহীহ মারফূ' ও মুত্তাসিল।

অতএব উক্ত হাদীসটি এই সকল হাদীসের মোকাবিলায় অতি নিম্ন পর্যায়ের বিধায় তা আমলযোগ্য নয়।[৭২]

২. হাদীসটির আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে তা হযরত আইউব (রা)-এর হাদীসের পূর্বেকার সময়ের সাথে সম্পর্কিত। কেননা যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কিছু সাহাবী সম্পর্কে-এ মর্মে আলোচনা করা হলো যে তারা লজ্জাস্থানসহ কিবলামমুখী হওয়াকে মাকরূহ মনে করে তখন তাদের এ কাণ্ড শুনে তিনি আশ্চার্যান্বিত হলেন। যদি এ ঘটনার পূর্বে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হত তাহলে আশ্চার্যান্বিত হওয়ার অর্থ থাকেনা। অতএব আবূ আইউব আনসারী (রা)-এর হাদীস দ্বারা উক্ত হাদীস মানসূখ হওয়ার বিষয়টি অনেকটা বিবেক সম্মত।[৭৩]

হযরত মা'কিল ইবন মা'কিল আল-আসাদী (রা)-এর বর্ণনায় قبلتين দুই কিবলার কথা উল্লেখ রয়েছে। এতে অনেকে বলেন, যে কা'বার ন্যায় বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকেও মুখ বা পিঠ করে পেশাব পায়খানা করা মাকরূহ। অথচ হুকুমটি শুধু কা'বা শরীফের সাথেই সম্পর্কিত। তাই অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরাম বলেন যে, এখানে একই সময় দুই কিবলা উদ্দেশ্যে নয় বরং যেটা কিবলা হিসাবে গণ্য হয়েছে অন্য সেই কিবলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার বিষয়টি ধর্তব্য ছিল অর্থাৎ একই সাথে উভয় কিবলার প্রতি ইস্তিকবাল ও ইস্তিদবার কখনো নাজায়িয ছিলনা। যখন বায়তুল মুকাদ্দাস কিবলা ছিল তখন তার ইস্তিকবাল ও ইস্তিদবার মাকরূহ ছিল। আবার যখন থেকে কা'বা শরীফ কিবলা হলো তখন তার ইস্তিকবাল ও ইস্তিদবারের প্রতিও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

অনেকে বলেছেন, এই হাদীসটি খাস করে মদীনা বাসীদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কেননা মদীনার অবস্থান এরূপ যে, যে ব্যক্তি বায়তুল মুকাদ্দিসের দিকে মুখ করলে কা'বার দিকে পিঠ হয়। অতএব মদীনাবাসীদেরকে যদি বাইতুল মুকাদ্দিসের ইস্তিকবাল ও ইস্তিদবারে অনুমতি প্রদান করা হয় তালে এতে কা'বা শরীফের প্রতিও ইস্তিকবাল বা ইস্তিদবার করা সাব্যস্ত হয়। এ কারণে তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা উভয় কিবলার কোনটির দিকেই মুখ বা পিঠ করে বসোনা।[৭৪]

অতএব যেখানে এরূপ অবস্থা না হবে সেখানের লোকদের জন্য শুধু কা'বার ইস্তিকবাল ও ইস্তিদবার করা মাকরূহ হবে। এটাই হলো নিষেধাজ্ঞা আরোপের মূখ্য উদ্দেশ্য।

হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা)-এর রিওয়ায়েতটি অন্যান্য হাদীস সমূহের মোকাবিলায় অধিক প্রাধান্য এবং অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বিধায় হানাফী ফকীহগণ এরই উপর ভিত্তি করে আলোচিত মাস'আলা উম্মতের সম্মুখে পেশ করেন। নিম্নে হাদীসটির প্রাধান্য দেওয়ার কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হল যারা হানাফী মাস'আলা বা পূর্ণভাবে হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয় বলে প্রতীয়মান হয়।

---

৭২. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১. পৃ. ১৯৪।

৭৩. প্রাগুক্ত।

৭৪. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

১. মুহাদ্দিসীনে কিরামের সর্বসম্মত অভিমত অনুসারে হাদীসটি সনদের দিক থেকে অপরাপর সমুদয় হাদীসের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধতম ও অত্যন্ত স্পষ্ট।[৭৫]

২. হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা)-এর হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা, সালমান ফারসী এবং সাহল ইবন হুনাইফ (রা) প্রমুখের হাদীস দ্বারা সমর্থিত যা বিপরীত হাদীস গুলোতে পরিলক্ষিত হয় না।[৭৬]

৩. হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা)-এর হাদীস একটি পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক বিধান সম্বলিত হাদীস। পক্ষান্তরে অপরাপর হাদীসসমূহের প্রত্যেকটি বিশেষ ঘটনা বা অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। মহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট এ নিয়মটি প্রচলিত আছে যে, তারা ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ অর্থবোধক হাদীসকে অন্য হাদীসের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কাজেই এই হাদীসকে প্রাধান্য দেওয়া চাই।

৪. হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা)-এর হাদীসটি (قــولى) মৌখিক হাদীস আর এর বিপরীত হাদীসগুলো (فعلى) কার্যমূলক হাদীস।

নিয়ম আছে যে মৌখিক এবং কার্যমূলক হাদীসের মধ্যে কোন ইখতিলাফ বা বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হলে তখন মৌখিক হাদীস প্রাধান্যপ্রাপ্ত হয়। কাজেই আবূ আইউব (রা)-এর হাদীসটি প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

৫. হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা)-এর হাদীসটি مُحَرِّمْ মুহাররিম-হারাম বা অবৈধতার হুকুম সম্বলিত। আর বিপরীত হাদীগুলো مُبِيْح (মুবীহ) অর্থাৎ হালাল বা বৈধতার বার্তা বা কর্ম নির্দেশ সম্বলিত। দ্বন্দ্ব নিরসনের আরেকটি কায়দা হলো যে, মুহাররিম ও মুবীহের মাঝে ইখতিলাফ দেখা দিলে মুহাররিম হাদীস প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়।

৬. হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা) হাদীস আলোচ্য মাস'আলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন।

পক্ষান্তরে এর বিপরীত হাদীস সমূহ অস্পষ্ট ও সম্ভাবনাময়। কাজেই উক্ত হাদীসকেই ترجيح দেওয়া উচিত।

৭. হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা)-এর হাদীস কুরআনী উদ্দেশ্যের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ যা এর বিপরীত হাদীসসমূহে পরিলক্ষিত হয় না। কেননা কুরআনে কারীমের কিছু আয়াত আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং সে সম্মান প্রদর্শনকে অন্তরের তাক্ওয়ার আলামত হয়ে বলে ঘোষাণা দেওয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ۔

আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এতো তার হৃদয়ের তাক্ওয়া সঞ্জাত। (সূরা হাজ্জ ঃ ৩০) অন্যত্রে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌلَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۔

৭৫. মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৯৬; দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৮।

৭৬. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

"এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র প্রতীকগুলোর সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট ইহাই তার জন্য উত্তম।"

৮. হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা)-এর হাদীসটি কিয়াস দ্বারাও সমর্থিত। কেননা সহীহ ইবন খুযাইমা এবং সহীহ ইবন হিববানে এ মর্মে একটি সহীহ ও মারফূ' হাদীস বর্ণিত আছে যে,

مَنْ تَفَلَ تِجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ .

"যে ব্যক্তি কিবলার দিকে থুথু ফেলবে সে তার চক্ষুদ্বয়ের মাঝে থুথু নিয়ে কিয়ামতের দিবসে হাজির হবে।"

অত্র হাদীসে কিবলার দিকে থুথু ফেলার বিষয়টিকে মারাত্মকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এতে কোন স্থান আবাদী বা খোলা ময়দান ইত্যাদির পার্থক্য করা হয়নি। তাহলে কিবলার দিকে মুখ করে পেশা পায়খানা করার বিষয়টি এর চেয়েও মারাত্মক হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

www.pathagar.com

ইস্তিঞ্জায়[১] তিন ঢেলা ব্যবহার করা সুন্নাত

পেশাব বা পায়খানার পর যথানিয়মে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে ফকীহগণের কারো দ্বিমত নেই। পরিচ্ছন্নতা অর্জন ব্যতিরেকে নামায সহীহ্ হয় না। নিয়ম হল, পেশাবের পর পুরুষ পেশাবের ফোটা বন্ধ হয়েছে মর্মে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত ঢেলা কুলুখ ধরে রাখবে। তারপর পানি ব্যবহার করবে। আর পায়খানার পর পুরুষ ও মহিলা উভয়ে তিনবার ঢিলা কুলুখ[২] ব্যবহারের পর পানি ব্যবহার করবে। ইস্তিঞ্জায় মলদ্বার পরিচ্ছন্ন করা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে তিন ঢেলা ব্যবহার করা সুন্নাত। কখনো তিন ঢেলায় পরিচ্ছন্নতা অর্জিত না হলে ঢেলার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এ পর্যায়ে ঢেলার সংখ্যা বেজোড় সংখ্যক হওয়া মুস্তাহাব। ঢেলা ব্যবহারের পর সাধারণ অবস্থায় পানি দ্বারা ধৌত করা সুন্নাত। কিন্তু কখনো যদি নাপাকী এক দিরহাম (হাতের তালুর নিচ স্থান সমপরিমাণ বিস্তৃত)-এর বেশী পরিমাণ ছড়িয়ে পড়ে সে ক্ষেত্রে ঢেলার পর পানিও ব্যবহার করা ওয়াজিব। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, সাধারণ অবস্থায় ইস্তিঞ্জায় গুহ্যদ্বার ও নির্গমনস্থল পরিচ্ছন্ন করা ওয়াজিব। আর ঢেলার সংখ্যা তিনটি হওয়া ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নাত।

ওয়াজিব না হওয়ার পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস লক্ষণীয় ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَحَرَجَ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَّ فَلاَ حَرَجَ ، وَمَنْ اَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَا لاَكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ ، وَمَنْ اَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ

---

১. ইস্তিঞ্জা শব্দটি نجـو থেকে গৃহীত হয়েছে। অর্থ হল, মলমূত্র ত্যাগের পর সৌচ করা, ঢেলা ব্যবহার করা। হাদীসে একই অর্থে আরো দু'টি শব্দ ইস্তিজমার ও ইস্তিতাবাহ্-এর ব্যবহারও পাওয়া যায়। শায়খ ইউসুফ বিন্নৌরী (র) বলেন,

ورد الحديث بلفظ الاستجمار وهو طلب الجمرة وبلفظ الاستطابه وهو طلب الطيب وهو الطهارة وبلفظ الاستنجاء وهو طلب موضع النجواى القطع يعنى قطع الاذى والخبث كما فى شرح المهذب وعمدة القارى وقال الشيخ النجو فى الاصل هو ما يخرج من السبع ثم اتسع فاطلق على مطلق ما يخرج فالاستنجاء هو طلب النجواى طلب العزرة ليزيلها وينقيها ولا يخفى حسنه ، كما فى معارف السنن ج :١١٨

২. ইমাম দাউদ যাহিরীর মতে ঢেলা বলতে শুধু পাথর খণ্ডকে বুঝাবে। এক্ষেত্রে অন্য কিছু প্রজোয্য হবে না। কিন্তু ইমাম চতুষ্টয়ের মতে পাথর কিংবা পোড়া মাটি বা এ জাতীয় এমন কোন জিনিস যা নিজে পাক; যা মানুষ কিংবা কোন জীব-বস্তুর আহার্য নয়, যা নাপাকী দূর করতে সক্ষম এসবই ঢেলা হিসাবে গ্রহণযোগ্য। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী, খ. ১, পৃ. ৭৩০-৭৩৩।

www.pathagar.com

فَانْ لَّمْ يَجِدْ الاَّ اَنْ يَّجْمَعَ كَعِيْبًا مِّنْ رَحْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَانَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمُقَاعِدِ بَنِىْ اٰدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ . رواه أبو داؤد وقال رواه أبو عاصم عن ثور قال حصين الحميرى قال ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال سعيد الخير

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সুরমা লাগাবে সে যেন বেজোড় সংখ্যায় (তিন/পাঁচ বার) সুরমা লাগায়। যে এমনটি করল সে ভাল কাজ করল। অন্যথায় তার কোন দোষ নেই। যে ব্যক্তি ইস্তিঞ্জা করবে সে যেন বেজোড় সংখ্যায় ইস্তিঞ্জা করে। যে এরূপ করল সে ভাল করল অন্যথায় তার কোন দোষ নেই। যে ব্যক্তি মুখে খাদ্য গ্রহণ করে খিলাল দ্বারা দাঁতের ফাঁক থেকে কিছু বের করে তবে সে বাইরে ফেলে দিবে। আর যে খাদ্য কণা সে তার জিহ্বায় দ্বারা সঞ্চালণ করে তা গিলে ফেলবে। যে এরূপ সে ভাল করল। অন্যথায় তার কোন দোষ নেই। যে ব্যক্তি ইস্তিঞ্জাখানায় পৌঁছবে সে যেন নিজকে যথাসাধ্য আড়াল করে নেয়। আর যদি আড়াল করার মত কিছু না পায় তাহলে সে বালুর স্তুপ জমা করে সেদিকে পিঠ দিয়ে বসবে। শয়তান (বেপর্দার সুযোগে) বণী আদমের নিতম্ব নিয়ে খেলা করে। আদেশটি যে পালন করবে ভাল, অন্যথায় কোন আপত্তি নেই।[৩]

উল্লেখিত হাদীস প্রমাণ করে যে, ইস্তিঞ্জায় ব্যবহৃত ঢেলার সংখ্যা তিন, পাঁচ যাই হোক বেজোড় হওয়া ভাল। এ সংখ্যার ঠিক রাখা ইখতিয়ারী বিষয়। ওয়াজিব-আবশ্যকীয় বিষয় নয়।[৪] ওয়াজিব নয় বিধায় প্রিয়নবী (সা) বাক্যের শেষাংশে স্পষ্ট বলে দেন যে, বেজোড় সংখ্যা রক্ষা করা না গেলে কোন দোষে নেই। উল্লেখ্য যে, কোন ওয়াজিব বিধানের ক্ষেত্রে এ ধরনের অবকাশ দেওয়া হয় না।–এটিই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও হানাফী ফকীহগণের অভিমত।[৫]

এ ব্যাপারে আরো কয়েকখানা হাদীস লক্ষ্য করা যেতে পারে। যেমন ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ قَالَ اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ لِتَطِيْبُ بِهِنَّ فَانَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন ইস্তিঞ্জাখানায় যাবে তখন সে যেন নিজের সঙ্গে তিনটি ঢেলা নিয়ে যায়।

৩. ইমাম আবূ দাঊদ, আস সুনান, দেওবন্দ ঃ মুখতার এণ্ড কোম্পানী, ১৯৮৫, কিতাবুত তাহারাত, বাবুল ইসতিতার ফিল খালা, খ. ১, পৃ. ৬। হাদীসখানা সুনান ইবন মাজা, দারা কুতনী, মুস্তাদরাকে হাকিম, সুনানে বায়হাকী, সহীহ ইবন হিব্বান, তাবারানী ইত্যাদি কিতাবেও বর্ণিত হয়েছে।

৪. শায়খ মুহাম্মদ আবুল হাসান, তানযীমুল আশতাত, চট্টগ্রাম, দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম, ১৯৮২, খ. ১, পৃ. ১৪২।

৫. শায়খুল ইসলাম মুরগীনানী, আল-হিদায়া, দেওবন্দ, কুতুবখানা রশীদিয়্যা, তা. বি. খণ্ড ১, পৃ. ৬২।

www.pathagar.com

এগুলোর দ্বারা সে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করবে। এ সংখ্যক ঢেলা তার প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হবে।[৬] (ঐ)

عَنْ اَبِیْ اَیُّوْبَ الْاَنْصَارِیِّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَغَوَّطَ اَحَدُكُمْ فَلْیَمْسَحْ بِثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ فَاِنَّ ذَالِكَ كَافِیَةٌ ، رواه الطبرانی فی الكبیر والأوسط ورجاله موثقون الا ان ابا شعیب صاحب أبی أیوب لم ارفیه تعدیلاً ولا جرحًا . (فجمع الزوائد ١ : ٨٦) قال العثمانی ومثله یحتج به عندنا وعند الكل ، (اعلاء السنن . ج : ١ ، ص : ٣٠٩)

হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন ইস্তিঞ্জার জন্য যাবে তখন সে যেন তিন ঢেলার সাহায্যে মলদ্বার মুছে নেয়। এই তিন ঢেলাই তার কাজের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হবে।[৭]

উপরোক্ত হাদীসখানাও প্রমাণ করে যে, ঢেলার সংখ্যা তিনটি হওয়া ওয়াজিব নয় বরং যথেষ্ট বিবেচিত হওয়ার সংখ্যা।

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ یَقُوْلُ اَتَی النَّبِیُّ ﷺ الْغَائِطَ فَاَمَرَنِیْ اَنْ اٰتِیَهٖ بِثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَیْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ اَجِدْهُ فَاَخَذْتُ رَوْثَةً فَاَتَیْتُهٗ بِهَا ، فَاَخَذَ الْحَجَرَیْنِ وَاَلْقَی الرَّوْثَةَ وَقَالَ هٰذَا رِكْسٌ . رواه البخاری .

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মহানবী (সা) ইস্তিঞ্জার জন্য আসলেন। নবীজী (সা) তখন আমাকে তিনটি ঢেলা এনে দিতে আদেশ করলেন। আমি (খুঁজে) দু'টি ঢেলা পেলাম। আরেকটি (তৃতীয়টি) অনেক খুঁজেও সংগ্রহ করতে পারলাম না। ফলে অবশেষে একখানা গোবর এনে তাঁকে দিলাম। অতঃপর তিনি ঢেলা দু'টি গ্রহণ করলেন আর গোবরের টুকরাটি ফেলে দিয়ে বললেন, এটি নাপাক।[৮]

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস প্রমাণ করছে যে, প্রিয়নবী (সা) তখন মাত্র দু'টি ঢেলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করেছেন। তাঁর এ আমল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইস্তিঞ্জায় ঢেলার সংখ্যা

---

৬ সুনানে আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬; হাদীসখানা সুনানে ইবন মাজা, দারা কুতনী প্রভৃতি গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম দারা কুতনী হাদীসটির সনদ সম্পর্কে মতামত দিয়ে লিখেছেন, هذا اسناد صحیح এটি একটি বিশুদ্ধ সনদ।

৭. আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, তাহারাত অধ্যায়, তাসলীমুল আহজার ওয়া ইতারুহা অনুচ্ছেদ, করাচী, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামী, ১৪১৫ হি. খণ্ড, ১, পৃ. ৩০৯।

৮. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ, কিতাবুল অযূ, বাব, লা ইউসতানজা বিরাওছিন, দিল্লী ঃ কতুবখানা রশীদিয়্যা, খণ্ড ১, পৃ. ২৭।

www.pathagar.com

তিনটি হওয়া ওয়াজিব নয় এবং তিনি যে, তিনটি ঢেলা আনার আদেশ দিয়ে ছিলেন সেটিও ওয়াজিব পর্যায়ের নির্দেশ ছিল না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাভী (মৃ. ৩২১ হি.) বলেন, ইস্তিঞ্জায় ঢেলার সংখ্যা তিনটি হওয়া শর্ত নয়। যদি শর্ত হত তাহলে প্রিয়নবী (সা) গোবরটি ফেলে দেওয়ার পর তৃতীয় অপর একটি ঢেলা এনে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতেন। মুসনাদে ইমাম আহমাদ গ্রন্থে বর্ণিত একখানা হাদীসে (ائتنى بحجر) (আমাকে আরেকটি ঢেলা এনে দাও) মর্মে বর্ণনা[৯] পাওয়া গেলেও এই বর্ণনার সনদ গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া এ বর্ণনা গ্রহণ করা হলেও হযরত ইবনে মাসউদ (রা) নবীজীকে তৃতীয় একটি ঢেলা এনে দিয়েছেন মর্মে কোন বর্ণনাই পাওয়া যায় না। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, নবীজী (সা) দু'টি ঢেলা দ্বারাই পরিচ্ছন্নতা অর্জন করেছিলেন।

হানাফী ফকীহগণ আরো বলেন, যে, কেউ যদি একাধিক কোণ বিশিষ্ট একটি বড় ঢেলায় তিনটি কোণ দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে তাহলে ফুকাহায়ে কিরামের সকলের মতেই ইস্তিঞ্জা দুরস্ত হয়ে যাবে।[১০] যদি তাই হয়, তাহলে ঢেলাকে তিন এর সাথে আবশ্যকীয় ঘোষণার কোনই অর্থ থাকে না।

ইমাম তাহাভী (র) আরো যুক্তি প্রদর্শণ করে বলেন, পায়খানা বা পেশাব পানি দ্বারা ধৌত করার পরেও যদি এর রং কিংবা গন্ধ বিদূরিত না হয় তাহলে পুনর্বার ধুইতে হয়। যদি তাতেও বিদূরিত না হয় তাহলে আবারো ধুইতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত পেশাব পায়খানার চিহ্ন, রং কিংবা দূর্গন্ধ বিদূরিত না হয়। বুঝা গেল যে, এখানে বিশেষ কোন সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল পরিচ্ছন্ন করা। ঢেলা গ্রহণের বিষয়টিও তদ্রুপই। বিশেষ কোন সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল পরিচ্ছন্নতা অর্জন। আর এ কারণে বিশেষ কোন সংখ্যাকে ওয়াজিব বলার সুযোগ নেই।[১১]

---

৯. ইমাম বায়হাকী (র) বলেন; আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস মুসনাদে আহমদ, দারা কুতনী প্রভৃতি গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে। সেখানে عبد الرزاق عن معمر عن ابى اسحاق عن علقمه عن عبد الله সনদে فانها ركس বাক্যের পর বলা হয়েছে যে, নবী (সা) তখন বলেছেন, ائتنى بحجر। ফলে বুঝা যায় যে, নবী (সা) দু'টি ঢেলার উপর ক্ষান্ত হননি। আল্লামা আইনী (র) 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থে এবং হাফিয জামালুদ্দীন যায়লাঈ (র) 'নসবুর রায়া' গ্রন্থে বলেন, মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে বর্ণিত উপরোক্ত বর্ধিত অংশের সনদ নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ বর্ণনাকারী আবূ ইসহাক নিজের উস্তায হিসাবে হযরত আলকামার নাম উল্লেখ করছেন। অথচ আবূ ইসহাকের سماع আলকামা থেকে প্রমাণিত নয়। হাফিয যায়লাঈ (র) বলেন, ইমাম বায়হাকী (র) এ স্থানে এ সনদের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেননি। অথচ এ সনদটি তিনি কিতাবুদ দিয়্যাতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করত সেখানে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, রাবী আবূ ইসহাক হযরত আলকামা থেকে কোন হাদীস শোনেননি। আর এ কথাটি স্বয়ং আবূ ইসহাক (র) এক জায়গায় স্বীকার করেছেন। কাজেই এ হাদীস মুনকাতি' এটি দলীল হিসাবে উপস্থাপন করা যায় না। (দ্র. নসবুর রায়া, খ. ১, পৃ. ২১৭)

১০. আল্লামা বুরহানুদ্দীন মুরগীনানী, আল-হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২

১১. আল্লামা আবূ জাফর তাহাভী, শারহু মা'আনিল আসার।

www.pathagar.com

হানাফী ফকীহগণ বলেন, তবে ঢেলার সংখ্যা স্বাভাবিক অবস্থায় তিনটি হওয়া সুন্নাত। কোন কারণে বেশী ঢেলা ব্যবহারের প্রয়োজন হলে বেজোড় সংখ্যাক হওয়া মুস্তাহাব[১২]।

এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীসটি লক্ষণীয় ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَجْمَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُوْتِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ اَمَا تَرٰى السَّمٰوٰتِ سَبْعًا وَالْاَرْضِيْنَ سَبْعًا وَذَكَرَ اَشْيَاءَ . رواه البزار والطبرانى فى الاوسط ورجاله رجال الصحيح ، مجمع الزوائد ١ : ٨٥

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন ঢেলা ব্যবহার করে তখন সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢেলা ব্যবহার করে। কারণ মহান আল্লাহ্ বেজোড়। তিনি যেজোড় সংখ্যাকে পছন্দ করেন। তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আসমান সাতটি। অনুরূপে যমীনও সাতটি। নবীজী (সা) এ ধারায় আরো কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন।[১৩]

عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَجْمَرَ ثُمَّ فَاَوْتِرُوْا وَاِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَاسْتَنْثِرُوْا ، رواه الطبرانى الكبير ورجاله موثقون كما فى مجمع الزوائد ١ : ٨٦

হযরত তারিক ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, তোমরা যখন ঢেলা ব্যবহার করবে, তখন বেজোড় সংখ্যক ব্যবহার কর। আর যখন অযূ করবে তখন নাকে পানি দিবে।[১৪]

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْاِسْتِطَابَةِ فَقَالَ اَوَلَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ ثَلٰثَةَ اَحْجَارٍ ، حَجَرَانِ لِلصَّفْحَتَيْنِ وَحَجَرٌ لِلْمَسْرُبَةِ رواه الطبرانى فى الكبير وفيه عتيق بن يعقوب الزبيرى قال أبو زرعة انه حفظ الموطاء فى حياة مالك ، كما فى مجمع الزوائد ،

---

১২. আল্লামা শারানবুলালী, নূরুল ঈযাহ, ফসল ফিল ইস্তিঞ্জা, দেওবন্দ, কুতুবখানা ইমদাদিয়্যা, তা. বি. পৃ. ৩০।

১৩. আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, খণ্ড ১, করাচী, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামিয়্যা, তা. বি. পৃ. ৩০৮।

১৪. আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯।

www.pathagar.com

ووثقه الدار قطني وذكره ابن حبان في الثقات كذا في لسان الميزان (٤
: ١٣٠) فالحديث حسن وحسنه الدار قطني في سننه .

৩. হযরত সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পরিচ্ছন্নতা অর্জনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা কি তিনটি ঢেলা জোগাড় করতে পার না ? দু'টি ঢেলা দুই দিকের জন্য, আর একটি মলদ্বারের জন্য।[১৫]

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঢেলা তিনটি হওয়া সুন্নাত, এটিই হানাফী ফকীহগণের অভিমত। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (মৃ. ১৩৫২ হি.) বলেন, ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এ প্রসঙ্গে বর্ণিত সকল হাদীস গবেষণা করেন এবং তানকীহে মানাত (تنقيح المناط) ইল্লাত কারণ নির্ণয় করণ করে দেখলেন যে, এখানে প্রধান বিষয় হল নাপাকী দূর করা ও নাপাকীর মলদ্বার পরিচ্ছন্ন করা। এ জন্য এটিকে ওয়াজিব নির্ধারণ করেছেন। আর এ পরিচ্ছন্নতা স্বাভাবিক অবস্থায় তিনটি ঢেলার দ্বারা সম্পন্ন হয়ে যায় বিধায়-নবীজী (সা) তিনটির কথা উল্লেখ করেছেন। কাজেই এটি সুন্নাত পর্যায়ের আমল।[১৬]

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট মাকরূহ

কোন ছোট পাত্রে রক্ষিত পানিতে যদি বিড়াল মুখ দেয় তাহলে সে পানি.সম্পূর্ণ নাপাক না হলেও ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়। এমন পানির দ্বারা অযূ করা মাকরূহ তানযীহী[১৭] অর্থাৎ যদি বিড়ালের ঝুটা পানি ব্যতিরেকে সম্পূর্ণভাবে পাক পানি বিদ্যমান থাকে তাহলে ঝুটা পানি ব্যবহার না করাই ভাল। আর যদি ঝুটা পানি ব্যতিরেকে অন্য কোন পাক-পানি না থাকে তখন এই ঝুটা পানি দ্বারা অযূ করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রেও অযূ করা মাকরূহ তানযীহী হবে। বিড়ালের ঝুটা পানি বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও তায়াম্মুম করার অনুমতি প্রাপ্ত হবে না।[১৮]

বিড়ালের ঝুটা পানি সম্পর্কে হাদীসে মহানবী (সা) দু'টি কথা ইরশাদ করেছেন। এক. এ ঝুটা নাপাক নয়। দুই. ঝুটা পানিতে বিড়ালের মুখ লাগার কারণে পাত্রটি অন্তত একবার ধুয়ে নিতে হবে। উপরোক্ত দু'টি মূলনীতির আলোকে ফকীহগণ বলেন, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট মাকরূহ।

---

১৫. প্রাগুক্ত।

১৬. আল্লামা আবুল হাসান, তানযীমুল আশতাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫২।

১৭. শারানবুলালী, নূরুল ঈযাহ, কিতাবুত তাহারাত, দেওবন্দ, কুতুবখানা ইমদাদিয়্যা, তা. বি. পৃ. ২৫। বিড়ালের ঝুটা পানির উপরোক্ত বিধান গৃহপালিত বিড়ালের ক্ষেত্রে প্রজোয্য। বন্য বিড়ালের ঝুটা পানি সম্পূর্ণ নাপাক। হাশিয়া, প্রাগুক্ত। আল্লামা বুরহানুদ্দীন মুরগীনানী, আল-হিদায়া, ১ম খণ্ড, দেওবন্দ ঃ আশরাফী বুক ডিপো, তা. বি. বাবুল মা আল্লাযী ইয়াজুযু বিহীল অযূ, পৃ. ২৮।

১৮. আল্লামা নওয়াব কুতবুদ্দীন খান দেহলবী, মুযাহিরে হক জাদীদ, দেওবন্দ ঃ ইদারায়ে ইসলামিয়্যাত, ১৯৮৬, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৫।

www.pathagar.com

এটিই ইমাম আযম আবু হানীফা (রা)-এর অভিমত।[১৯] বিড়ালের ঝুটা পানি ত্রুটিযুক্ত হলেও সম্পূর্ণ নাপাক নয় সে মর্মে নিম্নের কয়েকখানা হাদীস লক্ষণীয় ঃ

عَنْ كَبْشَةَ ابْنَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا [قَالَتْ] فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوْءً قَالَتْ فَجَائَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ فَاَصْغٰى لَهَا الْاِنَاءَ ، حَتّٰى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَاٰنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْهِ فَقَالَ اَتَعْجَبِيْنَ يَا ابْنَةَ اَخِىْ "فَقُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، اِنَّمَا هِىَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ اَوِ الطَّوَّافَاتِ ، رواه الترمذى ، وقال هذا حديث حسن صحيح وهو أحسن شئ فى هذا الباب ، وقد جود مالك هذا الحديث عن اسحاق بن عبد اللّٰه بن أبى طلحة ولم يأت به أحد أتم من ذلك .

কা'ব ইবন মালিকের কন্যা হযরত কাবশা (বিশিষ্ট মহিলা তাবিঈ) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন সাহাবী হযরত আবূ কাতাদা (রা)-এর পুত্রবধু। তিনি বলেন, একদা হযরত আবু কাতাদা (রা) তাঁর গৃহে আগমন করলে তিনি তাঁকে অযূ করার জন্য পানির ব্যবস্থা করে দেন। তিনি বলেন, ইত্যবসরে একটি বিড়াল এসে পানি পান করতে শুরু করলে তিনি পাত্রটি বিড়ালের সামনে কাৎ করে দেন। (যেন বিড়ালটি সহজে তৃষ্ণা ভরে পানি পান করতে পারে) ফলে বিড়ালটি (ভাল করে) পানি পান করে নেয়। কাবশা (র) বলেন, আবু কাতাদা (রা) আমাকে দেখলেন যে, আমি অবাক হয়ে বিষয়টির প্রতি তাকিয়ে আছি। তাই তিনি বললেন, ওহে আমার ভাতিজী[২০]! তুমি কি অবাক হচ্ছো ? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, বিড়াল নাপাক নয়। বিড়াল তো তোমাদের গৃহভ্যান্তরে সদা বিচরণকারী বা কিংবা বিচরণকারীনিদের অন্তর্ভুক্ত।[২১]

---

১৯. ইমাম আওযাঈ (র)-এর মতে বিড়ালের ঝুটা সম্পূর্ণ নাপাক। ইমাম শাফিঈ, মালিক, আহমাদ ইবন হাম্বল ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এ ঝুটা সম্পূর্ণভাবে পাক। তাতে কোন কারাহাত নেই। ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন-এটি মাকরূহ। ইমাম তাহাভী (র)-এর মতে মাকরূহে তাহরীমী। আর ইমাম কারখী (র)-এর মতে এই ঝুটা মাকরূহে তানযীহী। দ্র. তাকী উসমানী, দারসে তিরমিযী, করাচী ঃ মাকতাবা দারুল উলূম, ১৯৮৮, ১ম খণ্ড, বাব ফী সুরিল হিররাহ, পৃ. ৩২৬।

২০. হযরত আবূ কাতাদা (রা) নিজ পুত্রবধুকে ভাতিজী বলে সম্বোধন করেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে হযরত কাবশা বিনত কা'ব তাঁর ভাতিজী ছিলেন না। এতদসত্ত্বেও ভাতিজী বলার কারণ হল, তৎকালে আরবের সাধারণ রীতি ছিল বয়সে কেউ ছোট হলে তাকে আদর করে ভাতিজা কিংবা ভাতিজী বলা হত এবং বড় হলে চাচা কিংবা চাচী বলা হত। সে সূত্রেই আবূ কাতাদা (রা) তাঁকে ভাতিজী বলেছেন। তা ছাড়া মুসলমান হিসাবে সব মুসলমানই একজন অপর জনের ভাই। সে সূত্রেও একজন অপর জনকে ভাতিজী বলার সুযোগ আছে। (নওয়াব কতবুদ্দীন খান, মুযাহিরে হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪)

২১. মু'আত্তা মালিক,মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবূ দাউদ, সুনান নাসাঈ সুনান ইবন মাজা। দেখুন জামি তিরমিযী, রিয়াদ, দারুস সালাম, ১৯৯৯, বাবু মা জায়া ফী সুরিল হিররাহ, হাদীস নং ৯২ পৃ. ২৫।

www.pathagar.com

উপরোক্ত হাদীস প্রমাণ করছে যে, বিড়াল ঘরের অভ্যন্তরে বিচরণ খাদিম বা সেবকদের অন্তর্ভুক্ত[২২] সেবকদের ন্যায় বিড়াল তোমার ঘরের ভিতরে ও বাইরে সর্বদা বিচরণ করে। এমন বিচরণকারীর ঝুটাকে নাপাক জ্ঞান করা হলে ঘরোয়া জীবন কষ্টকর হয়ে পড়বে বিধায় মহানবী (সা) বলে দিয়েছেন যে, বিড়ালের ঝুটা পানি নাপাক নয়। উল্লেখ্য যে, এখানে ঝুটা পানিকে পাক বলা হয়নি। বলা হয়েছে যে, নাপাক নয়। দুই বাক্যের মধ্যে মর্মার্থের সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান।

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أُمِّهِ اَنَّ مَوْلاَتَهَا اَرْسَلَتْهَا بِهَرِيْسَةٍ اِلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَتْهَا تُصَلِّيْ فَاَشَارَتْ اِلَيَّ اَنْ ضَعِيْهَا فَجَائَتْ هِرَّةٌ فَاَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ اَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ اَكَلَتِ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّمَا هِىَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ ، وَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَتَوَضَّؤُ بِفَضْلِهَا . رواه أبو داؤد ، ص : ٣٢

হযরত দাঊদ ইবন সালিহ্ ইবন দীনার (বিশিষ্ট তাবিঈ) তাঁর মাতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর মাতা বলেছেন, একদা তাঁকে তাঁর আযাদকারী মহিলা 'হারীসা'[২৩] নামক পাকানো খাদ্যদ্রব্য দিয়ে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি (খাদ্য দ্রব্যটি নিয়ে হযরত আয়েশা (রা)-এর বাড়ী পৌঁছে) তাঁকে নামায পড়া অবস্থায় পেলেন। (তিনি বলেন,) হযরত আয়েশা (রা) নামায অবস্থায় আমার দিকে ইশারা[২৪] করে বুঝালেন যে, জিনিসটি পাশে রেখে দাও। এমতাবস্থায় একটি বিড়াল প্রবেশ করে এবং ঐ হারীসা থেকে কিছু খেয়ে নেয়। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) যখন নামায শেষ করলেন তখন তিনি বিড়াল যেদিক দিয়ে মুখ দিয়েছিল সে দিক থেকেই এটি আহার করলেন। তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, বিড়াল নাপাক নয়। বিড়াল তো তোমাদের পাশে সদা বিচরণকারীদেরই অন্তর্ভুক্ত[২৫]।

---

২২. বিড়াল বিচরণকারী খাদিমদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থ হল খাদিম বা সেবক যেভাবে ঘরে বাইরে আসা যাওয়া করে বিড়ালও তদ্রুপ ঘরে বাইরে আসা যাওয়া করে থাকে। কিংবা অর্থ হল সেবক যেমন তোমাদের সেবা করে বিড়াল তদ্রুপ ঘরের ভিতর থেকে ক্ষতিকর জীব বা কীট হত্যা করে কিংবা তাড়িয়ে দিয়ে তোমাদের উপকার সাধন করে থকে। (মুযাহিরে হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫)

২৩. আরব এলাকার বিশেষ ধরনের খাবারকে 'হারীসা' বলা হয়। গমের আটা এবং গোশত মিলিয়ে একত্রে রান্না করে এ খাবার তৈরী করা হয়। (মুযাহিরে হক, প্রাগুক্ত। পৃ. ৪৪৬।)

২৪. নামায অবস্থায় কোন কিছুর প্রতি ইশারা করা দু'ধরনের হতে পারে। এটি যদি হালকা ও মৃদু পর্যায়ের হয় তাহলে এটি 'আমলে কালীল'। আর 'আমলে কালীল' এর কারণে নামায ফাসিদ হয় না। পক্ষান্তরে এটি যদি হালকা বা মৃদু পর্যায়ের না হয় তাহলে এটিকে বলা হবে 'আমলে কাসীর'। 'আমলে কাসীরের' কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায়। হযরত আয়েশার (রা)-এর ইশারাটি 'আমলে কালীল'-এর পর্যায়ভুক্ত ছিল।

২৫. এখানে "বিড়ালকে ঘরের ভিতরে বিচরণশীল হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে"। এ সূত্র থেকেই কোন কোন আলিম ঘরে বিড়াল পালা মুস্তাহাব বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (দেখুন মুযাহিরে হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬)।

www.pathagar.com

একং আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছি যে, তিনি বিড়ালের ঝুটা পানি দ্বারা অযূ করতেন।[২৬]

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اَرْضٍ بِالْمَدِيْنَةِ يُقَالُ لَهَا بَطْحَانَ فَقَالَ يَا اَنَسُ اُسْكُبْ لِيْ وَضُوْءً فَسَكَبْتُ لَهُ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَاجَتَهُ اَقْبَلَ اِلَى الْاِنَاءِ وَقَدْ اَتٰى هِرٌّ فَوَلَغَ فِيْ الْاِنَاءِ فَوَقَفَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقْفَةً حَتّٰى شَرِبَ الْهِرُّ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ اَمْرُ الْهِرِّ فَقَالَ يَا اَنَسُ اِنَّ الْهِرَّ مِنْ سِبَاعِ الْبَيْتِ ، لَنْ يُقَذِّرَ شَيْئًا وَلَنْ يُنَجِّسَهُ . رواه الطبرانى فى الصغير وفيه عمر بن الحفص المكى وثقه ابن حبان قال الذهبى لا ندرى من هو ، كنا فى مجمع الزوائد ج : ١ ، ص : ٨٧ (اعلاء السنن ، ج : ١ ، ص ١٠١)

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা ভূখণ্ডে অবস্থিত 'বাতহা' নামক স্থানে গেলেন। মহানবী (সা) আমাকে বললেন, হে আনাস! আমার জন্য অযূর ব্যবস্থা কর। সে মতে আমি তাঁর জন্য অযূর ব্যবস্থা করলাম। মহানবী (সা) ইসতিনজা সেরে যখন পাত্রের দিকে আসতে লাগলেন তখন দেখলেন একটি বিড়াল এসে পানির পাত্রে মুখ দিয়েছে। নবীজী (সা) বিড়ালটির জন্য কিছুক্ষণ বিলম্ব করলেন। ফলে বিড়ালটি পান করার কাজ সেরে নেয়। তারপরে নবীজী (সা) অযূ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বিড়ালের (ঝুটার) বিষয়ে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, হে আনাস! বিড়াল গৃহ অভ্যন্তরস্ত হিংস্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। এটি কোন জিনিস ময়লা করে না এবং নাপাকও করে না।[২৭]

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে বুঝা যায় যে, বিড়ালের ঝুটা নাপাক নয়। তাহলে পাক কি না? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে, এটিকে পূর্ণাঙ্গ মাত্রায় পাকও বলা যায় না। পূর্ণাঙ্গ মাত্রায় পাক নয় বিধায়-কয়েকখানা হাদীসে নবীজী (সা) বিড়ালের ঝুটা পানি দিয়ে অযূ করতে নিষেধ করেছেন এবং যে পাত্রে বিড়াল মুখ দেয় সে পাত্রটি অন্তত একবার পাক পানি দ্বারা ধৌত করতে আদেশও দিয়েছেন[২৮]

এ প্রসঙ্গের হাদীসগুলো নিম্নে লক্ষণীয় ঃ

---

২৬. ইমাম আবূ দাউদ আস সিজিস্তানী, সুনানে আবূ দাউদ, রিয়াদ, দারুস সালাম, ১৯৯৯, বাবু সুরিল হিররাহ, হাদীস নং ৭৬, পৃ. পৃ. ২২।

২৭. আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, করাচী, ইদারাতুল কুরআন ওয়াস উলূমুল ইসলামী, তা. বি. ১ম খণ্ড, বাবু কারাহাতি সূরিল হিররাহ তানযীহান, পৃ. ২০১।

২৮. বিস্তারিত রিওয়ায়াতের জন্য দেখুন ইমাম আবূ জাফর তাহাভী, বাবু সুরিল হিররাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১।

www.pathagar.com

عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ لاَ تَوَضَّأْ مِنْ سُوْرِ الْحِمَارِ وَلاَ الْكَلْبِ وَلاَ السِّنُّوْرِ . أخرجه الطحاوى ج : ١ ص : ١٢ قال الشيخ العثمانى رجاله ثقات والربيع مختلف فيه من رجال الصحيح ، والاختلاف لا يضر ، كما فى اعلاء السنن . ج : ١ ، ص : ٢٠١

হযরত নাফি' হযরত ইবন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা গাধার ঝুটা পানি দ্বারা অযূ করবে না। কুকুরের ঝুটা দ্বারাও নয়। বিড়ালের ঝুটা দ্বারাও নয়।[২৯]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ (اَنَّهُ) قَالَ يُغْسَلُ الْاِنَاءُ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلاَهُنَّ اَوْ اُخْرَهُنَّ بِالتُّرَابِ وَاِذَا وَلَغَتْ فِيْهِ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً . أخرجه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح ، أيضًا أخرجه أبو داؤد .

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, পানির পাত্রে কুকুর মুখ দিলে পাত্রটি সাত বার ধৌত করতে হবে[৩০]। তন্মধ্যে প্রথম বার কিংবা বলেছেন শেষ বার ধৌত করতে হবে মাটি দিয়ে।[৩১] আর পানির পাত্রে বিড়াল মুখ দিলে পাত্রটি একবার ধৌত করতে হবে।[৩২]

---

২৯. আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

৩০. কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে পাত্রটি নাপাক হয়ে যায়। এ পাত্র পাক পনি দ্বারা তিনবার ধৌত করলে তা পাক হয়ে যাবে। (দ্র. হিদায়া, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮) বর্ণিত হাদীসে সাতবার ধৌত করার বিধানটি-ইসলামের প্রথম যুগের সাথে সম্পর্কিত। এ বিধান পরবর্তীকালে রহিত হয়ে গিয়েছে এবং তিন বার ধৌত করার বিধান দেওয়া হয়েছে (দ্র. হাশিয়া, হিদায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯) হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) বলেন, কুকুর অভিশপ্ত জীব। ফিরিশ্তাগণ কুকুরকে ঘৃণা করেন। আকার আকৃতি ও স্বভাবের ক্ষেত্রেও কুকুর শয়তানের অনুরূপ। এ সব কারণে যে সকল কুকুর পাহারা দেওয়া কিংবা শিকার করার জন্য নয় সেগুলোর ঝুটার ব্যাপারে কঠোরতার বিধান আরোপিত হয়েছে। নতুবা সাধারণভাবে কুকুরের মুখ দেওয়া পাত্র তিনবার ধৌত করার দ্বারাই পাক হয়ে যায়। (দ্র. আল্লামা আবুল হাসান, তানযীমুল আশতাত, চট্টগ্রাম ঃ আল হেলাল প্রকাশনী, তা. বি. ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯)

৩১. আল-বিদায়া গ্রন্থে আল্লামা ইবন রুশদ (র) বলেন, সাত বার ধৌত করার হুকুমটি দেওয়া হয়েছে চিকিৎসা নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে। নাপাক দূরীভূত করার দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। নতুবা নাপাকী দূরীভূত করার জন্য তিন বার ধৌত করাই যথেষ্ট। তাছাড়া ইউরোপীয়-চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের বলেছেন যে, কুকুরের লালার মধ্যে বিষাক্ত জীবাণু থাকে। মাটি দ্বারা পাত্রটি ঘষা-মাজা করে নেওয়া হলে সেই জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। এ কারণে উপরোক্ত হাদীসে প্রথমবার কিংবা শেষবার মাটি দ্বারা ঘষা-মাজার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (তানযীমুল আশতাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯)

৩২. ইমাম তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৯১, পৃ. ২৫।

www.pathagar.com

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ قَالَ فِىْ سُوْرِ الْهِرَّةِ يُعْرَاقُ وَيُغْسَلُ الْاِنَاءِ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ . أخرجه الدارى قطنى عن محمد بن سيرين موقوفاً .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বিড়ালের ঝুটা পানি সম্পর্কে বলেন, পানিটি ফেলে দিতে হবে এবং পাত্রটি একবার কিংবা দু'বার ধৌত করে নিতে হবে।[৩৩]

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يُغْسَلُ الْاِنَاءُ مِنَ الْهِرِّ كَمَا يُغْسَلُ مِنَ الْكَلْبِ .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে; মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, কুকুর মুখ দিলে যেমন পাত্রটি ধুয়ে নিতে হয় তদ্রূপ বিড়াল মুখ দিলেও পাত্রটি ধুয়ে নিতে হবে।[৩৪]

উল্লেখ্য যে, উপরের হাদীসগুলো যদিও মাওকূফ অর্থাৎ শুধু সাহাবীর বরাতে বর্ণিত, মহানবীর (সা)-এর বরাতে বর্ণিত নয়, তাতে কোন আপত্তি নেই। কারণ এগুলো হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিজস্ব বক্তব্য নয় বরং মহানবী (সা) থেকেই শ্রুত। ইমাম তাহাভী (র)-এর একটি বর্ণনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

তিনি বর্ণনা করেন,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا حَدَّثَ عَنْ هُرَيْرَةَ فَقِيْلَ لَهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ كُلُّ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

হযরত মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি যখন হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস (মওকূফ পদ্ধতিতে) বর্ণনা করলেন তখন জিজ্ঞাসা করা হল যে, আবূ হুরায়রা এ হাদীস মহানবী (সা) থেকে শুনে বলছেন ? ইবন সীরীন (র) উত্তর দিলেন, আবূ হুরায়রা (রা)-এর সবগুলো হাদীসই মহানবী (সা) থেকে শ্রুত।[৩৫]

মোটকথা, উপরে দু'ধরনের হাদীস পেশ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের হাদীসগুলো প্রমাণ করছে যে, বিড়ালের ঝুটা নাপাক নয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের হাদীসগুলো প্রমাণ করছে যে, ঝুটা নাপাক না-হলেও পাত্র অন্তত একবার পাক পানি দিয়ে ধৌত করে নেওয়া আবশ্যক। উভয় পর্যায়ের হাদীসকে সমন্বিত করলে ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, বিড়ালের ঝুটা পাক তবে মাকরূহ।

ফিকহ-এর নীতি অনুসারে মাকরূহ দু'রকমের হতে পারে। মাকরূহে তাহরীমী ও মাকরূহে তানযীহী। প্রশ্ন হল, বিড়ালের ঝুটা তন্মধ্যে কোন ধরনের মাকরূহ। এ প্রশ্নের উত্তরে ইমাম আবু জাফর তাহাভী (র) বলেন, এটি মাকরূহে তাহরীমী। কারণ মাকরূহ শব্দটি সাধারণভাবে (مطلقًا) বলা হলে তার দ্বারা মাকরূহে তাহরীমী উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তা ছাড়া ঝুটা মাকরূহ

৩৩. ইমাম আবূ জাফর তাহাভী (র) শারহু মা'আনিল আসার, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১।

৩৪. তাহাভী, প্রাগুক্ত।

৩৫. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

হওয়ার ইল্লাত (কারণ) হল, পানির সাথে বিড়ালের মুখের লালা মিশ্রিত হয়ে যাওয়া। লালা শরীরের গোশত থেকে সৃষ্ট, এবং তা গোশত স্পর্শ করে বেরিয়ে আসে। আর বিড়ালের গোশত হারাম। কাজেই হারাম গোশত থেকে বেরিয়ে আসা লালাও হারাম। আর হারাম লালা পানিতে পড়েছে বিধায় পানিও ত্রুটিযুক্ত হয়ে গিয়েছে। এটি ঐ পানির মাকরূহে তাহরীমী হওয়াকে নির্দেশ করছে।[৩৬]

ইমাম কারখী (র)-এর মতে বিড়ালের ঝুটা মাকরূহে তানযীহী। কারণ হাদীসে মহানবী (সা) ঝুটা নাপাক না হওয়ার ইল্লাত-হিসাবে বিড়ালের সর্বদা আনাগোনা করা (طواف)-কে নির্দেশ করেছেন। এই ইল্লাত বিষয়টি মাকরূহে তানযীহী হওয়াকে নির্দেশ করে।[৩৭]

বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা ইবন হুমাম (র) বলেন, বিড়ালের ঝুটা প্রকৃত প্রস্তাবে ছিল নাপাক। কিন্তু এ নাপাকী থেকে বেঁচে থাকা স্বাভাবিক জীবনের সুকঠিন বিধায় (عـــمـــوم بلوى) তথা সর্বজনীয় -এর দিক বিবেচনা করে শরী'আত এটিকে 'নাপাক নয়' বলে হালকা করে দিয়েছে। এ কারণটি উসূলে ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে 'মাকরূহে তানযীহী' হওয়াকে নির্দেশ করে থাকে।[৩৮]

আল্লামা ইবন আবেদীন শামী (র) বলেন, বিড়ালের ঝুটা মাকরূহে তানযীহী হওয়া-এর অভিমতটি অন্যান্য সকল অভিমতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভারসাম্যপূর্ণ অভিমত এবং এটি এ প্রসঙ্গে বর্ণিত সকল হাদীসের আলোকে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিমত।[৩৯]

মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে বর্ণিত একখানা হাদীসে আছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَاْتِىْ دَارَ قَوْمٍ بْنَ الْاَنْصَارِ وَدُوْنَهُمْ دَارُ فَشَقَّ ذَالِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (انَّكَ) يَاْتِىْ دَارَ فُلَانٍ وَلَا يَاْتِىْ دَارَنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِاَنَّ فِىْ دَارِكُمْ كَلْبًا قَالُوْا فَاِنَّ فِىْ دَارِهِمْ سِنُّوْرًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ السِّنُّوْرَ سَبْعٌ .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা) আনসারদের এক বাড়ীতে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। তাদেরই নামে আরেকটি বাড়ী ছিল। (সেখানে নবীজীর খুব যাতায়াত ছিল না।) ফলে বিষয়টি তাদের জন্য ভারি হয়ে গিয়েছিল। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অমুকের বাড়ী যাতায়াত করেন কিন্তু আমাদের বাড়ী যাতায়াত করেন না। মহানবী (সা) বললেন, তোমাদের বাড়ীতে কুকুর আছে[৪০]। (বিধায় আমি যাতায়াত করি না।)

৩৬. হিদায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

৩৭. প্রাগুক্ত।

৩৮. আল্লামা তাকী উসমানী, দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮।

৩৯. তানযীমুল আশতাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

৪০. যে বাড়ীতে কুকুর থাকে সে বাড়ীতে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করে না বিধায় রাসূলুল্লাহ (সা) এমন বাড়ীতে যাতায়াত করতেন না। হাদীসে আছে;

عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ رضـ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَدْخُلُ الْمَلٰئِكَةَ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةُ تَمَاثِيْلَ .

www.pathagar.com

তারা বলল, তাহলে ওদের বাড়ীতে তো বিড়াল আছে। মহানবী (সা) বললেন, বিড়াল হিংস্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত[৪১]।

এ হাদীসে উল্লেখিত শেষ বাক্যটির প্রেক্ষিতে ইমাম আওযাঈ (র) বলেন, বিড়াল হিংস্র প্রাণী। আর হিংস্র প্রাণীত ঝুটা সম্পূর্ণ নাপাক। তাই বিড়ালের ঝুটাও সম্পূর্ণ নাপাক, শুধু মাকরূহই নয়। তবে হাদীসখানা সম্পর্কে আল্লামা জামালুদ্দীন যায়লাঈ 'নসবুর রায়া' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, হাদীসখানা যাঈফ বিধায় তদ্বারা প্রমাণ পেশ করার সুযোগ নেই[৪২]। হাদীসখানা প্রসঙ্গে অনুরূপ বক্তব্য আল্লামা নূরুদ্দীন হায়সামী (র) থেকেও পাওয়া যায়, তিনি 'মাজমাউয যাওয়াইদ' গ্রন্থে লিখেছেন, এ হাদীসের সনদে ঈসা ইবনুল মুসায়্যাব নামক বর্ণনাকারী রয়েছেন। এ বর্ণনাকারী যাঈফ। তাই হাদীসখানা দলীল প্রদানের উপযুক্ত বিবেচিত থাকছে না।[৪৩] আল্লামা তাকী উসমানী-বলেন, হাদীসখানা দলীলের উপযুক্ত জ্ঞান করা গেলেও علت طواف ও عموم بلوی-এর কারণে এটিকে সাধারণ হিংস্র প্রাণীদের ঝুটা থেকে ব্যতিক্রম গ্রণ্য করা হবে।[৪৪]

শিশুদের পেশাবের বিধান ও তা পবিত্র করার নিয়ম

শিশুদের পেশাবের বিধান

সাধারণভাবে সব ধরনের পেশাবই নাপাক[৪৫] এবং নাজাসাতে গালীযা।[৪৬] পেশাব শিশুর হোক কিংবা বয়স্কের, পুত্র শিশুর হোক কিংবা কণ্যা শিশুর তাতে কোন পার্থক্য নেই।[৪৭] সকলের পেশাবই নাপাক। সব ধরনের পেশাব থেকেই সাবধান থাকা অবশ্যক। হাদীসে মহানবী (সা) পেশাব জনিত নাপাকী থেকে সাবধানতা অবলম্বনের তাকীদ করেছেন। এবং এ

হযরত আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি যে, তিনি বলছেন, রহমতের ফিরিশতাগণ এমন গৃহে প্রবেশ করে না যেখানে কুকুর থাকে কিংবা কোন জীবের ছবি থাকে। সুনানে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৮০৪, পৃ. ৬৩২।

৪১. মুসনাদে ইমাম আহমাদ।

৪২. জামালুদ্দীন যায়লাঈ, নসবুর রায়া, বাবু সুরিল হিররাহ।

৪৩. নূরুদ্দীন হায়সামী, মাজমাউয যাওয়াদ, খণ্ড ১, পৃ. ১৮৭।

৪৪. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।

৪৫. মালিকুল উলামা আল্লামা কাসানী (মৃ. ৫৮৭ হি.) বলেছেন, মানব দেহ থেকে যে সকল জিনিস নির্গত হওয়ার কারণে অযূ ভেঙ্গে যায় কিংবা গোসল ফরয হয় সেগুলোর সবই নাপাক। যেমন পেশাব, পায়খানা, মনী, মযী ইত্যাদি। দেখুন আল্লামা আলাউদ্দীন আবূ বকর ইবন সাউদ আল কাসানী আল হানাফী, বাদাইউস সানায়ি' ফী তারতীবিশ শারাঈ', বায়রূত, দারু ইহয়াইত তুরাস আল আরাবী, ২০০০, ২য় মুদ্রণ, খ ১, পৃ. ১৯৩।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

৪৭. হযরত আম্মার (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা আছে,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّمَا يُغْسِلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ الخ...

আল্লামা কাসানী (র) বলেন, এ হাদীসে মহানবী (সা) সর্ব প্রকার পেশাবকে একই হুকুমের আওতায় রেখেছেন। তাতে কোন পার্থক্য করেননি। (দেখুন বাদায়িউস সানাঈ', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০।

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে অসাবধানতা ও উদাসীনতাকে কবরে আযাবগ্রস্ত হওয়ার প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নে কয়েকখানা হাদীস লক্ষণীয় ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ .

أخرجه الدار قطني من حديث انس وقال المحفوظ مرسلاً وعن أبى هريرة مثله أخرجه الدار قطنى والحاكم وعن ابن عباس بلفظ عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه أخرجه الطبرانى والدار قطنى ، كما الدراية فى منتخب تخريج لحادث الهداية ، قد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وغيره كذا فى فتح البارى . ج : ٢ ، ص : ٢٨٩

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, তোমরা পেশাবের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করলে। কারণ সাধারণত কবরের আযাব পেশাবের ক্ষেত্রে অসাবধানতার জন্যই হয়ে থাকে।[৪৮]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ (بَلٰى اِنَّهُ لَكَبِيْرٌ) اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ فِىْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا . رواه البخارى ومسلم وداؤد والترمذى والنسائى

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মহানবী (সা) দু'টি কবরের[৪৯] পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, এ দু'জন কবরবাসীকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। বস্তুত তাদেরকে কোন বড় কষ্টসাধ্য বিষয়ের জন্য আযাব দেওয়া হচ্ছে না। (তবে

৪৮. দারা কুতনী, মুসতাদরাকে হাকিম, তাবারানী, দ্র. দিরায়া ফী তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়া, হিদায়া মূল গ্রন্থের সাথে সংযুক্ত, হিদায়া ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬।

৪৯. এ কবরদ্বয়ের বিশেষণ সম্পর্কে কোন কোন বর্ণনায় 'পুরাতন' আবার কোন কোন বর্ণনায় 'নতুন' বলা হয়েছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকারীর মতে কবর দু'টি জাহেলী আমলের কাফিরদের কবর ছিল। তবে ইবন হাজার আসকালানী (র) বলেন, বিশুদ্ধ মতে এই কবর দু'টি দুইজন মুসলমানের কবর ছিল। কেননা একটি বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা) আরো ইরশাদ করেছেন, من دفنتم তোমরা এখানে কাদেরকে দাফন করেছো ? তা ছাড়া এক বর্ণনায় আছে নবীজী (সা) তাদের জন্য দু'আ করেছিলেন। কাজেই যদি তারা কাফির হত তাহলে নবীজী (সা) তাদের জন্য অবশ্যই দু'আ করতেন না।

www.pathagar.com

তাদের অর্জিত গুনাহটি কবীরা গুনাহ)[৫০] তাদের একজনের অবস্থা হল যে, সে নিজেকে পেশাব (এর ছিটা ফোটা থেকে) বাঁচিয়ে চলত না। সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, সে পেশাবের সাবধানতা অবলম্বন করত না। আর অপরজনের অবস্থা হল যে, সে (চোগলখুরী) করে বেড়াত। তারপর মহানবী (সা) খেজুরের একটি কাঁচা ডাল হাতে নিয়ে এটিকে আধাআধি করে দু'ভাগ করলেন এবং একটি করে উভয় কবরে পুঁতে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এটি কেন করলেন ? মহানবী (সা) উত্তর দিলেন, আশা করি ডালাদ্বয় না শুকানো পর্যন্ত তাদের আযাব হালকা করে দেওয়া হবে।[৫১]

وَعَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ رضی الله عنه عَنِ النَّبِیِّ ﷺ وَ قَالَ اتَّقُوْا الْبَوْلَ ، فَاِنَّهُ اَوَّلُ مَا يُحَاسِبُ بِهِ الْعَبْدُ فِیْ الْقَبْرِ . رواه الطبرانی فی الكبير ورجاله موثقون كما فی مجمع الزوائد . ج : ١ ، ٢٠٥ انظر اعلاء السنن . ج ، ١ ، ص : ٢٩٧

হযরত আবূ উসামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে চলবে। কারণ এ ব্যাপারেই বান্দা কবরে সর্বাগ্রে হিসাবের সম্মুখীন হবে।[৫২]

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে বোঝা যায় যে, পেশাব নাপাক। তা থেকে বেঁচে চলা এবং সাবধানতা অবলম্বন করা অতি জরুরী। এখানে লক্ষণীয় যে, মহানবী (সা) 'পেশাব' শব্দটি 'মুতলাক' ভাবে বলেছেন, তাতে শিশু কিংবা বয়স্ক, পুরুষ কিংবা মহিলা ইত্যাদির কোন তফাৎ করেননি। তাই বুঝা যায় যে, সকলের পেশাবই নাপাক। বয়স্কের পেশাব থেকে যেমন সাবধানতা জরুরী তেমনি শিশু ছেলে হোক কিংবা মেয়ে তার পেশাব থেকেও সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। একখানা হাদীসে শিশুর পেশাব সম্পর্কে আরো স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়। যেমন,

---

৫০. সহীহ বুখারীর কোন কোন বর্ণনায় এ অংশটি অতিরিক্ত বর্ণিত আছে। (তানযীমুল আশতাত, আল হেলাল প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, খ ১, পৃ. ১৪২)

৫১. কেননা, কাঁচা ডালগুলো কাঁচা অবস্থায় থাকা পর্যন্ত তাসবীহ পাঠ করবে বিধায়-তাসবীহের বরকতে তাদের আযাব হালকা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ সূত্র থেকেই আলিমগণ বলেন, কবরের কাছে গিয়ে যিকর ও পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। কারণ এটি কাঁচা ডালের তাসবীহ পাঠ থেকেও বেশী শক্তিশালী উপকরণ। তবে করবে যাওয়ার সময় সঙ্গে কুরআন শরীফ নিয়ে যাওয়া আদবের পরিপন্থী। (তানযীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩) আল্লামা কুতবুদ্দীন খান বলেন, এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কারো কবর যিয়রতে নেক বান্দাদের গমন করা সেই কবরবাসীর জন্য আযাবের ক্ষেত্রে নমীনয়তা প্রাপ্তির কারণ হয়ে থাকে। (মুযাহিরে হক, কুতবুদ্দীন খান দেহলভী, দেওবন্দ ঃ ইদারায়ে ইসলামিয়্যাত, তাবি, খ ১, পৃ. ৩৫১)

৫২. কবর হল কিয়ামত দিবসের পূর্ববর্তী ভূমিকা। কিয়ামত দিবসে সর্বাগ্রে হিসাব নেয়া হবে নামায ও অন্যায় খুন সম্পর্কে। পেশাব থেকে পরিচ্ছন্নতা অর্জন এবং চোগলখুরী যেহেতু নামায ও খুনের ভূমিকা হিসাবে কাজ করে সেহেতু এ দু'টি কিয়ামতের ভূমিকা অংশে হিসাবের জন্য উত্থাপিত করা হবে। (তানযীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩)

www.pathagar.com

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُوْتَى بِالصِّبْيَانِ فَاُتِيَ بِصَبِيٍّ مَرَّةً فَبَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ صَبُّوْا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبًّا

رواه الطحاوى اسناده صحيح ، كما فى اثار السنن ج : ١ ص : ٢٧ اعلاء السنن ، ج : ١ ، ٢٩٣

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট (দু'আর জন্য) শিশুদেরকে আনা হত। একবার তাঁর কাছে জনৈক শিশুকে আনা হলে শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বললেন, এটি পানি দ্বারা ভাল করে ধৌত করে দাও।[৫৩]

وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ بَالَ الْحَسَنُ اَوِ الْحُسَيْنُ عَلٰى بَطْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَرَكَهُ حَتّٰى قَضٰى بَوْلَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ

رواه الطبرانى فى الأوساط باسناد حسن ، كما فى فتح البارى ج : ١ ، ٢٨١

হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা শিশু হাসান (রা) কিংবা শিশু হুসায়ন (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পেটের উপর পেশাব করে দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে পেশাব শেষ করা পর্যন্ত নিজ অবস্থায় রেখে দেন। তারপর পানি এনে তার উপর ঢেলে দেওয়ার নির্দেশ দেন।[৫৪]

অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, পেশাব নাপাক হওয়ার বিষয়ে শিশু কিংবা বয়স্কের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটিই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল এবং ইসহাক ইবন রাহওয়াহ্ (র) ফকীহগণও শিশুদের পেশাব নাপাক বলেছেন।[৫৫] তবে ফকীহ দাউদ যাহেরীর মতে শিশুদের পেশাব নাক, নাপাক নয়। কাযী ইয়ায্ (র) বলেছেন, দাউদ যাহেরীর উপরোক্ত অভিমতের সাথে ইমাম শাফিঈও একমত রয়েছেন। বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ইমাম নববী (র)। তিনি বলেছেন, ইমাম শফিঈ (র) জমহূরেরর সাথে একমত। তাঁর মতেও শিশুদের পেশাব নাপাক। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম মত কেবল দাউদ যাহেরীর।[৫৬]

ইমাম দাউদ যাহেরী নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে দলীল পেশ করে থাকেন ঃ

---

৫৩. আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী (র) ই'লাউস সুনান, করাচী, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূম আল ইসলামিয়্যা, তাবি, খ ১, পৃ. ২৯৩।

৫৪. আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী, প্রাগুক্ত, খ ১, পৃ. ২৯১

৫৫. মাওলানা তাকী উসমানী, দরসে তিরমিযী, করাচী ঃ মাকতাবা দারুল উলূম, আগস্ট ১৯৮৮, খ. ১, পৃ. ২৮৭।

৫৬. তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭।

www.pathagar.com

عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بِابْنٍ لِيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ ، رواه الترمذى .

১. হযরত উম্ম কায়স বিনত মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক পুত্র সন্তানকে নিয়ে মহানবীর (সা) দরবারে আসলাম। শিশুটি তখনও (দুধ ব্যতিরেকে সাধারণ) খাদ্য গ্রহণ করা শুরু করেনি সে মহানবী (সা)-এর শরীরে পেশাব করে দিলে তিনি পানি আনার এবং তা ছিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।[৫৭]

উল্লেখ এখানে رَشٌّ (ছিটিয়ে দেওয়া) শব্দ থেকে দাউদ যাহেরী দাবী করছেন যে, শিশুদের পেশাব পাক। কারণ যদি নাপাক হত তাহলে মহানবী (সা) শুধু পানি ছিটানোকে যথেষ্ট মনে করতেন না।[৫৮] জমহুর ফুকাহা হাদীসখানার ব্যাখ্যায় বলেন যে, মহানবী (সা) এখানে পানি আনার নির্দেশ দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে পানি ধৌত করার লক্ষ্যেই আনা হয়ে থাকে। আর رَشٌّ (ছিটানো) শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হল الغسل الخفيف। অর্থাৎ এ পেশাব ধৌত করার জন্য খুব বেশী পানি ব্যয়ের প্রয়োজন নেই। সাধারণ অর্থে ধৌত করা পাওয়া গেলেই যথেষ্ট। আর এই সাধারণভাবে ধৌত করার নির্দেশতও প্রমাণ করছে যে, শিশুর পেশাব নাপাক।

শিশুদের পেশাব থেকে কাপড় পবিত্র করার নিয়ম

দুগ্ধপোষ্য যে শিশুরা এখনো স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ শুরু করেনি–তারা ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক তাদের পেশাবও অন্যান্য মানুষের পেশাবের ন্যায় নাপাক এবং নাজাসাতে গালীযা। এ পেশাব শরীরে লাগলে শরীর ধৌত করা জরুরী। যদি কোন কাপড়ে লাগে তাহলে কাপড়টি পাক করতে হবে। পাক করার নিয়ম হল তা পবিত্র পানি দিয়ে তিনবার ভালভাবে ধৌত করা এবং প্রত্যেক বার কাপড়টি কচলিয়ে ভালভাবে নিংড়িয়ে নিবে। তৃতীয়বার খুব জোরে নিংড়াতে হবে। ভালমত নিংড়ানো না হলে কাপড় পাক হবে না।[৫৯]

তবে দুগ্ধপোষ্য পুত্র সন্তান আর কন্যা সন্তানের পেশাব ধৌত করার মধ্যে কিঞ্চিত পার্থক্য আছে। ফকীহগণ বলেন, ধৌত করা দু'রকমের হয়। খুব কচলিয়ে ধৌত করা। পরিভাষায় এটিকে বলা হয় 'আল গাসলুশ শাদীদ।' আর স্বাভাবিকভাবে ধৌত করা। পরিভাষায় এটির নাম 'আল গাসলুল খাফীফ'।[৬০] কন্যা সন্তানের পেশাব অন্যান্য মানুষের পেশাবের ন্যায় খুব

৫৭. ইমাম আবূ ঈসা আত্ তিরমিযী (র) আল জামি', রিয়াদ : দারুস সালাম লিন্নাশর ওয়াত তাওযী', এপ্রিল ১৯৯৯, খ. ১, হাদীস নং ৭১, পৃ. ১৯।

৫৮. ইমাম যাহেরীর উপরোক্ত যুক্তির খণ্ডনে জামহূর আলিমগণ বলেন, যদি শিশুর পেশাব নাপাক না হত তাহলে পানি ছিটানোর নির্দেশেরও কোন দরকার ছিল না। এভাবে ফেলে রাখলেই যথেষ্ট হতো। অথচ হাদীসের কোথাও এমন নির্দেশ পাওয়া যায় না। সর্বত্র ধৌত করা কিংবা পানি ছিটিয়ে দেওয়া এতদুভয়ের কোন না কোন নির্দেশ অবশ্যই দেওয়া হয়েছে।

৫৯. মাওলানা হেমায়েতুদ্দীন, আহকামে যেন্দেগী, ঢাকা : মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ, জানু ১৯৯৯, পৃ. ৯২।

৬০. মাওলানা তাকী উসমানী, দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭।

www.pathagar.com

কচলিয়ে ধৌত করতে হবে। পক্ষান্তরে পুত্র সন্তানের পেশাব স্বাভাবিকভাবে ধৌত করতে হবে। এ করণে হাদীসের মধ্যে পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানের পেশাব পাক করার পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে।[৬১]

এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীসমূহ লক্ষণীয় ঃ

عَنْ اُمِّ قَيْسٍ اَنَّهَا اَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَأْكُلُ الطَّعَامَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فِىْ حُجْرَةٍ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ . متفق عليه .

হযরত উম্ম কায়স (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি নিজের এমন এক শিশুপুত্রকে নিয়ে এসে মহানবী (সা)-এর কোলে দেন যে এখনো সে স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ শুরু করেনি। শিশুটি তখন তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিলে মহানবী (সা) পানি আনতে নির্দেশ দেন। অতঃপর তাতে পানি ছিটিয়ে সাধারণভাবে (ধুয়ে) নেন। তবে (খুব কচলিয়ে)[৬২] ধৌত করেননি।[৬৩]

وَعَنْ اُمِّ الْفَضْلِ مَرْفُوْعًا اُمَا يُصَبُّ عَلٰى بَوْلِ الْغُلَامِ وَيُغْسِلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ . أخرجه الطحاوى اسناده حسن ، كما فى اثار السنن ، إعلاء السنن . ج : ١ ، ص ٢٩٣

হযরত উম্মুল ফাযল (রা) সূত্রে মহানবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পুত্র সন্তানের পেশাবের উপর পানি প্রবাহিত করা হয় আর কন্যা সন্তানের পেশাব (খুব কচলিয়ে) ধৌত করতে হয়।[৬৪]

---

৬১. প্রাগুক্ত।

৬২. এই হাদীস সহীহ মুসলিম গ্রন্থের বর্ণনায় وَلَمْ يَغْسِلْهُ শব্দের পর غَسْلًا শব্দ অতিরিক্ত বর্ণিত আছে। অতিরিক্ত ঐ শব্দটি নির্দেশ করছে যে, মহানবী (সা) তখন কাপড়টি আদৌ ধৌত করেননি এমন নয় বরং ধৌত করেছেন তবে খুব ভালভাবে কচলিয়ে কচলিয়ে ধৌত করেননি। এতে বুঝা গেল যে غسل شديد কে নফী করা হয়েছে মাত্র। আর غسل شديد -এর নফী করার দ্বারা مطلق غسل -এর নফী হয় না। **দ্র. আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী, ফাতহুল মুলহিম, খ ১।**

৬৩. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম সূত্র মিশকাতুল মাসাবীহ, দেওবন্দ, মাকতাবা থানবী, তা. বি. বাবু তাতহীরিন নাজাসাত। হাদীসে বর্ণিত نَضَحَهُ শব্দটির ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী হানাফী (র) লিখেছেন,

ای اسال الماء على ثوبه حتى عليه قوله ولم يغسله ای لم يبالغ فی الغسل بالرش والدلك لان الغلام لم ياكل الطعام فلم يكن لبوله عفونة يفتقر فی ازالتها الى المبالغة ولم يرو انه لم يغسله بالمرة بل ازا به التفريق بين الغسلين والتنبيه على انه غسل دون غسل فعبر عن أحدهما بالغسل وعن الاخر بالنضح قال القاضى المراد بالنضح رش الماء بحيث يصل الى جميع موارد البول من غير جرى والغسل الجراء الماء على مواردها

(হাশিয়া, পৃ. ৫২)

৬৪. তাহাভী, সূত্র : ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩।

www.pathagar.com

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيَنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ ، وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ قَتَادَةُ هٰذَا مَا لَمْ يُطْعَمَا ، فَاِذَا طَعِمَا غُسِلاً جَمِيْعًا . رواه ابو داود . ص : ٦٦

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (মহানবী (সা) সূত্রে) বলেন, কন্যা সন্তানের পেশাব (ভালভাবে) ধৌত করতে হয়। আর পুত্র সন্তানের পেশাব (স্বাভাবিকভাবে) পানির ছিটা মেরে ধৌত করতে হয়। যতদিন না তারা খাদ্য গ্রহণ শুরু করবে। অপর বর্ণনায় আছে, কাতাদা (রা) বলেন, এ বিধান যতদিন পর্যন্ত তারা সাধারণ খাদ্য গ্রহণ না করবে ততদিন পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে। যখন খাদ্য গ্রহণ করবে তখন থেকে উভয়ের পেশাবই খুব কচলিয়ে ধৌত করতে হবে।[৬৫]

عَنْ اَبِى السَّمْحِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيَرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ ، رواه النسائى . ص : ٤٠

হযরত আবুস সামহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন। কন্যা সন্তানের পেশাব (কচলিয়ে) ধৌত করতে হয়। আর পুত্র সন্তানের পেশাব পানির ছিটা দিয়ে (সাধারণভাবে) ধৌত করতে হয়।[৬৬]

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, পুত্র সন্তানের ও কন্যা সন্তানের পেশাব পাক করার মধ্যে কিঞ্চিত পার্থক্য বিদ্যমান। পার্থক্য হল কন্যা সন্তানের পেশাব পাক করতে হলে 'গামলুশ শাদীদ' মানে খুব কচলিয়ে ধৌত করা জরুরী। পক্ষান্তরে পুত্র সন্তানের পেশাব সাধারণ ধৌত করাই যথেষ্ট। এটিই ইমাম আযম আবূ হানীফা (রা)-এর অভিমত।[৬৭]

মুহাদ্দিসগণ বলেন, পুত্র সন্তানের পেশাব পাক করার বিষয়ে হাদীসে মোট ৪টি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। এক. لَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلاً খুব কচলিয়ে ধৌত করেননি, দুই. صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ তাতে পানি ঢেলে দিয়েছেন, তিন. يَنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ পুত্র সন্তানের শিশুর পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দেওয়া হবে। চার. يُرَشُّ مِنْ بَوْلِهِ তার পেশাবের উপর পানি টপকিয়ে দেওয়া হবে। এ চারটি শব্দের মধ্যে প্রথমোক্ত দু'টি শব্দ স্পষ্টভাবে ধৌত করার নির্দেশ বুঝাচ্ছে। আর শেষোক্ত

৬৫. ইমাম আবূ দাউদ, আস সুনান, রিয়াদ ঃ দারুস সালাম লিন নাশর ওয়াত তাওযী', এপ্রিল ১৯৯৯, হাদীস, নং ৩৮৭, পৃ. ৬৬।

৬৬. ইমাম আবূ আবদুর রহমান আন নাসাঈ, আস সুনান, রিয়াদ ঃ দারুস সালাম লিন নাশর ওয়াত তাওযী', এপ্রিল ১৯৯৯, হাদীস নং ৩০৫, পৃ. ৪০।

৬৭. ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, ইমাম ইসহাক ইবন রাহওয়াইহি প্রমুখের মতে পুত্র সন্তানের পেশাব ধৌত করার স্থলে পানির ছিটা মেরে দেওয়াই যথেষ্ট। আর ছিটার পরিমাণ সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র)-এর এক বর্ণনা মতে কাপড় থেকে পানির ফোটা ঝরে পড়া শর্ত নয়। তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে তিনি বলেছেন যে, সেই কাপড়ে এত অধিক পরিমাণে পানি ছিটানো আবশ্যক যেন পানির ফোটা ঝরে না পড়লেও কাপড় চিপানো হলে যেন পানি ফোটা ফোটা পড়তে থাকে। (দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭)

www.pathagar.com

দুটির মধ্যে স্পষ্টভাবে ধৌত করার বিষয়টি না বুঝা গেলেও অন্যান্য হাদীসগুলোর সঙ্গে এ দুটির সামঞ্জস্যতা বজায় রাখার প্রয়োজনে এখানে 'আল গাসলুল খাফীফ' অর্থাৎ সাধারণভাবে ধৌত করার অর্থ গ্রহণ করা জরুরী। কেননা বহু হাদীসে সর্বপ্রকার পেশাবকে নাপাক বলা হয়েছে। এবং সর্ব প্রকার পেশাব থেকেই সাবধানতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাজেই যদি উপরোক্ত শব্দ দু'টিকে গাসলে খাফীফ-এর অর্থে গণ্য করা না হয় তাহলে ব্যাপকার্থক ও মূলনীতি নির্দেশক সহীহ হাদীসের সাথে এগুলোর অর্থ নিঃশন্দেহে সাংঘর্ষিক হয়ে যাবে।

তাছাড়া মুহাদ্দিসগণ আরো লিখেছেন যে, نَضْحٌ ও رَشٌّ শব্দদ্বয় আভিধানিকভাবে দুরকম অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো শুধু পানি ছিটানোর অর্থে আবার কখনো পানি ছিটিয়ে ধুইয়ে ফেলার[৬৮] অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহলে দেখা যায় যে, শব্দদ্বয়কে যদি প্রথম অর্থের জন্য গ্রহণ করা হয় তাহলে অন্যান্য হাদীসের সাথে এগুলোর تَعَارُض বৈপরীত্য ঘটে। পক্ষান্তের দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হলে কোন বৈপরীত্য থাকে না। বিধায় দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণই অগ্রাধিকার প্রদানযোগ্য।[৬৯]

ইমাম আবূ জাফর তাহাভী (র) লিখেছেন যে, نَضْحٌ ও رَشٌّ শব্দ গাসলে খাফীফ-এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত মহানবী (সা)-এর বহু সহীহ হাদীসেও বিদ্যমান। এমতাবস্থায় শব্দদ্বয়কে গাসলে খাফীফ অর্থে ব্যবহার করার মধ্যে কোন ত্রুটি থাকার প্রশ্নই উঠে না।

কোন কোন ফকীহ শব্দদ্বয়কে শুধু পানি ছিটানোর অর্থে গ্রহণ করে লিখেছেন যে, পুত্র সন্তানের পেশাব ধৌত করার প্রয়োজন নেই। পেশাব মিশ্রিত কাপড়ের উপর সামান্য পানি ছিটিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট। তাদের এ অভিমত সর্বাংশে শুধু নয়। কেননা এ অভিমত সম্পূর্ণ একপেশে। এ অভিমতের দ্বারা সকল হাদীসকে আমলে আনা এবং হাদীসের উপর আমল বজায় রাখার সুযোগ থাকে না। বিশেষ করে যে সব হাদীসে মুতলাকান অর্থাৎ ব্যাপকভাবে সকল পেশাব থেকে সাবধনতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেগুলোর উপর আমল ছুটে যায়।

---

৬৮. যেমন নিম্মোক্ত হাদীসগুলোতে نضح শব্দকে স্বয়ং শাফিঈ ফকীহগণও غـــسل -এর অর্থে ব্যবহার করেন;

عن علي فى السوال من المذى انه عليه السلام قال اذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وفى رواية مسلم يغسل ذكره ، وفى الترمذى عن سهل قال كنت القى من المذى شدة فسألت النبى ﷺ قال انما يجزيك من ذالك الوضوء قلت يارسول الله فكيف بما يصيب ثوبى منه فقال عليه السلام يكفيك ان تاخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك .

অনুরূপভাবে رَشّ শব্দটিকে غَسَلَ শব্দের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে নিম্নোক্ত হাদীসগুলোতে যেমন;

فى رواية الترمذى قال حتيه ثم اقرصيه ثم رشيه وصلى فيه ، وعن ابن عباس انه حكى ح\وضوء النبى ﷺ اخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها (المراد بالرش ههنا هوصب الماء قليلا قليلا وهو الغسل يعينه .

(দ্র. আইনী, ফাতহুল মুলহিম, বাযলুল মাজহূদ, সূত্র তানযীমুল আশতাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪)

৬৯. لوجه التوافق بين الروايات

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানের পেশাব থেকে কাপড় পাক করার ব্যাপারে গাসলে খাফীফ ও গাসলে শাদীদ-এর পার্থক্য কেন করা হয়েছে তার ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন এক. শিশুদের মধ্যে মানুষ সহজাত প্রকৃতিগত কারণে মেয়ে শিশুর তুলনায় ছেলে-শিশুর প্রতি বেশী দুর্বল হয়ে থাকে। (যদিও স্নেহ মমতার ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ের মধ্যে কোনরূপ কমবেশীর ব্যবধান শরী'আতে পসন্দনীয় নয়।) তাই ছেলে শিশুকে স্নেহ করা, কোলে নেওয়া, আদর সোহাগ করার পরিমাণ সাধারণভাবে বেশী। আর পরিমাণ বেশী হওয়ার কারণে পুত্র সন্তানের পেশাব থেকে কাপড় পাক করার পদ্ধতিকে কিছু হাল্‌কা করে দেওয়া হয়েছে, যেন মানুষের কষ্ট কম হয়। পক্ষান্তরে কন্যা সন্তানের আদর সোহাগের পরিমাণ সে তুলনায় কিছুটা কম বিধায় পবিত্রতার বিধান হাল্‌কা করার প্রয়োজন দেখা দেয়নি।[৭০]

অপর অভিমতে প্রকৃতিগতভাবেই কন্যা সন্তানের পেশাব ঘাড় আর পুত্র সন্তানের পেশাব পাতলা হয়ে থাকে। কাজেই কন্যা সন্তানের পেশাব কাপড়ের মধ্যে যেভাবে মিশে যায় পুত্র সন্তানের পেশাব এতটুকু শক্তভাবে মিশে যায় না। এ কারণেই উভয়ের পেশাব ধৌত করার পদ্ধতিতে সামান্য পার্থক্য করা হয়েছে। অন্য একটি অভিমতে বলা হয়েছে যে, কন্যা সন্তানের পেশাবে পুত্র সন্তানের পেশাবের তুলনায় দুর্গন্ধ বেশী। তাই এই পার্থক্য করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইমাম তাহাভী (র)-এর অভিমত বেশী যুক্তিযুক্ত। তিনি লিখেছেন, পুত্র ও কন্যার পেশাব নির্গমন স্থল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। এ ভিন্নতার কারণে পুত্র সন্তানের পেশাব বিস্তৃতি কম হয়, প্রক্ষান্তরে কন্যা সন্তানের পেশাব এক স্থানে পতিত না হওয়ায় বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ে। নির্গত পেশাব পতিত স্থানকে অপবিত্র করার মধ্যে উপরোক্ত পার্থক্যের কারণে কাপড় পাক করার বিধানেও পার্থক্য করা হয়েছে।[৭১]

ভূমি পবিত্র করার নিয়ম

ভূমির উপর পেশাব বা এ জাতীয় কোন তরল নাপাকী পতিত হলে ভূমির যে অংশটুকু ভিজে থাকে সেটুকু নাপাক হয়ে যায়। এ নাপাকী থেকে ভূমি পাক করার তিনটি পদ্ধতি আছে। যথা ঃ এক. ভূমিটি নিজ থেকে শুকিয়ে যেতে দেওয়া।[৭২] দুই. পতিত নাপাকীর উপর তিন বার[৭৩] পানি প্রবাহিত করে দেওয়া। তিন. পতিত অংশে মাটি খুঁড়ে ফেলে দেওয়া। উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতির যে কোন একটি অবলম্বন করা হলেই নাপাক ভূমি পবিত্র হয়ে যাবে। তবে দ্রুত করার জন্য কিংবা দুর্গন্ধ বিদূরীত করার জন্য একসঙ্গে একাধিক পদ্ধতিও অবলম্বন করা যায়। এটিই ইমাম আযম আবূ হানীফা (রা)-এর অভিমত।[৭৪]

---

৭০. তানযীমুল আশতাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪।

৭১. তানযীমুল আশতাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪।

৭২. আল্লামা মুরগীনানী, আল-হিদায়া, দেওবন্দ ঃ আশরাফী বুক ডিপো, তা বি, বাবুল আনজাস ওয়া তাতহীরুহা, খ. ১, পৃ. ৫৮।

৭৩. আল্লামা কাসানী, বাদাইউস সানাঈ, বায়রূত, দারু ইহয়ায়িত তুরাস আল আরাবী, ২০০০, খ ১, পৃ. ২৫১।

৭৪. কিন্তু ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ ইবন-হাম্বল (র) প্রমুখের মতে নাপাক ভূমি পবিত্র করার একমাত্র পদ্ধতি হল, সেই ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করে দেওয়া। তাদের মতে শুকিয়ে যাওয়ার

www.pathagar.com

উপরোক্ত ত্রিবিদ পদ্ধতির প্রত্যেকটিই মহানবী (সা)-এর হাদীস থেকে প্রমাণিত। যেমন ভূমি নিজ থেকে শুকিয়ে গেলে অর্থাৎ সূর্যের তাপ, বাতাসের প্রবাহ কিংবা অন্য কোন উপায়ে নাপাকী পতিত স্থানটি যদি এমনভাবে শুকিয়ে যায় যে, তাতে নাপাকীর কোন চিহ্ন নেই তাহলে ঐ ভূমি পবিত্র হয়ে যাকে। তাতে নামায আদায় করতে কোন অসুবিধা নেই।[৭৫]

এ মর্মে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো লক্ষণীয় ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ فِى الْمَسْجِدِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكُنْتُ فَتًى شَابًا عَزَبًا وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُوْلُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِى الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرُشُّوْنَ شَيْئًا مِّنْ ذٰلِكَ رواه أبو داؤد فى باب طهور الارض اذايبست .

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে মসজিদে থাকতাম (রাত যাপন করতাম)। আর সেকালে আমি ছিলাম অল্প বয়স্ক ও অবিবাহিত যুবক। তখনকার দিনে কুকুর পেশাব করত এবং মসজিদের ভিতর আনাগোনা করত। তাতে মুসলমানগণ (নামায আদায় করত কিন্তু) এর উপর পানির কোন ছিটা দিত না।[৭৬]

উল্লেখ্য, কুকুরের পেশাব নাপাক। এ নাপাকী ভূমিতে পড়লে সেই ভূমিও নাপাক হয়ে যায় তাতে কারো দ্বিমত নেই। বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে এতদসত্ত্বেও মসজিদের সেই ভূমি মেঝের উপর কোন প্রকার পানি ছিটানো হত না। তাহলে তাঁরা যে নামায পড়তেন তা কিভাবে পড়তেন ? নিশ্চয় এ কারণে পড়তেন যে, তাঁরা এ কথা মেনে নিয়ে ছিলেন যে, নাপাকী ভূমির উপর পতিত হওয়ার পর ভূমি যদি তা চুষে নেয় তাহলে ভূমি আর নাপাক থাকে না। এ থেকে উদ্ভাষিত হয় যে, ভূমি পাক হওয়ার একটি পদ্ধতি হল ভূমিটি এমনভাবে শুকিয়ে যাওয়া যে, সেখানে নাপাকীর কোন চিহ্ন দেখা যায় না।[৭৭]

দ্বারা ভূমি পবিত্র হয় না। দ্র. আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নোরী, মা'আরিফুস সুনান, দেওবন্দ ঃ মাকতাবা নূরিয়্যা, ত. বি. খ. ১, পৃ. ৪৯৮।

৭৫. তবে এ পদ্ধতিতে পাককৃত ভূমির মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা দুরস্ত নয়। আল্লামা মুরগীনানী, আল হিদায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

৭৬. ইমাম আবূ দাঊদ, আস সুনান, রিয়াদ, দারুস সালাম লিন্‌ন নাশরওয়াত তাওযী', বাব ঃ তুহুরুল আরদ ইযা ইয়াবিসাত, হাদীস নং ৩৮২, পৃ. ৬৬-৬৭।

৭৭. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) লিখেছেন;

قال اصحابنا اذا اصابت الارض نجاسة رطبة فان كانت الارض رخوة صب عليها الماء حتى ينسفل فيها واذا لم يبق على وجهها شئ من النجاسات وتسفل الماء يحكم طهارتها ولا يعتبر فيه العدد وانما هو على غالب ظنه انها طهرت ويقوم التسفل فى الارض مقام العصر فيما لا يحتمل العصر وعلى قياس ظاهر الرواية يصب عليها الماء ثلاث مرات وينسفل فى كل مرة وروى عن أبى حنيفة انها بعد صب الماء عليها لا تطهر حتى تدلك وتنشف بصوف اوخرقة ، وفعل ذالك ثلاث مرات وان لم تفعل ذالك لكن صب عليها ماء كثيرًا حتى انه زال النجاسة ولم يوجد فيه لون ولا ريح ثم ترك حتى نشفت كانت طاهرة وان كانت الارض صعودًا يحفر فى اسفلها حفيرة ويصب الماء عليها ثلث مرات ونتسفل الى الحفيرة ثم تكبس الحفرة وان كانت مستوية بحيث لا يزول عنها الماء لايغسل لعدم الفائدة فى الغسل بل تحفر وعن أبى حنيفة لا تطهر

www.pathagar.com

হাদীসখানা ইমাম বুখারী তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন[৭৮] তবে তার বর্ণনায় تبــول (কুকুর পেশাব করত) শব্দটি নেই।[৭৯] তথাপি تبـــول শব্দ ব্যতিরেকেও হাদীসের অবশিষ্ট বক্তব্য বুঝায় যে, নাপকী শুকানোর দ্বারা ভূমি পাক হয়ে যায়। সেটি এভাবে যে, হযরত ইবন উমর (রা) বলছেন, আমি অবিবাহিত ও নওজোয়ান অবস্থায় মসজিদে থাকতাম। অর্থাৎ তিনি যেন ইঙ্গিত করতে চাচ্ছেন যে, এ বয়সে সাধারণত রাতে মানুষের স্বপ্নদোষও হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও কোন প্রকার পানি ছিটানো হত না। উল্লেখ্য যে, যদি এ ধরনের কোন কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করা তাঁর মনস্থ না হত তাহলে হাদীসের বাক্যে শব্দগুলো উল্লেখের কোনই প্রয়োজন ছিল না।

তাছাড়া বুখারীর বর্ণনার মধ্যেও কুকুরের আনাগোনার কথা আছে। এ কথায় কোন সন্দেহ নেই যে, কুকুর যেখানেই যায় সেখানেই পেশাব করে। কুকুরের এ অভ্যাসটি এত বেশী যে, এটি হেঁটে গিয়েছে বলা হলে সবাই নিশ্চিত বুঝে নেয় যে, অবশ্যই সে পথে পথে পেশাব করেছে। কাজেই 'আনাগোনা করত'–কথাটির মধ্যেও পেশাব করত বিষয়টিও লুকিয়ে আছে বিধায় বুখারীর বর্ণনা দ্বারাও হানাফী ফকীহদের অভিমত প্রমাণিত হয়।[৮০]

আল্লামা খাত্তাবী (র) অবশ্য একটি ব্যাখ্যায় বলেন যে, কুকুর–মসজিদের ভিতর আসা যাওয়া করত বলে উল্লেখ থাকলেও তাতে পেশাব করত হাদীসে এ কথা বলা নেই। হাদীসের উদ্দেশ্য হল, কুকুর বাইরে পেশাব করত তারপর মসজিদে ঢুকত আবার বের হত। আল্লামা কাশ্মীরী (সা) বলেন, এ ব্যাখ্যা শুদ্ধ নয়। কারণ কুকুর কোন কালেই এমন শিক্ষিত ছিল না যে, মসজিদের সম্মানের কথা চিন্তা করা সেখানে পেশাব না করে বাইরে কোথাও পেশাব করত। অতঃপর মসজিদের আনাগোনা করত। তাছাড়া কুকুর যদি বাইরেই পেশাব করত তাহলে হযরত ইবন উমর (রা)-এর সেটি উল্লেখের কোন প্রয়োজনই ছিল না। এরূপ হলে হাদীসের শেষ বাক্যের সাথে এর কোন সম্পর্কই থাকে না।

الارض حتى تحفر الى الموضع الذى وصلت اليه النداوة وينقل التراب ، كما فى عمد القارى ج : ١ ، ص : ٨٨٤

৭৮. ইমাম বুখারী, আস সহীহ, রিয়াদ, দারুস সালাম লিন নাশর ওয়াত তাওযী', মার্চ ১৯৯৯, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস নং ১৭৪, পৃ. ৩৪-৩৫।

৭৯. আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী (র) বলেন, সহীহ্ বুখারীর বর্তমান কপিতে تبـــــول শব্দটির উল্লেখ না থাকলেও ইমাম বায়হাকীর বক্তব্য অনুসারে জানা যায় যে, সহীহ বুখারীর অন্যান্য নুসখায় শব্দটি বিদ্যমান আছে। ইমাম বায়হাকী (র) তাঁর সুনান গ্রন্থের ২য় খণ্ডে বিষয়টি-বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া এ হাদীস ইমাম বুখারী (র) অপর একটি সনদে نوم الرجـال فى المسـجـد অনুচ্ছেদেও বর্ণনা করেছেন। মা'আরিফুস সুনান, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৪।

৮০. আল্লামা কাশ্মীরী (র) বলেন,

هذا تاويل يابى عنه الذوق ، والباعث لامثال هولاء الافاضل على مثل هذا التكلف البعيد أخرجه عن احتجاج الحنفية ، وظاهر سياق العبارة ان اظرف للمعطوفات كلها ولم ينته الكلام الاول على قوله ومقبول ولوكان غرض بن عمر بول الكلاب خارج المسجد واقبالها وابدارها فى المساجد لم يكن هناك داعية لذكر بولها اصلاً ، كما فى فتح البارى ، ج : ١ ، ص : ١٩٦

www.pathagar.com

মোটকথা হাদীস দ্বারা হযরত ইবন উমরের উদ্দেশ্য হল, একথা বলা যে, ভূমি নিজ থেকে শুকানোর কারণে পাক হয়ে যায়। তা পানি ঢেলে পাক করার প্রয়োজন হয় না। এ কারণে নবীযুগে মসজিদে কুকুরের পেশাব করা কিংবা পেশাবের পর আনাগোনা করা কিংবা স্বপ্নদোষ হওয়ার আশংকা থাকে এমন লোকদের নিদ্রা যাপনের পরেও কোন চিহ্ন বিদ্যমান না থাকা অবস্থায় মসজিদের মেঝের উপর কেউ পানির ছিটা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করত না।[৮১]

عَنْ نَافِعٍ قَالَ سُئِلَ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْحِيْطَانِ تَكُوْنُ فِيْهَا الْعُذْرَةُ وَاَبُوْلُ النَّاسِ وَرَوْثُ الدَّوَابِّ فَقَالَ اِذَا سَالَتْ عَلَيْهِ الْاَمْطَارُ وَجَفَفَتْهُ الرِّيَاحُ فَلَا بَأْسَ فِى الصَّلٰوةِ فِيْهِ وَيَذْكُرُ ذَالِكَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

رواه الطبرانى فى الوسط ، وفيه عمر بن عثمان الكلابى الرقى ، ضعفة أبو حاتم والازدى ووثقه أبو حاتم وابن حبان وقال ابن عدى له الحديث صالحة وبقية رجاله الصحيح خلا شيخ الطبرانى كذا فى مجمع الزوائد – ج : ١ ، ص : ١١٨ وشيخ الطبرانى ثقة على قاعدة مجمع الزوائد اعلاء ص : ٣٨٠.

হযরত নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, বাগানে মলমূত্র বা মানুষের পেশাব বা জীব-জন্তুর পায়খানা থাকে। (অর্থাৎ লোকজন প্রয়োজনের সময় বাগানে ঢুকে পেশাব করে থাকে বা জন্তুরাও ঘাস খাওয়ার সময় পেশাব পায়খানা করে থাকে। এমতাবস্থায় বাগানের মাটিতে দাড়িয়ে নামায পড়া যাবে কি না?) তখন তিনি বললেন, নাপাকীর উপর বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হলে কিংবা সেগুলো বাতাসের কারণে শুকিয়ে গেলে তাতে নামায আদায়ে কোন আপত্তি নেই। কথাটি মহানবী (সা) সূত্রে বর্ণনা করেন।[৮২]

وَقَدْ جَاءَ مَوْقُوْفًا عَنْ عَائِشَةَ ذَكٰوةُ الْاَرْضِ يُسَبِّهَا وَعَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ جُفُوْفُ الْاَرْضِ طُهُوْرُهَا وَعَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ اِذَا جَفَّتِ الْاَرْضُ فَقَدْ ذَكَتْ وَفِى الْمَبْسُوْطِ مَرْفُوْعًا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَيُّمَا اَرْضٍ جَفَّتْ فَقَدْ ذَكَتْ .

---

৮১. আল্লামা তাকী উসমানী, দরসে তিরমিযী, করাচী : মাকতাবা দারুল উলূম, আগস্ট ১৯৮৮, খ. ১, পৃ. ৩৯১; আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী, বাযলুল মাজহূদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, তাবি, খ. ৩, পৃ. ১২৬-১৩১।

৮২ আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, করাচী : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূম আল ইসলামিয়্যা, হি. ১৩৯৭, বাব তাহারাতুল আরদ বিল জাফাফ, খ. ১, পৃ. ২৮০।

www.pathagar.com

বিভিন্ন মাওকূফ হাদীসে আছে, যেমন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ভূমির পবিত্রতা হল তা শুকিয়ে যাওয়া।[৮৩] হযরত আবূ কিলাবা (র) বলেন, ভূমি শুকিয়ে যাওয়া মানে পবিত্র হয়ে যাওয়া।[৮৪] হযরত ইবনুল হানাফিয়্যা (র) বলেন, ভূমি যখন শুকিয়ে যায় তখন তা পাক হয়ে যায়।[৮৫] মাবসূত গ্রন্থে মহানবী (সা) সূত্রে বলা হয়েছে, যে কোন ভূমি যখন তা শুকিয়ে যাবে তখন তা পবিত্রও হয়ে যাবে।[৮৬]

উপরোক্ত হাদীসগুলো সবই নির্দেশ করছে যে, ভূমি শুকিয়ে যাওয়ার দ্বারা পবিত্র হয়ে যায়। এ হাদীসগুলো মাওকূফ হাদীস। তাতে আপত্তি নেই। কেননা মাওকূফ হাদীসও হানাফী উসূলে ফিকহ্ অনুসারে গৃহীত ও দলীল হিসাবে উপস্থাপন যোগ্য। তা ছাড়া উপরোক্ত হাদীসগুলো এমন একটি বিষয় সংক্রান্ত যা কেউ বিবেক খাটিয়ে বলতে পারে না। আর যারা বলছেন, তারাও শরী'আতের ভিতরে স্বকপোলকল্পিত কোন কথা অনুপ্রবেশ করিয়েছেন–এমন ধারণা করা যায় না। তাই নিশ্চিত বলা চলে যে, তারা কথাগুলো নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে মহানবী (সা) থেকেই জেনে বলছেন বিধায় হাদীসগুলো মাওকূফ হওয়া সত্ত্বেও মারফূ-এর সমমর্যাদার অধিকারী।[৮৭]

নাপাক ভূমিকে পাক করার দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, নাপাকী পতিত হওয়া স্থানের উপর পাক পানি প্রবাহিত করে তা ধুইয়ে নেওয়া। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ লক্ষণীয় ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ اَعْرَابِىٌّ فَبَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ دَعُوْهُ وَهَرِيْقُوْا عَلٰى بَوْلِهِ سَجْلاً مِّنْ مَاءٍ اَوْ ذَنُوْبًا مِّنْ مَّاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ ۔ رواه البخارى فى باب صب الماء على البول فى المسجد رقم الحديث : ٢٢٠ ،

৮৩. মোল্লা আলী কারী, শারহুন নিকায়া, খ. ১, পৃ. ৪৪ সূত্রঃ মা'আরিফুস সুনান, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৫।

৮৪. আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী, মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৫। তাছাড়া হাদীসখানা মুসান্নাফে ইবন আবী শায়বা গ্রন্থে (খ. ১, পৃ. ৪১) বর্ণিত হয়েছে। সনদ সহীহ্ গ্রন্থের সমপর্যায়। সূত্র ঃ আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২।

৮৫. মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৫

৮৬. আল্লামা আবুল হাসান, তানযীমুল আশতাত, চট্টগ্রাম ঃ আল হেলাল প্রকাশনী, ১৯৯৭, খ. ১, পৃ. ১৯০।

৮৭. আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী (র) লিখেছেন ঃ

فهذه الاثار لعائشة وأبى جعفر الباقر وابن الحنفية وأبى قلابة وان كانت موقوفة لكنها فى حكم المرفوعة كلها حجة للامام أبى حنيفة رحمه الله فلم يترك الحنفية حديثًا فى الباب الا وقد اخذه ، فحديث أبى هريرة وانس من غير ذكر الحفر يصدق على صورة ، حديث الحفر على صورة اخرى وحديث ابن عمر فى الجفاف فكلها مستقيم على المذهب من غير تاويل ، بل تخريج المذهب الجزئيات المختلفة انما هو على يبق هذه الروايات وترى سائر المذاهب فى هذا الباب خالية عن هذه الدقة التى سلكها الحنفية ، معارف السنن ج : ١ ، ص ٥٠٦

www.pathagar.com

ص : ٤١ وفى باب قول النبى ﷺ يسر واولا تعسروا ورقم الحديث ٦١٢ ،
ص : ١٠٦٧

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক বেদুঈন[৮৮] মসজিদের নববীতে দাঁড়াল এবং পেশাব শুরু করে দিল[৮৯]। তখন সাহাবীগণ তাকে ভাল-মন্দ বলতে লাগলে মহানবী (সা) বললেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দাও[৯০]। হ্যাঁ, সে যে পেশাব করে দিয়েছে তার উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কিংবা বলেছেন, তাতে বালতি ভর্তি পানি ঢেলে দাও। কারণ তোমাদেরকে প্রেরণ[৯১] করা হয়েছে সহজ ও কোমলতা প্রদর্শণকারীরূপে, কঠোরতা আরোপকারীরূপে নয়।[৯২]

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَاءَ اَعْرَابِىٌّ فَقَامَ يَبُوْلُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَهْ مَهْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُزْرِمُوْهُ دَعُوْهُ فَتَرَكُوْهُ حَتّٰى بَالَ ثُمَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ بِشَيْءٍ مِّنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَالْقَذْرِ ، اِنَّمَ هِىَ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةِ وَقِرَائَةِ الْقُرْاٰنِ اَوْ كَمَا قَالَ قَالَ وَاَمَرَ رَجُلاً مِّنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِّنْ مَّاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ . متفق عليه نقله صاحب مشكوة المصابيح فى باب تطهير النجاسات .

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে মসজিদে নববীতে অবস্থানরত ছিলাম এমন সময়ে জনৈক বেদুঈন এসে মসজিদের ভিতরে

---

৮৮. বেদুঈন লোকটির নাম সম্পর্কে একাধিক মতামত পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন আল-আকরা আল হাবিস তাইমী। কেউ বলেছেন যুল খুওয়াইমারা-আল ইয়ামানী, কেউ বলেছেন তিনি ছিলেন উয়াইনা ইবন হিসন (রা)। দ্র. আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী, বাযলুল মাজহূদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

৮৯. সাহাবীগণের সকলেই ছিলেন ভদ্র ও উন্নত রুচিবোধ সম্পন্ন। কিন্তু এই লোকটি বেদুঈন ছিল বিধায় ততক্ষণেও শরী'আতের আদাব ও শিষ্টাচার সম্পর্কে শিখে উঠতে পারেনি। সে জানত না যে, মসজিদে এভাবে পেশাব করা নাজায়িয, প্রাগুক্ত।

৯০. পেশাব চলা অবস্থায় হঠাৎ কোন কারণে পেশাব বন্ধ করা হলে অনেক সময় শারীরিক বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় বিধায়, কিংবা তাকে ধমকা-ধমকী করা হলে ভয়ে বেচারা হয়ত ছুটাছুটি শুরু করবে আর তখন পেশাব এক স্থানে পতিত না হয়ে বিভিন্ন স্থান বিনষ্ট করবে আশংকায় মহানবী (সা) তাকে ধমক দিতে বারণ করেন। বাযলুল মাজহূদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

৯১. মাবউস তথা প্রেরিত হওয়ার বিষয়টি প্রধানত মহানবী (সা)-এর বিশেষণ। এখানে সাহাবীগণকে প্রেরিত বলার কারণ হল যে, যেহেতু সাহাবীগণ মহানবী (সা)-এর উপস্থিতিতে কিংবা অনুপস্থিতিতে তাঁর পক্ষ থেকে শরী'আতের পয়গাম অন্যদের কাছে পৌছিয়ে দিতে আদিষ্ট। মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৬।

৯২. ইমাম বুখারী, আস সহীহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২২০, পৃ. ৪১ ও হাদীস নং ৬১২৪, পৃ. ১০৬৭।

www.pathagar.com

দাঁড়াল এবং পেশাব শুরু করে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণ বলতে লাগলেন; থাম, থাম; (তুমি এ কি করছো ?) রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, লোকটিকে পেশাব শেষ করতে দাও, তাকে বারণ করো না।[৯৩] সাহাবীগণ তাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর লোকটির পেশাব শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ডেকে নিয়ে বললেন, (দেখ) এ সকল মসজিদে পেশাব করা কিংবা ময়লা ফেলা যায় না। এগুলো হল যিকর করা, নামায পড়া, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা ইত্যাদির স্থান[৯৪]। কিংবা রাসূলুল্লাহ এ ধরনের অন্য কোন বাক্য বলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) উপস্থিত একজনকে আদেশ দিলে তিনি এক বালতি পানি নিয়ে আসেন। অতঃপর তা পেশাবের উপর প্রবাহিত করে দেন।[৯৫]

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَعْرَابِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فَصَلّٰى قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَمُحَمَّدًا لاَ تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ اَنْ بَالَ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَاَسْرَعَ النَّاسُ اِلَيْهِ فَنَهَاهُمُ النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ اِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ ، صَبُّوْا عَلَيْهِ سَجَلاً مِّنْ مَّاءٍ اَوْ قَالَ ذَنُوْبًا مِنْ مَّاءٍ . رواه أبو داؤد ، ص : ٦٦ والترمذى والنسائى وابن ماجه

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন মসজিদে নববীতে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন সেখানে উপবিষ্ট। অতঃপর সে নামায পড়ল। ইবন আবাদা (র) বর্ণনা করেন যে, সে দু'রাক্'আত নামায পড়ল। তারপর বলল, হে আল্লাহ! আমার উপর এবং মুহাম্মদ (সা)-এর উপর দয়া কর, আমাদের প্রতি প্রদত্ত এ দয়ার মধ্যে অন্য কাউকে শরীক কর না। (দু'আর বাক্য শুনে) মহানবী (সা) মন্তব্য করে বলেন, তুমি একটি ব্যাপক জিনিসকে সংকীর্ণ করে ফেললে। তারপর খুব সময় অতিক্রান্ত হয়নি,

৯৩. বস্তুত মহানবী (সা) উম্মতের প্রতি অপার দয়ালু ও মেহেরবান ছিলেন। তাই লোকটিকে ধমক দিতে বারণ করলেন। তা ছাড়া উপরোক্ত হাদীস মানুষকে দীন শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে তাদের প্রতি কোমলতা ও কল্যাণকামিতা পোষণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছে। নওয়াব কুতবুদ্দীন খান দেহলভী, মোযাহিরে হক, দেওবন্দ ঃ ইদারা ইসলামিয়্যাত, ১৯৮৬, খৃ., পৃ. ৪৫০।

৯৪. মহানবী (সা) লোকটিকে কাছে ডেকে নিয়ে আদর করে যখন বোঝালেন তখন সে বিষয়টি বুঝে নিল এবং নিজে মহানবী (সা)-এর দয়ার সামনে খুবই বিগলিত হয়ে গেলেন। যেমন ইবন মাজা গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে আছে।

فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ بَعْدَ اَنْ فَقِهَ فَقَامَ اِلَىَّ ، بِاَبِىْ وَاُمِّىْ ، فَلَمْ يُؤَنِّبْ وَلَمْ يَسُبَّ

ইমাম ইবন মাজা, আস সুনান, রিয়াদ ঃ দারুস সালাম লিন নাশরওয়াত তাওযী', এপ্রিল ১৯৯৯, বাবুল আরদ' ইউসীবুহাল বাউলু কাইফা তুগসালু, হাদীস নং ৫২৯, পৃ. ৭৫।

৯৫. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম সূত্র ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু তাতহুরিন নাজাসাত, দেওবন্দ ঃ মাকতাবা থানবী, তাবি, পৃ. ৫২।

www.pathagar.com

ইত্যবসরে লোকটি মসজিদে নববীর এককোণে পেশাব শুরু করে দেয়। ফলে লোকজন তাকে নিষেধ করার জন্য ছুটে আসতে থাকে। মহানবী (সা) ছুটে আসা লোকদের বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। মহানবী (সা) আরো বললেন যে, তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে আচরণে কোমলতা প্রদর্শনের জন্য।[৯৬] কোনরূপ কঠোরতা দেখানোর জন্য তোমাদের পাঠানো হয়নি।[৯৭]

উপরোক্ত হাদীসসমূহ স্পষ্ট প্রমাণ করছে যে, ভূমির উপর পতিত নাপাকীর উপর পানি ঢেলে দেওয়া হলে সেই ভূমি পাক হয়ে যায়।

ইমাম কামালুদ্দীন ইবন হুমাম (র) বলেন, বর্ণিত হাদীসে নাপাক ভূমি পানি দ্বারা পাক করার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে মাত্র। হাদীসের কোন বাক্যে এমন কোন ইঙ্গিত নেই-যে, নাপাক ভূমি পাক করার এটিই একমাত্র পদ্ধতি, কিংবা এমনও ইশারা নেই যে, নাপাক ভূমি শুকানোর দ্বারা পাক হয় না।[৯৮]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, কেউ কেউ মনে করে যে, হাদীসখানা ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বর্ণিত অভিমতের বিরোধী।

বস্তুত এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) পানির প্রবাহ দ্বারা পাক করার পদ্ধতিকে অস্বীকার করেননি। তাঁর মতে তিনটি পদ্ধতিতে নাপাক ভূমি পাক করা যায়। তন্মধ্যে পানির প্রবাহও একটি। আর উপরোক্ত হাদীস সেই পদ্ধতির দলীল। কাজেই হাদীসখানা তার অভিমতের বিরুদ্ধে হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।[৯৯]

আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী (র) বলেন, যে সকল ক্ষেত্রে একাধিক বিকল্প ব্যবস্থা থাকে সেখানে ঐ বিকল্পগুলোর কোন একটি অবলম্বন করা হলে এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, অন্যটি কেন অবলম্বন করা হল না। তাছাড়া নাপাক ভূমি পাক করার পদ্ধতি তিনটি মহানবীর হাদীসে বর্ণিত আছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বর্ণিত সেই তিনটিকেই নিজ ফিকহে অন্তর্ভুক্ত করেছেন যেন সকল হাদীসের উপর আমল বজায় থাকে। অন্যরা শুধু একটি পদ্ধতিকে অবলম্বন করেছেন বিধায় তাদের ফিকহের মধ্যে অপর দুই পদ্ধতি বিষয়ক হাদীসের উপর আমল নিঃসন্দেহে বাদ পড়ে যায়।[১০০] এ মাস'আলা থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর ফিকহের মধ্যে বেশী সংখ্যক হাদীসের উপর আমল বজায় রাখার বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।[১০১]

---

৯৬. সত্যের পথে আহবানকারী মুসলমানের আচরণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হল, 'তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, তাতে হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা ভয় করবে।' (সূরা তাহা, ২০ : ৪৪)

৯৭. ইমাম আবূ দাউদ আস সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৮০, পৃ. ৬৬; ইমাম তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৪৭, পৃ. ৪১।

৯৮. আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী, বাযলুল মাজহুদ, খ. ৩, পৃ. ১২৬।

৯৯. উমদাতুল কারী, খ. ১, পৃ. ৮৮৪, সূত্র : মা'আরিফুস সুনান, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০২।

১০০. মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫০৩।

১০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৬।

www.pathagar.com

ভূমি পাক করার ত্রিবিদ পদ্ধতির মধ্যে স্থান-কাল-পাত্র পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুসারে যে কোন একটিকে ইখতিয়ার করা যায়। যেমন বর্ণিত হাদীসে বেদুঈনের পেশাব থেকে ভূমি পাক করার জন্য মহানবী (সা) পানি প্রবাহের বিকল্প গ্রহণ করেন। এ বিকল্পকে অগ্রাধিকার প্রদানের কারণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

এক. যেহেতু ঘটনাটি হয়ত ঘটে ছিল দিনের বেলায়। দিনের বেলায় কিছুক্ষণ পরপরই নামাযের জামা'আত হয়। তাই পরবর্তী নামাযের পূর্বে পতিত স্থানটি শুকানোর সম্ভাবনা না থাকায় মহানবী (সা) শুকানোর অপেক্ষা না করে পানি প্রবাহের মাধ্যমে ভূমি পাক করে নেয়ার ব্যবস্থা করেন।[১০২] কিংবা

দুই. যখন ঘটনাটি ঘটে তখন পরবর্তী নামাযের সময় ঘনিয়ে আসছিল বলে শুকানোর বিকল্প গ্রহণ না করে পানি প্রবাহের বিকল্প গ্রহণ করেন।[১০৩] কিংবা

তিন. উভয় বিকল্পের মধ্যে পানি প্রবাহিত করে নাপাক দূর করা তুলনামূলকভাবে উত্তম বিধায় মহানবী (সা) উত্তম বিকল্প গ্রহণ করেন।[১০৪] কিংবা

চার. পানি প্রবাহিত করা হয়েছিল দুর্গন্ধ দূর করার জন্য। নতুবা ভূমি ইতোপূর্বেই পানি চুষে নিয়ে ফেলেছিল বলে পাক হয়ে গিয়েছিল।[১০৫] কিংবা

পাঁচ. যেহেতু এটি ধৌত করার সুযোগ আছে বিধায় ধৌত করেছিলেন। সুযোগ না থাকলে এভাবে ধৌত করতেন না। কেননা আবূ দাঊদ শরীফের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, বেদুঈন পেশাব করেছিল فى ناحية المسجد অর্থাৎ মসজিদের এক কোণে। তাতে বুঝা যায়। কোণে মানে এমন স্থানে যেখানে পানি প্রবাহিত করলে প্রবাহিত পানি সহজে বাইরে চলে যাবে। হয়ত মধ্যখানে হলে কিংবা এমন কোন স্থানে যদি হত যেখানে প্রবাহিত পানি গড়িয়ে বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা নেই সেখানে শুকানোর জন্যই অপেক্ষা করা হত।[১০৬]

নাপাক ভূমি পাক করার তৃতীয় পদ্ধতি হল যেতুটুকু ভূমিতে নাপাকী পড়েছে ততটুকু ভূমি খুড়ে ফেলে দেওয়া। এভাবে মাটি খুড়ে ফেলে দিলে নাপাকের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যায়[১০৭]।

এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো লক্ষণীয় ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقَلِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ صَلّٰى اَعْرَابِىٌّ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيْهِ وَقَالَ يَعْنِىْ النَّبِىَّ ﷺ خُذُوْا مَا بَالَ عَلَيْهَا مِنَ التُّرَابِ

১০২. আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী, ফাতহুল মুলহিম, ১ম খণ্ড, সূত্র ঃ তানযীমুল আশতাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

১০৩. প্রাগুক্ত।

১০৪. প্রাগুক্ত।

১০৫. প্রাগুক্ত।

১০৬. মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০২।

১০৭ আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী (র) লিখেছেন;
لان فى حفر التراب ازالة عين النجاسة حسًا والتطهير انما هى ازالها عينها فقط كما فى اعلاء السنن ، ج : ١ ، ص : ٢٨١

www.pathagar.com

فَـالْقُـوْهُ وَاَهْـرِيْقُـوْا عَلٰى مَكَانِـهٖ مَـاءً . رواه أبو داؤد . ص : ٦٦ فى باب الارض يصيبها البول والرقم ٣٨١ وقال هو مرسل ابن معقل لم يدرك النبى ﷺ .

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মা'কিল ইবন মুকাররিন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, জনৈক বেদুঈন মহানবী (সা)-এর সাথে নামায পড়ে তারপর পূর্ণ ঘটনা পেশ করেন। বিস্তারিত ঘটনার মধ্যে তিনি বলেন, তিনি অর্থাৎ মহানবী (সা) তখন বললেন, মাটির যতটুকু অংশে পেশাব পতিত হয়েছে সেটুকু খুঁড়ে ফেল এবং (বাইরে) ফেলে দাও। তারপর সে স্থানে পানি প্রবাহিত করে দাও।[১০৮]

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَالَ اَعْرَابِىٌّ فِى الْمَسْجِدِ فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِمَكَانِهٖ فَاحْتُفِرَ وَصُبَّ عَلَيْهِ دَلْوٌ مِّنْ مَّاءٍ . رواه الطحاوى والدار قطنى وقال الدار قطنى سمعان مجهول ، وقال الشوكانى فيه سمعان بن مالك وليس بالقوى .

হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুইন মসজিদে পেশাব করে দেয়। মহানবী (সা) সেই স্থানটির প্রতি ইশারা করে আদেশ দেন। ফলে স্থানটি খুঁড়ে ফেলা হয়। এবং জায়গাটির উপর এক বালতি পানি প্রবাহিত করে দেওয়া হয়।[১০৯]

وَقَدْ جَاءَ فِيْهِ اَحَادِيْثُ مُرْسَلَةٌ مِّنْهَا مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقُ وَفِيْهِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَحْفِرُوْا مَكَانَهُ .

এ প্রসঙ্গে একাধিক মুরসাল হাদীসও বিদ্যমান। সেখানে আছে যে, মহানবী (সা) তখন বলেছিলেন, তোমরা বেদুঈনের পেশাব পতিত স্থানটি খুঁড়ে ফেল।[১১০]

উপরোল্লেখিত হাদীসগুলোর আলোকে স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে যে, ভূমি পাক করার জন্য নাপাকী পতিত স্থানটি থেকে মাটি খুঁড়ে ফেলে দেওয়াত স্বীকৃত একটি পদ্ধতি।

আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী (র) বলেন, আলোচ্য হাদীসে মহানবী (সা) মাটি খুঁড়ে ফেলে দেওয়া ও পানি প্রবাহিত করে দেওয়া উভয়টি একত্রিতভাবে আমল করেছেন। কাজেই এ দলীল থেকে উভয়টি পৃথক পৃথক অবস্থায় স্বয়ং সম্পূর্ণ পাক করার পদ্ধতি বলে কিভাবে প্রমাণিত হচ্ছে ? এ প্রশ্নের জবাবে তিনিই লিখেছেন বস্তুত পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন অন্য

১০৮. ইমাম আবূ দাঊদ, আস সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৮১, পৃ. ৬৬।

১০৯. মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৩।

১১০. আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী (র) 'আত তালখীসুল হাবীর' গ্রন্থে বলেন, এটি মুরসাল হাদীস তবে সনদ বিশুদ্ধ। তাই এগুলোকে অধ্যায়ের অন্যান্য হাদীসের সঙ্গে মিলানো হলে নিশ্চয় দলীলটি শক্তিশালী দলীলে পরিণত হয়। মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৩।

www.pathagar.com

কিছুর উপর নির্ভরশীল থাকে না। কারণ পানি নিজেই مُطَهِّرٌ অর্থাৎ পাককারী।[১১১] অনুরূপভাবে খুড়ে ফেলা এটির দ্বারা যেহেতু নাপাকীর অস্তিত্বসমূহে খতম হয়ে যায় এ জন্য এটিও স্বয়ং সম্পূর্ণভাবেই مُطَهِّرٌ

হাদীসে মহানবী (সা) উভয়টি একত্রিত এ জন্য করেননি যে, একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। বরং এ জন্য করেছেন যে, জায়গাটি পবিত্র হওয়ার পর যেন পরিচ্ছন্নও হয়ে যায়।[১১২]

হালাল জন্তুর পেশাব ও নাপাক

জন্তু দু'ধরনের হয় হালাল ও হারাম। হালাল অর্থ যেসব জন্তুর গোশত মানুষের জন্য খাওয়া হালাল। আর হারাম অর্থ যেসব জন্তুর গোশত মানুষের জন্য খাওয়া হালাল নয় বরং হারাম। হারাম জন্তুর পেশাব ফকীহগণের সকলের মতেই নাপাক। আর হালাল জন্তুর ক্ষেত্রে ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম শাফিঈ, ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র) প্রমুখের মতে এটিও নাপাক।[১১৩]

এ মর্মে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো লক্ষণীয় ঃ

رُوِىَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ صَحَابِىٍ صَالِحٍ ابْتُلِىَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ جَاءَ اِلَى امْرَاتِهِ فَسَالَهَا عَنْ اَعْمَالِهِ فَقَالَتْ كَانَ يَرْعَى الْغَنَمَ وَلَا يَتَنَزَّهُ مِنْ بَوْلِهِ فَحِيْنَئِذٍ قَالَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ

كذا فى نور الأنوار وعزاه فى حاشيته الى الحاكم قال الكشميرى وما فى حاشية نور الأنوار نقلاً عن مستدك الحاكم ... فلم اجده فى النسخة المطبوعة ولا فى القدر الموجود من النسخة القلمية عندى ولو

---

১১১. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩।

১১২. আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী (র) আরো লিখেছেন ঃ

والحاصل ان الجمع بينهما لم يكن شئ واحد بل الشيئين على حدتها وليس فى شئ منهما نفى طهارتها بالجفاف كما زعمه الحافظ فى الفتح (١ : ٢٨٠) لكونها طهارة ناقصة عندنا وتلك كاملة واختيار احدى الطهارتين لا ينفى الاخرى او يقال ان ذكر الماء او الحفر فى الحديث بالشمس والريح تاخير لهذا الواجب واذا تردد الحال لين الامرين لا يكون دليلا على احدهما بعينه ونفياً للاخرى ، قاله العينى (١ : ٨٨٥) والله اعلم ، اعلاء السنن ، ج : ١ ، ص ٢٨٣

১১৩. তবে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) এটিকে নাজাসাতে খাফীফা বলেছেন। কারণ তার 'উসূল' অনুসারে কোন বিষয়ে ফকীহগণের ভিন্ন মতপোষণ ঐ বিষয়টির কঠোরতা কমিয়ে দেয়। দেখুন মাওলানা তাকী উসমানী, দরসে তিরমিযী, করাচী ঃ মাকতাবা দারুল উলূম, ১ম খণ্ড, ১৯৮৮, পৃ. ২৮৯।

www.pathagar.com

ثبت لكان فصلا فى الباب (فيض البارى ج : ١ ، ص : ٣١٤ باب ما جاء فى غسل البول الخ) اعلاء السنن ج : ١ ، ص : ٢٩٧

বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা) একদা জনৈক পুণ্যবান সাহাবীর দাফন কার্য সমাধা করার পর কবরে তাকে আযাবগ্রস্ত দেখে তার স্ত্রীর নিকট আসলেন এবং সেই সাহাবীর কাজকর্ম সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। স্ত্রী জবাব দিল যে, তিনি বকরী চরাতেন, তবে তিনি বকরীর পেশাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন করে চলতেন না। তখন মহানবী (সা) ইরশাদ করলেন, তোমরা পেশাবের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে চল। কারণ কবরে এ কারণেই বেশী আযাব হয়ে থাকে[১১৪]।

উপরোক্ত হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ করছে যে, বকরী ও বকরী জাতীয় সকল হালাল জন্তুর পেশাবই নাপাক। আর এহেন নাপাকী থেকে অসাবধানতা কবর আযাবের কারণ। হাদীসখানার অন্যান্য বর্ণনা থেকে অনুমান মেলে যে, এটি ছিল বিশিষ্ট আনসারী সাহাবী হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর ঘটনা[১১৫] তিনি পেশাবের ব্যাপারে যথার্থ সাবধানতা অবলম্বনকারী ছিলেন না। 'আল-কাওকাবুদ দুররী' গ্রন্থে হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী (র) ঘটনাটি অত্যন্ত আস্থাশীলতার সাথে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা তাকী উসমানী বলেন, যদি তা-ই হয় তাহলে এ হাদীস হালাল জন্তুর পেশাব নাপাক হওয়ার মর্মে শুধু দলীলই নয় বরং النص الصريح বটে।[১১৬]

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ

صححه ابن خزيمة وغيره كذا فى فتح البارى ج : ١ ص : ٣٨٩ (اعلاء السنن ج : ١ ، ص ٣٩٧

২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা পেশাবের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন কর। কেননা কবরে সাধারণত এ কারণেই আযাব হয়ে থাকে।[১১৭]

---

১১৪. আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, করাচী; ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূম আল ইসলামিয়্যা, তাবি, খ. ১, পৃ. ২৯৭।

১১৫. দলীল নিম্নোক্ত হাদীস,

أخرج ابن سعد قال أخبرنا شبابة بن سوار أخبرنى أبو معشر عن سعيد المقبرى قال لما دفن رسول الله ﷺ سعد بن معاذ قال لو نجا احد من ضغطة القبر لنجا سعد ، ولقد ضم ضمة اختلفت فيها اضلاعه من اثر البول ، كذا فى شرح الصدور للسيوطى .

যাফর আহমদ উসমানী (র) উপরোক্ত বক্তব্যের পর বলেছেন, মানুষের পেশাব بالاتفاق নাপাক, তা সত্ত্বেও হযরত সা'দ (রা) পেশাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতেন না কথাটি মেনে নেওয়া মুশকিল। প্রাগুক্ত পৃ. ২৯৮।

১১৬. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০।

১১৭ আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭।

www.pathagar.com

উপরোক্ত হাদীসখানাকে ইমাম হাকিম সহীহ্ বুখারীর শর্তাবলীতে উপনীত বিশুদ্ধ বলে মতামত দেন[১১৮]। হাদীসখানার মধ্যে পেশাব শব্দটি مطلق ভাবে عــــام অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে'। তাতে বুঝা যায় যে, শুধু মানুষই নয় বরং হালাল কিংবা হারাম সকল জন্তুর পেশাব থেকেই সাবধান থাকতে হবে[১১৯], সকল জন্তুর পেশাবই নাপাক।[১২০]

উল্লেখ্য যে, এ অধ্যায়ে এমন কিছু হাদীসও পাওয়া যায় যেগুলোর বাহ্যিক বক্তব্য থেকে হালাল জন্তুর পেশাব পাক হওয়ার অনুমান মেলে। এ হাদীসগুলোর ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণের অভিমত হল যে, এগুলো হয়ত রহিত (মানসূখ) হয়ে গিয়েছে[১২১] কিংবা এগুলোর বাহ্য অর্থ রাসূল (সা)-এর উদ্দেশ্য ছিল না। এ পর্যায়ের কয়েকখানা হাদীস নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ نَاسًا اجْتَوُا الْمَدِيْنَةَ فَاَمَرَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَّلْحَقُوْا بِرَاعِيْهِ يَعْنِىْ الْاِبِلَ فَيَشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَلَحِقُوْا بِرَاعِيْهِ فَشَرِبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا حَتّٰى صَلُحَتْ اَبْدَانُهُمْ فَقَتَلُوْا الرَّاعِىَ وَسَاقُوْا الْاِبِلَ فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَبَعَثَ فِىْ طَلَبِهِمْ فَجِيْئَ بِهِمْ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ اَعْيُنَهُمْ ، رواه البخارى .

১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় লোক[১২২] মদীনায় আসার পর পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে[১২৩]। মহানবী (সা) তখন তাদেরকে (চিকিৎসাস্বরূপ পরামর্শ

১১৮. হাদীসখানা আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওযইদ' গ্রন্থেও বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারা কুতনী হাদীসখানা তার 'সুনান' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে (পৃ. ১২৮) উল্লেখ করে বলেন, الصواب انه مرسل বিশুদ্ধ মত হল যে, হাদীসটি মুরসাল। তবে তিনি এ মর্মের আরো অন্যান্য হাদীস পেশ করে সেগুলোকে مرفوع এবং আপত্তি মুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন।

১১৯. কেননা হাদীস ব্যাখ্যার অন্যতম নীতি হল, المطلق يجرى على اطلاقه

১২০. আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী এ মর্মে ইমাম তিরমিযী (র) কর্তৃক বর্ণিত আরো একখানা হাদীস উল্লেখ করেন, عن ابن عمر رضى الله عنه نهى رسول الله ﷺ عن اكل الجلالة والابانها ، كذا رواه الترمذى فى باب ما جاء فى اكل لحوم الجلالة والبانها তিনি বলেন, উপরোক্ত হাদীসে 'জাল্লালার গোশত খেতে নিষেধ করা হয়েছে। আল কামূস অভিধানে আছে যে, জাল্লালা হল সে সব প্রাণী যেগুল পেশাব পায়খানা–আহার করে থাকে। তাতে বুঝা যায় নিষেধ হওয়ার কারণ হল, পেশাব পায়খানার আহার। আরো বুঝা যায় যে, পেশাব পায়খানা নাপাক বিধায়ই এ জাতীয় প্রাণীর গোশতের মধ্যে আপত্তি সৃষ্টি করেছে। দেখুন আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী, মা'আরিফুস সুনান, করাচী ঃ মাকতাবাতুল বিন্নৌরিয়্যা, তাবি, খ. ১, পৃ. ২৭৫।

১২১. হাদীসের ক্ষেত্রে এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। তবে উসূল বিশারদগণ নাসিখ মানসূখের বিস্তারিত শর্তাবলী উল্লেখ করেছেন। কোন হাদীসকে নাসিখ বা মানসূখ বলে প্রমাণ করতে হলে সে সব শর্ত পাওয়া যেতে হবে। আলোচ্য হাদীসে সেই শর্তাবলীর সবই বিদ্যমান।

১২২ এ লোকগুলো কারা বা কোন গোত্রের সে বিষয়ে কোন বর্ণনায় 'উরায়না' আবার কোন বর্ণনায় 'উকল' নাম পাওয়া যায়। হাদীস বিশারদগণ বলেন, এরা ছিল মোট আট জন। তন্মধ্যে চার জন ছিল উরায়না গোত্রের, তিন জন 'উকল' গোত্রের আর একজন সম্ভবত অন্য কোন গোত্রের। দ্র. আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১।

১২৩. ইমাম আবু আওয়ানা (র) এর বর্ণনায় আছে فعظمت بطونهم অর্থাৎ তাদের পেটগুলো ভয়ানক বড় হয়ে গিয়েছিল। নাসাঈর বর্ণনায় আছে, فاجتووا المدينة حتى اصفرت الوانهم وعظمت بطونهم

www.pathagar.com

দিয়ে) বলেন, তারা যেন উটের রাখালের সাথে থাকে এবং উটের দুধ ও পেশাব সেবন করে। এর ফলে তারা নবীজীর রাখালের[১২৪] সাথে অবস্থান পূর্বক উটের দুধ ও পেশাব সেবন করতে থাকে। অবশেষে তারা পেটের পীড়া থেকে সুস্থ হয়ে গেলে তারা রাখালকে হত্যা করে এবং উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। মহানবী (সা)-এর নিকট (এ লুণ্ঠনের) সংবাদ পৌছলে তিনি তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। তাদেরকে পাকড়াও করে আনা হয়, তাদের হাত-পা কর্তন করা হয়[১২৫] এবং তাদের চোখ ফুঁড়ে[১২৬] দেওয়া হয়।[১২৭]

এ হাদীসের বাহ্য বক্তব্য বোঝায় যে, উট তথা হালাল জন্তুর পেশাব পাক। নতুবা মহানবী (সা) তাদেরকে তা সেবন করার আদেশ কিভাবে দিয়েছেন। বস্তুত হাদীসের মর্মকথা এটি নয়। তিনি পেশাব পাক হওয়ার ভিত্তিতে সেবনের আদেশ দেননি। আদেশ দিয়েছেন এ মর্মে যে, তাঁকে ওয়াহীর মাধ্যমে অবগত করানো হয়েছে যে, উল্লেখিত লোকদের যে পেটের-পীড়া চলছে তার চিকিৎসা উটের পেশাব সেবন ব্যতিরেকে অন্য কিছু নয়। সে কারণেই নবীজী (সা) তাদেরকে পেশাব সেবনের আদেশ দেন। উল্লেখ্য যে, এ দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝা যায় যে, পেশাব সেবন তাদের জন্য একটি অনন্যোপায় ব্যবস্থা مضطر ছিল। আর অনন্যোপায় ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোন নাপাক বস্তু ব্যবহার করা বা পান করার অনুমতি আছে।[১২৮]

অর্থাৎ মদীনার আবহাওয়া তাদের জন্য প্রতিকূল হয়। এমনকি তাদের শরীরের বর্ণ হলুদ হয়ে যায় এবং তাদের পেটগুলো অস্বাভাবিক ফুলে বিশাল আকার ধারণ করে। (বিন্নৌরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২)

১২৪. সেই রাখাল ছিলেন মহানবীর গোলাম হযরত ইয়াসার। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন হযরত আবু যর গিফারীর জনৈক পুত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২।

১২৫. কেননা তারা ছিল ডাকাত। আর ডাকাতের শাস্তি সম্পর্কে নির্দেশ হল ঃ

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ الخ

তা ছাড়া কোন কোন বর্ণনা মতে তারা মহানবী (সা)-এর রাখালকেও হাত-পা কর্তনপূর্বক হত্যা করেছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই তাদেরকেও অনুরূপে হত্যা করা হয়। (তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯২)

১২৬ কোন আসামী কিংবা কিসাসের দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পূর্বে অঙ্গ কর্তন ইমাম আবূ হানীফার মতে নাজায়িয। আলোচ্য হাদীস মানসূখ। কেননা সুনান ইবন মাজা গ্রন্থে আছে মহানবী (সা) বলেন, لا قود الا بالسيف।

১২৭. ইমাম বুখারী, সহীহ বুখারী, রিয়াদ ঃ দারুস সালাম, ১৯৯৯ হাদীস নং ৫৬৮৬, পৃ. ১০০৬।

১২৮. মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ "কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তার জন্য কোন পাপ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৭৩) আরো বলেন, তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে নিরুপায় অবস্থায় তা করলে তোমার প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৪৫) আরো বলেন, "কিন্তু কেউ অবাধ্য কিংবা সীমালংঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু!" (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১১৫)

www.pathagar.com

মুহাদ্দিসগণ আরো বলেন যে, মহানবী (সা) তাদেরকে যে বাক্য বলেছেন তাতে পেশাব পান করতে বলেননি, বলেছেন পেশাব পেটের উপর মালিশ করতে। তবে বাক্যটি সংক্ষিপ্ত ও আরবী বালাগাতের বিশেষ রীতি 'الصناعة التضمن' সমৃদ্ধ।[১২৯] বাক্যটির মূল ইবারত হল। اشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاسْتَشْفُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا اضْمَدُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا "তোমরা উটের দুধ পান কর এবং উটের পেশাব ব্যবহার কর কিংবা উটের পেশাব মালিশ কর।"

কাজেই বুঝা যায় এখানে পেশাব পান করার নির্দেশ নেই। তাহলে পেশাব পাক একথা প্রমাণেরও কোন সুযোগ থাকে না।

কোন কোন মুহাদ্দিস বলেছেন, পেশাব পান সংক্রান্ত হাদীসখানা রহিত (مَنْسُوْخ) হয়ে গিয়েছে। এর রহিতকারী (نَاسِخ) হল হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত اسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ হাদীস। দলীল এই যে, পেশাব পান সংক্রান্ত হাদীসটি ছিল মূলত উরায়না গোত্র থেকে আগত লোকদের ব্যাপারে। তারা মদীনায় আসে হিজরী ২ সালের জুমাদাল উলা কিংবা শাওয়াল কিংবা যুলকাদা মাসে। আর اسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ হাদীস বর্ণনা করেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা)। তিনি ইসলাম গ্রহণ পূর্বক মদীনায় এসে পৌঁছেন হিজরী ৭ সালে। তাহলে বুঝা যায় যে, আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস হল, পরের আর উরায়না গোত্র সংক্রান্ত হাদীস হল পূর্বের এতদুভয় ঘটনার বক্তব্য একটি অপরটির বিপরীত। তাই পরের হাদীস দ্বারা পূর্বের হাদীস রহিত এ কথা সুস্পষ্ট। তা ছাড়া উরায়নাদের হাদীসে শত্রুদের শাস্তি প্রদানে مُثْلَة তথা নাক চোখ কেটে দেহ বিকৃত করে দেওয়ার আদেশ বিদ্যমান। কাউকে শাস্তি দানের ক্ষেত্রে এভাবে দৈহিক বিকৃতি সাধন ইসলামের প্রথম যুগে অনুমতি থাকলেও পরে এটি রহিত হয়ে গিয়েছে[১৩০]–এ ব্যাপারে কোন মুহাদ্দিস বা ফকীহের দ্বিমত নেই। এ আলামত থেকেও বুঝা যায় যে, উরায়নাদের হাদীস পরবর্তী সময়ে রহিত হয়ে গিয়েছে"।

---

১২৯. শায়খ বিন্নৌরী (র) লিখেছেন,

عطف الابوال عليها يكون من قبيل وعلفتها تبنًا وماءً باردًا، والتضمين فى مثل هذا مشهور وهو الحاق مادة باخرى لتضمنها معناها باتحاد واتناسب ، وقد اوضحه ابن هشام فى كتابه المغنى وتمام الشعر حتى شتت همالة عيناها ، ويوده ما ورد فى بعض الطريق عند النسائى فى سننه من غير ذكر الابوال ، انظر معارف السنن ، ج : ١ ، ص ٢٧٤ ، والشعر فى الاصل كان على هذه العبارة ، علفتها تبنًا وسقيتها ماء باردًا .

১৩০. সুনান নাসাঈ গ্রন্থে আছে, হযরত আনাস (রা) বলেন, মহানবী (সা) তাঁর খুতবায় সাদাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন এবং 'মুসলা' (অঙ্গের বিকৃতি সাধন) করা থেকে নিষেধ করতেন। আল্লামা বিন্নৌরী (র) মুসলা রহিত হওয়ার মর্মে আরো বলেন,

انه فعل ذلك بهم سياسة لاحدًا ولا مماثلة فى القصاص ، ولو سلم انه كان حدًا فهو منسوخ كما حكى الترمذى عن ابن سيرين ان قصتهم كانت قبل ان تنزل الحدود ولموسى بن عقبة فى المغازى وذكروا ان النبى ﷺ نهى بعد ذالك عن المثلة .

(দ্র. আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী, মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯)

www.pathagar.com

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَفِيْ رِوَايَةِ جَابِرٍ قَالَ مَا اكل لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ ، رواه أحمد والدار قطني .

২. হযরত বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে জন্তুর গোশত খাওয়া হালাল সেগুলোর পেশাবে কোন আপত্তি নেই। হযরত জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যার গোশত খাওয়া যায় তা পেশাবে কোন আপত্তি নেই।[১৩১]

এ হাদীস হালাল জন্তুর পেশাব পাক-এ কথা বুঝালেও হাদীসখানার সনদগত কোন ভিত্তি নেই। আল্লামা ইবন হাযাম (র) হাদীসখানা সম্পর্কে বলেন, انه خبر باطل موضوع لان فی رجاله سوار بن مصعب وهو متروك عند جميع اهل النفس ومتفق على ترك الرواية عنه فانه يروى الموضوعات كذا قاله الشوكانى 'এ বর্ণনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বানোয়াটি। কারণ বর্ণনাটির সনদে আছে সিওয়ার ইবন মুস'আর। এ ব্যক্তি সকল হাদীস পর্যালোচকের মতে প্রত্যাখ্যাত। সকলেই তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয় বলে একমত। কারণ লোকটি বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করে থাকে।'[১৩২] কাজেই এ বর্ণনার ভিত্তিতে পেশাব পাক হওয়ার দলীল পেশ করা যায় না।

হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসার বিধান

প্রসঙ্গক্রমে এখানে হারাম বা অপবিত্র বস্তু দ্বারা রোগের চিকিৎসা করা যায় কিনা-বিষয়টিও আলোচনা করা যায়।

এ ব্যাপারে ফকীহগণের অভিমত নিম্নরূপ ঃ

রোগী যদি অনন্যোপায় হয় অর্থাৎ হারাম বস্তু সেবন ব্যতিরেকে তার জীবন বাঁচানো সম্ভব নয়-এ পর্যায়ে চলে যায় তাহলে সেই রোগীর জন্য হারাম কিংবা অপবিত্র বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ সকল ফকীহের মতে জায়িয।[১৩৩]

যদি এমন পর্যায়ের হয় যে, হারাম জিনিসটি সেবন না করলেও রোগী বাঁচবে তবে রোগ দূর করতে হলে এটির সেবন প্রয়োজন-এমতাবস্থায় ইমাম মালিকের মতে হারাম ঔষধ ব্যবহার করা জায়িয, ইমাম শাফিঈর মতে না জায়িয। ইমাম বায়হাকী (র) বলেন, হারাম জিনিসগুলোর মধ্যে মদ ব্যতিরেকে অন্যান্য জিনিস দ্বারা চিকিৎসা জায়িয। ইমাম তাহাভী (র) ও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যদি অভিজ্ঞ ও দীনদার

১৩১. মুসনাদে ইমাম আহমদ, দারা কতুনী, সূত্র মিশকাতুল মাসাবীহ, দেওবন্দ ঃ মাতবা আসাহহুল মাতাবি, তাবি, খ ১, পৃ. ৫৩।

১৩২. আল্লামা আবুল হাসান, তানযীমুল আশতাত, চট্টগ্রাম ঃ আল হেলাল প্রকাশনী, তাবি. খ. ১, পৃ. ১৯৭।

১৩৩. তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

www.pathagar.com

চিকিৎসক রোগ পর্যালোচনা করে এমন রায় দেন যে, হারাম বস্তুটি সেবন ব্যতিরেকে উপশম হবে না সেক্ষেত্রে জায়িয, অন্যথায় জায়িয নয়। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (সা)-এর মতে কোন প্রকার হারাম বস্তুর সাহায্যে চিকিৎসা জায়িয নয়।[১৩৪]

এ ব্যাপারে কয়েকখানা হাদীস লক্ষণীয় ঃ

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ اُمَّتِىْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا ، رواه أبو داؤد

হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা আমার উম্মতের জন্য যে সব বস্তু হারাম ঘোষণা করেছেন সেগুলোর মধ্যে তাদের কোন রোগমুক্তির গুণ[১৩৫] রাখেননি।[১৩৬]

وَعَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ بِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ ، رواه أبو داؤد •

হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, মহান আল্লাহ রোগ ও রোগের ঔষধ (উভয়ই) অবতীর্ণ করেছেন। এবং তিনি প্রত্যেক রোগের ঔষধও স্থির করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা ঔষধ ব্যবহার কর। তবে হারাম বস্তুর দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করো না।[১৩৭]

وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ طَارِقٍ اَنَّهُ سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ ثُمَّ سَاَلَهُ فَنَهَاهُ فَقَالَ لَهُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّهَا دَوَاءٌ فَقَالَ النَّبِىَّ ﷺ لاَ وَلٰكِنَّهَا دَاءٌ رواه أبو داؤد . ص : ٥٥٠.

হযরত সুওয়াইদ ইবন তারিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি মহানবী (সা)-কে মদ দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। মহানবী (সা) তাকে নিষেধ করেন। তিনি আবারও জিজ্ঞাসা করলে মহানবী (সা) আবারো নিষেধ করেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! এটি তো ঔষধ বটে। মহানবী (সা) বললেন, না এটি ঔষধ নয়, বরং এটি তো স্বয়ং রোগ।[১৩৮]

---

১৩৪. প্রাগুক্ত

১৩৫. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন,

ان الشفاء يطلق فى الامور المباركة واما فى غيرها فيذكر فيه المنفعة لا الشفاء ، وذلك كما قال رجل ذكره ، فيهما اثم كبير ومنافع للناس ، ففى المحرم يمكن ان يكون منفعة فلا يقال لها شفاء بلسان الشرع ، كما فى معارف السنن ، ج : ١ ، ص ٢٧٨

১৩৬. সুনান আবূ দাউদ, সূত্র আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫।

১৩৭ সুনান আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৮৭৪, পৃ. ৫৫০।

১৩৮. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৮৭৩, পৃ. ৫৫১।

www.pathagar.com

وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ ، رواه أبو داؤد

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অপসন্দনীয় (মদ) ঔষধ সেবন করতে নিষেধ করেছেন।[১৩৯]

মোটকথা উপরোক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, হারাম বস্তু থেকে তৈরী ঔষধ স্বাভাবিক রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করা জায়িয নয়।

---

১৩৯. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৮৭০, পৃ. ৫৫০।

www.pathagar.com

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ওয়াক্তসমূহ

ইসলামে পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে নামায দ্বিতীয় স্তম্ভ। পবিত্র কুরআন মাজীদে বহুবার নামায কায়েম করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। হাদীস শরীফেও নামায আদায় করার ব্যাপারে সীমাহীন গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ইসলামী শরী'আতে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে। এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের জন্য পৃথক পৃথক পাঁচটি ওয়াক্তও নির্ধারন করা হয়েছে। নামায আদায় করার পূর্বশর্ত হচ্ছে ওয়াক্ত হওয়া। ওয়াক্ত বা সময় হওয়ার পূর্বে বা পরে নামায আদায় করলে সে নামায বাতিল বলে গণ্য হবে। যথা সময়ে নামায আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا .

নিশ্চয়ই নামায মু'মিনদের ওপর নির্ধারিত ওয়াক্তে ফরয করা হয়েছে।[১]

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন। রাসূল করীম (সা) প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তের সীমারেখা অর্থাৎ শুরু ও শেষ সময় সাহাবীগণকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

রাসূল করীম (সা) বলেন ঃ

اِنَّ لِلصَّلَاةِ اَوَّلاً وَّاٰخِرًا (الحديث)

প্রত্যেক নামাযের শুরু এবং শেষ আছে।[২]

নামায এমন একটি নির্দিষ্ট ইবাদত, যা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নামাযের রুকনসমূহ আদায় করা হয় যা শুরু করা হয় 'আল্লাহু আকবর' দ্বারা এবং সমাপ্ত হয় সালাম দ্বারা।

اَلصَّلَاةُ هِيَ الْعِبَادَةُ الْمَخْصُوْصَةُ الَّتِيْ تُؤَدّٰى بِطَرِيْقٍ مَخْصُوْصَةٍ وَ اَرْكَانٍ مَخْصُوْصَةٍ فِيْ وَقْتٍ مَخْصُوْصٍ مُفْتَتَحَةٌ بِتَكْبِيْرِ اللّٰهِ وَمُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيْمِ .

---

১. আল কুরআন, সূরা আন-নিসা ঃ ১০৩।

২. ইমাম আহমাদ আল-মুসনাদ, খ.৪, পৃ. ২৩২। ইমাম তিরমিযী, জামি' তিরমিযী, ১ম খণ্ড সালাত অধ্যায় অনুচ্ছেদ : নামাযের ওয়াক্তসমূহ, খ. ১, পৃ. ৩৯। এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, এক ওয়াক্ত নামাযের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য ওয়াক্তের নামায আদায় করা যাবে না।

www.pathagar.com

ফজরের ওয়াক্ত

সকল ইমামের মতে সুবহে সাদিক (প্রকৃত ভোর) হতে ফজরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এ নামাযের সময় বাকী থাকে।

মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ، (سورة : طه ، اية : ١٣٠)

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ، (سورة : ق ، اية ٣٩)

সুতরাং আপনার পালনকর্তার সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে। (সূরা তাহা ঃ ১৩০ ও সূরা কাফ ঃ ৩৯)

ফজরের নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ لِلصَّلَاةِ اَوَّلاً وَاٰخِرًا وَّاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَاٰخِرَهُ حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ . رواه أحمد ، ورواه أيضا الترمذى فى أبواب الصلاة ، ص : ٤٠

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করে বলেন, প্রত্যেক নামাযের শুরু এবং শেষে সময় আছে—ফজরের প্রথম সময় হল যখন ফজরে (সকাল) উদিত হয় এবং তার শেষ সময় হল যখন সূর্য উদিত হয়।[৩]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهٖ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تُصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ الْاَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَاِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ . رواه مسلم فى صحيحه فى باب أوقات الصلوت الخمس .

৩. ইমাম আহমাদ, মুসনাদ, খ. ৪, পৃ. ২৩২; ইমাম তিরমিযী সুনান, সালাত অধ্যায়, পৃ. ৪০, রশিদিয়া কুতুবখানা দেওবন্দ, ভারত।

www.pathagar.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সূর্য (পশ্চিমে) ঢলে যাওয়ার পর যুহরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং মানুষের ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া ও আসরের ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকে। আর আসরের ওয়াক্ত সূর্য হরিদ্রাভ না হওয়া পর্যন্ত। মাগরিবের ওয়াক্ত শাফাক গায়ের না হওয়া পর্যন্ত। ইশার ওয়াক্ত মধ্য রাত্রি পর্যন্ত এবং ফজরের ওয়াক্ত ঊষার উদয় কাল হতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত। আর যখন সূর্য উদিত হতে থাকে তখন সালাত থেকে বিরত থাকবে। কেননা, সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে উদিত হয়।[৪]

অনুরূপ ইমাম মুসলিম অন্য একটি সনদের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে ফজরের নামাযের শেষ সময় সম্পর্কে আরও একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তা হল—নবী করীম (সা) বলেন,

وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ

رواه مسلم في باب أوقات الصلوت الخمس .

(নবী করীম (সা) বলেন) এশার ওয়াক্ত অর্ধরাত্রি পর্যন্ত এবং ফজর ওয়াক্ত সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত। ইমাম মুসলিম, পাঁচ ওয়াক্ত নামায অধ্যায়ে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجْرٌ مُسْتَطِيلٌ يَحِلُّ بِهِ الطَّعَامُ وَتُحَرَّمُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ مُسْتَطِيرٌ يُحَرِّمُ بِهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ .

৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ফজর হল দু'রকমের ১. সুবহে কাযিব (অপ্রকৃত ভোর) তখন (রোযার জন্য সাহরী) খাওয়া হালাল এবং (ফজরের) নামায পড়া হারাম ২. সুবহে সাদিক (প্রকৃত ভোর) এ সময় সাহারী খাওয়া হারাম এবং নামায পড়া হালাল।[৫]

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ لَكِنَّ الْفَجْرَ الْمُسْتَطِيرَ فِي الْأُفُقِ .

৭. রাসূল কারীম (সা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল (রা)-এর আযান এবং অপ্রকৃত ভোর যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে বরং প্রকৃত ভোর যখন আকাশের দিগন্তে উদ্ভাসিত হয় (তখন তোমরা নামায আদায় কর)।[৬]

---

৪. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম, সহীহ মুসলিম, পাঁচ ওয়াক্ত নামায অধ্যায়, মাকতাবা আশরাফিয়া দেওবন্দ, ভারত; ফাতহুল মুলহিম শারহে মুসলিম, খণ্ড ২, পৃ. ১৯৫।

৫. দারা কুতনী, সুনান (في باب وقت السحر) সাহরী পরিচ্ছেদ, খণ্ড ২, পৃ. ১৬৫।

৬ ইমাম মুসলিম, সহীহ, খণ্ড ১, পৃ. ১২২।

www.pathagar.com

উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা বোঝা যায় যে, ফজরের ওয়াক্ত সুবহে সাদিক (প্রকৃত ভোর) থেকে শুরু হয়ে সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ফজরের নামায আদায় করা জায়িয।[৭]

যুহরের ওয়াক্ত

সূর্য মধ্য আকাশ হতে পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার সাথে সাথেই যুহরের নামাযের সময় শুরু হয়। হানাফী মাযহাব মতে যুহরের শেষ সময় হল যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া মধ্যাহ্ন ছায়া বাদ দিয়ে তার দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত এ নামাযের সময় অবশিষ্ট থাকে। আর যখন প্রতিটি জিনিসের ছায়া তার সমান হয় তখন যুহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়।

ইমাম মালিক (র) ইমাম শাফিঈ (র) আহমাদ (র) সাওরী (র) ইসহাক (র) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে প্রতিটি বস্তুর মধ্যাহ্ন ছায়া বাদ দিয়ে তার একগুণ ছায়া হওয়া পর্যন্ত যুহর ওয়াক্ত বাকী থাকে। কিন্তু এক গুণ ছায়ার পর আসরের সময় শুরু হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

যুহরের নামাযের শেষ সময়ের ব্যাপারে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এর কয়েকটি মত বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে মাশহুর মত হল ছায়া আসলী বাদে ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যুহরের শেষ সময় অবশিষ্ট থাকে।[৮]

প্রমাণ স্বরূপ হিদায়া, বিকায়া ও কানযুদ্ দাকাইকের মূল ইবারত পেশ করা গেল।

اَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَاَخَرُ وَقْتِهَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ اِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَيْهِ سِوَى فَئِى الزَّوَالِ وَقَالاَ اِذَا صَارَ ظِلُّ مِثْلِهِ وَهُوَ

---

৭. আল-হাদীস ঃ

وَفِىْ رِوَيَةِ النَّسَائِىْ «لاَ تَغْتَرُّوْا بِاَذَانِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَلٰكِنْ اَذَانُ بِلاَلٍ» ولمسلم عن سمرة ، مرفوعًا لاَ يَغُرَنَّكُمْ مِّنْ سُحُوْرِكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ بِيَاضُ الْاُفُقِ الْمُسْتَطِيْلِ هٰكَذَا حَتّٰى سَتَطِيْرُ هٰكَذَا وَحَكَاهُ حَمَّادُ بِيَدَيْهِ قَالَ يَعْنِي مُعْتَرِضًا . كَمَا فِىْ فِقْهِ السّنَن و الاثار السيد محمد عميم الاحسان فى المواقيت ، ص ٣٦ :

হাদীসটি হযরত আয়েশা সূত্রে নবী কারীম (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন বিলাল (রা) রাত থাকতে আযান দিয়ে থাকেন। কাজেই তোমরা (সাহারী) পানাহার করতে থাক; যতক্ষণ না ইবন উম্মে মাকতূম (রা) আযান দেন।

(ইমাম বুখারী, সাহীহ্ বুখারী, ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগে আযান দেওয়া অধ্যায়।)

সাধারণত রমযান মাসে হযরত বিলাল (রা) সাহরী খাওয়ার উদ্দেশ্যে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই আযান দিতেন। আর হযরত ইবন উম্মে মাকতূম (রা) ফজরের নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পর নামাযের আযান দিতেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاَشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ اِبْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ، رواه البخارى فى باب الاذان قبل الفجر ج ١

মোটকথা, ইসলামের প্রথম যুগে হযরত ইবন উম্মে মাকতূম রাতে আর হযরত বিলাল (রা) ফজরের আযান দিতেন। সে সময় রাসূল (সা) উপরিউক্ত হাদীসটি বলেন। পরবর্তীতে প্রিয় নবী (সা) এ দু'জন মুয়াজ্জিনের মধ্যে দায়িত্ব পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

৮. যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, সালাত অধ্যায়, ইদারাতুল কুরআন, করাচি, খণ্ড ২, পৃ. ৩।

www.pathagar.com

رِوَايَةُ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) (كما فى الهداية ، المجلد الاول فى كتاب الصلاة)

* اَلْوَقْتُ لِلْفَجْرِ مِنَ الصُّبْحِ الْمُعْتَرَضِ اِلٰى طُلُوْعِ ذَكَاءٍ ، احْتَرَزَ بِالْمُعْتَرِضِ عَنِ الْمُسْتَطِيْلِ وَلِلظُّهْرِ مِنْ زَوَالِهَا اِلٰى بُلُوْغِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ سِوَى فَيْئُ الزَّوَالِ - كما فى الوقاية وشرح الوقاية فى كتاب الصلاة ص : ١٢٨

* فَاٰخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ اَنْ يَّصِيْرَ ظِلُّهُ مِثْلَى الْمِقْيَاسِ وَرُبْعُهُ هٰذَا فِى رِوَايَةِ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَفِىْ رِوَايَةِ اُخْرٰى عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ اَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَّالشَّافِعِىُّ اِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ سِوَى فَيْئُ الزَّوَالِ - شرح الوقاية .

* وَقْتُ الْفَجْرِ مِنَ الصُّبْحِ الصَّادِقِ اِلٰى طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَالظُّهُوْرِ مِنَ الزَّوَالِ اِلٰى بُلُوْغِ الظِّلِّ مِثْلَيْهِ سِوَى الْفَيْئِ (كما فى كنز الدقائق ، ص : ٢٠)

হিদায়া, শারহে বিকায়া এবং কানযুদ্ দাকাইকের উপরিউক্ত বর্ণনা অনুযায়ী হানাফী মাযহাব মতে যুহরের শুরু সময় হল সূর্য হেলার পর থেকে, আর শেষ সময় হল প্রতিটি বস্তুর ছায়া মধ্যাহ্ন ছায়া বাদ দিয়ে দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। المحيط ، البدائع ، العناية ، البحر الرائق এর মধ্যে ও এ রূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ আলিমের মতে প্রতিটি বস্তুর (ছায়া আসলী বাদে) ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যুহর ওয়াক্ত বাকী থাকে। এবং হানাফী মাযহাব অবলম্বনকারীগণ সাধারণত এর ওপরই আমল করে থাকেন, আর এ মুতাবিকই ফাতওয়া ।

যুহরের প্রথম ওয়াক্ত দলীল সমূহ নিম্নরূপ ঃ

মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ اللَّيْلِ (بنى اسرائيل، اية : ٧٨)

তোমরা নামায আদায় কর সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত।[৯]

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ - رواه مسلم ، فتح الملهم شرح صحيح مسلم ج : ١ ، ص ، مسلم : ١٩٥

৯. সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৮।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যুহরের ওয়াক্ত (আরম্ভ) হয়।[১০]

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلصَّلٰوَاتِ اَوَّلاً وَّاٰخِرًا ، اِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ . رواه الطحاوى فى شرح معانى الاثار .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তের শুরু ও শেষ সময় রয়েছে। যুহরের নামাযের শুরু সময় হচ্ছে, যখন সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলতে শুরু করে।[১১]

যুহরের শেষ সময়

যুহরের সময় প্রতিটি বস্তুর চায়া মধ্যাহ্ন ছায়া বাদ দিয়ে দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। এটাই হানাফী ফকীহগণের অভিমত। কিন্তু ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, ও সাহিবাইনের মতে বস্তুর ছায়া এক গুণ হওয়া পর্যন্ত যুহরের নামায পড়া যায়।

দলিল নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَنَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلَاةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ رواه البخارى فى بَابِ الاِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِى شِدَّةِ الْحَرِّ . بخارى ج : ١ ، امدادية پستكالى ، بنگله بازار ، ڈهاكه - واخرجه الجماعة من حديث أبى هريرة كذا قال الزيلعى واللفظ للبخارى .

হযরত আবু হুরায়রা (রা) ও আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায়, তখন গরম কমলে সালাত আদায় করবে। কেননা, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপের অংশ। (বুখারী শরীফ)

وَعَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ اَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِىِّ ﷺ الظُّهْرَ فَقَالَ اَبْرِدْ اَبْرِدْ اَوْ قَالَ اِنْتَظِرْ اَنْتَظِرْ وَقَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلَاةِ حَتّٰى رَاَيْنَا فَىْءَ التُّلُوْلِ - أخرجه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى ، فى كتاب مواقيت الصلوة وفضلها. ج : ١

---

১০. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, অধ্যায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়, ফাতহুল মুলহিম, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ভারত খ. ১, পৃ. ১৯৫।

১১ ইমাম তাহাভী, শারহে মা'আনিল আসার, খণ্ড ১, পৃ. ১০৯।

www.pathagar.com

وايضا رواه الترمذى عن ابى ذرّ رضى الله عنه فقَالَ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ اَبْرِد فِى الظُّهرِ قَالَ حَتّٰى رَاَيْنَا فِئَى التُّلُوْلِ الخ قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْث حَسَنٌ صَحِيح ترمذى ج : ١ ، ص : ٤١ وَقَالَ اَبُوْ عِيْسٰى مَنْ ذَهَبَ اِلٰى تَاْخِيْرِ الظُّهْرِ فِى شِدَّةِ الْحَرِّ هُوَ اَوْلٰى وَاشْبَهُ بِالْاِتِّبَاعِ (باب فى تاخير الظهر)

হযরত আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুআয্যিন যুহরের আযান দিলে তিনি বললেন, ঠাণ্ডা হতে দাও, ঠাণ্ডা হতে দাও। অথবা তিনি বললেন, অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর, তিনি আরও বলেন, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের ফলেই সৃষ্টি হয়। কাজেই গরম যখন বেড়ে যায় তখন গরম কমলেই সালাত আদায় করবে। এমন কি (বিলম্ব করতে করতে বেলা এতটুকু গড়িয়ে গিয়েছিল যে,) আমরা টিলাগুলোর ছায়া দেখতে পেলাম। (বুখারী)

(এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, যুহরের নামায এক গুণ ছায়ার অনেক পরেই আদায় করা হয়েছে। গরমের সময় আরবের টিলাগুলোর ছায়া এক গুণ ছায়ার সময়ের অনেক পরেই দেখা যায়।)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ «اَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» أخرجه البخارى فى باب مواقيت الصلوة ص : ٧٦

হযরত আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যুহরের সালাত গরম কমলে আদায় কর। কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। (বুখারী)।[১২]

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰه عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيْمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ اِلٰى غُرُوْبِ الشَّمْسِ اُوْتِىَ اَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوْا حَتّٰى اِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوْا فَاُعْطُوْا قِيْرَاطًا ثُمَّ اُوْتِىَ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ الْاِنْجِيْلَ فَعَمِلُوْا اِلٰى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوْا فَاُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا ثُمَّ اُوْتِيْنَا الْقُرْاٰنَ فَعَمِلْنَا اِلٰى غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَاُعْطِيْنَا قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ فَقَالَ اَهْلُ الْكِتَابَيْنِ اَىْ رَبَّنَا اَعْطَيْتَ هٰؤُلَاءِ قِيْرَطَيْنِ وَاَعْطَيْنَا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا وَنَحْنُ كُنَّا اَكْثَرُ

১২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আবূ যার (রা) ও আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত উল্লিখিত হাদীসসমূহ ইমাম বুখারী, সহীহ বুখারীতে নামাযের ওয়াক্তের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
অনুরূপভাবে ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্য ইমামগণ তাঁদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

عَمَلاً قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِّنْ اَجْرِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ قَالُوْا لاَ قَالَ فَهُوَ فَضْلِيْ أُوْتِيْهِ مَنْ اَشَاءُ (بخارى ، ج : ١ ، باب من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب)

وَرَوَاهُ مُحَمَّدٌ فِى "المؤطا" بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابِن عُمَرَ مِثْلَهُ ، الاَّ اَنَّهُ « زَادَ اَلاَ فَاَنْتُمُ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ اِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ قَالَ فَغَضَبَ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى وَقَالُوْا : نَحْنُ اَكْثَرُ عَمَلاً وَاَقَلُّ عَطَاءً الخ » وهو كذلك فى رواية اخرى للبخارى فى باب الاجارة الى صلاة العصر -كما نقله فى "اثار السنن" (ج : ١ ، ص : ٤٣) فثبت انه مذهب أبى حنيفة رحمه اللّٰه.

সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন যে, পূর্বেকার উম্মতের স্থায়িত্বের তুলনায় তোমাদের স্থায়িত্ব হল আসর থেকে নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের অনুরূপ। তাওরাত অনুসারীদেরকে তাওরাত দেওয়া হয়েছিল। তারা তদনুসারে কাজ করতে লাগল, যখন দুপুর হল, তখন তারা অপারগ হয়ে পড়ল। তাদেরকে এক এক "কীরাত"[১৩] করে পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। তারপর ইনজীল অনুসারীদেরকে ইন্‌জীল দেওয়া হল। তারা আসরের সালাত পর্যন্ত কাজ করে অপারগ হয়ে পড়ল। তাদেরকে এ এক "কীরাত" করে পারিশ্রমিক দেওয়া হল। তারপর আমাদেরকে কুরআন দেওয়া হল। আমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করলাম। আমাদের দু' দু' 'কীরাত' করে দেওয়া হল। এতে উভয় কিতাবী সম্প্রদায় বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের দু' দু' 'কীরাত' করে দান করেছেন, আর আমাদের দিয়েছেন এক এক 'কীরাত' করে; অথচ কাজের দিক দিয়ে আমরাই এগিয়ে। (অর্থাৎ আমরা কাজ করেছি বেশি আর পারিশ্রমিক পেলাম কম) আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ তোমাদের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে আমি কি তোমাদের প্রতি কোনরূপ যুলুম করেছি? তারা বলল না। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন: এ হলো আমার অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তাকে বর্ধিত পরিমাণ দেই।

হাদীসের এ দৃষ্টান্ত সময়ের দীর্ঘতা ও হ্রস্বতার দ্বারা যথাক্রমে আমলের আধিক্য ও স্বল্পতা ব্যক্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা আসরের নামাযের ওয়াক্ত প্রতি বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর আরম্ভ অভিমত। কারণ অন্যান্য ইমামগণের মতানুসারে এক গুণ ছায়া হওয়ার পরপরই আসরের ওয়াক্ত এসে যাওয়া মেনে নিলে উম্মাতে মুহাম্মদীর বেশি আমলে প্রতিদান কম প্রকাশ পাবে। (কিরমানী)।

একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, উম্মতে মুহাম্মদী (সা) অন্যান্য উম্মাতের তুলনায় কম সময় ও কম কাজ করে বেশি সাওয়াবের অধিকারী হবে। হাদীসে

১৩. এখানে "কীরাত" শব্দ দিয়ে সাওয়াবের বিশেষ পরিমাণ বোঝানো হয়েছে।

www.pathagar.com

দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, যুহর থেকে আসরের সময়ের (মধ্যবর্তী সময়) তুলনায় আসর থেকে মাগরিবের সময় অত্যন্ত কম। আর আসরের ওয়াক্ত যদি দুই ছায়ার পর আরম্ভ হওয়া স্বীকার করা হয় তবেই উম্মাতে মুহাম্মদীর ফযীলত অন্যান্য উম্মাতের ওপর সাব্যস্ত হবে।

হাদীসে জিবরাঈল (আ) মুকাদ্দাম বা পূর্বের অপর পক্ষে اَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ এবং হাদীস ক্বিরাত পরের অর্থাৎ যুহর নামায দেরীতে পড়ার হাদীস ও উম্মতে মুহাম্মদী (সা)-এর কম কাজ করে বেশি সাওয়াব দেয়া সম্পর্কিত হাদীসটি পরের, কাজেই حديث قيراط ও ابردوا بالظهر হল নাসিখ আর হাদীস জিব্রাঈল মানসূখ। (كما بيّن ابن همام)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّنِيْ جِبْرَئِيْلُ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ فَصَلَّ بِيَ الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَصَلّٰى بِيَ الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَصَلّٰى بِيَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلّٰى بِيَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلّٰى بِيَ الْفَجْرَ حِيْنَ حَرَّمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ ثُمَّ صَلّٰى بِيَ الظُّهْرَ مِنَ الْغَدِ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ وَصَلّٰى بِيَ الْمَغْرِبَ حَيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلّٰى بِيَ الْعِشَاءَ حِيْنَ مَضٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلّٰى بِيَ الْغَدَاةَ عِنْدَ مَا اَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتْ اِلَيَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَلْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ هٰذَا وَقْتُ الْاَنْبِيَاءِ مِنَ قَبْلِكَ (كما في شرح معاني الاثار للطحاوي)

হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, জিব্রাঈল (আ) আমার নামাযের দু'বার ইমামতি করেন....... দ্বিতীয় দিন যখন বস্তুর ছায়া এক গুণ হল তখন যুহরের নামায আদায় করা হল আর আসরের নামায পড়া হল যখন বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ।[১৪]

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلٰى اُمِّ سَلْمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ سَاَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَا اُخْبِرُكَ : صَلِّ الظُّهْرَ اِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَالْعَصْرَ اِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ الخ رواه مالك "في المؤطا" واسناده صحيح "اثار السنن" (ج : ١ ، ص : ٤٢ اعلاء السنن ، ج : ٢ ، ص ، ٨)

১৪. ইমাম তাহাভী, শারহে মা'আনিল আসার, গাযালী বুক ডিপো, দেওবন্দ, খ. ১, পৃ. ৮৭।

www.pathagar.com

৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) নামায আদায়ের সময়ের যে, বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তিনি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন, বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পরেই আসরের নামায আদায় কর।[১৫]

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَّنِيْ جِبْرَئِيْلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ .... وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْاَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ صِلُّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ... الخ . رواه الترمذى فى مواقيت الصلوة . ج : ١ ، ص : ٣٨ وايضا رواه ابو داؤد

৭. জিব্রাঈল (আ)-এর ইমামতিতে দ্বিতীয় দিবসে আসরের নামায বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়ার পরেই আদায় করা হয়েছে।[১৬]

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা বোঝা যায় বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর আসরের নামায আদায় করা হয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে যুহরের শেষ ওয়াক্ত হল যখন আসরের ওয়াক্ত প্রবেশ করে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاٰخِرُوَقْتِ الظُّهْرِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ ، كَمَا فِي بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرُ الْعَصْرُ الخ . رواه أبو داؤد فى كتاب الصلوة ص : ٥١

قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ سَاَلَهُ عَبْدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ صَلِّ الظُّهْرَ اِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَالْعَصْرَ اِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ أخرجه مالك بسند صحيح كما فى فقه السنن والاثار فى كتاب الصلوة ص ٣٧

عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) رِوَايَاتُ وَالْمَشْهُوْرُهُ عَنْهُ وَذَكَرَهَا اَرْبَابُ الْمُتُوْنِ اَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ اِلَى الْمِثْلَيْنِ وَقَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ عَلَى الْهِدَايَةِ اَنَّهَا ظَاهِرُ الرواية وتبعه ابن عابدين .

---

১৫. ইমাম মালিক মুয়াত্তা, ইমাম মালেক (র), যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ৮।

১৬. ইমাম তিরমিযী, জামিউত তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮।

www.pathagar.com

وَفِىْ رِوَايَةٍ الثَّانِيَةِ اَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ اِلَى الْمِثْلِ وَبَعْدَهُ وَقْتُ الْعَصْرِ فِىْ عَامَّةِ كُتُبِنَا اَنَّهَا عَنْ حَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَفِىْ مَبْسُوْطِ السَّرَخْسِىْ اَنَّهَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح)

وَالثَّالِثَةُ اَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ اِلَى الْمِثْلِ وَوَقْتَ الْعَصْرِ مِنَ الْمِثْلِ الثَّالِثِ وَالْمِثْلُ الثَّانِىْ مُجْمَلٌ وَهٰذِهِ مَرْوِيَّةٌ بِطَرِيْقِ اَسَدِ بْنِ عَمْرٍو .

اَلرَّابِعَةُ فِىْ عُمْدَةِ الْقَارِىْ وَصَحَّحَهَا الْكَرْخِىُّ يَصِيْرُ مِثْلَيْنِ وَهٰذِهِ الرواية مشبهة اى مشتملة على زيادة الخبر بخلاف غيرها فانها نافية اى غير مشتملة على زيادة الخبر . (كما فى حاشية الترمذى ص : ٣٩) وافتى صاحب الدر المختار باداء الظهر فى المثل الاول ورد عليه ابن عابدين بان المثلين ظاهر الرواية .

আসরের ওয়াক্ত

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর প্রসিদ্ধ মতে বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া থেকে আসরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়।

ইমাম শাফিঈ (র), মালিক (র) ও আহমাদ (র) এবং সাহিবাইনের (র) মতে মূল ছায়া ব্যতীত ছায়া তার সমান হওয়ার পর আসরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়।

মোটকথা, আসরের প্রথম সময় হল যখন উভয় দলের মত অনুসারে যুহরের সময় পার হয়ে যায়। আর আসরের শেষ সময় হল যতক্ষণ না সূর্য ডুবে যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

عَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ

(رواه البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه فى مواقيت الصلوة . وأيضًا رواه مسلم باب الصلوة .

যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার আগে আসরের সালাতের এক রাক'আত পেল সে আসরের সালাত পেল। (বুখারী শরীফ) নামাযের সময়সূচী অধ্যায়ে ইমাম মুসলিম ও একই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

মাগরিবের ওয়াক্ত

সূর্যাস্তের পর পরই মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয়। এ ব্যাপারে ফকীহগণের কোন মতপার্থক্য নেই। ইমাম কাসানী (র) বলেন,

اَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَحِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ بِلاَ خِلاَفٍ .

www.pathagar.com

ফকীহগণের ঐকমতে সূর্যাস্তের পরই মাগরিবের নামাযের শুরু সময়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوَاتِ فَقَالَ .... "وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ .

রাসূল করীম (সা) বলেন, মাগরিবের সালাতের ওয়াক্ত সূর্যাস্ত থেকে শাফাক গায়িব না হওয়া পর্যন্ত এবং এশার সালাতের ওয়াক্ত অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত। [১৭] (মুসলিম শরীফ)

وفى رواية البخارى عن جابر بن عبد الله ...... والْمَغْرِبَ اِذَا وَجَبَتْ الخ

সূর্য অস্ত গেলেই (নবী করীম (সা) মাগরিবের (নামায) আদায় করতেন।[১৮] (বুখারী শরীফ)

হানাফী মাযহাব মতে মাগরিবের শেষ সময় সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশে شفق-সাদা আভা বিলীন হওয়া পর্যন্ত। যেমন মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقِ (رواه مسلم)

সূর্যাস্ত থেকে শাফাক গায়েব না হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে। (মুসলিম শরীফ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ .... اَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَاٰخِرُهُ حِيْنَ يَغِيْبُ الشَّفَقُ .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত হল যখন সূর্য অস্ত যায় এবং শেষে ওয়াক্ত হল (শাফাক) সাদা আভা বিলীন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত।[১৯]

عَنْ اِبْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ .

১৭. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, মে ২০০৪, খ. ২, পৃ. ৩১০।

১৮. ইমাম বুখারী, সহীহ ও বুখারী শরীফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯১, খণ্ড ২, পৃ. ২০, ২২।।

১৯. ইমাম আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩২০।

www.pathagar.com

—মাগরিবের (শেষ) সময় হল সাদা আভা শেষ না হওয়া পর্যন্ত।[২০]

ইমাম আযম আবু হানীফা (র) মতে شفق (শাফাক) অর্থ দিগন্তের ফরসা আলো বা সাদা আভা, যা লালিমার পরে দেখা দেয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে শাফাক হল দিগন্ত লালিমা। ইমাম মালিক (র), শাফিঈ (র) আহমাদ (র) মতেও শাফাক হল দিগন্ত লালিমা।

ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ (র)-এর মতে মাগরিবের শেষ সময় শাফাক (দিগন্ত লালিমা) শেষে হওয়া পর্যন্ত।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত ইবন আব্বাস (রা), উপরোক্ত মত প্রদান করেছেন অর্থাৎ শাফাক অর্থ (লালিমা)।

অপরপক্ষে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলে শাফাক অর্থ সাদা আভা। এরূপ মত প্রদান করেছেন সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা), হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা), অর্থাৎ উপরিউক্ত সাহাবীগণের মতে শাফাক অর্থ সাদা আভা।[২১]

কারো কারো মতে ইমাম আযম আবূ হানীফা, সাহিবাইনের সাথেও দ্বিমত পোষণ করেছেন। তবে এ ব্যাপারে ইমাম সাহেবের একাধিক মতামত রয়েছে।

মাগরিবের সময়ের ব্যাপারে শাফিঈ (র)-এর দু'টি মত রয়েছে। একটি হল সূর্যাস্তের পর মাত্র তিন রাক'আত নামায পড়ার পরিমাণ সময় হচ্ছে মাগরিবের নামাযের সময়। (হিদায়া)

দ্বিতীয় মত হল শাফাক অর্থাৎ লাল আভা গায়িব হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের শেষ সময়।

وفى "البحر" الشفق هو البياض عند الامام (أبو حنيفة) الى ان قال فثبت ان قول الامام هو الأصح وبهذا ظهر انه لا يفتى ويعمل الا بقول الامام الأعظم ولا يعدل عنه الى قولها أو قول أحدهما او غيرهما الا لضروة

وفى حشية البحر "للعلامة الشامى" قال فى "الاختيار" الشفق البياض ، وهو مذهب أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، ومعاذ بن جبل وعائشة رضى الله عنهما (إعلاء السنن) فى كتاب الصلوة ص : ١١ (بن يريد الزيادة قديقرأ إعلاء السنن)

২০. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, ফাতহুল মুলহিম, আশরাফিয়া লাইব্রেরী, দেওবন্দ, ভারত বাব নামাযের সময়, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৫।

২১. দরসে তিরমিযী, মাওলানা তাকী উসমানীর বয়ান, রশিদিয়া লাইব্রেরী, মহল্লা মুফতী, সাহারানপুর, ভারত, খণ্ড ১, পৃ. ৩৯৭।

www.pathagar.com

ই'লাউস সুনানে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

ইমাম আযম আবূ হানীফার দলীল হল ঃ

قال عليه السلام "واٰخِرَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ اِذَا اَسْوَدَّ الْاُفُقُ . وما رواه موقوف على ابن عمر ذكره مالك فى المؤطا وفيه اختلاف الصحابة .

هداية ص : ٨٢

মাগরিবের শেষ সময় হল যখন দিগন্ত কালো হয়ে যায়। এ হাদীসটি ইবন উমর (রা)-এর উক্তি হিসাবে ইমাম মালিক মু'আত্তা গ্রন্থে ইহা উল্লেখ করেছেন। আর এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে।[২২]

شفق শব্দটির দু'টি অর্থ লাল ও সাদা, লাল রং-এর পরই সাদা অতঃপর কালো রং দেখা দেয়। আবূ দাঊদ শরীফের বর্ণনায় আছে ঃ

حِيْنَ يَسْوَدُّ الْاُفُقُ .

যখন দিগন্ত কালো হয়ে যায়।[২৩]

অর্থাৎ মাগরিবের শেষ সময় হল যখন দিগন্ত কালো হয়ে যায়। সাদা রং সমাপ্তির পরই কালো রং দেখা দেয় এর দ্বারা বোঝা গেল যে, মাগরিবের শেষ সময় সাদা আভা শেষ হওয়া পর্যন্ত।

এশার ওয়াক্ত

এশার প্রথম সময় হল যখন শাফক অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তার শেষ সময় হল যতক্ষণ না ফজর (সুবহি সাদিক) উদিত হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

وَاٰخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِيْنَ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ .

এশার শেষ সময় হল যতক্ষণ না ফজর উদিত হয় (নাসায়ী) কিন্তু রাতের অর্ধাংশের পর এশার সালাত মাকরূহ আর এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব। রাতের অর্ধাংশের পর নামায বিলম্বিত করা মাকরূহ তানযিহী।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اعْتَمَ النَّبِىُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتّٰى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتّٰى نَامَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلّٰى فَقَالَ اِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ وَفِىْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ لَوْ لاَ اَنْ يَّشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ .

رواه مسلم فى باب وقت العشاء وتاخيرها

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) (এশার সালাতে) দেরী করলেন। এমন কি রাতের এক বড় অংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। যারা

২২. আল হিদায়া, খণ্ড ১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৬০।

২৩. আবূ দাঊদ, সুনান, সালাত অধ্যায়, বাব নামাযের সময়, পৃ. ৫৭।

www.pathagar.com

মাসজিদে ছিল তারাও ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বেরিয়ে এসে সালাত আদায় করলেন, এর পর বললেন, এটাই সালাতের সময় যদি না আমি আমার উম্মাতের জন্য একে কষ্টকর বলে মনে করতাম। আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনায় রয়েছে, "যদি আমার উম্মাতের উপর তা কষ্টকর না হত।"

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ اَنَّهُ قَالَ لاَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا افْرَاطُ الْعِشَاءِ ؟ قَالَ طُلُوْعُ الْفَجْرِ رواه الطحاوى واسناده صحيح (اثار السنن ج : ١ ، ص : ٤٤)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

اَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِيْنَ يَغِيْبُ الشَّفَقُ وَاٰخِرُهُ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ .

শাফাক অপসৃত হওয়ার পর থেকে এশার নামাযের সময় শুরু হয় এবং ফজর তথা সুবহি সাদিক উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এশার ওয়াক্ত বাকী থাকে।[২৪]

যেহেতু মাগরিবের শেষ সময় নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তাই এশার প্রথম সময় নিয়েও ফকীহদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে।

নবী করীম (সা) হতে বর্ণিত আছে ঃ

اِنَّهُ قَالَ لاَ يَدْخُلُ وَقْتُ صَلاَةٍ حَتّٰى يَخْرُجَ وَقْتُ اُخْرٰى .

এক নামাযের ওয়াক্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় না।[২৫]

তাই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে শাফাক অর্থাৎ পশ্চিমাকাশের সাদা আভা গায়িব হওয়ার পর থেকে সুবহি সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত এশার নামাযের ওয়াক্ত। উপরে বর্ণিত সহীহ হাদীস এর প্রমাণ। আর এই মতই পোষণ করেন অনেক সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈন।

ইমাম মালিক (র), শাফিঈ (র), আহমাদ (র), আবূ ইউসুফ (র), মুহাম্মদ (র)-এর মতে শফক অর্থাৎ লালিমা গায়েব হওয়ার পর থেকে এশার নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়।

এশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময় হল বিতরের নামাযের ওয়াক্ত।

وتنقيح المذاهب فيه ما ذكره العينى ، قال الثورى وابن أبى ليلى وطاؤس ومكحول والحسن بن حى والأوزاعى ومالك والشافعى وأحمد واسحق وداؤد اذا غاب الشفق وهو الحمرة خرج وقتها (المغرب) وممن قال ذلك أبو يوسف ومحمد

---

২৪. শারহে মা'আনিল আসার, তাহাভী শরীফ, ইমাম আবূ জা'ফর তাহাভী, দেওবন্দ, গাযালী বুক ডিপো খণ্ড ১, পৃ. ৯৪।

২৫. ইমাম আল কাসানী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩২১।

www.pathagar.com

وقال عمر بن عبد العزيز وعبد اللّٰه بن المبارك والاوزاعى فى رواية وزفر بن الهذيل وأبو ثور والمبرد والفراد لا يخرج (وقت المغرب) حتى تغيب الشفق الابيض روى ذلك عن أبى بكر الصديق رضى اللّه عنه وعائشة رضى اللّٰه عنها وأبى هريرة رضى اللّٰه عنه ومعاذ بن جبل رضى اللّٰه عنه وأبى بن كعب رضى اللّٰه عنه وعبد اللّٰه بن الزبير رضى اللّٰه عنه واليه ذهب أبو حنيفة رحمه اللّٰه ، وقال ابن المنذر : وكان مالك رحمه اللّٰه والشافعى رحمه اللّٰه والأوزاعى يقولون : لاوقت لها الا وقتا واحداً اذا غابت الشمس وقد روينا عن طاؤس أنه قال : لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر. (عمدة القارى ج : ٢ ، ص : ٥٦٦)[২৬]

---

২৬. মাওলনা যাফর আহমাদ উসমানী , ই'লাউস সুনান, ইদারাতুল কুরআন ও ওয়াল উলূমুল ইসলামিয়্যা, করাচী, পাকিস্তান, খণ্ড ২, পৃ. ১০।

www.pathagar.com

নামাযের মুস্তাহাব সময়

ফজর নামাযের মুস্তাহাব সময়

ফজর নামাযের সময় সুবহে সাদিক থেকে শুরু হয় এবং সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাকি থাকে। এ বিষয়ে ইমামগণ ঐকমত্য পোষণ করেন এবং তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এতে কারো মতভেদ নেই। তবে ফজর নামাযের মুস্তাহাব সময় সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের হাদীস রয়েছে। যে কারণে এ বিষয়ে ইমামগণের কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। অবশ্য হাদীসসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুবহে সাদিকের পর আকাশ কিছুটা ফর্সা[১] হলে ফজর নামাযের মুস্তাহাব সময় হয়। নিম্নে ফজর নামাযের মুস্তাহাব সময় সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ صَلٰوةً لِغَيْرِ مِيْقَاتِهَا الاَّ صَلاَتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا . رواه البخارى ج : ١ ، ص : ٢٢٨ باب متى يصلى الفجر بجمع

"আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-কে নামাযের নির্ধারিত সময় ব্যতীত কোন নামায পড়তে দেখিনি। তবে দুই ওয়াক্তের নামায (মুযদালিফায়) মাগরিব ও এশার নামায এক সাথে পড়েছেন এবং ফজর নামায তার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পড়েছেন।" (বুখারী, পৃ. ২২৮, খ. ১)

উল্লিখিত হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন যে, নবী করীম (সা) মুযদালিফায় ফজর নামায সময়ের পূর্বে পড়েছেন। এ সম্পর্কে ইমাম নববী (র) বলেন যে, নবী করীম (সা) দৈনন্দিন যে সময়ে ফজর নামায পড়তেন এ দিন এর পূর্বে পড়ে ছিলেন। তবে তা সুবহে সাদিকের পর, এর পূর্বে ফজর নামায পড়া জায়িয নয়। এ বিষয়ে সকল মুসলমান একমত। উক্ত হাদীসে ফজর নামায সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে যে, নবী করীম (সা) মুযদালিফায় ফজর নামায নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পড়েছেন। অর্থাৎ নবী করীম (সা) দৈনন্দিন নিয়মিত যে সময় ফজর পড়তেন মুযদালিফায় সে সময়ের পূর্বে ফজর নামায পড়েছেন। তবে তা সুবহে সাদিকের পূর্বে পড়েন নি। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নবী করীম (সা) দৈনন্দিন ফজর নামায সুবহে সাদিক হওয়ার সাথেসাথে পড়তেন না; বরং কিছুক্ষণ পর আকাশ কিছুটা ফর্সা হলে পড়তেন। উল্লিখিত দুই সময়ের ব্যবধান অল্প নয়। যদি সামান্য ব্যবধান হত তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এভাবে বলতেন না যে, নবী করীম (সা) কখনো নির্ধারিত সময়ের পূর্বে

১. আকাশ কিছুটা ফর্সা হলে এমন সময় পড়া মুস্তাহাব যে, নামাযে সুন্দরভাবে চল্লিশ আয়াত পরিমাণ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করবে। এর পর যদি অযুর ত্রুটি ধরা পড়ে তবে পুনরায় অযূ করে পূর্বের ন্যায় নামায পড়তে পারে। হিদায়া ঃ পৃ. ৮২ খ. ১ আশরাফী বুকডিপো, দেওবন্দ, ইউ.পি, ভারত।

www.pathagar.com

নামায পড়েননি। তবে তিনি মুযদালিফায় ফজর নামায নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পড়েছেন। এতে বুঝা যায় যে, নবী করীম (সা) দৈনন্দিন ফজর নামায সুবহে সাদিক হওয়ার উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পড়তেন। যেহেতু সুবহে সাদিক ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময় এক ঘণ্টা পঁচিশ/ত্রিশ মিনিট। তাই সুবহে সাদিকের পর উল্লেখযোগ্য সময়ের পর আকাশ ফর্সা হয়ে যায়। সুতরাং উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নবী করীম (সা) ফজর নামায সুবহে সাদিকের পরপর অন্ধকার থাকতে পড়তেন না, আকাশ কিছুটা ফর্সা হলে পড়তেন এবং এটাই মুস্তাহাব।

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَانَّهُ اَعْظَمُ لِلاَجْرِ . رواه الترمذى ج : ١ ، ص ٢٣

"হযরত রাফি' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা ফজর নামায ফর্সা করে পড়, কারণ এতে সাওয়াব বেশি।" (তিরমিযী, পৃ. ২৩, খ. ১)

উক্ত হাদীস ফজর নামাযের মুস্তাহাব সময় সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এতে বলা হয়েছে যে, ফজর নামায ফর্সা করে পড়লে তাতে সাওয়াব বেশি হয়। সুতরাং ফজর নামায আকাশ ফর্সা হলে পড়া মুস্তাহাব।

عَنْ مُحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ رِجَالٍ مِّنْ قَوْمِهِ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَسْفَرْتُمْ بِالصُّبْحِ فَانَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ . رواه النسائى ج : ١ ، ص : ص : ٦٥

"মাহমূদ ইবনে লাবীদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর গোত্রের আনসারীগণ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা ফজর নামায যত বেশি ফর্সা করে পড়বে তত বেশি সাওয়াব হবে।" (নাসাঈ, পৃ. ৬৫, খ. ১)

উক্ত হাদীসে প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, আকাশ যথেষ্ট ফর্সা হলে ফজর নামায পড়া মুস্তাহাব।

তবে হাদীস গ্রন্থসমূহে এর বিপরীত কিছু হাদীসও পাওয়া যায়, যেগুলোর দ্বারা বুঝা যায় যে সুবহে সাদিকের পরপরই অন্ধকার বাকি থাকতে ফজর নামায পড়া ভাল। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبُوْنَ اِلٰى بُيُوْتِهِنَّ حِيْنَ يَقْضِيْنَ الصَّلٰوةَ لاَ يَعْرِفُهُنَّ اَحَدٌ مِّنَ الْغَلَسِ .

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'মিন স্ত্রীগণ তাদের চাদর দ্বারা আবৃত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে ফজরের নামাযে শরীক হতেন, নামায আদায় করার পর তারা

www.pathagar.com

তাদের বাড়ীতে ফিরে আসতেন। অন্ধকারের কারণে তাদেরকে কেউ চিনতে পারত না।" (বুখারী, পৃ. ৮২, খ. ১)

উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, মহিলারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ফজর নামায পড়ে বাড়িতে ফিরতেন এবং অন্ধকারের দরুন তাঁদেরকে চেনা যেতনা। তাই এ হাদীসের আলোকে অনেক ইমাম বলেন যে, ফজর নামায সুবহে সাদিকের সাথে সাথে অন্ধকার থাকতে অর্থাৎ প্রথম সময়ে পড়া মুস্তাহাব। তবে উক্ত হাদীসের সাথে বুখারী শরীফে উল্লিখিত আবু বারযাহ আসলামী (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের বিরোধ হয়। আবু বারযাহ আসলামী (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ .

"রাসূলুল্লাহ (সা) ফজর নামায শেষ করে ফিরতেন যখন কোন লোক তার পাশে বসা লোককে চিনতে পারত।" এতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) অনেক ফর্সা হলে ফজর নামায শেষ করতেন, কেননা তৎকালীন মসজিদে নব্বীর দেয়াল ও ছাদ অনেক নিচু ছিল এবং মসজিদে কোন জানালা ছিল না। সুতরাং মসজিদের বাইরে অনেক আলো হওয়ার পর মসজিদের ভিতরে পাশাপাশি বসা একজন লোক অপরজনকে চিনতে পারবে। তবে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের এভাবে ব্যাখ্যা করলে যে, মহিলাদেরকে অন্ধকারের কারণে চেনা যেত না এর অর্থ হচ্ছে মসজিদের ভেতরের অন্ধকারে চাদর পরিধান করা অবস্থায় চেনা যেত না। তাহলে উভয় হাদীসের মাঝে কোন বিরোধ থাকে না। তাছাড়া পূর্বে উল্লিখিত হাদীস সমূহে যেহেতু সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ফজর নামায ফর্সা হলে পড়ার মাঝে অধিক সাওয়াব রয়েছে। তাই আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত غلس বা 'অন্ধকার' এর অর্থ 'মসজিদের ভেতরের অন্ধকার' করা উত্তম। এতে করে হাদীসসমূহের বিরোধ থাকেনা।

عَنْ اُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ اَىُّ الاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَلصَّلٰوةُ لاَوَّلِ وَقْتِهَا . رواه الترمذى ج : ١ ، ص : ٤٢ باب ما جاء فى الوقت الاول من الفضل .

উম্মে ফারওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন আমল উত্তম ? তিনি (উত্তরে) বলেন, প্রথম সময়ে পড়া নামায। (তিরমিযী পৃ. ৪২, খ. ১)

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যে কোন নামায প্রথম সময়ে অর্থাৎ সময় হওয়ার সাথে সাথে পড়া উত্তম। এ হিসেবে ফজরের নামায সুবহে সাদিক হওয়ার সাথে সাথে অন্ধকার থাকা অবস্থায় পড়া উত্তম। যার প্রেক্ষিতে ফকীহগণের মধ্যে অনেকে বলেন, ফজরের নামায সুবহে সাদিকের পরপর অন্ধকার থাকাকালীন পড়া মুস্তাহাব, নামাযের মুস্তাহাব সময়ের বিষয়ে গবেষণা করলে বুঝা যায় যে, উক্ত হাদীসে যে প্রথম সময়ে নামায পড়া উত্তম বলা হয়েছে তা সকল নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যেমন এশার নামায বিলম্বে পড়ার কথা হাদীসে বলা হয়েছে এবং এ বিষয়ে ইমামগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এমনিভাবে যুহরের নামায গ্রীষ্মকালে বিলম্ব করে পড়ার কথা হাদীসে বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

সুতরাং উক্ত হাদীসের এমন ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যা সকল নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। তাই এর অর্থ হবে মুস্তাহাব সময়ের শুরুতে পড়া উত্তম। এতে করে উক্ত হাদীস সকল নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তাহলে হাদীসের অর্থে একথা বুঝা যায় না যে, ফজর নামায সুবহে সাদিকের সাথে সাথে অন্ধকার থাকতে পড়া উত্তম।

ফজরের নামাযের সময় সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস রয়েছে। যেমন, রাফি' ইবন খাদীজের হাদীসসহ এ ধরনের বহু হাদীসে পূর্ব দিগন্তে পরিষ্কার হলে ফজর নামায পড়ার কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। অন্ধকার থাকতে ফজরের নামায পড়ার কথা হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। সুতরাং হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফজরের নামায আকাশ ফর্সা হলে পড়া মুস্তাহাব। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এ অভিমতই ব্যক্ত করেন।

যুহর নামাযের মুস্তাহাব সময়

যুহর নামাযের মুস্তাহাব সময় সম্পর্কে অধিক সংখ্যক ইমামের অভিমত হচ্ছে যে, গরমের দিনে বিলম্ব করে পড়া এবং শীতের দিনে প্রথম ওয়াক্তে পড়া মুস্তাহাব। অবশ্য কারও মতে সময় হওয়ার সাথে সাথে অর্থাৎ প্রথম সময়ে যুহর নামায আদায় করা মুস্তাহাব।

নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল।

عَنْ اَنَسْ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا كَانَ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ وَاِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ . رواه النسائى ج : ١ ، ص : ٨٧

"আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) গরমের সময় (যুহরের) নামায রোধের তাপ ঠাণ্ডা হওয়ার পর এবং শীতের সময় আগেভাগে পড়তেন।" (নাসাঈ, পৃ. ৮৭, খ. ১)

উক্ত হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যুহরের নামায গরমকালে বিলম্ব করে পড়তেন এবং শীতকালে শুরু ওয়াক্তে পড়তেন। সুতরাং যুহরের নামায গরমকালে দেরীতে পড়া ও শীতকালে শুরু ওয়াক্তে পড়া মুস্তাহাব।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ . رواه البخارى ج : ١ ، ص : ٧٧ باب الابراد بالظهر فى شدة الحر .

আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা যুহরের নামায রোধের তাপ ঠাণ্ডা হওয়ার পড় কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়। (বুখারী, পৃ. ৭৭, খ. ১)

গরমকালে যুহরের নামায বিলম্বে পড়ার কথা এ হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সুতরাং যুহরের নামায গরমকালে দেরী করে পড়া মুস্তাহাব।

www.pathagar.com

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَاَرَادَ الْمُؤَذِّنُ اَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ اَبْرِدْ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ اَبْرِدْ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ اَبْرِدْ حَتّٰى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُوْلَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ . رواه البخارى ج : ١ ، ص : ٨٨ باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة .

"আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (সা) এর সাথে সফরে ছিলাম। মু'আয্যিন আযান দিতে চাইল। নবী করীম (সা) তাকে বললেন। রোদের তাপ কমার অপেক্ষা কর। কিছুক্ষণ পর সে আবার আযান দিতে চাইল। তিনি তাকে বললেন, রোদের তাপ কমার অপেক্ষা কর। অবশেষে টিলার ছায়া টিলার সমপরিমাণ হয়ে গেল। এরপর নবী করীম (সা) বললেন ঃ গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়।" (বুখারী ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৮)

উক্ত হাদীসেও গরমকালে যুহরের নামায দেরী করে পড়ার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। যেসব হাদীসে গরমকালে দেরী করে যুহরের নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে, কেউ এর ব্যাখ্যা করেন যে, বাড়ি থেকে গরমের সময় মসজিদে আসা কষ্টকর বলে গরম কমলে আসার কথা বলা হয়েছে। তবে তা আবু যর (রা)-এর হাদীসের আলোকে তা ভুল প্রমাণিত হবে। কেননা, উক্ত হাদীসে সফরের অবস্থায় যুহরের নামায বিলম্ব করে পড়ার কথা তিনবার বলা হয়েছে। সফরের অবস্থায় সকলে এক সাথে থাকে। কারো বাড়ি বা অন্য কোন স্থান থেকে আসার কোন প্রয়োজন হয় না। সুতরাং যুহরের নামায বিলম্ব করে পড়ার কারণ হিসেবে যদি বাড়ি বা দূর থেকে আমার সুবিধার্থে বিলম্ব করে পড়ার কথা বলা হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং সফর বা সফর ছাড়া সর্বাবস্থায় গরমকালে যুহরের নামায বিলম্বে পড়া মুস্তাহাব এবং শীতকালে প্রথম ওয়াক্তে পড়া মুস্তাহাব।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا كَانَ اَشَدَّ تَعْجِيْلاً لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ مِنْ اَبِىْ بَكْرٍ وَّلاَ مِنْ عُمَرَ رواه الترمذى ج : ١ ، ص : ٤٠ باب ما جاء فى التعجيل بالظهر .

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেয়ে বেশি আগেভাগে (প্রথম সময়ে) কাউকে যুহরের নামায পড়তে দেখিনি এবং আবূ বকর ও উমর (রা)-এর চেয়ে আগে ও কাউকে যুহরের নামায পড়তে দেখিনি।" (তিরমিযী ঃ খ. ১, পৃ. ৪০)

উক্ত হাদীস দ্বারা কোন কোন ইমাম যুহরের নামায সব সময় অর্থাৎ শীত ও গরম সর্বাবস্থায় শুরু ওয়াক্তে পড়াকে মুস্তাহাব মনে করেন। তবে উক্ত হাদীসে গরমকাল বা শীত কালের কোন উল্লেখ নেই। যুহরের নামাযের সময় বিষয়ক হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এমন বহু হাদীস রয়েছে যাতে গরমকালে যুহর নামায বিলম্ব করে এবং শীত

www.pathagar.com

কালে শুরু ওয়াক্তে পড়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীস এবং যে সব হাদীসে যুহর নামায প্রথম সময়ে পড়ার কথা বলা হয়েছে, তা শীতকালের যুহর নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এতে সকল হাদীসের অর্থ যথাস্থানে ঠিক থাকবে।

যদি কেউ শুরু ওয়াক্তে নামায পড়ার ফযীলতের হাদীস দ্বারা শীত ও গরম সব সময় যুহরের নামায শুরু ওয়াক্তে পড়াকে মুস্তাহাব মনে করেন তবে তা ঠিক হবে না। কেননা উক্ত হাদীস সকল নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন এশার নামায বিলম্ব করে পড়া উত্তম। এ বিষয়ে সকল ইমামগণ ঐকমত্য পোষণ করেন। সুতরাং যেহেতু যুহরের নামায সম্পর্কে অধিক সংখ্যক হাদীসে গরমকালে বিলম্ব করে পড়ার কথা বলা হয়েছে, তাই যুহরের নামাযের ক্ষেত্রে উক্ত হাদীস প্রযোজ্য হবে না।

যুহরের নামাযের সময় বিষয়ক হাদীস সমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গরমকালে যুহর নামায বিলম্ব করে পড়া এবং শীতকালে শুরু ওয়াক্তে পড়া মুস্তাহাব।

যুহর নামাযের মুস্তাহাব সময় সম্পর্কে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বিপ্রহরের সময় নামায আদায় করা হারাম

সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বিহরের সময় নামায পড়া হারাম। এ বিষয়ের প্রায় সকল ইমামগণ একমত। তবে কেউ কেউ দিপ্রহরের সময় নামায আদায় করা নিষিদ্ধ নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উক্ত সময়ে ফরয, নফল সব ধরনের নামায আদায় করা নিষিদ্ধ। তবে কোন কোন ইমাম বলেন যে, শুধু নফল নামায আদায় করা নিষিদ্ধ। ফরয নামায বা কাযা নামায আদায় করা যাবে। কোন কোন ইমাম বলেন যে, জুমু'আর দিন দ্বিপ্রহরে নামায পড়া নিষিদ্ধ নয়। তবে হাদীস সমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বিপ্রহরে ফরয নামায নফল নামাযসহ সব ধরনের নামায আদায় করা নিষিদ্ধ।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ اَوْ اَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضِيْفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ . رواه مسلم ج : ١، ص : ٢٧٦

১. উকবা ইবনে আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে তিন সময়ে নামায পড়তে নিষেধ করতেন এবং এ তিন সময়ে আমাদের মৃতদেরকে কবর দিতেও নিষেধ করতেন।[২]

---

২ হাদীসে উল্লিখিত কবর দেয়ার কথা দ্বারা জানাযা নামাযকে বুঝানো হয়েছেন। নামাযের নিষিদ্ধ সময় মৃত দাফন করা জায়িয এ বিষয়ের ইমামগণ একমত পোষণ করেন। (ই'লাউস্ সুনান, পৃ. ৫৭, খ. ২)

www.pathagar.com

সূর্য উদয় হওয়ার সময়। সূর্য (পূর্ণভাবে) উঠা পর্যন্ত। সূর্য ঠিক উপরে (ঠিক দুপুরে) থাকা অবস্থায়।[৩] সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত। সূর্য অস্তমিত হতে শুরু করলে, সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। (মুসলিম, পৃ. ২৭৬, খ. ১)

উক্ত হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং দ্বিপহরের সময় নামায আদায় করা নিষিদ্ধ এবং এতে ফরয নামায বা জুমু'আর নামাযকে নিষিদ্ধ ঘোষণা থেকে বাদ দেয়া হয়নি।

عَنْ عَمْرُ بْنِ عَبَسَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَانَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ وَهِىَ سَاعَةُ صَلٰوةِ الْكُفَّارِ فَدَعِ الصَّلٰوةَ حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَيَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ الصَّلٰوةُ مَحْضُوْرَةٌ مَشْهُوْرَةٌ الٰى اَنْ يَّنْتَصِفَ النَّهَارُ فَانَّهَا سَاعَةَ تُفْتَحُ فِيْهَا اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَتُسَجَّرُ فَدَعِ الصَّلٰوةَ حَتّٰى يَفِىْءَ الْفَيْئُ ثُمَّ الصَّلٰوةُ مَحْضُوْرَةٌ مَشْهُوْدَةٌ الٰى غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَانَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ الشَّيْطَانِ وَهِىَ سَاعَةٌ صَلٰوةِ الْكُفَّارِ رواه الطحاوى ج : ١ ، ص ٩١

২. আমর ইবন আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সূর্য যখন উদিত হয় তা শয়তানের দুই শিং-এর মাঝে উদিত হয়। তা কাফেরদের উপাসনার সময়। তাই সূর্য পূর্ণভাবে উঠে কিরণ বিস্তার করা পর্যন্ত নামায পড়বে না। এরপর নামাযের সময় থাকবে ঠিক দুপুর পর্যন্ত। ঠিক দুপুর সময় জাহান্নামের দরজাসমূহ খোলা হয় এবং জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয়। তাই ছায়া পড়া পর্যন্ত নামায পড়বে না। এরপর নামাযের সময় থাকবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। শয়তানের দুই শিং-এর মাঝে সূর্য অস্ত যায় এবং তা কাফিরদের উপাসনার সময়। (তাহাভী, পৃ. ৯১, খ. ১)

উক্ত হাদীসে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বিপ্রহরের সময় নামায নিষিদ্ধ বলার সাথে সাথে এর কারণ ও উল্লেখ করা হয়েছে। এতে করে এ সময়গুলোতে নামায আদায় করার নিষিদ্ধতা আরো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

উল্লিখিত নিষিদ্ধ সময় কেবল নফল নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ফরয নামাযের জন্য নিষিদ্ধ নয় বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

তিরমিযী শরীফের হাদীস ঃ

مَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوتِهٖ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا اذا ذَكَرَهَا

"যে ব্যক্তি নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকে অথবা ভুলে যায় সে যেন স্মরণ হলে পড়ে নেয়।" উক্ত হাদীস দ্বারা তারা প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, যেহেতু ঘুম থেকে উঠার ও স্মরণ হওয়ার

৩. যখন পূর্ব ও পশ্চিমে ছায়া পড়ে না তখন ঠিক দুপুর (শারহে নববী লি মুসলিম, পৃ. ২৭৬, খ ঃ ১ (মুসলিম)

www.pathagar.com

সাথে সাথে নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে। তাই নিষিদ্ধ সময়েও কেউ ঘুম থেকে উঠলে বা নামাযের কথা স্মরণ হলে তখনি নামায আদায় করে নেবে। সুতরাং নিষিদ্ধ সময়ে ফরয নামায আদায় করা জায়িয হবে। প্রকৃতপক্ষে এ হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না। কেননা, উক্ত হাদীসের অর্থ যেমনিভাবে "যখন স্মরণ হয় তখন নামায আদায় করে নেবে" অর্থ করা যায়। তদ্রূপ "যদি স্মরণ হয় তবে নামায আদায় করে নেবে" অর্থও করা যায়। সুতরাং নিষিদ্ধ সময়ে স্মরণ হলেও তখনই নামায আদায় করতে হবে তা প্রমাণিত হয় না। তাছাড়া ঋতুকালীন সময়ে কোন মহিলার নামাযের কথা স্মরণ হলে সে তৎক্ষণাৎ নামায পড়বে না; পাক হওয়ার পর পড়বে। এরূপ নিষিদ্ধ সময়ে নামাযের কথা স্মরণ হলে বা ঘুম থেকে জাগ্রত হলে তখনই সে নামায পড়বে না; বরং নিষিদ্ধ সময় অতিবাহিত হলে নামায পড়বে। রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বারের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে শেষ রাতে যাত্র বিরতি করে সাহবায়ে কেরাম সহ ঘুমিয়ে ছিলেন। তখন সূর্য উটে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুম থেকে উঠে সাথে সাথে ফজরের নামায আদায় করেন নি। পরিপূর্ণভাবে সূর্য উঠার পর নামায আদায় করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত হাদীস নিষিদ্ধ সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পূর্বে উল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বিপ্রহরের সময় ফরয ও নফল সবধরনের নামায আদায় করা নিষিদ্ধ।

জুমু'আর নামায দ্বিপ্রহরে বা এর পূর্বে আদায় করা জায়িয বলে কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উল্লিখিত ফকীহগণ তিরমিযী শরীফের হাদীস দ্বারা তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا كُنَّا نَتَغَدّٰى فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا نَقِيْلُ اِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ . ترمذى ج : ١ ، ص : ٩٥

সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে আমরা জুমু'আর নামাযের পরেই দ্বিপ্রহরের পূর্বের খাবার খেতাম এবং দুপুরের বিশ্রাম করতাম। غدا বলা হয় দ্বিপ্রহরের পূর্বের খাবারকে। যেহেতু তাঁরা জুমু'আর নামাযের পর غدا বা দ্বিপ্রহরের পূর্বের খাবার খেতেন, তাই তাঁরা দ্বিপ্রহরের পূর্বে জুমু'আর নামায পড়তেন। এ থেকে তারা দ্বিপ্রহরের পূর্বে অথবা দ্বিপ্রহরে জুমু'আর নামায পড়া জায়িয বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তবে খাবারের নাম দিয়ে নামাযের সময় নির্ধারণ করা যায় না। কেননা অনেক সময় দেখা যায় সকালের নাস্তা দুপুরে খাওয়া হয়। তাই বলে দুপুরকে সকাল বলা যাবে না। সুতরাং হাদীসে উল্লিখিত দ্বিপ্রহরের পূর্বের খাবার তাঁরা দ্বিপ্রহরের পূর্বেই খেয়েছেন এমন নয়; বরং হাদীসটির অর্থ হবে, তাঁরা নিষিদ্ধ সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে প্রথম সময়ে জুমু'আর নামায আদায় করতেন এবং খাওয়ার নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কিছুটা বিলম্ব করে খেতেন। সুতরাং এ হাদীস প্রমাণ করে না যে, দ্বিপ্রহরের পূর্বে বা দ্বিপ্রহরের জুমু'আর নামায আদায় করা জায়িয। নিষিদ্ধ সময়ের হাদীসসমূহ সম্পর্কে গবেষণা করলে বুঝা যায় যে, উল্লিখিত হাদীস সমূহে নিষিদ্ধ সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সুস্পষ্ট। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বিপ্রহরের সময় নামায নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে। সুতরাং যেসব হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বিপ্রহরের সময় ফরয নামায, নফল নামায ও জুমু'আর নামাযসহ সকল নামায নিষিদ্ধ। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) এ অভিমতই ব্যক্ত করেন।

www.pathagar.com

আসর নামাযের মুস্তাহাব সময়

আসর নামাযের মুস্তাহাব সময় সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস রয়েছে। এ সব হাদীসের ভিত্তিতে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কারো মতে আসর নামায কিছুটা বিলম্ব করে তবে মাকরূহ সময়ের পূর্বে পড়া মুস্তাহাব আবার কারো মতে সময়ের শুরুতে পড়া মুস্তাহাব। তবে হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হয় যে, আসরের নামায কিছুটা বিলম্ব করে পড়া মুস্তাহাব। এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ﷺ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشَدَّ تَعْجِيْلاً لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ اَشَدُّ تَعْجِيْلاً لِلْعَصْرِ مِنْهُ . رواه الترمذى ج : ١ ، ص : ٤٢ باب ما جاء فى تاخير صلوة العصر .

"হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যুহর নামায তোমাদের অপেক্ষা বেশি তাড়াতাড়ি পড়তেন। তোমরা আসর নামায তাঁর (সা) অপেক্ষা বেশি তাড়াতাড়ি পড়।" (তিরমিযী, পৃ. ৪২, খ. ১)

উক্ত হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা) আসর নামায কিছুটা বিলম্ব করে পড়তেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, আসর নামায কিছুটা বিলম্ব করে পড়া মুস্তাহাব।

عَنْ عَلِىِّ بْنِ شَيْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً رواه أبو داؤد ، ج : ١ ، ص : باب وقت العصر .

আলী ইবন শায়বান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে মদীনায় আসলাম। তিনি সূর্য স্বচ্ছ, পরিষ্কার থাকা পর্যন্ত আসর নামায বিলম্ব করে পড়তেন। (আবূ দাঊদ, পৃ. খ.১)

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আসর নামায মাকরূহ সময়ের পূর্বপর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِىْ حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْئُ مِنْ حُجْرَتِهَا . رواه الترمذى و ، ج : ١ ، ص ٤١ باب ما جاء فى تعجيل العصر .

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ঘরে রোদ থাকা অবস্থায় আসর নামায পড়েছেন। তখনো তাঁর ঘরে ছায়া পড়েনি।" (তিরমিযী, পৃ. ৪১, খ. ১)

কেউ কেউ উক্ত হাদীসকে আসর নামায তাড়াতাড়ি অর্থাৎ প্রথম সময়ে পড়া মুস্তাহাব এ কথার দলীল হিসেবে পেশ করার চেষ্টা করেছেন। তারা বলেন উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সা) এমন সময় আসর নামায পড়েছেন যখন আয়েশা (রা)-এর ঘরের মেঝেতে রোদ ছিল; ছায়া পড়েনি। এতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম সময়ে আসর নামায পড়েছেন। কেননা সূর্য পশ্চিম দিগন্তে বেশি ঢলে পড়লে ঘরের মেঝের রোদ সরে যায়। তবে হাদীসটির ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আসর নামায প্রথম সময়ে পড়েছেন। এ হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত হয় না। কারণ, হাদীসে বলা হয়েছে والشمس فى حجرتها শব্দের অর্থ ছাদবিহীন ঘর (দেয়ালের বেষ্টনী)। ছাদ বিশিষ্ট ঘরকেও حجرة বলা হয়। যদি শব্দটিকে ছাদ বিশিষ্ট ঘর অর্থে ধরা হয় তা হলে এ কথা মানতে হবে যে, হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘর নিচু ছিল এবং দরজা ছোট ছিল, এ ধরনের ঘরের ভেতর রোদ পৌঁছতে দেরী হয়। এতে করে উক্ত হাদীস আসর নামায প্রথম সময়ে পড়ার দলীল হয় না বরং দেরীতে পড়ার দলীল হয়। পক্ষান্তরে উক্ত শব্দকে ছাদবিহীন ঘরের অর্থে গণ্য করা হলে বলতে হয় যে, এর দেয়াল নিচু ছিল। কারণ এ জাতীয় ঘরের দেয়াল স্বাভাবিকভাবে নিচু হয়ে থাকে। এ অবস্থায় সূর্য অপেক্ষাকৃত বেশি ঢলার পরও ভিতরের মেঝেতে রোদ থাকতে পারে। সুতরাং এতেও এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম সময়ে আসর নামায পড়েছেন। নামায কিছুটা দেরী করে পড়া মুস্তাহাব। (তবে তা মাকরূহ সময়ের পূর্বে হতে হবে) পূর্বে উল্লিখিত দু'টি হাদীসে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় এবং এ ধরনের আরো অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে যাতে আসর নামায কিছুটা বিলম্ব করে পড়ার কথা বলা হয়েছে। মোটকথা হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, আসর নামায কিছুটা বিলম্ব করে পড়া মুস্তাহাব। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) এ অভিমত পোষণ করেন।

www.pathagar.com

আসর ও ফজরের ফরয নামাযের পর নফল পড়া মাকরূহ

সাধারণভাবে হাদীসসমূহের বক্তব্য প্রমাণ করে যে, আসর ও ফজরের ফরযের পর যে কোন নামায আদায়ই মাকরূহ। এ সম্পর্কিত হাদীস নিম্নরূপ ঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدَ عِنْدِىْ رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ وَاَرْضَاهُمْ عِنْدِىْ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ (بخارى كتاب الصلوة مواقيت الصلوة باب الصلوة بعد العصر حتى ترتفع الشمس ٠ ج : ١ ، ص :)

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কয়েকজন আস্থাভাজন ব্যক্তি যাঁদের মাঝে শ্রেষ্ঠ হলেন, হযরত উমর (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের পর সূর্য উজ্জ্বল হয়ে না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।[১]

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, ফজর ও আসরের পর কোন নামায আদায় করা যাবে না। অন্যান্য হাদীস থেকে এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন,

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبَهَا (المرجع السابق)

হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের চেষ্টা করবে না।

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَاَخِّرُوْا الصَّلٰوةَ حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَاذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَاَخِّرُوْا الصَّلٰوةَ حَتّٰى تُغِيْبَ . (المرجع السابق)

হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, যখন সূর্যের একাংশ উদিত হবে তখন তোমরা পূর্ণরূপে উদিত হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায়ে বিলম্ব করবে। অনুরূপ একাংশ ডুবে যাওয়ার পর তোমরা পূর্ণরূপে অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায়ে বিলম্ব করবে।[২]

---

১. ইমাম বুখারী, সহীহ বুখারী, অধ্যায় ঃ সালাতের সময়সূচী পরিচ্ছেদ ঃ ফজরের পর সূর্য উঠার আগে সালাত আদায় করা, খণ্ড ১, পৃ. ৮২।

২. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلاَتَيْنِ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنِ الْاِحْتِبَاءِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِىْ بِفَرْجِهِ اِلَى السَّمَاءِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ . (المرجع السابق)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) দু'ধরনের বেচা-কেনা দু'ধরনের পোষাক পরিধান এবং দু'সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ফজরের পর সূর্য পূর্ণরূপে উদিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। এক কাপড়ে পুরো শরীর জড়িয়ে এবং কাপড় দ্বারা হাঁটুবেঁধে এমনভাবে বসতে নিষেধ করেছেন যাতে লজ্জাস্থান ওপরের দিকে খুলে যায় আর মুনাবায ও মুলামাসা পদ্ধতিতে বিক্রি নিষেধ করেছেন।[৩]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ اَحَبُّهُمْ اِلَىَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . مسلم ، كتاب فضائل القرآن - باب الاوقات التى نهى عن الصلوة فيها

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একাধিক সাহাবী (রা) থেকে শুনেছি—যাঁদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের পর সূর্য পূর্ণরূপে উদিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।[৪]

উপরোক্ত হাদীসসমূহের বক্তব্য থেকে বাহ্যত প্রতীয়মান যে, আসর ও ফজরের পর যে কোন নামাযই নিষিদ্ধ। কিন্তু ইমাম নববী (র) এ ব্যাপারে উম্মাতের ইজ্‌মা উল্লেখ করেছেন যে, এ সময় ফরয নামায আদায় করা যাবে।[৫]ফরযের কাযা ছাড়া অন্য যে কোন নফল এ দু' সময় আদায় করা মাকরূহ। এটাই হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের অভিমত। তবে এ দু'সময় জানাযার নামায ও সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত আদায় করতেও কোন আপত্তি নেই।[৬]

---

৩. প্রাগুক্ত।

৪. মুসলিম, অধ্যায় ঃ ফাযাইলুল কুরআন, পরিচ্ছেদ ঃ যে সকল সময়ে নামায আদায় করা নিষেধ, খণ্ড ১, পৃ. ২৭৫।

৫. নববী , মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ, মুসলিম, প্রাগুক্ত।

৬ শাইখুল ইসলাম, মারগীনানী, হিদায়া, অধ্যায় ঃ সালাত, পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের সময়সূচী, অনুচ্ছেদ ঃ যে সকল সময়ে নামায আদায় মাকরূহ।

www.pathagar.com

কোন কোন হাদীসের বক্তব্য দ্বারা বাহ্যত মনে হয়, এই দু'সময়ে (تحية الوضوء) তাহিয়্যাতুল অযূ ও (تحية المسجد) তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা যাবে। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো দ্রষ্টব্য ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ يَا بِلَالُ حَدِّثْنِىْ بِاَرْجٰى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الْاِسْلَامِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا اَرْجٰى عِنْدِىْ اِنِّىْ لَمْ اَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِىْ سَاعَةِ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ اِلَّا صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِىْ اَنْ تَطَهَّرَ ۔ بخارى كتاب التهجد (الصلاة) باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلوة بعد الوضوء بالليل ونهار ج : ١ ، ص : ١٥٤ ، مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل بلال رضـ ج : ١ ، ص :)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) হযরত বিলাল (রা) কে বললেন, হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণের পর সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক যে আমল করেছ তার কথা আমার নিকট ব্যক্ত কর। কারণ আমি জান্নাতে আমার সামনে তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। হযরত বিলাল (রা) উত্তর দিলেন, আমি তো এমন কোন আশাব্যঞ্জক আমল করিনি। তবে দিনরাতের যে প্রহরেই আমি পবিত্রতা অর্জন করেছি তখনই যে পরিমাণ সালাত আদায় করা আল্লাহ তা'আলা আমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন সে পরিমাণ সালাত আদায় করেছি।[৭]

উপরোক্ত হাদীস হযরত বিলাল (রা) দিবসে ও রাতে যে কোন সময় অযূ করার পর তাহিয়্যাতুল অযূ আদায় করার কথা উল্লেখ করেছেন। এতে বাহ্যত মনে হয় রাত দিনের যে কোন সময় এমন কি ফজর ও আসরের পরেও তাহিয়্যাতুল অযূ আদায় করা যাবে। মাকরূহ হবে না।[৮] এ সম্পর্কিত আরো বর্ণনা পাওয়া যায়।

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَا بِلَالًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ بِمَا سَبَقْتَنِىْ اِلَى الْجَنَّةِ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ اِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ اَمَامِىْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا اَذَّنْتُ قَطُّ اِلَّا صَلَّيْتُ اَنَّ لِلّٰهِ عَلَىَّ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِهِمَا ۔

---

৭. বুখারী, অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ, (সালাত) পরিচ্ছেদ ঃ রাত-দিন পবিত্রতা অর্জন এবং অযূর পর সালাত আদায়ের ফযীলত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪
মুসলিম, অধ্যায় ঃ সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা, পরিচ্ছেদ ঃ হযরত বিলালের (রা) মর্যাদা, ২য় খণ্ড, পৃ.।

৮. এটা ইমাম শাফিঈর (র) মাযহাব, তাঁর মতে ফজর ও আসরের পর সকল ফরয এবং যে সকল নফলের বিশেষ কোন কারণ রয়েছে (نوافل ذوات الاسـبـاب) যেমন তাহিয়্যাতুল অযূ, তাহিয়্যাতুল মসজিদ, শুকরিয়ার নামায, ঈদের নামায, সূর্য গ্রহণের নামায ইত্যাদি আদায় করা যাবে। দরসে তিরমিযী, খণ্ড ১, পৃ. ৪২৩।

www.pathagar.com

২. হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত বিলালকে (রা) ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী করে তুমি আমার আগে, জান্নাতে চলে গেলে? আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করেছি তখনই আমার সামনে তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই আযানের পর দু'রাক'আত নামায আদায় করেছি। আর যখনই আমি অপবিত্র হয়েছি সাথে সাথে অযূ করেছি। এবং মনে করেছি, আমার ওপর আল্লাহ তা'আলার দু'রাক'আত নামাযের হক রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ঐ দু'রাক'আত নামাযের বিনিময়েই।[৯]

তাহিয়্যাতুল মসজিদ (تحية المسجد) সংক্রান্ত হাদীস নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ السَّلَمِىِّ رَحْمَهُ اللّٰهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ الْمَسْجِدِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ .

بخارى كتاب الصلوة - باب اذا دخل احد المسجد فليركع ركعتين ، ج : ١ ، ص ٦٣ مسلم كتاب صلوة المسافرين وقصرها باب استحباب تحية المسجد بركعتين ، ج : ١ ، ص : ٢٤٨

হযরত আবু কাতাদাহ আসসুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন বসার পূর্বেই দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়।[১০] এই হাদীস থেকে বাহ্যত মনে হয় দিনে-রাতে যে কোন সময়ই কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে দু'রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করবে। সুতরাং ফজর ও আসরের পরও মসজিদে প্রবেশ করলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করতে পারবে। মাকরূহ হবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা ফজর ও আসরের পর তাহিয়্যাতুল অযূ ও তাহিয়্যাতুল মসজিদ মাকরূহ নয় বলে প্রমাণিত হয় না। কারণ, প্রথমোক্ত হাদীসসমূহ যেহেতু ফজর ও আসরের পর সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে সেহেতু তাহিয়্যাতুল অযূও তাহিয়্যাতুল মসজিদ সম্পর্কিত হাদীসসমূহের অর্থ হবে এই যে, যখনই কেউ অযূ করবে তখন যদি নামাযের নিষিদ্ধ বা মাকরূহ সময় না হয়, তাহলে সে যেন দু'রাক'আত তাহিয়্যাতুল অযূ আদায় করে। তদ্রূপ যখনই কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন যদি নামাযের নিষিদ্ধ বা মাকরূহ সময় না হয়, সে যেন দু'রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করে। এরূপ নয় যে, অযূর পর এবং মসজিদে প্রবেশের পর নিষিদ্ধ বা মাকরূহ সময় হলেও তাহিয়্যাতুল অযূ ও তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা যাবে।

একটি হাদীস থেকে বাহ্যত মনে হয় মক্কার মসজিদুল হারামে ফজর ও আসরের পরে সব ধরনের নফল নামাযই জায়িয। মাকরূহ নয়। হাদীসটি এই ঃ

---

৯. প্রাগুক্ত।

১০. বুখারী, অধ্যায় ঃ সালাত, পরিচ্ছেদ ঃ যখন কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন বসার পূর্বেই দু'রাক'আত নামায আদায় করে, খণ্ড ১, পৃ. ৬২।
মুসলিম, অধ্যায় ঃ মুসাফিরের নামায ও কসর নামায পরিচ্ছেদ ঃ দু'রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ মুস্তাহাব, খণ্ড ১, পৃ. ২৪৮।

www.pathagar.com

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوْا اَحَدًا طَافَ بِهٰذَ الْبَيْتَ فَصَلّٰى اَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْنَهَارٍ .

ترمذى أبواب الحج باب ما جاء فى الصلوة بعد العصر وبعد الصبح فى الطواف لمن يطوف . ج : ١ ، ص : ١٧٥

হযরত জুবায়র ইবন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, হে বনূ আবদি মানাফ! রাত দিনের যে সময় ইচ্ছা বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে এবং সালাত আদায় করতে কাউকে তোমরা বাধা দিও না।[১১]

এ হাদীস থেকে বাহ্যত মনে হয়, মক্কার মসজিদুল হারামে ফজর ও আসরের পর সালাত আদায় করা যাবে।[১২]

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই হাদীস দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত হয় না। কারণ, ইমাম তাহাভীর মতে হাদীসটি مضطرب الاسناد বর্ণনা সূত্র বিভ্রাটপূর্ণ। উপরন্তু হাদীসটি যদি নির্ভুল, সঠিক ও সহীহও হয় তবু তার দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত হয় না। কারণ প্রকৃতপক্ষে এই হাদীস রাসূলুল্লাহ (সা) কা'বা ঘরের সংরক্ষণকারীদেরকে এ মর্মে উপদেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন দিবা-রাত্রি মসজিদুল হারাম খোলা রাখে এবং তাওয়াফ ও নামাযের ব্যাপারে কোন প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ না করে। হাদীসটির উদ্দেশ্য আদৌ এটা নয় যে, মসজিদুল হারামে নামায আদায়কারীদের জন্য দিবা-রাত্রির কখনো কোন নিষিদ্ধ বা মাকরূহ সময় নেই। বুখারী শরীফ ও তিরমিযী শরীফের একটি বর্ণনা দ্বারা এই বক্তব্যের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। বর্ণনাটি হচ্ছে ঃ

وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتّٰى صَلّٰى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِىْ طُوًى . ترمذى المرجع السابق ، بخارى كتاب المناسك باب الطواف بعد الصبح والعصر . ج : ١ ، ص : ٢٢

হযরত উমর (রা) একদিন ফজরের পর তাওয়াফ করলেন। অতঃপর ভ্রমণ করতে লাগলেন। অবশেষে যীতুওয়া নামক স্থানে (সূর্যোদয়ের পর) সালাতুত তাওয়াফ আদায় করলেন।[১৩]

এই হাদীস সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে, ফজর ও আসরের পর যে কোন স্থানে এমন কি মসজিদুল হারামেও কোন নফল নামায আদায় করা মাকরূহ। সুতরাং ফজর ও আসরের পর কেউ তাওয়াফ করলে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত পর্যন্ত সালাতুত্ তাওয়াফ আদায় করবেন। যদি এই না হতো তাহলে হযরত উমর (রা) সালাতুত তাওয়াফ মসজিদুল হারামে আদায় না করে

১১. তিরমিযী, অধ্যায় ঃ হজ্জ, পরিচ্ছেদ ঃ তাওয়াফকারীর জন্য তাওয়াফের ক্ষেত্রে আসর ও ফজরের পর সালাতুত্ তাওয়াফ আদায় করা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৫।

১২. এটা হযরত ইমাম শাফিঈ (র) অভিমত। তাঁর মতে মক্কার মসজিদুল হারামে ফজর ও আসরের পর যেকোন ধরনের নফলই আদায় করা যাবে। ইমাম আহমদের মত এটাই। হানাফী মাযহাব হচ্ছে, ফজর ও আসরের পর নফল আদায় করা যাবে না। আসরের পর কেউ তাওয়াফ করলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ফজরের পর তাওয়াফ করলে সূর্যোদয় পর্যন্ত সালাতুত তাওয়াফ আদায় করবে না। প্রাগুক্ত।

১৩. তিরমিযী, প্রাগুক্ত, বুখারী অধ্যায় ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ ফজর ও আসরের পর তাওয়াফ করা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২০।

www.pathagar.com

যীতুওয়ায় আদায় করতেন না। মসজিদুল হারামের ফযীলত এভাবে হাত ছাড়া করতেন না। বুখারী শরীফের আরেকটি বর্ণনা দ্বারাও এ বক্তব্যে সমর্থন পাওয়া যায়। বর্ণনাটি হচ্ছে ঃ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَاَرَادَ الْخُرُوْجَ وَلَمْ تَكُنْ اُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَاَرَادَتِ الْخُرُوْجَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ لِلصُّبْحِ فَطُوْفِيْ عَلٰى بَعِيْرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ فَفَعَلَتْ وَلَمْ تُصَلِّ حَتّٰى خَرَجَتْ .

بخارى كتاب المناسك ، باب من صلى ركعتى الطواف خارجًا من المسجد . ج : ١ ، ص : ٢٢٠

হযরত উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় ছিলেন। এবং মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছা করেছিলেন। অথচ হযরত উম্মু সালামা (রা) তখনো তাওয়াফ করেন নি। এবং তিনিও মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছা করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেন, যখন ফজরের নামায শুরু হয়ে যাবে লোকেরা নামাযরত থাকা অবস্থায়ই তুমি তোমার উটের চড়ে তাওয়াফ সেরে নিবে। হযরত উম্মু সালামা (রা) তাই করলেন এবং সালাতুত্ তাওয়াফ আদায় না করেই মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়লেন।[১৪]

উপরোক্ত হাদীস থেকে ও সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অন্য যেকোন স্থানের মতই মসজিদুল হারামেও ফজরের পর নফল আদায় করা মাকরূহ বলেই উম্মু সালামা (রা) তাওয়াফের পর সেখানে সালাতুত্ তাওয়াফ আদায় করেন নি।

মাগরিবের আযানের পর ফরযের পূর্বে নফল পড়া মাকরূহ

অধিকাংশ হাদীসের বক্তব্য (المتن) প্রমাণ করে যে, মাগরিবের আযানের পর ফরযের পূর্বে যে কোন নফল নামায আদায় করা মাকরূহ। এ সম্পর্কিত হাদীস নিম্নরূপ ঃ

عَنْ طَاؤُوْسٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْهِمَا وَرَخَّصَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، سنن أبى داؤد كتاب الصلوة ، باب الصلوة قبل المغرب . ج : ١ ، ص : ١٨٢

হযরত তাঊস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইবন উমর (রা)-কে মাগরিবের পূর্বের দু'রাক'আত (নফল) নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে কাউকে তা আদায় করতে দেখিনি। এবং আসরের পরের দু'রাক'আত নফলের অনুমতি দিতেও দেখিনি।[১৫]

---

১৪. বুখারী অধ্যায় ঃ হজ্জ, পরিচ্ছেদ ঃ তাওয়াফের দু'রাক'আত নামায মসজিদের বাইরে গিয়ে আদায় করা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২০।

১৫. সুলাইমান ইবনুল আশ'আশ, সুনানে আবূ দাঊদ, অধ্যায় ঃ সালাত পরিচ্ছেদ ঃ মাগরিবে ফরযের পূর্বে নফল নামায পড়া, দেওবন্দ, ১ম খণ্ড. পৃ. ১৮২।

www.pathagar.com

উপরোক্ত হাদীস হযরত ইবন উমর (রা) পরিষ্কার বলছেন যে, রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে কেউ মাগরিবের আযানের পর ফরযের পূর্বে নফল পড়তেন না। তাতে সুস্পষ্টই প্রমাণ হয়, মাগরিবের ফরযের পূর্বে নফল পড়া মাকরূহ। এটাই ইমাম আযম আবূ হানীফা ও হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের অভিমত।[১৬]

আরো অনেক হাদীস থেকেও এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়, যেমন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عِنْدَ كُلِّ اَذَانَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَا خَلاَ الْمَغْرِبِ .

دار قطني ج : ١ ، ص : ٢٦٤ كتاب الصلوة باب الحث على الركوع بين الاذانين فى كل صلوة والركعتين قبل المغرب والاختلاف فيه .

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, মাগরিব ব্যতীত অন্য সকল নামাযের আযান ও ইকামতের মাঝখানে দু'রাক'আত নামায রয়েছে।[১৭]

এই হাদীস থেকে প্রতিভাত হয় যে, মাগরিবের আযানের পর ফরযের পূর্বে নফল পড়া যাবে না।

কেউ কেউ অবশ্য এই হাদীসটির ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তারা বলেছেন, এই হাদীসে ما خلا المغرب মাগরিব ব্যতিত এই استثناء টি দুর্বল। আল্লামা ইবনুল জাওযী (র) হাদীসটি الموضوعات-তে উল্লেখ করেছেন।[১৮] কারণ হাদীসটির মূল ভিত্তি حيان নামক বর্ণনাকারীর ওপর, ফাল্লাস তাঁকে كذاب (মিথ্যাবাদী) বলেছেন। এর উত্তর হচ্ছে, হাদীসের ব্যাপারে আল্লামা ইবনুল জাওযী (র) কঠোরতা সুবিদিত। উপরন্তু এ হাদীসটির পূর্ণ যাছাই-বাছাই আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ূতী (র) اللالى الموضوعة فى الاحاديث الموضوعة গ্রন্থে করেছেন। তিনি বলেন প্রকৃতপক্ষে حيان নামক দু'জন বর্ণনাকারী রয়েছেন। এক. حيان بن عبد الله الدارمي দুই. حيان بن عبد الله البصرى ফাল্লাস حيان الدارمي-কে كذاب মিথ্যাবাদী বলেছেন সেটা সন্দেহাতীত সত্য। কিন্তু এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, حيان البصرى তিনি صدوق সত্যবাদী।[১৯] ইমাম বায়হাকী (র) একথার ওপরও আপত্তি তুলেছেন। তিনি বলেন,

رواه حيان بن عبد الله عن عبد الله بن بريدة واخطأ فى سناده واتى بزيادة لم يتابع عليها (بيهقى ، ج : ٣ ، ص : ٤٧٤)

---

১৬. হযরত ইমাম মালিক (র) ও এই অভিমত পোষণ করেন। আল্লামা তাকী উসমানী দরসে তিরমিযী, মাওলানা রশীদ আশরাফ সংকলিত, দেওবন্দ, খ. ১, পৃ. ৪৩০।

১৭. দারা কুতনী, অধ্যায় ঃ সালাত, পরিচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক নামাযের আযান ও ইকামতের অন্তবর্তী সময়ে নফল আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করন এবং মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত নফল ও এ সম্পর্কে মতবিরোধ।

১৮. আল্লামা ইবনুল জাওযী (র) হাদীসটিকে মাউযূ' বলেন নি। বরং তিনি বলেছেন, هذا حديث لا يصح এই হাদীসটি সহীহ নয়। ইবনুল জাওযী আল-মাউযূ'আত, খ. ২, পৃ. ৯২।

১৯. حيان البصرى সম্পর্কে ابو حاتم আবূ হাতিম (র) বলেছেন, তিনি صدوق সত্যবাদী ইসহাক ইবন রাহওয়াই বলেন, كان رجل صدوق হাইয়্যান সত্যবাদী লোক ছিলেন। ইবন হিব্বান ও হাইয়্যানকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আল-লায়ালিল মাসনূ'আ, খণ্ড ২. পৃ. ১৫।

www.pathagar.com

হাইয়্যান ইব্‌ন আবদুল্লাহ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুরাইদা থেকে বর্ণনা করেছেন। এবং বর্ণনা সূত্রে ভুল করেছেন। অতিরিক্ত এমন কিছুই বর্ণনা করেছেন যা অন্য আর কেউ বর্ণনা করেন নি।[২০]

ইমাম বায়হাকী (র) ইবনে খুযাইমার (র) বক্তব্যেরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইবন খুযায়মা বলেন, এই বর্ণনাটি ভুল। ইবনে মুবারক (র) ফাহমাস থেকে বর্ণিত তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেন। ইবন বুরায়দা মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত নফল আদায় করতেন। ইবন বুরায়দা যদি তাঁর পিতার সূত্রে হযরত নবী করীম (সা) থেকে ما خلا صلوة المغرب 'মাগরিব ব্যতীত' কথাটি শোনতেন যা হাইয়্যান ইব্‌ন আবদুল্লাহ তাঁর হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন-তাহলে তো তিনি নবী করীম (সা)-এর হাদীসের বিরোধিতা করতেন না।[২১] কিন্তু আলাউদ্দিন আল-মারদীমী الجوهر النقى গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—বায্যার হাদীসটি (হাইয়্যান ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল বাসরীর হাদীস) বর্ণনা করার পর বলেন,

حيان رجل من أهل البصرة مشهور ليس به بأس وقال فيه أبو حاتم صدوق وذكره ابن حيان فى الثقات من اتباع التابعين وأخرج له الحاكم فى أبواب الزنا حديثا وصحيح اسناده فهذاه زيادة من ثقه فيحمل على ان لا بن بريدة فيه سندين سمعه من ابن مغفل تلك الزيادة وسمعه من أبيه بالزيادة (فى ذيل السنن الكبرى للبيهقى . ج : ٢ ، ص ٥٧٥-٦٧٦)

হাইয়্যান বসরাবাসী একজন প্রসিদ্ধ লোক, তার ব্যাপারে কোন প্রকার আপত্তি নেই। আবূ হাতিম (র) তাঁর সম্পর্কে বলেন, হাইয়্যান صدوق সত্যবাদী। ইবন হিব্বান (র) তাঁকে তাবে তাবিঈনের মধ্যে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হাকিম আবূ আবদুল্লাহ নীশাপুরী (র) যিনা ব্যভিচার অনুচ্ছেদে তার একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এবং হাদীসের বর্ণনা সূত্রে সহীহ বলে সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং ما خلا صلوة المغرب মাগরিবের নামায ব্যতীত কথাটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত বর্ণনা, আর এর অর্থ এটাই দাঁড়ায়, ইবনে বুরাইদার এই হাদীসের দু'টি مسند বর্ণনা সূত্রে রয়েছে। ইবনে মাকিল থেকে তিনি এই অতিরিক্ত বর্ণনা শুনেছেন। এবং তাঁর পিতা থেকে অতিরিক্ত বর্ণনাসহ শুনেছেন।

قَالَ الابراهيم النخعى رحمة الله لَمْ يُصَلِّ اَبُوْ بَكْرٍ وَلاَ عُمَرَ وَلاَ عُثْمَانَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ . بيهقى السنن الكبرى كتاب الصلوة باب من جعل قبل صلوة المغرب ركعتين . ج : ٢ ، ص : ٤٧٦

ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, হযরত আবূ বকর (রা) হযরত উমর (রা) ও হযরত উসমান (রা) মাগরিবের ফরযের পূর্বে দু'রাক'আত নফল আদায় করতেন না।[২২]

২০. বায়হাকী, সুনানে কুবরা, খ. ২, পৃ. ৪৭৪।

২১. বায়হাকী, সুনানে কুবরা, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যারা মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত নফল আছে বলে দাবি করেছেন। খ. ২, পৃ. ৪৭৪। باب من جعل قبل صلوة المغرب ركعتين

২২. বায়হাকী, সুনানে কুবরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬।

www.pathagar.com

কোন কোন হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মাগরিবের আযানের পর ফরযের পূর্বে দু'রাক'আত নামায সুন্নাত না হলেও পড়ার অনুমতি আছে যেমন ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ لِرَاصِيَّةَ اَنْ يَّتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً

بخارى كتاب التهجد باب الصلوة قبل المغرب

হযরত আবদুল্লাহ আল-মুযানী (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, তোমরা মাগরিবের পূর্বে নফল পড়। তৃতীয় বার বললেন, যার ইচ্ছা হয় এ আশংকায় যাতে লোকে আবার এটাকে সুন্নাত না বানিয়ে ফেলে।[২৩]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ خَشْيَةَ اَنْ يَّتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً . أبو داؤد كتاب الصلوة باب الصلوة قبل المغرب ج : ١ ، ص : ١٨٢

হযরত আবদুল্লাহ আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, তোমরা মাগরিবের ফরযের পূর্বে দু'রাক'আত নফল পড়। এরপর আবার বললেন, তোমরা মাগরিবের ফরযের পূর্বে দু'রাক'আত নফল পড়। যার ইচ্ছা হয় সে পড়বে। 'যার ইচ্ছা হয়' কথাটি এ আশংকায় বললেন, যাতে মানুষ তা সুন্নাত না বানিয়ে ফেলে।[২৪]

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ (المختار بن فلفل) قُلْتُ لِاَنَسٍ اَرَاكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ رَانَا فَلَمْ يَاْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَانَا (المرجع السابق)

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত নফল আদায় করেছি। মুখতার ইবন ফুলফুল বলেন, আমি হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) কি আপনাদেরকে (মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত) পড়তে দেখেছেন? হযরত আনাস (রা) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, তিনি আমাদের তা পড়তে দেখেছেন। তবে তিনি আমাদেরকে তা আদায় করতে আদেশ করেননি, আবার নিষেধও করেননি।[২৫]

عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ الْيَزَنِىْ قَالَ اَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهْنِىِّ فَقُلْتُ اَلاَ اَعْجَبَكَ مِنْ اَبِىْ تَمِيْمٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ

২৩, বুখারী, তাহাজ্জুদ অধ্যায় ঃ পরিচ্ছেদ ঃ মাগরিবের পূর্বে নফল পড়া, খ. ১, পৃ. ১৫৭।

২৪. আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ সালাত পরিচ্ছেদ, মাগরিবের পূর্বে নফল পড়া, খ. ১, পৃ. ১৮২।

২৫. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

عُقْبَةُ اِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ لَلْاٰنَ قَالَ الشُّغْلُ بخارى كتاب التهجد باب الصلوة قبل المغرب ج : ١ ، ص : ١٥٨

মারসাদ ইবন আবদুল্লাহ আল-ইয়াযানী বলেন, আমি হযরত উকবা ইবন আমির আল জুহানীর (রা) নিকট গিয়ে বললাম, আপনি কি আবূ তামীমের এই কাণ্ডে আশ্চর্য হবেন না যে, তিনি মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত নফল পড়েন? উকবা বললেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ (সা(-এর যুগে তা পড়তাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে এখন তা পড়তে আপনাকে কি সে বারণ করে? তিনি বললেন, ব্যস্ততা।[২৬]

এ সকল হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত নামায সুন্নাত না হলেও অন্তত তা পড়ার অনুমতি রয়েছে।[২৭] ব্যাপকার্থকে আরেকটি হাদীস দ্বারাও এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ لِّمَنْ شَاءَ . أبو داؤد المرجع السابق

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) বলেন, প্রত্যেক নামাযের আযান ও ইকামতে অন্তবর্তী সময়ে নামায রয়েছে। প্রত্যেক নামাযের আযান ও ইকামতের অন্তবর্তী সময়ে নামায রয়েছে। যার ইচ্ছা হয়।[২৮]

আরেকটি বর্ণনায় বিষয়টি সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে ঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ اِذَا اَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِىْ حَتّٰى يَخْرُجُ النَّبِىُّ ﷺ كَذَالِكَ يُصَلُّوْنَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ شَىْءٌ .

بخارى كتاب الاذان ، باب كم بين الاذان والاقامة ج : ١ ، ص : ٨٧

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আয্যিন যখন আযান দিত তখন নবী (সা)-এর কয়েকজন সাহাবী নবী (সা)-এর বের হওয়া পর্যন্ত মসজিদের স্তম্ভের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেন এবং এ অবস্থায় মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন। অথচ মাগরিবের আযান ও ইকামতের মাঝখানে তেমন কোন ব্যবধান থাকত না।[২৯]

---

২৬. বুখারী, প্রাগুক্ত।

২৭. ইমাম শাফিঈ (র) এ সম্পর্কে দু'টি মত পাওয়া যায়। এক. আল্লামা নববী শারহে মুহাজ্জাবে উল্লেখ করেছেন, ইমাম শাফিঈর মতে মাগরিবে পূর্বের দু'রাক'আত নামায মুস্তাহাব, আবার মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, জায়িয। ইমাম আহমদের (র) ও এরূপ দু'টি মত পাওয়া যায়। (দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩০)।

২৮. বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, পরিচ্ছেদ ঃ আযান ও ইকামতের মাঝখানে কতটুকু ব্যবধান, খ. ১, পৃ. ৮৭।

২৯. বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, পরিচ্ছেদ ঃ আযান ও ইকামতের মাঝখানে কতটুকু ব্যবধান, খ. ১, পৃ. ৮৭।

www.pathagar.com

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, মাগরিবের আযানের পর ফরযের পূর্বে দু'রাক'আত নামায সুন্নাত বা মুস্তাহাব না হলেও অন্তত জায়িয। হানাফী মাযহাবের পরবর্তীকালের ফকীহ মুফ্তীদের মধ্যে শায়খ কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (র) এই মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রা) এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, হাদীসসমূহ থেকে মাগরিবের ফরযের পূর্বে দু'রাক'আত নামায মুস্তহাব নয় বলে প্রমাণ হয় বটে। কিন্তু মাকরূহ বা বিদ্'আত প্রমাণিত হয় না।

তবে এ দু'রাক'আত নামায জায়িয হলেও না পড়াই উত্তম। কারণ, প্রথমত হাদীসসমূহে খুব গুরুত্বের সাথে মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি আদায়ের আদেশ করা হয়েছে। ফরযের পূর্বে দু'রাক'আত নামায আদায় করলে ফরয আদায়ে বিলম্ব ঘটবে।

দ্বিতীয়ত অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরামই মাগরিবের ফরযের পূর্বে দু'রাক'আত নামায আদায় করতেন না। হাদীসের প্রকৃত অর্থ সাহাবায়ে কিরামের আমল দ্বারাই বুঝে আসে। অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম যখন এ দু'রাক'আত নামায পড়তেন না[৩০] সেহেতু এ দু'রাক'আত নামায না পড়াই ভাল। তবে কেউ পড়লে এজন্য তাকে তিরস্কার করা যাবে না।[৩১]

নামাযের কথা ভুলে গেলে কিংবা নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকলে এর বিধান

সাধারণত হাদীসের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি নামাযের কথা ভুলে যায় অথবা নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকে তবে তার নামাযের কথা স্মরণ হবে অথবা যখন সে ঘুম থেকে জাগ্রত হবে তখন নিষিদ্ধ সময় না হলে তৎক্ষণাৎ নামায আদায় করবে। আর যদি সময়টি নিষিদ্ধ সময় হয়ে থাকে তবে সে সময় অতিবাহিত হওয়ার পরই নামায আদায় করবে। এ স্পর্কিত হাদীস নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ فَسَارَ لَيْلَهُ حَتّٰى اِذَا اَدْرَكْنَا الْكَرٰى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ اَكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ قَالَ فَغَلَبَتْ بِلَالاً عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ اِلٰى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظِ النَّبِىُّ ﷺ وَلَا بِلَالٌ وَلَا اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ حَتّٰى اِذَا ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلَهُمْ اِسْتِيْقَاظًا فَفَزِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا بِلَالُ فَقَالَ اَخَذَ بِنَفْسِى الَّذِىْ بِنَفْسِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ فَاقْتَادُوْا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَمَرَ بِلَالاً فَاَقَامَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ وَصَلّٰى لَهُمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا

৩০. হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে মাগরিবের ফরযের পূর্বের দু'রাক'আত নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন; কেবল সা'দ ইবন মালিক (র) ছাড়া আর কাউকে আমি এ দু'রাক'আত নামায আদায় করতে দেখিনি। আবু সাঈদ আল-খুদরী বলেন, সা'দ ইবন মালিক ছাড়া আর কোন সাহাবীকেই আমি এ দু'রাক'আত নামায আদায় করতে দেখিনি। হযরত আহমদ (র) বলেন, আমি কেবল একবারই এই দু'রাক'আত নামায আদায় করেছি। পরে দেখলাম লোকে তো এর ওপর আমল করে না, তাই আমি বাদ দিয়ে দিলাম। মা'আরিফুস সুনান, খণ্ড ২, পৃ. ১৪৫-১৪৬।

৩১. দরসে তিরমিযী, খণ্ড ১, পৃ. ৪৩৩।

www.pathagar.com

قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ مَنْ نَسِىَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ . أبو داؤد كتاب الصلوة باب فى من نام عن صلوة او نسيها . ج : ١ ، ص : ٦٢

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, খায়বার যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ (সা) একরাতে সফর করছিলেন। আমাদের ঘুম পেয়ে বসল। তিনি বিশ্রামের জন্য অবতরণ করলেন। এরপর বললেন, বিলাল! আজ রাতে তুমি আমাদের পাহারাদারী করবে। হযরত বিলাল (রা) তাঁর হাওদার সাথে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তাঁর ঘুম প্রবল হয়ে আসল। ফজরের সময় নবী (সা), বিলাল (রা), এমন কি কোন সাহাবীই জাগতে পারলেন না। সূর্যের তাপ যখন তাঁদের গায়ে লাগল তখন সর্বপ্রথম হযরত নবী করীম (সা) জাগলেন। জেগে ভীত কম্পিত হয়ে তিনি বললেন, বিলাল! (কি ব্যাপার?) হযরত বিলাল বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোন, আপনার যা হয়েছে আমারও তাই হয়েছে। এরপর তাঁরা কিছু দূর উট হাঁকিয়ে চললেন। অতঃপর নবী করীম (সা) অযূ করলেন। হযরত বিলালকে ইকামত দিতে বললেন,অতঃপর তিনি সাহাবাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে বললেন, কেউ সালাতের কথা ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র যেন তা আদায় করে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ 'আমার স্মরণে সালাত আদায় কর।' [৩২]

এই হাদীসে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম ঘুমিয়ে ছিলেন বলে কেউই সময় মত ফজরের নামায আদায় করতে পারেন নি। সূর্যোদয়ের সময় তাঁদের ঘুম ভাংলো। কিন্তু তখন তো নামায আদায় করা নিষেধ। এ জন্য তাঁরা তখন নামায আদায় না করে সামনে চলতে লাগলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর যখন সূর্য পূর্ণরূপে উদিত হলো তখন যাত্রা বিরতি করে নামায আদায় করলেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে অথবা নামাযের কথা ভুলে যায় তাহলে জাগ্রত হওয়ার পর বা নামাযের কথা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথেই সে নামায আদায় করবে, কিন্তু তখন যদি নিষিদ্ধ সময় হয় তাহলে সে সময় অতিবাহিত হওয়ার পর নামায আদায় করবে। এটাই ইমাম আযম আবূ হানীফা ও হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের মাযহাব।

কোন কোন হাদীস থেকে বাহ্যত মনে হয়, কেউ নামাযের কথা ভুলে গেলে অথবা ঘুম থেকে জাগবে ঠিক তখনই নামায আদায় করবে। চাই সেটা সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বীপ্রহরের সময়ই হোক।[৩৩] অথচ এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে অপরাপর হাদীসের সাথে মিলিয়ে চিন্তা করলে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, নামাযে কথা ভুলে যাওয়ার পর স্মরণ হওয়া অথবা ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময়টি নিষিদ্ধ সময় না হলেই কেবল তৎক্ষণাৎ নামায আদায় করতে বলা হয়েছে। নিষিদ্ধ সময় হলে নয়।

---

৩২. ইমাম আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ সালাত, পরিচ্ছেদ ঃ যে নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকে বা নামাযের কথা ভুলে যায়, খ. ১, পৃ. ৬২
ইমাম তিরমিযী, সুনান, অধ্যায় ঃ তাফসীর, সূরা তাহার তাফসীর, খ. ২, পৃ. ১৪৯।

৩৩. ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদের (র) অভিমত এটা। তাঁদের মতে নামাযের কথা ভুলে গেলে বা নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকলে যখন স্মরণ হবে বা জাগবে তখন সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বীপ্রহর হলে ও নামায আদায় করবে, দরসে তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ৪১৬।

www.pathagar.com

সে ধরনের হাদীসগুলো নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرُوْا لِلنَّبِىِّ ﷺ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ اَنَّهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ فَاِذَا نَسِىَ اَحَدُكُمْ صَلٰوةً اَوْ اَنَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا . ترمذى كتاب الصلوة ، باب ما جاء فى القوم عن الصلوة . ج : ١ ، ص : ٤٣

হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম নবী করীম (সা)-এর নিকট নামাযের সময় তাদের ঘুমিয়ে থাকার বিষয়টি আলোচনা করলেন। নবী করীম (সা) বললেন, ঘুমের বেলায় কোন বাড়াবাড়ি নেই। বাড়াবাড়ি হচ্ছে জাগ্রত থাকা অবস্থায়। সুতরাং কেউ নামাযের কথা ভুলে গেলে অথবা নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকলে যখন তার স্মরণ হয় তখন যেন নামায আদায় করে নেয়।[৩৪]

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِىَ صَلٰوةً فَلْيَصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا . (ترمذى كتاب الصلوة باب ما جاء فى الرجل بين الصلوة ج : ١ ، ص : ٤٣)

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কেউ নামাযের কথা ভুলে গেলে যখন তার স্মরণ হয় তখনই যেন নামায আদায় করে নেয়।[৩৫]

উপরোক্ত হাদীস দু'টিতে فليصلها اذا ذكرها "যখন স্মরণ হবে তখন যেন নামায আদায় করে" একথা থেকে এমন ধারণা হতে পারে যে, যখন স্মরণ হবে তখন নিষিদ্ধ সময় সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বীপ্রহরের সময় হলেও নামায আদায় করবে। কিন্তু এটা সঠিক নয়। কারণ ليلة التعريش। তথা খায়বার থেকে ফেরার পথে রাস্তায় যাত্রাবিরতিকালে যে ঘটনা ঘটেছিল—যা ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে। সে ঘটনায় দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ঘুম থেকে জেগে উঠেন তখন সূর্যোয়ের সময় ছিল। এ জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ ফজরের নামায আদায় করলেন না। বরং বিলম্ব করে সূর্য পূর্ণরূপে উদিত হওয়ার পর আদায় করলেন। হাদীস দ্বারা فليصلها اذا ذكرها (যখন স্মরণ হবে তখন নামায আদায় করবে) এই শেষোক্ত হাদীসের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বীপ্রহরের সময় নামায আদায় নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির (متواتر)। এই তিন সময়ে সব ধরনের নামায আদায় করাই নিষিদ্ধ। সুতরাং এ তিন সময় কাযা নামাযও আদায় করা যাবে না। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে فليصلها اذا ذكرها (স্মরণ হলেই নামায আদায় করবে) হাদীসের ব্যাখ্যা করলে তার অর্থ দাঁড়াবে এই তিন সময় ব্যতীত যখনই নামাযের কথা মনে পড়বে বা ঘুম থেকে জাগ্রত হবে তখনই নামায আদায় করবে। হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (র) বলেন, খায়বার থেকে ফেরার পথে যাত্রাবিরতির

৩৪. তিরমিযী ঃ অধ্যায় ঃ সালাত, পরিচ্ছেদ ঃ নামায বাদ দিয়ে ঘুমিয়ে থাকা, খণ্ড ১, পৃ. ৪২।

৩৫. তিরমিযী, অধ্যায় ঃ সালাত, পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের কথা ভুলে যাওয়া, খণ্ড ১, পৃ. ৪২।

www.pathagar.com

ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সা) সূর্যোদয়ের সময় জাগ্রত হয়ে সাথেসাথে নামায আদায় করেন নি ঃ বিলম্ব করেছেন একারণে যে, এ স্থানে শয়তানের প্রভাব ছিল। তাই এ স্থান থেকে সরে গিয়ে নামায আদায় করেছেন। সূর্যোদয়ের সময় বলে বিলম্ব করেন নি। নাসাঈ শরীফের একটি বর্ণনা থেকে সেকথাই প্রতীয়মান হয়। সে হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, فَإِنْ هٰذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيْهِ الشَّيْطَانُ। এ স্থানটি এমন একটি জায়গা, যেখানে শয়তান আমাদের ঘিরে ফেলেছে।[৩৬]

কিন্তু নামায বিলম্ব করার কারণ হিসাবে রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথাটি উপস্থাপন করা ঠিক নয়। কারণ, কোন স্থানে শয়তানের প্রভাব থাকাটা নামাযকে নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বিত করার কোন শরয়ী কারণ হতে পারে না। বরং নামাযই শয়তানের প্রভাব দূর করার প্রকৃত ব্যবস্থা। রাসূলুল্লাহ (সা) স্থানটির অভিশপ্ততা বোঝানোর জন্য একথা বলেছেন। নামায বিলম্ব করার কারণ হিসাবে নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) নিষিদ্ধ সময়টি পার হয়ে যাওয়ার জন্যই নামায বিলম্বিত করেছেন এবং সে কথাই যুক্তিযুক্ত।[৩৭]

ইমাম নববী (র) বলেন সাহাবায়ে কিরাম অযূ-ইস্তিঞ্জা ইত্যাদি প্রয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন বলে রাসূলুল্লাহ (সা) নামায আদায় বিলম্ব করেছেন। কিন্তু একথাটিও সঠিক নয়। কারণ, যদি এ কারণেই নামায আদায় বিলম্ব হত তাহলে সেস্থানেই যতটুকু বিলম্ব করার প্রয়োজন ততটুকুর পর নামায আদায় করতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তো তা করেন নি। বরং তিনি এখান থেকে ভ্রমণ করে দূরে গিয়ে আবার যাত্রাবিরতি করে নামায আদায় করেছেন। এতেই প্রমাণিত হয়, পূর্ণরূপে সূর্য উদয়ের জন্যই নামায আদায় বিলম্ব করা হয়েছে।[৩৮] ইমাম তাহাভী (র) এই সম্ভাবনা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাহাভী শরীফের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়, অযূ ইস্তিঞ্জার মত প্রয়োজন এই স্থান থেকে অন্যত্র গিয়ে যাত্রাবিরতি করে পূরণ করা হয়েছে।[৩৯]

আল্লামা বাহরুল উলূম লাক্ষ্ণভী (র) বলেন, এই হাদীসে إذا অব্যয়টি شرطيه শর্তের 'অর্থজ্ঞাপক' ظرفيه 'কালের অর্থ জ্ঞাপক' নয়। সুতরাং হাদীসের অর্থ দাঁড়াবে স্মরণ হলে নামায আদায় করবে।[৪০]

---

৩৬. নাসাঈ, অধ্যায় ঃ নামাযের সময়সূচী, পরিচ্ছেদ ঃ কাযা নামায কিভাবে আদায় করবে, খণ্ড ১।

৩৭. দরসে তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ৪১৭।

৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮।

৩৯. তাহাভী, অধ্যায় ঃ সালাত, পরিচ্ছেদ ঃ কেউ ফজরের নামায শুরু করে এক রাক'আত আদায়ের পর সূর্য উদিত হলে কী করবে? খ. ১, পৃ. ১৯৫।

৪০. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৯।

www.pathagar.com

আযান ও ইকামত

আযানের সূচনা

আযান শব্দের অভিধানিক অর্থ আহবান, ঘোষণা দান ইত্যাদি।[১] এই অর্থে পবিত্র কুরআনেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِیٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗ

"মহান হজ্জের দিবসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি এই এক ঘোষণা যে, নিশ্চয় আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও।" (সূরা তাওবা, ৯ ঃ ৩)

শরী'আতের পরিভাষায় আযান হল নির্দিষ্ট কিছু শব্দমালার মাধ্যমে নামাযের ওয়াক্তের ঘোষণা দান। মোটকথা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমু'আর নামাযে যোগদানের জন্য আহবানসূচক বাক্য সমষ্টির পারিভাষিক নাম হল আযান।[২]

আযানের সূচনা কিভাবে হয়েছিল সে সম্পর্কে بدؤ الاذان শিরোনামে সিহাহ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়িদ প্রমুখ সাহাবীগণের বহু হাদীস বর্ণিত আছে। এসব হাদীস সমন্বিত করে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (র) বলেন, সাহাবায়ে কিরামের মনে যখন জামা'আতের সাথে নামায আদায়ের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল এবং সমস্যা দেখা দিল, কোন অবগতি বা ঘোষণা দান ব্যতিরেকে সকলকে একই সময়ে একত্রিত করা পরামর্শ করেন। পরামর্শে কেউ কেউ মত দিলেন নামাযের সময় একটি পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হবে। পতাকা দেখে মুসলমানরা একে অপরকে বলবে এবং মসজিদে নামাযের জন্য চলে আসবে। কিন্তু এ প্রস্তাব এ জন্য গ্রহণ করা হয়নি যে, এটি তো তাদের জন্যই প্রযোজ্য হবে, যারা পতাকা দেখতে পাবে। কিন্তু যারা দূরে বা গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করবে কিংবা যারা কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকবে তাদের জন্য বিষয়টি সহজ হবে না। কেউ প্রস্তাব করলেন, তাহলে নামাযের সময়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করা যাক। মহানবী (সা) এটিও অপসন্দ করলেন। কারণ তাতে অগ্নিপুজকদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। আর ইবাদত বন্দেগীর সাথে এ ধরনের সাদৃশ্য থাকা পসন্দীয় নয়।

---

১. লিসানুল আরব গ্রন্থে আছে ঃ

الاذان الإعلام واذنتك بالشيء واذنته اعلمته قال الله عز وجل فقل اذنتك على سواء قال الشاعر اذنتنا بينها اسماء ، ج ١٢ ، ص ٩

২ আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী, মা'আরিফুস, সুনান, দেওবন্দ ঃ আল মাকতাবা আন নূরিয়্যা, তা.বি. খ. ২ পৃ. ১৬৮; হযরত বান্নৌরী আরো বলেন,

ويحصل من الاذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام والحكمة فى اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل احد فى كل زمان ومكان ٠

www.pathagar.com

কেউ কেউ বললেন, সিঙ্গা বা বড় বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে সকলকে জানিয়ে দেওয়া যায় যে, নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছে। মহানবী (সা) এ প্রস্তাবও নাকচ করে দেন। কারণ বাঁশি ফুঁ দেওয়ার রেওয়াজটি ইয়াহূদীদের রেওয়াজ। এতে তাদের সঙ্গে সাদৃশ্য হয়। কেউ নাকূস গ্রহণের প্রস্তাব করলেন। নাকূস হল দু'টি কাষ্ঠ খণ্ডের সমন্বয়ে তৈরি এক ধরনের ধ্বনি সৃষ্টিকারী যন্ত্র। তন্মধ্যে একটি তুলনামূলক লম্বা ও অপরটি বেঁটে। একটিকে অপরটির উপর আঘাত করা হলে শব্দের সৃষ্টি হয়। তখনকার দিনে প্রাচ্যের খৃস্টানরা নিজেদের প্রার্থনার সময় এটি বাজাত। মহানবী এ প্রস্তাবও রদ করে দেন। কিন্তু নাকূসের প্রস্তাব রদ করার বিষয়টি সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়িদ (রা)-এর জানা ছিল না। কিংবা নাকূসের প্রস্তাবকে মহানবী (সা) তুলনামূলকভাবে ভাল ও গ্রহণযোগ্য বলে অভিমত দেন। এ পরামর্শ মজলিস সুস্পষ্ট কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়ে যায়।

রাতে সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন যায়িদ ইবন আবদ রাব্বিহী (রা) এক মুবারক স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখলেন, জনৈক ব্যক্তি একটি নাকূস বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি তার কাছ থেকে নাকূসটি খরিদ করার প্রস্তাব দেন। মূলত বহনকারী ব্যক্তি ছিলেন একজন ফেরেশতা। তিনি বললেন, নাকূস নয়; বরং তোমরা এরূপ করতে পার যে, যখন নামাযের সময় হবে তখন তোমাদের একজন কোন উচ্চস্থানে চলে যাবে। সে নিম্নোক্ত বাক্যগুলো জোরে উচ্চারণ করে আযান দিবে। ফেরেশতা নিজে বাক্যগুলো উচ্চারণ করে আযান দিয়ে তাঁকে দেখালেনও। স্বপ্নটি হযরত আবদুল্লাহ (রা) তৎক্ষণাৎ মহানবী (সা)-কে শোনান। তখন মহানবী (সা) বলেন, নিশ্চয় এ স্বপ্ন একটি সত্য স্বপ্ন।[৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়িদ (রা) যখন মহানবী (সা)-কে স্বপ্নের ঘটনা শোনান তখন শেষ রাত্র। লোকজন তাহাজ্জুদ শেষ করে ফজরের অপেক্ষা করছিল। তিনি স্বপ্নের ঘটনা শোনানোর সাথেসাথে মহানবী (সা) বিষয়টি স্পষ্ট বুঝে পেলেন। কারণ ইতোপূর্বে মহানবী (সা) যখন মিরাজ গমন তখন আসমানে হযরত জিব্রাঈলের কণ্ঠে এ বাক্য সমষ্টির আযানই শুনেছিলেন। আরো অন্যান্য রিওয়ায়াত থেকে বুঝা যায় যে, শুধু জিব্রাঈলই নয়, অন্যান্য ফেরেশতাদের কণ্ঠেও মহানবী আসমানে এ আযান শুনেছিলেন। মহানবী (সা) ছাড়া মানুষের মধ্যে অন্য কেউ বিষয়ে অবগত থাকার প্রশ্নই উঠে না। তাই হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়িদের স্বপ্ন যখন মহানবী (সা)-এর পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে গেল তখন কোন চিন্তা ছাড়াই তিনি বলে দিলেন--এটা সত্য স্বপ্ন।[৪]

সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন যায়িদ (রা)-এর কণ্ঠ খুব উচ্চ ছিল না। হযরত বিলাল (রা) ছিলেন উচ্চকণ্ঠের অধিকারী। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবদুল্লাহকে বললেন, তুমি বিলালকে নিয়ে যাও। তাঁকে বাক্যগুলো শিখিয়ে তাঁর মাধ্যমে আযান শুনিয়ে দাও। কারণ বিলালের কণ্ঠ সুউচ্চ ও দীর্ঘ। হযরত আবদুল্লাহ (রা) তাই করলেন। তিনি হযরত বিলালকে উচ্চস্থানে নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে তালকীন দিয়ে আযান শুনিয়ে দেন। ফজর নামায থেকে তখন আযানের এই প্রচলন শুরু হয়ে গেল।

---

৩. মাওলানা আবুল হাসান চাটগামী, তানযীমুল আশতাত, হাটহাজারী; আল-হেলাল প্রকাশনী, ১৯৯৭, খ.১, পৃ. ২৪৩।

৪. আল্লামা সুহাইলী, আর রাওযুল উনূফ; সূত্র ঃ তিরমিযী গ্রন্থের দরস, দারুল উলূম দেওবন্দ।

www.pathagar.com

আযানের বাক্যগুলো হযরত উমর ফারূক (রা)-এর কানে পৌঁছলে তিনি স্বচকিত হয়ে উঠলেন। তিনি যে অবস্থায় ছিলেন সে অবস্থায় থেকেই কোমরে লুঙ্গি মুঠিবদ্ধ করে মসজিদের দিকে ছুটে আসলেন। তাঁর স্বচকিত হওয়ার কারণ ছিল। এ ঘটনার প্রায় বিশ দিন আগে একই স্বপ্ন তিনিও দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি স্বপ্নটি তেমন গুরুত্ব দেননি। কিংবা নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তা ব্যক্ত থেকে বিরত থাকেন।[৫] আসলে মর্যাদাটি হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়িদ (রা)-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তাই হযরত উমরের সেদিকে মনোযোগ সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু সেদিন ফজরের সময় যখন আযানই তাঁর কানে ভেসে আসল তখন আর নিজকে সংবরণ করতে পারেন নি। তৎক্ষণাৎ ছুটে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ আযান তো আমি বিশ দিন আগেই স্বপ্নে দেখেছি। হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়িদের সমর্থনে হযরত উমরের স্বপ্নটি পেয়ে মহানবী (সা) আরো আনন্দিত হন।

ফজরের নামায হল। মহানবী (সা) সাহাবীগণের দিকে ফিরে বসলেন। এমন সময় হযরত আবূ বকর (রা) সহ দশ জনের অধিক সাহাবী জানালেন যে, এ স্বপ্ন হুবহু তাঁরাও দেখেছেন। মহানবী (সা) তাঁদের বক্তব্য শুনে বললেন, সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তার, যিনি আযানের ব্যাপারে তাঁর বান্দাদের অনেককে কবুল করেছেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরই জুমু'আ নামাযের বিধান নাযিল হয়। তাতে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

يَٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۔

"হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিনে যখন নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণে ধাবিত হও এবং কেনাচেনা ত্যাগ কর।" (জুমু'আ, ৬২ ঃ ৯)

উক্ত আয়াতের আযানের জন্য মহানবী (সা)-এর গৃহীত পদ্ধতিকে স্বীকৃত দেওয়া হয়।[৬]

আযানের সূচনা হিজরী সনের কোন বছর হয়েছিল তা নিয়ে সামান্য মত বিরোধ আছে। আল্লামা ইবন হাজার আসকালানীর মতে এ ঘটনা হিজরী ২য় সালে ঘটে। কিন্তু আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর মতে এটি হিজরী ১ম সালের ঘটনা। ইমাম বুখারীর মতে শুধু ১ম নয় বরং হিজরতের অল্প কিছু দিন পরই এ ঘটনা ঘটেছিল।[৭]

আযানের সূচনাকাল সম্পর্কে আরো কিছু রিওয়ায়াত পাওয়া যায় যেগুলো বস্তুত শুদ্ধ নয়। যেমন কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, আযানের সূচনা হিজরতের পূর্বে মহানবী মক্কা মুকাররমায় থাকতেই হয়েছিল। যখন পাঞ্জেগানা নামাযের বিধান দেওয়া হয় তখন মহানবী (সা)-কে আযানের জন্যও হুকুম দেওয়া হয়েছিল। আবার কোন কোন বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা)-কে

---

৫. যেমন ইমাম আবূ দাঊদ বর্ণনা করেন ;

قال وكان عمر بن الخطاب قد راه ذلك فكتمه عشرين يومًا قال ثم اخبر النبى ﷺ فقال ما منعك ان تخبرنى فقال سبقنى عبد الله بن زيد فاستجبت الخ.. ص ٢٤ باب كيف الاذان ۔

৬ আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, বাবু বাদয়িল আযান, খ. ২, পৃ. ৬৩।

৭. আল্লামা তাকী উসমানী, দরসে তিরমিযী, করাচী ঃ মাকতাবা দারুল উলূম, ১৯৮৮, খ. ১, পৃ. ৪৫০।

www.pathagar.com

মি'রাজ রজনীতে আযান শিখানো হয়েছিল। এ বর্ণনাগুলো সম্পর্কে হযরত ইবন হাজার আসকালানী (র) বলেন, বিচার বিশ্লেষণের নিরিখে উপরোক্ত বর্ণনাগুলোর কোনটিই বিশুদ্ধ নয়। এ ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনুল মুনযির নিশ্চিত করে বলেন,

ان النبى ﷺ كان يصلى بغير اذان من فرضت الصلوة بمكة الى ان هاجر الى المدينة ووقع التشاور فى ذلك كما فى حديث عبد الله بن عبد ربه

"মক্কায় নামায ফরয হওয়ার পর থেকে হিজরত করা এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আবদ রাব্বিহী (রা) বর্ণিত পরামর্শের ঘটনা পর্যন্ত মহানবী (সা) আযান ছাড়াই নামায পড়তেন।"[৮]

তৎকালে প্রচলিত আযান ছিল না এ ব্যাপারে সবাই একমত। কিন্তু সাহাবীগণ নামাযের জন্য পরস্পর ডাকাডাকি করতেন কিনা বা তাঁদের মধ্যে সকলকে জমায়েত করার জন্য গৃহীত কোন পদ্ধতি ছিল কিনা-এ প্রসঙ্গে আলিমগণ বলেন, হ্যাঁ, ডাকাডাকি করা হত। তখন الصلوة جامعة الصلوة جامعة শব্দে নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছে বলে বুঝানো হত। কোন কোন বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, নামাযের পূর্বক্ষণে হযরত বিলাল (রা) এ বাক্য উচ্চারণ করে সকলকে জমায়েত করতেন। অবশেষে হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়িদের মাধ্যমে আযানের তালীম নাযিল হলে পূর্বের সকল পদ্ধতি বাদ দেওয়া হয় এবং প্রচলিত আযান চালু করা হয়।[৯]

আযানের বাক্য ১৫টি

আযানের মূল বাক্য ৭টি। এগুলোকে এক বা একাধিকবার উচ্চারণ করে সর্বমোট ১৫ বার বলতে হয় বিধায় আযানের বাক্য এখানে ১৫টি বলা হয়েছে। উল্লেখ্য এ সাত-এর মধ্যে ফজরের আযানের الصلوة خير من النوم কে গণ্য করা হয়নি। কেননা, এটি মূল আযানের অতিরিক্ত অংশ। এ প্রসঙ্গে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ১৫টি বাক্য নিম্নরূপ ঃ

১. اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ মহান) ২ বার করে মোট ৪ বার।

২. اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই) ১ বার করে মোট ২ বার।

৩. اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল) ১ বার করে মোট ২ বার।

৪. حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (নামাযের জন্য আস) ১ বার করে মোট ২ বার।

৫. حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (কল্যাণের দিকে আস) ১ বার করে মোট ২ বার।

৬. اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ মহান) ১ বার করে মোট ২ বার।

---

৮. মাওলানা আবুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪।

৯. আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী, বাযলুল মাজহূদ, খ. ২, পৃ. ২৭৯ ; আল্লামা ইবন হাজার, ফাতহুল বারী, খ. ২, পৃ. ২।

www.pathagar.com

৭. لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই) শুধু ১ বার। আযানের উপরোক্ত ১৫ বাক্যই বেশি প্রচলিত ও অধিক সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ ক্ষেত্রে ফকীহ্ ও মুজতাহিগণের অন্যান্য মতামতও আছে। যেমন ইমাম আযম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) বলেছেন, মোট বাক্য ১৫টি, ইমাম মালিক (র) বলেছেন মোট বাক্য ১৭টি। আর ইমাম শাফিঈ (র) বলেছেন, মোট বাক্য ১৯টি।[১০] ইমাম মালিক (র) বলেন, প্রথম বাক্য 'আল্লাহু আকবর' বলা হবে মাত্র দুই বার। আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্য প্রথমে দুই বার করে চারবার বলার পর আবার চারবার বলা হবে। তন্মধ্যে আগের চারবার হবে আস্তে আস্তে। আর পরের চার বার হবে জোরে জোরে। এ হিসাবে তাঁর মতে আযানের মোট বাক্য সংখ্যা দাঁড়াবে ১৭টি। ইমাম শফিঈ (র) তাঁর মতই দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্য পুনর্বার বলার পক্ষপাতী। অধিকন্তু তিনি ইমাম আযম আবূ হানীফার মত আল্লাহু আকবার প্রথমে চার বার বলার অভিমত গ্রহণ করেছেন। এ হিসাবে তাঁর মতে আযানের মোট বাক্য দাঁড়ায় ১৯টি।[১১]

আযান সম্পর্কে ইমামগণের উপরোক্ত মতভিন্নতা জায়িয নাজায়িযের মতভিন্নতা নয়; বরং উত্তম অনুত্তমের মতভিন্নতা। কাজেই সব পদ্ধতিই সকলের মতে জায়িয। পার্থক্য একটুকু যে, ইমাম আযম আবূ হানীফা ১৫ বাক্য, ইমাম মালিক ১৭ বাক্য আর ইমাম শাফিঈ ১৯ বাক্যকে উত্তম বলেছেন। উল্লেখ্য হানাফী ফকীহগণের মধ্যে ইমাম সারাখ্সী হানাফী (র) সহ কতিপয় ফকীহ্ শাহাদাতাইনকে পুনর্বার বলা মাকরূহ লিখেছেন। তাঁদের ব্যবহৃত মাকরূহ্ শব্দই এখানে 'খিলাফুল আওলা' (অনুত্তম) অর্থে ব্যবহৃত। ফকীহ্গণ খিলাফে আওলাকেও কোন কোন সময় মাকরূহ বলে থাকেন। যেমন আল্লামা ইবন আবিদীন শামী (র) লিখেছেন, আশুরার সময় এক রোযা রাখা কোন কোন ফকীহ্ মাকরূহ বললেও এ মাকরূহ অর্থ হল খিলাফে আওলা।[১২]

আযানের মোট বাক্য সংখ্যায় ইখতিলাফের কারণ হল দুইটি। এক. তারবী; (চার বার বলা) দুই. তারজী (পুনর্বার বলা)। তারবী আরবী শব্দটি ربع থেকে গৃহীত। অর্থ হল কোন জিনিসকে চার-এ পরিণত করা। পরিভাষায় আযানের প্রথম বাক্য 'আল্লাহু আকবার' শব্দটি চার বার বলাকে 'তারবী' বলে। এ ক্ষেত্রে ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ

---

১০. আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী (র) বলে,

ثم كلمات الاذان تسع عشرة كلمة عند الشافعي بتربيع التكبير في اوله وترجيع الشهادتين وسبع عشرة حكمة عند مالك بالترجيع من غير تربيع وروى مثله عن أبي يوسف في الدر المختار أي في ثنية التكبير في اول الاذان فيكون الاذان عنده ثلاث عشرة كلمة وهي رواية محمد والحسن ايضاً كما في در المختار وخمس عشرة كلمة عند أبي حنيفة وأحمد ، كما في معارف السنن ج ٢ ، ص ١٧٦

১১. প্রাগুক্ত।

১২. আল্লামা বিন্নৌরী (র) বলেন,

والظاهر من عباراتهم الترجيع عندنا مباح فيه ليس بسنة ولا مكروه وهو المعتمد وقال صاحب النهرانه خلاف الاولى على ما حكاه ابن عابدين وكل من قال بالكراهة فيأول كلامه بانه مفضول كما يأول كلام صاحب الدر المختار ، في كراهية صيام عاشراء منفرداً بانه مفضول وبالجملة فالقول بكراهة الرجيع خلاف الصواب وكيف وقد استمر الترجيع من عهد النبوة الى عهد الشافعي وكان السلف يشهدون بمكة في مواسم الحج كل سنة ولم ينكره احد منهم ، معارف السنن ، ج : ٢ ، ص ١٧٨

www.pathagar.com

বলেন, আযানের তারবী করা হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (র) বলেন, তারবী' করা হবে না। ফলত মোট শব্দ সংখ্যায় পার্থক্য হয়ে গিয়েছে। অনুরূপ তারজী শব্দের অর্থ হল পুনর্বার করা। পরিভাষায় আযানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্য (শাহাদাতাইন)-কে প্রথমে আস্তেআস্তে বলে পুনরায় জোরে জোরে বলাকে তারজী বলা হয়। এ ক্ষেত্রে ইমাম আযম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) বলেন, আযানে তারজী নেই। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ বলেন, তারজী আছে। এ কারণেও মোট বাক্য সংখ্যায় পার্থক্য হয়ে গিয়েছে।

এখানে বিবেচ্য বিষয় এই যে, হাদীসে মহানবী (সা) তারবী' ও তারজী সম্পর্কে কি বলেছেন এবং তাঁর যুগে যে আযান দেওয়া হত সেটি কেমন ছিল?

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاقُوْسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهٖ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلٰوةِ طَافَ بِىْ وَاَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَقُوْسًا فِىْ يَدِهٖ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهٖ فَقُلْتُ نَدْعُوْ بِهٖ اِلَى الصَّلَاةِ قَالَ اَفَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ مِّنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لَهُ بَلٰى قَالَ فَقَالَ تَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الخ

أخرجه الامام أبو داؤد تحت باب كيف الاذان رقم الحديث ٤٩٩ وقال هكذا رواية الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد وقال فيه ابن اسحاق عن الزهرى الله اكبر الله اكبر وقال معمر و يونس عن الزهرى فيه الله اكبر الله اكبر لم يثنيا .

হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের জামা'আত সম্পর্কে লোকজনকে জানানোর জন্য নাকূস তৈরির আদেশ দিলেন তখনকার ঘটনা—আমি নিদ্রিত ছিলাম। আমি দেখলাম, জনৈক ব্যক্তি আমার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছে। সে হাতে একটি নাকূস বহন করে যাচ্ছিল। আমি বললাম, ওহে আল্লাহর বান্দা! নাকূসটি বিক্রি করবে কি? সে বলল, এটি দ্বারা তুমি কি করবে? আমি বললাম, এ দ্বারা আমরা নামাযের দিকে ডাকব। লোকটি বলল, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে আরো উত্তম পদ্ধতির পরামর্শ দিব? আমি বললাম, অবশ্যই সে বলল, (যখন নামাযের ওয়াক্ত হবে তখন) তুমি বলবে, আল্লাহু আকবার (দুই বার করে চার বার) আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (এক বার করে দুই বার) আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (এক বার করে দুই বার), হায়্যা আলাস সালাহ (একবার করে দুই বার), হায়্যা আলাল ফালাহ্ (এক বার করে দুই বার), আল্লাহু আকবার (এক বার করে দুই বার), লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (একবার)।[১৩]

---

১৩. ইমাম আবূ দাঊদ, আস সুনান, হাদীস নং ৪৯৯।

www.pathagar.com

আযান বিষয়ে এটিই মূল হাদীস। মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় এ হাদীসকে আবদুল্লাহ ইবন যায়িদের হাদীস কিংবা অবতীর্ণ ফেরেশতার হাদীস নামে অভিহিত করা হয়। এ হাদীসে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, আযান তারযী আছে। কেননা, এখানে স্পষ্টভাবে আল্লাহু আকবার বাক্য চার বার বলা আছে। বুঝা গেল, আযানের শুরুতে আল্লাহু আকবার বলতে হবে চার বার।

عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ رَضِىَ اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ اَلْقٰى عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّاذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِهٖ فَقَالَ قُلْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الخ

أخرجه الامام أبو داؤد تحت باب كيف الاذان ، رقمه ٥٠٣ ، الحديث صحيح ، قد أخرجه الجماعة

হযরত আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং আমাকে আযান দেওয়া শিক্ষা দেন, তিনি বললেন, বল, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ; আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লা।[১৪]

এ হাদীসও একটি বিশুদ্ধ হাদীস। মক্কা মুকাররমায় মসজিদুল হারামে নবী (সা) এর যুগে যিনি আযান দিতেন তিনি ছিলেন হযরত আবূ মাহযূরা। তাঁর আযানেও দেখা যাচ্ছে প্রথমে আল্লাহু আকবার বাক্যটি চার বার আছে। বুঝা গেল, আযানের শুরুতে তাকবীর বলতে হয় চার বার।

তাছাড়া আল্লাহু আকবার আযানের শুরুতে চার বার বলার বিষয়টি ইজ্‌মায়ে উম্মাত থেকেও প্রমাণিত। আল্লামা আবুল হাসান (র) লিখেছেন,

ان التربيع عمل أهل مكة وعليه إجماع المسلمين فى مواسم الحج وغيرها ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة .

তারবী অর্থাৎ আযানের শুরুতে আল্লাহু আকবার চার বার বলা মক্কা বাসীদের আমল। এ ব্যাপারে উম্মাতের ইজ্‌মা বিদ্যমান। কেননা হজ্জের মৌসূমে এভাবে চার বার আল্লাহু আকবার বলে আযান দেওয়া হত। তাতে সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কোন সাহাবী তাতে আপত্তি করেন নি। বুঝা গেল, সকলেই তারবীকে সমর্থন দান করেছেন।[১৫]

এরূপে চার বার বলার মধ্যে যৌক্তিকতাও আছে। তাহল দিক প্রধানত চারটি। আযানের উদ্দেশ্য হল এ ঘোষণা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়া। আল্লাহু আকবার মানে সবকিছু থেকে আল্লাহ বড়। মু'আযযিন এ কথাটি উচ্চারণ করে যেন আল্লাহ্‌র মহানত্বের ঘোষণা তার চতুর্দিকে

১৪. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫০৩।

১৫. মাওলানা আবুল হাসান, চাটগামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪।

www.pathagar.com

ছড়িয়ে দিচ্ছে। আর এ সব দৃষ্টিকোণ থেকেই ইমাম শাফিঈ, ইমাম আযম আবূ হানীফা ও হানাফী ফকীহগণ আযান তারবী-এর অভিমত গ্রহণ করেছেন।[১৬]

অবশ্য কিছু হাদীস এমনও আছে যেখানে তারবী'-এর কথাটি সুস্পষ্ট নয়। যেমন ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَشْفَعَ الاَذَانَ وَيُوْتِرَ الاِقَامَةَ

أخرجه الترمذى ، وأخرجه أبو داؤد ، وقال زاد حماد فى حديثه الا الاقامة ، رقمه ٥٠٨ تحت باب فى الاقامة .

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত বিলাল (রা)-কে এ মর্মে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যেন আযান দেন জোড় সংখ্যক, আর ইকামত দেন বেজোর সংখ্যায়।[১৭]

উল্লেখ্য يَشْفَعُ শব্দটি شفع থেকে গৃহীত। شفع অর্থ হল একটি বাক্য দুই বার বলা। এ নির্দেশটি আযানের কোন বাক্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট করা হয়নি। বুঝা গেল, আদেশটির আওতায় সকল বাক্যই দাখিল আছে। কাজেই শুরুতে যে 'আল্লাহু আকবার' বলা হচ্ছে সেটিও হবে মাত্র দুই বার। এই অভিমতই গ্রহণ করেছেন ইমাম মালিক (র)।

মুহাক্কিক আলিমগণ বলেন, এ হাদীসে দুই বার করে বলার অর্থ হল শাহাদাতাইন ও হাই-সালাতাইনকে দুই বার করে বলা। কাজেই এটি তাকবীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া যদি প্রযোজ্য মনে করা হয় তাহলে হাদীসের ব্যাখ্যা হল যে, বাক্যগুলো এক জোড়া বানিয়ে বলা। অর্থাৎ দুই বার আল্লাহু আকবারকে এক শ্বাসে বলা। এ ভাবে দুই বারে দুই শ্বাসে আল্লাহু আকবারের বাক্যগুলো উচ্চারণ করা। এভাবে দুই বারে দুই শ্বাসে আল্লাহু আকবার বাক্যগুলো উচ্চারণ করা। তাহলে তাকবীর হবে চারটি কিন্তু শ্বাস হবে দু'টি। এ দু'টিকেই এক জোড়া ধরা হবে।[১৮] এ ব্যাখ্যা করার কারণ হল, যেখানে হাদীসে আযানের বাক্যগুলো সশব্দে বিস্তারিতভাবে বলা আছে যা গুণে গুণে তাকবীর চার বার পাওয়া যাচ্ছে সেখানে شفع শব্দের এমন কোন ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই যা হাদীসে বর্ণিত স্পষ্ট সংখ্যার বিপরীত অর্থ বুঝায়। নতুবা ইজমাল ও তাফসীলের মধ্যে বৈপরীত্য ঘটে যাবে যা যুক্তিযুক্ত নয়।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَرَتَيْنِ وَالاَقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةِ . الحديث صحيح أخرجه الامام أبو داؤد والنسائى والدارمى كما فى مشكوة المصابيح ، ض : ٦٣

১৬. প্রাগুক্ত।

১৭. ইমাম আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫০৮।

১৮. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪।

www.pathagar.com

২. হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে আযান ছিল দুই বার দুই বার করে। আর ইকামত ছিল একবার একবার করে। তবে তিনি ইকামতে 'কাদ কামাতিস সালাত' বলতেন দুই বার।

এ হাদীসও নির্দেশ করছে যে, আযানের শুরুতে তাকবীর হবে দুই বার মাত্র। চার বার নয়। কেননা নবী (সা)-এর যুগে বলা হত মাত্র দুই বার। এ প্রসঙ্গে সূক্ষ্মদশী আলিমগণ বলেন, দুই বার করে বলার মানে হল দুই শ্বাসে বলা। কারণ হাদীসে আমরা আযানের বিবরণ হিসাবে দু'টি জিনিস পাই। একটি হচ্ছে আযানের বিস্তারিতরূপ বা তাফসীল। আর অপরটি হচ্ছে সংক্ষিপ্ত নির্দেশ বা ইজমালী ধারণা। ইজমাল কখনো তাফসীলের বিস্তারিতরূপকে খণ্ডন করতে পারে না। ইজমালের মধ্যে নানা অবকাশ থাকে, তাফসীলের মধ্যে সেই অবকাশের সুযোগ নেই। কাজেই এখানে ইজমালকে তাফসীলের আলোকে ব্যাখ্যাযোগ্য বলতে হবে।

তাছাড়া যে সব হাদীসে শুরুতে চার বার তাকবীরের কথা উল্লেখ আছে সেগুলো বিশুদ্ধ হাদীস। সিকাহ ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত। কাজেই যে সব হাদীসে দুই বারের কথা বলা হয়েছে সেগুলোর তুলনায় সিকাহ রাবীদের বর্ণনা অতিরিক্ত বলে গণ্য হবে। আর সিকাহ রাবীর অতিরিক্ত বর্ণনা হাদীস বিশারদ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য।

মোটকথা, হাদীসের আলোকে আযানের শুরুতে তারবী আছে এবং আযানে তারজী নেই এই বাক্যদ্বয়কে একত্রিত করলে ফলাফল দাঁড়ায় যে, আযানের মোট বাক্য হচ্ছে পনেরটি। এটিই হানাফী ফকীহগণের রায় ও ফাত্ওয়া।

আযানে তারজী না করা উত্তম

তারজী (ترجيع) শব্দের অর্থ হল কোন কাজ পুনর্বার করা। পরিভাষায় আযানে অবস্থিত শাহাদাতাইনকে প্রথমে দুই দুই বার করে চার বার নিম্নস্বরে বলার পর পুনরায় চার বার উচ্চস্বরে বলাকে তারজী বলে। (ফাতহুল বারী ও উমদাতুল কারী) আযান দেওয়ার সময় এহেন তারজী করা হবে কি না এ প্রসঙ্গে ফকীহগণের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। কেউ পক্ষে অভিমত দিয়েছেন, কেউ বিপক্ষে। বিবেচ্য বিষয় হলো হাদীসে এ সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর বক্তব্য কিরূপ সে দিকে দৃষ্টি প্রদান করা।

হাদীস নিম্নরূপ ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ... فَقُلْتُ لَهُ بَلٰى فَقَالَ تَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ، حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الخ

أخرجه أبو داؤد تحت باب كيف الاذان رقم ٢٩٩ ، والحديث صحيح

www.pathagar.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়িদ (ইবন আবদ রাব্বিহীন) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন........আমি তাকে (ফেরেশতাকে) বললাম, অবশ্যই। তখন তিনি বললেন, তুমি বলবে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ্, হাইয়া আলাল ফালাহ্, আল্লাহু আকবরার আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।[১৯]

উল্লেখ্য এ হাদীসটি প্রথমে যিনি স্বপ্নে দেখেছেন তাঁর হাদীস। পূর্বেও বলা হয়েছে যে, আযান অধ্যায়ে এটিই মূল হাদীস। এখানে আযানের বাক্যগুলো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা আছে। লক্ষণীয় যে, এখানে তারজী নেই। শাহাদাতাইনকে একবার বলার পর পুনরায় বলা হয়নি। তাতে বুঝা গেল, আযানের মধ্যে তারজী নেই।[২০]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهٖ اَنَّهُ رَاَى رَجُلاً نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ بَانَ اَخْضَرَانِ فَنَادٰى اَللّٰهُ اَكْبَرُ الخ ... فَذَكَرَ الْاَذَانَ بِغَيْرِ تَرْجِيْعٍ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ نِعْمَ مَا رَاَيْتَ عَلِّمْهُ بِلاَلاً فَقَامَ بِلاَلَ فَاَذَّنَ مَثْنٰى مَثْنٰى الخ. اخرجه الطحاوى والحديث صحيح

হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আবদ রাব্বিহী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি স্বপ্নে দেখতে পান, জনৈক ব্যক্তি আসমান থেকে অবতরণ করেছে, লোকটির শরীরে এক জোড়া সবুজ পোশাক। সে জোর আওয়াজে বলল, আল্লাহু আকবার-----। অতঃপর তিনি তারজী বিহীন পূর্ণ আযান উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, অতঃপর তিনি মহানবী (সা) -এর কাছে এসে বিষয়টি সম্পর্কে সংবাদ গেল। মহানবী (সা) বললেন, তুমি খুব উত্তম জিনিস স্বপ্নে দেখেছ। এটি বিলালকে শিখিয়ে দাও। অতঃপর হযরত বিলাল (রা) দাঁড়িয়ে বাক্যগুলো দুই দুই বার উচ্চারণ করে আযান দের।[২১]

এ হাদীস ইমাম তাহাভী (র) বর্ণনা করেছেন। হাদীসখানা অন্যান্য ইমামগণও হাদীসটি বর্ণনা করেন তখনও আযানে তারজী ছিল না। তিনি বাক্যগুলো দুই দুই বার উচ্চারণ করেছেন; চার বার করে নয়।

মদীনা মুনাওয়ারায় মহানবী (সা)-এর উপস্থিতিতে প্রত্যহ পাঁচ বার মসজিদে নব্বীতে আযান হত। হযরত বিলাল (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম (রা) আযান দিতেন। হযরত বিলালই ছিলেন প্রধান আযান দানকারী। ইতিহাসে দেখা যায় মহানবী (সা)-এর সম্মুখস্থ্ রোযকার এই আযান শেষ পর্যন্তও তারজী বিহীন ছিল। নিম্নোক্ত হাদীস থেকে বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট বুঝা যায়। তাই প্রমাণ হচ্ছে যে, আযানে তারজী নেই।[২২]

১৯. ইমাম আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৯৯।

২০. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪।

২১. ইমাম আবূ জাফর তাহাভী, শারহু মা'আনিল আসার।

২২. মাওলানা আবুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫।

www.pathagar.com

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ بِلاَلاً يُوَذِّنُ مَثْنٰى وَيُقِيْمُ مَثْنٰى . أخرجه الطحاوى فى شرح معانى الاثار ، تحت باب الاقامة كيف هى والحديث .

হযরত সুওয়াইদ ইবন গাফালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি হযরত বিলাল (রা) আযান দিচ্ছেন দুই বাক্য করে। আর ইকামতও দিচ্ছেন দুই বাক্য করে।[২৩]

শাহাদাতাইনের বাক্য দুইবার করে উচ্চারিত হবে চারবার করে নয় এটি উপরোক্ত হাদীস থেকেও বুঝা যায়। আরো বুঝা যায় যে, হযরত বিলালের আযানে তারজী ছিল না। থাকলে হযরত সুওয়াইদ (র) তা অবশ্যই শুনতেন।

এখানে একটি জিনিস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত সুওয়াইদ ইবন গাফালা ছিলেন মুখযারমীনের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি। স্বয়ং ইবন হাজার আসকালানী (র) ও বলেছেন যে, হযরত সুওয়াইদ মহানবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য এমন সময়ে মদীনা মুনাওয়ারা আগমন করেন যখন মহানবী (সা)-এর পবিত্র দেহ মোবারক কবরে দাফন করা হচ্ছিল। বুঝা গেল মদীনায় হযরত বিলালের কণ্ঠে আযান শ্রবণের যে বক্তব্য তিনি দিচ্ছেন সেটি ছিল মহানবী (সা)-এর ওফাত পরবর্তী কালের আযান। যেই আযানের উপর মহানবী (সা) জীবনের শেষ সময়টি অতিক্রম করেছেন। এই আযানের মধ্যে তারজী ছিল না। বুঝা গেল, মহানবী (সা) নিজে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তারজীবিহীন আযানের আমল করেছেন। আরো বুঝা গেল যে, প্রধান মু'আযযিন হযরত বিলালের আযানে শুরুতে যেমন তারজী ছিল না তদ্রূপ শেষ সময় পর্যন্ত এই তারজী বিহীনতাই বলবৎ ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে তারজী না করা উত্তম।[২৪]

মাওলানা আবুল হাসান (র) বলেন, প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে যে সব মু'আযযিন আযান দিতেন তাঁরাও আযানে তারজী করতেন না। এতে বুঝা যায়, তারজী না করা সাহাবীগণের সম্মিলিত রায়। অতএব তারজী না করা 'ইজমায়ে সুকূতী' দ্বারাও প্রমাণিত হচ্ছে।[২৫]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَذَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شُفْعًا شُفْعًا فِى الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ .

أخرجه الترمذى وقال حديث صحيح ، وقال ابن الجوزى فى التحقيق حديث عبد الله بن زيد هو أصل فى التاذين وليس فيه ترجيع فدل على ان الترجيع غير مسنون كما فى حواشى اثار السنن ، للفيموى ص ٥١ باب ما جاء فى عدم الترجيع .

২৩. ইমাম তাহাভী, প্রাগুক্ত, বাবুল ইকামাহ কাইফা হিয়া।

২৪. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ, ৪৫৪।

২৫. মাওলানা আবুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫।

www.pathagar.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে আযান ছিল যুগল যুগলভাবে বলা আযানের মধ্যে এবং ইকামতের মধ্যে।[২৬]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَثْنٰى مَثْنٰى ، أخرجه النسائى تحت كتاب الاذان وأبو داؤد فى باب الاقامة

হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে আযান ছিল (বাক্যগুলো) দুই বার দুই বার করে বলা।[২৭]

উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ে شفعًا ও مثنى শব্দ স্পষ্টভাবে বলা আছে। শব্দদ্বয়ের অর্থ হল কোন জিনিসকে দুই বার করা। তারজী করা হলে এটি আর জোড়া বা দুই বার থাকে না বরং চার বারে পরিণত হয় কাজেই বর্ণিত হাদীসদ্বয় প্রমাণ করছে যে, আযানে তারজী নেই।[২৮]

এ হাদীস সমূহের নিরিখেই ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) প্রমুখ ফকীহগণ বলেছেন, আযানে তারজী না করা উত্তম।[২৯] অবশ্য কয়েকটি হাদীস এমনও পাওয়া যায় যেখানে তারজী-এর কথা উল্লেখ আছে। যেমন,

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ ثُمَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْعَدَهُ وَالْقٰى عَلَيْهِ الْاَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا قَالَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ مِثْلَ اَذَانِنَا قَالَ بِشْرٌ فَقُلْتُ لَهُ اَعِدْ عَلَىَّ فَوَصَفَ الْاَذَانَ بِالتَّرْجِيْعِ .

أخرجه الامام الترمذى ، فى باب ما جاء فى الترجيع فى الاذان ، وقال حديث محذورة فى الاذان حديث صحيح ، وقد روى عنه من غير وجه ، وعليه المعمل حكم

হযরত আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বসালেন এবং তাকে আযান শব্দে শব্দে শিখালেন। রাবী ইবরাহীম বলেন, সেই আযান ছিল আমাদের কাছে প্রচলিত আযানেরই অনুরূপ। রাবী বিশর বলেন, আমি বললাম, তাহলে আযানটি আমাকে শোনান। তখন তিনি আযান ব্যক্ত করেন তারজীসহ।[৩০]

عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ثُمَّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً .

---

২৬. ইমাম তিরমিযী ; আল্লামা নূসুবী, আসারুস সুনান, পৃ. ৫১।

২৭. ইমাম আবূ দাঊদ, আস সুনান, বাবুল ইকামাহ।

২৮. মাওলানা আবুল হাসান, প্রাগুক্ত।

২৯. প্রাগুক্ত।

৩০. ইমাম তিরমিযী, প্রাগুক্ত, বাবু মা জাআ ফীত তারজী' ফীল আযান।

www.pathagar.com

أخرجه الترمذي في ذلك الباب ، وقال هذا حديث حسن صحيح ، وأبو موسى اسمه سمرة بن معير وقد روى عنه انه كان يفرد الاقامة .

হযরত আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,--------তারপর মহানবী (সা) তাকে আযান শিখালেন ১৯ বাক্য আর ইকামত শিখালেন ১৭ বাক্য।[৩১]

عَنْ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِيْ سُنَّةَ الْاَذَانِ قَالَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَاسِيْ وَقَالَ تَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ الخ

أخرجه الامام مسلم في صحيح ، رقمه ٥٠٠ ، وفي رواية قال ثم ارجع فمد من صوتك اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ ، وفي رواية ثم يعود فيقول اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ .

হযরত আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আযানের নিয়ম শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন, রাসূল (সা) তখন আমার মাথার অগ্রভাগ স্পর্শ করে বললেন, তুমি বলবে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, এ বাক্যগুলোতে স্বর উচ্চ করবে। তারপর বলবে আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, বাক্যগুলোতে স্বর হ্রাস করবে। তারপর স্বরউচ্চ করে শাহাদতের বাক্য বলবে—আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়া আলাস সালাহ-----।[৩২]

উপরোক্ত হাদীসগুলোতে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) শাহাদাতাইন বাক্যকে পুনর্বার একবার আস্তেআস্তে বলার পর পুনর্বার জোরে বলতে আদেশ দিয়েছেন। এ আদেশটি স্পষ্ট বিধায় প্রমাণ হচ্ছে যে, আযানে তারজী' আছে। তা ছাড়া হযরত আবূ মাহযূরা (রা) কে নবী (আ) নিজে আযান শিখিয়েছেন। তাঁর সেই আযানের যেই তাফসীল তিনি পেশ করেছেন তাতেও শাহাদাতাইন চার বার করে উল্লেখ আছে। কাজেই এই তারজী' অস্বীকারের সুযোগ নেই। আরো দেখা যাচ্ছে আযানের বাক্যগুলো সাহাবী গণনা করে পেশ করছেন যে, এটি ১৯

৩১. প্রাগুক্ত।

৩২. ইমাম মুসলিম, আস সহীহ, রিয়াদ ঃ দারুল নাশর ওয়াত তাওযী' ১৯৯৯, হাদীস নং-৫০০।

www.pathagar.com

বাক্য সম্বলিত। যদি আযানে তারজী' না মানা হয় তাহলে বাক্য সমষ্টি ১৯ থাকে না। কাজেই এ সংখ্যাও তারজীকে সমর্থন করছে। এ সব দিক বিবেচনা করেই ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ (র) আযানে তারজী' করা উত্তম বলে অভিমত দিয়েছেন।[৩৩]

বিশেষজ্ঞ আলিমগণ বলেন, উপরোক্ত হাদীসগুলোর সবই সাহাবী হযরত আবূ মাহযূর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি নবী (সা)-এর যুগের শেষ দিকে মুসলমান হন এবং মক্কায় মসজিদুল হারামে মু'আয্যিনের দায়িত্ব পালন করেন। নবী (সা)-এর যুগে যাঁরা আযান দিতেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন হযরত বিলাল (রা), হযরত ইবন উম্মে মাকতূম (রা), হযরত সা'দ আর কারায ও হযরত আবূ মাহযূরা (রা)। তন্মধ্যে তারজীর কথা শুধু আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। অন্য কেউ বর্ণনা করেন নি। কাজেই অধিক সংখ্যক মু'আযযিন যেই পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন সেটাই হবে উত্তম।[৩৪]

قال مشائخنا لا ترجيع فى اذان مشاهير المؤذنين لا فى اذان بلال ولا فى اذان ابن ام مكتوم ولا فى اذان سعد القرظى مؤذن مسجد قباء ، انما الترجيع فى اذان أبى محذورة فقط فالترجيح لعدم الترجيع كما فى تعليق الصحيح ، ج ١ ، ص ٢٩١

দ্বিতীয়ত, হযরত আবূ মাহযূরা (রা) বর্ণিত হাদীসের বাক্য ترفع به صوتك (তুমি উচ্চ স্বরে বলবে) কথাটি দ্বারা তারজী' প্রমাণ করা হয়। বস্তুত এ বাক্য দ্বারা তারজী' প্রমাণ হয় না। কেননা এখানে নবী (আ)-এর উদ্দেশ্য পুনর্বার বলা নয়; বরং হযরত আবূ মাহযূরার স্বর এখানে যথাযথভাবে উচ্চ হয়নি বিধায় আওয়াজ উচ্চ করতে বলেছেন মাত্র। এটি ترفع به صوتك বিবরণ মূলক বাক্য হলেও ارفع به صوتك এর অর্থে ব্যবহৃত অনুজ্ঞাবাচক বাক্য। কাজেই আওয়াজ উচ্চ করার আদেশকে আযানের শব্দ বৃদ্ধির আদেশ মনে করা যায় না।[৩৫]

তৃতীয়ত, আল্লামা ইবনুল জাওযী (র) বলেন, যেহেতু হযরত আবু মাহযূরা (রা) এই শিক্ষা গ্রহণের সময় ছিল অমুসলিম। তাই শাহাদাতাইনের বাক্য তাঁর হৃদয়ে বদ্ধমূল করানোর জন্য শাহাদাতাইনকে পুনরায় আবৃত্তি করয়েছেন। কাজেই পুনরায় আবৃত্তি করার বিষয়টি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার; আযানের মহানত্ব কাফিরদের কাছেও ছিল স্বীকৃত বিষয়। তাই তাকবীরকে পুনর্বার পড়ানো হয়নি।[৩৬]

চতুর্থত, হযরত আবূ মাহযূরা (রা) মক্কায় আযান দিতেন। যেখানে মহানবী (সা) বাস করতেন না। তাঁর আযানে রয়েছে তারজী। পক্ষান্তরে হযরত বিলাল (রা) আযান দিতেন

৩৩. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ, ৪৫৪ ; মাওলানা আবুল হাসান চাটগামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫।

৩৪. আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী, ফাতহুল মুলহিম, খ. ২, পৃ. ৫; আল্লামা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী, বাযলুল মাজহূদ, খ. ১, পৃ. ২৮৩।

৩৫. মাওলানা আবুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫।

৩৬. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

মসজিদে নব্বীতে। যেখানে রোযানা পাঁচ ওয়াক্তের আযান ছিল মহানবী (সা)-এর সামনে। সেই আযানে তারজী নেই। তাই মহানবী (সা) সামনে দেওয়া আযানই অগ্রাধিকার যোগ্য।[৩৭]

পঞ্চমত, আল্লামা মোল্লা আলী কারী হানাফী (র) বলেন, একমাত্র হযরত আবূ মাহযূরা (রা) ব্যতীত অন্যান্য সকল রিওয়ায়াত তারজীবিহীন তার পক্ষে। তাই অধিক সংখ্যক রিওয়ায়াত যা সমর্থন করে সেটিই অগ্রাধিকার যোগ্য বিবেচিত হবে। কাজেই আযানে তারজী না করা উত্তম।[৩৮]

ষষ্টত, হিদায়া গ্রন্থে আল্লামা মুরগীনানী (র) বলেন, হযরত আবূ মাহযূরা (রা)-কে মহানবী (সা) শাহাদাতাইন পুনর্বার পড়িয়েছেন। এটি ছিল শিখানোর জন্য। কিন্তু আবূ মাহযূরা (রা) এটিকে ভুলক্রমে আযানের অংশ মনে করে নিয়েছেন। আল্লামা মুরগীনানীর উপরোক্ত ব্যাখ্যা যথার্থ নয়। এতে সাহাবীর উপলব্দির উপর আপত্তি চলে আসে। তাছাড়া কোন কোন বর্ণনায় যেহেতু এমনও উল্লেখ আছে যে, ثم ارجع فمد من صوتك اشهد ان لا اله الا الله الخ সেহেতু আবূ মাহযূরা (রা) বুঝতে ভুল করেছেন--তা বলা যায় না।[৩৯]

সপ্তমত, সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন বিশিষ্ট আলিম আল্লামা ইবন কুদামা (র) তাঁর আল-মুগনী গ্রন্থে। শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র) ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থে এ অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁদের মতে হযরত আবূ মাহযূরা (রা)-এর তারজী সংক্রান্ত মূল ঘটনা ছিল নিম্নরূপ ঃ

হিজরীতে হুনাইন যুদ্ধের পর মহানবী (সা) তায়িফ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। পথিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হলে মুসলমানগণ এক গ্রামের পার্শ্বে যাত্রা বিরতি করেন। তাঁরা সেখানে আযান দিয়ে নামায আদায় করেন। মুসলমানদের জমায়েত উপলক্ষে স্থানীয় মুশরিক বালকদের কয়েকজন একান্ত তামাসা দেখার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়। আযান ও নামায তাদের কাছে নতুন জিনিস মনে হল। বিশেষ করে আযান যখন তারা শুনল তখন ছোট বালকেরা যা করে থাকে অর্থাৎ তারা নিজেরা আযানের শব্দমালা উচ্চারণ করে ব্যাঙ্গ করতে থাকল। এই ব্যাঙ্গাত্মক আযানের মধ্যেও একটি আওয়াজ মহানবী (সা)-এর কাছে ভাল লাগে। মহানবী (সা) তাতে ঈমানের সম্ভাবনাময় নূর অনুভব করেন। আযান শেষে তিনি বালকদের ডেকে কাছে নিলেন এবং আদর করলেন। তিনি পুনরায় তাদের কণ্ঠে আযান শুনতে চাইলেন। তারা আযান শোনালে মহানবী (সা) স্থির করলেন যে, যেই কণ্ঠটি তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল সেটি ছিল হযরত আবূ মাহযূরার কণ্ঠ।

মহানবী (সা) বালক আবূ মাহযূরাকে আরো সোহাগ করে আযানের তালীম দেন। মহানবী (সা) শিখিয়ে দিচ্ছেন আর আবূ মাহযূরা উচ্চারণ করে যাচ্ছেন। পাশেই রয়েছে অন্যান্য বালকেরা যারা মুশরিক ও আবূ মাহযূরার সাথী-সঙ্গী। আযানের প্রথম বাক্য তাকবীর। মুশরিকদের বিশ্বাস মতও আল্লাহ মহান, মাহযূরা এটি উচ্চারণ করতে কোনই দ্বিধা করেন নি।

---

৩৭. প্রাগুক্ত।

৩৮. প্রাগুক্ত।

৩৯. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ, ৪৫৫।

www.pathagar.com

জটিলতা দেখা দিয়েছে দ্বিতীয় বাক্য তাওহীদের ঘোষণায়। আরো জটিলতা দেখা দিয়েছে, মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালাতের ঘোষণা বিষয়ক তৃতীয় বাক্যে। আবূ মাহযূরা মুশরিক সঙ্গীদের সামনে এই দুই বাক্য উচ্চারণ করতে দ্বিধা করেন। তাই শাহাদাতাইন উচ্চারণে তাঁর কণ্ঠ ছিল খুবই নিম্ন। তখন মহানবী (সা) নিজের ডান হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা করে আবূ মাহযূরার মাথার অগ্রভাগে চুলের গোড়ায় এমনভাবে স্থাপন করেন যে, তাঁর হাতের তালু আবূ মাহযূরার মাথার তালুকে স্পর্শ করে আছে—নবীজী (সা)-এর মুবারক হস্তস্পর্শ আবূ মাহযূরার দেহ-মন ও জীবনকে নাড়া দেয়। মনের সব সংশয় বিদূরিত করে দেয় এভাবে মহানবী (সা) রূহানীভাবে তাঁর উপর 'তাসাররুফ' করেন। তাতে আবূ মাহযূরার হৃদয় খুলে যায়। তিনি নূরে ঈমান হৃদয়ে স্থান দেন। ফলে আবার যখন শাহাদাইত উচ্চারণ করতে বললেন, তখন তিনি জোর আওয়াজে তা শুনিয়ে দেন। একই ঘটনায় বালক আবূ মাহযূরা আযানও শিখলেন আবার মুসলমানও হয়ে গেলেন।

এ ঘটনা হযরত আবূ মাহযূরার মনে দাগ কেটে ছিল। তিনি কখনো তা ভুলতেন না। আর মহানবী (সা)-এর যে হস্তস্পর্শ তিনি পেয়েছিলেন সেটি ছাড়তে রাজী ছিলেন না। এ কারণে তিনি মস্তকের অগ্রভাগে অবস্থিত চুলগুলো কখনো মুণ্ডন করতেন না। চুলগুলো মওত পর্যন্ত এভাবেই রেখে দেন। মহানবী (সা)-এর প্রতি ভালবাসার আতিশয্য তাঁকে এমনটি করতে বাধ্য করেছিল।

হযরত আবূ মাহযূরা (রা)-এর এই রূহানী হালের বিয়টি মহানবী (সা) করতেন। তাই পরবর্তী কালে তিনি যখন তাঁকে মসজিদুল জারামে মু'আযযিন হিসাবে দায়িত্ব দেন তখন তাঁর আযানের মধ্যে তারজী দাখিল করে দেন। কেননা হযরত আবূ মাহযূরার রূহানী হালের লালনে তারজী' যথপোযুক্ত ছিল। তাই বুঝা যায় যে, তারজী করার হুকুমটি হযরত আবূ মাহযূরার জন্য 'খাস' হুকুম ছিল। সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ হুকুম ছিল না।

হুকুমটি আবূ মাহযূরা (রা)-এর জন্য খাস ছিল--এ মর্মে আরো প্রমাণ হল যে, এই ঘটনার পর মহানবী (সা) নিজের মু'আযযিন হযরত বিলাল (রা)-এর আযানে পরিবর্তন সাধনের কোন আদেশ দেননি। ফলে হযরত বিলাল (রা) শেষ পর্যন্তও তারজীবিহীন আযান দিয়ে যান। আল্লামা মুহাম্মদ ইউসুফ বানূরী (র) বলেন, হযরত আবু মাহযূরার কপালের উপর চুল রেখে দেওয়া যেমন তাঁর জন্য বিশেষ অনুমতি ছিল তদ্রূপ আযানে তারজী করারও বিশেষ অনুমতি ছিল। উভয় বিধান তার জন্য একান্ত বিধান। তাই এগুলোর উপর অন্যকে শামিল করা যাবে না।[৪০]

আযানের তারজী সম্পর্কে ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র)-এর ব্যাখ্যা আরো হৃদয়গ্রাহী। তিনি বলেন,

---

৪০. আল্লামা বানূরী (র) লিখেছেন ঃ

وما اثار اليه من الخير فاخرجه الدار قطنى فى سننه وفيه قصة طويلة وفى اخره ثم دعانى حين قضيت التاذين واعطائى صرة فيها شئ من فضة ثم وضع يده على ناصية ابى محذورة ثم امرها على وجهه ثم امر بين ثديبه ثم على كيده حتى بلغت يده سرة ابى محذورة ثم قال رسول الله ﷺ بارك الله فيك وبارك عليك فقلت يا رسول الله مرئى التاذبين بمكة فقال قد امرتك وذهب به كل شئ كان لرسول الله ﷺ من كراهته وعاد ذلك كله محبة اللنبى ﷺ وهذه القصة تويد ما لفاده ابن قدامة – معارف السنن الخ ٠٠٠ ص : ١٨١

www.pathagar.com

ان الاختلاف فى كلمات الاذان كالاختلاف فى احرف القران كلها شاف .

"আযানের বাক্যমালা সম্পর্কীয় ইখতিলাফ কুরআনের পাঠনরীতি বিষয়ক ইখতিলাফের মত। সবগুলোই জায়িয ও অনুমোদিত।"

শাহ্ সাহেবের মতে আযানের উপরোক্ত বিভিন্ন পদ্ধতি শুরু থেকেই মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এভাবে অবতীর্ণ। তারজী করা বা না করা উভয়ই অনুমোদিত ছিল। তাই দেখা যায়, হযরত বিলাল (রা)-এর আযানের তারজী ছিল না। তবে হযরত আবূ মাহযূরা (রা)-এর আযান তারজী ছিল। যেন অনুমোদিত একাধিক পদ্ধতি একাধিক ব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা কুবা মসজিদে মু'আযযিন হযরত সা'দ আল কারায (রা) আযান দিতেন। তাঁর আযানে তারজী বিদ্যমান ছিল তাতে বুঝা যায় তারজী হযরত আবূ মাহযূরার জন্য খাস ছিল না। আবার হযরত সা'দ আল কারযের পুত্র পরবর্তী কালে আযান দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তারজী বিহীন আযান দিতেন। পিতার অনুসরণে তারজী করতেন না। মুসান্নাফে ইবন আবু শায়বা গ্রন্থে আরো একটি পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) আযানের মধ্যে শাহাদাতাইনকে তিনবার উচ্চারণ করতেন।[৪১] তাই বিভিন্ন রকমের এই বর্ণনাগুলো পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, সব পদ্ধতিই জায়িয; সবগুলোই রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত ও অনুমোদিত। তবে হানাফী ফকীহ্গণ হযরত বিলাল (রা)-এর পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন যেমন ইমাম শাফিঈ হযরত আবূ মাহযূরা (রা)-এর আযানকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[৪২]

ফজরের আযানে অতিরিক্ত বাক্য

ফজর নামাযের আযানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার পর দুই বার 'আস সালাতু খাইরুম মিনান নাওম' বলতে হয়। তাহলে ফজরের আযানে বাক্য সংখ্যা হবে ১৭টি। এটি শুধু ফজরের আযানেই প্রযোজ্য। অন্য নামাযের আযানে এটি জায়িয নয়। ফিকহের পরিভাষায় এরূপ বাক্য বৃদ্ধিকে তাসবীব (تثويب) বলে। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত পরে আলোচনা করা হবে।

জমহূর ফুকাহার মতে ফজরের আযানে 'আস সালাতু খাইরুম মিনান নাওম' বলা মুস্তাহাব। তবে ইমাম শাফিঈ (র) থেকে বর্ণিত অভিমত অনুসারে এটি মাকরূহ। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ ... فَاِنْ كَانَتْ صَلٰوتُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ . أخرجه الامام أبو داؤد .

---

৪১. ইমাম ইবন আবু শাইবা (রা) বর্ণনা করেন,
عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه قال كان اذان ابن عمر الله الكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ، شهدت ان لا اله الا الله شهدت ان لا اله الا الله ثلاثا ، شهدت ان محمداً رسول الله ثلاثا ، حى على الصلوة ثلاثا ، ج ١ ، ص ٢٠٣

৪২. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬।

www.pathagar.com

হযরত আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,---আর যদি ফজরের নামায হয় তাহলে তুমি বলবে 'আসলালাতু খাইরুম মিনান নাওম'।[৪৩]

وَعَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَفِيْهِ الصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ فِى الْاَذَانِ الْاَوَّلِ فِى الصُّبْحِ ، أخرجه أبو داؤد .

হযরত আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন... তাতে আছে, তারপর ফজরে প্রথম আযানের মধ্যে বলবে 'আস সালাতু খাইরুম মিনান নাওম' দুই বার।[৪৪]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْاَذَانُ بَعْدَ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ .

أخرجه البيهقى والطبرانى باسناد حسن قال اليعمرى هذا اسناد صحيح

হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আযান ছিল এমন যে, 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার পর 'আস সালাতু খাইরুম মিনান নাওম' বাক্যটি দুই বার বলা হত।[৪৫]

উপরোক্ত হাদীসগুলো নির্দেশ করছে যে, ফজরের আযানে অতিরিক্ত বাক্যটি বলা যাবে। এটিই ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল প্রমুখ ফকীহগণের অভিমত।

তবে হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আবদ রাব্বিহী (রা) বর্ণিত স্বপ্নের ঘটনা ও আযানের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন সেটি আযানের মূল উৎস। অথচ সেই হাদীসে ফজরে উপরোক্ত বাক্য বৃদ্ধির কথা নেই। এ কারণে ইমাম মালিক এক উক্তি মতে 'আস সালাতু খাইরুম মিনান নাওম' বৃদ্ধিকে মাকরূহ বলেছেন।

জমহূর উলামা বলেন যে, বাক্যটি হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দের হাদীসে উল্লেখ না থাকলেও যেহেতু অন্যান্য বিশুদ্ধ বর্ণনায় বর্ণিত আছে সেহেতু এটি গ্রহণে কোন আপত্তি নেই। তা ছাড়া হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) যা বলেছেন, সেটি ছিল আযান সম্পর্কীয় সম্পূর্ণ প্রাথমিক কালের ঘটনা। তখনও ফজরে বর্ধিত বাক্য সংযুক্ত হয়নি। এটি সংযুক্ত হয়েছে পরে।

---

৪৩. ইমাম আবূ দাঊদ, আস সুনান।

৪৪. প্রাগুক্ত।

৪৫. ইমাম বায়হাকী আস্ সুনান। আল্লামা বিন্নৌরী লিখেছেন,

وفيه حديث اخر من طريق عطاء بن السائب عن عبد الرحمن ابى ليلى عن بلال للبيهقى وعبد الرحمن امرنى رسول الله ﷺ ان لا اثوب الا فى الفجر قال البيهقى وعبد الرحمن لم يلق بلالا ، كذا فى نصب الراية وحديث اخر عند ابن خزيمة والدار قطنى والبيهقى عن انس رضى الله عنه قال من السنة اذا قال المؤذن فى اذان الفجر حى على الفلاح قال قال الصلوة خير من النوم صححه ابن السكن كما فى معارف السنن ج ٢ ، ص ٣-٢

www.pathagar.com

অর্থাৎ পরবর্তী কালে মহানবী (সা) ফজরের আযানে এটি বৃদ্ধি করতে আদেশ দিলে সাহাবীগণ ফজর নামাযে সেটি অন্তর্ভুক্ত করে নেন।[৪৬]

আযানে হল নামাযের জন্য শরয়ী পদ্ধতির আহবান। এই আহবানের গুরুত্ব ধরে রাখা আবশ্যক। আযানের পর নামাযে হাজির হওয়ার জন্য একজন অন্যজনকে ডাকা বা উদ্বুদ্ধ করা ব্যক্তিগত পর্যায়ে হলে কোন আপত্তি নেই। বরং সাওয়াব হবে। কিন্তু সেই ডাকাডাকির জন্য বিশেষ কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা ঠিক নয়। কেননা তাতে মূল আযানের আবেদন বিনষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে একখানা হাদীসে পুনরাহবান করা কঠিনভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। যেমন ঃ

عَنْ بِلَالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُثَوِّبَنَّ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الصَّلٰوتِ . أخرجه الامام الترمذى .

হযরত বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, (হে বিলাল) কোন নামাযে কখনো পুনরাহবান করবে না।

এ হাদীসে 'তাসবীব' তথা পুনরাহবান সম্পর্কে বল হয়েছে। তাসবীব শব্দটি ثوب থেকে গৃহীত। 'সাওব' অর্থ কাপড় বা বস্ত্র খণ্ড। যেহেতু প্রচলন আছে যে, কাউকে দূর থেকে ডাকতে হলে কিংবা দূর থেকে কোন জিনিস নির্দেশ করতে হলে কোন বস্ত্রখণ্ড উড়িয়ে দেওয়া হয় কিংবা রুমাল বা কাপড়ের টুকরা বার বার উপরের দিকে উড়িয়ে দেখানো হয়। সেখানে থেকে 'তাসবীব' শব্দটি الاعلان بعد الاعلان। ঘোষণার পর ঘোষণা-এর অর্থে ব্যবহৃত।[৪৭]

আল্লামা সাহারানপুরী (র) লিখেছেন, পরিভাষায় তাসবীব শব্দটি আযানের মধ্যে 'আস সালাতু খাইরুম মিনান নাওম' বলা ও ইকামত দেওয়া অর্থে ব্যবহৃত। এটিকে বলা হয় তাসবীবে কাদীম। এটি শরী'আত সম্মত ও জায়িয যা মুসলিম সমাজে নবী (সা) যুগ থেকেই চলে আসছে। আরেক প্রকার তাসবীব আছে যাকে বলা যায় 'তাসবীবে হাদিস'। যা পরবর্তী কালে সৃষ্ট। যেমন আযান হয়ে যাওয়ার পর আস সালাত; আস সালাত কিংবা হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ ইত্যাদি বলে মানুষকে ডাকাডাকি করা। কূফার আলিমগণ এই রেওয়াজের সূচনা করে ছিলেন। সাধারণত, তাসবীব বলে এই তাসবীবে হাদিসকেই বুঝানো হয়ে থাকে। এটি জায়িয কিনা সে বিষয়ে মতভিন্নতা আছে। উপরের বর্ণিত হাদীস থেকে বুঝা যায় এই তাসবীব জায়িয নয়।

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাসান চাটগামী লিখেছেন, মুতাকাদ্দিমীন উলামা শুধু ফজর নামাযে তাসবীব জায়িয বলেছেন। অন্য নামাযের জন্য নাজায়িয ও মাকরূহ।[৪৮] পক্ষান্তরে মুতাআখ্‌খিরীন উলামা অন্য নামাযেও জায়িয বলেছেন। হাদীসে এ প্রসঙ্গে যে সব উপাত্ত পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ ঃ

---

৪৬. মাওলানা আবুল হাসান , প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮।

৪৭. প্রাগুক্ত।

৪৮. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِى الظُّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ قَالَ فَقَالَ اَخْرِجْ بِنَا فَاِنَّ هٰذِهٖ بِدْعَةٌ . أخرجه الامام أبو داؤد، الحديث صحيح

হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত ইবন উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি যোহর কিংবা আসর নামাযে তাসবীব করেছিল। তাই হযরত ইবন উমর (রা) বললেন, আমাকে নিয়ে চল। কারণ এটি বিদ্‌'আত।[৪৯]

عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ رَاٰى مُؤَذِّنًا يُثَوِّبُ فِى الْعِشَاءِ فَقَالَ اَخْرِجُوْا هٰذَا الْمُبْتَدِعَ مِنَ الْمَسْجِدِ .

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার তিনি জনৈক মু'আয্যিনকে দেখলেন যে, সে ইশার নামাযে তাসবীব করছে। তিনি বললেন, এই বিদ্‌'আতীকে মসজিদ থেকে বের করে দাও।[৫০]

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে বুঝা যায় তাসবীব করা ঠিক নয়। বিশেষত যুহর, আসর (মাগরিব) ও এশা নামাযে তাসবীব করা বিদ্‌'আত। এই অভিমতই মুতাকাদ্‌দিমীন ও জমহূর উলামা অবলম্বন করেন।

তবে মুতাআখ্‌খিরীন উলামা বলেন, তাসবীবে হাদীস যা আযান ও ইকামতের মাঝে 'আস সালাত আস সালাত' বলে পালন করা হয় সেটি ফজর নামাযের সাথে খাস নয়। অন্যান্য নামাযে করা হলেও মাকরূহ হবে না। কারণ নামায ফরয। সকলের জন্যই ফরয। এ ফরয পালনে অপরকে আহবান করা, স্মরণ করিয়ে দেওয়া উদ্বুদ্ধ করা সবই নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত। এতে মূল আযানের আবেদন খর্ব হয় না বরং মূল আযানের আবেদন কার্যকরী। তাছাড়া ফজর নামাযে তাসবীব জায়িয হওয়ার যে কারণ (ইল্লত) সেটি কালক্রমে অন্যান্য নামাযের মধ্যেও পাওয়া যাচ্ছে বিধায় অন্যান্য নামাযেও তাসবীব জায়িয। ফজরের কারণ হল সেটি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময়। তাতে অনেকের মধ্যে অমনোযোগিতা বা উদাসিনতা ঘটে যায়। তাই তাসবীবের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কালক্রমে দেখা যায় মানুষের কর্মব্যস্ততা বা কাজ কর্মের বিভিন্ন নতুন পদ্ধতির কারণে আযান শোনা যায় না কিংবা অমনোযোগিতা ঘটে যাচ্ছে বিধায় তাসবীব সব নামাযেই জায়িয।[৫১]

মুতাআখ্‌খিরীন আরো বেলন, মুতাকাদ্‌দিমীনের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেছেন, শরী'আতের পক্ষ থেকে যে সব কাজে ব্যক্তিকে গভীর মনোযোগিতা নিবদ্ধ করে কর্ম সম্পাদনের আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন বিচারকার্য পরিচালনা, ইলম অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা ইত্যাদির সাথে যারা জড়িত তাঁদের ক্ষেত্রে তাসবীব মাকরূহ নয়। এটি যেমন বিশেষ ওযরের কারণে

---

৪৯. ইমাম আবূ দাঊদ, প্রাগুক্ত।

৫০. প্রাগুক্ত।

৫১. মাওলানা আবুল হাসান , প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮।

www.pathagar.com

মাকরূহ নয় তেমনি বর্তমান উদাসীনতার যুগে নামাযের প্রতি মানুষের সাধারণ অমনোযোগিতার বিশেষ কারণে সকল নামাযেই তাসবীব মাকরূহ হবে না।[৫২]

হযরত বিলাল (রা) হাদীসে তাসবীবকে নিষেধ করা হয়েছে এ প্রসঙ্গে মুতাআখ্খিররীন উলামা বলেন, হাদীসখানা দুর্বল। ইমাম তিরমিযী স্বয়ং বলেন, ان ابا اسرائيل الراوى ليس هو بذلك القوى الحديث মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে রাবী আবূ ইসরাঈল শক্তিশালী ব্যক্তি নন। হযরত ইবন উমর ও হযরত আলী (রা) বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে তারা বলেন, যেহেতু সে কালে নামাযের প্রতি মানুষের এহেন উদাসীনতা ছিল না সেহেতু তখন তাসবীব নিষেধ ছিল। বর্তমানে উদাসীনতা সৃষ্টি হওয়ায় তাসবীব নিষিদ্ধ থাকবে না।

নবী (আ)-এর যুগে তাসবীব ছিল না। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ প্রমুখ ফকীহগণ অধ্যয়ন ও গবেষণায় মগ্ন ব্যক্তিদেরকে ইকামতের পূর্বে মনে করিয়ে দেওয়া পছন্দ করতেন। এরূপ মনে করিয়ে দেওয়া মুবাহ। কেননা এই মনে করিয়ে দেওয়াকে শরী'আত যেমন আদেশ করেনি তেমনি নিষেধও করেনি। কিন্তু কোন কোন স্থানে তাসবীবকে বিধিবদ্ধ সুন্নাতের মানে জ্ঞান করা হয়। এটি ঠিক নয় বিধায় আলিমগণ বিদ্'আত বলেছেন। তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাসবীবকে যদি সুন্নাত বা ইবাদত জ্ঞান না করে অবলম্বন করা হয় তাহলে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। তাসবীব সম্পর্কে এ অভিমতই সবচেয়ে বেশি ভারসাম্যপূর্ণ অভিমত।[৫৩]

ইকামতের বাক্য ১৭টি

ইকামত আযানের মতই। কেবল মোট বাক্য সংখ্যায় কিছু পার্থক্য আছে। ইকামতের মোটবাক্য হল ১৭টি। আযানে উচ্চারিত ১৫ বাক্যের সঙ্গে অতিরিক্ত দুই বার 'কাদ কামাতিস সালাহ' বলতে হবে। এই অতিরিক্ত বাক্য 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার পর বলা হবে এটিই ইমাম আবূ হানীফার অভিমত। ইমাম শাফিঈর মতে মোট বাক্য ১১টি আর ইমাম মালিকের মতে মোটকথা ১০টি। তাঁরা বলেন, ইকামত আযানেরই অনুরূপ। তবে ইকামতের মধ্যে প্রথমে ও শেষে অবস্থিত তাকবীর (আল্লাহু আকবর) দুই বার করে বলা হবে। আর অন্যান্য বাক্য একবার করে বলা হবে। 'কাদ কামাতিস সালাহ' বাক্য ইমাম শাফিঈর মতে বলা হবে দুই বার। তাই মোট সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১১টি আর ইমাম মালিকের মতে বলা হবে একবার। তাই তাঁর কাছে মোট সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১০টি।[৫৪]

---

৫২. প্রাগুক্ত।

৫৩. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪। আল্লামা বিন্নৌরী বলেন,

وعن أبى يوسف جوازه للامام كذا فى البدائع والهداية وغيرها ، بقوله لا ادى بأسًا ان يقول المؤذن الامير فى الصلوات كلها السلام عليك ايها الامير ورحمة الله وبركاته حى على الصلوة حى على الفلاح يرحمك الله، واستبعده محمد لان الناس سواسية فى امر الجماعة ، وأبو يوسف خصهم بذلك لزيادة امشتغالهم بامور المسلمين كى لا تفوتهم الجماعة ، فكان هذا الاعلام من باب التعاون على البر والتقوى ، انظر معارف السنن ج ٢ ، ص : ٢٠٥

৫৪. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৭।

www.pathagar.com

এ ক্ষেত্রে হাদীসের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ الْاَنْصَارِىَّ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَاَنَّ رَجُلاً قَامَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ اَخْضَرَانِ عَلٰى حَدِيَةِ حَائِطٍ فَاَذَّنَ مَثْنٰى وَاَقَامَ مَثْنٰى وَقَعَدَ قَعْدَةً قَالَ فَسَمِعَ ذٰلِكَ بِلاَلٌ فَاَذَانَ مَثْنٰى مَثْنٰى وَاَقَامَ مَثْنٰى مَثْنٰى وَقَعَدَ قَعْدَةً .

أخرجه الامام ابن أبى شيبه فى مصنفه تحت باب ما جاء فى الاذان والاقامة كيف هو ، وصححه ابن دقيق العيد وقال ابن حزم هذا اسناد فى غاية الصحة ، وصححه ابن الجوزى .

হযরত আবদুর রহমান ইবন আবু লাইলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণ বর্ণনা করেছেন যে, আনসারী সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আবদ রাব্বিহী (রা) মহানবী (সা)-এর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন এক ব্যক্তি এক জোড়া সবুজ পোশাক পরিহিত দেওয়ালের ছাদে দাঁড়িয়ে আছে অতঃপর সে আযান দিল বাক্যগুলো দুই বার দুই বার করে। তারপর ইকামত দিল দুই বার দুই বার করে এবং সামান্য বসল। তিনি বলেন, অতঃপর হযরত বিলাল কথাটি শুনলেন। তিনি সে অনুসারে আযান দিলেন দুই বার, দুই বার করে। অতঃপর ইকামত দিলেন দুই বার দুই বার করে এবং সামান্য বসলেন।[৫৫]

এই হাদীস ইমাম ইবন আবু শায়বা উদ্ধৃত করেছেন। আল্লামা হাকিম জামালুদ্দীন যায়লাঈ বলেন, আল্লামা তাকী উদ্দীন ইবন দাকীকুল ঈদ হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। আল্লামা ইবন হাযাম যাহেরীও এটিকে উচ্চমানের বিশুদ্ধ বলেছেন। আল্লামা ইবনুল জাওযী হাদীসখানার বিশুদ্ধতা দেখে অবাক হয়ে যান এবং 'আত তাহকীক' গ্রন্থে এ হাদীসের কারণে ইকামত জোড়া জোড়া হওয়ার প্রতি নিজের অভিমত প্রকাশ করেন।[৫৬] কাজেই হাদীসখানার গ্রহণযোগ্যতা সকল প্রশ্নের উর্ধে। এটি প্রমাণ করছে যে, ইকামতের বাক্যগুলো আযানের ন্যায় জোড়া জোড়া হবে। প্রতিটি বাক্য দুই বার দুই বার করে বলা হবে।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ اَذَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَفْعًا فِى الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ .

أخرجه الامام الترمذى تحت باب ما جاء أن الاقامة مثنى مثنى ، وقال وعبد الرحمن لم يسمع من عبد الله .

৫৫. ইমাম ইবন আবু শাইবা, আল মুসান্নাফ, বাবু মা জাআ ফিল আযান ওয়াল ইকামাহ।

৫৬. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬০।

www.pathagar.com

হযরত আবদুর রহমান ইবন আবু লাইলা (র) বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে আযান ছিল দুই বাক্য করে, আযানের মধ্যে ও ইকামতের মধ্যে।[৫৭]

উপরোক্ত হাদীস থেকেও বুঝা যায় যে, ইকামতের বাক্য দু'টি করে হবে; একটি করে নয়।

তবে হাদীসখানার উপর ইমাম তিরমিযী আপত্তি করে বলেন যে, এটি মুনকাতি'। কেননা আবদুর রহমান ইবন আবু লাইলা-এর শ্রবণ হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) থেকে প্রমাণিত নয়। কাজেই এটি দলীলযোগ্য নয়।

গবেষক আলিমগণ বলেন, প্রথমত, হযরত আবদুর রহমান ইবন আবু লাইলা (র) খলীফা হযরত উমর (রা)-এর শাহাদতের আট বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। এদিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) ইন্তিকাল করেন খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর আমলে। তাতে বুঝা যায়, হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দের ওফাতের সময় হযরত আবদুর রহমান ইবন আবু লাইলার বয়স ন্যূনতম আট বছর। এতটুকু বয়স হাদীস বর্ণনার জন্য যথেষ্ট। এ কারণেই আল্লামা ইবন আবদুর বার 'আল ইস্তি'আব' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা)-এর শাগিরদের তালিকায় হযরত আবদুর রহমান ইবন আবু লাইলাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৫৮]

আল্লামা যায়লাঈ বলেন, এই হাদীসের অপর সনদে দেখা যায় যে, আবদুর রহমান ইবন আবু লাইলা জনৈক সাহাবীর সূত্রে হাদীসখানা হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) থেকে শুনেছেন। এ সনদ বিদ্যমান থাকায় হাদীসটিকে মুনকাতি' বলার সুযোগ থাকে না। প্রশ্ন শুধু একটুকু যে, সেই সাহাবীর নাম অজ্ঞাত। আর উসূলে হাদীস মতে সাহাবীর নামে অজ্ঞতা থাকা হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতাকে বাধাগ্রস্ত করে না।[৫৯]

প্রাজ্ঞ আলিমগণ আরো বলেন, যদি আবদুর রহমান ও হযরত আবদুল্লাহ তাহলেও বলা যায় যে, সনদটি বড় জোর 'মুরসাল' হবে। আর মুরসাল হাদীস জমহুর উলামার মতে দলীল যোগ্য। কাজেই হাদীসটিকে কোন দিক থেকেই ত্যাগ করার সুযোগ নেই।[৬০]

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ بِلاَلاً مُؤَذِّنُ مَثْنٰى وَيُقِيْمُ مَثْنٰى ۔

أخرجه الامام الطحاوى ، الحديث صحيح ۔

হযরত সুওয়ায়দ ইবন গাফালা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি হযরত বিলাল (রা) আযান দিচ্ছেন দুই বাক্য করে এবং ইকামত দিচ্ছেন দুই বাক্য করে।[৬১]

---

৫৭. ইমাম তিরমিযী, প্রাগুক্ত।

৫৮. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত।

৫৯. প্রাগুক্ত।

৬০. প্রাগুক্ত।

৬১. ইমাম তাহাভী, বাবুল ইকামাহ কাইফা হিয়া।

www.pathagar.com

عَنْ اَبِیْ مَحْذُوْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ عَلَّمَنِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الاِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَجَاءَ تَفْضِيْلاً فِی رِوَايَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ، حَیَّ عَلَی الصَّلٰوةِ حَیَّ عَلَی الصَّلٰوةِ ، حَیَّ عَلَی الْفَلاَحِ حَیَّ عَلَی الْفَلاَحِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةِ قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

أخرجه الامام الطحاوى فى كتابه ، تحت باب الاقامة كيف هى ، الحديث صحيح .

হযরত আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে ইকামত শিখিয়েছেন সতের বাক্য। অন্য বর্ণনায় তিনি তা বিস্তারিত আকারে এভাবে বলেন, আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আলাস সালাহ; হাইয়া আলাল ফালাহ হাইয়াত আলাল ফালাহ, কাদ কামাতিস সালাহ কাদ কামাতিস সালাহ, আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবার,লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।[৬২]

عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُثْنِى الْاَذَانَ وَيُثْنِى الْاِقَامَةَ حَتّٰى مَاتَ وَعَنْ عَلِیٍّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ الْاَذَانُ مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْاِقَامَةُ مَثْنٰى مَثْنٰى رواه البيهقى ، وروى الطحاوى عن مَعْلَمَةَ ابْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّهُ كَانَ يُثْنِى الْاَذَانَ وَالْاِقَامَةَ .

হযরত আসওয়াদ ইবন যায়দ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলতেন, আযান হবে দুই দুই বাক্য সম্বলিত এবং ইকামতও হবে দুই দুই বাক্য সম্বলিত। ইমাম তাহাভী হযরত সালমা ইবনুল আক্ওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আযান ও ইকামত দুই দুই বাক্য উচ্চারণ করে দিতেন।[৬৩]

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইকামতের বাক্য অবিকল আযানেরই মত হবে এবং এগুলো হবে জোড়া জোড়া। পার্থক্য কেবল একটু যে, ইকামতের মধ্যে অতিরিক্ত দুইবার 'কাদ কামাতিস সালাহ' বলতে হয়। সাহাবী হযরত আবূ মাহযূরা ইকামতকে যেরূপ বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা করেছেন। তাতে আর কোন অস্পষ্টতা বাকি নেই। বাক্যগুলো হিসাব করলে দেখা যায় এগুলোর সংখ্যা ১৭টি। এই নিরিখেই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ইকামতের বাক্য ১৭টি বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

---

৬২. প্রাগুক্ত।

৬৩. ইমাম বায়হাকী, আস সুনান। বাবুল ইকামাহ।

www.pathagar.com

অবশ্য কয়েকটি হাদীসে কিছু ব্যতিক্রম বক্তব্যও পাওয়া যায়। যেমন,

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُمِرَ بِلَالُ اَنْ يَّشْفَعُ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ . أخرجه الامام الترمذى وقال حديث انس حديث حسن صحيح .

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত বিলাল (রা)-কে আদেশ করা হয়েছে তিনি যেন আযান দেন জোড় সংখ্যক আর ইকামত দেন বেজোড় সংখ্যক।[৬৪]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, আযান হবে জোড়া জোড়া বাক্যে অর্থাৎ প্রতিটি বাক্য দুই বার দুই বার করে। আর ইকামত হবে বেজোড় বাক্যে অর্থাৎ প্রতিটি হবে এক বার এক বার করে। এমন কি 'কাদ কামাতিস্ সালাত' বাক্যটিও বলা হবে মাত্র একবার। এ হিসাব মতে ইকামতের মোট বাক্য দাঁড়ায় ১০টি। এই নিরিখেই ইমাম মালিক ইকামতের বাক্য ১০টি বলে অভিমত প্রকাশ করেন।[৬৫]

আরো কিছু ব্যতিক্রম বক্তব্য পাওয়া যায় নিম্নোক্ত হাদীসে। যেমন ঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُمِرَ بِلَالُ اَنْ يَّشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الاقَامَةَ زَادَ يَحْىٰ فِىْ حَدِيْثِهٖ عَنِ ابْنِ عَلِيَّةَ فَحَدَّثْتُ بِهٖ اَيُّوْبَ فَقَالَ الاَّ الْاِقَامَةَ

أخرجه الامام مسلم فى صحيحه تحت باب الامر يشفع الاذان وايتاء الاقامة رقمه ٨٤٨ ، وأيضا اخرجه أبو داؤد فى سننه .

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত বিলাল (রা) দেন বেজোড় বাক্যে। রাবী ইয়াহইয়া তার বর্ণনায় ইবন আলিয়া সূত্রে বলেন, অতঃপর আমি হাদীসটি আইয়ুবকে বর্ণনা করলে তিনি বলেন, তবে ইকামত অর্থাৎ 'কাদ কামাতিস সালাহ' বাক্যটি ব্যতীত।[৬৬]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ اِنَّمَا كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ وَالْاِقَامَةَ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ اَنَّهُ يَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ .

رواه أحمد أبو داؤد والنسائى واسناده صحيح كما فى اثار السنن ص : ٥١ ، تحت باب فى افراد الاقامة .

---

৬৪. ইমাম তিরমিযী, প্রাগুক্ত।

৬৫. মাওলানা আবুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬-২৪৭।

৬৬. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৮৩৮।

www.pathagar.com

হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে আযান ছিল দুই বার করে আর ইকামত ছিল এক বার একবার। তবে তিনি বলতেন যে, ইকামতে 'কাদ কামাতিস সালাত' দুই বার বলা হবে।[৬৭]

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, ইকামতের বাক্যগুলো একটি করে হবে। তবে 'কাদ কামাতিস সালাত' বাক্য হবে দুইটি। এই হিসাব মতে মোট বাক্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১১টি। এই নিরিখেই ইমাম শাফিঈ ইকামতের বাক্য ১১টি বলে অভিমত দেন।[৬৮]

বিশেষজ্ঞ আলিমগণ বলেন, উপরোক্ত হাদীসগুলো আযান ও ইকামত প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসের স্বাভাবিক ধারা থেকে ব্যতিক্রম। কাজেই এগুলোর ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমন হাদীসগুলোতে বলা আছে আযানে شفع কর আর ইকামতে ايتار কর। এখানে شفع অর্থ দুই বাক্য বলা নয় অনুরূপ ايتار অর্থ এক বাক্য বলা নয়। বরং অর্থ হল বলার সময়ে ধ্বনির মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হওয়া যে দু'টি বাক্যকে এক শ্বাসে একত্রে বলা হলে হবে شفع এর পৃথক পৃথক শ্বাসে পৃথত পৃথক বলা হলে হবে ايتار। ইকামতে এভাবে দুই বাক্য এক শ্বাসে একত্রে বলাকে হদর বল হয়। হদর ইকামতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেভাবে আযানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হল رسل। এই দুই বাক্য এক শ্বাসে বলা হচ্ছে বলে এটিকে এক ধরা হচ্ছে। যেমন ইমাম শাফিঈও ইকামতে প্রথমে আল্লাহু আকবার বাক্যটি দুইবার একত্রে এক শ্বাসে বলাকে ইতার তথা এক বার গণ্য করেছেন। অনুরূপ দেখা যায় যে, হাদীসের বাক্যাংশ الا الاقامة। এর ব্যাখ্যায় ইমাম শাফিঈ (র) বলেছেন যে, 'কাদকামাতিস সালাহ' দুই বার পৃথক শ্বাসে বলা হবে। বুঝা গেল আযান ইকামতে شفع এর অর্থ হল শ্বাস বিষয় নয়। অদ্রূপ ايتار অর্থ হল শ্বাস একটি ব্যবহার করা। ব্যতিক্রমী হাদীসগুলোকে এ ব্যাখ্যার আওতায় আনা হলে সবগুলির মধ্যে সুন্দর সমন্বয় স্থাপিত হয়ে যায়।[৬৯]

আরো ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, যে সব হাদীসে ইকামতের বাক্য এক বার এক বার বলার কথা উল্লেখ আছে সেগুলো মূলত لبيان الجواز অর্থাৎ এই পদ্ধতির জায়িয আছে এটা নির্দেশ করা উদ্দেশ্য মাত্র। কিংবা কাউকে তালীম দেওয়ার উদ্দেশ্য এক বার এক বার বলে শুধু চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এটি ইকামতের মূল হাদীসের বিপরীতে বিবেচনা করা হবে না।[৭০]

হযরত ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে, হযরত বিলালকে ইকামত এক এক বাক্যে দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে। অথচ হযরত বিলাল (রা) থেকে ইকামতের যেই তাফসীল বর্ণিত আছে তাতে দেখা বাক্যগুলো দুই বার দুইবার। উসূলে হাদীসের নিয়ম অনুসারে ইজমাল ও তাফসীলের মধ্যে যখন বিরোধ দেখা দেয় তখন তাফসীল প্রাধান্য পায়। এ হিসাবে দুই বাক্যের অভিমতই প্রাধান্য পাবে।[৭১]

---

৬৭ মুসনাদে আহমদ।

৬৮. মাওলানা আবুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭।

৬৯. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬১।

৭০. মাওলানা আবুল হাসান , প্রাগুক্ত।

৭১ প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ইমাম আবূ জাফর তাহাভী (র) বলেন, হাদীসে ইকামত একবার করে দেওয়ার কথা আছে। তবে এ হুকুম হল পূর্বেকার। পরবর্তী সময়ে সেটি রহিত হয়ে যায় এবং চূড়ান্তভাবে যা স্থির হয় তাহলো দুইবার করে বলা। এ কারণেই হযরত বিলাল (রা) মহানবী (সা)-এর ওফাতের পরেও যে ইকামত দিতেন তাতে প্রতিটি বাক্য ছিল দুইবার করে। আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র) স্পষ্ট লিখেছেন,

ان اقامة بلال كانت مثنى مثنى فى أخر الامر فالاقرب ان يقال ان عادة الافراد كانت فى الابتداء حين امر به دعادة التثنيه بعد ذلك .

মাওলানা আবুল হাসান চাটগামী লিখেছেন,

وحاصل الخلاف فى بحث الاذان والاقامة ان مالكًا أخذ بما رأى عليه أهل المدينة أى الاقتصار على التكبير مرتين وعلى الكلمة الاقامة مرة واحدة، والشافعى أخذ باذان أبى محذورة واقامة بلال ، وأبو حنيفة باذان بلال واقامة أبى محذورة كلهم اجتهدوا فى متابعة السنة بقدر وسعهم نور الله مرقدهم ، كما فى البذل ج ١ ، ص ٢٨٤ وفتح الملهم ج ٢ ، ص ٣ وغير ذلك .

বস্তুত হাদীসের মধ্যে ইকামতের تشفيع ও ايتار উভয় প্রমাণিত আছে। এ জন্য উভয় পদ্ধতি জায়িয তা নিশ্চিত। তবে বিবেচনা করতে হবে যে, পদ্ধতিদ্বয়ের কোনটি অগ্রাধিকার যোগ্য? তাতে হানাফী ফকীহগণ ১৭ বাক্যের রিওয়ায়াতের প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ এটি হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দের হাদীসে আছে। আর আযান ইকামতের তাঁর হাদীসই মূল সূত্র। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্র রাসূলের প্রধান মু'আয্যিন হযরত বিলাল (রা)-এর ইকামত শেষ পর্যন্তও ছিল ১৭ বাক্য বিশিষ্ট—যা হযরত সুওয়াইদ ইবন গাফালা (রা) বর্ণিত হাদীস প্রমাণ করছে। তৃতীয়ত, হযরত বিলালের ইকামত বিষয়ে রিওয়ায়াতের বিপরীমুখী বক্তব্য থাকায় বিষয়টি অপর বিশিষ্ট মু'আয্যিন হযরত আবু মাহযূরার ইকামতের সাথে মিলিয়ে দেখলে ১৭ বাক্যের প্রাধান্যই ফুটে উঠে। উল্লেখ্য হযরত আবূ মাহযূরা (রা) থেকে ইকামত এক বাক্যে প্রদানের যে রিওয়ায়াত পাওয়া যায় সেটি নেহায়েত দুর্বল। তাই এটি বিবেচনায় আনা হবে না। মোটকথা হযরত বিলাল (রা) থেকে ইকামতের বাক্য ১৭টি বিধায় এটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। এটাই হানাফী ফুকাহা ও ইমাম আযম আবূ হানীফার অভিমত।[৭২]

ওয়াক্তের আগে আযান দিলে পুনরায় আযান দিতে হবে

আযান দেওয়ার উদ্দেশ্য হল মানুষকে নামাযের দিকে আহবান করা এবং নামাযের সময় হয়েছে মর্মে অবগত করা। যেহেতু এটি নামাযের সময় বিষয়ক অবগতি সেহেতু ওয়াক্ত হওয়ার আগে এমন ঘোষণা দানের কোন অর্থ হয় না। এ জন্য কোন কারণে আযান ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে ঘটে গেলে ওয়াক্ত হওয়ার পর পুনর্বার আযান দেওয়া আবশ্যক। তাতে ফজর, যুহর

৭২. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬১।

www.pathagar.com

ইত্যাদির কোন পার্থক্য নেই। এটিই সাধারণ ফকীহগণের অভিমত। কিন্তু কোন কোন ফকীহ ফজরের ক্ষেত্রে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেন, ফজর নামাযে ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেও আযানের অবকাশ আছে। কাজেই অন্য নামাযে ওয়াক্তের আগে আযান ঘটে গেলে তা পুনর্বার দিতে হবে। কিন্তু ফজর নামাযে এমনটা ঘটলে পুনর্বার আযান দিতে হবে না। পূর্বের আযানই যথেষ্ট বিবেচিত হবে।[৭৩]

ফজর নামাযে ওয়াক্তের আগে আযান দিলে পুনরায় ওয়াক্ত হওয়ার পর পুনরায় আযান দিতে হবে–বিষয়টি হাদীসের আলোকে পর্যালোচনার প্রয়োজনে পূর্বেই দু'টি বিষয়ে আলোকপাত করা আবশ্যক। তাহল, এক. নবী (সা)-এর যুগে শেষরাতে মসজিদে নববীতে যে একাধিক আযান দেওয়া হত তা কি শুধু রমযানে দেয়া হতো, না সারা বছর ? দুই. সেই একাধিক আযানের মধ্যে কে কোন আযান দিতেন ?

প্রথমোক্ত বিষয়ে কেউ কেউ বলেছেন, শেষরাতের দুই আযান সারা বছরই ছিল। কিন্তু এতদ সম্পর্কে তাঁরা বস্তুনিষ্ঠ কোন প্রমাণ দেননি। জমহূর বলেন, এটি ছিল শুধু রমযান মাসে। তাই যে হাদীসগুলোতে দুই আযানের কথা পাওয়া যায় সেখানে এটি যে রমযানের ঘটনা তার ইঙ্গিতও বিদ্যমান। যেমন ঃ

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤْذَنَ ابْنَ اُمِّ مَكْتُوْمٍ . أخرجه الامام الترمذى والبخارى رقمه : ٦٢٠، ٦١٨

হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন (মু'আয্যিন হযরত) বিলাল আযান দেয় রাতের বেলা কাজেই তোমরা পানাহার অব্যাহত রাখতে পার যতক্ষণ না আযান দিবে (মু'আয্যিন হযরত) আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম (রা)।[৭৪]

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُغَرَّنَّكُمْ اَذَانُ بِلَالٍ عَنِ السُّحُوْرِ فَاِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ذكره العلامة الشهادة نيورى فى البذل

৭৩. আযান ও ইকামতের ওয়াক্ত সম্পর্কে মালিকুল উলামা আল্লামা কাসানী (র) বলেন,

فوقتهما ما هو وقت الصلوات المكتوبات حتى لو اذن قبل دخول الوقت لا يجزئه ويعيد اذا دخل الوقت فى الصلوات كلها فى قول أبىْ حنيفة ومحمد وقد قال أبو يوسف أخيراً الا بأس بان يؤذن للفجر فى النصف الاخير من الليل وهو قول الشافعى ، واحتجا بحديث ابن عمر رضى الله عنه ان بلالا كان يؤذن بليل ... ولان وقت الفجر مشتبه وفى مراعاته بعض الحج بخلاف سائر الصلوات ، ولابى حنيفة ومحمد ما روى شداد انه قال لبلال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يده عرضًا ولان الاذان شرع للاعلام بدخول الوقت والاعلام بالدخول قبل الدخول كذب وكذاب وكذا هو من باب الخيانة فى الامانة والمؤذن مؤتمن على لسان رسول الله ﷺ ولان الاذان قبل الفجر يؤدى الى الضرر بالناس لان ذلك وقت نومهم خصوصًا فى حق من تهجد فى النصف الاول من الليل فربما يلتبس الأمر عليهم وذلك مكروه، كما فى البدائع .

৭৪. ইমাম তিরমিযী, আল-জামি, বাবু মা জাআ ফিল আযান বিল লাইল।

www.pathagar.com

হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, বিলালের আযান তোমাদেরকে সাহরী গ্রহণ থেকে যেন কিছুতেই প্রবঞ্চিত না করে। কেননা বিলাল আযান দেয় রাত্রিকালীন সময়ে।[৭৫]

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে বুঝা যায়, দুই আযান দেওয়ার ঘটনা রমযান মাসের। সারা বছরের নয়। এটি ইমাম আযম আবূ হানীফা ও হানাফী ফকীহগণের অভিমত। হাদীসদ্বয় থেকে আরো বুঝা যায় প্রথম আযানের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সাহরীর ওয়াক্ত হয়েছে মর্মে অবগত করা। যেন যারা নামাযে রত আছে তারা দ্রুত নামায শেষ করে সাহরী গ্রহণ করে এবং যারা নিদ্রায় আছে তারা ঘুম থেকে উঠে সাহরী খেতে শুরু করে। ইমাম বুখারী (র) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস থেকেও এ কথা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَمْنَعَنَّ اَحَدَكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ مِّنْ سُحُوْرِهِ فَانَّهُ يُؤْذِنُ اَوْ يُنَادِيْ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ . أخرجه الامام البخارى تحت كتاب الاذان ومسلم تحت كتاب الصوم .

হযরত ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কাউকে যেন বিলালের আযান সাহরী গ্রহণ থেকে বিরত না রাখে। কারণ বিলাল আযান দেয় কিংবা বলেছেন বিলাল ঘোষণাবাণী উচ্চারণ করে যেন তোমাদের মধ্যকার নামায আদায়কারী ফিরে যায় এবং নিদ্রা যাপনকারী সচেতন হয়।[৭৬]মোটকথা দুই আযানের প্রথমটি হল সাহরীর জন্য আর দ্বিতীয়টি হল ফজর নামাযের জন্য। ইমাম তাহাভী (র) বলেন, তাহলে আযানদ্বয়ের মাঝখানে বেশ সময় ব্যবধান হওয়া উচিৎ যেন পানাহার করা সম্ভব হয়।অথচ একখানা হাদীসে দেখা যায় যে, আযানদ্বয়ের মাঝে ব্যাবধান কেবল এতটুকু যে, একজন আযান দিয়ে অবতরণ করছেন তো অপর জন আযানের জন্য মিনারে আরোহণ করছেন। হাদীসখানা নিম্নরূপ ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُنَادِيْ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِيْ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ، وزاد فى حديث عائشة ولم تَكُنْ بَيْنَهُمَا الاَّ مِقْدَارَ فَانْزِلُ هٰذَا و...... هٰذَا

وأخرجه الطحاوى تحت باب التاذين للفجراى وقت هو بعد طلوع أو قبل ذلك .

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, বিলাল আযান দেয় রাতে। কাজেই তোমরা পানাহার অব্যাহত রাখতে পারো যতক্ষণ না আযান দিবে ইবন উম্মে মাকতূম। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণিত আছে

৭৫. আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী, আল-বাজলুল মাজহূদ।

৭৬. ইমাম বুখারী, আস সহীহ, কিতাবুল আযান, হাদীস নং ৬২১, পৃ. ১০৩; ইমাম মুসলিম, আস সহীহ কিতাবুস সাওম।

www.pathagar.com

যে, দু'জনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কেবল এতটুকু যে, একজন অবতরণ করছেন তো অন্যজন আরোহণ করছেন।[৭৭]

এ আপত্তির ব্যাখ্যায় আল্লামা নীমবী বলেন, আসলে ঘটনা এমন হত যে হযরত বিলাল সাহরীর জন্য আযান দেওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সেখানেই বসে দু'আ দুরূদ পড়তেন। তারপর ফজরের ওয়াক্ত ঘনিয়ে আসলে তিনি অবতরণ করতেন এবং অপর মু'আযযিন হযরত আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূমকে জাগাতেন। ইবন মাকতূম (র) তখন ফজরের আযান দেওয়ার জন্য উপরে উঠতেন। তাতে উভয়ের উঠা ও নামার মাঝে সময়ের তেমন ব্যবধান হতো না, তবে উভয়ের আযানের মধ্যে বেশ ব্যাবধান হতো। অতএব হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসের সাথে উপরোক্ত বক্তব্যের বৈপরীত্য থাকে না। তা ছাড়া কেউ কেউ বলেছেন, দু'জনের আযানের মধ্যে ব্যবধান ছিল অল্প সময়। সময়ের স্বল্পতা নির্দেশ করার জন্য হযরত আয়েশা (রা) কথাটি এরূপ বলেছেন যে, এত সামনে সাহরীব জন্য মানুষের সময় খুব বেশি খরচও হতো না। কেননা তাদের জীবনধারা ছিল সহজ সরল। পানাহার ছিল যৎসামান্য ও খুব সাধারণ। ফলে পানাহারে তেমন সময় তাদের ব্যয় হতো না।[৭৮]

কোন কোন ব্যাখ্যাকারী আযানদ্বয়ের প্রথমটিকে তাহাজ্জুদের আযান বলে অভিহিত করেছেন। এ ব্যাখ্যা শুদ্ধ নয়। কেননা এ দাবীর পক্ষে হাদীসের কোন সমর্থন নেই। তা ছাড়া তাহাজ্জুদসহ কোন নফল নামাযের জন্যই আযান ইকামত নেই। আল্লামা কাসানী (র) লিখেছেন ঃ

لا اذان ولا اقامة فى النوافل لان الاذان الاعلام بدخول وقت الصلوة والمكتوبات هى المختصة بأوقات معينة دون النوافل ولان النوافل تابعة للفرائض فجعل اذان الاصل اذانا للتبع تقديراً .

নফল নামাযের জন্য কোন আযান বা ইকামত নেই। কেননা আযান হল নামাযের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার বিষয়ে মানুষকে অবগত করানো। নফল নামাযের নির্দিষ্ট ওয়াক্ত নেই। নির্দিষ্ট ওয়াক্ত আছে কেবল ফরয নামাযের। তাছাড়া নফল হল ফরযের অধিভুক্ত আমল। তাই অধিভুক্তির কারণে ফরযের আযানই নফলের আযান হিসাবে বিবেচিত। নতুন আযানের অবকাশ কোথায়?[৭৯]

কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে শেষ রাতের আযানদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটি ছিল সাহরীর জন্য। এতটুকু নিশ্চিত। তবে এটি রমযানের সাথে সীমাবদ্ধ ছিল না। কেননা নবী (সা) -এর সময়ে মসজিদে নববী ছিল সার্বক্ষণিক আবাদ মসজিদ। দিবসে যেমন কোন মুহূর্তে মুসল্লী বা ইবাদতকারী থেকে খালি থাকতো না, রাতেও তেমনি আবাদ থাকতো। অনেকে রাতভর সেখানে নামায আদায় করতেন। এই নামাযীগণ যেন বাড়ি ফিরে গিয়ে সাহরী গ্রহণ করে সে দিকে ইশারা করে হাদীসে বলা হয়েছে ليرجع به قائمكم-এ রূপ রাতভর সেখানে ইবাদত বন্দেগী চলত বিধায় সারা বছরই ফজর নামায শুরু ওয়াক্ত তথা غلس এর মধ্যে আদায় করা

৭৭. ইমাম তাহাভী, শারহু মা'আনিল আসার, বাবুত তাযীন লিল ফাজর।

৭৮. আল্লামা নীমবী, আসারুস সুনান, পৃ. ৫৫ ; আল্লামা তকী উসমানী, দরসে তিরমিযী, করাচী ঃ মাকতাবা দারুল উলূম, ১৯৮৮, খ. ১, পৃ. ৪৭১।

৭৯. আল্লামা কাসানী, আল-বাদায়িউস্ সানায়ি', খ. ১, পৃ.।

www.pathagar.com

হত। অথচ অন্য মসজিদের অবস্থা এমন ছিল না বলে সেখানে না غلس এর সময় ফজর পড়া হতো। আর না সেখানে দুই বার আযান দেওয়া হত। তাতে বুঝা যায় যে, সাহরীর জন্য আযান দেওয়া বা গালাস-এর সময় ফজর নামায নিয়মিত পড়া উভয়ই মসজিদে নববীর বিশেষ হুকুম যা অন্যত্র প্রযোজ্য নয়।

দ্বিতীয় বিষয় হল যে আযানদ্বয়ের কে কোনটি দিতেন। ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদীসগুলোতে দেখা যায় যে, হযরত বিলাল (সা) দিতেন রাত্রিকালীন নামাযের আযান। কিন্তু কোন কোন হাদীস থেকে বুঝা যায় এর সম্পর্ণ বিপরীত অবস্থা। অর্থাৎ হযরত বিলাল (রা) দিতেন ফজর নামাযের আযান আর হযরত আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম (রা) দিতেন রাত্রিকালীন আযান। যেমন ঃ

عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمَّتِهِ أُنَيْسَةَ قَالَتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ ابْنَ اُمِّ مَكْتُوْمٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى تَسْمَعُوْا نِدَاءَ بِلَالٍ .

أخرجه الطحاوى فى شرح معانى الاثار ، تحت باب التاذين للفجر اى وقت هو بعد طلوع الفجر او قبل ذلك ، وايضا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان المنذر وابن حجر العسقلانى فى فتح البارى .

হযরত খুবাইব ইবন আবদুর রহমান তাঁর ফুফু হযরত উনাইসা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, ইবন উম্মে মাকতূম আযান দেয় রাত্রিকালীন সময়ে। কাজেই তোমরা পানাহার অব্যাহত রাখতে পার যতক্ষণ না তোমরা বিলালের আযান শুনতে পাও।[৮০]

عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلاً اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَغْتَرُّوْا بِاَذَانِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَلٰكِنَّ اَذَانَ بِلَالَ .

হযরত উরওয়া থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা ইবন উম্মে মাকতূমের আযানে বিভ্রান্ত হয়ো না। তবে বিলালের আযান-এর প্রতি খেয়াল রেখো।[৮১]

এ হাদীসদ্বয় থেকে বুঝা যায়, আযানদ্বয়ের মধ্যে সাহরীর জন্য প্রথম আযান দিতেন হযরত আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম আর ফজরের জন্য দ্বিতীয় আযান দিতেন হযরত বিলাল (রা) যা পূর্বোক্ত আলোচনার সম্পূর্ণ বিপরীত।

উপরোক্ত বৈপরীত্যের সমাধানে মুহাক্কিকগণ বলেন, দুই রকম বর্ণনার উভয়ই সঠিক, তবে প্রত্যেকটি ছিল ভিন্ন ভিন্ন সময়ের। আসল ঘটনা নিম্নরূপ ঃ

---

৮০. ইমাম তাহাভী, শারহু মা'আনিল আসার, বাবুত তাযীন লিল ফাজর ; আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী বলেন, হাদীসখানা ইবন খুযায়মা, ইবন হিব্বান, ইবনুল মুনযির প্রমুখ ইমামগণও বর্ণনা করেছেন।

৮১. আল মাতালিবুল আলীয়া, খ. ১, পৃ. ১৬৪ নং ২২৮।

www.pathagar.com

শুরুর দিকে হযরত ইবন উম্মে মাকতূম দিতেন রাতের আযান আর হযরত বিলাল দিতেন ফজরের আযান। কিন্তু কিছু দিন পর দেখা গেল, হযরত বিলালের চোখে সমস্যা দেখা দিয়েছে। দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে আসছে। ফলত তিনি ওয়াক্ত নিরূপণে মাঝে ভুল করে ফেলেন। কখনো ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগেই আযান দিয়ে দেন। তাতে মহানবী (সা) তাঁকে দিয়ে ভুল হয়ে গিয়েছে মর্মে রায় ঘোষণা দেওয়ান।[৮২]

তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে ঃ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ بِلاَلاً اَذَّنَ بِلَيْلٍ فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ مُنَادِيْ اَنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ (اى نسى عن وقت صلوة الصبح)

أخرجه الامام الترمذى تحت باب ما جاء فى الاذان بالليل .

হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত একবার হযরত বিলাল রাত বাকী থাকতেই আযান দিয়ে দেন। তখন মহানবী (সা) তাঁকে এ মর্মে পুনরায় ঘোষণা দিতে আদেশ করেন যে, বান্দা ঘুমিয়ে গিয়েছিল, তাই ফজরের ওয়াক্ত নিরূপণে ভুল করে ফেলেছে।[৮৩]

হযরত বিলালের ওয়াক্ত নিরূপণে ভুল হয়ে যায় বিধায় মহানবী (সা) অন্যদেরকে বিভ্রান্ত হতে নিষেধ করেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغُرَّنَّكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ فَاِنَّ فِيْ بَصَرِهِ شَيْئًا .

أخرجه الطحاوى تحت باب التاذين للفجر

হযরত কাতাদা হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদেরকে বিলালের আযান বিভ্রান্ত না করে। কেননা তার চোখে সামান্য ত্রুটি আছে।[৮৪]

নবী (সা) ও সাহাবীগণও তাই সাহরীর সময় বিলালের আযানের উপর নির্ভরশীল থাকতেন না বরং নিজেরাও ওয়াক্ত যাচাই করে নিতেন।[৮৫]

যেমন নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

عَنْ شَيْبَانَ قَالَ تَسَحَّرْتُ ثُمَّ اَتَيْتُ الْمَسْجِدَ فَاسْتَنَدْتُ اِلَى حُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَاَيْتُهُ يَتَسَحَّرُ فَقَالَ اَبَا يَحْىٰ قُلْتُ نَعَم قَالَ هَلُمَّ اِلَى الْغَدَاءِ قُلْتُ اِنِّىْ اُرِيْدُ الصِّيَامَ قَالَ وَاَنَا اُرِيْدُ الصِّيَامَ وَلٰكِنَّ مُؤَذِّنَنَا هٰذَا فِىْ

৮২. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৬।

৮৩. ইমাম তিরমিযী, প্রাগুক্ত।

৮৪. ইমাম তাহাভী, প্রাগুক্ত।

৮৫. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৬।

www.pathagar.com

بَصَرِهِ سُوْءٍ اَوْ قَالَ شَيْءٍ ، وَاِنَّهُ اَذَّنَا قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ الطَّعَامُ وَكَانَ لَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يُصْبِحُ .

رواه الطبرانى وقال الحافظ فى الرواية اسناده صحيح كما فى اثار السنن ص ٥٦ أبواب الاذان ، باب ما جاء فى اذان الفجر قبل طلوعه .

হযরত শায়বান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি সাহরী খেয়ে মসজিদে নববীতে আসলাম। আমি মহানবী (সা)-এর হুজরার সাথে হেলান দিয়ে বসে দেখি মহানবী (সা) সাহরী গ্রহণ করছেন। মহানবী (সা) আমাকে বললেন, আবূ ইয়াহইয়া! আমি বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, আস আহারে অংশগ্রহণ কর। আমি বললাম, আমি রোযা রাখার ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, আমিও রোযা রাখার ইচ্ছা করেছি। তবে আমাদের এই মু'আয্যিনের দৃষ্টিশক্তিতে কিছু ত্রুটি আছে তাই সে সুবহে সাদিকের আগেই আযান দিয়ে ফেলে। তারপর তিনি বের হয়ে মসজিদের দিকে আসেন। তখন সুবহে সাদিক হয়। তিনি সুবহে সাদিকের আগে আযান অনুমোদন করতেন না।[৮৬]

এ হাদীসগুলো প্রমাণ করছে যে, দৃষ্টিশক্তির ত্রুটিজনিত কারণে হযরত বিলালের বেশ ভুল হয়ে যেত। উল্লেখ্য হযরত বিলাল (রা) যে ফজরের আযান দিতেন এবং তাঁর আযানের পরে পানাহার বন্ধ না করার যে সব নির্দেশ হাদীসে দেওয়া আছে সেগুলো এ সময়েই দেওয়া নির্দেশ। অতঃপর হযরত বিলালের এই সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করলে মহানবী (সা) মু'আয্যিনদ্বয়ের দায়িত্ব পরিবর্তন করে দেন। তখন হযরত বিলালকে ফজরের আযান থেকে সরিয়ে রাতের আযানের দায়িত্ব দেন। আর হযরত ইবন উম্মে মাকতূমকে রাতের আযানের পরিবর্তে ফজরের আযানের জন্য নিযুক্ত করেন। উদ্দেশ্য হল, হযরত বিলালের ভুল হয়ে গেলেও তা যেন নামাযের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধার সৃষ্টি করতে না পারে। আর এ দিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম (রা) ছিলেন অন্ধ সাহাবী। নিজে সুবহে সাদিক দেখে তার আযান দেওয়ার সুযোগ ছিল না। লোকেরা তাকে বলত, যাও, আযান দাও, ভোর হয়ে গিয়েছে তখন তিনি আযান দিতেন।[৮৭]

বিষয়টি বুখারী গ্রন্থে হাদীসে নিম্নরূপ বর্ণিত আছে,

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىْ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ثُمَّ قَالَ وَكَانَ رَجُلاً اَعْمٰى يُنَادِىْ حَتّٰى يُقَالُ لَهُ اَصْبَحْتَ اَصْبَحْتَ .

أخرجه الامام البخارى تحت باب اذان الاعمى اذا كان له من يخبره

হযরত সালিম ইবন আবদুল্লাহ তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, বিলাল রাতের আযান দেয়। কাজেই তোমরা পানাহার

৮৬. আল্লামা নীমবী, প্রাগুক্ত, বাবু মা জাআ ফী আযানিল ফাজরি কাবলা তুলূয়িহী, পৃ. ৫৬।

৮৭. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

অব্যাহত রাখতে পার যতক্ষণ না আযান দিবে ইবন উম্মে মাকতূম। তারপর মহানবী বলেন, আর ইবন উম্মে মাকতূম একজন অন্ধ মানুষ। সে আযান দিতে পারে না যতক্ষণ না লোকেরা তাঁকে বলে, সকাল হয়ে গিয়েছে, সকাল হয়ে গিয়েছে।[৮৮]

উল্লেখ্য হাদীসগুলোকে এভাবে স্থাপন করা হলে গোটা বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং তখন দুই হাদীসের বক্তব্য কোন বৈপরীত্য অবশিষ্ট থাকে না। দু'টি বিষয় আলোচনার পর এবার মূল বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা যাচ্ছে।

ওয়াক্তের আগে আযান দিলে ওয়াক্ত হওয়ার পর পুনরায় আযান দিতে হবে কিনা এটি নির্ভর করে এ কথার উপর যে ওয়াক্তের আগে প্রয়োজন নেই। আর যদি অবকাশ না থাকে তাহলে অবশ্যই ওয়াক্ত হওয়ার পর পুনরায় আযান দিতে হবে। জমহূর ফুকাহার মতে যুহর আসর, মাগরিব ও এশার নামাযে ওয়াক্তের আগে আযানের অবকাশ নেই। কাজেই কোন সময় যদি এ নামাযসমূহের আযান ওয়াক্তের আগে হয়ে যায় তাহলে ওয়াক্ত হওয়ার পর পুনরায় আযান দিতে হবে। অবশিষ্ট রইল ফজরের নামায। এ ক্ষেত্রে ফকীহগণের দু'টি মত পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন, এখানে ওয়াক্তের পূর্বেও আযানের অবকাশ আছে। তাদের মতে ফজরে ওয়াক্ত হওয়ার পর পুনরায় আযানের প্রয়োজন নেই। ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল এরূপ অভিমতই প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে কেউ কেউ বলেছেন যে, অন্যান্য নামাযের ন্যায় ফজর নামাযেও ওয়াক্তের পূর্বে আযানের অবকাশ নেই। কাজেই ওয়াক্ত হওয়ার পর ফজরের ক্ষেত্রেও পুনরায় আযান দিতে হবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) এরূপ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন।[৮৯]

যাহোক ফজর নামাযে ওয়াক্তের আগে আযান দেওয়া যায় কিনা এ বিষয়ে মহানবী (সা)-এর হাদীসে প্রাপ্ত বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

عَنْ شَدَّادٍ عَنْ بِلَالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ لاَ تُؤَذِّنْ حَتّٰى يَسْتَبِيْنَ لَكَ الْفَجْرُ هٰكَذَا وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا .

হযরত শাদ্দাদ (র) হযরত বিলাল (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বলেছেন, (হে বিলাল!) যতক্ষণ পর্যন্ত সুবহে সাদিক তোমার কাছে এভাবে স্পষ্ট না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আযান দিবে না। কথাটি বলে মহানবী নিজের হস্তদ্বয় পাশাপাশি লম্বিত করে দেখান।[৯০]

ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয় সুবহে সাদিক থেকে। এ হাদীসে সুবহে সাদিকের পূর্বে আযান দিতে নিষেধ করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় ফজর নামাযে ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া যায় না।

ইমাম আবূ দাঊদ হাদীসখানা উদ্ধৃত করার পর বলেন وشداد لم يدرك بلالا রাবী শাদ্দাদ হযরত বিলাল (রা)-এর সাক্ষাৎ পাননি। আল্লামা সাহারানপুরী (র) বলেন, কথাটি বলে ইমাম

৮৮. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬১৭।

৮৯. আল্লামা কাসানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. আরো দ্র. মাওলানা আবুল হাসান চাটগ্রামী, তানযীমুল আশতাত, হাটহাজারী ঃ আল হেলাল প্রকাশনী, তা.বি. খ. ১, পৃ. ২৫৫-২৫৬।

৯০. ইমাম আবু দাঊদ, আস সুনান, রিয়াদ ঃ দারুস সালাম লিন নাশর ওয়াত তাওযী', এপ্রিল ১৯৯৯, হাদীস নং ৫৩৪।

www.pathagar.com

আবূ দাঊদ হাদীসটির দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। হযরত সাহারানপুরী (র) বলেন, বস্তুত হাদীসকে দুর্বল বলার সুযোগ নেই। কেননা জমহূর মুহাদ্দিসীন شــــداد عن بـلال সনদকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন।[৯১] আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী (র) বলেন, উপরোক্ত হাদীসের সনদ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও সুনানে বাইহাকী গ্রন্থে এ হাদীস হুবহু বর্ণিত হয়েছে। বাইহাকীর হাদীস সর্বপ্রকার অভিযোগমুক্ত। সেখানে আছে انه ﷺ قال। মহানবী (সা) ইরশাদ করেন, হে বিলাল! সুবহে সাদিক উদিত হওয়া পর্যন্ত ফজরের আযান দিও না।[৯২]

عَنْ حَفْصَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِنْتِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْفَجْرِ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ وَحَرَّمَ الطَّعَامُ وَكَانَ لاَ يُؤَذِّنُ حَتّٰى يُصْبِحَ .

أخرجه الطحاوى فى شرح معانى الاثار تحت باب التاذين للفجر اى وقت هو الخ

হযরত হাফসা বিনত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিয়ম ছিল যে, মু'আয্যিন ফজরের আযান দিলে তিনি দাঁড়িয়ে দুই রাক'আত নামায পড়তেন। তারপর বেরিয়ে মসজিদে চলে যেতেন। তখন খাবার দাবারও নিষিদ্ধ হয়ে যেত। তাঁর নিয়ম ছিল যে, তিনি সুবহে সাদিক হওয়ার আগে আযান দিতেন না।[৯৩]

এ হাদীসে ----কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইমাম তাহাভী (র) বলেন, তা থেকে বুঝা যায় যে, ফজরের জন্য সুবহে সাদিকের আগে আযান দেওয়ার অভ্যাসই তাদের ছিল না।

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ مَا كَانُوْا يُؤَذِّنُوْنَ حَتّٰى يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ .

أخرجه الامام ابن أبى شيبة تحت باب من كره أن يوذن المؤذن قبل الفجر ، وأخرجه الحافظ ابن عبد البر فى التمهيد وأيضا ذكره أبو الشيخ فى كتاب الاذان وذكره الحافظ فى الدراية وعزاه الى أبى الشيخ فى كتاب الاذان وقال باسناد صحيح وقال ابن التركمانى فى الجوهر النقى هذا سند صحيح ، كما فى اثار السنن وحواشيه ص ٥٧

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, (নবী সা-এর যুগে) মুসলমানরা সুস্পষ্টভাবে সুবহে সাদিক উদিত না হওয়া পর্যন্ত আযান দিত না।[৯৪]

৯১. হাশিয়া দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৮।

৯২. আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, বাবু আন লা-ইউআয্যানু কাবলাল ফাজরি।

৯৩. ইমাম তাহাভী, প্রাগুক্ত, বাবুত তাযীন লিল ফাজরি।

৯৪. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৮।

www.pathagar.com

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ بِلاَلاً اَذَّنَ بِلَيْلٍ فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُنَادِيْ اَنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ .

أخرجه الامام الترمذى وأبو داؤد والطحاوى ودار قطنى وغيرهم ، وقال الترمذى هذا حديث غير محفوظ .

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত একদা হযরত বিলাল (রা) রাত থাকতেই আযান দিয়ে দেন। ফলে মহানবী (সা) এ মর্মে ঘোষণা দিতে আদেশ করেন যে, ان العبد قد نام বান্দা ঘুমিয়ে গিয়েছিল।[৯৫]

সুনান বায়হাকী গ্রন্থে এ ঘটনা আরো স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় ঃ

عن عبد العزيز بن ابى رواد عن نافع عن ابن عمر رضى اللّٰه عنه اَنَّ بِلاَلاً اَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا حَمَلَكَ عَلٰى ذٰلِكَ فَقَالَ اسْتَيْقَظْتُ وَاَنَا وَسْنَانُ وَظَنَنْتُ اَنَّ الْفَجْرَ طَلَعَ فَاَمَرَهُ اَنَّ يُنَادِيْ بِالْمَدِيْنَةِ ثَلاَثًا اِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ ثُمَّ اَقْعَدَهُ اِلٰى جَنْبِهٖ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ ،

قَالَ النيموى اسناده حسن ، كما فى اثار السنن .

আবদুল আযীয ইবন আবূ রাওয়াদ নাফি' ইবন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, হযরত বিলাল ফজর নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই আযান দিয়ে দেন। এখন মহানবী (সা) তাঁকে বললেন, তুমি এমনটি করলে কেন? তিনি বললেন, আমি ঘুম থেকে জাগলাম বটে কিন্তু ঝিমাচ্ছিলাম। আমার মনে হয়েছিল বুঝি ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছে। তখন মহানবী (সা) তাঁকে আদেশ করলেন তিনি যেন মদীনায় তিনবার এভাবে ঘোষণা দেন ان العبد قد نام বান্দা ঘুমিয়ে গিয়েছিল। (তাই ভুল হয়ে গিয়েছে) তারপর তাকে মহানবী (সা) নিজের পাশে ফজরের ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত বসিয়ে রাখেন।[৯৬]

আল্লামা নীমবী (র) বলেন, ইমাম বায়হাকী (র) বর্ণিত এ হাদীস সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। কোন মুহাদ্দিস তাতে কোন আপত্তি দেখাননি। এ হাদীস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, ফজর নামাযে ওয়াক্ত হওয়ার আগে আযান দেওয়া যায় না। যদি দেওয়া যেত তাহলে মহানবী (সা) হযরত বিলালকে দিয়ে ভুল হয়ে যাওয়ার ঘোষণা প্রদান করতেন না।[৯৭]

ইমাম তিরমিযী বর্ণিত হাদীসখানার উপর هذا حديث غير محفوظ উক্তি করে দুটি আপত্তি উত্থাপন করেন। এক. হাদীসখানা রাবী হাম্মাদ ইবন সালামা থেকে এককভাবে বর্ণিত। তার বর্ণনার সাথে অন্য কেউ শরীক নেই। আর তিনিও ঘটনার বর্ণনায় ভুল করে ফেলেছেন। কেননা প্রকৃত ঘটনা ছিল হযরত উমর (রা)-এর মু'আয্যিন হযরত মাসরূহের সম্পর্কে। রাবী

৯৫. ইমাম আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৩২।

৯৬. আল্লামা নীমবী, প্রাগুক্ত, সূত্র ঃ দারসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৯।

৯৭ প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ভুলক্রমে মাসরূহের ঘটনাকে হযরত বিলালের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। হযরত উমর (রা)-এর মু'আয্যিন ছিলেন মাসরূহ। তিনি একবার ফজর নামাযের ওয়াক্তে ভুল করেন এবং ওয়াক্তের আগেই আযান দিয়েছেন। ফলে হযরত উমর (রা) তাঁকে পুনরায় ওয়াক্ত হওয়ার পর আযান দিতে হুকুম দেন। রাবী এটিকেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মু'আযযিন হযরত বিলালের সঙ্গে মিলিয়ে দেন।[৯৮]

বিশেষজ্ঞ আলিমগণ বলেন, বস্তুত হাম্মাদ ইবন সালামা একজন সিকা রাবী। তাই তাঁর تفـرد (একক বর্ণনা) ক্ষতিকর নয়। তাছাড়া ব্যাপক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় এই বর্ণনায় তিনি এককও নন। কেননা সুনানে দারা কুতনী গ্রন্থে রাবী সাঈদ ইবন যারবী তাঁর মুতাবা'আত করেছেন। এরূপ ইমাম দারা কুতনী অপর একটি সনদ যথা ইমাম কাযী আবূ ইউসুফ সাঈদ ইবন আবূ আরূবা কাতাদা আনাস (রা)-এর সূত্রে রাবী হাম্মাদ ইবন সালামার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম বায়হাকী অপর একটি সনদ যথা ইবরাহীম ইবন আবদুল আযীয ইবন আবদুল মালিক ইবন মাহযূরা আবদুল মালিক ইবন মাহযূরা-আবদুল আযীয ইবন আবূ রাওওয়াত নাফি' ইবন উমর (রা)-এর সূত্রে হাম্মাদ ইবন সালামার মত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ সব বর্ণনা বিদ্যমান বিধায় রাবী হাম্মাদকে মুতাফাররিদ (একক বর্ণনাকারী) বলার সুযোগ নেই।[৯৯] অবশিষ্ট রইল হাম্মাদকে ভুলের শিকার হয়েছেন বলে অভিহিত করা। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ইমাম তিরমিযী এ দাবীর সমর্থনে কোন দলীল পেশ করেন নি। হাম্মাদ সকলের মতে একজন সিকা রাবী। কোন সিকা রাবী সম্পর্কে দলীল বিহীন এমন মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই হযরত বিলালের ঘটনা হযরত উমরের মু'আয্যিন মাসরূহের সাথে মিলিয়ে ফেলা হয়েছে বলে যে অভিযোগ উত্থাপিত করা হয় এ অভিযোগ যুক্তিযুক্ত নয়।[১০০]

হাদীসখানার উপর ইমাম তিরমিযী দ্বিতীয় অভিযোগ পেশ করেন যে, বহু হাদীসে স্পষ্ট পাওয়া যায় ان بلالاً يؤذن بليـل হযরত বিলাল (রা) আযান দেন রাতের আযান। তাতে বুঝা গেল রাতের আযানই ছিল তাঁর দায়িত্ব। এমতাবস্থায় ফজরের আগে রাত থাকতেই তিনি আযান দিয়ে ফেলেন বলে মহানবী (সা) তাঁকে ভুল হয়ে গিয়েছে বলে এলান করানোর প্রশ্নই উঠে না।

ইমাম তিরমিযী (র) পেশকৃত এ আপত্তির জবাব ইতিপূর্বে আলোচিত কে কোন আযান দিতেন সেখানে বিস্তারিত বলা আছে। আসল ব্যাপার হল হযরত বিলাল (রা) কিছুদিন ফজরের আযান আবার কিছুদিন সাহরীর আযান দেন। দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ঘটনা। মহানবী (সা) তাঁকে ভুল হয়ে গিয়েছে মর্মে যে ঘোষণা দিতে পাঠান তখন তার যিম্মাদারী ছিল ফজর

---

৯৮. দ্র. জামি তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফিল আযান বিল লাইল।

৯৯. মাওলানা রশীদ আশরাফ সাইফী লিখেছেন,

وانظر لمتابعته وشواهد اثار السنن .. وايضًا له شاهد ضعيف منقطع عند اسحاق بن راهو به فى مسنده عن ابى نصر قال قال بلال اذنت بليل فقال النبى ﷺ منعت الناس من الطعام ولشراب انطلق فاصعد فناد الا ان العبد نام فانطلقت وانا اقول ليت بلالاً لم تلده امه وابتل من نضح دم جنبيه فناديت ثلاثا الا ان العبد نام كما فى المطالب العالية ج ١ ، ص ٦٤ ، رقم الحديث : ٢٢٧

১০০. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৯।

www.pathagar.com

নামাযের আযান দেওয়া। এটি হল প্রথম সময়ের ঘটনা। পরবর্তী কালে দায়িত্ব পরিবর্তন করে দেওয়া হলে বিলাল (র) চলে যান রাতের আযানে আর ইবন উম্মে মাকতূম (রা) চলে আসেন ফজরের আযানে। আর তখনকার সময়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, বিলাল (রা) আযান দেন রাতের আযান। ইমাম তিরমিযী দুই সময়ের দুই ঘটনার হাদীসকে একত্রিত করে ফেলেছেন বলে তাঁর নজরে আপত্তি দেখা দিয়েছে। নতুবা প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে কোন আপত্তি নেই।[১০১]

عَنْ نَافِعٍ اَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوْحٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ يُقَالُ لَهُ مَسْعُوْدٌ اَنَّهُ اَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَاَمَرَهُ عُمَرُ اَنَّ يُنَادِىْ اَنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ ، أخرجه الامام أبو داؤد .

৫. হযরত নাফি' থেকে বর্ণিত, হযরত উমর (রা)-এর জনৈক মু'আযযিন যাকে বলা হত মাসরুহ, অপর বর্ণনায় আছে তাকে বলা হত মাসউদ তিনি একবার ফজর নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই আযান দিয়ে দেন। অতঃপর হযরত উমর (রা) তাকে এ মর্মে ঘোষণা দিতে হুকুম দেন যে, বান্দা ঘুমিয়ে গিয়েছিল।[১০২]

এ হাদীসও প্রমাণ করে যে, ফজরের আযান ওয়াক্তের আগে দেওয়ার সুযোগ নেই। যদি থাকতো তবে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) মু'আযযিনকে উপরোক্ত ঘোষণা দানের আদেশ দিতেন না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ وَالْمُؤْتَمَنُ . أخرجه أبو داؤد والترمذى وأحمد ، الحديث ، صحيح

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, ইমাম হল যিম্মাদার আর মু'আযযিন হল আমানতদার।[১০৩]

এ হাদীসে মু'আযযিনকে আমানতদার বলা হয়েছে। আমানতদারের আমানতদারী তখনই প্রমাণিত হবে যখন সে ওয়াক্ত মত আযান দিবে। কেননা ওয়াক্তের আগে আযান দেওয়া মানে খিয়ানত করা। তাই কোন নামাযেই ওয়াক্তের পূর্বে আযানের সুযোগ নেই।[১০৪]

এ সকল কারণে ফকীহগণের অনেকে বলেন, ফজর নামাযে ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে আযানের অবকাশ নেই। যদি ওয়াক্তের আগে আযান দেওয়া হয় তাহলে ওয়াক্ত হওয়ার পর পুনরায় আযান দিতে হবে। এটিই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও হানাফী ফকীহগণের অভিমত।

তবে এ ক্ষেত্রে দুএকটি হাদীস এমন আছে যেখানে ফজর নামাযে ওয়াক্তের আগে আযান দেওয়ার অবকাশ আছে বলে অনুমান করা হয়েছে। যেমন,

১০১. প্রাগুক্ত।
১০২. ইমাম আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং
১০৩. প্রাগুক্ত, হাদীস নং
১০৪. মাওলানা আবুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫।

www.pathagar.com

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُوَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤْذِنَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ . أخرجه الامام البخارى والامام مسلم .

হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, বিলাল (রা) আযান দেয় রাতে। কাজেই তোমরা পানাহার অব্যাহত রাখতে পার, যতক্ষণ না আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম (রা) আযান দিবে।[১০৫]

عَنْ ابْنِ عُمَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَغُرَّنَّكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ عَنِ السُّحُوْرِ فَانَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، كما فى البذل عن البدائع ،

হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, বিলালের আযান তোমাদেরকে যেন সাহরী খাওয়া থেকে ধোকায় না ফেলে কেননা বিলাল (রা) রাত থাকতে আযান দেয়।[১০৬]

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে বুঝা যায় হযরত বিলাল (রা) রাতে আযান দিতেন। অথচ এশার নামাযের পর রাতে আর কোন জামা'আত নেই। কাজেই এই আযান অবশ্যই ছিল ফজরের আযান-যা ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল। বুঝা গেল ফজর নামাযে ওয়াক্ত হওয়ার আগেও আযান দেওয়া জায়িয। এই অভিমতই গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল।[১০৭]

মুহাক্কিক আলিমগণ বলেন, হযরত বিলাল (রা) রাতে আযান দিতেন। তাঁর এ আযান যদি ফজর নামাযের জন্য দিয়ে থাকতেন তাহলে হযরত ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেও আযান দেওয়ার অনুমতি প্রমাণ হত। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর সেই আযান ফজর নামাযের উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং সেটি ছিল সাহরীর জন্য। আল্লামা আইনী (র) লিখেছেন ঃ[১০৮]

اِنَّ هٰذَا الْاَذَانَ كَانَ لِرَجْعِ الْقَائِمِ وَاِيْقَاظِ النَّائِمِ وَبِهٖ قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَقَالَ لاَ بُدَّ مِنْ اَذَانٍ كَمَا فَعَلَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ .

দ্বিতীয়ত হযরত বিলাল ফজরের আগে যে আযান দেন সেই আযানকে কখনো যথেষ্ট মনে করা হয়নি। বরং ওয়াক্ত হওয়ার পর হযরত ইবন উম্মে মাকতূম (রা) পুনঃ আযান দিতেন। যদি ওয়াক্তের পূর্বেই জায়িয থাকতো তাহলে ওয়াক্ত হওয়ার পর পুনরায় আযান দেওয়ার দরকারই হতো না। বুঝা গেল, প্রথম আযানটি মূলত ফজরের জন্য ছিল না।[১০৯]

---

১০৫. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং

১০৬. মাওলানা আবুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪।

১০৭ প্রাগুক্ত।

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫; আল্লামা আইনী, উমদাতুল কারী, খ. ২, পৃ. ৬৫১।

১০৯. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭।

www.pathagar.com

তৃতীয়ত, ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র) বলেন, হযরত বিলাল (রা) রাতে যেই আযান দিতেন সেটি ছিল রমযান মাসে সাহরী খাওয়ার আযান। আর লোকদেরকে ফজর নামাযে আহবানের যে আযান ছিল সেটি দিতেন হযরত ইবন উম্মে মাকতূম (রা)। হাদীস বিশারদ ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান (র) স্পষ্ট বলেছেন, দুই আযানের এ বিষয়টি ছিল শুধু রমযান মাসে।[১১০]

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে বুঝা যায় যে, হযরত বিলাল (রা) রাতে আযান দিতেন—এতটুকু তথ্যের উপর ভিত্তি করে ফজরের আযান ওয়াক্তের পূর্বেও দেওয়া যেতে পারে বলে প্রমাণ করা কঠিন।

১১০. মাওলানা আবুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫।

www.pathagar.com

তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা ওয়াজিব

নামাযের শুরুতে তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা ওয়াজিব।[১]

এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো নিম্নরূপ ঃ

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ - رواه الترمذى و فى التلخيص الحبير وصححه الحاكم وابن السكن .

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ পবিত্রতা নামাযের চাবি। নামাযের তাহ্‌রীমা হলো তাকবীর ('আল্লাহু আকবার' বলা) ও তার সমাপ্তি হলো তাসলীম ('আস্‌-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্‌' বলা)।[২]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيْرُ وَانْقِضَائُهَا التَّسْلِيْمُ - رواه أبو نعيم فى كتاب الصلاة وقال الحافظ فى التلخيص : انساده صحيح (أثار السنن ، ١-١٣)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, নামাযের চাবি হলো তাকবীর ও তার সমাপ্তি হলো তাসলীম।[৩] শুধু বক্তব্যই নয়, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলও ছিল অনুরূপ।

হাদীস শরীফে আছে ঃ

---

১. হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে 'আল্লাহু আকবার' শব্দ দ্বারা নামায শুরু করা ওয়াজিব। তাই কোন ব্যক্তি যদি এই শব্দটি ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার তা'যীমসূচক অন্য কোন শব্দ দ্বারা তাহ্‌রীমা বাঁধে–তাহলে ওয়াজিব বর্জন করার কারণে তাকে আদায়কৃত নামায পুনরায় পড়তে হবে। এবং এটা ওয়াজিব। দ্রঃ আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, বাবু : ইফতিরাযিত তাহ্‌রীমাহ্‌ ওয়া সুনানিহা, টীকা, করাচী, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ্‌, ১৪১৪হি. হাদীস নং ৬৫০, খণ্ড ২, পৃ. ১৭৮।

২ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, আত-তালখীসুল হাবীর গ্রন্থেও উল্লিখিত হয়েছে। ইমাম হাকিম ও ইবনুস্‌ সাকান হাদীসটিকে 'সহীহ' বলেছেন। দ্র. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯; হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেছেন ঃ هذا اصحّ شيء في هذا الباب وأحسن "এ অধ্যায়ে এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও উত্তম হাদীস"। তাছাড়া এই হাদীসটি শুধু ইমাম নাসাঈ (র) ব্যতিত সিহাহ্‌ সিত্তার অন্য পাঁচ ইমাম বর্ণনা করেছেন। দ্র. ইমাম শাওকানী (১২৫৫হি.), নায়লুল আওতার, বাবু : ইফতিরাযী ইফতিতাহিহা বিত-তাকবীর, বৈরূত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, হাদীস নং ৬৬২, ১৯৯৫ খ্রী., খণ্ড ২, পৃ. ১৭৭।

৩. হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (২০২-২৭৫ হিঃ) বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী (র) ও বর্ণনা করেছেন এবং বিশুদ্ধ বলেছেন। ইমাম নাসাঈ ও ইমাম ইব্‌ন মাজাও উল্লেখ করেছেন। দ্র. নায়লুল আওতার, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৬৪, পৃ. ১৮০।

www.pathagar.com

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسَوِّىْ صُفُوْفَنَا اِذَا قُمْنَا اِلَى الصَّلَاةِ - فَاِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ- رواه أبو داؤد

নু'মান ইবন বাশীর (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমরা যখন নামাযে দাঁড়াতাম, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কাতার সোজা করে দিতেন। তারপর যখন আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াতাম তখন তিনি 'তাকবীর' বলতেন।[৪]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) 'আল্লাহু আকবার' ব্যতিত আল্লাহ তা'আলার তা'যীমসূচক অন্যান্য শব্দের দ্বারাও তাহ্‌রীমা বাঁধাকে জায়িয বলেছেন। এর কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى 'এবং সে তার প্রভুর নাম নিল অতঃপর নামায পড়ল।' (সূরা আলা, ৮৭ : ১৫)

এই আয়াতে আল্লাহর নামে নামায শুরু করার কথা বলা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্‌র নামের স্মরণ وذكر اسم ربه কথাটির পরপরই (ف) বর্ণযোগে (فصلّى) নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে। যা কোনরূপ বিরতি ব্যতিরেকে একটার পর অপরটি সংঘটিত হওয়াকে বুঝায়। সুতরাং আলোচ্য বৈকারণিক নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ্‌র নামের যিকর (تكبيرة الافتتاح) এর পরপরই সূচিত হবে নামায এবং এও লক্ষণীয় অত্র আয়াতে আল্লাহ'র নামটি ব্যাপক (مُطْلق) রাখা হয়েছে। সুতরাং اخبار احاد দ্বারা এটাকে বিশেষ কোন শব্দের সাথে مقيّد করা জায়িয হবে না।[৫]

তাছাড়া 'তাকবীর' শব্দটির অর্থেও যথেষ্ট ব্যাপকতা আছে। 'তাকবীর' শব্দটি যেমন 'আল্লাহু আকবার' বলার অর্থে ব্যবহৃত হয়, তেমনি তা'যীম প্রকাশ করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

«وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا» اى عظّمه تعظيماً

'উত্তমরূপে তাঁর 'তাকবীর' কর' অর্থাৎ তা'যীম কর। (সূরা ইস্‌রা, ১৭ : ১১১)

---

৪. হাদীসটি আবূ নু'আইম কিতাবুস সালাতে এবং হাফিয ইবন হাজার আল-আসকালানী 'আত-তালখীস'-এর বর্ণনা করেছেন। দ্র. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৫১, পৃ. ১৭৯।

৫. মূলত হানাফী মাযহাব ও অন্যান্য মাযহাবের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য হলো, অন্যান্য মাযহাবে ফরয আর ওয়াজিবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এবং সুন্নাত ও ফরযের মাঝখানে আমলের কোন স্তরও নেই। তাই সুন্নাতের উর্ধ্বে গেলেই তা সরাসরি ফরয। তাই (اخبار احاد) দ্বারাও সেসব মাযহাবে ফরয প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে হানাফী মাযহাবে সুন্নাত ও ফরযের মাঝখানে একটি স্তর আছে। যার নাম ওয়াজিব। এর গুরুত্ব সুন্নাতের চাইতে বেশী এবং ফরযের চাইতে কম। অধিকন্তু কেবলমাত্র «قطعى الثبوت» অকাট্যভাব প্রমাণিকতা ও «قطعى الدلالة» অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন যার বক্তব্য কেবল সেইসব দলীল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধানগুলোই ফরয। পক্ষান্তরে যেসব দলীল অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয় কিংবা তার বক্তব্য (قطعى) দ্ব্যর্থহীন নয় যেসব দলীল দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত বিধানকেও ফরয বলা যাবে না। বরং ফরযের চাইতে একস্তর নিচে যাকে ওয়াজিব বলা হবে। মূলত আলোচ্য মাস'আলার ক্ষেত্রেও যেহেতু 'আল্লাহ তা'আলার নাম'সহ নামায শুরু করার কথা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যা প্রথম শ্রেণীর قطعى الثبوت وقطعى الدلالت দলীল, তাই আল্লাহ তা'আলার যে কোন নামে নামায শুরু করাকে ফরয বলা হয়েছে। আর যেহেতু তাকবীর বা 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করার কথাটি হাদীস শরীফে এসেছে দ্ব্যর্থহীনভাবে তবে তা (قطعى الثبوت) অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়, তাই এটাকে ওয়াজিব স্তরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। [দ্র. মাওলানা তাকী উসমানী, দরস-ই তিরমিযী, বাবু : মা জাআ ফী তাহ্‌রীমিস সালাত ওয়া তাহলীলিহা, দেওবন্দ, দারুল কিতাব, ১৯৮৯ খ্রী., ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৪। শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নৌরী, মা'আরিফুস্‌ সুনান।

www.pathagar.com

«فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ» اى عظمنه

'তারা যখন তাঁকে দেখল অনেক বড় মনে করল' (সূরা ইউসুফ, ১২ : ৩১)

«وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ» أى عظم

'এবং তুমি তোমার রবেরই বড়ত্ব বর্ণনা কর।' (সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ : ৩১)

এ সকল আয়াত দ্বারা এ কথাই ফুটে উঠে যে, 'তাকবীর' শব্দটি তা'যীমের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আল-কুরআনে وذكر اسم ربه فصلى যখন মুতলাক আল্লাহর নামে নামায শুরু করার কথা বলা হয়েছে, তাই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার তাযীমসূচক যে কোন নামে নামায শুরু করলেই নামায সহীহ হয়ে যাবে। অধিকন্তু 'তাকবীর' শেষে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যেও যেহেতু 'তাযীম ব্যাঞ্জক' যে কোন ইলাহী নামের মর্মও নিহিত আছে তাই তা'যীমপূর্ণ আল্লাহ তা'আলার যে কোন নাম দ্বারা নামায শুরু করলেই ওসব হাদীসে উপরও আমল হয়ে যাব। তবে যেহেতু 'আল্লাহু আকবার' শব্দটিও বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত[৬] তাই 'আল্লাহু আকবার' শব্দে নামায আরম্ভ করা ওয়াজিব ; তবে ফরয নয়।[৭]

পুরুষ নামাযে নাভীর নিচে হাত বাঁধবে

নামাযে নাভীর নিচে হাত বাঁধা পুরুষের জন্য সুন্নাত।

قال أبو هريرة رضى الله عنه : اَخْذُ الْاَكُفِّ عَلَى الْاَكُفِّ فِى الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ ، رواه أبو داؤد (١ : ٢٧٥)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন : নামাযে এক হাতে অপর হাত আকর্ষণপূর্বক নাভীর নিচে বাঁধবে।[৮]

اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اَلسُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِى الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ – رواه أبو داؤد

---

৬ ইমাম আবূ দাঊদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ

لَاتَتِمُّ صَلَاةُ اَحَدِكُمْ مِّنَ النَّاسِ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوَضُوْءَ مَوَاضِعَه ثُمَّ يُكَبِّرُ– ورواه الطبرانى بلفظ – ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ

'কোন মানুষের নামাযই পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না সে যথাযথভাবে অযূ করবে অতঃপর তাকবীর বলবে। এই হাদীসটিই ইমাম তাবারানী (তাকবীর বলবে এই স্থলে) অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলবে-অর্থ শব্দে বর্ণনা করেছেন। দ্র. ইমাম শাওকানী, নায়লুল আওতার, খণ্ড ২, পৃ. ১৭৮ (৬৬২ নং হাদীসের অধীনে)।

৭. আল্লামা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী, নতুন সংস্করণ, তাবি, খণ্ড ১, পৃ. ৩৪৬; ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, (টীকা) পৃ. ১৭৯।

৮. সুনান-ই আবু দাঊদ (১ : ২৭৫), ইমাম তাহাভী (শারহু মা'আনিল আসার, বাবু : সু'রিল হিররি-১ ঃ ১১) বর্ণনা করেন ঃ মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) যখন হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এটা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী? উত্তরে তিনি বলেন : আবূ হুরায়রার সূত্রে বর্ণিত সকল হাদীসই রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে প্রাপ্ত। এই বর্ণনা সকল হাদীসই রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে প্রাপ্ত। এই বর্ণনার সকল রাবীই (ثقة) নির্ভরযোগ্য। এতে একথাই প্রমাণিত হয়, হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত সকল হাদীস-ই মারফূ'। অতএব, নামাযের মধ্যে নাভীর নিচে হাত বাঁধাই সুন্নাত। দ্র. আল্লামা যফর আহ্মদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪।

www.pathagar.com

হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ নামাযে সুন্নাত হলো, এক হাত অপর হতের উপর রেখে নাভীর নিচে হাত বাঁধা।[৯]

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ : يَضَعُ يَمِيْنَهُ عَلٰى شِمَالِهٖ فِى الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ - رواه ابن أبى شيبة واسناده حسن - كذا فى اثار السنن (١ : ٧١) مع تعليقة ورواه محمد بن الحسن الامام فى اثاره نحوه (ص : ٢٥)

হযরত ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন : নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে নাভীর নিচে বাঁধবে।[১০] হাদীসটি ইবন আবু শায়বা বর্ণনা করেছেন। এর সনদ হাসান। অনুরূপভাবে হাদীসটি তালীকসহ আসরুস্ সুনানেও (১ ঃ ৭১) বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসানও হাদীসটি তদীয় 'আসার' গ্রন্থে (পৃ. ২৫) বর্ণনা করেছেন।

অধিকন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এও বর্ণিত আছে ঃ

ثَلَاثٌ مِّنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ - تَعْجِيْلَ الْاِفْطَارِ وَتَأْخِيْرًا السُّحُوْرِ وَ اَخْذَ الشِّمَالِ بِالْيَمِيْنِ فِى الصَّلَاةِ وَفِىْ رِوَايَةٍ "وَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ فِى الصَّلَاةِ .

'রাসূলগণের সুন্নাতসমূহ থেকে তিনটি সুন্নাত হলো, বিলম্ব না করে ইফতার করা। সেহরী দেরী করে খাওয়া, নামাযে ডান হাত দ্বারা বাম হাত আকর্ষণ করা।[১১] অন্য বর্ণনায় আছে, নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে নাভীর নিচে বাঁধা।[১২]

---

৯. সুনান-ই ইমাম আবূ দাউদ (ইবনুল আরাবীর নুসখা), বাহ্যত এটা মাওকূফ রিওয়ায়াতে হলেও মারফূ' এর মানে উন্নীত। কেননা, তাদরীবুর রাবী গ্রন্থে আছে (পৃ. ৬২) কোন সাহাবী যখন বলেন : (أمرنا بكذا) আমাদেরকে এই রকম আদেশ করা হয়েছে; (نهينا عن كذا) এই ধরনের বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে; (من السنة كذا) সুন্নাত হলো এই... তাহলে জমহুর এর বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এই জাতীয় কথার মত মর্ম হলো, এটা (مرفوع) মারফূ' হাদীস। হাদীসটি মুসনাদে (ইমাম আহমাদেও উদ্ধৃত হয়েছে। কানযুল উম্মালের ভূমিকায় আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন; মুসনাদে আহমাদের সকল হাদীস-ই মাকবূল। এর দুর্বল হাদীসও 'হাসান'-এর কাছাকাছি পর্যায়ের। হাফিয ইবন হাজার, আল্লামা হায়সামী (র) এবং তাদরীবুর রাবীর বর্ণনা মতে এই হাদীসটি কমপক্ষে 'হাসান' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২; মাওলানা তকী ওসমানী, দারস-ই তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ২৪।
হযরত আনাস (রা) বলেছেন ঃ
ثَلَاثٌ مِّنْ اَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ - تَعْجِيْلُ الْاِفْطَارِ ، تَأْخِيْرُ السُّحُوْرِ وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى فِى الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ
নবুওয়াতের আখ্লাক হলো তিনটি। ১. বিলম্ব না করে ইফতার করা, বিলম্বে সাহ্রী খাওয়া এবং নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভীর নিচে বাঁধা। দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

১০. দ্র. ইলাউস সুনান, হাদীস নং ৬৭৫।

১১. হাদীসটি ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম তাবরানী তদীয় 'আল-কাবীর' গ্রন্থে (১১৪৮৫) উল্লেখ করেছেন। আল-মাজমা' গ্রন্থে (২ : ১০৫) আছে, [ورجاله رجال الصحيح] এই হাদীসের সকল রাবী-ই সহীহর রাবী। ইমাম বায়হাকী হযরত আয়েশা (রা)-এর সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন اسناده صحيح এর সনদ সহীহ। দ্র. ইমাম কাসানী, বাদাইউস-সানাই', কিতাবুস সালাত, বয়ানু মাহাল্লি ওয়াযইল ইয়াদায়ন, দেওবন্দ, মাকতাবাতু যাকারিয়াহ, ১৯৯৮ খ্রী., খণ্ড ১, পৃ. ৪৬৯।

১২. হাদীসটি ইমাম আহমদ তদীয় মুসনাদে, ইমাম আবূ দাউদ তদীয় সুনানে (হাদীস : ৭৫৬), দারা কুতনী তদীয়, সুনানে (১ : ১৮৬) বায়হাকী তদীয় 'আস-সুনানুল কুবরা' (২/৩১) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। দ্র. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আলোচ্য মাস'আলাটিতে ফকীহ্গণের মধ্যে সামান্য মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র) থেকে এ মর্মে দু'টি মত পাওয়া যায়। ১. সীনার নিচে হাত বাঁধবে। ২. সীনার উপরে বাঁধবে। ইমাম আহমাদ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে তিনটি মত। ১. সীনার নিচে; ২. নাভীর নিচে এবং ৩. ইখতিয়ার দু'টির যেটা খুশী গ্রহণ করতে পারে। যদিও ইবনুল হুবায়রা (র) বলেছেন ঃ ইমাম আহমাদ (র)-এর প্রসিদ্ধ মত হলো, নাভীর নিচে হাত বাঁধার পক্ষে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর দু'টি মতের মধ্যে প্রথম মতটির কথাই শাফিঈ মাযহাবের আধিকাংশ কিতাব–সবিশেষ কিতাবুল 'উম্ম'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। এবং ইমাম (র) থেকেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম আযম আবূ হানীফা, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ইবন রাহ্ওয়াহ্, আবূ ইসহাক মারূযী আশ-শাফিঈর (র) মত হলো, হাত বাঁধতে হবে নাভীর নিচে।

ফকীহ্গণের এই মতবিরোধের মূল কারণ হলো হযরত ওয়াইল ইবন হুজ্র (রা)-এর রিয়াওয়াতের শব্দগত বিভিন্নতা। সহীহ্ ইবন খুযায়মায় হযরত ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নামাযে সীনার উপর হাত বাঁধবে। মুসনাদে বাযযার থেকে তাঁরই সনদে বর্ণিত হয়েছে। [عند صدره] সীনার কাছে। আবার মুসান্নাফ ইব্ন আবু শায়বাতে একই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে [تحت السّرة] হাত নাভীর নিচে বাঁধবে।

বর্ণনায় শব্দগত এই বিভিন্নতার কারণে ইমামগণের মতেও বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (রা) উপরে উল্লিখিত দলীলসমূহের আলোকে মুসান্নাফ ইবন আবু শায়বার বর্ণনাকে প্রধান্য দিয়েছেন। বলেছেন ঃ হাত নাভির নিচে বাঁধবে।[১৩]

তাকবীরে তাহ্রীমা ও ফাতিহা পাঠের মাঝে সানা পড়া মুস্তাহাব

নামাযের প্রারম্ভে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পূর্বে সানা পড়া মুস্তাহাব।[১৪] এ মর্মে হাদীস শরীফের ভাষ্য খুবই স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো ঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ : اَنَّهُ كَانَ اِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ اُذُنَيْهِ يَقُوْلُ : سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ - رواه الطبرانى فى الاوسط ورجاله موثقون - مجمع الزوائد .

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকবীর বলার সময় উভয় হাত কান পর্যন্ত উঁচু করতেন এবং "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাস্মকু ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গায়রুকা (ছানা)" পাঠ করতেন।[১৫]

---

১৩. আল্লামা তাকী উসমানী, দারস-ই-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ১৯।

১৪. এটা হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদসহ জুমহুরে সাহাবা ও তাবিঈনের মাসলাক। একমাত্র ইমাম মালিক ব্যতিত এবিষয়ে অন্য কেউ ভিন্নমত পোষণ করেননি। মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ৩৪৯।

১৫. হাদীসটি ইমাম তাবরানী 'আল-আওসাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এর সকল রাবী-ই (ثقة) নির্ভরযোগ্য। মাজমাউয যাওয়াইদ, ১ : ১৮৪ [النسخة الهندية], ২ : ১০৭ [النسخة البيروتية], দ্র. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৭৯, পৃ. ২০১

www.pathagar.com

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا اِذَا فَتَحْنَا الصَّلاَةَ اَنْ نَّقُوْلَ : سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ - وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعلمنا ويقول : كان رسول الله ﷺ يقوله . رواه الطبرانى فى الاوسط أبو عبيدة لم يسمع عن ابن مسعود ، كذا فى مجمع الزوائد .

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের এই মর্মে শিক্ষা দান করতেন, আমরা যেন নামায শুরু করার সময় এই দু'আটি পাঠ করি ঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা...." আর উমর (রা)ও আমাদেরকে (এই) শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন রাসূলুল্লাহ (সা)ও এই দু'আ (সানা) পাঠ করতেন।[১৬]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ : سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ - رواه أبو داؤد .

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শুরু করার সময় নিয়মিতই বলতেন, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা.....[১৭]

عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : اَنَّهُ كَانَ اِذَا كَبَّرَ لِلصَّلاَةِ قَالَ : سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ - رواه الدار قطنى - وقال هذا صحيح عن عمر رضى الله عنه قوله .

'আল-মুগনী (المغنى) তে আছে, «رواه أنس رضـ واسناد حديثه كلهم ثقات» হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত এই হাদীসের সকল রাবীই (ثقة) নির্ভরযোগ্য। দ্র. মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১।'

১৬. হাদীসটি ইমাম তাবরানী 'আওসাত'-এ বর্ণনা করেছেন। তবে উবায়দা ইবন মাসউদ (রা) থেকে কোন হাদীস শুনেননি। মাযমাউয যাওয়াইদ, ১ : ১৪৮ [النسخة الهندية] ২ : ১০৬ [النسخة البيروتية]; মুহাদ্দিসগণের কাছে এটাই বিশুদ্ধ মত আবু উবায়দা তদীয় পিতার কাছ থেকে হাদীস শুনেননি। এ হিসাবে এই বর্ণনা (رواية) টি মুনকাতি' (منقطع)। তবে এই হাদীসটির ভিন্ন একটি সনদ আছে রাবী আবদুর রহমান-এর সূত্রে। সে হিসাবে এটি 'মাওসূল'। (ফাতহুল বারী, ১ : ২২৪), সর্বোপরি ইমাম দারা কুতনী (রা) হাদীসটিকে তদীয় 'সুনান' গ্রন্থে সহীহ বলেছেন। দ্র. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত নং ৬৮০ {টীকাসহ}, পৃ. ২০১।
অবশ্য আল্লামা আইনী (র) তদীয় 'উমদাতুল ক্বারী' গ্রন্থে একথা (তাবরানীর আল-মু'জামুল আওসাত এর সূত্রে) প্রমাণ করেছেন যে, আর উবায়দা তদীয় পিতা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) এর কাছ থেকে হাদীসটি শোনেছেন। সুতরাং এটি মুনকাতি' বলারও অবকাশ থাকে না। দ্র. প্রাগুক্ত, টীকা, পৃ. ২০২।

১৭. হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (র) তদীয় 'সুনান' গ্রন্থে (বাবু মান রাআল ইস্‌তিফতাহা বিসুবহানাকা ১ : ১৩১ দেওবন্দ) উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবন মাজা, ইমাম দারা কুতনী এবং ইমাম হাকিম ও স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হাফিয মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহিদ বলেছেন, এই হাদীসের রাবীগণের মধ্যে কেউ (مجروح) বিতর্কিত আছেন বলে আমি জানিনা। হাকিম এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং তার (شـاهد) সমর্থনে অন্য বর্ণনারও উল্লেখ করেছেন। হাফিয বলেছেন, এই হাদীসের সকল রাবীই (ثقـة) নির্ভরযোগ্য, তবে এর সনদে ইনকিতা' আছে। দ্র. নায়লুল আওতার, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৮৩, খণ্ড ২, পৃ. ২০১-২০২; ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৮২।

www.pathagar.com

হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি যখন নামাযের তাকবীর তাহ্রীমা বলতেন তখন বলতেন, সুবাহানাকা আল্লাহুম্মা....[১৮]

সারকথা হলো, তাকবীরে তাহ্রীমার পর কিরা'আত শুরু করার পূর্বে দু'আ পড়া মুস্তাহাব, এটা যেমন স্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত তেমনি 'সানা' পড়া যে মুস্তাহাব এটাও বিশুদ্ধ হাদীস, সাহাবায়ে কিরামের আমল ও বিপুল সংখ্যক তাবিঈনের আমল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।[১৯] এও প্রতিষ্ঠিত যে এই দু'আটি (সানা) ইমাম, মুকতাদী এবং মুনফারিদ সকলকেই পড়তে হয়।[২০]

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোন কোন বর্ণনায় একথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে, হযরত উমর (রা) এতটা উচ্চকণ্ঠে সানা পড়তেন যে পেছনের মুকতাদীগণ তা শোনতে পেতেন। অবশ্য ঐসব বর্ণনায় (يُعَلِّمُنَا) তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দান করতেন—একথাটিও আছে। এই উচ্চ কণ্ঠে সানা পাঠ ও শিক্ষাদান বিষয়টির প্রকৃত রহস্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে এই ঘটনা দ্বারা—

ইমাম মুহাম্মদ (র) ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

«أخبرنا أبو حنيفة عن حمّاد عن ابراهيم»

একবার বসরার অধিবাসী কিছু লোক হযরত উমর (রা)-এর সমীপে উপস্থিত হলো। তাদের আসার উদ্দেশ্য ছিল নামাযের ইফতিতাহ্ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। তিনি বলেন ঃ অতঃপর হযরত উমর (রা) উঠে দাঁড়ালেন। নামায আরম্ভ করলেন। তারা সকলেই তাঁর পেছনে। তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন ঃ সুবহানাকাল্লাহুম্মা.....। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ এই বর্ণনাটিই আমরা নামাযের ইফতিতাহ্-এর ক্ষেত্রে অবলম্বন করে থাকি। তবে ইমাম ও মুকতাদী কেউ-ই উচ্চস্বরে সানা পাঠ করবে না। কারণ উমর (রা) উচ্চস্বরে পড়েছিলেন প্রশ্নকারী বসরাবাসীদেরকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে।[২১]

হযরত উমর (রা)-এর এই ঘটনার পর সানা পড়ার ইসতিহ্বাব সম্পর্কে আর কোন অস্পষ্টতার অবকাশ থাকে না।

---

১৮. হাদীসটি ইমাম দারা কুতনী (র) বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এই বক্তব্যটি হযরত উমর (রা) থেকে বিশুদ্ধসূত্রে বর্ণিত। দ্র. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৮৪।

১৯. আল্লামা তোরপুশতী (র) বলেছেন : সানা সম্পর্কিত এই হাদীসটি হাসান এবং মশহুর (حسن و مشهور)। খোলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে হযরত উমর (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদসহ অন্যান্য ফকীহ্ সাহাবীগণ এটাকে গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া সুফিয়ান সাওরী, আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ও ইসহাক ইবন রাহ্ওয়ায় এর মত বিখ্যাত হাদীসবিশারদগণও এটাকে গ্রহণ করেছেন। যদিও ইমাম তিরমিযী তদীয় সনদের রাবী হারিসার স্মৃতিশক্তির সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য মেনে নিলেও সেতো একটিমাত্র সূত্র। হাদীসটি তো একাধিক সূত্রে বর্ণিত। অথচ ইমাম আবূ দাউদ হাদীসটি (حسن) সনদে বর্ণনা করেছেন। দ্র. মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত, মুলতান, মাকতাবা-ই-ইমদাদিয়্যাহ্, তাবি খণ্ড ২. পৃ. ২৭৮; ইমামা আব দাঊদ, সুনান, দেওবন্দ, আশরাফী বুক ডিপো, তা. বি. আল্লামা সিন্ধীকৃত টীকা নং ৩, পৃ. ১১৩।

২০. এটা অধিকাংশ আলিমের মত। তাঁদের মধ্যে হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, হযরত ইবন মাসউদ (রা), নাখ্ঈ, আহমদ ও ইসহাক আছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেছেন, তাবিঈন ও অন্যান্য আহলে ইলমের আমলও এর উপর। দ্র. আল্লামা কাসানী, 'বাদাইউস সানাই', প্রগুক্ত, (টীকাসহ), খণ্ড ১, পৃ. ৪৭১।

২১. শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নৌরী, মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড-২, পৃ. ২৫১।

www.pathagar.com

আরাফা ও মুযদালিফা ছাড়া অন্যত্র দুই ফরয নামায একত্রে আদায় নিষেধ

প্রতিটি নামাযের নির্ধারিত সময় রয়েছে এবং সেই সময়ের মধ্যেই সেই নামায করা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا .

'নিশ্চয় নামায মুসলমানদের জন্য উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।'[২২] (নিস ৪ : ১০৩)

অবশ্য এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু আরাফা ও মুযদালিফার নামায। কারণ, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফা ও মুযদালিফায় দুই নামায একই ওয়াক্তে পড়েছেন বলে বিশুদ্ধ হাদীসে প্রমাণ রয়েছে। যথা—

عن ابن عمر رضى الله عنه : اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيْعًا - كل واحدة منهما باقامة ولم يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا - وَلَا عَلَى اثر واحدة منهما - رواه البخارى والنسائى

হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) মুযদালিফায় মাগরিব এবং এশা একই সাথে এক এক ইকামত আদায় করেছেন এবং দু'য়ের মাঝখনে কোন সুন্নাত নামায পড়েননি।[২৩]

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে এটাই অকাট্য সত্য যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতিটির-ই নির্ধারিত এবং সুনির্দিষ্ট সময় আছে। নামায আদায় করা যেমন আবশ্যক তেমনি সময়মত আদায় করাও অপরিহার্য। এক নামাযকে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য নামাযের সময়ে নিয়ে আদায় করার কোন অবকাশ নেই। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু আরাফা ও মুযদালিফার নামায এবং এটা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত—যা আমরা উপরে পত্রস্থ করেছি। তার এমন কিছু হাদীসও আছে যেগুলের ভাষ্য থেকে বাহ্যত কেউ মনে করতে পারে, দুই নামায বুঝি একই ওয়াক্তে আদায় করার সুযোগ আছে। মূলত বিষয়টি এমন নয়। প্রথমে আমরা এই জাতীয় কয়েকটি বর্ণনা তুলে ধরছি। তারপর এর প্রকৃত মর্মও তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذا دَخَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلٰى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا - فَاِنْ زَاغَتْ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ . متفق عليه .

হযরত আনাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সূর্য হেলে পড়ার পূর্বেই সফরে বের হতেন তখন যুহর নামাযকে আসরের নামাযের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন। অতঃপর

---

২২. اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا—اى : فرضًا محدودًا باوقات معلومة لا يجوز تاخيرها عنه অর্থাৎ : নামায ফরয হয়েছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে। তাই সেই নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্ব করে পড়া জায়েয নেই। দ্র. আল্লামা সাবূনী, সাফওয়াতুত তাফাসীর, কায়রো দারুস-সাবূনী, নবম সংস্করণ, তাবি, খণ্ড ১ পৃ. ৩০২।

২৩. হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসাই বর্ণনা করেছেন। দ্র. ইমাম শাওকানী, নায়লুল আওতার, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১১৭৫ খণ্ড ৩. পৃ. ২৩১

www.pathagar.com

সাওয়ারী থেকে নেমে যুহর ও আসর এক সাথে আদায় করতেন। আর সফর শুরু করার পূর্বেই যদি সূর্য হেলে যেত তাহলে যুহর পড়েই সাওয়ারীতে আরোহন করতেন।[২৪]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : كَانَ فِى السَّفَرِ اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فِىْ مَنْزِلِهٖ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ يَّرْكَبَ، فَاِذَا لَمْ تَزِغْ لَهُ فِىْ مَنْزِلِهٖ سَارَ حَتّٰى اِذَا حَانَتْ الْعَصْرُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَاِذَا حَانَتْ لَهُ الْمَغْرِبُ فِىْ مَنْزِلِهٖ جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، وَاِذَا لَمْ تَحِنْ فِىْ مَنْزِلِهٖ رَكِبَ حَتّٰى اِذَا كَانَتِ الْعِشَاءُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا - رواه أحمد ورواه الشافعى فِىْ مسنده وقال فيه : واذا سَارَ قَبْلَ اَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ حَتّٰى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْعَصْرِ فِىْ وَقْتِ الْعَصْرِ .

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সফর করতেন তখন ঘরেই যদি সূর্য হেলে যেত তা হলে একই সাথে যুহর এবং আসর পড়ে তারপর সাওয়ার হতেন। আর ঘরে থাকতে সূর্য ঢলে না পড়লে সফরে বেরিয়ে পড়তেন, তারপর আসর নামাযের সময় হলে আসর এবং যুহর এক সাথে আদায় করে নিতেন, আর ঘরে থাকতেই মাগরিবের সময় হয়ে গেলে একই সাথে মাগরিব এবং ইশা পড়ে নিতেন। আর সময় না হলে সফর শুরু করে দিতেন এবং ইশার নামাযের সময় মাগরিব ও ইশা একসাথে পড়ে নিতেন।[২৫]

এখানে আরেকটি বিষয় প্রথমেই স্পষ্ট করে নেয়া প্রয়োজন। আর তা হলো এই (جمع) দুই নামায একত্রে পড়ার পদ্ধতি দুই রকম হতে পারে। তাকদীম–অর্থাৎ সময় হওয়ার পূর্বেই নামায আদায় করে নেয়া। যেমন যুহর নামাযের সময় আসরও একই সাথে আদায় করে নেয়া। দ্বিতীয়ত তাখীর (جمع تاخير)—অর্থাৎ নামাযের সময় পার করে তারপর আদায় করা। যেমন আসর নামাযের সময়ে আসর ও যুহর একসাথে আদায় করা। এর মাধ্যে جمع تقديم অর্থাৎ সময় হওয়ার পূর্বেই নামায আদায় করা একমাত্র আরাফা ব্যতিত অন্য কোথাও কোনক্রমেই জায়িয নেই।[২৬]

---

২৪. হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উল্লেখ করেছেন। দ্র. ইমাম শাওকানী, নায়লুল আওতার, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১১৭০।

২৫. হাদীসটি ইমামা আহমাদ (র) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম শাফিঈ (র) তদীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে অনুরূপ শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এবং তাতে এও বলেছেন ; তিনি (সা) যখন সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বেই সফর শুরু করতেন তখন যুহর নামাযকে বিলম্বিত করে আসর নামাযের সময়ে যুহর ও আসর একত্রে আদায় করতেন। দ্র. ইমামা শাওকানী, নায়লুল আওতার, হাদীস নং ১১৭২।

২৬. এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেছেন : ليس فى جمع التقديم حديث قائم অর্থাৎ নামায সময় হওয়ার পূর্বে আদায় করা সম্পর্কে বিশুদ্ধ কোন হাদীস নেই। দ্র. ইমাম শাওকানী, নায়লুল আওতার, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩ পৃ. ২২৬ ; আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮।

www.pathagar.com

তবে جمع تاخير জায়িয আছে কিনা সে বিষয়ে মত প্রকাশের পূর্বে আমাদেরকে আরেকটি বিষয় জানতে হবে। তা হলো এই جمع একসাথে দুই ওয়াক্তে নামায পড়া দুই অর্থ হতে পারে।

১. প্রকৃত অর্থেই একসাথে দুই নামায আদায় করা–অর্থাৎ جمع حقيقى।

২. বাহ্যিক অর্থে (جمع صورى) দুই নামায একসাথে আদায় করা, নইলে প্রকৃত অর্থে প্রতিটি নামায-ই আদায় হবে তার নির্দিষ্ট সময়ে।

আমরা অত্র মাস'আলাটির প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছি, পবিত্র কুরআনে পরিস্কার ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে : "নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।" (নিসা, ৪ ঃ ১০৩) অতএব, প্রতিটি নামাযকে তার নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করতে হবে এটা আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা।[২৭] কাজেই যেসব হাদীসে এর ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে তার অর্থ جمع صورى বাহ্যিকভাবে একত্রে আদায় করা—প্রকৃত অর্থে নয়।

এ সম্পর্কে ইমাম শাওকানী (র) লিখেছেন : হাদীসে উল্লিখিত দুই নামায একত্রে আদায় করাটা প্রকৃত অর্থে নয় বরং বাহ্যিক (صورى) অর্থে। যেমন, যুহর নামাযকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিলম্ব করে তার শেষ ওয়াক্তে পড়েছেন আর আসর পড়েছেন তার প্রথম ওয়াক্তে। যদিও আল্লামা নববী (র) এই সম্ভবনা ও ব্যাখ্যাকে বাতিল ও দুর্বল বলেছেন। কিন্তু হানাফী ফকীহগণ এর উত্তরে বলেছেন : নববী এটাকে দুর্বল বললেও ইমাম কুরতুবী এটাকে উত্তম বলেছেন। ইমামুল হারামাইন (র) এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইবনুল মাজিশূন ও ইমাম তাহাভী (র) এটাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই মতকে আরও বলিষ্ঠ করে তুলেছেন ইবনু সায়্যিদিন-নাস। তিনি বলেন হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে যিনি এই হাদীস বর্ণনা করেন হযরত আবুশ-শা'ছা (র)ও এই মতকে সমর্থন করেছেন। এই বক্তব্যকে একথাও সমর্থন করে যে, এই একত্রে নামায আদায় করণ সম্পর্কিত হাদীসগুলোর সময়ের উল্লেখ নেই। একথা বলেছেন স্বয়ং হাফিয (র)! তাছাড়া যদি এ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো বাহ্যিক অর্থে ব্যবহার করা হয়। তা হলে বিনা কারণে নামাযকে তার নির্ধারিত সময় থেকে বের করার বৈধতাই অপরিহার্য হয়ে পড়বে। অথচ যদি جمع الصورى এর অর্থে ব্যবহৃত হয় তা হলে একই সাথে সকল হাদীসের উপরই আমল হয়ে যায় এবং পরস্পর সমন্বয় সাধিত হয়। সুতরাং এখানে جمع صورى এর অর্থে হাদীসগুলো গ্রহণ করাই উত্তম।

ইমাম নাসাই (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে এ মর্মে যে বর্ণনাটি করেছেন। তা হলো—

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا — اَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَاَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ.

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে যুহর ও আসর একসাথে পড়েছি। তিনি (সা) যুহরকে বিলম্বিত করে পড়েছেন আর আসরকে পড়েছেন প্রথম ওয়াক্তে।

---

২৭ তবে মুসাফির যদি পথে চোর-ডাকাতের আশংকা করে এবং নামায আদায় করতে করতে সঙ্গীরা তাকে ফেলে চলে যাবার ভয় থাকে-তা হলে এই জাতীয় ওযরের কারণে (جمع التاخير) হানাফীদের কাছেও জায়িয আছে [রাদ্দুল মুহ্তার, ১ : ৩৯৭] তবে হানাফী আলিমগণের দৃষ্টিতে সাধারণ সফর কোন ওযর নয়। দ্র. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, ২ : ৯৮।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে মাগরিবকে একটু দেরী করে পড়েছেন আর ইশা পড়েছেন প্রথম ওয়াক্তে। অথচ এই ইবন আব্বাস-ই দুই নামাযকে একত্রে পড়ার সপক্ষে হাদীস (হাদীস নং ১১৭২) বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় তিনিই যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তাতে একথাই প্রতিভাত হয়ে উঠছে এখানে جمع صورى-ই উদ্দেশ্য, প্রকৃত অর্থেই দুই নামায একত্রে পড়া উদ্দেশ্য নয়।[২৮]

তা ছাড়া (جمع صورى)এর সমর্থনে আরও অনেক বর্ণনা-ই রয়েছে। যেমন—

عَنْ عَـائِشَـةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَـا قَـالَتْ : كَـانَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّـفَـرِ يُؤَخِّـرُ الظُّهْـرَ وَيُقَـدِّمُ الْعَـصْـرَ وَيُؤَخِّـرُ الْـمَـغْـرِبَ وَيُقَـدِّمُ الْعِـشَـاءَ- رواه الطحاوى وأحمد والحاكم واسنده حسن - كذا فى آثار السنن (٢ : ٧٣)

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, সফরে রাসূলুল্লাহ (সা) যুহর নামাযকে দেরী করে (শেষ সময়ে) এবং আসর নামাযকে একটু আগেভাগে (প্রথম ওয়াক্তে) আদায় করতেন। অনুরূপভাবে মাগরিবকে বিলম্বিত করে ইশাকে শুরু ওয়াক্তে আদায় করতেন।[২৯]

عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَاقِدٍ اَنَّ مؤذن ابن عمر رضى الله عنه قال : الصلاة قَـالَ : سِرْ، سِرْ، حَتّٰى اِذَا كَـانَ قَـبْلَ غُـرُوْبِ الشَّـفَقِ نَزَّلَ فَـصَلَّى الْـمَـغْـرِبَ ، ثُمَّ انْـتَظَرَ حَـتّٰى غَـابَ الشَّـفَقُ فَـصَلَّى الْعِـشَـاءَ ، ثُمَّ قَـالَ : اِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا عَجَّلَ بِـهِ اَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِىْ صَنَعْتُ ....

হযরত নাফি' ও আবদুল্লাহ ইবন ওয়াকিদ বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবন উমর (রা) এর মু'আয্যিন বললেন, নামাযের সময় হয়ে গেছে! ইবন উমর (রা) বললেন, সামনে চল, সামনে চল! অনন্তর যখন পশ্চিমাকাশের লালিমা অস্তমিত হবার উপক্রম হলো তখন তিনি অবতরণপূর্বক মাগরিব পড়লেন। তারপর সামান্য সময় ইনতিজার করে লালিমা অস্তমিত হওয়ার পর এশা আদায় করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)ও কোন বিশেষ কারণে যদি তাড়াহুড়ার প্রয়োজন হতো তখন আমার মত এভাবে নামায পড়তেন।[৩০] অর্থাৎ এইভাবে جمع صورى করতেন।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, সফরে যদি তিনি দুই নামাযকে একত্রে পড়তে চাইতেন তা হলে যুহরকে বিলম্বিত করে শেষ ওয়াক্তে পড়তেন আর আসরকে পড়তেন তার প্রথম ওয়াক্তে। অনুরূপভাবে মাগরিবকে বিলম্বিত করে তার শেষ ওয়াক্তে আর এশাকে পড়তেন তার প্রথম ওয়াক্তে। এবং বলতেন ঃ

هكذا كان رسول الله ﷺ يجمع بين الصلاتين فى السفر .

---

২৮. ইমাম শাওকানী, নায়লুল আওতার, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩, পৃ. ২২৯।

২৯. হাদীসটি ইমাম তাহাভী, ইমাম আহমাদ ও ইমাম হাকিম বর্ণনা করেছেন। এর সনদ হাসান। (আসারুস সুনান ২ : ৭৩) দ্র. ই'লাউস্ সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৪৩।

৩০. হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন। এর সনদ সহীহ্ (আসারুস সুনান, ২ : ৭৩) দ্র. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৪৪।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফরে এভাবেই দুই নামাযকে একত্রে পড়তেন।[৩১] বলার অপেক্ষা রাখে না, এটা বাহ্যত দুই নামাযকে একত্রে আদায় করণ মনে হলেও প্রত্যেকটি নামাযকে আদায় করা হচ্ছে তার সময়ে।

সারকথা হলো, এ সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীসকে মন্থন করলে একথাই প্রমাণিত হয় শুধু আরাফা ও মুযদালিফা ব্যতিত অন্য কোথাও দুই নামায একত্রে আদায় করার বিধান শরী'আতে নেই। যেসব হাদীসে এরূপ বাহ্যিক বর্ণনা পাওয়া যায় সেখানে (جمع صوری) বাহ্যিক একত্র-করণের কথা বলা হয়েছে, প্রকৃত অর্থে না।[৩২]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلٰوتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ اَتٰى بَابًا مِّنْ اَبْوَابِ الْكَبَائِرِ - رواه الحاكم

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি বিনা ওযরে দুই নামায একত্রে জমা করল সে কবীরা গুনাহসমূহের থেকে একটি দরজায় এসে উপনীত হল"।[৩৩]

---

৩১. এটি ইমাম বাযযার বর্ণনা করেছেন! এর সনদে ইবন ইসহাক রাবী রয়েছে যিনি সিকাহ্ তবে মুদাল্লিস। (মাজমাউয যাওয়াইদ, ১ : ২০৬) আত-তারগীব গ্রন্থে আছে। (২ : ৫৩) তিনি বিতর্কিত, তবে 'আসানুল হাদীস'—অর্থাৎ তার হাদীস গ্রহণযোগ্য। দ্র. আল্লামা যফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, হাদীস নং ৫৪৯।

৩২. ইমাম শাওকানী, নায়লুল আওতার, প্রাগুক্ত, ২২৯; আল্লামা উসমানী, ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ৯৩-৯৪।

৩৩. হাদীসটি হাকিম (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন উক্ত হাদীসের রাবী হানাশ ইবন কায়িম একজন সিকা রাবী। সর্বোপরি উক্ত হাদীসখানা কুরআনের এবং একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত।

www.pathagar.com

নামাযে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' নিঃশব্দে পড়া উত্তম

নামাযে 'বিস্‌মিল্লাহ' পড়া সুন্নাত। তবে তা নিঃশব্দে পড়া উত্তম। নামাযটি জাহরী হোক অথবা সিররী হোক অর্থাৎ কিরা'আত সরবে পড়া হোক অথবা নীরবে পড়া হোক তাতে কোন পার্থক্য হবে না।[১]

নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হলো ঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسِرُّ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

رواه الطرانى فى الكبير والأوسط ، ورجاله موثوقون ، مجمع الزوائد .

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) 'বিস্‌মিল্লাহির রহামানির রাহীম' নিঃশব্দে পড়তেন। আর আবূ বকর ও উমর (রা) ও (নিঃশব্দে পড়তেন।)[২]

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَكَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، لاَ يَذْكُرُوْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِىْ اَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلاَ فِىْ اٰخِرِهَا (رواه مسلم)

হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা) আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা) পিছনে (মুকতাদী হয়ে) নামায পড়েছি। তাঁরা কিরা'আত শুরু করতেন আল-

---

১. ক. শাইখুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন মুরগীনানী, হিদায়া : দারুল কিতাব, দেওবন্দ ভারত অধ্যায় সালাত। খণ্ড ১, পৃ. ১০৩।
খ. আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী : দুররে মুখতার ; এইচ, এম. সাঈদ কোম্পানী, করাচী পাকিস্তান। অধ্যায় : সালাত; পরিচ্ছেদ সালাতের বিবরণ, খ. ১, পৃ. ৭৩।
গ. আল্লামা মুহাম্মদ ইব্‌ন আবেদীন শামী : রাদ্দুল মুহতার, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত। অধ্যায় সালাত; খ. ২, পৃ. ১৭২।
ঘ. আল্লামা ইউসুফ বানুরী ঃ মা'আবিফুস্‌ সুনান, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া সাহারানপুর, ভারত, অধ্যায় সালাত, পরিচ্ছেদ, বিস্‌মিল্লাহ পড়া প্রসঙ্গে, খ. ২, পৃ. ৩৬৩।

২ আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস্‌ সুনান, দারুল যিকর, লেবানন, পরিচ্ছেদ; আউযুবিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ পড়া এবং তা নিঃশব্দে পড়া সুন্নাত। খ. ২, পৃ. ৭০২, হাদীস নং ৬৯৪।

www.pathagar.com

হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন দ্বারা। তাঁরা কিরা'আতের শুরু এবং শেষে 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়তেন না।[৩] হাদীসখানা ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) 'বিস্মিল্লাহ' নিঃশব্দে পড়তেন। এখানে যদিও পড়ার কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু এর দ্বারা এটা প্রতিভাত হয় যে, তিনি স্বশব্দে বা নিঃশব্দে তা পড়েননি। কেননা কান কিছু উল্লেখ না করার দ্বারা এর গণ্য হওয়া বা অস্তিত্বহীনতা বুঝায় না। তাছাড়া হযরত আনাস (রা) থেকে এতদসংশ্লিষ্ট আরো কতিপয় রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। যথা পূর্বোক্ত ইমাম তাবারাণী, ইব্ন খুযাইমা ও হায়সামী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে সম্পষ্ট বলা হয়েছে যে, নবী করীম (সা) আবূ বকর ও উমর (রা) 'বিস্মিল্লাহ' নিঃশব্দে পড়তেন। সুতরাং এ কথা মানা আবশ্যক যে রাসূলুল্লাহ (সা) ফাতিহার পূর্বে 'বিস্মিল্লাহ' আস্তে পড়েন। অন্যথায় একই রাবী থেকে বিপরীত মুখী দু'ধরনের অভিমত ব্যক্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে। অথচ তা অনুচিত।

ইমাম নববী (র) বলেন, যাঁদের মতে 'বিস্মিল্লাহ' ফাতিহার অংশ নয় আর যাঁদের মতে তা ফতিহার অংশ এবং তা নিঃশব্দে পড়া সুন্নাত তাঁরা এ হাদীসকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। ইমাম নববীর এ উক্তি থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত হাদীসটি বিস্মিল্লাহ নিঃশব্দে পড় সুন্নাত হওয়ার প্রমাণ।[৪]

حدثنا أحمد .... عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلَ قَالَ سَمِعَنِىْ اَبِىْ وَاَنَا فِى الصَّلَاةِ اَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، فَقَالَ اَىْ بُنَىَّ ! مُحَدَّثٌ ، اِيَّاكَ وَالْحَدَثَ ، قَالَ وَلَمْ اَرَ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اَبْغَضَ اِلَيْهِ الْحَدِيْثِ فِى الْاِسْلَامِ يَعْنِىْ مِنْهُ ، وَقَالَ وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعَ اَحَدًا مِنْهُمْ يَقُوْلُهَا فَلَا تَقُلْهَا ، اِذَا اَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

رواه الترمذى وقال حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى ﷺ منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وبخيرهم ومن بعدهم من التابعين ، وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك وأحمد واسحق لا يرون ان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، قالوا ويقولها فى نفسه .

আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফালে এর পুত্র থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমার পিতা (আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফালে) নামাযের মধ্যে আমাকে বিস্মিল্লাহ বলতে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, হে বৎস! এটি তো বিদ্'আত (দীনের মধ্যে নব আবস্কৃত জিনিস) বিদ্'আত থেকে খুব সাবধান থেকো। আরো বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের নিকট ইসলামের

৩. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০২, হাদীস নং ৬৯৫।

৪. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

মধ্যে বিদ্'আত সৃষ্টি অপেক্ষা ঘৃণিত বস্তু আর কোন কিছু দেখিনি। আরো বললেন, আমি নবী করীম (সা), হযরত আবূ বকর, হযরত উমর এবং হযরত উসমান (রা)-এর সাথে নামায পড়েছি; কিন্তু তাঁদের কাউকে এটি বলতে শুনিনি; কাজেই তুমি তা বলবে না। তুমি যখন নামায পড়বে তখন বলবে আল-হামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামীন।[৫]

হাদীসখানা ইমাম তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফালের এ হাদীসটি হাসান। নবী করীম (সা)-এর সাহাবীদের মধ্যে অধিকাংশ আলিম যথা হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান এবং হযরত আলী প্রমুখ এবং তাঁদের পরবর্তীতে তাবিঈনে কেরাম এ হাদীস মোতাবিক আমল করেছেন। এটাই হচ্ছে সুফিয়ান সাওরী, ইবন মুবারক, আহমাদ, ইসহাক প্রমুখের অভিমত। তাঁদের মতে 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' জোরে পড়া যাবে না। তাঁরা বলেন, নামায আদায়কারী ব্যক্তি তা নিঃশব্দে পড়বে।

ইমাম তিরমিযীর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসের মধ্যে لا تقلها (তুমি তা বলবে না) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো لا تَجْهَرْ بِهَا তুমি তা সশব্দে পড়বে না তা ছাড়া হযরত আনাস (র) এর হাদীসে না বলা দ্বারা সশব্দে না বলা বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এ হাদীসে ও না বলা দ্বার সশব্দে না বলাই উদ্দেশ্য হবে।

হাদীসখানার আলোকে এ কথা দিবালোকের ন্যায় ফুটে উঠে যে, নামাযে 'বিস্মিল্লাহ' নিঃশব্দে পড়ার বিষয়টি তাঁদর নিকট উত্তরাধিকারের ন্যায় পরম্পরায় চলে আসা আমল। এটি তাঁরা নবী (সা) থেকে পরম্পরারূপে শেষে এসেছেন। আলোচ্য বিষয়টি প্রামাণের জন্য এরূপ একটি হাদীসই যথেষ্ট। কারণ জাহরী নামায (যাতে কিরা'আত সশব্দে পড়া হয়) সকাল সন্ধ্যায় সর্বদা চলতেই থাকে। যদি নবী করীম (সা) সবসময় 'বিস্মিল্লাহ' সশব্দে পড়ে থাকতেন তাহলে এতে কারো দ্বিতম সৃষ্টি হতোনা। কারো সন্দিহান হওয়ার অবকাশও ছিল না। সুনিশ্চিতরূপে তা সকলের সুবিদিত থাকত। রাসূলের নামাযের বিবরণের ক্ষেত্রে সকল রাবী তা সংশয়হীনরূপে ঐক্যবদ্ধরূপে এটাই বর্ণনা করতেন যে তিনি দাঁড়িয়ে সশব্দে 'বিস্মিল্লাহ' পড়তেন অতঃপর আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন---বলতেন।

হযরত আনাস (রা) একথা বলতেন না যে রাসূলুল্লাহ (সা), হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর 'বিস্মিল্লাহ' আস্তে বা নিঃশব্দে পড়তেন। এরূপ তার এবং আবদুল্লাহ ইবন ও মুগাফ্ফালের এ কথা বলার সুযাগ হতো না যে, নবী করীম (সা) 'বিস্মিল্লাহ' জোরে পড়েননি। আর না পড়েছেন তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীন। রাসূলুল্লাহ (সা) যদি তা সর্বদা সশব্দে পড়তেন তা হলে আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল এটিকে বিদ্'আত কি করে বললেন? আর এটাই বা কি করে হতে পারে যে তিনি সারাজীবন নবী করীম (সা) ও আবূ বকর, উমর এবং উসমানের সাথে নামায পড়লেন কিন্তু কারো মুখ থেকে সশব্দে 'বিস্মিল্লাহ' বের হতে শ্রবণ করেন নি?

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম 'যা-দুল মা'আদ'-এ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো কখনো 'বিস্মিল্লাহ' স্বশব্দে পড়তেন তবে তিনি অধিকাংশই নিঃশব্দে পড়তেন। এটা হতে পারে না যে, তিনি আবাসে প্রবাসে দিবানিশি পাঁচবার সর্বদা তা সশব্দে পড়তেন আর এ বিষয়টি খুলাফায়ে রাশেদীন এবং সিংহভাগ সাহাবী এবং তাঁর যুগের লোকদের নিকট অজানা বা গোপন থেকে

---

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৪, ৭০৫, হাদীস নং ৬৯৮।

www.pathagar.com

যাবে। এটি তো চরম অসম্ভব ব্যাপার। 'বিস্মিল্লাহ' পড়ার বিষয়টি সাব্যস্ত করার জন্য হাদীস অত্যাবশ্যক। কিন্তু এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে যেগুলো সহীহ তাতে সশব্দে পড়ার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। আর যেগুলোতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে সেগুলো সহীহ নয়।[৬]

কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন যে, এখানে আদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফালের ছেলে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি। জানা নেই যে, সে কে ও কি পর্যায়ের রাবী। সুতরাং হাদীসটি অগ্রহণযোগ্য। তা প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যাবে না।

এর উত্তরে মুহাদ্দিসগণ স্পষ্টরূপে বলে যে, আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফালের ছেলের নাম ইয়াযীদ। তিনি সুনান চতুষ্টয়ের রাবী। হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানী (র) 'তাহযীবে' বলেন, বলা হয় যে, তাঁর নাম ইয়াযীদ। আমার মতে তিনি নির্ভরযোগ্য। মুসনাদে আবু হানীফায় এরূপই উল্লেখ রয়েছে।[৭]

আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী (র) বলেন, রাবীকে সিকা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আল্লামা ইব্ন হিব্বানের মূলনীতি অনুসারে ইয়াযীদ একজন সিকা রাবী। তিনি বলেন, যদি কোন রাবী সম্পর্কে جرح ও تعديل না থাকে কিন্তু তাঁর উস্তাদ এবং তাঁর থেকে বর্ণনা কারীগণ সকলেই সিকা বলে গণ্য হয় আর তিনি মুনকার (منكر) হাদীস বর্ণনা না করে থাকেন তাহলে তিনি সিকা বলে সাব্যস্ত হবেন। এরূপ বহু রাবী রয়েছে। যার বর্ণনা তাঁর প্রণীত كتاب الثقات এ উল্লেখ রয়েছে। আর ইয়াযীদ তাঁদের একজন। কাজেই তিনি সিকা রাবী।[৮]

উসূলে হাদীসের নিয়ম হলো, কোন রাবী থেকে দু'জন রিওয়ায়াতে করলে তাঁর ব্যাপারে অপরিচিতির বিষয়টি বিদূরিত হয়ে যায়। এখানে ইয়াযীদ থেকে বর্ণনাকারীদের সংখ্যা দু'য়ের অধিক। কেননা তাঁর থেকে এ রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেন ঃ (ক) কায়স ইব্ন আবা-য়াহ। তিনি একজন সিকা রাবী। তাঁর রেওয়ায়াতটি ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযীতে আর ইমাম আহমদ 'মুসনাদে ' উল্লেখ করেন। (খ) আবদুল্লাহ ইব্ন বুরাইদা তাঁর রিওয়ায়াত ইমাম তাবারানী স্বীয় (معجم) মু'জামে উল্লেখ করেন। আবদুল্লাহ ইবন বুরাইদা একজন সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত রাবী। সিহাহ সিত্তার মুসান্নিফগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(গ) আবূ সুফিয়ান তারীফ ইবন শিহাব। তিনিই তাঁকে ইয়াযীদ নামে পরিচিত করেন। যদিও তাঁর সম্পর্কে কিছু আপত্তি রয়েছে; কিন্তু অন্যান্য সিকা রাবীদের পক্ষ থেকে তাঁর এ রিওয়ায়াতের সমর্থন থাকায় তাঁর বর্ণিত হাদীসটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

তাছাড়া আল্লামা ইবন আদী ও তাঁকে সিকা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর থেকে সিকা রাবীগণ বর্ণনা করেন। তাঁর সনদাবলী সুসাব্যস্ত ও গ্রহণযোগ্য (তাহযীব) অধিকন্তু উল্লিখিত হাদীসখানার পক্ষে বহু شاهد এবং متابع বিদ্যমান রয়েছে। অতএব হাদীসটিকে সহীহ বলা না হলেও অবশ্যই তা হাসান বলে বিবেচিত হবে। এ সব কারণেই ইমাম তিরমিযী (র) এটিকে হাসান বলে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফালের হাদীসটি হাসান। সুতরাং তা প্রমাণযোগ্য।[৯]

৬ প্রাগুক্ত পৃ. ৭০৪, ৭০৫, ৭০৬।

৭. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৪।

৮. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৪।

৯. প্রাগুক্ত পৃ. ৭০৫।

www.pathagar.com

عَنْ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَلَمْ اَسْمَعَ اَحَدًا مِّنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . رواه الامام مسلم

হযরত কাতাদা (রা) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ বকর, উমর এবং উসমান (রা) -এর সাথে নামায পড়েছি কিন্তু তাঁদের কাউকে 'বিস্‌মিল্লাহ' পড়তে শুনিনি। [১০] হাদীসখানা ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন।

এ হাদীসে يقرأ দ্বারা উদ্দেশ্য يَجْهَرُ জোরে বা সশব্দে না পড়া। কেননা, এ হাদীসটিই নাসাঈ শরীফে (অধ্যায় ঃ নামায শুরু করা প্রসঙ্গ ঃ বিস্‌মিল্লাহ সশব্দে না পড়া, খ., ১, পৃ. ১৪৪। কুতুবখানায়ে রশীদিয়া ঢাকা) এরূপ বর্ণিত রয়েছে ঃ

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَعُثْمَانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِّنْهُمْ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

আমি নবী কারীম (সা), আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর সাথে নামায পড়েছি। কিন্তু তাঁদের কাউকে 'বিস্‌মিল্লাহ' সশব্দে পড়তে শুনি নি। [১১]

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ الرَّجُلِ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَنَّهَا اَعْرَابِيَّةٌ وَكَانَ لاَ يَجْهَرُبِهَا هُوَ وَلاَ اَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ .

أخرجه الامام محمد بن الحسن فى الاثار جامع المسانيد قلت رجاله ثقات ، وهو رسل ابراهيم ومراسيله صحيحه .

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) হাম্মাদের সূত্রে বর্ণনা করেন, ইবরাহীম নাখ্‌ঈ (র) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, নামাযে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সশব্দে পড়া একটি বেদুঈনপনা কাজ। তিনি তা সশব্দে পড়তেন না এবং অন্য কোন সাহাবীও নয়। [১২]

এ হাদীস ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান 'আসার" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (জামেউল মাসানীদ)-এ হাদীসের সনদে বিদ্যমান রাবীগণ সকলেই সিকা তথা নির্ভরযোগ্য। এখানে এ আপত্তি করা যাবে না যে, এটি মুরসাল। কেননা হযরত ইবরাহীম একজন সুপ্রসিদ্ধ সিকা এবং সর্ব স্বীকৃত বিশ্বস্ত রাবী। আর মুহাদ্দিসগণ তাঁর মুরসাল রিওয়ায়াতসমূহকে সহীহ বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

বিশেষ করে যদি তাঁর সমর্থনে অন্যান্য রিওয়ায়াত বিদ্যমান থাকে তাহলে তার গ্রহণযোগ্যতা ও প্রামাণ্যের ক্ষেত্রে কারো দ্বিমত থাকে না। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (র)-এর এ

১০. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৯৭ , পৃ. ৭০২।

১১. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৪।

১২. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৬, হাদীস নং ৬৯৯।

www.pathagar.com

ভাষ্যটি হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। ইমাম তাহাভী (র) বর্ণনা করেন,

عَنْ بن عباس فى الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ ذٰلِكَ فِعْلُ الْاَعْرَابِ .

ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' জোরে পড়া বেদুঈনদের কাজ।

যেন তাঁদের মতে বিস্‌মিল্লাহ সশব্দে পড়া একটি সুন্নাত পরিপন্থী কাজ। তাঁরা জোরে পড়াকে অপছন্দ করতেন। যদি তা সশব্দে পড়া সুন্নাত হতো তাহলে এ মহান সাহাবীদের মুখ থেকে একটি সুন্নাত সম্পর্কে এ ধরনের কটুক্তি ব্যক্ত করা আদৌ সমীচীন হতো না। অথচ হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জুতা বহনকারী খাদেম। আবাসে প্রবাসে তাঁর সঙ্গে লেগে থাকতেন। আর হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইলম ও মারিফাত অর্জনে সদা রাসূলের (সা) সংস্পর্শতায় যুক্ত থাকতেন। এতদসত্ত্বেও কি তাঁরা 'বিস্‌মিল্লাহ' পড়ার বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারেন? আর আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদের বর্ণনা মোতাবিক সমস্ত সাহাবীগণ কিভাবেই বা এ আমলকে বর্জন করলেন?[১৩]

সুতরাং উপরোক্ত হাদীস সমূহের আলোকে এ কথাই সুসাব্যস্ত হয় যে, নামাযে 'বিস্‌মিল্লাহ' নিঃশব্দে পড়া উত্তম। এটাই হচ্ছে ইমাম আযম আবূ হানীফা ও তাঁর অনুসারীদের অভিমত। ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, ইসহাক, আবূ উবায়দ, ইবনুল মুবারক, সাওরী, ইব্‌ন আবু লাইলা এবং হাসান ইব্‌ন হুয়াই প্রমুখ এ অভিমতই ব্যক্ত করেন। আল্লামা ইব্‌ন আবদুল বার (র) বলেন, ইরাক ও মাশরিকী আলেমগণ এ অভিমতই ব্যক্ত করেন। এটাই হচ্ছে খুলাফায়ে রাশদীন, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ, ইব্‌ন আব্বাস সহ অপরাপর সাহাবী এবং তাঁদের পরবর্তী তাবিঈনে কিরামের অভিমত।[১৪]

বিপরীতমুখী হাদীস সমূহের ব্যাখ্যা

কিছু কিছু হাদীসে 'বিস্‌মিল্লাহ' সশব্দে পড়ার কথা উল্লেখ রয়েছে যা পূর্বোক্ত হাদীস পরিপন্থী। এজন্য ফকীহগণ সে সকল হাদীসের যথোচিত সমাধান দিয়ে থাকেন।[১৫]

عن بن عباس رضى الله عنه : كان النبى ﷺ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم .

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) সশব্দে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়তেন।

উক্ত হাদীসের উত্তর এই যে, (ক) আল্লামা হাফিয জামালুদ্দীন যায়লাঈ (র) বলেন, এ হাদীসটি দুর্বল, বরং মাওজু'র কাছাকাছি। হাফিয যাহাবী (র) ও এটিকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত

---

১৩. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৫।

১৪. মা'আরিফুস্ সুনান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬৩।

১৫. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০২।

www.pathagar.com

করেছেন।[১৬] ইমাম বায্যার এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন, এর সনদে বিদ্যমান ইসমাঈল শক্তিশালী নয়। আবূ দাঊদ (র) বলেন, এটি দুর্বল হাদীস। আল্লামা উকায়লী (র) স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করে এই ইসমাঈলের কারণে এটিকে ত্রুটিমুক্ত করেছেন, এবং বলেছেন যে, তাঁর হাদীস محفوظ (সংরক্ষিত বা নিরাপদ) নয়। তিনি এটি অজ্ঞাত রাবী থেকে বর্ণনা করেন। তাছাড়া 'বিস্‌মিল্লাহ্' শব্দ করে পড়া সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের কোনটি সহীহরূপে বর্ণিত নেই। ইব্‌ন আদীও এটি বর্ণনা করে বলেন, হাদীসটি محفوظ নয়। আর এর সনদে বিদ্যমান আবূ খালিদ একজন অজ্ঞত রাবী। তাঁর সম্পর্কে আবূ যুর'আ বলেন, আমি তাকে চিনি না। সে কে তাও জানি না। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, এর সনদটি মানসম্পন্ন নয়।[১৭]

(খ) হাদীসটির সনদগত দুর্বলতার পাশাপাশি তার মতন ও প্রমাণযোগ্য নয়। কেননা প্রসিদ্ধ বর্ণনা মোতাবিক ইব্‌ন আব্বাসের হাদীসে يَفْتَتِحُ ও يَسْتَفْتِحُ (শুরু করতেন বিস্‌মিল্লাহ দিয়ে) বিদ্যমান, يَجْهَرُ (বিস্‌মিল্লাহ জোরে পড়তেন) শব্দটি নয়।[১৮] কেননা ইমাম আবূ দাঊদ, তিরমিযী, এবং ইমাম দারা কুত্‌নী নিজ নিজ সুনানে يَجْهَرُ এর স্থলে يَفْتَتِحُ উল্লেখ করেছেন। রিওয়ায়াতটি নিম্নরূপ ঃ

كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلَاةَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আর ইমাম বায়হাকী (সুনানে কুবরায় ২/৪৮) يَجْهَرُ এর স্থলে يَسْتَفْتِحُ উল্লেখ করেছেন।

انَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ الْقِرَاءَةَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাছাড়া আল্‌-জাওহারুন্নাকী গ্রন্থকার বলেন, আল্লামা ইবনে তুরকুমানী (র) বলেন, كَانَ يَجْهَرُ بِهَا এটি হযরত ইব্‌ন আব্বাসের কথা নয়।[১৯] বরং পরবর্তী কোন রাবী বাক্য। এজন্যই আল্লামা ইউসুফ বানূরী মা'আরিফুস সুনানে উল্লেখ করেন যে جهر শব্দ দ্বারা বর্ণনাকারীগণ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে (رواية بالمعنى) করেছেন।[২০]

(গ) শুরু যুগে 'বিস্‌মিল্লাহ' সশব্দে পড়া হতো, পরবর্তীতে নিঃশব্দে পড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর এটাই আমল হিসাবে জারি করা হয়েছে। এর প্রমাণ নিম্নরূপ হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উচ্চস্বরেও টেনে পড়তেন। তখন মুশরিকরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলত, ঐ দেখ মুহাম্মদ আইয়ামমার মা'বূদকে ডাকছে। উদ্দেশ্য মুসাইলামা কায্যাব। কেননা, সে নিজেকে রাহমান রাহীম নামে আখ্যা দিত। আর আরবের মুশরিকদের নিকট সে এই নামে পরিচিত। তখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ।[২১] হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এরূপ বর্ণিত সেটি আল্লামা তাবরানী "আল-মু'জামূল কাবীর" এবং আল-মুজামূল আতসাতে উল্লেখ করেন। ইবনে

১৬. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০২।

১৭. মা'আরিফুস্ সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫।

১৯. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৬-৭০৭।

২০. মা'আরিফুস্ সুনান, প্রাগুক্ত।

২১. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০১।

www.pathagar.com

আব্বাস (রা) বলেন, এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) তা না পড়ার নির্দেশ প্রদান করলেন। এ হাদীসের সনদে বিদ্যমান রাবীগণ সকালেই সিকা ও শক্তিশালী—সুতরাং বিস্‌মিল্লাহ সশব্দে পড়া রহিত বলে বিবেচিত হলো ।[২২]

যদি বলা হয় সে এ আয়াতেটি لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ দু'আ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যেমনটি ইমাম বাখারী (র) সূরা বনী ইসরাঈলের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং আলোচ্য বিষয়ে তা প্রমাণযোগ্য হতে পারে না।

এ আয়াতখানি যেমনি দু'আ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, তেমনি 'বিস্‌মিল্লাহ' পড়া প্রসঙ্গেও অবতীর্ণ হয়েছে বলে বিবেচিত হতে পারে। কেননা একই আয়াতের শানে নুযূল একাধিক হতে পারে। তাফসীর বিশারদদের নিকট এ বিষয়টি স্বীকৃত।

যদি বলা হয় যে, এটি কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তখনও একই উত্তর প্রযোজ্য। কেননা তা বিশেষভাবে 'বিস্‌মিল্লাহ' প্রসঙ্গেও অবতীর্ণ হতে পারে। অধিকন্তু বিশুদ্ধ মতানুসারে 'বিস্‌মিল্লাহ' কুরআনে কারীমেরই একটি অংশবিশেষ। সুতরাং 'বিস্‌মিল্লাহ' উচ্চস্বরে পড়ার কুরআন উচ্চস্বরে পড়ার নামান্তর। আর তা নিঃশব্দে পড়া কুরআন নিঃশব্দে পড়ার নামান্তর। উভয়টির একই হুকুম। এতদুভয়ের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই।[২৩]

(ঘ) যদি এটি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে সঠিকরূপে বর্ণিত রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে তা তার নিজস্ব রিওয়ায়াত বা অভিমতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হবে। কেননা, মুসনাদে আহমদ বর্ণিত রয়েছে, ইকরিমা থেকে বর্ণিত, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, 'বিস্‌মিল্লাহ' সশব্দে বা উচ্চস্বরে পড়া বেদুঈনদের কিরা'আত। ইমাম তাহাভী (র) এরূপ বলেন। অবশ্য আসরাম রেওয়ায়াতটি ইকরিমা থেকে ভিন্নরূপে বর্ণনা করেন। যার দ্বারা বিষয়টি আরো মজবূত হয়ে উঠে। সেটি হলো, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি বেদুঈন বলে গণ্য হবে যদি 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম: উচ্চস্বরে পড়ে থাকে।[২৪]

عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ اَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتَ وَرَاءَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقَرَاَءَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ قَرَاَ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ حَتّٰى اذَا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقَالَ اٰمِيْنَ فَقَالَ النَّاسُ اٰمِيْنً ، وَيَقُوْلُ كُلَّمَا سَجَدَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوْسِ فِى الْاِثْنَيْنِ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَاِذَا سَلَّمَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنِّىْ لَاَشْبَهَكُمْ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

নু'আইম বলেন, আমি একদা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এর পেছনে নামায পড়েছি। তিনি প্রথমে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়লেন। অতঃপর সূরা ফাতিহা পড়লেন এবং 'গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন' বলে আমীন বললেন। তখন লোকেরাও আমীন বলল। তিনি প্রত্যেকবার 'আল্লাহু আকবার ' বলে সাজ্‌দায় যেতেন। এরূপ দু'রাকা'আত শেষে উঠার সময়

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৭।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০১।

২৪. মা'আরিফুস্ সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬।

www.pathagar.com

ও আল্লাহু আকবার বলতেন। আর সালাম ফিরানোর পর বললেন, কসম ঐ সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। নিশ্চয়ই আমার নামায তোমাদের অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামাযের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

এ হাদীসটি ইমাম দারাকুতনী, নাসাঈ, বায়হাকী, ইবন হিব্বান ও হাকিম বর্ণনা করেন।

উক্ত হাদীসের উত্তর এই যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর এ দাবী "আমার নামায তোমাদের অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামাযের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ" থেকে আলোচ্য বিষয় প্রতীয়মান হতে পারে না। কেননা রাসূলের নামাযের সাথে তাঁর নামাযের সাদৃশ্য প্রতিটি অংশে না কিছু অংশে, না অধিকাংশে আমলে তার উল্লেখ নেই। সুতরাং হতে পারে তাঁর উদ্দেশ্য নামাযের বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ আমলের ক্ষেত্রে কিংবা অধিকাংশ অংশে তাঁর নামাযটি রাসূলের নামাযের সাদৃশ্যপূর্ণ। এতে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ার বিষয়ে সাদৃশ্য নাও হতে পারে। তখন এটি তাঁর স্বতন্ত্র আমল বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং সাদৃশ্যের নির্দিষ্ট দিক না বলা পর্যন্ত এ হাদীসকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায় না। অবশ্য ইমাম মুসলিম এটিকে অপর এক সূত্রে বর্ণনা করেছেন । যার থেকে সাদৃশ্য দ্বারা আবূ হুরায়রা (রা) উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

রিওয়ায়াতটি হলো এই, আবূ সালামা বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নামাযের মধ্যে প্রত্যেক উঠা-নামার ক্ষেত্রে তাকবীর বলতেন। তখন আমরা বললাম, হে আবূ হুরায়রা! এটা কোন তাকবীর? বললেন, নিশ্চই আমার এ নামায রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায।

এ হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তার ঐ কথা দ্বারা এটাই বুঝতে চেয়েছেন যে, প্রত্যেক উঠা-নামার ক্ষেত্রে তাক্‌বীর বলা বিষয়ে তাঁর নামাযটি রাসূলের (সা) নামাযের সাথে সর্বাপেক্ষা সাদৃশ্যপূর্ণ। নামাযের সকল অংশে নয়। তাছাড়া আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এ হাদীসটি তাঁর বহু শাগরিদ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এই নু'আইম ব্যতীত অন্য কেউ বিস্‌মিল্লাহর কথা বর্ণনা করেন নি।[২৫]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র)-এর উত্তরে বলেন, তাঁরা যদি বলেন, প্রত্যেকটি আমলই রাসূলের নামাযের সাদৃশ্য তাহলে আউযুবিল্লাকেও সশব্দে পড়ার কথাও স্বীকার করতে হবে। আবূ সালেহ বলেন, আমি আবূ হুরায়রাকে লোকদের ইমামতি করা অবস্থায় বলতে শুনেছি। তিনি সূরা ফাতিহা পড়ে বললেন, رَبَّنَا اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ প্রশ্ন হল, 'বিস্‌মিল্লাহ' সশব্দে পড়ার প্রবক্তাগণ এই হাদীসের আলোকে আউযুবিল্লাহ সশব্দে পড়ার মত কেন ব্যক্ত করেন না। যেমনি নিম্নে বর্ণিত রিওয়ায়াতটির আলোকে বিস্‌মিল্লাহ্ সশব্দে পড়ার অভিমত পোষণ করে থাকেন। রিওয়াতটি হলো, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নামায শেষে বললেন, যা কিছু রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে শুনিয়ে পড়েছেন অর্থাৎ জোরে বা সশব্দে পড়েছেন আমি তা তোমাদেরকে শুনালাম। আর যা তিনি আমাদের সামনে নিঃশব্দে পড়েছেন তা আমি তোমাদের সামনে নিঃশব্দে পড়লাম। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত[২৬]

এখানে আরেকটি বিষয় হলো, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন,-(রা) বলেন, নামায আমার এবং আমার বান্দার মাঝে দু'ভাগে বিভক্ত। অর্ধেক

২৫. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৮।

২৬. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

আমার আর অর্ধেক আমার বান্দার। আমার বান্দা যা চাইবে তা পাবে। অতএব বান্দা যখন বলে, 'আল-হামুদলিলাহি রাব্বিল 'আলামীন' আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল .... (আল-হাদীস) হাদীসটির বর্ণধারা বা বচনপদ্ধতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিস্মিল্লাহ ফাতিহার অংশ নয়। যদি ফতিহার অংশ তথা আয়াত হতো তাহলে কথাটি এরূপ শুরু করতেন যে, যখন বান্দা 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে---। তাছাড়া বিস্মিল্লাহকে অংশ মানা হলে আধা আধির হিসাব বিবর্জিত হয়ে যায়। কথা হলো, আবূ হুরায়রা (রা) স্বয়ং এ হাদীসের রাবী হয়ে কি করে তিনি 'বিস্মিল্লাহ' সশব্দে পড়ার অভিমত ব্যক্ত করেন। আর কিভাবেই বা হতে পারে যে, সদৃশ দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো তাঁর নামায 'বিস্মিল্লাহ' জোরে পড়ার দিক থেকে রাসূলের নামাযের সদৃশ। যেমনি আউযুবিল্লাহ ও সানা ফাতিহার অংশ না হওয়ায় তা আস্তে তথা নিঃশব্দে পড়া উত্তম তদ্রূপ বিস্মিল্লাহও সে হিসাবে নিঃশব্দে পড়া উত্তম বলে বিবেচিত হবে।[২৭]

ইমাম মুহাম্মদ (র) কিতাবুল আসারে লিখেন, ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) হাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, চারটি জিনিস ইমাম নিঃশব্দে পড়বে। ১. সানা-সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গায়রুকা ২. আউযুবিল্লাহিমিনাশ শাইতানির রাজীম ৩. বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম, ৪. আমীন।[২৮]

(খ) নু'আইমের বর্ণনা মোতাবিক যদি 'বিস্মিল্লাহ' পড়ার কথাটি সঠিক বলে মেনেও নেওয়া হয় তবু তা প্রমাণযোগ্য হতে পারে না। কারণ এখানে শুধু পড়ার কথাই উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সশব্দে পড়েছেন না নিঃশব্দে তার উল্লেখ নেই। এখানে এটাও স্পষ্ট করা হয়নি যে নু'আইম তা আবূ হুরায়রার নামায অবস্থায় শ্রবণ করেছেন। হতে পারে আবূ হুরায়রা (রা) নু'আইমকে জানিয়েছেন যে তিনি তা আস্তে পড়েছেন সেটাকেই তিনি পড়েছেন, قرأ বলে ব্যক্ত করেন। আর এটাও হতে পারে যে তিনি তার অতি নিকটে থাকায় আস্তে পড়াকেও শ্রবণ করে নিয়েছেন। কিন্তু আর সেটাকেই 'পড়েছেন' বলে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এর দ্বারা তো সশব্দে পড়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয় না। আর এটি তার উদ্দেশ্যও নয়। তাছাড়া এখানে এ সম্ভাবনাও হতে পারে যে, আবূ হুরায়রা (রা)-এর জোরে পড়ার উদ্দেশ্য হলো ঐ ব্যক্তিকে রদ্দ করা যে নামাযে বিস্মিল্লাহ-ই পড়েনা। সুতরাং "আমার নামায তোমাদের অপেক্ষা রাসূলের নামাযের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নামাযে 'বিস্মিল্লাহ' পড়া বর্জন না করার দিক থেকে, তা জোরে পড়ার দিক থেকে নয়।[২৯]

قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِالْمَدِيْنَةِ صَلَاةً فَجَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَبَدَاَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَلَمْ يَقْرَاْ بِهَا لِلسُّوْرَةِ الَّتِىْ بَعْدَهَا حَتّٰى قَضٰى تِلْكَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُكَبِّرْ حِيْنَ يَهْوِىْ حَتّٰى قَضٰى تِلْكَ

২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৮, ৭০৯।

২৮. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ আমীন বলা প্রসঙ্গে, পৃ. ৫১৩।

২৯. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৯।

www.pathagar.com

الصَّلَاةَ ، فَلَمَّا سَلَّمَا نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَاكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَمَنْ كَانَ عَلَى مَكَانٍ ، يَا مُعَاوِيَةُ ! اَسَرَقْتَ الصَّلَاةَ اَمْ نَسِيْتَ ؟ اَيْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؟ اَيْنَ التَّكْبِيْرُ اِذَا خَفَضْتَ وَاِذَا دَفَعْتَ ؟ فَلَمَّا صَلَّى ذٰلِكَ قَرَا بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لِلسُّوْرَةِ الَّتِىْ بَعْدَ اُمِّ الْقُرْاٰنِ وَكَبَّرَ حِيْنَ يَهْوِىْ سَاجِدًا (رواه الدار قطنى)

আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, একদা মু'আবিয়া (রা) মদীনায় নামায আদায় করলেন। তাতে তিনি কিরা'আত সশব্দে পড়লেন। সূরা ফাতিহা 'বিস্‌মিল্লাহ' দ্বারা শুরু করলেন কিন্তু সূরা মিলানোর সময় তা পড়েননি। এভাবে রাক'আতটি সম্পূর্ণ করলেন, কিন্তু রুকু' বা সাজ্‌দায় যাওয়ার সময় তাক্‌বীর বলেন নি। একই নিয়মে পরের রাক'আতটিও সম্পন্ন করলেন। সালাম ফিরানোর পর মুহাজির ও আনসারগণ এবং তথায় উপস্থিত লোকজন তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, হে মু'আবিয়া! তুমি কি নামায চুরি করেছ, না ভুলে গেছ? কোথায় গেল বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম? কোথায় গেল তাকবীর যখন উঠানামা করেছ? এর পর যখন আবার নামায পড়লেন তখন তিনি ফাতিহার পরে পঠিত সূরার শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহ' বললেন এবং সাজ্‌দায় যাওয়ার সময় তাকবীর বললেন।[৩০] (দারা কুতনী)

উক্ত হাদীসের উত্তর এই যে, 'বিস্‌মিল্লাহ' সশব্দে পড়ার প্রবক্তাগণ হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর এ হাদীসটিকে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য মনে করেন, এমন কি খতীব বলেন, আলোচ্য বিষয়ে এটিই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দলীল অথচ এটির ভিত্তি হলো আবদুল্লাহ ইব্‌ন উসমানের উপর। যদিও মুসলিমের রাবী কিন্তু তার সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ নানান আপত্তি করেছেন। ইয়াহইয়া বলেন, তার হাদীসসমূহ শক্তিশালী নয়। নাসাঈ বলেন, সে হাদীসের বিষয়ে দুর্বল, হাদীস বর্ণনায় শক্তিশালী নয়। ইবনে মাদীনার মতে মুনকারুল হাদীস (তার হাদীস মুনকার বলে বিবেচিত) মোটকথা, সে একজন বিতর্কিত রাবী। সুতরাং এককভাবে বর্ণিত তার কোন হাদীস গ্রহণ করা যায় না। অধিকন্তু তার সনদটি اضطراب এ পূর্ণ। শারহু মা'আনিল আসারে এর বিশদ বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়া এ হাদীসটি شاذ এবং مَعْلُوْلٌ অর্থাৎ ত্রুটি যুক্ত। কারণ, এটি ঐ হাদীসের পরিপন্থী যা সিকা রাবীদের দ্বারা হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, হযরত আনাস (রা) 'বিস্‌মিল্লাহ' সশব্দে পড়ার ক্ষেত্রে হযরত মু'আবিয়া (রা) এর উক্ত ঘটনাকে কিভাব প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে পারেন অথচ তিনিই নবী করীম (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে বিপরীত মাস'আলা বর্ণনা করে থাকেন। যা সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট, তাছাড়া হযরত আনাসের যে সব শাগরিদ তাঁর সংস্পর্শে পেয়েছে তাদের কারো থেকেই এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, তিনি হযরত মু'আবিয়া (রা) সম্পর্কে এজাতীয় ঘটনা বর্ণনা করেছেন।[৩১]

---

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১০।

৩১. প্রাগুক্ত।

আল্লামা জামালুদ্দীন যায়লাঈ (র) উক্ত হাদীসটি মুসতাদরাকে হাকিমের বরাত দিয়ে উল্লেখ করে বলেন, এর উত্তর কয়েকটি হতে পারে।

প্রথমত ঃ এটির ভিত্তি হলো আবদুল্লাহ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন খায়সামের উপর আর সে হলো একজন বিতর্কিত অনির্ভরযোগ্য রাবী। তাছাড়া হাদীসটি সনদ ও মতন উভয় দিক থেকে اضْطِرَابْ পূর্ণ। সনদগত اضطراب হলো এই, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উসমান কখনো এটিকে বকর ইবন হাফসের সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আবার কখনো ইসমাঈল ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন রিফা'আর সূত্রে আনাস থেকে বর্ণনা করেন। অবশ্য বায়হাকী 'কিতাবুল মা'রিফায়' বারীদের উঁচু মর্যাদার ভিত্তিতে প্রথম সূত্রটিকে প্রাধান্য প্রদান করেন। আর ইমাম শাফিঈ (র) দ্বিতীয় সূত্রকে আবার কখনো তিনি ইসমাঈল ইব্‌ন উবাইদ ইব্‌ন রিফা'আহ আল্ আবীহি আন্ জাদ্দিহীর সূত্রে বর্ণনা করেন।

আর মতনের اضطراب হলো এই যে, তিনি একবার বলেন, "অতঃপর মু'আবিয়া (রা) সূরা ফাতিহার বিস্‌মিল্লাহ দ্বারা শুরু করেছেন। কিন্তু সূরা মিলানের সময় তা পড়েন নি" (হাকিম) আবার কখনো এরূপ বর্ণনা করেন, "তিনি তিলাওয়াতের শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ পড়েন নি, অবশ্য ফাতিহা পড়েছেন" (দারা কুতনী ঃ সূত্র ইসমাঈল ইব্‌ন আয়োশ) কখনো এরূপ বর্ণনা করেন, "তিনি ফাতিহার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ পড়েননি। আর না তারপরে সূরা মিলানোর সময় পড়েছেন।" (দারা কুতনী ঃ সূত্র ইব্‌ন জুরাইজ)

কোন হাদীসের সনদে ও মতনে এরূপ اضطراب থাকলে তা দুর্বল বলে বিবেচিত হয়। তাছাড়া শক্তিশালী হতে হলে তা شاذ এবং معلّ হতে মুক্ত হবে। অথচ এটি شاذ এবং معلّ হাদীস এ হাদীসটি معلول হওয়ার কারণ একাধিক। প্রথমত, হযরত আনাস (রা) বসরায় বসবাস রত ছিলেন। হযরত মু'আবিয়া (রা) মদীনায় আসার সময় তিনি মদীনায় এসেছেন বলে প্রমাণ নেই।[৩২]

দ্বিতীয়ত, যে সব আনসার ও মুহাজির সাহাবী ও উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর উপর প্রশ্ন করেছিলেন তাঁদের সকলের মতে 'বিস্‌মিল্লাহ' নিঃশব্দে পড়া উত্তম। তাঁদের কেউ তা সশব্দে পড়ার কথা বলেন না। অতএব এ মর্মানুযায়ী এটা কিভাবে হতে পারে যে তাঁরা হযরত মু'আবিয়া (রা) থেকে বিস্‌মিল্লাহ জোরে পড়া তলব করেছেন।[৩৩]

আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী (র) বঁলন, যদি হাদীসটি সহীহ বলে ধরেও নেওয়া হয় তবু এর দ্বারা বিস্‌মিল্লাহ সশব্দে পড়া উত্তম হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ হতে পারে না। কেননা এর সঠিক ব্যাখ্যা হলো খুলাফায়ে রাশিদীনের 'বিস্‌মিল্লাহ' নিঃশব্দে পড়ার কারণে কেউ কেউ ধারণা করতে পারে যে তা পড়া বিদ্'আত। তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডনের উদ্দেশ্যে মু'আবিয়া (রা) বিস্‌মিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়েছেন। তবে যেহেতু তিনি ফাতিহার শুরুতে পড়েছেন, কিন্তু সূরা মিলানোর পূর্বে সশব্দে পড়েন নি। এতে শ্রোতাদের মনে হয়েছিল যে, তিনি তা পড়েননি বিধায় সূরা মিলানোর ক্ষেত্রে না পড়ায় সাহাবীগণ তাকে প্রশ্ন করেছেন। কেননা সূরা মিলানোর আগেও বিস্‌মিল্লাহ পড়া সুন্নাত।[৩৪]

---

৩২. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, (ফুট নোট নং ৩ সহ) পৃ. ৫০১-৫০২।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০২।

৩৪ ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১১।

www.pathagar.com

صَلَّيْتُ خَلْفَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَكَانَ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَقَالَ مَا يَمْنَعُ اُمَرَاءَكُمْ اَنْ يَجْهَرُوْا بِهَا اِلاَّ الْكِبْرُ . رواه الخطيب

আমি হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরের পিছনে নামায পড়েছি। তিনি 'বিস্‌মিল্লাহ' উচ্চস্বরে পড়লেন। আর বললেন, তোমাদের আমীরদের জন্য তা সশব্দে পড়ার প্রতিবন্ধক হলো শুধু অহংবোধ। হাদীসটি আল্লামা জামালুদ্দীন যায়লাঈ (র) খতীবের সূত্রে বর্ণনা করেন।

উক্ত হাদীসের উত্তর এই যে, আল্লামা ইব্নুল হাদী বলেন, এটির সনদ সহীহ বটে, কিন্তু এখানে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরের উদ্দেশ্য হলো, একথা মানুষদের অবগত করানো যে, 'বিস্‌মিল্লাহ' পড়া সুন্নাত। জোরে বা সশব্দে পড়তে হবে; এটা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। কেননা, খুলাফায়ে রাশিদীন তা নিঃশব্দে পড়তেন। এতে করে বহু মানুষের মনে ধারণা সৃষ্টি হলো যে, তা পড়া বিদ্‌'আত। কোন কোন সাহাবী এটিকে সশব্দে পড়তেন। সেটাও কখনো কখনো, সব সময় নয়।[৩৫]

'বিস্‌মিল্লাহ' নিঃশব্দে পড়ার প্রাধান্যকর দিকসমূহ

ক. 'বিস্‌মিল্লাহ' নিঃশব্দে পড়া সংশ্লিষ্ট হাদীসাবলী قولى (বাচনিক)। আর বিস্‌মিল্লাহ সশব্দে পড়া সম্বলিত হাদীসাবলী হচ্ছে فعلى (কর্মগত)। নিয়ম বলে قولى ও فعلى হাদীসের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে قولى হাদীস প্রাধান্য পায়।

খ. নিঃশব্দে পড়ার হাদীসাবলী خاطر (নিষেধকারী) পর্যায়ের অর্থাৎ সেগুলোতে সশব্দে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে আর সশব্দে পড়ার হাদীসাবলী مبيح (অনুমতি প্রদানকারী) পর্যায়ের, যাতে সশব্দে পড়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। নিয়ম হলো خاطر ও مبيح-এর মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে خاطر তথা محرم হাদীস প্রাধান্যযোগ্য।

উপরোক্ত মূলনীতি দ্বয়ের আলোকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, 'বিস্‌মিল্লাহ' নিঃশব্দে পড়া উত্তম।[৩৬]

পরিশিষ্ট

আল্লামা জামালুদ্দীন যায়লাঈ (র) নসবুর রায়া-য় এবং হাফিয ইব্ন তাইমিয়্যা স্বীয় ফাতাওয়ায়ে বর্ণনা করেন যে, সশব্দে বিস্‌মিল্লাহ পড়ার অন্যতম প্রবক্তা ইমাম দারা কুতনী এতসম্পর্কীয় সমস্ত রিওয়ায়াত একত্রিত করে সেটিকে একটি বড় পুস্তকের রূপ দেন। একবার তিনি মিশর যাওয়ার পর মালিকী মাযহাবের অনুসারী এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হলো (যার মতে বিস্‌মিল্লাহ কুরআনের অংশই নয় তা নিঃশব্দে বা সশব্দে পড়া তো দূরের কথা) এবং তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, এতে কি কোন সহীহ হাদীস আছে? তখন তিনি বললেন,

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৯।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১১।

www.pathagar.com

كُلُّ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْجَهْرِ فَلَيْسَ بِصَحِيْحٍ وَأَمَّا عَنِ الصَّحَابَةِ فَمِنْهَا صَحِيْحٌ ضَعِيْفٌ .

'বিস্‌মিল্লাহ' সশব্দে পড়া সম্পর্কে যে সব রিওয়ায়াত নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত রয়েছে তার একটিও সহীহ নয়। অবশ্য সাহাবীদের থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতাবলীর কোন কোনটি সহীহ্ আর কতক দুর্বল।

সশব্দে পড়ার প্রমাণাদির দুর্বলতা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে এ স্বীকারোক্তির চেয়ে বড় আর কি দলীল হতে পারে? [৩৭]

তাছাড়া অন্যান্য বড় বড় মুহাদ্দিসগণ ও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যে, সশব্দে 'বিস্‌মিল্লাহ' পড়া সম্পর্কে সহীহ কোন হাদীস নেই। হাফিয যায়লাঈ (র)-এর কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন যে, রাফিযী সম্প্রদায় 'বিস্‌মিল্লাহ' সশব্দে পড়ার প্রবক্তা ছিল। আর তাদের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ যে, তারা হাদীস বর্ণনায় সর্বপেক্ষা মিথ্যাবাদী। এতদুদ্দেশ্যে তারা 'বিস্‌মিল্লাহ' সশব্দে পড়ার সমর্থনে বহু হাদীস তৈরি করেছে। এজন্যই দেখা যায় যে, এতদ্বসম্পর্কীয় অধিকাংশ হাদীসের সনদে কোন না কোন রাফিযী বিদ্যমান। একারণেই ইমাম বুখারী ও মুসলিম বিস্‌মিল্লাহ সশব্দে পড়া সম্পর্কীয় হাদীস বর্ণনা করেননি।

যায়লাঈ (র) আরো বলেন, এ বিষয়ে কোন একটি সহীহ ও স্পষ্ট হাদীস সনদগত দিক থেকে সুসাব্যস্ত হতো তাহলে আমি দু'বার কসম করে বলছি যে, ইমাম বুখারী (র) সেটি অবশ্যই স্বীয় সহীহে বর্ণনা করতেন। কেননা ইমাম বুখারী হানাফীদের উপর প্রশ্ন ও জটিলতা সৃষ্টি করার বাদান্যতা প্রদর্শন করেন। এবং তাদেরকেই قال بعض الناس দ্বারা টার্গেট করেন।[৩৮]

মুনফারিদের জন্য নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব

নামাযে কুরআন কারীমের যে কোন জায়গা থেকে তিলাওয়াত করা ফরয।[৩৯] অবশ্য ইমাম কিংবা (একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তি)-এর মুনফারিদ জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। এটি নামাযের মধ্যস্থ ১৪টি ওয়াজিবের একটি। এটি ফরয নয়। সুতরাং সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায আদায় হয়ে যাবে। তবে এ জন্য 'সাজদায়ে সাহু' আদায় করা ওয়াজিব। অন্যথায় নামায মাকরূহ তাহরীমীর সাথে আদায় হবে। এ অবস্থায় নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব বলে

৩৭. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৩।

৩৮. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত।

৩৯. কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন فَاقْرَأُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ-এ আয়াতের মধ্যে مَا تَيَسَّرَ অর্থাৎ পড়তে সক্ষম বা সহজ এ পরিমাণ ফরয করা হয়েছে, নির্দিষ্ট কোন সূরা বা আয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং কুরআনের এ নস মোতাবিক নামাযে কুরআনের যে কোন অংশ পড়া ফরয বলে প্রমাণিত হয়। কাজেই خبر واحد বা হাদীস দ্বারা নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব সাব্যস্ত করার বিষয়টি কুরআনকে ডিঙ্গিয়ে বিধান আরোপের নামান্তর। অথচ তা করা জায়িয নেই। (শাইখুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন মুরগীনানী ঃ হিদায়া, ইয়াসী এণ্ড নাদীম কোম্পানী, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া, খ. ১, পৃ. ১০৪, আল্লামা তাকী উসমানী, দারসে তিরমিযী দারুল কিতাব, দেওবন্দ, খ. ১, পৃ. ৫১০)

www.pathagar.com

বিবেচিত। অধিকাংশ হাদীসের বক্তব্য প্রমাণ করে যে, মুনফারিদের জন্য নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।[৪০]

এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلاَّ صَلاَةً لَمْ يَقْرَأ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ ثَلاَثًا غَيْرُ تَمَامٍ . الحديث رواه مسلم

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নামায আদায় করল কিন্তু তাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না তাহলে সে নামাযটি অসম্পূর্ণ। এটি তিনি তিন বার বলেছেন।[৪১] (হাদীসখানা ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)

এ হাদীস থেকে প্রতিভাত হয় যে, সূরা ফাতিহা পড়া ব্যতীত সালাত ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়, এবং আর হাতেম সিজিস্তানী ও হারবী প্রমুখ অভিধানবিদগণের মতে (হাদীসে বর্ণিত) خداج-এর অর্থ ত্রুটি, ঘাটতি, হ্রাস, ক্ষতি লোকসান ইত্যাদি। ইমাম নববী (র) বলেন, অতএব خداج অর্থ ত্রুটিসম্পন্ন, (সালাতটি ত্রুটিযুক্ত) পরে উল্লেখিত غير تمام বাক্যটি দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। غير تمام-এর অর্থ হলো, অপরিপূর্ণ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য নামাযের অপরিপূর্ণতা বর্ণনা করা। কোন কিছু সম্পর্কে অপরিপূর্ণতা ব্যক্ত করার দ্বারা তা বাতিল বা অশুদ্ধ বুঝায় না।[৪২]

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنَا اَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ .

رواه أبو داؤد وسكت عنه واسناده صحيح ، كما فى التلخيص الحبير، وعزاه الزيلعى إلى صحيح ابن حبان بلفظ : امرنا رسول الله ﷺ ان نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ وَالْمَعنى واحد وفى النيل بعد ذكر لفظ أبى داؤد قال ابن سيد الناس اسناده صحيح ، ورجاله ثقات .

৪০. (ক) আল্লামা ইব্‌ন আবিদীন শামী: রাদ্দুল মুহতার : মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ খ. ২, পৃ. ১৪৮, ১৪৯ অধ্যায় : সালাত।
(খ) আল্লামা ইউসুফ বানূরী, মা'আরিফুস সুনান : মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ইউ. পি. ভারত : অধ্যায় সালাত; পরিচ্ছেদ সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায হবে না, খ. ২, পৃ. ৩৮২।
(গ) আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী, বাদাইউস সানাই', মাকতাবায়ে নাঈমিয়া, দেওবন্দ, সাহারানপুরী, ইউ. পি. ভারত : অধ্যায় সালাত; পরিচ্ছেদ নামাযের মৌলিক ওয়াজিবসমূহ, খ. ১ পৃ. ৩৯৫।
(ঘ) শাইখুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন মুরগীনানী : হিদায়া: দারুল কিতাব দেওবন্দ, সাহারানপুর, ইউ. পি. ভারত : অধ্যায় সালাত, খ. ১, পৃ. ১০৪।

৪১. আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী : ই'লাউস সুনান; মাকতাবায়ে দারুল ফিকর বাইরুত, লেবানন, অধ্যায় : সালাত : পরিচ্ছেদ আল্লাহর বাণী فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ-এর ব্যাখ্যা এবং নামাযে কিরা'আত ফরয হওয়া ও তার পরিমাণ প্রসঙ্গে। খ., ২ পৃ. ৭১৯। হাদীস নং ৭০৭।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৯-৭২০।

www.pathagar.com

হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে (নামাযে) সূরা ফাতিহা সহ আরো যা সহজসাধ্য তা পড়ার আদেশ দিয়েছেন।[৪৩] (আবূ দাঊদ)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ يَوْمًا . قَالَ رِفَاعَةُ وَنَحْنُ مَعَهُ - اِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ كَالْبَدَوِىِّ فَصَلّٰى فَاَخَفَّ صَلاَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَعَلَيْكَ ، فَارْجِعْ ، فَصَلِّ ، فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلّٰى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ وَعَلَيْكَ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ، كُلَّ ذٰلِكَ يَاْتِىْ النَّبِىَّ ﷺ فَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَيَقُوْلُ النَّبِىُّ ﷺ وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ ، فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَعَافَ النَّاسُ وَكَبُرَ عَلَيْهِمْ اَنْ يَكُوْنَ مَنْ اَخَفَّ صَلاَتَهُ لَمْ يُصَلِّ ، فَقَالَ الرَّجُلُ فِىْ اٰخِرِ ذٰلِكَ ، فَاَرِنِىْ وَعَلِّمْنِىْ ، فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اُصِيْبُ وَاُخْطِئُ، فَقَالَ ، اَجَلْ ! اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلاَةِ ، فَتَوَضَّاْ كَمَا اَمَرَكَ اللّٰهُ بِهِ ثُمَّ تَشَهَّدْ فَاَقِمْ اَيْضًا ، فَاِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْاٰنٌ فَاقْرَاْ ، وَاِلاَّ فَاحْمَدِ اللّٰهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ ، ثُمَّ اَرْكَعْ فَاطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ اعْتَدِلْ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ فَاعْتَدِلْ سَاجِدًا ! ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ قُمْ فَاِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ وَاِنْ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلاَتِكَ ، قَالَ وَكَانَ هٰذَا اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِّنَ الْاُوْلٰى اَنَّهُ مَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا انْتَقَصَ مِنْ صَلاَتِهٖ وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُّهَا .

رواه الترمذى (ج ١ ، ص ٤٠) وقال حديث رفاعة حديث حسن ، قال وفى الباب عن أبى هريرة وعمّار بن يسار .

হযরত রিফা'আ ইব্ন রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। রিফা'আ বলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় বেদুঈনের মত এক লোক আসল এবং সে সংক্ষিপ্তভাবে সালাত আদায় করল এবং তা শেষ করে নবী (সা)-কে সালাম করল। নবী করীম (সা) তাকে আলাইকা জানিয়ে বললেন, ফিরে যাও আবার সালাত আদায় কর। কারণ তুমি তো সালাত আদায় করনি। লোকটি ফিরে গিয়ে সালাত আদায় করে আবার এসে সালাম জানাল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ওয়া লাইকা জানালেন এবং বললেন, ফিরে যাও, আবার সালাত আদায় কর। তুমি তো সালাত আদায় করেনি। এ রূপ দু'তিন বার ঘটলে। প্রত্যেক বারেই লোকটি নবী করীম (সা)-এর নিকট এসে সালাম জানাছিলেন আর তিনি ওয়া লাইকা জানিয়ে বলছিলেন, ফিরে যাও, আবার সালাত আদায় কর। কারণ তুমি তো সালাত

৪৩. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৭০৮, পৃ. ৭২০।

www.pathagar.com

আদায় কর নি। উপস্থিত লোকেরা বিষয়টিকে খুবই ভারী মনে করল যে, কেউ সংক্ষিপ্তভাবে সালাত পড়লে তার যে সালাতই হবে না। যাহোক শেষে ঐ লোকটি বলল, আমাকে দেখিয়ে দিন, আমাকে শিখিয়ে দিন, আমি তো একজন মানুষ, অনেক সময় ঠিকও করি ভুলও করি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হ্যাঁ, শুন, সালাতের জন্য যখন দাঁড়াবে তার আগে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবিক অযূ করে নিবে। এরপর আযান দিবে, ইকামত দিবে। পরে কুরআনের কিছু যদি মুখস্থ থাকে তবে তা পড়বে, তা না হলে 'আল-হামদুলিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করবে। অতঃপর রুকূ' করবে এবং খুব ধীরস্থিরভাবে রুকূ' করবে। পরে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এর পর সিজ্‌দা করবে এবং তাতে ই'তিদাল বা শান্তভাব অবলম্বন করবে। পরে উঠে ধীরস্থিরভাবে বসবে। পরে উঠে দাঁড়াবে। এরূপ যদি করতে পার তবে তোমার সালাত পূর্ণ হবে। এতে যদি কিছু ত্রুটি হয় তবে তোমার সালাত ও ততটুকু ত্রুটিপূর্ণ হবে।

রিফা'আ (রা) বলেন, "এতে যতটুকু ত্রুটি হবে সালাত ও কতটুকু ত্রুটিপূর্ণ হবে"—এ কথাটি উপস্থিত লোকদের নিকট প্রথম কথার তুলনায় অনেকটা সহজ মনে হল। কারণ এক্ষেত্রে তো আগের মত পুরো সালাত বাতিল বলে গণ্য হয় নি।

এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে বলেন, রিফা'আর বর্ণিত হাদীসখানা হাসান। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আবু হুরায়রা ও আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির থেকেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে।[৪৪]

পর্যালোচনা ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসটি বুখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য তাতে এরূপ বর্ণিত রয়েছে। "বেদুঈন লোকটি বলল, ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে হক রূপে প্রেরণ করেছেন, আমি এর চেয়ে উত্তমরূপে নামায পড়তে পারি না। অতএব আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন নবী (সা) বললেন, যখন সালাতের জন্য দাঁড়াবে তখন তাকবীর দিবে। অতঃপর তুমি কুরআনের যা জান তা পড়বে। পরে ধীরস্থিরভাবে রুকূ' করবে।"

মোটকথা, রিফা'আ এবং আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বেদুঈন লোকটিকে পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা দেওয়ার বিবরণ রয়েছে।

উদ্দেশ্য যথাযথভাবে নামায আদায় করা। যাতে কোন প্রকারের ত্রুটি বিচ্যুতি না ঘটে। তিনি তাকে কুরআনের যে কোন অংশ যা তার সহজ বা তার ইয়াদ রয়েছে পড়তে বলেছেন। এমন কি কুরআন ইয়াদ না থাকাবস্থায় 'আল-হামদুল্লিাহ ওয়াল্লাহু আকবর ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ার অবকাশ প্রদান করেছেন এবং এতেই নামায বিশুদ্ধরূপে আদায় হওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। কিন্তু সূরা ফাতিহার কথা বলেন নি। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুনফারিদের জন্য নামায সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। ফরয বা রুকন নয়। যদি তাই হতো তাহলে নবী করীম (সা) অবশ্যই সে লোকটিকে সূরা ফাতিহা পড়ার অবশ্য কাজ ব্যক্ত করতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। অথচ সেটা ছিল শিক্ষা দেওয়ার অবস্থা।[৪৫]

---

৪৪. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা : সুনানে তিরমিযী, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া দেওবন্দ, সাহারানপুর : পরিচ্ছেদ ; নামাযের বিবরণ , খ. ১, পৃ. ৬৬।

৪৫. ই'লাউস্ সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২২।

www.pathagar.com

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنِ مُوْسَى الرَّازِىْ ، اَنَا عِيْسٰى ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُوْنَ الْبَصْرِى حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ النَّهْدِىْ حَدَّثَنِى اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ : لِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخْرَجَ فَنَادِ فِىْ الْمَدِيْنَةِ اَنَّهُ لاَ صَلاَةَ اِلاَّ بِقُرْاٰنِ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ .

رواه أبو داؤد ، وسكت عنه ورجاله كلهم ثقات مشهورون الا جعفر بن ميمون فقد تكلم فيه بعضهم ، وقال الحاكم فى المستدرك ، هو من ثقات البصريين وذكره ابن حبان وابن شاهين فى الثقات كذا فى تهذيب التهذيب وروى عنه يحى بن سعيد عند الحاكم فى المستدك ، قال الحاكم ويحى بن سعيد لا يحدث الا عن الثقات - اهـ .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, যাও মদীনায় ঘোষণা কর যে, কুরআন তিলাওয়াতে ব্যতীত নামায হবে না। যদিও ফাতিহাসহ অতিরিক্ত কিছু হোক।[৪৬]

পর্যালোচনা ঃ এ হাদীস থেকেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নয়; যদি ফরয হতো তাহলে নবী করীম (সা) আবূ হুরায়রা (রা)-কে এরূপ বলতেন, মদীনায় গিয়ে ঘোষণা দাও যে, সূরা ফাতিহা ব্যতীত সালাত সহীহ হবে না।

عَنْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ صَلاَةَ اِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَاٰيَتَيْنَ مَعَهَا .

رواه الطرانى "الاوسط" قلت ، هو فى الصحيح خلا قوله وايتين معها وفيه الحسن بن يحى الحسنى ضعفه النسائى والدار قطنى ، ووثقة دحيم وابن عدى وابن معين فى رواية اه مجمع الزوائد ، قلت والاختلاف لا يضر فالحديث حسن

হযরত উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, সূরা ফাতিহা ও তার সাথে দু' আয়াত না পড়লে সালাত হবে না।'[৪৭] (তাবারানী ও আওসাত)

পর্যালোচনা ঃ এ হাদীস থেকে আলোচ্য বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। কেননা সালাত সহীহ না হওয়ার বিষয়টি সূরা ফাতিহা সহ আরো দু' আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। দু' আয়াত বলতে সূরা মিলানো বুঝানো হয়েছে। আর সূরা মিলানো ফরয নয়, সুতরাং ফাতিহাও

---

৪৬. ই'লাউস্ সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৮, ৭২৯।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩২।

www.pathagar.com

ফরয নয়। কেননা وايتين معها এর মধ্যে واو হচ্ছে সংযোজনের অব্যয়। এটি তার পররর্তী বস্তুকে পূর্ববর্তী বস্তুর সাথে একই বিধানের অন্তুর্ভুক্ত করে। এখান হুকুম হলো নামায না হওয়া। সুতরাং তা যেমনি ফাতিহা না পড়ার সাথে যুক্ত, তেমনি তা দু'আয়াত বা সূরার সাথে সম্পৃক্ত হবে কিন্তু সূরা মিলানো ফরয় নয়, এতে দ্বিমত নেই। সুতরাং ফাতিহাও ফরয নয়। বরং ফাতিহা ওয়াজিব। অদ্রূপ সূরা মিলানাও ওয়াজিব।

বাহ্যত বিপরীতমুখী হাদীস সমূহের ব্যাখ্যা

কিন্তু কিছু হাদীস এরূপ রয়েছে যেগুলো দ্বারা বাহ্যত প্রতিভাত হয় যে, মুনফারিদের জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ফরয। অথচ গভীরভাবে পর্যবেক্ষন করলে প্রমাণিত হয় যে, সেসব হাদীস দ্বারা ফরয সাব্যস্ত হয় না, বরং ওয়াজিবই সাব্যস্ত হয়ে থাকে। নিম্নে সেগুলোর যথোচিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো।

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه مرفوعًا لا صلاة لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে মারফূ'রূপে বর্ণিত যে, সূরা ফাতিহা না পড়লে নামাযই হবে না।

এ হাদীস থেকে বাহ্যত প্রতিভাত হয় যে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয। হানাফী ফকীহগণ বলেন প্রথমত, এ হাদীস দ্বারা ফরয সাব্যস্ত করা কুরআনকে ডিঙ্গিয়ে বিধান আরোপ করার নামান্তর। কেননা, কুরআনের মধ্যে শুধু তিলাওয়াতকে ফরয করা হয়েছে, বিশেষভাবে সূরা ফাতিহা পড়ার ফরয করা হয়নি। ইরশাদ হচ্ছে فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ (কুরআনের যতটুকু পার তা পড়া) এখানে مَا শব্দটি ব্যাপক, এতে কুরআনের সমস্ত আয়াত ও সমস্ত সূরা শামিল, উসূলে ফিকহে বলা হয়েছে যে, ما দ্বারা কুরআনের ব্যাপক অর্থকে خاص করা যায় না। কেননা, হাদীস হচ্ছে ظَنِّىْ الدَّلَالَة আর কুরআন হচ্ছে قطعى الدلالة আর ظَنِّىْ الدَّلَالَة কে قطعى الدلالة এর মোকাবিলায় পেশ করা যায় না।[৪৮]

প্রশ্ন ঃ হাদীসটি مشهور হলে তা দ্বারা কুরআন নির্দেশিত বিধান অপেক্ষা বর্ধিত বিধান সাব্যস্ত করা জায়িয। আর এখানে হযরত উবাদার হাদীসটি مشهور কেননা ইমাম বুখারী (র) خلق افعال العباد এর মধ্যে এটিকে হিজায, ইরাক, সিরিয়া এবং মুহাদ্দিসদের মতে মাশহুর (مشهور) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

উত্তর ঃ আমরা মানি না যে, এটা مشهور কেননা مشهور বলা হয় ঐ হাদীসকে যা তাবিঈগণ সকলেই সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে নিয়েছেন। অথচ এ বিষয়ে তাদের মতপার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি আমরা এটিকে مشهور বলে মেনেও নেই তবু তার দ্বারা কিতাবুল্লাহ নির্দেশিত বিধানের উপর বৃদ্ধি করা যাবে না। কেননা مشهور হাদীস দ্বারা বৃদ্ধি করা জায়িয

---
৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৫।

www.pathagar.com

হতে হলে সেটির মর্ম ও ভাষ্য محكم তথা স্পষ্ট হতে হবে। সুতরাং তার মর্ম বা ভাষ্য محتمل (সাম্ভব্য মূলক) হলে তা দ্বারা কুরআনের নির্দেশিত বিধানের উপর বৃদ্ধি করা যাবে না। আর এ হাদীসটি محتمل পর্যায়ের। কেননা এ জাতীয় হাদীসে لا শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (ক) সহীহ্ বা জায়িয না হওয়া (খ) ফযীলত ও পূর্ণতা না পাওয়া। যথা ঃ لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ اِلاَّ فِى الْمَسْجِدِ , لاَ صَلاَةَ لِلْعَبْدِ الاَبِقِ حَتّٰى يَرْجِعَ ও وَلاَ وَضُوْءَ لِمَنْ لَّمْ يُسَمِّ এসব হাদীসের মধ্যে لا শব্দ দ্বারা অপূর্ণতা বুঝানো উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অশুদ্ধতা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। এমনিভাবে পবিত্র কুরআন বলা হয়েছে اِنَّهُمْ لاَ اَيْمَانَ لَهُمْ (তারা এমন লোক যাদের কোন শপথ নেই) আয়াতটির পূর্বাপর লক্ষ্য করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এখানে উদ্দেশ্য হলো, তাদের কসমটি বিশ্বাসযোগ্য নয় একথা বুঝানো। মোটেই তারা কসম করেনি এটা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। কেননা এর আগে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِنْ نَّكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ .

চুক্তির পর তারা যদি নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে-----) আর তার পরে বলেন ঃ اَلاَ تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نَّكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ তামরা কি সে সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। সুতরাং এখানে তাদের শপথটি সুদৃঢ় না হওয়ার বিষয়টি বুঝানো উদ্দেশ্য। যেহেতু হাদীসটির মধ্যে উভয়ার্থের সম্ভাবনা বিদ্যমান সেহেতু এটিকে বিশেষ কোন অর্থের জন্য প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায় না। কেননা নিয়ম রয়েছে যে কোন বক্তব্যের দ্ব্যর্থতা হলে তার প্রামাণ্যতা বাতিল হয়ে যায়।[৪৯]

দ্বিতীয়ত, এ হাদীসের মতই আরো কতিপয় হাদীস বর্ণিত রয়েছে। সেগুলোতে সূরা ফাতিহার সাথে আরো কিছু পড়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। যথা ঃ

(ক) لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا

সূরা ফাতিহা সহ আরো কিছু না পড়লে সালাত হবে না। (মুসলিম ও আবূ দাঊদ)

(খ) اُمِرْنَا اَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ

আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন সূরা ফাতিহা ও যতটুকু সহজ পড়ি।

(গ) لاَ صَلاَةَ اِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ مَّعَهَا

সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে একটি সূরা না পড়লে সালাত হবে না।

(ঘ) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ لاَ صَلاَةَ اِلاَّ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَمَعَهَا غَيْرُهَا

আবূ সাঈদ থেকে বর্ণিত, উম্মুল কুরআন ও তার সাথে অন্য সূরা না পড়লে সালাত হবে না। (মুসনাদে ইব্ন আবু শাইবা, মাজমাউয্যাওয়াইদ)

যদি বলা হয় যে হযরত উবাদা ইব্ন সামিতের সে হাদীস দ্বারা সূরা ফাতিহা পড়া ফরয বুঝানো উদ্দেশ্য তাহলে বলতে হবে যে, উক্ত হাদীসাবলীর আলোকে সূরা ফাতিহার সাথে

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫, ২৬, ২৭।

www.pathagar.com

আরো কিছু সূরা কিংবা আয়াত পড়াও ফরয। কেননা এসব হাদীসের বাচনধারা এক রকম। অথচ সূরা বা আয়াত মিলানোকে কেউই ফরয বলেন না। অতএব উপরোক্ত হাদীস চতুষ্টয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য ফকীহগণ যে ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন, হযরত উবাদার হাদীসের ক্ষেত্রে হানাফী ফকীহগণ সে ব্যাখ্যাই দিয়ে থাকেন।[৫০]

তৃতীয়ত, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমীরী (র) فَصْلُ الْخِطَابِ فِيْ مَسْئَلَةِ اُمِّ الْكِتَابِ গ্রন্থে হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন যে, এখানে لا শব্দটি দ্বারা সালাতের পূর্ণতা রহিতকরণ উদ্দেশ্য নয়: বরং এর দ্বারা মূল সালাতই রহিতকরণ উদ্দেশ্য। অবশ্য হাদীসের বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য হলো, নামাযের মধ্যে কিরা'আত না পড়লে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। যেন এখানে কিরা'আত দ্বারা শুধু সূরা ফাতিহা উদ্দেশ্য নয়, বরং কুরআন তিলাওয়াত উদ্দেশ্য। অতএব হাদীসের ব্যাখ্যা হবে, এরূপ ঃ কেউ যদি নামাযে কুরআন তিলাওয়াত না করে অর্থাৎ ফাতিহাও পড়ল না এবং অন্য সূরাও পড়ল না তাহলে তার নামায হবে না।

এর প্রমাণ হলো, কোন কোন বর্ণনায় হযরত উবাদা (রা)-এর হাদীসের শেষে فَصَاعِدًا শব্দটি বৃদ্ধি রয়েছে। এ বৃদ্ধি নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত। সুতরাং হাদীসখানা এরূপ হবে لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি ফাতিহা এবং অতিরিক্ত আরো অংশ না পড়বে তার নামায হবেনা। অতএব হাদীসের সার উদ্দেশ্য দাঁড়াবে এই যে, নামায না হওয়ার হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে, যখন তাতে একেবারেই কুরআন তিলাওয়াত না পাওয়া যায়। এ বিশ্লেষণ মোতাবিক হাদীসখানা হানাফী মাযহাবেরই একটি দলীল হিসাবে বিবেচিত হলো। এমন কি কোন কোন সূত্রে فَصَاعِدًا এর পরিবর্তে فَمَا زَادَ অথবা مَا تَيَسَّرَ অথবা وَايَتَيْنِ مَعَهَا শব্দও উল্লেখ রয়েছে। সনদ ও বর্ণনাগত দিক থেকে এগুলো সব সহীহ। ইতিপূর্বে এতদসংশ্লিষ্ট হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।[৫১]

চতুর্থত, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) উক্ত গ্রন্থে হাদীসটির আরেকটি চমৎকার বিশ্লেষণ পেশ করেছেন। সেটি হল, যে সমস্ত ফে'ল বা ক্রিয়া কোন অব্যয় যথা ঃ مِنْ ، بِ ، عَلٰى ، لِ ، فِى ইত্যাদির মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি مُتَعَدِّىْ হয় (অর্থাৎ مفعول (কর্মক) এর সাথে সম্পৃক্ত হয়) কখনো কখনো সেগুলো بِ (বা) অব্যয়ের মাধ্যমেও متعدى করা হয়। কিন্তু উভয় অবস্থায় অর্থগত পার্থক্য হবে। সুতরাং ب এর মাধ্যম ছাড়া متعدى হওয়ার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হবে যে, مفعول به অর্থাৎ যার সাথে فعل (ক্রিয়াটি) সম্পৃক্ত হয়েছে সেটাই পূর্ণরূপে উদ্দেশ্যে, এতে অন্য কোন مفعول এর সম্পৃক্ততা নেই আর ب এর মাধ্যমে متعدى হওয়ার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হবে যে, فعل টির সম্পর্ক শুধু উল্লেখিত مفعول এর সাথেই নয়, বরং অতিরিক্ত আরো কিছুর সাথেও। অর্থাৎ উল্লেখিত مفعول টি পূর্ণরূপে উদ্দেশ্য নয়। বরং তা সহ আরো অতিরিক্ত কিছু উদ্দেশ্য।

---

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৭।

৫১. আল্লামা তাকী উসমানী ঃ দরসে তিরমিযী ঃ দারুল কিতাব, দেওবন্দ, সাহারানপুর, পরিচ্ছেদ : ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না, খ. ১, পৃ. ৫১১।

www.pathagar.com

সুতরাং قرأ শব্দটি যদি মাধ্যম ব্যতীত متعدى করা হয় তাহলে তার مفعول হবে শুধু পঠিত বস্তু যা উল্লেখ থাকবে তাই অর্থাৎ শুধু তাই পড়া হবে, অন্য কিছু নয়। আর যদি ب এর মাধ্যমে متعدى করা হয় তাহলে তার مفعول হবে পাঠের জন্য উল্লেখিত বস্তু সহ আরো অতিরিক্ত কিছু।

অতএব যে সব হাদীসে নবী করীম (সা) -এর কিরা'আত সম্পর্কে এরূপ বলা হয়েছে ঃ

يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ ، قَرَأَ فِيْ الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ ، كَانَ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ ق وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ٠

তার অর্থ হবে তিনি কেবল সূরা তূর, সূরা কাফ পড়েন নি, বরং এর সাথে আরো কিছু পড়েছেন অর্থাৎ সূরা ফাতিহা। পক্ষান্তরে অপর একটি হাদীসে ب এর মাধ্যম ছাড়া বর্ণিত রয়েছে قَرَأَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ এখানে ب নেই। অতএব এর অর্থ হবে তিনি শুধু সূরা রাহমান পাঠ করেছেন। এর সাথে আর কিছু পড়েন নি। কাজেই হযরত উবাদার হাদীসে قرأ (পড়া) ক্রিয়াটি ب অব্যয়ের মাধ্যমে متعدى করা হয়েছে। এর দ্বারা এ কথাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, নামাযের মধ্যে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া হবে না ; বরং এর সাথে আরো অতিরিক্ত কিছু পড়া হবে। অর্থাৎ সূরা মিলানো হবে। অতএব হাদীসটির অর্থ হবে সূরা ফাতিহা ও তার সাথে আরো কিছু না পড়লে নামায হবে না। অর্থাৎ সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা এতদুভয়ের কোনটি না পড়লে নামায হবে না। শুধু ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না এটা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু অন্য সূরা ফরয নয়, সুতরাং বিশেষভাবে সূরা ফাতিহাও ফরয নয়। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী হাদীসখানা হানাফী মাযহাবেরই পক্ষে একটি প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হয়।[৫২]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِيْهِمَا اِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ...

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম (সা) দাঁড়িয়ে দু' রাক'আত নামায পড়লেন, তাতে তিনি সূরা ফাতিহা ব্যতীত আর কিছু পড়েননি।

হাদীসটি হাফিয ইব্ন হাজার (র) ফাতহুল বারীতে আর ইব্ন খুযাইমা (র) স্বীয় সহীহে উল্লেখ করেছেন।

হানাফী ফকীহগণের মতে এ হাদীসের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

(ক) এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি আমলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে বিভিন্ন সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং তা প্রমাণযোগ্য হতে পারে না।

(খ) এ হাদীস বর্ণিত বিষয়টি হচ্ছে রাসূলের فعل তথা আমল মাত্র। আর নামাযে ফাতিহার সাথে সূরা মিলানো ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি রাসূলের قول তথা বাণী। নিয়ম হলো قولى حديث এবং فعلى حديث এর মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে قولى حديث প্রাধান্য পায়। সুতরাং নামাযে কিরা'আতের ক্ষেত্রে রাসূলের قولى حديث ই আমলযোগ্য হবে।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১০।

www.pathagar.com

(গ) হতে পার রাসূলুল্লাহ (সা) জিহাদ বা এ জাতীয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকায় সংকটাপন্ন অবস্থায় বা সময় সংকীর্ণতার দরুন শুধু সূরা ফাতিহা দ্বারা নামায শেষ করেছেন। আর শরী'আতের দৃষ্টিতে এরূপ চরম মুহূর্তে সূরা মিলানোর ওয়াজিব রহিত হয়ে যায়।

আল্লামা মুহাম্মদ ইব্ন আবিদীন শামী (র) বলেন, বলা হয়েছে যে, কেউ যদি জামা'আত ছুটে যাবে বলে আশংকা করে তাহলে সে ফজর অথবা যুহরের সুন্নাতে সানা, আউযুবিল্লাহ বাদ দিয়ে শুধু ফাতিহা ও একটি তাসবীহ পাঠ করলে যথেষ্ট বিবেচিত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা তাহতাবী (র) 'মারাকিল ফালাহ'র পাদ টীকায় বলেন যে, এটা এবং এর পূর্বে যা বলা হয়েছে তখন ওয়াজিব হবে, যদি আদায়ের জন্য পর্যাপ্ত সময় হাতে থাকে। অতএব যদি এ আশংকা সৃষ্টি হয় যে, যদি ফাতিহার সাথে সূরা মিলানো হয় কিংবা ফাতিহা পূর্ণরূপে পড়া হয় কিংবা এক আয়াতের চেয়ে বেশি পড়া হয় তাহলে সময় শেষ হয়ে যাবে ও ওয়াক্ত পাওয়া যাবে না। তাহলে প্রতি রাক'আতে একটি করে আয়াত তিলাওয়াত করবে।

(ঘ) হতে পারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উদ্দেশ্য হলো এরূপভাবে নামায জায়িয বলে গণ্য হওয়া। কেননা হানাফী ফকীহদের মতে সূরা মিলানো ব্যতীত শুধু ফাতিহা পাঠ করলে নামায জায়িয বলে গণ্য হয়, তবে মাকরূহ। ফাতাওয়া আলমগীরীতে বলা হয়েছে, কেউ যদি নামাযে শুধু ফাতিহা কিংবা ফাতিহারও একটি আয়াত কিংবা দুই আয়াত পড়ে তা মাকরূহ হবে। (মুহীত) কিন্তু যেহেতু নবী করীম (সা) উম্মতের জন্য বিধান প্রণয়ন করার উদ্দেশ্য এরূপ করেছেন (অর্থাৎ শুধু সূরা ফাতিহা দিয়ে নামায পড়েছেন) সেহেতু তার নামাযটি বিশুদ্ধ হবে। তাতে মাকরূহের কোনরূপ ছোঁয়া নেই।[৫৩]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ فِىْ كُلِّ صَلَاةٍ يَقْرَأُ فَمَا اَسْمَعَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا اَخْفَى عَنَّا اَخْفَيْنَا عَنْكُمْ وَاِنْ لَّمْ تَزِدْ عَلٰى اُمِّ الْقُرْاٰنِ اَجْزَأَتَ ، وَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ ...... اهـ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক নামাযে কিরা'আত রয়েছে। যা কিছু রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের স্বরবে পড়েছেন। আমি তা তোমাদের সামনে স্বরবে পড়েছি আর যা তিনি নীরবে পড়েছেন আমি তা তোমাদের সামনে নীরবে পড়েছি। অবশ্য তুমি যদি ফাতিহার চেয়ে বেশি কিছু না পড় তাহলে নামায আদায় হয়ে যাবে। আর যদি আরো কিছু অতিরিক্ত পড় তাহলে তা উত্তম হবে।

এ হাদীস থেকে প্রতিভাত হয় যে, সূরা ফাতিহাই নামাযে পড়া ফরয, এছাড়া অন্য সূরা পড়া না পড়ার মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। তবে পড়া উত্তম।

উত্তর (ক) এর উত্তরে হানাফী ফকীহগণ বলেন যে, আবূ হুরায়রা (রা)-এর এ কথাটি وَاِنْ لَّمْ تَزِدْ عَلٰى اُمِّ الْقُرْاٰنِ اَجْزَاَتَ وَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ তার থেকে موقوف রূপে বর্ণিত অর্থাৎ এটা তার নিজস্ব অভিমত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নয়। এর প্রমাণ হলো, 'নায়লুল আওতার' গ্রন্থকার এ হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন, কথার ধারা প্রসঙ্গ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তার এ

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩২,৭৩৩।

www.pathagar.com

কথাটি ......وَإِنْ تَزِدْ মারফূ' তথা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শ্রুত নয়। এমন কি তা মারফূ' এর পর্যায়ভুক্ত ও নয়। সুতরাং আলোচ্য বিষয়ে তা প্রমাণযোগ্য হতে পারে না।

(খ) তাছাড়া মাওকুফ এবং মারফূ' এর মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে মারফূ' প্রাধান্য পায়। যেহেতু আবূ হুরায়রা (রা)-এর এ কথাটি মাওকূফ। সুতরাং তা এতদ্‌সম্পর্কীয় মারফূ' হাদীসের মোকাবিলায় আসার কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত এ হাদীসটি হানাফী মাযহাব সম্মত। কেননা হানাফী মাযহাব বিশেষ ক্ষেত্রে নামায সহীহ তথা ফরয কিরা'আত আদায়ের জন্য শুধু ফাতিহা এবং একটি আয়াতই যথেষ্ট বলে বিবেচিত। আর وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ (অতিরিক্ত পড়লে উত্তম হবে) থেকে প্রতীয়মান হয় না যে, সূরা মিলানো ওয়াজিব নয়। কেননা خَيْرٌ (উত্তম) শব্দটি ওয়াজিব ও মুস্তাহাব উভয়কে শামিল করে থাকে। কারণ, কোন কিছু ওয়াজিব হয়েও উত্তম হতে পারে আবার মুস্তাহাব হয়েও উত্তম হয়ে থাকে। আর সাহাবা ও তাবিঈগণের পরিভাষায় ওয়াজিব বিষয়াদির ক্ষেত্রে সুন্নাত শব্দের অহরহ ব্যবহার পাওয়া যায়।[৫৪]

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৩,৭৩৪।

www.pathagar.com

ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরা'আত পড়া জায়িয নয়

নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করা ফরয। সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। তবে এটি হচ্ছে মুনফারিদ (একাকী নামায আদায়কারী) এবং ইমামের আমল মুক্তাদীর নয়। মুক্তাদী ইমামের পিছনে চুপ থাকবে, তবে কিরা'আত মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে। উল্লেখ্য, নামায দু'প্রকার ঃ যাহরী নামায যাতে কিরা'আত সশব্দে পড়া হয়। আর সিররী নামায যাতে কিরা'আত নিঃশব্দে পড়া হয়।[১] উভয় ধরনের নামাযেই মুক্তাদীর জন্য ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়া জায়িয নয়।

---

১. উল্লেখ্য সিররী নামায সম্পর্কে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) থেকে পাঁচটি অভমত বর্ণিত রয়েছে। (১) ওয়াজিব, (২) মুস্তাহাব (৩) মুবাহ, (৪) মাকরূহে তাহরীমী (৫) মাকরূহে তানযিহী। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো মাকরূহে তাহরীমীর অভিমত। এটাই হলো যাহেরী রিওয়ায়াত। পক্ষান্তরে মুস্তাহাবের রিওয়ায়াতটি যাহরী রিওয়ায়াত নয়। উসূলে ইফতার নিয়ম মুতাবিক যাহেরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী ফাতওয়া দেওয়া ও আমল করা ওয়াজিব। আল্লামা ইত্বকানী (র) গায়াতুল বায়ানের মধ্যে এটাকেই যথাযথভাবে সাব্যস্ত করেন। আল্লামা ইবনে নুজাইম মিসরী (র) আল-বাহরুর রাইকের মধ্যে এটাই প্রমাণিত করেন। তিনি হিদায়ায় বর্ণিত ইমাম মুহাম্মদের মুস্তাহাবের অভিমতটিকে খণ্ডন করে বলেন, সঠিক কথা হলো ইমাম মুহাম্মদের অভিমতটি ইমাম আযম আবূ হানীফাও আবূ ইউসুফের ন্যায়। কেননা তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর ভাষ্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে তিনি এ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেননি। কেননা তিনি 'কিতাবুল আসারে" (কিরা'আত খালফাল ইমাম পরিচ্ছেদে) হযরত আলকামা ইবনে কায়স সম্পর্কে এ অভিমত-যে তিনি কখনো যাহরী ও সিররী নামাযে কিরা'আত পড়েননি–বর্ণনা করার পর বলেন, এটাই আমাদের মাযহাব। এরপর বলেন, মুহাম্মদের (আমার) মতে কোন প্রকার নামাযে ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়া উচিত নয়। মু'আত্তার মধ্যেও তিনি এরূপ ব্যক্ত অভিমত করেছেন। এরই ভিত্তিতে আল্লামা কামাল ইবনুল হুমাম (র) ফাতহুল কাদীরে "কিরা'আত পরিচ্ছেদে" ইমাম মুহাম্মদের মুস্তাহাবের অভিমতটিকে দুর্বল বলে সাব্যস্ত করেন। তাছাড়া তিনি বলেন, واذا قُرِى القران فاستمعوا له وانصتوا (কুরআন পড়া হলে তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক) এ আয়াতের মধ্যে দু'টি জিনিস উদ্দেশ্য ; استماع (শ্রবণ) এবং سُكونت চুপ থাকা। তন্মধ্যে শ্রবণের বিষয়টি জাহরী নামাযের সাথে খাস। আর سَكونت চুপ থাকবে বিষয়টি সর্বপ্রকার নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং সিররী নামাযেও চুপ থাকার নির্দেশ পালনার্থে কিরা'আত পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে (আল্লামা ইউসুফ বানুরী মা'আরিফুস্ সুনান; মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত। প্রসঙ্গ : কিরা'আত খালফাল ইমাম; সম্পর্কে ইমামদের মতামত পৃ. ১৮৮, খ, ৩)

ইমামুল কালাম গ্রন্থে বলা হয়েছে, সতর্কতা অবলম্বনার্থে ইমামের পিছনে যাহরী নামাযে কিরা'আত পড়া সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ। আর সিররী নামায সম্পর্কে কারো কারো অভিমত হলো মাকরূহ নয়। তবে বিশুদ্ধতম অভিমতে মাকরূহ। (আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান : দারুল ফিকর লেবানন, খ ৩, পৃ. ১১৩৬)

শারহুন নুকায়া গ্রন্থকার আল্লামা বারজান্দী (র) বর্ণনা করেন, ইমাম আবূ হাফস কবীর (র) বলেন, মুক্তাদীর জন্য সিররী নামাযে কিরা'আত পড়া মাকরূহ। তবে কেউ কেউ বলেন যে, ইমাম মুহাম্মদের (র) মতে মাকরূহ নয়, আর শাইখাইন অর্থাৎ ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফের (র) মতে মাকরূহ, এটাই হলো বিশুদ্ধতম অভিমত। মোল্লা আলী কারী হানাফী (র) মিরকাতুল মাফাতীহে লিখেন যে, ইমাম আযম আবু হানীফার মাযহাব হলো, যাহরী ও সিররী কোন নামাযেই ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়া যাবে না। (ই'লাউস্ সুনান, প্রাগুক্ত পৃ. ১১৩৭)

অবশ্য কিছু সংখ্যক হানাফী ফকীহ একদসংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সমন্বয় সাধন পূর্বক মতনৈক্যের ঝঞ্ঝাট থেকে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে আমলী সতর্কতার প্রতি বিবেচনা করে ইমাম মুহাম্মদের অনুসরণে এমত ব্যক্ত করেছেন যে, সিররী নামাযে ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়া ওয়াজিবও নয়, আবার মাকরূহও নয়। বরং মুস্তাহাব, পড়ে নেওয়া ভাল না পড়লেও চলবে। (গবেষক)

www.pathagar.com

এখানে কিরা'আত দ্বারা উদ্দেশ্য সূরা ফাতিহা পড়া। কেননা অন্য সূরা পড়া নাজায়িয সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই। অতএব যেমনি ইমামের পিছনে অন্য সূরা পড়া জায়িয নয়, তেমনি ফাতিহা পড়াও জায়িয নেই। ইমামের কিরা'আতই তার কিরা'আতের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হবে, যাহেরী রিওয়ায়াত মোতাবিক ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়া মাকরূহে তাহরীমী; এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত এবং এ অভিমতই ফাতওয়ার জন্য গৃহীত।[২]

এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সা) সাহাবীগণ এবং তাবিঈনে কেরাম থেকে বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে তা পেশ করা হল। হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيْ الصَّلَاةِ فَسَمِعَ قِرَاءَةَ فَتًى مِّنَ الْاَنْصَارِ فَنَزَلَ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا .

أخرجه البيهقى : قال العلامة ظفر أحمد العثمانى : واثر مجاهد هذه ذكره الحافظ فى الدراية والبيهقى فى كتاب القراءة ولم يطعنه أحد بشى غير انه قال : هذا مرسل .

১. মুজাহিদ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে কিরা'আত পড়তেন। একদা তিনি কোন এক আনসারী যুবকের কিরা'আত শুনতে পেলেন, তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, "যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক।"[৩]

পর্যালোচনা ঃ পবিত্র কুরআনের এ আয়াত وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا-এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কুরআন তিলাওয়াতের সময় তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতে এবং চুপ

শাইখুত্ তাসলীম নিযামুল মিল্লাত ওয়াদ্দীন আল্লামা আব্দুর রহীম (র) বলতেন, নামাযের ক্ষেত্রে সতর্কতা প্রদশনার্থে কিরা'আত পড়ে নেওয়া মুস্তাহাব। তিনি বলতেন যে, কিয়ামতের দিবসে আমাকে (আমাকে কিরা'আত না পড়ার দায়ে) তোমার নামায হয়নি-এ কথা বলার চেয়ে আমার মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লেখা অধিক শ্রেয়। ইমামুল কালামে বলা হয়েছে, এ মাস'আলায় হানাফীদের তৃতীয় অভিমত হলো, যাহরী নামাযে কিরা'আত পড়া মাকরূহ আর সিররী নামাযে পড় উত্তমও মুস্তাহাব ইমাম মুহাম্মদের এক বর্ণনানুযায়ী। শাইখুত্ তাসলীম আল্লামা আব্দুর রহীম এবং ইমাম আবূ হাফস কাবীর এটাই গ্রহণ করেছেন। হানাফী ও সূফিয়ায়ে কেরামের একটি দল এ মতাবলম্বন করেন।
তাফসীরে আহমদী গ্রন্থকার বলেন, এ বিষয়ে মতনৈক্যের পরিধি এরূপ সীমা ছাড়িয়ে গেছে যে, আবূ হানীফা (র)-এর মতে কিরা'আত পড়লে হুমকি বা শাস্তিযোগ্য হয় আর শাফিঈ (র)-এর মতে কিরা'আত না পড়লে হুমকি বা শাস্তিযোগ্য হয়। আমরা যদি সুফিয়ায়ে কেরাম এবং হানাফী মাশায়েখের প্রতি লক্ষ করি তাহলে দেখা যাবে যে, তাদের মতে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর জন্য ফাতিহা পড়া উত্তম। মোল্লা আলী ক্বারী (র) এতদসম্পর্কীয় বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করার এক পর্যায়ে বলেন, ইমাম মুহাম্মদ সিররী নামাযে শাফিঈ (র)-এর সমমত ব্যক্ত করেন। আর এটাই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ এ মতানুসারে সকল রিওয়ায়াতের মাঝে সমন্বয় সাধিত হয়।
(ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩৭)

২ আল্লামা ইবন আবেদীন শামী ঃ রাদ্দুল মুহতার ঃ মাকাতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ, ভারত পরিচ্ছেদ কিরা'আত! অধ্যায় সালাত, খ ২, পৃ. ২৬৬।
শাইখুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন মুরগীনানী : হিদায়া: ইয়াসির নাদীম এণ্ড কোম্পানী দেওবন্দ, ভারত, পরিচ্ছেদ, কিরা'আত : খ., ১, পৃ. ১২০।

৩. আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান : দারুল ফিকর লেবানন, পরিচ্ছেদ واذا قرى القران فاستمعوا له وانصتوا আয়াতের ব্যাখ্যা, যাহরী ও সিররী নামাযে ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়া নিষিদ্ধ এবং মুক্তাদীর জন্য তার ইমামের কিরা'আত যথেষ্ট : খ ৩, পৃ. ১০৭৬ , হাদীস নং ১০৪০

www.pathagar.com

থাকতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তবে এটি কখন প্রযোজ্য আর আয়াতটি কোন প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, বিভিন্ন হাদীসে তার বিশুদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায়। হযরত মুজাহিদের হাদীস থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে,উক্ত আয়াত নামাযের তিলাওয়াত প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় মুক্তাদির জন্য ইমামের পিছনে কিরা'আত জায়িয নয়। এ সময় কিরা'আত করার অর্থ হবে কুরআনের বিরোধিতা করা। এ রিওয়ায়াতটি যদিও مُرْسَلٌ কিন্তু তা সুনিশ্চিতরূপে গ্রহণযোগ্য, কেননা এটা হচ্ছে মুজাহিদ কর্তৃক মুরসাল।

মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণের মতে তিনি কুরআনী তাফসীর সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ। তিনি রইসুল মুফাস্‌সিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর প্রকান্ত সুযোগ্য শাগরিদ, তিনি একজন সুমহান তাফসীর বিশারদ এ শাস্ত্রে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্বের অধিকারী ও উচ্চ শিখরে আরোহণকারী। নিম্নের ঘটনাটি থেকেই তার পাণ্ডিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আবূ নু'আইম 'হিলয়াতুল আউলিয়ায়' বর্ণনা করেন, মুজাহিদ বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-এর দরবারে শুধু এ উদ্দেশ্যে যেতাম যে তাঁর খিদমত করব এবং তাঁর ইলম আমল দ্বারা উপকৃত হবো। কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর খিদমত করার সুযোগ না দিয়ে তিনি নিজেই আমার খিদমত শুরু করতেন, কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত ইব্‌ন উমর (রা) মুজাহিদ (র)-এর রিকাব ধরে চলতেন এ কারণেই তাফসীর বিষয়ে তাঁর মুরসাল রেওয়ায়াত প্রমাণযোগ্য।[৪]

তাছাড়া মুহাদ্দিসীনে কেরাম মুজাহিদের মুরসাল রিওয়ায়াতবলী সম্পর্কে সুমন্তব্য পেশ করেছেন। তাদরীবুর রাবী গ্রন্থকার বলেন, ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) বলেন, আমার নিকট সাঈদ ইব্‌ন জুবাইরের মুরসাল রিওয়ায়াতবলী হযরত আতা'র মুরসাল রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিক শ্রেয়। বলা হলো, তাহলে, আপনার নিকট মুজাহিদের মুরসাল অধিক শ্রেয় না তাউসের মুরসাল? বললেন, তাঁদের মধ্যে যার মুরসাল রিওয়ায়াত অধিকতর। তাহযীবুত্ তাহযীব গ্রন্থকার বলেন, আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, আমার নিকট মুজাহিদের মুরসাল আতা ইব্‌ন কাসীরের মুরসাল অপেক্ষা অধিক শ্রেয়। অধিকন্তু মুরসাল হাদীস আমাদের নিকট প্রমাণযোগ্য। বিশেষত যদি তা অন্য হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়ে থাকে। আর মুজাহিদের এ হাদীসটি নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন রিওয়ায়াত দ্বারা সমর্থিত।

(ক) যুহরীর মুরসাল ঃ তিনি বলেন, এ আয়াতখানা একজন আনসারী যুবক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। ঘটনা হলো, রাসূলুল্লাহ (সা) যখনই কোন কিছু পড়তেন সেও তা পড়ত। তখন নাযিল হলো ঃ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا

এ হাদীসের সনদে বিদ্যমান সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। কেননা আবূস সাইব সাল্‌ম ইবন জুনাদাহ আস-সুওয়ায়ী তিরমিযী, ইবন মাজাহ এবং বুখারীর জামে ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থাবলীর রাবী। আবূ হাতেম নাসাঈ তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেন। আবূ বকর বারকানী বলেন, তিনি সিকা এবং আস্থাযোগ্য ও সহীহ হাদীস বর্ণনাকারী। এরূপ হাযস ইব্‌ন গিয়াস সিহাহ সিত্তা গ্রন্থকারগণের রাবী আর আশ'আস ইব্‌ন মাওয়ার আল-কিন্দি হচ্ছেন ইমাম

৪. আল্লামা তাকী উসমানী : দরসে তিরমিযী; দারুল কিতাব দেওবন্দ ভারত, পরিচ্ছেদ : কিরা'আত খালফাল ইমাম : খ., ২, পৃ. ৮৭

www.pathagar.com

মুসলিমের রাবী। ইবনে সাঈদের মতে তিনি সিকা। বায্যার বলেন, আমার মতে স্বল্পজ্ঞানের অধিকারী ব্যতীত কেউই তার হাদীস বর্জন করেনি।

আর যুহরীর মুরসাল যদিও দুর্বল বলে কারো কারো মন্তব্য রয়েছে। কিন্তু তা মুজাহিদের মুরসাল দ্বারা সমর্থিত বিধায় প্রমাণযোগ্য।[৫]

(খ) মূসা ইবন আব্দুর রহমান মাসরুকী থেকে বর্ণিত মু'আবিয়া ইব্ন কুররা বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর জনৈক সাহাবী অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইব্ন মুগাফফালকে জিজ্ঞাসা করলাম, যে কুরআন শ্রবণ করবে তার জন্য শ্রবণ ও চুপ থাকার এ বিধান? উত্তরে তিনি বলেন, এ আয়াতটি وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا তো ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়া প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। সুতরাং ইমাম যখন কিরা'আত পড়বে তখন তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে এবং চুপ থাকবে।

এ হাদীসের সনদে বিদ্যমান রাবীদের মধ্যে আবুল মিকদাম ব্যতীত বাকি সকলেই সিকা। আবুল মিকদাম দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও ওয়াজী', যায়দ ইবন হুবাব, নাযব ইব্ন শুমাইল ও ইয়াযীদ ইব্ন হারূন প্রমুখ তাঁর রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন।

তাছাড়া এতদসংশ্লিষ্ট অপরাপর রিওয়ায়াতবলী দ্বারা এটি সমর্থিত এবং এর বিভিন্ন شاهد বিদ্যমান বিধায় তা হাসানের পর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং এটিকে মুজাহিদের হাদীসটির متابع হিসাবে উল্লেখ করা যথাযোগ্য গণ্য হবে।[৬]

(গ) ইমাম বায়হাকী কিতাবুল কিরা'আতে নিজ সনদে আব্দুল ওয়াহহাব সাশফীর সূত্রে মুহাজির থেকে বর্ণনা করেন যে, আবুল আলিয়া বলেন, একদা নবী করীম (সা) নামাযে কিরা'আত পড়া কালে তার সাহাবীরাও কিরা'আত পড়লেন। তখন নাযিল হলো ঃ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا এর পর থেকে লোকেরা চুপ থাকত আর নবী করীম (সা) পড়তেন।

পর্যালোচনা ঃ ইমাম বায়হাকী (র) যদিও হাদীসটিকে মুনকাতি' বলে আখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু তা আমাদের নিকট প্রমাণযোগ্য। উল্লেখ্য বায়হাকী এর কোন রাবী সম্পর্কে কালাম করেননি। অথচ তিনি 'কিতাবুল কিরা'আত' গ্রন্থে উল্লেখকৃত স্বমাযহাব বিরোধী হাদীসমূহের কোনটি সম্পর্কে কালাম না করে ছাড়েননি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটির সনদে বিদ্যমান সকল রাবী নির্ভরযোগ্য।[৭]

(ঘ) বশীর ইব্ন জাবির কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) নামায পড়া সময় শুনতে পেলেন কিছু লোক ইমামের সাথে কিরা'আত পড়ছে। নামায শেষ করার পর তিনি বললেন, তোমাদের কি এখনো বুঝ হয়নি, তোমাদের কি এখনো وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا এ আয়াতের মর্ম উপলব্ধি (করে তদনুযায়ী আমল) করার সময় হয়নি।

---

৫. ই'লাউস্ সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮৭।

৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭৮-১০৭৯।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭৯-১০৮০।

www.pathagar.com

এটি ইমাম তাবারী (র) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন, এর সনদে বিদ্যমান রাবীগণ সকলে সিহাহ্ সিত্তার রাবী'। ইমাম বায়হাকী ও এটি কিতাবুল কিরা'আতে উল্লেখ করে এ সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। মোটকথা, সার্বিক বিচারে হাদীসখানা সম্পূর্ণ সহীহ।[৮]

(ঙ) ইব্‌ন হুবাইরা থেকে বর্ণিত, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলতেন যে, এ আয়াতটি وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيْفَةً ফরয নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর বিভিন্ন কিচ্ছা কাহিনী তথা ওয়ায নসীহত এবং নামাযের বাহিরে তিলাওয়াত করার বিষয়টি নফল বলে গণ্য। একদা নবী করীম (সা) ফরয নামাযে কিরা'আত করলেন, তাঁর সাথে সাহাবীরাও কিরা'আত পড়লেন। এতে তাঁর কিরা'আত এলোমেলো হয়ে গেল। তখন নাযিল হলো وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ এ আয়তটি ফরয নামায সম্পর্কে প্রযোজ্য।

এ হাদীসটিও ইবন জারীর কর্তৃক বর্ণিত, এর সনদে বিদ্যমান রাবী সকলেই সিকা। তবে হাদীসটি মুনকাতি'। কেননা ইব্‌ন হুবাইরা ইব্‌ন আব্বাসের সাক্ষাত পাননি। মূলত তিনি তাঁর আযাদকৃত গোলাম ইকরিমার সূত্রে বর্ণনা করেন, তবে আমাদের নিকট ইনকিতা' দলীলের ক্ষেত্রে তেমন ক্ষতিকারক নয়।[৯]

(চ) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা নামাযে কথা বলত। তখন وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ এসহ আরেকটি আয়াত নাযিল হলো, তখন তাদেরকে নামাযে নীরব থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এটিও ইমাম তাবারী কর্তৃক বর্ণিত।

এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই সিকা। তবে ইব্‌রাহীম হাজারী সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি لين الحديث। কিন্তু এতে কোন সমস্যা নেই। কেননা এটা অন্যান্য রিওয়ায়াত দ্বারা সমর্থিত।[১০]

(ছ) মুসাইয়্যির ইব্‌ন রাফি' বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বলতেন, আমাদের লোকেরা একে অপরকে নামাযের মধ্যে এভাবে সালাম দিত যে অমুকের উপর সালাম, অমুককে সালাম। তখন কুরআনের এ আয়াত وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا নাযিল হলো।

এটিও ইমাম তাবারী কর্তৃক বর্ণিত। এর রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। সিহাহ্ সিত্তার লেখকগণ তাঁদের হাদীস গ্রহণ করেছেন।[১১]

কেউ কেউ এ আয়াতটিকে জুমু'আর খুৎবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে বলে চালানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। প্রথমত, এ আয়াতটি মাক্কী, আর জুমু'আ ফরয হয়েছে মদীনা শরীফে। দ্বিতীয়ত, উক্ত আয়াতে কুর'আন পড়া প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অথচ খুৎবার সারা অংশ আয়াতে কুর'আন নয়। এবং কিছু আয়াত, কিছু হাদীস আর কিছু কথার সমষ্টি হচ্ছে খুৎবা। পক্ষান্তরে নামাযের মধ্যে পাঠ্য কিরা'আতের সবটুকুই কুরআনের আয়াত; সুতরাং আয়াতটি সুনিশ্চিতরূপে নামাযের কিরা'আত প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয়েছে।[১২] অবশ্য নামাযের

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭৭-১০৭৮ হাদীস নং ২০৪১।

৯. প্রাগুক্ত, ১০৭৯-১০৮০।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭৬ হাদীস নং ১০৪০।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭৫ হাদীস নং ১০৩৯।

১২. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

www.pathagar.com

সাথে বিশেষ সামঞ্জস্যের কারণে তা খুৎবা প্রসঙ্গে প্রযোজ্য বলেও বিবেচিত। কেননা ইমামের খুৎবা চলাকালে মনোযোগসহ ও চুপথাকা সম্পর্কে সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেন। কারণ এ সম্পর্কে বিশুদ্ধরূপে নবী করীম (সা) থেকে বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে।[১৩]

কেউ কেউ এখানে বলতে চেয়েছেন যে, হযরত মুজাহিদের অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে এ আয়াতটি জুমু'আর খুৎবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে রিওয়ায়াতটি এ রকম ঃ

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا আয়াতটি জুমু'আর খুৎবা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (বায়হাকী ঃ কিতাবুল কিরা'আত খালফাল ইমাম, ইদারায়ে ইহইয়াউস্ সুন্নাহ, গুজরানাওয়ালা, পরিচ্ছেদ ঃ কিরা'আত খলফাল ইমামে ওয়াজিবুন–এ অভিমত ব্যক্তাকারীদের প্রমাণ প্রসঙ্গে)

এর উত্তরে বলা যায় যে, আল্লাম সুয়ূতী (র) আল-ইতকানে আর হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) ফাওযুল কাবীরে আয়াত নাযিলের প্রসঙ্গ ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে একটি একটি সুন্দর নিয়ম বর্ণনা করেছেন, যে, কোন কোন সময় সাহাবীও তাবিঈ কোন আয়াত সম্পর্কে ঘটনা বর্ণনার প্রাক্কালে বলে থাকেন যে, نَزَلَتِ الْاٰيَةُ فِىْ كَذَا অথবা نَزَلَتْ فِىْ كَذَا ইত্যাদি। এ জাতীয় শব্দের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এ ঘটনাটিই এ আয়াতের শানে নুযূল। বরং উদ্দেশ্য হলো এ ঘটনাটি ও উক্ত আয়াতের প্রয়োগস্থল ওরা অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আলোচ্য বিষয়ে হযরত মুজাহিদের কথা "আয়াতটি খুৎবা সম্পর্কে" ঐ জাতীয় একটি শব্দই মাত্র। অর্থাৎ এখানে তাঁর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আয়াতটি জুমু'আর খুৎবা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা এরূপ হলে তা ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্ভব হবে। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। আর জুমু'আ ফরয হয়েছে মদীনায়। অন্যদিকে মুজাহিদ স্বয়ং ব্যক্ত করেছেন যে, এটি নামায প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং মুজাহিদের উভয় রিওয়ায়াতের ফলাফল এ দাঁড়াচ্ছে, মূলত আয়াতটি নামায প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ। তবে বিশেষ সামঞ্জস্যের নিরিখে খুৎবাও তার পর্যায়ভুক্ত।[১৪]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইব্ন তাইমিয়্যাহ তাঁর 'ফাতাওয়ায়" লিখেন, যুক্তিগত দিক থেকে উক্ত আয়াতে তিনটি সম্ভাবনা বিদ্যমান, (ক) আয়াতটি শুধু নামায সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (খ) নামায এবং খুৎবা উভয়টি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (গ) শুধু খুৎবা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, নামায সম্পর্কে নয়। প্রথমোক্ত সম্ভাবনাদ্বয় থেকে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। কিন্তু শেষোক্ত ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়। তবে এ অভিমতটি প্রত্যাখ্যাতও অগ্রহণযোগ্য। কেননা আয়াতটি হচ্ছে মাক্কী। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এ আয়াতটি যাহরী নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সিররী নামাযের ক্ষেত্রে নয়। কেননা যা মোটামোটি শুনা যায় সেটাই মনোযোগ দিয়ে শ্রবণযোগ্য। আর সিররী নামাযে যাতে কিরা'আত শোনা যায় না-সে ক্ষেত্রে মনোযোগসহ শ্রবণ ও চুপ থাকার নির্দেশ প্রদান নিরর্থকই বটে।[১৫]

এর উত্তরে বলা যায় যে, দু'টি জিনিসের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, (ক) استماع অর্থাৎ মনোযোগসহ শ্রবণ করা (খ) اِنْصات অর্থাৎ চুপ থাকা এ দু'টি এক নয়। এতদুভয়ের মাঝে

---

১৩. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত পৃ. ১০৭৬।

১৪. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮, ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮০।

www.pathagar.com

পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং কোন কিছু মোটামোটিভাবে শুনতে না পারা গেলে সেসম্পর্কে استماع তথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণের নির্দেশ প্রদান নিরর্থক ও অসঙ্গতিপূর্ণ বটে। তবে انصات এর বিষয় এরূপ নয়। কেননা তার অর্থ শুধু চুপ থাকা। এতে কর্ণপাত নিষ্প্রয়োজন। অভিধানে রয়েছে, نَصَتَ يَنْصِتُ ,أَنْصَتَ ও اِنْتَصَتَ। অর্থাৎ চুপ হলো। نُصْتَةٌ অর্থাৎ চুপ। বলা হয় هُوَ أَنْصَتَ لَهُ সে চুপ থেকে তার কথার প্রতি মনোযোগ দিয়েছে। আর اَنْصَتَهُ এর অর্থ সে তাকে চুপ করিয়েছে। এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে انصات এর অর্থ চুপ থাকা, শ্রবণ করা নয়। অবশ্য أَنْصَتَ لَهُ-র দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয় -(ক) চুপ থাকা, (খ) কারো কথা মনোযোগসহ করা। যেহেতু আয়াতের মধ্যে দু'টি শব্দ প্রয়োগে করা হয়েছে استماع এবং انصات। আর এ শব্দদ্বয় দ্বারা পৃথক পৃথক দুই উদ্দেশ্য মনোযোগসহ শ্রবণ করা আর চুপ থাকা। সুতরাং শব্দদ্বয়ের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করাই সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা আরবী সাহিত্য অলংকারের নিয়ম হলো التاسيس اولى من التاكيد দুই শব্দ বা বাক্যের মধ্যে একটিকে অপরটির দৃঢ়তাজ্ঞাপক না ধরে প্রত্যেকটিকে ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা অধিক শ্রেয়। কাজেই استماع অর্থ শ্রবণ আর انصات। অর্থ হবে শুধু চুপ থাকা। মোটকথা যাহরী নামাযের ক্ষেত্রে استماع। প্রযোজ্য আর সিররী নামাযে انصات। প্রযোজ্য। আর এটা এজন্য ধর্তব্য হবে যে, হানাফী ফিকাহবিদগণের মতে জুমু'আর দিন ইমামের খুৎবা না শুনা গেলেও চুপ থাকা ওয়াজিব। সুতরাং এবং ইমাম শাফিঈ ও আহমদের মতে মুস্তাহাব। চুপ থাকার জন্য বস্তুটি শ্রুত হওয়া অনাবশ্যক, তাইনা হলে জুমু'আর খুৎবা না শোনা গেলে চুপ থাকা ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হওয়াব অভিমত অনর্থক দাঁড়াবে। যেহেতু ইমাম শাফিঈ (র) বলেন যে, জুমু'আর খুৎবা না শ্রুত হলেও চুপ থাকা মুস্তাহাব। অতএব তাঁর জন্য এটাও বলা সমীচীন হবে যে, সিররী নামাযে মুক্তাদীর জন্য চুপ থাকা উচিত। কেননা, নামাযে চুপ থাকার নির্দেশ পালন খুৎবায় চুপ থাকার নির্দেশ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সিররী নামাযে কিরা'আত পড়ার অভিমত পোষণকারী ইমাম বায়হাকীর মন্তব্য হলো, সকল উম্মত এ বিষয়ে একমত যে, এ আয়াতটি নামায প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। আল্লামা ইব্‌ন কুদামাহ মুগনীতে বলেন, ইমাম আহমাদ বলেন সকল মানুষের অভিমত হলো, এ আয়াতটি নামায সম্পর্কে।[১৬]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ : هَلْ قَرَأَ مَعِىْ اَحَدٌ مِنْكُمْ اٰنِفًا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنِّىْ اَقُوْلُ مَا لِىْ اُنَازَعُ الْقُرْاٰنَ . قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا يَجْهَرُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الصَّلٰوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ (قال أبو عيسى هذا حديث حسن ورواه مالك فى الموطأ والشافعى والأربعة وصححه ابن حبان ، كذا فى المرقاة .

---

১৬. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, ১০৮১।

www.pathagar.com

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম (সা) যাহরী নামায থেকে ফারেগ হয়ে বললেন, তোমাদের কেউ কি এখন আমার সাথে কিরা'আত পড়েছে ? এক ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! বললেন, তাই তো বলছি, কি ব্যাপার, আমার কুরআন তিলাওয়াতে গোলামাল হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ কথা শুনার পর থেকে লোকেরা যে সকল নামাযে তিনি সশব্দে কিরা'আত পড়তেন তাতে কিরা'আত থেকে বিরত থাকল।[১৭]

পর্যালোচন ঃ বর্ণিত হাদীসটি থেকে আলোচ্য মাস'আলাটি সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়ে উঠে। এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, কিরা'আত খালফাল ইমামের বিষয়টি মূলত কুরআন নিয়ে টানাটানি তথা তাতে সংঘর্ষ সৃষ্টির নামান্তর। এখানে একথা বলা সংগত হবে না যে, এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য ইমামের সাথে সূরা পড়া নিষিদ্ধ করণ ফাতিহা নয়। কেনান নবী করীম (সা) নিষিদ্ধ তার যে কারণ দর্শিয়েছেন, তাহলো কুরআন পাঠ করার মধ্যে জট সৃষ্টি করণ। এ কারণটি যেমনি সূরার মধ্যে বিদ্যমান, তেমনি ফাতিহার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। সুতরাং উভয়টার ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য। কিরা'আত খালফাল ইমামের বৈধতার অভিমত পোষণকারীগণ উপর কয়েটি প্রশ্ন উথাপন করেন।

প্রশ্ন ঃ ১ নং এ হাদীসের ভিত্তি ইবনে উকাইমা লাইসীর উপর। অথব তিনি একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। সুতরাং রিওয়ায়াতটি প্রমাণযোগ্য নয়।

উত্তর ঃ ইব্নে উকাইমা লাইসী সিকা রাবী। বহু সংখ্যক মুহাদ্দিস তাঁকে সিকা বলে আখ্যায়িত করেন। নিয়ম হলো, মুহাদ্দিসীনে কেরাম কোন রাবীকে সিকার সনদ দান করলে তাঁর অজ্ঞাত হওয়ার ত্রুটি রহিত হয়ে যায়। বস্তুত তিনি অজ্ঞাত নন। সকল মুহাদ্দিস এ ব্যাপারে একমত যে, মু'আত্তার সকল হাদীস সহীহ। ইমাম মালিক (র) তাতে ইবনে উকাইমা লাইসীর হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি যে একজন সিকা রাবী এবং অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি নন এটি তার একটি বড় দলীল।[১৮]

প্রশ্ন ঃ ২ নং فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ এ অংশটি ইমাম যুহরীর বৃদ্ধিকৃত।

উত্তর ঃ প্রথমত, এটি ইমাম যুহরী (র)-র বৃদ্ধিকৃত নয়। বরং তা হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর কথা, আবূ দাউদে তা সম্পষ্টাকারে উল্লেখ রয়েছে ঃ

وقال ابن السرح فى حديثه قال معمر عن الزهرى قال أبو هريرة فانتهى الناس

মা'মার–যুহরী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর লোকেরা বিরত থাকল।

ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর পর বলেন ঃ

قَالَ سُفْيَانَ وَتَكَلَّمَ الزُّهْرِى بِكَلِمَةٍ لَمْ اَسْمَعْهَا فَقَالَ مُعْمَر انَّهُ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ .

১৭. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩২-১১৩৩ হাদীস নং ১০৭২।

১৮. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫।

www.pathagar.com

এ কথার ব্যাখ্যা হলো, সুফয়ান বলতে চাচ্ছেন যে, ইমাম যুহরী (র) যখন তাঁর দরসে এ হাদীস বর্ণনা করেন তখন مَا لِيْ اُنَازَعُ الْقُرْاٰنَ এর পরের বাক্যটি আমি শুনতে পাইনি বিধায় আমার সমপাঠী মা'মারকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, উস্তাদজি কি বলেছেন ? এ কথায় মা'মার বললেন, তিনি বলেছেন' فَانْتَهٰى النَّاسُ যেহেতু মা'মার উত্তরে কথাটি যুহরীর দিকে সম্পর্কিত করে বলেছেন। এর থেকে কোন কোন লোক মনে করেছে যে, এটি ইমাম যুহরীর নিজের কথা। অথচ বাস্তবে তা হচ্ছে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর কথা ঃ

দ্বিতীয়ত, আলোচ্য মাস'আলা প্রমাণ করার জন্য ঐ অংশটি فَانْتَهٰى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ এর তেমন প্রয়োজনই নেই; বরং مَا لِى اُنَازِعُ الْقُرَانَ এ অংশ থেকেই তা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।[১৯]

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ ، اَيُّكُمْ قَرَأَ؟ أَوْ اَيُّكُمُ الْقَارِئُ؟ قَالَ رَجُلٌ : اَنَا فَقَالَ : قَدْ ظَنَنْتُ اَنْ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا . رواه مسلم

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম (সা) যুহরের নামায পড়লেন, তখন জনৈক ব্যক্তি তার পিছনে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى সূরাটি পড়তে লাগল। তিনি নামায সমাপ্ত করার পর বললেন, তোমাদের মধ্যে কে কিরা'আত পড়ল ? কিংবা বললেন, তোমাদের মধ্যে কিরা'আত পাঠকারী কে ? একটি লোক বলল আমি। তিনি বললেন, তাই তো ভাবছিলাম, তোমাদের মধ্যে কেউ আমার নামাযে (বা কিরা'আতে) জট সৃষ্টি করেছে।[২০]

পর্যালোচনা ঃ আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী (র) বলেন, এ কিরা'আত খালফাল ইমাম নিষিদ্ধতার ক্ষেত্রে হাদীসটি ব্যাপক। এতে ফাতিহা এবং অন্যান্য সূরা, যাহরী নামায এবং সিররী নামায সব সামিল অর্থাৎ নামাযের মধ্যে কিরা'আত সশব্দে পড়া হোক চাই নিঃশব্দে সর্বা-বস্থায় মুক্তাদী চুপ থাকবে। পক্ষান্তরে ইমাম বায়হাকী কিতাবুল কিরা'আতে এটিকে নামাযে ইমামের পিছনে সশব্দে পড়া নিষিদ্ধতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তার দাবী হলো কিরা'আতে জট সৃষ্টি হয় জোরে পড়লে আস্তে পড়ার ক্ষেত্রে নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয় অবস্থায়ই তা সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতএব রাসূলের (সা) একথাটি—"তোমাদের মধ্যে কে সূরা আ'লা পড়েছে"—দ্বারা প্রতিভাত হয় না যে মুক্তাদি তার পিছনে জোরে পড়েছিল। হতে পারে তাঁর নিকটে ছিল। এ জন্য সূরাটি আস্তে পড়া সত্ত্বেও নবী কারীম (সা) তা শুনে ফেলেছেন।[২১] আমাদের পেশাকৃত মন্তব্যটি হযরত ইমরানেরই আরেকটি হাদীস দ্বারা সমর্থিত। হাদীসটি হলো ঃ

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

২০. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯৪ হাদীন নং ১০৪৮।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯৪।

www.pathagar.com

عن عمران بن حصين قال كان رسول الله ﷺ يصلى بالناس ورجل بقرأ خلفه فلما فرغ قال : من ذالذى يخالجى سورتى فنهى عن القراءة

ইমরান ইবন হুসাইন (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তার পিছনে কিরা'আত পড়তে লাগল। নামায শেষে তিনি বললেন, কে সে যে আমার সূরার মধ্যে জট সৃষ্টি করছিল? অতপর তিনি ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়তে নিষেধ করেন।

বায়হাকী এবং দারা কুতনী বলেন, এ হাদীসটি সহীহ তবে "فنهى عن القراءة خلف الامام" অংশটি হাজ্জাজ ইব্‌নে আরত্বাত কর্তৃক বর্ধিত। কাতাদা থেকে হাদীসটি হাজ্জাজ ইবনে আরত্বাত ব্যতীত শু'বা ও সাঈদ প্রমুখ বর্ণনা করেন। কিন্তু তাঁরা এ অংশ উল্লেখ করেন না আর হাজ্জাজ প্রমাণযোগ্য নয়। সুতরাং তার এককভাবে বৃদ্ধিকৃত এ অংশটি গ্রহণযোগ্য হবেনা। এর উত্তর হলো, বর্ধিত অংশটি মূল হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা রাসূলের (সা) এ কথা" কে সে যে আমার সূরার মধ্যে জট সৃষ্টি করছিল" আর একথা "আমি ধারণা করছিলাম যে তোমাদের কেউ আমার সুরায় জট সৃষ্টি করেছে"–থেকে ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়ার নিষিদ্ধতাও মাকরুহ হওয়ার বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। এ কথা দ্বারা শুধু তাঁর কিরা'আত জট সৃষ্টি করার সংবাদ দেওয়া আদৌ উদ্দেশ্য নয়। এটাই রচনাধারার দাবী।[২২] নিয়ম হলো সহীহ কিংবা হাসান হাদীসের রাবীর বৃদ্ধি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়ে তাকে যদি তা অন্যান্য রাবীদের এরূপ পরিপন্থী না হয় যার দ্বারা তা প্রত্যাখ্যান যোগ্য হয়ে যায়।

আর এখানের বৃদ্ধিটি তদ্রূপ। কেননা, হাজ্জাজ সহীহ হাদীসের রাবী না হলেও হাসান হাদীসের রাবী তো অবশ্যই। ইমাম মুসলিম (র) অন্যের সাথে মিলিয়ে তাঁর রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (র) তালীক স্বরূপ তার রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম বুখারীর তা'লীক সহীহের পর্যায়ভুক্ত।

ইমাম বাযযার বলেন, তিনি হাফিয ও মুদাল্লিস ছিলেন। শু'বা তাঁর প্রশংসা করত। তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারীদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে ইদ্‌রীস ব্যতীত আর কেউ রিওয়ায়াত করেননি বলে আমার জানা নেই।

হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ বলেন, একদা আমাদের নিকট হাজ্জাজ আসলেন। তখন তার নিকট এমন ভীড় হলো যা আমরা ইবনে সুলাইমানের নিকট দেখতে পাইনি। দেখতে পেলাম দাউদ ইবনে আবু হিন্দ, ইউনুস ইবনে উবাইদ, মাতার আল-ওয়াররাক দু'জানু হয়ে বসে বলছে, হে হাজ্জাজ, এ বিষয়ে আপনার কি অভিমত, এ বিষয়ে অপনার কি মত?

ইবনে উয়াইনা বলেন, ইবনে নুজাইহকে বলতে শুনেছি, আমাদের নিকট তার মত কেউই আসেনি। অর্থাৎ হাজ্জাজ ইবনে আরত্বাতের মত। সাওরী বলেন, তোমরা তার সঙ্গে লেগে থাকা। তাহযীবে বলা হয়েছে শু'বা, হুশাইন ইবনে নুমাইর, হামাদান, সাওরী এবং হাফস ইব্‌ন গিয়াস তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আর এ কথা সুবিদিত যে, শু'বা তার নিকট যে সিকা তার থেকেই বর্ণণা করেন। সুতরাং তার এ বৃদ্ধি আবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।[২৩]

---

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯৪-১০৯৫।

২৩. প্রাগুক্ত, ১০৯৫, ১০৯৬।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ ইমরান ইবনে হুসাইনের হাদীসটি হযরত শু'বা থেকে এরূপ বর্ণিত রয়েছে ঃ

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَقَرَأَ (رجل) بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فَقَالَ اَيُّكُمُ الْقَارِئْ فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا : فَقَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ اِنَّ بَعْضَكُمْ خَالَ جَانِبِيْهَا

قال شعبة : فقلت : لقتاده اَيَكْرَهُ ذٰلِكَ ؟ قال : لو كره لنهى عنه .

শু'বা হাদীসটি কাতাদাহ থেকে যুরারাহ ইবনে আওফের সূত্রে বর্ণনা করেন। হাদীস বর্ণনা শেষে শু'বা বলেন, আমি কাতাদাকে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে তিনি কি মুক্তাদীর কিরা'আত পড়াকে মাকরূহ মনে করলেন ? বলল, যদি মাকরূহ মনে করতেন, তাহলে অবশ্যই এটিকে নিষেধ করে দিতেন।

শু'বা ও কাতাদার এ প্রশ্নোত্তর দ্বারা দু'টি জিনিস প্রতিভাত হয় ঃ

১. ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরা'আত পড়া মাকরূহ বা নিষিদ্ধ নয়। মাকরূহ বা নিষিদ্ধ হলে কাতাদার কথাটু অনুযায়ী অবশ্যই নিষেধ করা হতো।

২. হাজ্জাজের রিওয়ায়াত বৃদ্ধিকৃত নিষিদ্ধের কথাটি সঠিক নয়, সেটি তার নিজস্ব কথা।

উত্তর ঃ কাতাদাহ হাদীসখানা যুরায়াহ থেকে শ্রবণ করেছেন। আর কাতাদার শাগরিদ দুই জন–হাজ্জাজ ইবনে আরত্বাত ও শু'বা। সুতরাং হতে পারে কাতাদাহ হাদীসটি তাঁর উস্তাদ যুরারাহ থেকে সংক্ষিপ্তাকারে শ্রবণ করার পর শু'বা তা তার থেকে শ্রবণ করেন। অতঃপর তিনি যুরারাহ থেকে হাদীসটি এর চেয়ে দীর্ঘরূপে শ্রবণ করার পর তা হাজ্জাজ ইবনে আরত্বাতের নিকট বর্ণনা করেন। আর তাতে "فَنَهٰى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ" এ অংশটিও বৃদ্ধি রয়েছে। তাছাড়া এ সম্ভাবনাও আছে যে, শু'বা এ অংশটি প্রথমে শ্রবণ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে ভুলে গিয়েছেন। ফলে হাজ্জাজ তা বর্ণনা করেছেন আর শু'বা বর্ণনা করেননি। এভাবে উভয় রিওয়ায়াতের মাঝে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়।

অধিকন্তু বায়হাকী শু'বার বক্তব্যটি এরূপ বর্ণনা করেন।

قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ ، كَاَنَّهُ كَرِهَهُ ، فَقَالَ كَرِهَهُ للنهى عنه

হাদীসটির শেষে শু'বা বলেন, তখন আমি কাতাদাহকে বললাম, যেন তিনি (নবী (সা) সে ব্যক্তির কিরা'আত পড়াটাকে অপছন্দ বা মাকরূহ মনে করলেন। কাতাদাহ বলল, হ্যাঁ অপছন্দ বা মাকরূহ মনে করেছেন, কেননা ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

এ থেকে আমাদের আলোচ্য মাস'আলা ও হাজ্জাজের বৃদ্ধিকৃত অংশটি আরো সুদৃঢ়ও মজবুত হয়ে উঠে। শু'বার দুই সূত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিধায় উভয়টি রহিত হয়ে যাবে এবং শুধু হাজ্জাজের রিওয়ায়াত মোতাবিক আমল হবে।[২৪]

২৪. প্রাগুক্ত, ১০৯৬-১০৯৭।

www.pathagar.com

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبْنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ اِذَا صَلَّيْتُمْ فَاَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمُّكُمْ اَحَدُكُمْ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا وَاِذْ قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ . فَقُوْلُوْا اٰمِيْنٌ .

رواه الامام مسلم وقال الحافظ فى الفتح حديث صحيح .

হযরত আর মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। তাতে আমাদেরকে সুন্নাতের বিবরণ দিলেন এবং নামায শিক্ষাদান করলেন তিনি বললেন, নামাযে কাতার সোজা করে দাঁড়াবে। অতঃপর তোমাদের কোন একজন ইমামতি করবে। সে তাকবীর দিলে তোমরাও তাকবীর দিবে। আর সে কিরা'আত পড়লে তোমরা চুপ থাকবে। আর যখন 'গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন' বলবে তখন তোমরা বলবে, আমীন।[২৫]

হাদীসের মান নির্ণয়

হাদীসখানা ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত, হাফিয ইব্ন হাজার (র) বলেন, এটি সহীহ হাদীস। 'তামহীদ' গ্রন্থকার ইবনে আব্দুল বার বলেন, ইমাম আহমাদ এটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

পর্যালোচনা ঃ এ জাতীয় হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। তাতেও وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا 'উল্লেখ রয়েছে। রিওয়ায়াতটি এরূপ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ইমাম তো অনুসরণ বা ইক্তিদার জন্য নিযুক্ত। অতএব সে তাক্‌বীর দিলে তোমরাও তাকবীর দিবে। এবং সে কিরা'আত পড়লে চুপ থাকবে। সে যখন 'সামি'আল্লাহুলিমান হামীদাহ্ বলবে তোমরা বলবে 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ'। এ হাদীসদ্বয়ের মধ্যে ইমামের কিরা'আত পড়া কালীন মুক্তাদিদেরকে চুপ থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তাতে সূর ফাতিহা বা তৎপরবর্তী সূরা পড়ার কথা খাস করা হয়নি। এ হুকুমটি হাদীসে ব্যাপক রাখা হয়েছে। সুতরাং নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য করত হুকুমটি সূরা ফাতিহার জন্য প্রযোজ্য নয়, এর পরে পাঠ্য সূরার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এরূপ বলা আদৌ সমীচীন নয়। তা কিভাবেই হতে পারে, অথচ এটা ছিল নামায শিক্ষা প্রদানের মজলিস। তাতে তিনি নামাযের প্রতিটি সুন্নাত ও আমল একটি একটি করে বর্ণনা করে দিয়েছেন। যদি সূরা ফাতিহা এবং পরবর্তী সূরা পাঠের মাঝে কোনরূপ পার্থক্য থাকত তাহলে তিনি তা অবশ্যই স্পষ্টরূপে বলে দিতেন।[২৬]

প্রশ্ন ঃ কিরা'আত খালফাল ইমামের বৈধতার পক্ষাবলম্বনকারীগণ এখানে প্রশ্ন করেন, وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا এ অংশটি হাদীসের অংশ বলা সহীহ নয়। কেননা, হযরত আয়েশা এবং আনাস

২৫. ইমাম আবূল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ কুশাইরী, সহীহ মুসলিম, কুতুবখানায়ে রশীদিয়া, ঢাকা, পরিচ্ছেদ : নামাযে তাশাহুদ, খ. ১, পৃ. ১৭৪।

২৬. দরাসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

www.pathagar.com

(রা) থেকেও এদরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু তাদের কেউ এ অংশটি উল্লেখ করেননি। তাছাড়া আবূ মূসা আশ'আরীর রিওয়ায়াতটি প্রমাণযোগ্য হতে পারে না এজন্য যে, এটি সুলায়মান তাইমী কাতাদা থেকে এককভাবে বর্ণনা করেন।

উত্তর ঃ وَاِذَا قَرَاَ فَانْصِتُوْا অংশটি হাদীসের অংশ হিসাবে নিঃসন্দেহে সহীহ এবং সুসাব্যস্ত। ইমাম মুসলিম স্বয়ং এ হাদীসটিকে স্পষ্ট ভাষায় সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। গোটা মুসলিম শরীফের মধ্যে এটাই একামাত্র হাদীস, যার সম্পর্কে তিনি স্পষ্টভাষায় সহীহ বলে অভিমত ব্যক্তি করেছেন। মূলত এটি একটা ঘটনার সঙ্গে জড়িত। সেটি হলো ইমাম মুসলিম (রা) স্বীয় সহীহ লিখানোর এক পর্যায়ে হযরত আবূ মূসা আশ'আরীর এ হাদীসটিতে পৌছলেন যাতে وَاِذَا قَرَاَ فَانْصِتُوْا বৃদ্ধি রয়েছে, যা সুলাইমান তাইমীর সূত্রে বর্ণিত। তাঁর শাগরিদ অর্থাৎ আবুন-নার্দরের ভাগ্নে আবূ বকর হাদীসটি (সুলাইমান তাইমীর একক) বর্ণনার কারণে এ সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করলে ইমাম মুসলিম (র) উত্তর দিলেন, "تُرِيْدُ اَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ" তুমি সুলায়মান থেকেও আরো বড় হাফিয চাও? (অর্থাৎ সুলাইমান হাদীস মুখস্থ করার ক্ষেত্রে একজন শক্তিশালী রাবী। কাজেই তার রিওয়ায়াতে অন্য রাবীর রিওয়ায়াত থেকে ভিন্ন কিছু থাকায় কোন ক্ষতি নেই)[২৭]

তখন আবূ বকর প্রত্যুত্তরে বলল, তাহলে আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে আপনার কি মন্তব্য, সেটার وَاِذَا قَرَاَ فَانْصِتُوْا অংশটি কি সহীহ? বললেন, তা আমার নিকট সহীহ বলে গণ্য। বলল, তাহলে আপনি সে রিওয়ায়াত এখানে কেন উল্লেখ করেননি। বললেন, বিষয়টি এরকম নয় যে যেটাই আমার নিকট সহীহ সেটাই আমি এখানে সংকলন করব। আমি তো আমার এ কিতাবে ঐ হাদীসই লিখে থাকি যার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সকলের ঐক্যমত রয়েছে।[২৮]

হযরত আয়েশা (রা) এবং আনাস (রা)-এর হাদীসে যদিও وَاِذَا قَرَاَ فَانْصِتُوْا অংশটি বৃদ্ধি নেই তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা-হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারে অসংখ্য এরূপ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে যাতে এক সাহাবী এক অংশ বৃদ্ধি করেছেন আর অন্যজন তা বর্ণনা করেননি। সে সব ক্ষেত্রেই زِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُوْلَةٌ নিয়মটি প্রযোজ্য। যেহেতু সুলাইমান তাইমী একজন সিকা রাবী, অতএব তার এ বৃদ্ধিটিও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে। অধিকন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধু সুলাইমান তাইমী কাতাদা থেকে এ অংশ এককভাবে বর্ণনা করেননি, বরং এ ক্ষেত্রে উমর ইব্ন আমির, সাঈদ ইব্ন আবু আরুবা এবং আবূ উবায়দাও তার متابعت করেছেন।

উমর ইবনে আমির এবং সাঈদ ইব্ন আবু আরুবার হাদীসদ্বয় ইমাম দারাকুত্নী তাঁর সুনানে আল-বায়হাকী (র) সুনানে কুবরায় উল্লেখ করেন।[২৯] তারা যদিও উমর ইবনে আমির এবং সাঈদ ইবনে আবু আরুবার রিওয়ায়াতে বিদ্যমান রাবী সালিম ইবনে নাওহকে দুর্বল সাব্যস্ত করে এ متابعت কে অনির্ভরযোগ্য বলেছেন। কিন্তু আল্লামা নিমবী (র) আসারুস্ সুনানে

২৭ প্রাগুক্ত, ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮৩।

২৮. প্রগুক্ত।

২৯. বায়হাকী : "সুনানে কুব্রা" দা-ইরাতুলই মা'আরিফ, হায়দ্রাবাদ, দক্ষিণ, ভারত পরিচ্ছেদ : "ইমাম কিরা'আত জোরে পড়লে মুক্তাদী কিরা'আত পড়বে না" খ. ২, পৃ. ৫৬ দারাকুত্নী : (খ., ১, পৃ. ৩৩০) পরিচ্ছেদ: এ হাদীস من كان له امام له قراءة-এর ব্যাখ্যা, ইকতিদা সম্পর্কে উল্লেখিত বিভিন্ন রিওয়ায়াত : সূত্র দরসে তিরমিযী, ফুটনোট ১, ২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১/আরো দ্রষ্টব্য: ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮৪।

www.pathagar.com

(পৃ. ৮৭) আর আল্লাম সারফারায খান সাহেব সাফদার আহসানুল কালামে (খ. ১, পৃ. ১৯২, ১৯৩) তার উপযুক্ত জবাব প্রদান করে সালিম ইবনে নাওহের রিওয়ায়াতটিকে প্রমাণযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন।[৩০]

আর আবু উবায়দার হাদীসটি আবু উয়ানার-সহীহে উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারাও সুলাইমান তাইমীর রিওয়ায়াতটি সমর্থিত হয় রেওয়ায়াতটি নিম্নরূপ ঃ[৩১]

حدثنا سهل بن بحر الجند سابورى قال حدثنا عبد الله بن رشيد قال حدثنا أبو عبيدة عن قتادة عن يونس بن جبير عن خطان بن عبد الله الرقاشى عن أبى موسى الاشعرى قال قال رسول الله ﷺ اذا قرا الامام فانصتوا واذا قال غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فقولوا اٰمِيْن

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) একটি বিশ্লেষণ পেশ করেছেন, যার সারসংক্ষেপ নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

তিনি বলেন, "اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِه" এ হাদীসটি চারজন সাহাবী থেকে বর্ণিত। হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত আবূ মূসা আশ'আরী, হযরত আনাস এবং হযরত আয়েশা (রা)। তন্মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রা এবং হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর হাদীসে "وَاِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوْا" বিদ্যমান। কিন্তু তা হযরত আয়েশা ও আনাস (রা)-এর হাদীসে নেই। এ বিষয়ের হাদীসসমূহের পর্যালোচনার পর এর কারণ জানা গেছে যে, নবী কারীম (সা) এ হাদীসটি দু'বার ইরশাদ করেছেন, একবার وَاِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوْا বলেছেন, আরেকবার, সেটা বলেননি। দু'টির কাল ও সময় ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমবারের হাদীসটি তাঁর ঘোড়া থেকে পড়ে ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। এটি পঞ্চম হিজরীতে ঘটে। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোড়া থেকে পড়ে আঘাত প্রাপ্ত হন। তখন কিছু দিন তিনি বসে বসে নামায পড়িয়েছেন আর সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন। তখন তিনি তাঁদেরকে বসে পাড়ার ইঙ্গিত প্রদান করেন। আর নামায শেষে এ হাদীসটি শুনান। এর শেষে রয়েছে "وَاِذَا صَلّٰى جُلُوْسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا" এটি আয়েশার রিওয়ায়াত (অবশ্য আনাসের রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে وَاِذَا صَلّٰى قُعُوْدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ ইমাম যদি বসে নামায পড়ে তোমরা সকলেই বসে পড়বে। মূলত এখানে এ হাদীসটি বর্ণনায় রাসূলের উদ্দেশ্য হলো এ মাস'আলা বুঝিয়ে দেয়া যে, যখন ইমাম বসে নামায পড়ে তখন মুক্তাদীর জন্যও বসে নামায পড়া উচিত। এ জন্যই তিনি এখানে নামাযের সমস্ত রুকন ও আমল উল্লেখ করেন নি। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে দু' একটি আমলের কথা বলে দিয়েছেন। যেহেতু এখানে সব আমলের বিবরণ দেয়া উদ্দেশ্য নয়, একারণে তিনি وَاِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوْا ইরশাদ করেননি। আর যেহেতু এ সময় হযরত আয়েশাও আনাস (রা) উপস্থিত ছিলেন, তাই তাদের রেওয়ায়াতে وَاِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوْا অংশটি নেই। তখন হযরত আবূ হুরায়রা ও আবূ মূসা (রা)

৩০. দরসে তিরমিযী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

৩১. প্রাগুক্ত, ফুটনোট ঃ ৩ পৃ. ৯১।

www.pathagar.com

উপস্থিত ছিলেন না। কেননা ইবন হাজারের বর্ণনা মোতাবিক ঘোড়া থেকে পড়ার ঘটনা পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত হয়। তখন আবূ হুরায়রা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেননি, তিনি সপ্তম হিজরীতে মুসলমান হন। আর আবূ মূসা আশ'আরী (র) ও সপ্তম হিজরীতে হাবশা থেকে মদীনায় আসেন। কাজেই উক্ত ঘটনা সময় তাঁদের কেউই উপস্থিত ছিলেন না। ফলে তাঁদের হাদীসটি সপ্তম হিজরীর কিংবা তারও পরের। এতে নবী করীম (সা)-এর শুধু বসে নামাযের হুকুম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিলনা বরং উদ্দেশ্য ছিল ইমাম ও মুক্তাদির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম বলে দেয়া যে, মুক্তাদির জন্য নামাযের প্রতিটি আমলে ইমামের অনুসরণ করা উচিত। এজন্যই তিনি নামাযে ইমামের অনুসরণের বিষয়টি খুলে পেশ করার লক্ষ্যে এক এক করে সকল অংশে ইমামের অনুসরণের বিষয় উপস্থাপন করেছেন। তারই একটি বিষয় হলো وَاذَا قَرَأَ فَانْصِتُوْا অর্থাৎ ইমাম যখন কিরা'আত পড়বে তখন তোমরা চুপ থাকবে। সুতরাং দু' হাদীসের (আয়েশা ও আনাসের হাদীস আর আবু হুরায়রা ও আবু মূসা আশা'আরীর হাদীস) প্রসঙ্গ ভিন্ন, কাল ভিন্ন ঘটনা ভিন্ন এবং উদ্দেশ্য ভিন্ন। সুতরাং প্রথম ঘটনায় وَاذَا قَرَأَ فَانْصِتُوْا বিদ্যমান না থাকায় এটা বলা যাবে না যে, আবু মূসা ও আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে থাকা অসঙ্গতিপূর্ণ বা অশুদ্ধ বা দুর্বল।[৩২]

انَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ-এর ব্যাখ্যা

انما جعل الامام ليؤتم به-এর তরজমা হলো, "ইমামকে নিযুক্ত করা হয় তার অনুকরণের জন্য।" অর্থাৎ ইমাম অনুকরণযোগ্য। সর্বক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করতে হবে। আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীস এ অংশটি انما جعل الامام ليؤتم به আর আবূ মূসা আশ'আরীর হাদীসে। ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ (অতপর তোমাদের কেউ যেন ইমামতি করে) উভয়টির একই উদ্দেশ্য অর্থাৎ একজন ইমাম হবে আর বাকিরা তার অনুসরণ করবে। এখন অনুসরণ কি বিষয়ে করতে হবে পরবর্তীতে তার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে এ বলে "وَاذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاذَا قَرَأَ فَانْصِتُوْا" অর্থাৎ ইমাম তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর বলবে, তিনি রুকূ করলে তোমরাও রুকূ' করবে তিনি কিরা'আত পড়লে তোমরা চুপ থাকবে, এ কথা সুনিশ্চিত যে যাহরী ও সিররী প্রত্যেক নামাযে তাকবীর রুকূ' ও সিজ্‌দা ইত্যাদিতে ইমামের অনুসরণ ওয়াজিব। সুতরাং انصات (চুপ থাকার) এর ক্ষেত্রেও ওয়াজিব হবে।[৩৩]

اِنْصَاتَ-এর সঠিক ব্যাখ্যা

ইমাম বায়হাকী اِنْصَات-এর যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা সঠিক নয়। তিনি বলেন, اِنْصَاتَ বলা হয় কথাবার্তা বাদ দিয়ে সশব্দে না পড়াকে, কাজেই মনে মনে স্মরণ করে নিঃশব্দে পড়লেও انصات বলে গণ্য হবে। তিনি এর প্রমাণে হযরত আলী (রা)-এর হাদীস পেশ করেন। আলী (রা) বলেন ঃ

مِنَ السُّنَّةِ اَنْ يَّقْرَأَ الْاِمَامُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاَوَلَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ سِرًّا فِىْ نَفْسِهِ وَيَنْصِتُوْنَ مَنْ خَلْفَهُ وَيَقْرَأُوْنَ فِىْ اَنْفُسِهِمْ

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২, ৯৩।

৩৩. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮৬।

www.pathagar.com

সুন্নাত হলো, ইমাম যুহরের প্রথম দু'রাক'আতে ফাতিহা ও সূরা নিঃশব্দে চুপিসারে পড়বে। আর মুক্তাদীরা انصات করবে এবং নিঃশব্দে কিরা'আত পড়বে। বায়হাকী বলেন, হযরত আলী (রা)-এর এ কথা 'وينصتون من خلفه ويقرؤن من خلفه' থেকে প্রতিভাত হয় যে, انصات এর অর্থ হলো ترك الجهر وترك كلام الناس وان كان قارئًا في نفسه

হানাফী ফকীহগণ বলেন انصات-এর প্রকৃত অর্থ হলো سُكُوْت (চুপ থাকা) আর سُكُوْت এর অর্থ قَطْعُ الْكَلَامِ (কথাবন্ধ করে থাকা)। অভিধানে রয়েছে, اَسْكَتَ অর্থাৎ তার কথার বিচ্ছিন্ন হলো, আর কথা বলল না।

'মাজমাউল বিহার' নামক অভিধানে রয়েছে, جــــرى الوادى ثلاثًا ثم سكت اى انقطع উপত্যকা তিন দিন প্রবাহিত হয়ে চুপ হয়ে গেল অর্থাৎ তার প্রবাহ ধারা বন্ধ হয়ে গেল, اَسْكَتَ وَاسْتَغْضَبَ وَمَكَثَ طَوِيْلاً অর্থাৎ (তার প্রতি) বিমুখ হয়ে দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকল অর্থাৎ কথা বন্ধ করে দিল। বলা হয়, تَكَلَّمَ الرَّجُلُ ثُمَّ سَكَتَ লোকটি কথা বলল অতঃপর চুপ থাকল অর্থাৎ কথা বন্ধ করে দিল। সুতরাং انصات-এর অর্থ হলো মুখে কোন প্রকার শব্দ উচ্চারণ না করা। শুধু جَهْرَ (শব্দ করা) বর্জন করাকেই انصات বলা হয় না।

হযরত আলী (রা)-এর এ কথা "يَنْصِتُوْنَ مَنْ خَلْفَهُ وَيَقْرَأُوْنَ فِى اَنْفُسِهِمْ" টির অর্থ হলো لاَ يَتَكَلَّمُوْنَ وَيَتَدَبَّرُوْنَ قِرَاءَةَ الامَامِ بِاَنْفُسِهِمْ (মুক্তাদীরা কথা বলবে না মনে মনে ইমামের কিরা'আতে ও তার অর্থ ব্যাখ্যা) নিয়ে চিন্তা করবে। এ বিষয়টি হযরত আলী (রা)-এর অপর এক হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় ঃ

عن ابن أبى ليلى عن على قال من قَرَأَ خَلْفَ الْاِمَامِ فَقَدْ اَخْطَأَ الْفِطْرَةَ

ইবনে আবু লায়লা থেকে বর্ণিত, হযরত আলী (রা) বলেন যে ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়ল সে যেন ফিতরতের বিরুদ্ধাচরণ করল অর্থাৎ ইসলাম পরিপন্থী কাজ করল।

এটি ইবনে আবু শাইবা (র) স্বীয় মুসান্নাফে উল্লেখ করেছেন। মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে হাদীসটি নিম্নরূপে বর্ণিত ঃ

عن محمد بن عَجْلَانَ قال : قال على من قَرَأَ مَعَ الامَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ

মুহাম্মদ ইবনে আজলান থেকে বর্ণিত, হযরত আলী (রা) বলেন, যে ইমামের সাথে কিরা'আত পড়বে (ধরে নেওয়া হবে যে) সে ইসলামী ফিতরাতের উপর নেই। অর্থাৎ এটি ফিতরাত পরিপন্থী কজ। এতে ফিতরাতে আঘাত আসে, তা না করাই ফিতরাত সম্মত।

তামহীদ গ্রন্থকার বলেন, হযরত আলী, হযরত সা'দ এবং হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, যাহরী এক সিররী কোন নামাযেই ইমামের সাথে কিরা'আত পড়া যাবে না।[৩৪] (সূত্র জাওহারুন্নাকী)

যেহেতু মুসান্নাফে ইবনে আবু শাইবা মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক এবং তামহীদের বর্ণনাসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আলী (রা) ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়তে নিষেধ

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮৭, ১০৮৮।

www.pathagar.com

করেছেন, সুতরাং বায়হাকীর পেশকৃত হাদীসে আলী (রা)-এর একথা يُنْصِتُوْنَ مِنْ خَلْفِهِ وَيَقْرَءُوْنَ فِىْ اَنْفُسِهِمْ এটির এ ব্যাখ্যাই হবে, যা ইতোপূর্বে পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ মনে মনে ইমামের কিরা'আত নিয়ে ভাববে ও চিন্তা করবে। এরূপ বুখারী কর্তৃক বর্ণিত হযরত আলী (রা)-র রিওয়ায়াতটি এ অর্থেই প্রযোজ্য হবে।

عن عبيد الله بن دافع عن على رضى الله عنه اذا لَمْ يَجْهَرِ الْاِمَامُ فِى الصَّلَوٰاتِ فَاقْرَأْ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ اُخْرٰى فِى الْاَوَّلَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِى الْاَخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَفِى الْاُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ

নিম্নে বর্ণিত দারা কুতনীর রিওয়ায়াতটির ক্ষেত্রে ও একই কথা।

عن عبد الله ابن رافع قال كان على يقول اقرأوا فى الركعتين والاولين مِنَ الظُّهْرِ والْعَصْرِ خلف الامام بفاتحة الكتاب وسورة .

দারা কুতনী এ রিওয়ায়াতটি মা'মারের সূত্রে যুহরী থেকে বর্ণনা করেন।

ইমাম বায়হাকী–তাঁর রিওয়ায়াতটিও মা'কিল ইবনে উবায়দুল্লাহর সূত্রে যুহরী থেকে বর্ণনা করেন, আর তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফি' থেকে বর্ণনা করেন।

একই প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা) থেকে তিন রকমে বর্ণিত রয়েছে। সুতরাং তিনটির ক্ষেত্রে ও উদ্দেশ্য একই হবে।

প্রথম সূত্র ঃ মা'কিল ইবনে আব্দুল্লাহর বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত।

দ্বিতীয় সূত্র ঃ ইসহাক ইবনে রাশিদের-বুখারী কর্তৃক বর্ণিত ।

তৃতীয় সূত্র ঃ মা'মার দারা কুত্নী কর্তৃক বর্ণিত।

মা'কিল ইবনে আব্দুল্লাহর রিওয়ায়াতটির ক্ষেত্রে যে ব্যাখ্যা প্রযোজ্য, অপরাপর সূত্রদ্বয়ের ক্ষেত্রে একই অর্থ প্রযোজ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা এক রিওয়ায়াত অপর রিওয়ায়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপ।[৩৫]

বুঝা, জানা ও দেখাকেও قِرَاءَة (কিরা'আত) বলা হয়

ইমাম বায়হাকী বলেন, এখানে এ অর্থ নেওয়া যাবে না যে, "উচ্চারণ করা ছাড়া অন্তরে স্মরণ করা"কে কিরা'আত বলা হয়। কেননা সকল আরবী ভাষাবিদরা এ ব্যাপারে একমত যে, একে কিরা'আত বলা হয় না এবং কিরা'আতের জন্য উচ্চারণ ছাড়া অন্তরে স্মরণ করা শর্তে ও নয়, নিয়মও নয়। মোটকথা কিরা'আত পড়ার জন্য মুখে উচ্চারণ জরুরী, উচ্চারণ ব্যতীত শুধু অন্তরে অনুধাবণ বা স্মরণ করাকে পড়া বা কিরা'আত বলা হয়না। কাজেই হযরত আলী

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮৮, ১০৮৯।

www.pathagar.com

প্রমুখের হাদীসে বর্ণিত কিরা'আত (পড়া) শব্দটি ঐ অর্থেই প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়, যার ব্যাপারে ভাষাবিদদের সমর্থন রয়েছেন। এতদভিন্ন অন্য অর্থে প্রয়োগ সঠিক নয়।

উত্তর ঃ কোন কিছু উচ্চারণ না করলে শুধু চোখ বুলিয়ে দেখে গেলে বা বুঝলে যে সেটাকে পড়া বলা হয়না তা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং কখনো কখনো শুধু দেখাকেও পড়া বলা হয়। যথা কেউ কোন বই মুখে উচ্চারণ না করে একের পর এক পৃষ্ঠা শেষ করার পর বলে থাকে যে আমি অমুক বই পড়েছি। পেপার সংবাদ পত্র দেখে মূল ঘটনা অনুধাবন করলে বলা হয়ে থাকে পেপার বা সংবাদ পড়েছে। শিক্ষক ক্লাশে এসে কোন একটি বিষয় বলে যায় আর ছাত্ররা তা আত্মস্থ করে নেয়। এক্ষেত্রে ছাত্র বলে আমরা অমুক বিষয় পড়েছি অথচ তারা শ্রবণ করেছে মাত্র। এভাবে সারা দুনিয়ায় পড়ার বিষয়টি চলছে প্রায় বুঝা, শুনা, অনুধাবন ও দেখার মাধ্যমে। আরবী ভাষা পণ্ডিতবর্গ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। খুলাসা গ্রন্থকার বলেন, কেউ যদি কসম করে যে, অমুকের কিতাব পড়ব না, অতঃপর সে তার মধ্যে তাকিয়ে বইটির বিষয়বস্তু বুঝে নিল তাহলে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অবশ্য আবূ ইউসুফ ভিন্নমত পোষণ করেন। ইমাম মুহাম্মদ (র) হচ্ছেন, আরবী ভাষার ইমাম এবং সর্বস্বীকৃত আরবী ভাষা তত্ত্ববিদ। তিনি দেখে বিষয়টি বুঝে নেওয়াকেই পড়ার মধ্যে গণ্য করেছেন–এতে কসম ভঙ্গের জন্য মুখে উচ্চারণকে শর্ত করেননি।[৩৬]

'কামূস' অভিধানে রয়েছে, قُرَّاءُ শব্দটি رُمَّانٌ-এর মত। যার অর্থ ইবাদতকারী দ্বীনী আমল পালনকারী আর قُرَّاء বহুবচন। এর একবচন قَارِیٌّ অর্থাৎ قاری শব্দটির বহুবচন قَرَّاءُوْنَ , قَرَارِیٌّ হতে পারে, (قِرَاءَةٌ 'মাসদার, ধাতুপদ قَرْء থেকে গঠিত)। تَقَرَّأَ অর্থাৎ সে বুঝল অনুধাবন করল, মাজমাউল বিহারে ইবনুল আসীর রচিত 'নিহায়া'র সূত্রে।

كَانَ لاَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ........ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো, তিনি যুহর ও আসরে কিরা'আত সশব্দে পড়তেন না এবং নিজেও তা শুনতে পেতেন না। যেন তিনি লোকদের এ অবস্থায় পেলেন যে তার কিরা'আত এরূপভাবে পড়ছে যে নিজেরা তা শুনতে পায় এবং নিকটস্থ লোকেরাও শুনতে পায়। তখন তিনি এ কথা "وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا" দ্বারা বুঝালেন যে তুমি যে কিরা'আতটি সশব্দে পড় অথবা নিজকে শুনিয়ে পড় তা দুই কাঁধের ফেরেশতাদ্বয় লিখে রাখেন আর যদি তা মনে মনে পড় তারা তা লিখবেন না। তবে মনে মনে পড়ার কারণে আল্লাহ তোমার আমলনামায় তা সংরক্ষণ করে রাখবেন। ভুলে যাবেন না। তোমাকে এর বিনিময় দান করবেন।

উক্ত ব্যাখ্যা থেকে বুঝা গেল যে যেভাবে মুখে উচ্চারণ করে বা সশব্দে পড়াকে কিরা'আত বলা হয় তদ্রূপ মনে মনে অনুধাবণ স্মরণ করাকেও পড়া বলা হয়ে থাকে।

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (র) আবূ হুরায়রা (রা)-এর এ কথা "اِقْرَاْهَا فِىْ نَفْسِكَ اَيُّهَا الْفَارِسِىُّ" কে এ অর্থেই প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ হে ফারেসী তুমি, (যখন ইমামের পিছনে থাকবে তখন ফাতিহা) মনে মনে পড়।[৩৭]

---

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮৯।

৩৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

'দুররে মুখতার' গ্রন্থকার বলেন, মুক্তাদী ইমামের পিছনে মোটেই পড়বে না বরং ইমাম জোরে পড়লে সে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে। আর নিঃশব্দে পড়লে চুপ থাকবে। অনুরূপ খুৎবার ক্ষেত্রে মনোযোগসহ শ্রবণ করবে এবং চুপ থাকবে। খতীব যখন নবী করীম (সা) -এর উপর দুরূদ পড়বে তখনও চুপ করে শুনবে। তবে যদি এ আয়াত اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا পড়ে (যার মধ্যে দুরূদ পড়ার আদেশ প্রদান করা হয়েছে) তাহলে শ্রোতা মনে মনে দুরূদ পড়বে আর জিহবা বন্ধ রাখবে যাতে "তোমরা দুরূদ পড় আর তোমরা চুপ থাক" এ উভয় প্রকার আদেশ মোতাবিক আমল হয়ে যায়। এ বক্তব্য থেকে প্রতিভাত হয় যে, মুখে বা জিহবা দ্বারা আমল দুষ্কর হলে সে ক্ষেত্রে অন্তরের আমল গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। অতএব মুখে কিরা'আত না পড়ে অন্তরে পড়লে সেটাকে কিরা'আত বলে আখ্যায়িত করা হয়। সুতরাং ইমাম বায়হাকী (র)-এর এ কথা বলা যে কারো মতেই অন্তরের স্মরণকে বা অন্তরের পড়াকে পড়া বলা হয় না সঠিক নয়।[৩৮]

اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ : قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْحَسَنِ مُوْسٰى بْنُ عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ شَدَّادَ بْنِ الْهَادِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ مَنْ صَلّٰى خَلْفَ الْاِمَامِ فَاِنَّ قِرَاءَةَ الْاِمَامِ لَهٗ قِرَاءَةٌ .

رواه الامام محمد فى الموطا قال العينى : طريق صحيح من عمدة القارى (٣/٨٦)

وقال محمد بن منيع والامام ابن الهمام : هذا الاسناد صحيح على شرط الشيخين (حاشية الطحاوى)

قال العلامة ظفر أحمد العثمانى : رجاله رجال الجماعة الامامنا الاعظم أبو حنيفة ، وهو ثقة لا يسأل عن مثله : قال فى الجوهر النقى فقد وثقه كثيرون ، وأخرجه له ابن حبان فى صحيحه واستشهد به الحاكم فى المستدرك اهـ وأخرجه محمد مفصلا بالارسال .

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ইরশাদ করেন, ইমামের পিছনে নামায পড়লে ইমামের কিরা'আতই তার কিরা'আতের জন্য যথেষ্ট হবে।[৩৯] (মুহাম্মদ : মু'আত্তা)

হাদীসের মান নির্ণয়

'উমদাতুল কারী' গ্রন্থকার আল্লামা আইনী (র) বলেন, হাদীসটির সূত্র বিশুদ্ধ। মুহাম্মদ ইবনে মানী' এবং ইমাম ইবনুল হুমাম বলেন, এটির সনদ সহীহ এবং শায়খাইনের শর্তে উন্নীত। আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী (র) বলেন, এটির সনদে বিদ্যমান রাবীদের মধ্যে

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯০।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১.০০, ১১০১, হাদীস নং ১০৫১।

www.pathagar.com

ইমাম আবূ হানীফা (র) ব্যতীত বাকি সকলেই সিহাহ সিত্তা গ্রন্থকারগণের রাবী। (তাঁরা সকলেই সিকা) আর ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) হচ্ছেন এ পর্যায়ের সিকা যে, তাঁর সমকক্ষ আর কে হতে পারে। আল-জাওহারুন্নাকী গ্রন্থকার বলেন, বহু মুহাদ্দিস তাঁকে সিকা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, ইব্‌নে হিব্বান স্বীয় সহীহে তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৪০]

পর্যালোচনা ঃ এ হাদীসটি সহীহ্‌ এবং আলোচ্য বিষয়ে সর্বাধিক সুস্পষ্ট প্রমাণ, কেননা এ হাদীসের বক্তব্য অপরাপর হাদীস থেকে ব্যতিক্রম, ইমামের পিছনে মুক্তাদী চুপ থাকলে তার কিরা'আতের কি অবস্থা হবে তা সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। একটি মূলনীতির মধ্য দিয়ে সেটা হলো, ইমামের কিরা'আতই মুক্তাদীর কিরা'আতের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হবে। সুতরাং তার কিরা'আত পড়ার প্রয়োজন নেই। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, এখানে বিষয়টি সাধারণভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, তাতে ফাতিহার সাথে অন্য সূরাও শামিল। সুতরাং উভয়টির ক্ষেত্রেই ইমামের কিরা'আত মুক্তাদীর কিরা'আতের জন্য যথেষ্ট বলে গণ্য হবে, কাজেই মুক্তাদী কিরা'আত না পড়ার দ্বারা এ হাদীসের "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" (ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না) লংঘন করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে না।[৪১]

তবে কিরা'আত খালফাল ইমামের বৈধতার অভিমত পোষণকারীগণ নানান প্রশ্ন উত্তাপন করে হাদীসটির অপ্রমাণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতা সাব্যস্ত করার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছেন। এবং নানান অযাচিত ও অবান্তর উক্তি পেশ করে হানাফী মাযহাবকে ভিত্তিহীন ও দুর্বল করতে চেয়েছেন। এগুলো সব ইলমে হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞানতা, অগভীরতা এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা শূন্য হওয়ার পরিচায়ক। নিম্নে প্রশ্নগুলোর যথোচিত উত্তর প্রদান করা হলো ঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রা) সাহাবী

প্রশ্ন ঃ ১. এ হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ ইবনুল হাদ ও হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা)-এর বর্ণনা করেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ হযরত জাবির (রা) থেকে শ্রবণ করেছেন বলে প্রমাণ নেই।

উত্তর ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ ইবনুল হাদ (রা) একজন সাহাবী। এর প্রমাণ হলো, হাফিয ইবন হাজার (র) 'ইসাবায়' লিখেন, لَهُ رُؤْيَةٌ-তিনি নবী (সা)-কে দেখেছেন। সুতরাং তিনি জাবিরের সমযুগের। অবশ্য তিনি কমবয়সী সাহাবী ছিলেন। জাবির থেকে তাঁর হাদীস শ্রবণ সাব্যস্ত হওয়ার ভিত্তিতেই এটি মুসলিমের শর্তে উন্নীত। যদি মেনেও নেয়া হয় যে, তিনি জাবির (রা) থেকে শ্রবণ করেননি। তাহলে বেশীর চেয়ে বেশী বলা যাবে যে, এটি সাহাবীর মুরসাল। আর সাহাবীর মুরসাল রিওয়ায়াত প্রমাণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে সকলের ইজ্‌মা রয়েছে।[৪২]

আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রা) সরাসরি জাবির (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন

প্রশ্ন নং ২. দারাকুত্‌নী উক্ত হাদীস এরূপ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, "আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ-আবুল ওয়ালীদের সূত্রে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন।" এর থেকে প্রতিভাত হয় যে,

৪০. প্রাগুক্ত।

৪১. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ হাদীসটি সরাসরি জাবির থেকে শ্রবণ করেননি। বরং আবুল ওয়ালীদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। আর আবুল ওয়ালীদ একজন অজ্ঞাত রাবী।

উত্তর ঃ আসলে আবুল ওয়ালীদ হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদের উপনাম। প্রকৃত সনদটি নিম্নরূপ

عن عبد الله بن شداد بن الهاد أبى الوليد عن جابر

(আবুল ওয়ালীদ আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ বর্ণনা করেন জাবির থেকে) কোন লিপিকার ভুলক্রমে عن শব্দটি (أبو الوليد) আবুল ওয়ালীদের পূর্বে বৃদ্ধি করে দিয়েছে। কাজেই এতদুভয়ের মাঝে কারো মধ্যস্থতা নেই।[৪৩]

প্রশ্ন নং -৩ দারাকুত্‌নী স্বীয় সুনানে বলেন যে, এ হাদীসটি মূসা ইবনে আবু আয়েশা থেকে আবূ হানীফা এবং হাসান ইবনে উমারা ব্যতীত কেউ বর্ণনা করেনি, আর এরা দু'জনই হলো দুর্বল। পক্ষান্তরে সুফিয়ান সাওরী, আবুল আহওয়াস, শু'বা, ইসরাঈল, শরীক আবূ খালেদ দা-লালী এবং সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনা প্রমুখ মূসা ইব্‌নে আয়েশা থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদের সূত্রে মুরসালরূপে যে হাদীসটি বর্ণনা করেন সেটিই হচ্ছে সঠিক।

মুহাদ্দিস হিসাবে ইমাম আযমআবূ হানীফা (র) ও তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলিমদের অভিমত

উত্তর ঃ এটি দারাকুতনীর স্বার্থপ্রণোদিত উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি প্রতিষ্ঠিত সত্যকে এড়ানোর লক্ষ্যে প্রতিপক্ষের প্রতি অহেতুক কাঁদা ছুঁড়ার নামান্তর। আল্লামা আইনী (র) বলেন, যদি দারা কুত্‌নীর স্বভাবে লজ্জাবোধ ও ভদ্রতার গুণ থাকত তাহলে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) সম্পর্কে এ ধরনের ভাষা ব্যক্ত করতেন না। অথচ ইমাম আযম আবু হানীফা (র) একজন বিশ্বনন্দিত মহিমান্বিত ইমাম, বিশ্বের আনাচে কানাচে পূর্ব-পশ্চিমে, উত্তর দক্ষিণে সারা দিগন্তে তাঁর ইলমের জ্যোতির্ময় আলোর বিচ্ছুরণ ঘটেছে। গোটা বিশ্বকে ইসলামী ফিকহ্ তথা শারঈ মাসা'আলার এক অফুরন্ত সম্ভার উপহার দিয়েছেন। কুরআন হাদীসের আলোকে শারঈ মাসা'আলা নির্ণয় করার একটি অপূর্ব রূপরেখা, বিধিমালা প্রণয়ণ করে গোটা মুসলিম জাতির জীবনের নানান সমস্যা সমাধানের চমৎকার ব্যবস্থাপনা পেশ করেছেন। দুনিয়ার রীতি অনুসারে কতিপয় স্বার্থান্বেষী হিংসুটে শ্রেণীর লোকেরা ব্যতীত সমগ্র জাতি যুগ যুগ ধরে তাঁর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হয়ে নিজকে ধন্য মনে করছেন।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) একজন স্বীকৃত সিকা তথা নির্ভরশীল রাবী। নিম্নে এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলিমদের তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য পেশ করা হলো ঃ

১. جرح وتعديل শাস্ত্রের সর্বপ্রথম ব্যক্তিত্ব ও আলিম, হাদীস শাস্ত্রে আমীরুল মু'মিনীন-এর উপাধি প্রাপ্ত ইমাম শু'বা ইবনে হাজ্জাজ বলেন, আল্লাহর কসম, আবূ হানীফা সিকা, অবশ্যই, সিকা।

جرح وتعديل শাস্ত্রের অন্যতম আলিম ও সুপণ্ডিত হলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান। তিনি ইমাম আযম আবূ হানীফ (র) এরই শাগরিদ এবং সদা তাঁর কথার অনুযায়ী ফাতওয়া দিতেন। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, আমি ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর সাথে বসতাম

৪৩. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

এবং তাঁর আলোচনা শ্রবণ করতাম। যখনই তাঁর মোবারক চেহারার প্রতি দৃষ্টি রাখতাম তখন তাঁর চেহারায় ভেসে উঠত যে, তিনি বিরাট বড় আল্লাহ্ভীরু। তার আরেকটি উক্তি আল্লামা সিকী প্রণীত 'কিতাবুত্ তা'লীমে' উল্লেখ রয়েছে সেটি হলো "নিশ্চয় তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস সম্পর্কে এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।"

২. جـــرح وتعـــديل শাস্ত্রের আরেক মহান ব্যক্তি হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন। তিনি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তানের শাগরিদ। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) সম্পর্কে বলেন, "তিনি ছিলেন একজন সিকা রাবী, হাফিয। নিজের মুখস্থ ছাড়া কখনো হাদীস বয়ান করতেন না। কেউ তাকে দুর্বল বলেছে বলে আমি জানি না। এক সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আবূ হানীফা কি সিকা রাবী ? উত্তরে বললেন, হ্যা, সিকা, অবশ্যই সিকা। তিনি মিথ্যা থেকে খুব সতর্ক।[৪৪]

৩. جرح وتعديل শাস্ত্রের চতুর্থ বড় ইমাম হলেন ইমাম বুখারী (র)-এর উস্তাদ হযরত আলী ইবনে মাদীনী (র)। তিনি হাদীস পরখে চরম যত্নশীল এবং রাবী শনাক্ত ও তাকে যাচাই করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কাঠোর। তিনি বলেন, "ইমাম আবূ হানীফা (র) সিকা রাবী। তাঁর মধ্যে কোন ত্রুটি নেই। সাওরী, ইব্নুল মুবারক, হিশাম, ওয়াকী', আব্বাদ ইবনে আওয়্যাম এবং জা'ফর ইবনে আউন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।"

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) বলেন, "আল্লাহ যদি আমাকে আবু হানীফা ও সুফিয়ান দ্বারা মদদ না করতেন তাহলে আমি সাধারণ মানুষের পর্যায়ভুক্ত থেকে যেতাম। মাক্কী ইব্নে ইবরাহীম বলেন, "তিনি স্বীয় যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন।" এছাড়া হযরত হারূন, সুফিয়ানে সাওরী, সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা, ইসরাঈল ইবনে ইউনুস, ইয়াহইয়া ইবনে আদম, ওয়াকী' ইবনে জাররাহ, ইমাম শাফিঈ এবং ইব্নে দু'কাইন প্রমুখ হাদীসের বড় বড় ইমামগণ তাঁকে সিকা বলে আখ্যায়িত করেন।[৪৫]

বস্তুত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সম্পর্কে جرح কারীদের সংখ্যা تعديل কারীদের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম। গুটি কয়েক লোক ব্যতীত বাকি সকলেই তাঁর تعديل-এর পক্ষে। আর جرح وتعديل-এর নিয়মানুসারে এরূপ অবস্থায় রাবীর تعديل-এর দিকটিই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকে। সুতরাং গুটি কয়েক جرح রাবী جرح-এর কারণে তেমন কিছু আসে যায় না। এতে ইমাম আযম আবূ হানীফার সুমহান ব্যক্তিত্বের উপর কোন প্রভাব পড়বে না।

হাফিয ইবনে সালাহ উসূলে হাদীস সম্বলিত স্বীয় গ্রন্থ 'মুকাদ্দামায়' বলেন, কোন রাবী সম্পর্কে যদি جرح এবং تعديل উভয়টির উল্লেখ থাকে جرح-এর বিষয়টি বিশ্লেষণ সম্পর্কে না হয় অর্থাৎ কি কারণে جرح করা হলো তার উল্লেখ না থাকে, তাহলে تعديل-এর দিকটি প্রাধান্য পাবে। আর تعديل এর বিষয়টি যদি বিশ্লেষণ হয়ে থাকে তবে তো প্রশ্নই উঠে না।

এ নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করলে ইমাম আবু হানীফার রিওয়ায়াতগত মান সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) সম্পর্কে جرح-এর যে সব শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে তা অস্পষ্ট, তাতে কারণ নির্দেশ করা হয়নি। পক্ষান্তরে তাঁর সম্পর্কে উল্লেখকৃত تعديل সম্বলিত সমস্ত শব্দ

৪৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০২।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

www.pathagar.com

সুস্পষ্ট ও বিশ্লেষণমূলক। সুতরাং এসব جــرح-এর কোন মূল্য নেই। এতে তার ব্যক্তিত্বে কোনরূপ নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। কাজেই তার تعديل-এর বিষয়টিই গ্রহণযোগ্য হবে।

আর الجرح مقدم على التعديل (تعديل ও جرح)-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে جرح প্রাধান্য পাবে) এ নিয়মটি তখন প্রযোজ্য। যদি جــرح সুস্পষ্ট হয় এবং তার কারণ উল্লেখ করা হয়। কারো কারো মতে এটাও একটা শর্ত যে تعديل কারীদের সংখ্যা جرح কারীদের থেকে বেশী না হতে হবে।[৪৬]

আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী (র) রচিত 'মীযানুল ই'তিদাল ফী আসমা-ইর-রিজালে' (مِيْزَانُ الْاِعْتِدَالُ فِى اَسْمَاءِ الرِّجَال) ইমাম আবূ হানীফার আলোচনায় বলা হয়েছে, "নু'মান ইব্‌নে সাবিত কূফী ফিকাহ্‌শাস্ত্র চর্চাকারীদের ইমাম। নাসাঈ, ইবনে আদী ও দারা কুতনী প্রমুখ তাঁকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেন।" এর উত্তর হলো, মীযানুল ই'তিদালের এ ইবারতটি, নিঃসন্দেহে প্রক্ষিপ্ত। এটি গ্রন্থকারে লিখিত ইবারত নয়। বরং কোন ব্যক্তি ইবারতটি কিতাবের ফুটনোটে লিখেছিল। পরবর্তীতে তা মূল বিতাবের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এটা হয়ত লিপিকার ভুলক্রমে কিংবা ইচ্ছাপূর্বক প্রবেশ করিয়েছেন। নিম্নে তার প্রমাণ পেশ করা হলো ঃ

১. আল্লামা হাফিয যাহাবী (র) মীযানুল ই'তিদালের ভূমিকায় এ কথা স্পষ্টাকারে বলেছেন যে, আমি এ কিতাবের মধ্যে ঐ সকল বড় বড় ইমামদের আলোচনা করব না যাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মান মর্যাদায় বিষয়টি বিশ্বখ্যাত যদিও তাঁদের সম্পর্কে কেউ সমালোচনা করে থাকুক। তিনি সেসব বড় বড় ইমামদের মধ্যে স্পষ্টাকারে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর নাম উল্লেখ করেন। সুতরাং এটা কি করে সম্ভব যে, তিনি তাঁর কিতাবে আবূ হানীফা প্রসঙ্গে এজাতীয় উক্তি করবেন।

২. তাছাড়া যেসব বড় বড় ইমামদের পরিচিতি 'মীযানুল ই'তিদালে' উল্লেখ করেননি তাঁদের পরিচিতির জন্য তিনি 'তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাযা' নামে একটি ভিন্ন কিতাব প্রণয়ন করেছেন। আর সে কিতাবে ইমাম আবূ হানীফার শুধু গতানুগতিক নাম ঠিকানাই উল্লেখ করেন নি; বরং তাঁর নানান গুণাবলী উল্লেখ করে ভুয়সী প্রশংসা করেছেন।

৩. হাফিয ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র) মীযানুল ই'তিদালের উপর ভিত্তি করেই 'লিসানুল মীযান' প্রণয়ন করেন। মীযানুল ই'তিদালে যে সব রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি তিনি লিসানুল মীযানে তাঁদের আলোচনা করেননি দু'এক জন ব্যতীত। আর 'লিসানুল মীযানে' ইমাম আবূ হানীফার নাম উল্লেখ নেই। এর থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মীযানুল ই'তিদালে সেই ইবারত ছিল না, পরে তা বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়েছে।

৪. শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ হালাবী' আর রাফ্‌উ ওয়াত্-তাকামীলের' পাদটীকা (পৃষ্ঠা ১০১) লিখেন, আমি দেমাস্কের মাকতাবায়ে যাহিরিয়্যায়' মীযানুল ই'তিদালের' একটি কপি দেখতে পেলাম। যেটি সম্পূর্ণ হাফিয যাহাবীরই এক শাগরিদ আল্লামা শারফুদ্দীন আলওয়ানীর স্বয়ং লিখিত পাণ্ডুলিপি। সেখানে লিখেন, আমি এ কপিটি আমার উস্তাদ হাফিয যাহাবী (র) সামনে তিন বার পড়েছি এবং তার পাণ্ডুলিপির সাথে আমার লিখিত কপিকে মিলিয়েছি।

আব্দুল ফাতাহ বলেন, সে কপিতে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর নাম নেই। তিনি বলেন, এমনিভাবে আমি মরক্কোর রাজধানী রাবাতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগার 'আল খাযানাতুল আ-মেরায়'

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

www.pathagar.com

মীযানুল ইতিদালের হাতে লিখা কপি নিয়ে দেখলাম, তাতে যাহাবীর শাগরিদদের পড়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেখানে এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে তার অমুক শাগরিদ তার মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তার নিকট এ কিতাবখানি পড়েন। সে কপিতেও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কথা উল্লেখ নেই। এর থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে যেন ইবারতটি অন্য কারো বৃদ্ধি করা।

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লামা যাহাবী (র) ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে দুর্বল বলা এবং ত্রুটি যুক্ত করার দুর্নাম থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। আর এটা কিভাবে হতে পারে অথচ তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন।

হাফিয ইব্‌নে আদী (র) সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, তিনি ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন এবং তাঁর বিরোধী ছিলেন। বস্তুত এককালে তিনি আবূ হানীফা (র)-এর বিরোধী ছিলেন এবং ইমাম সাহেবের সম্পর্কে جرح করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে ইমাম যাহাবী (র)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবণ করতে সক্ষম হন এবং এক পর্যায়ে তিনি নিজের ভুল স্বীকার করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এর প্রতিকার স্বরূপ তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর হাদীস গ্রন্থ 'মুসনাদ'কে সুবিন্যস্ত আকারে সংকলন করেন। সুতরাং তাঁর পূর্বের সমালোচনা এবং جرح রহিত বলে সাব্যস্ত হয়।[৪৭]

লক্ষণীয় বিষয় হলো, শু'বা, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, আলী ইবনুল মাদীনী, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, সুফিয়ান সাওরী, ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ, মাক্কী ইব্‌নে ইবরাহীম, ইসরাঈল ইবনে ইউনুস এবং ইয়াহইয়া ইবনে আদম প্রমুখ বড় বড় মুহাদ্দিস, যাঁরা ইমাম আযম আবূ হানীফার সমসাময়িক তাঁর ব্যাপারে তাঁদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে, না তাঁর পরবর্তী যুগের লোকদের কথা না দারা কুত্‌নীর কথা। যিনি ইমাম সাহেবের মৃত্যুর দু'শ বছর পর দুনিয়ার আলো বাতাস দেখতে পান ? বরং ইয়াহইয়া ইবনের মুঈনের উক্তি থেকে তো প্রতীয়মনে হয় যে, ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর যমানা পর্যন্ত কেউ তাঁর ব্যাপারে সমালোচনামূলক কোন উক্তি পেশ করেনি। কেননা তিনি বলেন, আমি কাউকে তাঁর সম্পর্কে جرح করতে শুনিনি।

তিনি আরো বলেন, তিনি একজন দ্বীনদার, সত্যবাদী, ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে মিথ্যার অভিযোগ নেই। তিনি আল্লাহর দীন সম্পর্কে অনভিপ্রেত কিছু বলা থেকে মুক্ত এবং তিনি হাদীসের ব্যাপারে সত্যবাদী ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ও তাঁর পরবর্তীতে সুফিয়ান ইব্‌নে উয়াইনা, সুফিয়ান সাওরী, হাম্মাদ ইব্‌নে যায়দ, আব্দুর রাজ্জাক এবং ইমামত্রয় হযরত ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদসহ আরো অনেক বড় বড় মুহাদ্দিস তাঁর প্রশংসা করেছেন। এ থেকে দারা কুতনীর সে উক্তিটির তাৎপর্য ও তাঁর ভ্রান্তির বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এসব মহান ব্যক্তিবর্গের উক্তির সামনে দারাকুতনীর উক্তির কোন মূল্য থাকিতে পারে না। সুতরাং তাঁর আবূ হানীফাকে দুর্বল বলা অর্থ হবে নিজকে দুর্বল বলে চিহ্নিত করা। এতে তিনিই সমালোচনার পাত্র হয়ে দাঁড়ান। বস্তুতপক্ষে তিনি নিজে

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১০৪।

www.pathagar.com

এমন একজন সংকলক যিনি স্বীয় সংকলনে বহু মা'লূল, মুনকার, গারীব এবং মাওজূ' হাদীসের সমাহার ঘটিয়েছেন। তিনি বিসমিল্লাহ সশব্দে পড়া প্রসঙ্গে 'জাহর বিল-বাসমালা' নামে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন, তাতে তিনি অনেক দুর্বল হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং সেগুলোকে নিজ মাযহাবের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন। অথচ তিনি নিশ্চিত জানতেন বর্ণিত এসব হাদীস দুর্বল। এ সম্পর্কে জনৈক মালিকী তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন, এর একটি হাদীসও সহীহ নয়। অতএব আলোচ্য হাদীসটি দারাকুত্নীর নিজ মতের পরিপন্থী হওয়ার কারণে সর্বস্বীকৃত ও নির্ভরযোগ্য রাবী ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-কে দুর্বল বলে করা আখ্যায়িত বাস্তব সম্মত হতে পারে না।[৪৮]

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে, ইমাম নাসাঈও দারাকুতনীর মত হাদীসের ইমামগণ ইমাম সাহেব সম্পর্কে এরূপ ভিত্তিহীন উক্তি কিভাবে করলেন ?

এর উত্তর হলো, এসব বুযুর্গদের ইখলাস সম্পর্কে তো আমাদের কোন খারাপ ধারণা নেই। তবে প্রকৃত ঘটনা হলো আল্লাহ তা'আলা ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-কে একটি বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিলেন। এজন্য তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ লোকদের অভাব ছিল না। তারা ইমাম সাহেব সম্পর্কে অনেক অবান্তর কথা চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর সম্পর্কে একটা সুপ্রসিদ্ধ প্রোপাগাণ্ডা ছিল এই যে, তিনি হাদীস ছেড়ে যুক্তি ও কিয়াসকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এতে করে আবূ হানীফার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অবগত নয় এরূপ বহু আলেম বিগড়ে যান। কিন্তু পরবর্তীতে ইমাম আবূ হানীফার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তাঁদের ধারণা পাল্টে যায় এবং ইমাম আবূ হানীফার বিরোধিতা বর্জন করেন। যেমনটি হাফিয ইবনে আদী সম্পর্কে প্রসিদ্ধি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আওযাঈ (র)-র কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যিনি এক সময় আবূ হানীফার কট্টর বিরোধী ছিলেন।

আল্লামা কারদারী (র) মানাকিবুল ইমাম-আল আযিমের প্রথম খণ্ডের ৩৯ নং পৃষ্ঠায় সায়মারীর সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আমি সিরিয়ায় এসে ইমাম আওযাঈ (র)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে পেলাম। তিনি জানতে পারলেন যে, আমি কূফা থেকে আগমণ করেছি। তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কূফার মধ্যে আবূ হানীফা উপাধিতে কে এই খারেজী ও বিদ্'আতী ? আব্দুল্লাহ বলেন, আমি তাঁকে এর বিস্তারিত জবাব দেওয়াটাকে সমাচীন মনে করলাম না বরং আমি আমার নিজের জায়গায় চলে আসলাম। আমার নিকট সংরক্ষিত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ফিকহী মাসাইলসমূহ তিন দিনের মধ্যে একত্রিত করে পুস্তকররূপে শুরুতে, قال أبو حنيفة (আবূ হানীফা বলেন) এর স্থলে قال النُّعْمَان بْنُ الثَّابِتْ (নু'মান ইব্নে সাবিত বলেন) লিখে দিলাম। তৃতীয় দিন ইমাম আওযাঈর নিকট সে সমষ্টিগুলো পেশ করলাম। তিনি তা পড়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, নু'মান কে ? বললাম, আবূ হানীফা, যার কথা আপনি সে দিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আব্দুল্লাহ বলেন, এর পর আমি দেখলাম যে, আওযাঈর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে উভয়ে ঐ সকল মাস'আলা নিয়ে পর্যালোচনা করলেন যা আমি তাঁকে লিখে দিয়েছিলাম। ইমাম সাহেব সেসব মাসা'আলা আওযাঈ (র)-কে আরো বিস্তারিতভাবে খুলে বলেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)

৪৮. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০১।

www.pathagar.com

চলে যাওয়ার পর আমি ইমাম আওয়াঈ (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন দেখলেন ? তিনি বললেন, তাঁর ইলমের প্রাচুর্য এবং জ্ঞানের গভীরতায় আমি ঈর্ষান্বিত ও বিমুগ্ধ। আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই, আমি একটি চরম ভুলে নিপতিত ছিলাম। নিশ্চয়ই আমি তাঁর সম্পর্কে যা শুনেছি তিনি তার বিপরতে।

যারা ইমাম আবূ হানীফা (র) প্রকৃত অবস্থা ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত নয় বস্তুত তারা একটি ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন। মোটকথা, ইলমে হাদীসে ইমাম আবূ হানীফা (র) উঁচু মর্যাদার অধিকারী। তাঁর সম্পর্কে যারা সমালোচনা করেছেন তারা না জেনেই তা করেছেন। এজন্যই দেখা যায় যাঁরাই ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে গভীরভাবে জানার চেষ্টা করেছেন তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, হাদীস শাস্ত্রে তিনি বহু উঁচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। তাঁর উপর আপত্তি উত্থাপন করা আদৌ ঠিক নয়।[৪৯]

জাবরের হাদীস সনদগত দিক থেকে প্রমাণযোগ্য

হাদীসটির সনদে আরো তিনজন রাবী রয়েছেন, যাদের সম্পর্কে আপত্তি করা হয়ে থাকে। ১. হাসান ইবনে উমারা, ২. লাইস ইবনে আবু সুলাইম, ৩. জাবের জু'ফী।

হাসান ইবনে উমারা যদিও বিতর্কিত রাবী, কিন্তু বিশুদ্ধ মতানুসারে তার হাদীস হাসান পর্যায়ের। লাইস ইবনে আবু সুলাইমও বিতর্কিত রাবী, অর্থাৎ তার সম্পর্কে উভয় ধরনের মন্তব্য পাওয়া যায়। আল্লামা হায়শামী (র) মাজমাউয যাওয়াইদের বিভিন্ন স্থানে তাঁকে সিকা বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) 'তামাত্তু' পরিচ্ছেদে তাঁর একটি হাদীসকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং তাঁর হাদীসও হাসান থেকে কম নয়।

অবশ্য জাবের জু'ফী নিঃসন্দেহে দুর্বল। স্বয়ং ইমাম আবূ হানীফা (র) তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ হাদীসটি তার উপর নির্ভরশীল নয় বরং এ হাদীসটি আরো বহু সনদে বর্ণিত রয়েছে যার মধ্যে জাবির জু'ফীর মধ্যস্থতা নেই। আর না রয়েছে পূর্বোক্ত বিতর্কিত রাবীদের কারো নাম। এমন কি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মধ্যস্থতাও নেই।[৫০]

উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি সূত্র পেশা করা হলো।

عن حسن ابن صالح عن ابىْ الزبير عن جابر عن النبى ﷺ قال كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاْتُهُ قِرَاءَةٌ لَهُ

হাসান ইবন সালিহ বর্ণনা করেন আবু যুবাইর থেকে, তিনি হযরত জাবির (রা) থেকে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, যার ইমাম থাকবে তার কিরা'আতই তার কিরা'আতের জন্য যথেষ্ট। (মুসান্নাফে ইবনে আবু শাইবা) এতে প্রশ্ন করা হয়ে যে, হাসান ইবনে সালিহ আবূ যুবাইর থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি। এর উত্তর হলো, হাসান ইবনে সালিহ জন্মগ্রহণ করেন ১০০ হিজরীতে আর আবূ যুবাইরের মৃত্যু ঘটে ১২৮ হিজরীতে। সুতরাং তারা উভয়ের সমসাময়িক। হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য ইমাম মুসলিমের মতে এতটুকুই (অর্থাৎ দু'জনের এক যুগে থাকা) যথেষ্ট।

---

৪৯. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ১০৪-১০৫, ১০৬।

৫০. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ২য় খ., পৃ. ৯৮।

www.pathagar.com

حَدَّثَنَا اَبُوْ نَعِيْمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ الخ .....

আবূ নু'আইম বর্ণনা করেন হাসান ইবনে সালিহ থেকে তিনি আবূ যুবাইর থেকে, তিনি জাবির থেকে, নবী করীম (সা) (মুসনাদে আব্দ ইবনে হুমাইদ) আল্লামা আলূসী (র) বলেন এটি মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ।

حدثنا سفيان وشريك عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر قال قال رسول الله ﷺ

সুফিয়ান ও শরীক বর্ণরা করেন মূসা ইবনে আবু আয়েশা থেকে। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, (মুসনাদে আহমদ ইবনে মানী') এর সনদ (سلسلة الذهب) (তথা সোনা শেকল) বলে গণ্য। এটি শায়খাইনের শর্তে উন্নীত। কেননা ইসহাক আল-আযরাক বুখারী ও মুসলিমের রাবী। সুফিয়ান সাওরী পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেনা। শবীব মুসলিমের রাবী এবং মূসা ইবনে আবু আয়েশা সিহাহ সিত্তার সুপ্রসিদ্ধ সিকা রাবী।

عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ الثَّوْرِىْ عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٌ بْنِ شَدَّادٌ بْنِ الْهَادُ اللَّيْثِىْ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الظُّهْرَ اَ الْعَصْرَ وَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ وَرَجُلٌ يَنْهٰى فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهَ كُنْتُ اَقْرَأُ وَكَانَ هٰذَا يَنْهَانِىْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَاِنَّ قِرَأَةَ الْاِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ .

আবদুর রাযযাক সাওরী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি মূসা ইবনে আবু আয়েশা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ ইবন হাদ আল-লাইসী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) যুহর কিংবা আসরের নামায পড়ছিলেন। তখন এক লোক কিরা'আত পড়তে লাগল আরেকজন তাকে নিষেধ করল। নামাযে শেষে লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কিরা'আত পড়ছিলাম। সে আমাকে বারণ করছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন, যার ইমাম থাকে তার ইমামের কিরা'আতই তার কিরা'আতের জন্য যথেষ্ট।[৫১] (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক)

হযরত জাবির (রা)-এর হাদীসের পূর্বোক্ত সূত্রসমূহের কোনটিতে জাবির জু'ফী, হাসান ইবনে উমারা এবং লাইস ইবনে সুলাইম এমনকি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মধ্যস্থতা নেই। আর ইমাম আবূ হানীফা (র) জাবির জু'ফী এবং এ জাতীয় দুর্বল রাবীদের মধ্যস্থতা ব্যতীত বর্ণনা করেন।

তাছাড়া হযরত জাবিরের একটি ফাতওয়া থেকে তাঁর হাদীসটি সমর্থিত হয়ে থাকে। এটি ইমাম তিরমিযী (র) স্বীয় সুনানে উল্লেখ করেন। ফাতওয়াটি নিম্নরূপ ঃ

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১০০।

www.pathagar.com

حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بْنُ مُوْسٰى الانصارى حدثنا معن حدثنا مالك عن أبى نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَلَمْ يُصَلِّ الاَّ اَنْ يَّكُوْنَ وَرَاءَ الاِمَامِ . هذا حديث حسن صحيح

আবূ নু'আইম ওয়াহ্ব ইব্নে কাইসান থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, যে, ব্যক্তি সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায পড়ল প্রকৃতপক্ষে সে নামায পড়ল না। তবে সে যদি ইমামের পিছনে হয়ে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। (এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্)

খতীবে বাগাদাদীর তারীখ গ্রন্থেও হযরত ইবন উমর (রা) থেকে এরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

মোটকথা, হযরত জাবিরের হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ্ এবং সুসাব্যস্ত। এবং এর উপর উত্থাপিত সকল আপত্তি অসার এবং অমূলক। এত কিছুর পর এটিকে দুর্বল বলে অপ্রমাণযোগ্য বলা আদৌ ইনসাফের কাজ নয়।[৫২]

সাহাবা কেরামের দৃষ্টিতে কিরা'আত খালফাল ইমাম জায়িয নয়

বিতর্কিত বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের আমল ও মতামত ফায়সালায় উপনীত হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। বরং তা একটি বিরাট প্রমাণও বটে। কেননা তাঁদের আমল নিশ্চই রাসূলুল্লাহ (সা) প্রদর্শিত আমল হবে। তাঁদের থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমল ও হাদীসের বিপরীত আমল অকল্পনীয়। আলোচ্য মাস'আলার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের আমল ও মতামতের প্রতি লক্ষ্য করলেও হানাফী মাযহাবের অভিমতটি নির্ভুল বিবেচিত হয়। এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের বহু আমল বর্ণিত রয়েছে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) উমদাতুল কারীতে লিখেন, প্রায় আশি জন সাহাবী থেকে কিরা'আত খালফালে ইমাম বর্জন করার কথা বর্ণিত রয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এ বিষয়ে খুবই কঠোর ছিলেন। এঁদের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস, হযরত যায়েদ ইব্ন সাবিত, হযরত জাবির, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ শামিল রয়েছেন। নিম্নে তাঁদের কয়েকটি আস্র উল্লেখ করা হলো।[৫৩]

عَنْ مُوْسٰى ابْنِ عُقْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَ عُثْمَانَ كَانُوْا يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الاِمَامِ . أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه

মূসা ইবন উকবা থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা), আবূ বকর ও উমর এবং উসমান (রা) ইমামের পেছনে কিরা'আত পড়া থেকে নিষেধ করতেন।[৫৪]

---

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০, ১০২।

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

৫৪. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২৯, হাদীস নং ১০৬৭।

www.pathagar.com

হাদীসটি আব্দুর রাযযাক স্বীয় 'মুসান্নাফে' বর্ণনা করেন। এ রিওয়ায়াতটি মুরসাল বটে তবে সহীহ। কেননা মূসা ইবনে উকবা রাসূলের যুদ্ধ ইতিহাসের ক্ষেত্রে ইমাম পর্যায়ের। তিনি সিকা ও নির্ভরযোগ্য এবং বহু হাদীস বর্ণনাকারী।

عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ اِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ اَحَدٌ خَلْفَ الْاِمَامِ؟ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ خَلْفَ الْاِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةَ الْاِمَامِ وَاِذَا صَلّٰى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَقْرَأُ .

أخرجه مالك فى مؤطاه وسنده من أصح الاسانيد .

নাফি' থেকে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)-কে যদি জিজ্ঞাসা করা হতো যে, ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়া যাবে কি ? তিনি বলতেন কেউ যদি ইমামের পিছনে নামায আদায় করে তাহলে ইমামের কিরা'আতই তার জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি একাকী নামায আদায় করে তবে যেন সে কিরা'আত পড়ে। রাবী বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন উমর নিজে ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়তেন না।[৫৫]

এটি ইমাম মালিক মু'আত্তায় বর্ণনা করেন। এটির সনদ বিশুদ্ধতম।

عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ؟ قَالَ اَنْصِتْ لِلْقُرْاٰنِ فَاِنَّ فِىْ الصَّلاَةِ شُغْلاً ، وَسَيَكْفِيْكَ ذٰلِكَ الْاِمَامُ .

رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط ورجاله موثوقون (مجمع الزوائد) ورواه الطحاوى ، واسناده صحيح (اثار السنن) ورواه محمد فى الموطأ بسند رجاله رجال الصحيح

আবূ ওয়াইল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদের নিকট এসে বলল, আমি ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়ব কি ? তিনি বললেন, কুরআন তিলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে। কেননা নামাযে একটি ব্যস্ততা আছে। আর ইমামের কিরা'আতই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।[৫৬]

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ كَانَ لاَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ فِيْمَا يَجْهَرُ فِيْهِ وَفِيْمَا يُخَافَتُ فِيْهِ فِى الْاَوَّلَيْنِ وَلاَ فِى الْاٰخِرَيْنِ .

الحديث أخرجه محمد فى الموطا .

আলকামা ইবন কাইস থেকে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ যাহরী এবং সিররী নামাযে প্রথম দু'রাক'আত এবং শেষের দু'রাক'আতের কোন অবস্থাতেই ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়তেন না।[৫৭]

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১৯ হাদীস নং ১০৫৮।

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২০ হাদীস নং ১০৫৯।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২৪ হাদীস নং ১০৬১।

www.pathagar.com

عَنْ عَبْدُ اللّٰه بْنِ مِقْسَمٍ اَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللّٰه ابْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَجَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰه فَقَالُوْا لاَ يَقْرَأُ فِيْ خَلْفِ الْاِمَامِ فِيْ شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ . رواه الطحاوى واسناده صحيح ، اثار السنن

আব্দুল্লাহ ইবনে মিক্সাম বলেন যে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, যায়দ ইবনে সাবিত এবং জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (র)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা সকলেই বললেন, কোন প্রকার নামাযে ইমামের পেছনে কিরা'আত পড়বে না।[৫৮]

عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اَقْرَءَ وَالْاِمَام بَيْنَ يَدِىْ؟ فَقَالَ لاَ . رواه الطحاوى واسناده حسن •

আবূ জামরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। আমার সামনে ইমাম থাকাবস্থায় আমি কিরা'আত পড়তে পারি কি ? বললেন, না।[৫৯]

عَنْ مُوْسٰى بْنِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ قَالَ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْاِمَامِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ

মূসা ইবনে সা'দ তাঁর দাদা যায়দ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (যায়দ ইবনে সাবিত) বলেন, যে ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়বে তার নামায হবে না।[৬০] (এটি ইমাম মুহাম্মাদ মু'আত্তায় বর্ণনা করেন।)

عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَوَّلَ مَا اَحْدَثُوْا الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْاِمَامِ وَكَانُوْا لاَ يَقْرَأُوْنَ (اخرجه عبد الرزاق فى مصنفه الجهر النقى)

আ'মাশ থেকে বর্ণিত, ইব্রাহীম বলেন, লোকেরা সর্বপ্রথম ইসলামে যে জিনিসটি বিদ্'আতস্বরূপ চালু করেছে সেটি হলো ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়া। অথচ সাহাবী (রা) (ইমামমের পিছনে) কিরা'আত পড়তেন না।[৬১]

عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ اَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ لاَ . (أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه)

ওয়ালীদ ইবনে কাইস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি হযরত সুওয়াইদ ইবনে গাফালা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, যুহর এবং আসরে ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়ব কি ? বললেন, না।[৬২]

---

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২৪, ১১২৫, হাদীস নং ১০৬২।

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২৫ হাদীস নং ১০৬৪।

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩৪ হাদীস নং ১০৭৩।

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩৬ হাদীস নং ১০৭৫।

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩৭ হাদীস নং ১০৭৬।

www.pathagar.com

عَنْ اَبِیْ بَشْرٍ عَنْ سَعِيْدُ ابْنُ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ قَالَ لَيْسَ خَلْفَ الْاِمَامِ قِرَاءَةٌ (أخرجه ابن أبى شيبة المصنف)

আবূ বিশার বলেন, আমি হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইরকে কিরা'আত খালফাল ইমাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ইমামের পিছনে কোন কিরা'আত নেই। ইবনে আবু শাইবা এটি স্বীয় মুসান্নাফে বর্ণনা করেন। হাদীসের সনদে বিদ্যমান রাবী সিকা এবং সহীহাইনের রাবী।[৬৩]

عن أيوب عن محمد قال : لاَ اَعْلَمُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْاِمَامِ مِنَ السُّنَّةِ . أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف

আইউব থেকে বর্ণিত, মুহাম্মদ (ইবনে সীরীন) (র) বলেন, কিরা'আত খালফাল ইমাম সুন্নাত বলে আমি মনে করিনা। এটির সনদও সহীহ।[৬৪]

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ قَالَ : وَدِدْتُ اَنَّ الَّذِىْ يَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ مُلِئَ فَوْهُ تُرَابًا . (أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه)

ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত, আসওয়াদ বলেন, আমি চাই যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়ে তার মুখগহবর যেন মাটি দ্বারা ভরে দেওয়া হয়।[৬৫] এটি সনদ সহীহ এর সনদে বিদ্যমান রাবীগণ সিহাহ সিত্তা গ্রন্থকারগণের রাবী।

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ مَا قَرَأَ عَلْقَمَةَ بْنُ قَيْسٍ قَطُّ فِيْمَا يُجْهَرُ فِيْهِ وَلاَ فِيْهَا لاَ يُجْهَرُ فِيْهِ وَلاَ فِىْ الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ اُمُّ الْقُرْاٰنِ وَلاَ غَيْرِهَا خَلْفَ الْاِمَامِ . أخرجه الامام محمد بن الحسن فى كتاب الاثار .

ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলকামা ইবনে কায়স যাহ্‌রী নামায, সিররী নামায, (প্রথম দু'রাকা'আত) এবং শেষের দু'রাকা'আত ও কখনো ইমামের-পিছনে কিরা'আত পড়েননি।[৬৬]

বিপরীতমুখী হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা

কুরআন, হাদীস ও কিয়াসের আলোকে হানাফী মাযহাবের এটই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে, ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়া জায়িয নেই। কিন্তু কিছু কিছু হাদীসের বক্তব্য দ্বারা বাহ্যত প্রতিভাত হয় যে, ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়া জায়িয, বরং হাদীস দ্বারা ওয়াজিব ও বুঝা যায়। কিন্তু সে সকল হাদীসের মধ্যে গভীরভাবে পর্যাবেক্ষণ করলে এ কথাই প্রতীয়মান হয়ে

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩৮ হাদীস নং ১০৭৭।

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩৯ হাদীস নং ১০৭৮।

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩৯ হাদীস নং ১০৭৯।

৬৬. প্রাগুক্ত. পৃ. ১১৪০ হাদীস নং ১০৮০।

www.pathagar.com

যে, ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়া জায়িয নয়। নিম্নে তন্মধ্যে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে সেগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করা হলো।

উবাদার (রা) ১ম হাদীসের ব্যাখ্যা

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ انِّىْ اَرَاكُمْ تَقْرَأُوْنَ وَرَاءَ اِمَامِكُمْ قَالَ قُلْنَا اَىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىْ وَاللّٰهُ قَالَ لاَ تَفْعَلُوْا اِلاَّ بِاُمِّ الْقُرْانِ فَاِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْهَا .....

হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামায পড়লেন। তখন তার কিরা'আতে জড়তা সৃষ্টি হলো, নামায শেষ করে বললেন, আমার মনে হয় তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়, উবাদাহ বলেন, আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, এরূপ করোনা সূরা ফাতিহা ব্যতীত। কেননা যে সূরা ফাতিহা পড়বে না তার নামায নেই।[৬৭] এ হাদীসটি কিরা'আত খালফাল ইমামের মত পোষণকারীদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দলীল।

হযরত উবাদার এ হাদীসটি প্রমাণযোগ্য হতে পারেন। তিনটি কারণে

১. হাদীসটি مَعْلُوْل (ত্রুটি সম্পন্ন) সহীহ নয়।

২. সনদগত দিক থেকে مُضْطَرَبْ

৩. মতনগত দিক থেকে مُضْطَرَبْ

মা'লূল হওয়ার বিবরণ

এ হাদীসটি মা'লূল (ত্রুটি যুক্ত) হওয়ার কারণ হলো এটি তিন সূত্রে তিনভাবে বর্ণিত রয়েছে।

১. বুখারী ও মুসলিমে এরূপ বর্ণিত রয়েছে

ان رسول اللّٰه ﷺ قال : لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ফাতিহা পড়বে না তার নামায হবে না।

২. ইবনে আবু শাইবা মুসান্নাফে, তাহাভী 'আহকামুল কুরআনে' এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা স্বীয় ফাতাওয়ায় মাহমূদ ইবনে রাবী' থেকে বর্ণনা করেন।

قَالَ صَلَّيْتُ صَلاَةً وَالَى جَنْبِىْ عُبَادَةُ ابْنُ الصَّامِتِ ، قَالَ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ! اَ لَمْ اسْمَعْكَ تَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ اَجَلْ ، اِنَّهُ لاَ صَلاَةَ اِلاَّ بِهَا (لفظه لابن شيبة)

৬৭. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে মূসা : তিরমিযী শরীফ, মাকাতাবায়ে আশরাফীয়া দেওবন্দ, সাহারানপুর। পরিচ্ছেদ : ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়া, খ., ১, পৃ. ৬৯।

www.pathagar.com

মাহমূদ ইবনে রাবী বলেন, একদা আমি (জামা'আতের সাথে) নামায পড়ছিলাম। আর আমার পার্শ্বে ছিলেন হযরত উবাদা ইবন সামিত। তিনি নামাযে ফাতিহা পড়লেন। মাহমূদ বলেন, আমি তাকে বললাম, হে আবুল ওয়ালীদ। আমি আপনাকে ফাতিহা পড়তে শুনলাম? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কেননা তা ছাড়া তো নামায হয় না।

৩. তৃতীয় সূত্রটি ইমাম তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত যা শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ তিনটি সূত্রের মধ্যে প্রথমটি সর্বসম্মতিক্রমে বিশুদ্ধ বটে; কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণ সাব্যস্ত হয় না। কেননা হানাফীদের মতে সেটি ইমাম কিংবা মুনফারিদের জন্য প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় সূত্রটিও সহীহ। তবে তার দ্বারাও স্পষ্ট প্রমাণ মেলে না। কেননা এটা হলো হযরত উবাদার নিজস্ব ইজতিহাদভিত্তিক একটি উক্তি। বস্তুত لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ বাক্য সম্বলিত হাদীসটি ইমাম ও মুকতাদী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। এ হাদীস তাদের দু'জনকেই শামিল করে। এর থেকে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মুক্তাদীর উপরও ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। কিন্তু অপরাপর মারফূ' ও শক্তিশালী হাদীসের মোকাবিলায় তার ব্যক্তিগত ইজতিহাদ কোন প্রকার গুরুত্ব বহন করে না। মূলত এ হাদীস হানাফী মাযহাবেরই একটি প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত। কেননা এর দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, অধিকাংশ সাহাবী ও তাবিঈ ইমামের পিছনে কিরা'আত বর্জন করতেন। যদি তাই না হবে তাহলে হযরত মাহমূদ ইবন রাবী হযরত উবাদাকে ফাতিহা পড়তে দেখে আশ্চার্যান্বিত হয়ে প্রশ্ন করলেন কেন ? তাঁর বিস্ময়াত্মক প্রশ্ন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত উবাদার এ আমলটি অপরাপর সমস্ত সাহাবী ও তাবিঈদের আমলের পরিপন্থী ছিল। হযরত মাহমূদ ইবনে রাবী' সে নামাযে ফাতিহা পড়েন নি। তা সত্ত্বেও উবাদাহ তাঁকে নামায পুনরায় পড়ার নির্দেশ প্রদান করেননি। এর থেকে স্পষ্ট হয় যে, হযরত উবাদার মতে মুক্তাদীর জন্য নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয়। অন্যথায় অবশ্যই তিনি তাকে পুনরায় নামায পড়ার নির্দেশ দিতেন।[৬৮]

তৃতীয় সূত্রটি (অর্থাৎ তিরমিযীর রিওয়ায়াত) যদিও কিরা'আত খালফাল ইমামের বৈধতার পক্ষে সুস্পষ্ট মনে হয়, কিন্তু তা সহীহ নয়। ইমাম আহমদ, আল্লামা ইব্‌নে তাইমিয়্যা ও হাফিয ইবনে আব্দুল বারসহ মুহাক্কিক মুহাদ্দিস নিম্নোক্ত কারণে এ রিওয়ায়াতটিকে (ত্রুটি যুক্ত) বলে সাব্যস্ত করেছেন।

হাদীস বিশারদগণ মনে করেন, কোন রাবী ভুলক্রমে প্রথমোক্ত রিওয়ায়াত দু'টিকে সামনে রেখে একটি তৃতীয় রিওয়ায়াতের রূপদান করেছে। এর দায় চাপে মাকহূলের উপর। কারণ হযরত উবাদার এ হাদীসটি মাহমূদ ইবনে রাবী থেকে তাঁর বহু শাগরিদ বর্ণনা করেছেন। তারা সকলেই এটিকে প্রথমসূত্রে কিংবা দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণনা করেন। তাদের কেউই কিরা'আত খালফাল ইমামের কথাটি সরাসরী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সম্পর্কিত করে বর্ণনা করেননি। এ কাজটা করেছেন শুধু মাকহূল। তিনিই এ অংশটি "لَا تَفْعَلُوْا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ" রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সম্পর্কিত করে একটি তৃতীয় রিওয়ায়াতের রূপ দেন।

جرح وتعديل শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ তার সম্পর্কে একথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, অনেক সময় রিওয়ায়াত করতে গিয়ে তাঁর ওহাম বা ভুল হয়ে যায়। এখানেও তাই হয়েছে। মনে হয়ে হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে তার ওহম সৃষ্টি হয়েছে। ফলে দু'-তিনটি রিওয়ায়াতের সংমিশ্রণে

৬৮. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ৭৫।

www.pathagar.com

তৃতীয় একটি রিওয়ায়াত বানিয়ে ফেলেছেন। এর বিস্তারিত আলোচনা আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ স্বীয় ফাতওয়ায়–(দারুল কুতুব–আল হাদীসিয়্যাহ, মিশর পৃষ্ঠা ১৭৮, খ. ২)–উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি উল্লেখ করার পর এটিকে ইমাম যুহরীর সূত্রেও বর্ণনা করেন। তাতে এরূপ বর্ণিত আছে "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" (ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না।) এখানে ইমামের পিছনে মুক্তাদী না পড়লে নামায হবেনা–এরূপ কিছু বলা হয়নি তিনি এর পর বলেন, এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধতম।[৬৯]

ইবন তাইমিয়া বলেন, মূল ঘটনাটি হযরত উবাদার সাথে সম্পৃক্ত। এ ঘটনাটি নবী করীম (সা)-এর পরের যুগে সংঘটিত হয়েছে। উবাদা স্বয়ং তা পড়েন এবং তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে নিজ পক্ষ থেকে বলেছেন 'لَا تَفْعَلُوْا الاَّ بِاُمِّ الْكِتَابِ'

সহীহ হাদীস হলো রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, لَا تَفْعَلُوْا اِلاَّ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ যা বুখারী ও মুসলিম নিজ নিজ সহীহে বর্ণনা করেন। মূলত যুহরী মাহমূদ ইবন রাবী'র সূত্রে হযরত উবাদাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন তারপর কোন রাবী ভুল করে ফেলেছেন। একদা উবাদা বায়তুল মুকাদ্দাসে তা বর্ণনা করলে শ্রোতাদের সন্দেহ সৃষ্টি হলো এটি উবাদার কথা না রাসূলের কথা।[৭০] তবে এটা যে উবাদার কথা অর্থাৎ মাওকূফ রিওয়ায়াত, তার বহু সমর্থন পাওয়া যায়।

মাকহূলের সূত্রে রয়েছে মুহাম্মদ ইবন ইসহাক। তিনি যদিও সিকা রাবী, কিন্তু বিতর্কিত যেসব রিওয়ায়াত তিনি এককভাবে বর্ণনা করবেন তা প্রমাণযোগ্য নয়। ইমাম যাহাবী (র) মীযানুল ই'তিদালে তাঁর সম্পর্কে লিখেন, যা তিনি এককভাবে বর্ণনা করবেন তা ত্রুটিপূর্ণ। কেননা তাঁর স্মৃতিশক্তি দুর্বলতা। হাফিয দিরায়ায় বলেন, ইব্‌নে ইসহাক আহকাম বিষয়ে যা এককভাবে বর্ণনা করবেন তা প্রমাণযোগ্য নয়। তাঁর চেয়ে নির্ভরযোগ্য রাবীর বিপরীত বর্ণনা তো দূরের কথা![৭১]

اضطراب এর বিবরণ

এ হাদীসটির সনদেও মতনে বড় রকমের মতানৈক্য বিদ্যমান। নিম্নে মতানৈক্যের দিকগুলো উল্লেখ করা হলো ঃ

সনদগত ইযতিরাব

১. কোন কোন সনদে বলা হয়েছে مكحول عن عبادة ابن الصامت (মাকহূল বর্ণনা করেন উবাদাহ্ ইবনে সামিত থেকে)। এ সনদে انقطاع পাওয়া যায়। কেননা সর্বসম্মতিক্রমে মাকহূল উবাদাহ্ থেকে শ্রবণ করেনি।

২. কোন কোন সনদ এরূপ : عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة ابن الصامت (মাকহূল মাহমূদ ইবনে রাবী' থেকে, তিনি উবাদাহ্ ইবনে সামিত থেকে বর্ণনা করেন)। এটি তিরমিযীর সনদ।

৩. একটি সনদ এরকম : مكحول عن نافع بن محمود عن عبادة بن الصامت মাকহূল নাফি' ইবনে মাহমূদ থেকে, তিনি উবাদাহ্ ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন। এটি আবূ দাঊদ কর্তৃক বর্ণিত।

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

৭০. মা'আরিফুস্ সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯।

৭১. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫২, ১১৫৩।

www.pathagar.com

৪. কোন কোন সূত্রে এরূপ বর্ণিত রয়েছে مكحول عن نافع محمود عن محمود بن الربيع عن عبادة (মাকহূল বর্ণনা করেন নাফি' ইবনে মাহমূদ থেকে, তিনি মাহমূদ ইবনে রাবী' থেকে, আর তিনি হযরত উবাদাহ থেকে ইবন সামিতে থেকে বর্ণনা করেন)।

৫. কোন সনদ এরূপ : مكحول عن محمود عن أبي نعيم انه سمع عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم (মাকহূল বর্ণনা করেন মাহমূদ থেকে, তিনি আবূ নাঈম থেকে, তিনি উবাদাহ ইবনে সামিত কে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করতে শ্রবণ করেছেন)।

৬. কোন কোন জায়গায় সনদটি এরকম عن رجاء بن حيوة عن عبد الله عمر হাদীসটি রাজা ইবনে হাইওয়াহর মাধ্যমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের থেকে বর্ণনা হয়। এ রিওয়ায়াতের মধ্যে ঘটনাটি আব্দুল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত (মাদীনী)

৭. আরেকটি সূত্রে দেখা যায় যে, মাকহূল সরাসরি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। (আল্লামা মাদীনী)

৮. আরেক সূত্রে দেখা যায় যে, রাজা এটিকে মাহমূদ ইবনে রাবী'র সূত্রে হযরত উবাদার থেকে মাওকূফরূপে বর্ণনা করেন।

মারদীনী বলেন, এটি তাহাভী স্বীয় 'আহকামে' বর্ণনা করেছেন ঃ

উপরোক্ত এ আটটি সূত্রের মাঝে পর্যবেক্ষণ করলে হাদীসটির সনদ সম্পর্কে নিম্নোক্ত اضطراب গুলো পরিলক্ষিত হয়।

১. হাদীসটি মারফূ' না মাওকূফ তা নিশ্চিত নয়।

২. এটি মুত্তাসিল না মুনকাতি' তা নিশ্চিত জানা নেই।

৩. উবাদাহ থেকে বর্ণনাকারী নাফি' ইবনে মাহমূদ না মাহমূদ ইবনে রাবী' না আবূ নাঈম।

৪. এ ঘটনাটি কি হযরত উবাদার সাথে সম্পৃক্ত না হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের সাথে সম্পৃক্ত।

অতএব যে, হাদীসের সনদে সমস্ত اضطراب বিদ্যমান সেটি কি করে প্রমাণযোগ্য হতে পারে ?[৭২]

মতনগত ইযতিরাব

এরূপ হাদীসটির মতনে বিভিন্ন দিক থেকে اضطراب পাওয়া যায়।

১. আবূ দাঊদে তিরমিযী প্রমুখের বর্ণনা মোতাবিক ইবনে ইসহাক আব মাকহূলের সূত্রে বর্ণিত মতন।

عن عبادة ابن الصامت قال ﷺ الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال ان اراكم تقرأون راء امامكم قال قلنا يا رسول الله اى والله قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها

৭২. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭; মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২, ২০৩।

www.pathagar.com

২. দারাকুত্নীতে وليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول-এর সূত্রে বর্ণিত هل تقرأون في الصلاة معي؟ قال نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب উবাদাহ বলেন, তোমরা কি আমার সাথে নামাযে কিরা'আত পড় ? বলল, হ্যাঁ, তিনি বললেন, শুধু ফাতিহাতুল কিতাব পড়বে অন্য কিছু নয়। এখানে فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها এর উল্লেখ নেই আর ام الكتاب এর স্থলে بفاتحة الكتاب বলা হয়েছে।

৩. সুনানে দারাকুতনীতে "زُبَيْدِيْ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ" এর সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণিত فَلاَ تَقْرَأوْا اِلاَّ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ سِرًا فِيْ اَنْفُسِكُمْ শুধু সূরা ফাতিহা নিঃশব্দে মনে মনে পড়বে।

৪. সুনানে দারাকুতনীতে "زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول عن نافع" -এর সূত্রে এরূপ বর্ণিত রয়েছে ঃ

قَالَ : مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ يَّقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْاٰنِ اِذَا جَهَرْتُ بِالْقُرْاٰنِ ؟ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَقُوْلُ مَا لِيْ اُنَازَعُ الْقُرْاٰنَ فَلاَ يَقْرَأَنَّ اَحَدٌ مِّنْكُمْ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْاٰنِ اِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ اِلاَّ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ .

বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ আছে কি যে আমি কুরআন সশব্দে পড়াকালে সেও কুরআন পড়ে? আমরা বললাম, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তাই তো আমি বলছি কি হলো, আমার কিরা'আতে বিঘ্নতা সৃষ্টি হচ্ছে কেন ? অতএব আমি যখন কিরা'আত সশব্দে পড়ি তখন কেউ কিরা'আত করবে না উম্মুল কুরআন (ফাতিহা) ব্যতীত।

৫. সুনানে দারাকুতনীতে "ابن عيينة عن ابن شهاب عن محمود عن عبادة ابن الصامت" এর সূত্রে এরূপ বর্ণিত রয়েছে।

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اُمُّ الْقُرْاٰنِ عِوَضٌ مِّنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا بِعَوْضٍ

নবী করীম (ষা) বলেন, ফাতিহা অন্যান্য সূরার বিনিময় স্বরূপ হতে পারে তবে অন্যান্য সূরা ফাতিহার বিনিময় বা বিকল্প হতে পারে না।

৬. সুনানে বায়হাকীতে আলা' ইবনুল হারিসের সূত্রে এরূপ বর্ণিত রয়েছে, এখানে হাদীসের শুরু অংশ উল্লেখ নেই।

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . اِمَامٌ وَغَيْرُ اِمَامٍ .

উবাদাহ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, ইমাম বা ইমাম নয় যেই ফাতিহা না পড়বে তার নামায হবে না।

৭. তাবারানী মু'জামুল কাবীরে বর্ণনা করেন :

www.pathagar.com

مَنْ صَلّٰى خَلْفَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

যে ইমামের পিছনে নামায পড়বে সে যেন ফাতিহা পড়ে।

৮. যাওয়াইদুল হাইসামীতে এরূপ বর্ণিত রয়েছে :

مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

৯. মুসনাদে আহমদে ইবন ইসহাকের সূত্রে এরূপ বর্ণিত :

فلا عليكم ان تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة الا بها

১০. তাবারাণী 'আওসাতে' এরূপ বর্ণনা করেন।

لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وايتين معها

ফাতিহা এবং তার সাথে আরো দু'আয়াত পড়া ব্যতীত নামায হবে না।

১১. বায়হাকী কিতাবুল কিরা'আয় এরূপ বর্ণনা করেন ঃ

لا صلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الامام

ইমামের পিছনে যে ফাতিহা না পড়বে তার নামায হবে না।

উপরোক্ত এ তিনটি হাদীস সম্পর্কে সামনে আলোচনা করা হবে। ইনশাআল্লাহ।

১২. ঈসমাইল ইবনে সাঈদ শানানী হাদীস এরূপ বর্ণনা করেন ঃ

أَمَرَنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنْ تَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ .

রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে প্রত্যেক রাক'আতে ফাতিহা পড়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। (এ রিওয়ায়াতটি আত-তালখীসুল হাবীরে বর্ণিত রয়েছে।)

১৩. ইমাম বুখারী (র) معمر عن الزهرى-এর সূত্রে বর্ণনা করেন :

ان رسول الله ﷺ قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

১৪. ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ معمر عن الزهرى-এর সূত্রে এরূপ বর্ণনা করেন :

ان رسول الله ﷺ قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً

উপরে বর্ণিত রিওয়ায়েতসমূহ মূলত একই রিওয়ায়াতের বিভিন্নরূপ। একটি হাদীসের অতগুলো রূপ হলে তা কি করে প্রমাণযোগ্য হতে পারে।[৭৩]

উপরোক্ত এ সকল কারণে মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসকে মা'লূল-(ত্রুটি যুক্ত) বলে আখ্যায়িত করেছেন, এমন কি جرح وتعديل শাস্ত্রের সুদক্ষ পণ্ডিত ও ইমাম হাফিয যাহাবী (র) মীযানুল

৭৩. মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩, ২০৪, ২০৫।

www.pathagar.com

ই'তিদালে মাহমূদ ইবন রাবী'র পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে স্বীকার করেছেন যে, তার এ হাদীসটি মা'লূল, সুতরাং এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা সঠিক হবে না।

আর যদি কিছুক্ষণের জন্য হাদীসটিকে সহীহ বলে মেনেও নিয়া তবু এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করা চলবে না। এর কারণ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র) "হিদায়াতুল মুতাদী ফী কিরাআতিল মুক্তাদী" গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করেছেন; এখানে মূল উদ্দেশ্য পূর্ণ কথা হলো, لا تفعلوا الا بام القران এ বাক্যের মধ্যে "الا بام القران"-কে لا تفعلوا নিষেধসূচক ক্রিয়া থেকে استثناء করা হয়েছে। আর নিয়ম হলো, কোন কিছু নিষেধসূচক ক্রিয়া থেকে استثناء করা হলে তার দ্বারা مستثنى (যাকে বাদ দেওয়া হয়েছে)এর বৈধতা সাব্যস্ত হয় তা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং এর দ্বারা ফাতিহা পড়া বৈধ সাব্যস্ত হতে পারে ওয়াজিব নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এর পরে বলেছেন "فَانَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْبِهَا" এ বাক্য দ্বারা তো ওয়াজিব হওয়া প্রতিভাত হয়। এর উত্তরে হযরত গাঙ্গুহী (র) উক্ত কিতাবে বলেন যে, এ বাক্যটি দ্বারা ফাতিহা পড়া বিধানের ইল্লত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। বরং এটি استشهاد স্বরূপ কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, এর দ্বারা ফাতিহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ফাতিহা পড়ায় কোন ক্ষতি নেই। কেননা এটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। যখন এটি অন্যদের বেলায় অর্থাৎ ইমাম ও মুনফারিদের ক্ষেত্রে ওয়াজিব তাহলে মুক্তাদীর ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে জায়িয তো হবে।[৭৪]

বুখারী ও মুসলিমের সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি সহীহ বটে, তবে তার দ্বারা মুক্তাদীর জন্য ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়ার আবশ্যকতা প্রতীয়মান হয় না। নিম্নে তার যথাযথ ব্যাখ্যা পেশ করা হলো, হাদীসটি হলো ঃ

عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله ﷺ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

হযরত উবাদাহ ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ফাতিহা না পড়বে তার নামায হবে না।[৭৫]

উত্তর ঃ অন্যান্য প্রমাণাদির নিরিখে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ফাতিহার বিধানটি ইমাম ও মুনফারিদের সাথে খাস, এ হুকুম মুক্তাদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ইমামের ফাতিহা পড়াই মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট যা পূর্বোক্ত প্রমাণাদির আলোকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিশুদ্ধরূপে উবাদার হাদীসে শব্দটিও রয়েছে

এ হাদীসের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো যা হযরত মাওলানা কাশ্মীরী (র) "ফাসলুল খিতাব ফী মাসা'আলাতি উম্মিল কিতাব" (فصل الخطاب فى مسئلة ام الكتاب) লিখেছেন, তিনি বলেন,

---

৭৪. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

৭৫. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, সহীহ বুখারী, রশীদিয়া কুতুবখানা, পরিচ্ছেদ : "ইমাম এবং মুক্তাদীর জন্য আবাসে প্রবাসে, যাহরী ও সিররী সবধরনের নামাযে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব, খ., ১, পৃ. ১৪০।

www.pathagar.com

(মুসলিম ও নাসাঈর সূত্রে বর্ণিত) অপর হাদীসে শেষ দিকে فصاعداً শব্দটি উল্লাখ রয়েছে এবং তা সহীহ ও বিশুদ্ধরূপে সাব্যস্ত।[৭৬]

অতএব হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِداً

فَصَاعِداً অর্থাৎ আরো কিছু ঃ অতএব হাদীসটির অর্থ হবে যে নামাযে সূরা ফাতিহা এবং আরো অতিরিক্ত অংশ (সূরা) না পড়বে তার নামায হবে না। সুতরাং হাদীসটির উদ্দেশ্য হবে এটা যে সূরা মিলানোর ক্ষেত্রে ঐ হুকুম যা সূরা ফাতিহার ক্ষেত্রে বিবেচিত। এতদুভয়ের হুকুমে কোন পার্থক্য হবে না। যদি বলা হয় যে, সূরা মিলানো ওয়াজিব ইমামের পিছনে পড়া যাবে না, তাহলে আমরা বলব যে, ফাতিহা পড়া ওয়াজিব ইমামের পিছনে তা পড়া যাবে না।

মুলত فصاعداً ওয়ালা হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি কিরা'আত না পড়ে অর্থাৎ না ফাতিহা পড়ে, আর না অন্য সূরা পড়ে তাহলে তার নামায হয় না, অতএব নামায হওয়ার বিধান তখন, যদি কুরআনের কোন অংশই তিলাওয়াত না করে। আর যদি কোন অংশ পড়ে তাহলে নামায হয়ে যাবে।[৭৭]

প্রশ্ন ঃ ইমাম বুখারী (র) "جُزْءُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ" এর মধ্যে আপত্তি করেছেন যে, "فصاعداً" শব্দটি মা'মার এককভাবে বর্ণনা করেন। অন্যান্য রাবী তা উল্লেখ করে না। সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

উত্তর ঃ প্রথমত মা'মার একজন বিশিষ্ট সিকা রাবী। আর সিকা রাবী কর্তৃক বৃদ্ধিকৃত অংশ গ্রহণযোগ্য। তার সম্পর্কে বলা হয় যে, যুহরী থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তিনি সর্বাপেক্ষা নিভরযোগ্যও শক্তিশালী। এটি আহমদ ও ইবন মুঈন প্রমুখের মন্তব্য। অতএব যদি যুহরী থেকে তার রিওয়ায়াত প্রমাণযোগ্য না হয় তবে আর কারটা গ্রহণযোগ্য হবে। বস্তুত এ ক্ষেত্রে একজন চিন্তাশীল ও গবেষক এ কথা বলতে বাধ্য হবেন যে, বুখারী বায়হাকীও প্রমুখ হাদীসকে ক্রটিযুক্ত করার মাপ কাঠির জন্য যে সব নিয়ম প্রণয়ন করেছেন তার নিরিখে এ রিওয়ায়াত ক্রটিযুক্ত হতে পারে না বিধায় তাদের এ উক্তি নিজের চিন্তাধারা ও মাযহাবকে টিকানোর ফন্দি ছাড়া আর কি হতে পারে।'

দ্বিতীয়ত, فصاعداً শব্দটি শুধু মা'মার এককভাবে বৃদ্ধি করেননি। বরং তা অন্যান্য নির্ভরযোগ রাবীদের থেকেও বর্ণিত রয়েছে। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রা) فصل الخطاب ফাজলুল খিতাব ফী মাস'আলাতি উম্মেল কিতাবের মধ্যে প্রমাণ করেছেন যে, এটি মা'মার ব্যতীত

৭৬. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ কুশায়রী ঃ সহীহ মুসলিম, আশরাফী বুক ডিপো দেওবন্দ, ভারত। পরিচ্ছেদ : প্রত্যেক রাকা'আতে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। যদি ফাতিহা পড়তে না পারে এবং তা শিখাও সম্ভব না হয় তা হলে যা পাবে তাই পড়বে, খ. ১, পৃ. ১৬৯
আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবন শু'আইব, সুনানে নাসাঈ, রশিদিয়া কুতুবখানা ঢাকা, অধ্যায় ইফতিতাহ, পরিচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব আর এ সম্পর্কে মা'মার সূত্রের বিবরণ, খ., ১, পৃ. ২০৫।

৭৭. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

www.pathagar.com

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, ইমাম আওযাঈ, শু'আইব ইবনে আবু হামযা, আব্দুর রহমান ইবনে আবূ হামযা এবং আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক মাদানী (র) বর্ণনা করেন। তাঁদের রিওয়ায়াতসমূহ মা'মারের রিওয়াতের পক্ষে متابع বলে ধর্তব্য। সুতরাং এ অংশটি নিঃসন্দেহে সহীহ।[৭৮]

সুফিয়ানের রিওয়ায়াতটি আবূ দাঊদ (র) কর্তৃক বর্ণিত।

আওযাঈ এবং শু'আইব ইবনে আবু হামযার রিওয়ায়াত ইমাম বায়হাকী (র) হাম্মাদ ইবন হারূন মুসতাযিলীর সূত্রে কিতাবুল কিরা'আতে বর্ণনা করেন।

আব্দুর রহমান ইবন ইসহাকের রিওয়ায়াতটি ইমাম বুখারী (র) 'জুয্উল কিরা'আতে খালফাল ইমামে' উল্লেখ করেন।

এখানে আব্দুর রহমান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আব্দুর রহমান আল-মাদিনী, তিনি মুসলিমের রাবী। আবূ শাইবা আল ওয়াসিতী নন, তিনি দুর্বল রাবী ইমাম বুখারী (র) তাঁর রিওয়ায়াতকে استشهاد স্বরূপ পেশ করেন, আর তিনিই এ যুহরী থেকে রিওয়ায়াত বর্ণনা করে থাকেন– ওয়াসিতী নন। তাছাড়া মাদিনী ষষ্ঠস্তরের আর ওয়াসিতী সপ্তম স্তরের রাবী।[৭৯]

তাছাড়া فصاعدًا শব্দ বিশিষ্ট এ হাদীসটির আরো شاهد (শাহিদ-মূলক-হাদীস) রয়েছে। সে সব হাদীস থেকে ঐ মর্মই ফুটে উঠে, যা আমরা فصاعدًا ওয়ালা হাদীসের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি।

অর্থাৎ আবূ হুরায়রা, আবূ সাঈদ ও জাবির ইবন আব্দুল্লাহর হাদীস দ্বারা উবাদার এ হাদীসটি সমর্থিত হয়ে থাকে ।

আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস ঃ

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُخْرُجْ فَنَادِ فِی الْمَدِیْنَةِ اَنَّهُ لَا صَلَاةَ اِلَّا بِالْقُرْاٰنِ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ وَفِی لفظ اَمَرَنِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لَا صَلَاةَ اِلَّا یَقْرَاُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ .

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, বের হয়ে যাও এবং মদীনায় ঘোষণা দাও যে, কুরআন তিলাওয়াত ব্যতীত নামায হবে না-যদিও তা সূরা ফাতিহাসহ কিছু অতিরিক্ত অংশ হয়।

অপর বর্ণনায় রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এ ঘোষণা দেওয়ার জন্য যে, সূরা ফাতিহা ও আরো অতিরিক্ত কিছু না পড়লে নামায হবেনা। (এটি আবূ দাঊদ তাঁর সুনানে বর্ণনা করতেন।)

আবূ সাঈদের হাদীস

قَالَ اَمَرَنَا اَنْ نَقْرَاَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَیَسَّرَ

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮০; মা'আরিফুস্ সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২, ২২৩।

৭৯. মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, ২২৩।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, ফাতিহাসহ আরো যা সম্ভব হয় নামাযে পড়ি।

এটি ইমাম আবূ দাঊদ (র) স্বীয় সুনানে "من ترك القراءة فى صلاته" পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেন, এমনিভাবে ইবনে হিব্বান স্বীয় সহীহ আর আবূ ইয়া'লা স্বীয় মুসনাদে এবং আহমদ স্বীয় মুসনাদে উল্লেখ করেন।

হাফিয ইবনে হাজার (র) ফাতহুল বারীতে (২/২০২) বলেন, এটির সনদ শক্তিশালী। আর আত-তালখীসুল হাবীরে (পৃ. ৮৭) বলা হয়েছে এটির সনদ সহীহ।' 'নায়লুল আওতার গ্রন্থকার বলেন, হাফিয য়া'মুরী বলেন, এটির সনদ সহীহ এবং এর সনদে বিদ্যমান রাবীগণ সকলেই সিকা।

হযরত রিফা' আর হাদীস তাতে বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ اقْرَاَ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَبِمَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَقْرَاَ

অতঃপর তুমি ফাতিহা এবং তার সাথে আল্লাহ চাহে তো যা পার পড়বে।

এটি ইমাম আবূ দাঊদ (র) স্বীয় সুনানে باب صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেন। অবশ্য তাতে এরূপ বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ اقْرَأْ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ অতঃপর তুমি ফাতিহা পড়বে এর পর কুরআনের যে কোন সূরা পড়বে।

ইবনে হিব্বান ও এরূপ বর্ণনা করেছেন, এটির সনদ সহীহ।

হযরত জাবির (রা)-এর হাদীস

قَالَ وَكَانَ يَتَحَدَّثُ اَنَّهُ لاَ صَلاَةَ اِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا فَوْقَ ذٰلِكَ اَوْ قَالَ فَمَا اَكْثَرَ ذٰلِكَ

এটি ইমাম তাহাভী (র) স্বীয় গ্রন্থ শারহু মা 'আনিল আসারে (১/১২৪) القراءة فى الظهر والعصر পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেন। আর বায়হাকী বর্ণনা করেন কিতাবুল কিরা'আতে।

ইমরান ইবনে হুসাইনের হাদীস ঃ

لاَ تَجْزِىْ صَلاَةٌ لاَ يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَاٰيَتَيْنِ فَصَاعِدًا

উপরোক্ত হাদীস বলী প্রমাণযোগ্য। এ সব হাদীসের বাচনধারা ও প্রসঙ্গ فصاعدا ওয়ালা হাদীসের বাচনধারাও প্রসঙ্গ একইরূপ। কেননা, فصاعدا , فمازاد , فما تيسر , وما تيسر , فما فوق ذلك , فما اكثر من ذلك এবং وايتين فصاعدا ইত্যাদি শব্দগুলোর একই মর্ম।[৮০]

প্রশ্ন ঃ কিন্তু ইমাম বুখারী এখানে একটা শক্ত প্রশ্ন করেছেন।

তিনি বলেন, যদি মেনেও নেওয়া হয় যে فصاعدا শব্দটির বৃদ্ধি সহীহ। কিন্তু এটির এ মতলব নয় যে, যদি নামাযে ফাতিহা এবং সূরা দু'টোই বাদ যায় তাহলেই নামায হবে না আর

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪, ২২৫।

www.pathagar.com

যে কোন একটি পড়া হলে নামায হয়ে যাবে (যেমনটি হানাফীগণ বলে থাকেন।) বরং হাদীসের ব্যাখ্যা হলো এই যে, নামাযে ফাতিহা পড়া তো ফরয, যা না পড়লে নামায হবে না। কিন্তু তার চেয়ে অতিরিক্ত অন্য সূরা পড়া মুস্তাহাব। এর প্রমাণ হলো প্রখ্যাত আরবী ব্যাকরণবিদ আল্লামা সীবাওয়াই লিখেন যে, আরবী ভাষায় فصاعداً শব্দটি اِيْجَابُ مَا قَبْلَهُ وَتَخْيِيْرُ مَا بَعْدَهُ এর উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ এ শব্দটি বাক্যের মধ্যে এসে তার পূর্বের বস্তুটির আবশ্যকতা এবং পরের বস্তুটির ঐচ্ছিকতা বুঝায়। যথা কেউ যদি বলে, بِعْتُهُ بِدِرْهَمٍ فَصَاعِدًا তখন পরিভাষাগত দিক থেকে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বস্তুটি এক দিরহামে বিক্রি করা ওয়াজিব বা আবশ্যক, আর তার চেয়ে বেশী দিয়ে বেচার ইখতিয়ার থাকবে। অতএব আলোচ্য হাদীসটিতে فصاعداً শব্দ দ্বারা এ অর্থ দাঁড়াবে যে, ফাতিহা পড়া ফরয, আর তার চেয়ে অতিরিক্ত পড়া সুন্নাত অথবা মুস্তাহাব।

আরবী ব্যাকরণের নিয়মানুসারে فصاعداً শব্দের ব্যাখ্যা

হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) ইমাম বুখারীর এ প্রশ্নের যে উত্তরটি প্রদান করেছেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। তাঁরই একান্ত শাগরিদ আল্লামা ইউসুফ বানূরী (র) সেটি বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করেছেন। নিম্নে তার সারমর্ম উল্লেখ করা হলো ঃ

"فصاعداً" শব্দটি একটি আরবী পরিভাষা। পরিভাষা কোন প্রকারের নিয়মের আওতাভুক্ত থাকে না বরং তা মানুষের কথাবার্তার মাঝে উৎপত্তি লক্ষ্য করে প্রর্যায়ক্রমে কথোপকথনে চলতে থাকে অতঃপর শ্রবণের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ? তদ্রূপ কোথাও একটি পরিভাষা গড়ে উঠলে তাথে সর্বক্ষেত্রে সর্বস্থলে চলবে এমনও হতে পারে না। এবং পরিভাষাগত প্রত্যেকটি বাক্য ও শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র ও অবস্থা রয়েছে। সে অনুপাতে তা প্রয়োগ হতে থাকে। একটি পারিভাষিক শব্দ তা বিভিন্ন বাচনধারায় বিভিন্ন অর্থ প্রদান করে। একই অর্থ বিভিন্ন বাচনধারায় প্রযোজ্য হয় না। সুতরাং একটি পরিভাষা সংবাদ প্রধান বাক্যে ব্যবহৃত হলে এক অর্থ, সেটাই যদি সংবাদ নিরপেক্ষ বাক্য তলবযুক্ত বাক্যে প্রয়োগ করা হয় তবে আরেক অর্থ হয়ে যায়। এমনি একই পরিভাষা ক্রিয়া প্রধান বাক্যে এক অর্থ দেয় আবার অবস্থাবাচক বাক্যে কিংবা শর্তবাচক বাক্যে আরেক অর্থ দেয়। তদ্রূপ হাঁবাচক বাক্য নাবাচক বাক্য কিংবা আদেশসূচক বাক্য ও নিষেধসূচক বাক্যে ভিন্নভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়ে থাকে। فصاعداً শব্দটি ক্ষেত্রেও উপরোক্ত বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য। আরবী ভাষা পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, فصاعداً শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১. اِيْجَابُ مَا قَبْلَهُ وَتَخْيِيْرُ مَا بَعْدَهُ অর্থাৎ তার পূর্বের বিষয়টি ওয়াজিব আর পরেরটির ব্যাপারে ইখতিয়ার থাকা বুঝায়। بِعْتُهُ بِدِرْهَمٍ فَصَاعِدًا-এর ক্ষেত্রে এ অর্থই প্রযোজ্য, অর্থাৎ এক দিরহাম দ্বারা তো বিক্রি করতেই হবে। তবে এর চেয়ে বেশী দ্বারা করলে ক্ষতি নেই-করতে পার, নাও করতে পার।

২. কখনো উপরোক্ত অর্থের বিপরীত اِدْخَالُ مَا بَعْدَهُ فِىْ حُكْمِ مَا قَبْلَهُ এক অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ পরের বিষয়কে পূর্বের বস্তুর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা। যথা, বলা হয় ঃ مَشَيْتُ مِيْلَيْنِ فَصَاعِدًا আমি দু'মাইলেরও বেশী হেঁটেছি। এখানে হুকুম তথা উদ্দেশ্য হলো চলার সংবাদ প্রদান করা আর হাঁটা হয়েছে পূর্ণ দু' মাইল ও আরো কিছু বেশী। এখানে فصاعداً শব্দটি এসে

www.pathagar.com

দু' মাইলের অতিরিক্ত পথকে হাঁটার ক্ষেত্রে দু'মাইলের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ হাঁটায় অতিরিক্ত পথ ও দু' মাইলের শামিল।

৩. এটি কখনো تَقْسِيْمُ الْاَحَادِ عَلَى الْاَحَادِ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কথা বলা হয় ঃ بِعْتُهُ بِدِرْهَمٍ فَصَاعِدًا এর অর্থ হলো আমি এজাতীয় জিনিসের একটি তো এক দিরহামের বিক্রি করেছি আর অন্যটি তার চেয়ে বেশী দিয়ে। قَرَأْتُ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءً مِنَ الْقُرْاٰنِ فَصَاعِدًا-এর মধ্যে فَصَاعِدًا এ অর্থেই প্রযোজ্য।

সুতরাং একটি উদাহরণ পেশ করে একথা বলা চলবে না যে فَصَاعِدًا সর্বদা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। অথচ এ পরিভাষাটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাজেই فَصَاعِدًا-এর মধ্যে তিন সম্ভাবনাই বিদ্যমান। ক্ষেত্র বিশেষ এবং বাচনধারা অনুপাতে তার অর্থ নির্ণয় করা হবে।

আলোচ্য হাদীসের মধ্যে فَصَاعِدًا শব্দটি কোন অর্থে প্রয়োগ হবে তা বাক্যের পূর্বাকার এবং এতদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হাদীসের নিরিখে বিবেচনা করা হবে। পর্যবেক্ষণের পর দেখা যায় যে, এখানে শব্দটিকে তার দ্বিতীয় অর্থে প্রয়োগ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ তার পরের বস্তুটিকে পূর্বের বস্তুর হুকুমের আওতাভুক্ত করার অর্থে ধরা হবে, ওয়াজিব ও ইখতিয়ার প্রদানের অর্থে নয়। সুতরাং হাদীসটি مَشَيْتُ مِيْلَيْنِ فَصَاعِدًا উদাহরণের পর্যায়ভুক্ত হবে, بِعْتُهُ بِدِرْهَمٍ فَصَاعِدًا-এর পর্যায়ভুক্ত হবেনা। বাক্যের গঠনগত দিক থেকে বিচার করলে ও এটা অধিক মনে হয়। কেননা আলোচ্য হাদীসটি সংবাদ প্রধান বাক্য, আর مَشَيْتُ مِيْلَيْنِ فَصَاعِدًا ও তাই।

পক্ষান্তরে بِعْتُهُ بِدِرْهَمٍ হচ্ছে সংবাদ নিরপেক্ষ তথা আদেশসূচক বাক্য। আর পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কোন পরিভাষা বিভিন্ন ক্ষেত্র, বচনধারা ও বাক্যের দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কাজেই হাদীসের মধ্যে فَصَاعِدًا শব্দটি এসে একথাই বুঝাতে চাইছে যে, অন্য সূরাও ফাতিহা পড়ার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। ফাতিহা পড়া ওয়াজিব হলে সূরা পড়া ওয়াজিব, আর ফাতিহা পড়া ফরয হলে সূরা পড়া ফরয। তা মুস্তাহাব হলে সূরা পড়া মুস্তাহাব হবে। যেহেতু কিরা'আত খালফালে ইমাম বৈধতার প্রবক্তাগণ ইমামের পিছনে মুক্তাদীর জন্য ফাতিহা পড়াকে ফরয বলে দাবী করেন। সুতরাং পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে মুক্তাদীর জন্য ইমামের পিছনে সূরা পড়া ও ফরয বলে সাব্যস্ত হয়। অন্যথায় আরবী পরিভাষাকে অবজ্ঞা করার নামান্তর হবে। এটা কখনই উচিত নয়।

কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে মুক্তাদীর জন্য অন্য সূরা পড়া জায়িয নয়। ফরয বা ওয়াজিব হওয়া তো দূরের কথা। বুঝা গেল, ফাতিহা পড়া মুক্তাদীর জন্য ফযর নয়।

মূলত ফাতিহা পড়া ওয়াজিব ইমাম এবং মুনফারিদের জন্য فَصَاعِدًا শব্দটি এসে অন্য আয়াত বা সূরাকে ফাতিহার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ ফাতিহার ন্যায় সূরা মিলানো ও ওয়াজিবের আওতাভুক্ত। আমাদের এ ব্যাখ্যার একটি প্রমাণ এটাও যে আরবী ব্যাকরণগত দিক থেকে فَصَاعِدًا শব্দটি فاتحة الكتاب এর حال অর্থাৎ অবস্থাজ্ঞাপক স্বরূপ সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং মূল বাক্যটি এরূপ হবে ঃ

www.pathagar.com

لا صَلاَةَ لِـمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حَالَ كَوْنِهَا صَاعِدَةً اِلَى سُوْرَةٍ غَيْرِهَا .

ذو الحال-এর حال টি حال হলো। নিয়ম হলো فاتحة الكتاب হলো ذو الحال আর فصاعدة হলো حال। নিয়ম হলো حال টি ذو الحال-এর قيد হয়, ذو الحال কে مقيّد বলা হয় আর حال কে قيد বা مقيّد বলা হয়। একটি সর্বস্বীকৃত নিয়ম হলো, কোন مُقَيَّدٌ-এর আগে نفي (নাসূচক ক্রিয়া) আসলে তার দ্বারা শুধু قيد টি نفي করা হয় অথবা مقيّد ও قيد উভয়টি এক সাথে نفي হয়। قيد ব্যতীত শুধু مقيّد-এর نفي কোন অবস্থাতেই হয় না। এখানে فاتحة الكتاب হচ্ছে مقيّد আর فصاعداً হচ্ছে তার قيد। আর مقيّد এর পূর্বে لم يَقْرَأْ নাসূচক ক্রিয়া (نفي) এসেছে। অতএব এ نفي (অর্থাৎ না পড়া) দ্বারা হয়ত শুধু فصاعداً-এর نفي হবে অথবা فاتحة এবং فصاعداً (مُقَيَّدْ ও قيد) উভয়টির। সুতরাং শুধু فاتحة এর نفي কখনো হবে না। কেননা এটি শুধু مقيّد হাদীসটির অর্থ হবে যে কেউ যদি শুধু সূরা না পড়ে কিংবা সূরা ও ফাতিহা না পড়ে তবে তার নামায হবে না। আর যদি শুধু ফাতিহা না পড়ে সে অর্থাৎ নামায না হওয়ার সম্পর্ক হয়ত সূরা না পড়ার সাথে সম্পৃক্ত নতুবা সূরা এবং ফাতিহা উভয়টি না পড়ার সাথে। শুধু ফাতিহা পড়ার সাথে তা সম্পৃক্ত নয়।[৮১]

হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) এর এ ব্যাখ্যার উপর প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে يُعْتَهُ بِدِرْهَمٍ فَصَاعِداً এর মধ্যে فصاعِداً শব্দটি حال এর অর্থে হতে পারবে না, কেননা فصاعداً শব্দটিকে حَال ধরা হবে এবং তা درهم এর قيد হবে আর درهم হবে مقيد। এর উত্তর হলো حال টি ذو الحال এর قيد হওয়ার যে ব্যাখ্যা পূর্বে বলা হয়েছে তার সারকথা হলো এই যে, فصاعداً শব্দটি মৌলিকভাবে قيد এর অর্থে প্রযোজ্য, কিন্তু কখনো কখনো বিভিন্ন ধারাও আলামতের প্রেক্ষিতে তার বিপরীত অর্থেও প্রয়োগ করা হয়। এখানে يُعْتَهُ بِدِرْهَمٍ فَصَاعِداً এর মধ্যে আহলে আরবের বিশেষ একটি ব্যবহার ধারা রয়েছে। যার দ্বারা এ আলামত প্রতিভাত হয় যে, এখানে فصاعداً শব্দটি قيد এর অর্থে ব্যবহৃত নয়। পক্ষান্তরে আলোচ্য হাদীসের মধ্যে فصاعداً শব্দটির ব্যবহারে এমন কোন আলামত বা প্রসঙ্গধারা পাওয়া যায়না, যার কারণে সেটিকে তার মৌলিক অর্থে প্রয়োগ করা ছেড়ে অন্য অর্থে ব্যবহার করার অবকাশ থাকে। কাজেই এখানে فصاعداً তার মৌলিক অর্থ قيد এর জন্যই প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া এর পক্ষে প্রমাণও পাওয়া যায়। কেননা কোন কোন হাদীসে فصاعداً এর স্থলে فمازاد বা ما تيسر ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সেগুলো اِدْخَالُ مَا بَعْدَ هَا فِيْ حُكْمِهِ مَا قَبْلَهُ এর অর্থে প্রযোজ্য। কাজেই এখানেও তাই হবে।[৮২] উবাদা (রা)-এর ২য় হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ

عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله ﷺ لاَ صَلاَةَ لِـمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الامَام قَالَ اَبُوْا الطَّيِّب قلت لمحمد بن سليمان خلف الامام ؟ قال خلف الامام .

খ. হযরত উবাদা ইবন সামিতের পূর্বের যে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে তাতে শুধু ফাতিহা পড়ার কথা বলা হয়েছিল। আর সেটা ইমাম এবং মুনফারিদের জন্য প্রযোজ্য, মুক্তাদীর

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০, ৮১, ৮২।

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২, ৮৩।

www.pathagar.com

জন্য নয়। কারণ তাতে এমন কোন শব্দ বলা হয়নি যার দ্বারা হাদীসটি মুক্তাদির জন্য প্রযোজ্য বলে ধরা যেতে পারে।

কিন্তু হযরত উবাদার এ হাদীসটিতে 'خلف الامام' বাক্যটি বৃদ্ধি রয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মুক্তাদীও ফাতিহা পড়বে। এর রাবী আবু তায়্যিব হাদীসটির শ্রবণের পর মুহাম্মদ ইবন সুলাইমানকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ইমামের পিছনে? বললেন, ইমামের পিছনে। এতে বিষয়টি আরো শক্তিশালী হলো। ইমাম বায়হাকী বলেন, যেমনি উবাদার অন্য হাদীসে বৃদ্ধিকৃত فصاعدا। সহীহ, তদ্রূপ এ হাদীসে خلف الامام ও সহীহরূপে সাব্যস্ত। এর উত্তর এই যে, যে সনদের মাধ্যমে এখানে উবাদার হাদীসে خلف الامام বৃদ্ধি রয়েছে ইমামে বুখারী ও মুসলিম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা থেকে যুহরীর সূত্রে এ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাতে যে خلف الامام শব্দটি নেই। এরূপ ইমাম মুসলিম (র) ইবনে ওয়াহবের সূত্রে এসনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতেও خلف الامام নেই। মুসলিমের বর্ণনা মোতাবিক সালিহ ও মা'মার ও যুহরী থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন, তাতেও এ অংশ নেই। এমন কি ইমাম বায়হাকী (র) জুয্-এর মধ্যে মালিক, কুররা ইবন আব্দুর রহমান, আকীল, আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক, আওযাঈ এবং শু'আইব ইবন আবু হামযার সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন। প্রত্যেকেই যুহরী থেকে বর্ণনা করেন একই সনদে। কিন্তু কেউই خلف الامام অংশটি বৃদ্ধি করেন নি। সুতরাং এ বৃদ্ধিটি شاذ এর পর্যায়ভুক্ত। যার কোন متابع নেই। হতে পারে উসমান উমরের নিচের কোন রাবী এটিকে হাদীসের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দিয়েছে। আবু তায়্যেবের প্রশ্নের ধারা থেকে এটাই প্রতিভাত হয়। কেননা তিনি যখন হাদীসের মধ্যে এ অংশ বৃদ্ধি দেখলেন তখন এটিকে অপছন্দ করলেন, তার মতে এ অংশটুকু হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ জন্য তার শায়খকে জিজ্ঞাসা করলেন তাতে কি خلف الامام রয়েছে? সুতরাং এটি গ্রহণযোগ্য হবে না। এর প্রমাণ হলো ইমাম আবূ দাউদ (র) স্বীয় সনদে হাদীসটি ইমাম যুহরীর সূত্রে অংশ (خلف الامام) ব্যতীত বর্ণনা করেন। এরপর বলেন যে, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার মতে হাদীসটি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে একাকী নামায পড়ে অর্থাৎ মুনফারিদের জন্য। যদি (خلف الامام) এ অংশটি হাদীসের মধ্যে শামিল থাকত তাহলে হাদীসটিকে মুনফারিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ সঠিক হতো না। আর সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার জন্য স্পষ্টভাবে হাদীস পরিপন্থী কোন উক্তি পেশ করার অবকাশ থাকত না।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন যে, ইমাম আহমদ (র) এ হাদীসের ঐ ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন যে ব্যাখ্যা সুফিয়ান (র) কর্তৃক বর্ণিত। অর্থাৎ এটি মুনফারিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আহমদের মতেও এ অংশটি সুসাব্যস্ত নয়। তা না হলে তার প্রদত্ত ব্যাখ্যা বাতিল বলে গণ্য হবে।[৮৩]

আবু হুরায়রা (রা)-এর ১ম হাদীসের ব্যাখ্যা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلّٰى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ فَقَالَ لَهُ حَامِلُ الْحَدِيْثِ اِنِّىْ اَكُوْنُ اَحْيَانًا وَرَاءَ الْاِمَامِ قَالَ اِقْرَأْ بِهَا فِىْ نَفْسِكَ .(رواه الترمذى و مسلم)

৮৩. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪৬, ১১৪৭।

গ. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেন, যে ব্যক্তি নামায পড়ল কিন্তু তাতে ফাতিহা পড়ল না তাহলে তার নামায অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ হবে। তখন (আবূ হুরায়রা (রা) থেকে) হাদীস শ্রবণকারী বলল, আমি তো কখনো ইমামের পিছনে নামায পড়ে থাকি (তখন কি করব ?) বললেন, اِقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ অর্থাৎ তা নিঃশব্দে পড়।

এর উত্তর এই যে, এ হাদীসটিতে দুইটি অংশ রয়েছে।

(ক) প্রথম অংশটি নবী করীম (সা)-এর। সেটা হচ্ছে, সূরা ফাতিহা পড়া ব্যতীত নামায অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

(খ) দ্বিতীয় অংশ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কথা। তিনি ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়া সম্পর্কে বলেছেন ঃ اِقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ। হানাফী ফকীহগণ বলেন, হাদীসের প্রথম অংশটি অন্যান্য হাদীস ও প্রমাণাদির নিরিখে ইমাম এবং মুনফারিদের জন্য প্রযোজ্য। আর দ্বিতীয় অংশটি যেহেতু আবূ হুরায়রা (রা) নিজস্ব ইজতিহাদ, সুতরাং তা অন্যান্য মারফূ' হাদীসের মোকাবিলায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাছাড়া আবূ হুরায়রা (রা) এ কথার اِقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ এর ব্যাখ্যা হলো, তুমি তা মুখে না পড়ে মনে মনে পড়। আর মনে মনে খেয়াল করা জায়িয। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে, আরবী পারিভাষায় কখনো কখনো فِيْ نَفْسِهِ ও শব্দ দ্বারা একাকী অবস্থাও বুঝানো হয়ে থাকে। সুতরাং اِقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ এর অর্থ হবে اِقْرَأْ بِهَا حال كونك منفردًا। অর্থাৎ তুমি তা মুনফারিদ অবস্থায় পড়বে। এর প্রমাণ হলো বুখারী শরীফে একটি হাদীস রয়েছে, সেটি হাদীসে কুদ্সী। তাতে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَاٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَاٍ خَيْرٍ مِنْهُ .

সে যদি আমাকে একাকী স্মরণ করে তাহলে আমি একাকী স্বরণ করি আর যদি সে আমাকে জামা'আতের মধ্যে স্মরণ করে তাহলে আমিও তাকে তার চেয়ে উত্তম জামা'আতের মধ্যে স্মরণ করি। এখানে فِيْ نفسه কে ملا এর বিপরীতে উল্লেখ করা থেকে প্রতিভাত হয় যে, فى نفسه অর্থাৎ একাকী। সুতরাং আলোচ্য হাদীসের মধ্যেও فى نفسك দ্বারা একাকী উদ্দেশ্য হবে।[৮৪]

ইবন উমার (রা)-এর ১ম হাদীসের ব্যাখ্যা

عن ابن عمر مرفوعًا من صلى مكتوبة او سبحة فيقرأ بام القران وقران معها فان انتهى الى ام القران اجزأت ومن كان مع الامام فيقرأ قبله اذا سكت ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها فهى خداج ثلاثًا .

(رواه عبد الرزاق عن ابن عمر مرفوعا وحسن)

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেন, কেউ যদি (একাকী) ফরয অথবা নফল নামায পড়ে তাহলে সে যেন ফাতিহা এবং তার সাথে অন্য সূরা পড়ে। অবশ্য

৮৪. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩, ৮৪।

www.pathagar.com

ফাতিহা পড়ে শেষ করলে নামায আদায় হয়ে যাবে। আর যদি সে ইমামের সাথে পড়ে (অর্থাৎ মুক্তাদী হয়) তাহলে সে যেন সূরার আগের অংশ (ফাতিহা) পড়ে যখন ইমাম তা পড়ে চুপ করে। আর যদি ফাতিহা ব্যতীত নামায পড়ে তবে তা অসম্পূর্ণ হবে। এটি তিনবার বলেছেন।

(হাদীসটি আব্দুর রাযযাক ইবনে উমরের সূত্রে বর্ণনা করে সেটিকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেন।)

এর উত্তর এই যে, প্রথমত, ইবন উমর এ হাদীসের রাবী নন, বরং এর রাবী হলেন ইবনে আমর অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আস (রা)। এটি সনদে রয়েছেন মুসান্না ইবনে সাব্বাহ। তিনি দুর্বল। (তাকরীব) আর আব্দুর রাযযাক হাদীসটি তাঁর থেকে তাঁর শেষকালে শ্রবণ করেছেন। তাহ্যীব গ্রন্থকার বলেন, আব্দুর রায্যাক বলেন, আমি তাকে অতিশয় বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েছি। (তাহযীব ১০/৩৬) তাছাড়া হাদীসটি মারফূ' হওয়ার দিক থেকে দুর্বল। (অর্থাৎ এটি নবী (সা)-এর বাণী হওয়ার বিষয়ে দুর্বলতা রয়েছে) তিনি এটিকে মাওকূফরূপে হযরত আমরের বাণী বলে সাব্যস্ত করেন। আর এ বিষয়ে হযরত আমরের ইজতিহাদ অগ্রহণযোগ্য হবে। কেননা তার বিপরীতে অসংখ্য সাহাবী থেকে এর বিপরীত অভিমত ও আমল বর্ণিত রয়েছে।[৮৫]

(২) ইবনে উমর (রা) ২য় হাদীসের উত্তর

روى عبد الرزاق عن ابن عمر مرفوعًا اذا كُنْتَ مَعَ الْاِمَامِ فَاقْرَأْ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ قَبْلَهُ وَاِذَا سَكَتَ .

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে মারফূ'রূপে বর্ণিত, যখন তুমি ইমামের সাথে নামায পড়বে তখন তার পূর্বে এবং যখন সাকতা (চুপ) করবে তখন তুমি সূরা ফাতিহা পড়ে নিবে। আব্দুর রায্যাক এটিকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেন।

এর উত্তর এই যে, এটির সনদে রয়েছে মুসান্না ইবনে সাব্বাহ, তিনি দুর্বল ও শেষ কালে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যান। তাছাড়া ইমাম বায়হাকী এটিকে মাওকূফ বলে সাব্যস্ত করেছেন অর্থাৎ এটি ইবন উমরের নিজস্ব কথা। যা অন্যান্যদের মুকাবিলায় প্রমাণযোগ্য হবে না। তাছাড়া স্বয়ং ইবন উমর থেকে এর বিপরীত মত বর্ণিত রয়েছে। যা মূল প্রমাণাদির বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে। সেটা সহীহ ও শক্তিশালী। সুতরাং সেটাই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত।[৮৬]

আবূ হুরায়রা (রা)-এর ২য় হাদীসের উত্তর

روى محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عطاء عن أبى هريرة قال قال رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مَعَ الامَامِ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِىْ سَكْتَاتِهٖ وَمَنْ اَنْتَهٰى اِلٰى اُمِّ الْقُرْاٰنِ فَقَدْ اَجْزَءَهٗ . أخرجه البيهقى فى جزءو والحاكم فى مستدركه .

---

৮৫. ই'লাউস্ সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪২।

৮৬. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

চ. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উবাইদ ইবন উমাইর হযরত আতার সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কেউ যদি ইমামের সাথে ফরয নামায আদায় করে তাহলে যেন ইমামের নিরবতা অবলম্বন করার সময় ফাতিহা শরীফ পড়ে নেয়। আর ফাতিহা পর্যন্ত পড়লেই তার জন্য যথেষ্ট হবে।

এটি বায়হাকী স্বীয় জুয-এর মধ্যে আর হাকিম মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন।

এর উত্তর এই যে, এটির সনদে বিদ্যমান মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উবাইদ ইবন উমাইর লাইসী দুর্বল রাবী। তার হাদীস বর্জনযোগ্য। লিসানে বলা হয়েছে, কেউ কেউ তাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। স্বয়ং বায়হাকী (র) বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সে প্রমাণযোগ্য নয়। বস্তুত এটি আবূ হুরায়রার মাওকূফ হাদীস। এটি রাসূলের (সা) বাণী নয়।

তাছাড়া এখানে কিরা'আত পড়ার নির্দেশটি মুস্তাহাবও জায়িয পর্যায়ের। আর আমাদের নিকট ইমামের সাকতাগুলোতে কিরা'আত পড়া জায়িয রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য বহু সংখ্যাক সাহাবীদের মতের বিপরীত। সুতরাং তাদের মোকাবিলায় এ মাওকূফ রিওয়ায়াত প্রমাণযোগ্য হবে না।[৮৭]

আমর ইবনে শু'আইবের হাদীসের উত্তর

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده انّهُمْ كَانُوْا يَقْرَأُوْنَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اذا اَنْصَتَ فَاذَا قَرأَ لَمْ يَقْرَأُوْا وَاذَا اَنْصَتَ قَرَأُوْا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ صَلَاةٍ لاَ يَقْرَأُ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ .

رواه البيهقى فى كتاب القراءة وصحيحه

ছ. হযরত আমর ইবন শু'আইব আন আবীহি আন জাদ্দিহীর সূত্রে বর্ণিত, তারা (সাহাবী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে কিরা'আত পড়ত যখন তিনি চুপ করতেন। আর যখন তিনি পড়তেন তারা পড়ত না। আবার চুপ করলে পড়ত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন, যে নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া হবে না তা অসম্পূর্ণ। হাদীসখানা বায়হাকী কিতাবুল কিরা'আতে উল্লেখ করে তা সহীহ বলে মন্তব্য করেন)

এর উত্তর এই যে, প্রথমত, হাদীসটি থেকে ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়া ওয়াজিব প্রতিভাত হয় না। দ্বিতীয়ত, রাসূলের (সা) এ কথা كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَهِىَ خِدَاجٌ টি মুনাফারিদ ও ইমামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কিংবা বলা হবে যে, তা ইমাম, মুনফারিদ ও মুক্তাদীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে মুক্তাদীর কিরা'আতের জন্য ইমামের কিরা'আতই যথেষ্ট। কাজেই ইমামের ফাতিহা পড়া মুক্তাদীর পড়ারই নামান্তর ইমাম পড়লেই ধরে নেওয়া হবে মুক্তাদী পড়েছে। বহু হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে নবী করীম (সা) বলেছেন, যার ইমাম থাকবে ইমামের কিরা'আতই তার কিরা'আত হিসাবে বিবেচিত। মুক্তাদীর ক্ষেত্রে কিরা'আতকে হুকমী কিরা'আতের বলে বিবেচনা করা হবে যাতে এতদসংশ্লিষ্ট হাদীসের মাঝে দ্বন্দ্ব বাকি না থাকে। যেমনিভাবে কখনো প্রকৃতপক্ষে নামায নয় সেটাকেও নামাযের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি নামায

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪২-১১৪৩।

www.pathagar.com

পড়ে আরেক নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকে তাহলে পরবর্তী নামায ও শুরু হওয়া পর্যন্ত ধরে নেওয়া হবে যে, সে নামায আদায় অবস্থায় ছিল। এখানে রাসূল (সা) বসাকে নামাযের পর্যায়ভুক্ত করেছেন যেটাকে হুকমী নামায বলা হয়।

সুতরাং হাদীসখানা হানাফী মাযহাবের বিপরীতে নয়, বরং অনুকূল রয়েছে।

অধিকন্তু কোন কোন বর্ণনা থেকে প্রতিভাত হয় যে, মুক্তাদীরা ইসলামের শুরু যুগে ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়ত, পরবর্তীতে তা বর্জন করেছে। এর প্রমাণ হলো ইমাম বায়হাকী স্বীয় 'জুয' গ্রন্থে আবুল আ-লিয়ার সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

كان النبىّ ﷺ اذا صلى قرأ فقرأ أصحابه ، فنزلت ، فاستمعوا له وانصتوا فسكت القوم وقرأ النبى ﷺ .

নবী করীম (সা) যখন নামাযে কিরা'আত পড়তেন তাঁর সাহাবীরাও কিরা'আত পড়েতেন। তখন আয়াত নাযিল হলো "فاستمعوا له وانصتوا" এরপর লোকেরা চুপ থাকত আর নবী (সা) কিরা'আত পড়তেন।

এ হাদীসটি মুরসাল বটে তবে তা গ্রহণযোগ্য।[৮৮]

উবাদাহ (রা) এর ২য় হাদীসের উত্তর

عن عُبَادَةَ بْنُ الصَّامت قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ يَقُوْلُ لاَ صَلاَةَ لـمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ امَامٌ اَوْ غَيْرُ امَامٌ . (اخرجه البيهقى فى جزه)

হযরত উবাদাহ ইবন সামিত (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি। যে সূরা ফাতিহা না পড়বে তার নামায হবে না। ইমাম হোক চাই ইমাম না হোক। (এটি ইমাম বায়হাকী স্বীয় 'জুয'-এর মধ্যে বর্ণনা করেন।)

এর উত্তর এই যে, এ হাদীসের মূল অংশ হলো "لاَ صَلاَةَ لـمَنْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" এতে امَامٌ اَوْ غَيْرُ امَامٍ অংশটি রাবী কর্তৃক বৃদ্ধিকৃত, এটি সহীহ নয়। কেননা এর সনদে রয়েছে আহমদ ইবন উমাইর দেমাশকী। দারাকুতনী বলেন, সে শক্তিশালী রাবী নয়। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহবের ন্যায় অভিযুক্ত রাবী থেকে বর্ণনা করেন। মীযানুল ই'তিদালে বলা হয়েছে, দীনওয়ারী হাদীস গড়া এবং মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত রাবী। দারাকুতনী বলেন, সে হাদীস গড়ত। তাছাড়া এটির সনদে রয়েছে মুহাম্মদ আবুস্ সিরযী। যদিও ইবনে মুঈন (র) তাকে সিকা বলে থাকেন; কিন্তু সে অনেক ভুল করে থাকে। তার বহু হাদীস মুনাকার হিসেবে বিবেচিত। আল্লামা যাহাবী (র) মীযানুল ই'তিদালে তার আলোচনা প্রসঙ্গে একটি মুনকার হাদীস উল্লেখ করে বলেন, ইবন মুহাম্মদ কর্তৃক বহু মুনকার হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

সুতরাং আলোচ্য হাদীসে বৃদ্ধিকৃত অংশটি হযরত ইবন আবুস সিরযী (র) মুনকার রিওয়ায়াত সমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে কিংবা আহমদ ইবনে উমাইরের গরীব রিওয়ায়াত সমূহের পর্যায়ভুক্ত হবে। মুহাদ্দিসদের মতে তার বহু গরীব রিওয়ায়াত রয়েছে। কাজেই হাদীসটি প্রমাণযোগ্য নয়।[৮৯]

---

৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪৩-১১৪৪।

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪৫।

www.pathagar.com

আবূ হুরায়রা (রা) এর তা হাদীসের ব্যাখ্যা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ اُنَادِىْ اَنَّهُ لاَ صَلاَةَ اِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ (أخرجه أبو داؤد عن أبى داؤد)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) নির্দেশ প্রদান করেছেন যেন ঘোষণা দেই যে, ফাতিহা এবং আরো অতিরিক্ত কিছু না পড়লে নামায হবে না।

এর উত্তর এই নয়, আল্লামা আইনী (র) বলেন, আমার মতে এ হাদীসখানা বিভিন্নভাবে বর্ণিত,

* বায্যারের বর্ণনায় এরূপ রয়েছে, اَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى

(কোন এক ঘোষককে নির্দেশ দিলে সে ঘোষণা করল)

* আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-খিফাফ স্বীয় 'সালাত' গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করেন ঃ لاَ صَلاَةَ اِلاَّ بِقُرْاٰنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ

কিরা'আত কুরআন পড়া ব্যতীত নামায হবেনা যদিও তা ফাতিহা এবং অতিরিক্ত কিছু হোক।

* ফিরয়াবী স্বীয় 'সালাত' গ্রন্থে নিম্নরূপ বর্ণনা করেন। امرني ان انادى فى المدينة ان لا صلاة الا بقراءة او بفاتحة الكتاب فما زاد

আমাকে নির্দেশ প্রদান করেছেন যেন মদীনা ঘোষণা দেই যে, কিরা'আত পড়া ব্যতীত অথবা ফাতিহা ও অতিরিক্ত অংশ পড়া ব্যতীত নামায হবে না।

* ইমাম বায়হাকী এরূপ বর্ণনা করেন, الاَّ بقرَاءَةِ فاتحة الكتاب فما زاد ফাতিহা ও আরো কিছু পড়া ব্যতীত নামায হবে না। "সালাতে" এরূপ বর্ণনা করেন فى كلى صلاَةِ قرَاءَةٌ ولو بفاتحة الكتاب প্রত্যেক নামাযেই কিরা'আত রয়েছে যদিও সূরা ফাতিহা হয়। উপরোক্ত এসব হাদীসের দ্বারা (মুক্তাদীর জন্য) ফাতিহা পড়া ফরয বলে প্রতীয়মান হয় না। বরং এগুলোর অধিকাংশ থেকে তা ফরয না হওয়ার বিষয়টি প্রতিভাত হয়। দেখা যায় যদি একটি দ্বারা ফাতিহা ব্যতীত নামায না হওয়া প্রতিভাত হয়ে অপরটি দ্বারা ফাতিহা ব্যতীত নামায সহীহ হওয়া প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। সুতরাং পেশকৃত হাদীসটিকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা যাবেনা যে মুক্তাদীর জন্য নামাযে ফাতিহা পড়া ফরয বা আবশ্যক।

আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী (র) বলেন, যদি হাদীসটি আপন অবস্থায় মেনেও নেওয়া হয় তাহলে এটা ইমাম এবং মুনাফারিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

তাছাড়া এর দ্বারা এটাও প্রতিভাত হয় যে, ফাতিহার সাথে অতিরিক্ত অংশও ফরয মুক্তাদীর জন্য। কেননা ما زاد (অতিরিক্ত অংশ) এর দ্বারা উদ্দেশ্য ফাতিহা ছাড়া অতিরিক্ত অংশ। فما زاد এর মধ্যে ف হচ্ছে সংযোজক অব্যয় যা তার পরবর্তী শব্দ বা বাক্যকে পূর্ববর্তী শব্দ বা বাক্যের সাথে সংযোজন করে দেয় এ মর্মে যে, পূর্ববর্তী বস্তুর সাথে যে বিধান বা হুকুম সম্পৃক্ত সেটি তার পরবর্তী বস্তুর সাথেও যুক্ত। সুতরাং এখানে নামায না হওয়ার হুকুম যেভাবে ফাতিহা পড়ার সাথে সম্পৃক্ত তদ্রূপ অতিরিক্ত অংশ (ما زاد)-এর সাথেও সম্পৃক্ত হবে। যদি ফাতিহা ফরয হয় তাহলে অতিরিক্ত অংশ বা সূরা মিলানোও ফরয হবে। অথচ ইমামের পিছনে

www.pathagar.com

কিরা'আত পড়ার প্রবক্তাগণ তা ফরয বলা তো দূরের কথা জায়িযই বলেন না। অতএব সূরা মিলানোর ব্যাপারে যে জবাব প্রদান করা হয় হানাফী ফকীহগণ ফাতিহা সম্পর্কে সে উত্তরই প্রদান করে থাকেন। যদি বলা হয়, অতিরিক্ত কিছু তথা সূরা পড়া জায়িয় নয় তাহলে হানাফীরা বলেন, যে, ফাতিহারও একই বিধান। একটিকে অপরটি থেকে বিধানগত দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করা নিয়ম বহির্ভূত কাজ।[৯০]

আবূ কিলাবার হাদীসের ব্যাখ্যা ও উত্তর

عَنْ اَبِىْ قَلاَبَةَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّكُمْ تَقْرَأُوْنَ وَالْاِمَامُ يَقْرَأُ؟ قَالُوْا اِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ يَقْرَأَ اَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

(رواه أحمد من طريق خالد الحذاء واسناده حسن)

এ. আবু কিলাবাহ থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা)-এর কোন এক সাহাবী বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, মনে হয় ইমামে কিরা'আত পড়া অবস্থায় তোমরাও পড় ? বলল, আমরা অবশ্যই তা করে থাকি। বললেন, না তবে ফাতিহা পড়তে পার।[৯১]

উত্তর এর যে, এ হাদীসটি সনদ গত দিক থেকে এবং মতন গত দিকে اضطراب পূর্ণ।

সনদগত اضطراب এর বিবরণ

* আইয়ূব সাখতিয়ানী আবূ কিলাবার সূত্রে নবী (সা) থেকে এটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেন।

* কেউ কেউ এটি আবূ কিলাবার সূত্রে আনাসের মাধ্যমে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বায়হাকী এ সূত্রকে ক্রটিযুক্ত (معلول) বলে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি সুনানে বলেন, যারা বলে, আবূ কিলাবা আনাস থেকে বর্ণনা করেন সেটা যথাযথ নয়।

ইমাম দারাকুতনী আবু কিলাবার এ সূত্রটি উল্লেখ করে বলেন, ইবনে উলাইয়্যা এর বিপরীতে আন আইউব আন্-আবী কিলাবার সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেন

* আততা'লীকুল হাসানে বলা হয়েছে ঃ

رواه خالد الحذاء عن أبى عائشة عن رجل عن أصحاب النبى ﷺ

খালিদ আল-হায্যা আবূ আয়েশার সূত্রে জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন। উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রতিভাত হয় যে, কোন সূত্র অনুযায়ী হাদীসটি মাওকূফ আবার কোন সূত্র মুতাবিক মারফূ'।

মতনের اضطراب এর বিবরণ

* তাহাভীতে এরূপ বর্ণিত রয়েছে ঃ

---

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬৩-১১৬৪।

৯১. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫।

www.pathagar.com

عَنْ اَبِىْ قَلاَبَةَ عن انس قال رسول الله ﷺ ثم اقبل بوجهه فقال اَ تَقْرَأوْنَ وَالْاِمَامُ يَقْرَأْ ؟ فسكتوا فسألهم ثلاثًا ، فقالوا اما لنفعل فقال فلا تفعلوا .

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়ার পর মুসল্লীদের দিকে মুখ করে বললেন, তোমরা কি ইমামের পড়া অবস্থায় পড় ? তখন তারা চুপ হয়ে গেল, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে তিনবার প্রশ্ন করার পর বলল যে, আমরা অবশ্যই তা করি। বললেন, তোমরা এরূপ (আ) করোনা।

উল্লেখ্য, এখানে নবী করীম (সা) তাদেরকে সাধারণভাবে ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়তে নিষেধ করেছেন ফাতিহা কিংবা অন্য সূরা তার বর্ণনা দেননি।

কিন্তু ইমাম বায়হাকী (র) স্বীয় 'জুয' গ্রন্থে উক্ত রেওয়ায়াতটি হাসান ইবনে ফাঁরাজ আল-গাযযী আন্ ইউসুফ ইবন আদীর সূত্রে বর্ণনা করে আপত্তি করতে গিয়ে বলেন যে, এখানে মূলত ফাতিহার বিষয়টি বাদ দেওয়া আছে, কিন্তু ইউসুফ ইবন আদী ভুলক্রমে তা উল্লেখ করেননি। এ ত্রুটির কারণ একমাত্র তিনি।

এর উত্তর হলো ঃ ইউসুফ ইবন আদী একজন নির্ভরশীল রাবী। 'তাহযীবে' বলা হয়েছে তিনি ইমাম বুখারীর শায়খ এবং সিকা রাবী। তাঁর সম্পর্কে কেউই একথা বলেন তিনি হাদীসে ভুল করেন কিংবা সন্দেহে নিপতিত হল। আর এ অংশটি। "الا بفاتحة الكتاب"ফাতিহা ব্যতীত"–বাদ দেওয়ার ত্রুটিটি এ পর্যায়ের নয় যেটা রাবীগণ জায়িয বলে মেনে নিবেন। কেননা এ অংশটি শরী'আত প্রণেতা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। কেননা, তিনি ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়তে নিষেধ করেছেন।

আর কোন সিকা রাবী এরূপ করতে পারেন ন। সুতরাং বলতে হবে যে, ইউসুফ ইবনে আদী যা শ্রবণ করেছেন কি তা বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে কম বেশী করেননি। আর তিনিও এ অংশ ব্যতীত হাদীসটি শ্রবণ করেছেন। তাছাড়া, হাদীসের এ অংশটি لاَ الاَّ اَنْ يَقْرَأَ اَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ থেকে ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। এর দ্বারা শুধু এতটুকু প্রতিভাত হয় যে, মুক্তাদির জন্য পড়ার অনুমতি রয়েছে। আর হানাফী ফকীহগণের মতে ইমামের সাকতাগুলোতে পড়ার অবকাশ রয়েছে।

جرح ও تعديل শাস্ত্রের ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (র) বলেন, এ অংশ (اَ لاَ اَنْ يَّقْرَأَ اَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) বিশিষ্ট হাদীস তেমন পর্যায়ের নয়। যায়লাঈ (র) বলেন, ইমাম আহমদসহ বহু মুহাদ্দিস এটিকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেন।[৯২]

ইমামের সাক্তা[৯৩]গুলো মুক্তাদীর ফাতিহা পড়ার জন্য নয়

অনেকে বলেন থাকেন যে, ইমামের সাক্তাগুলোর মুক্তাদীর জন্য কিরা'আত পড়া ওয়াজিব। কিন্তু তা কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে কিছু কিছু হাদীস থেকে ব্যবহৃত বুঝে আসে

৯২. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫৫-১১৫৬।

৯৩. সাকতা, অর্থ চুপ করা, থামা। ইমামের কিরা'আতের আগে পরে বা মাঝে থামাকে সাকতা বলা হয়। সাধারণত সাকতা কয়েকবার হয়ে থাকে। তাকবীরে তাহরীমা বলতে, পর, সানা পড়ার জন্য সূরা ফাতিহা পড়ার পর আমীন বলার জন্য বা পরবর্তী সূরা নির্ধারণের জন্য। হানাফী মাযহাবে নামাযের মধ্যে ইমামের সাকতা করা ওয়াজিব নয়। সুতরাং তখন কিরা'আত পড়া ওয়াজিব হওয়া তো পরের কথা।

www.pathagar.com

যে, ইমামের সাকতা করার সময়ে মুক্তাদীর জন্য ফাতিহা পড়ে নেওয়া ওয়াজিব। নিম্নে সেসব রিওয়ায়াতের যথোচিত ব্যাখ্যা ও উত্তর প্রদান করা হলো ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مَنْ صَلّٰى صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مَعَ الْاِمَامِ فَلْيَقْرَءْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِىْ سَكْتَاتِهٖ .

আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, কেউ যদি ইমামের সাথে ফরয নামায আদায় করে তাহলে সে যেন তার সাকতাগুলোতে ফাতিহা পড়ে নেয়।

এর উত্তর এই যে, এ হাদীসের সনদে বিদ্যমান মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উবাইদ ইবন উমার লাইসী ইবন মুঈনের মতে দুর্বল রাবী। ইমাম বুখারী বলেন, সে منكر الحديث।

নাসাঈ (র) বলেন, তাঁর হাদীস বর্জনযোগ্য। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থকার বলেন, সুনান গ্রন্থকারগণ সাকতা সম্পর্কে যে, হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাতে ঐ সাকতার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যেটা মুক্তাদীর ফাতিহা পড়ার সুবিধার্থে করে থাকে। কেননা হাদীসে বর্ণিত সাকতাটি হচ্ছে আমীন উচ্চারণ করার অবকাশ প্রদান মাত্র। এতে যে পারে তা বলে নিজে, অন্যথায় ইমামের সঙ্গে রুকু'তে চলে যাবে। অথবা এরূপ বলা হবে যে, এটি আমীন এবং ফাতিহার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টির জন্য 'অতি সামান্য ক্ষণ নীরব থাকা মাত্র'। যাতে কুরআনের সাথে কুরআন বহির্ভুত বস্তুর সংমিশ্রণ না ঘটে। অথবা এ হাদীসে নির্দেশিত সাকতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেন তিলওয়াতকারী পরবর্তী আয়াত বা সূরা পড়ার জন্য ভাল শ্বাস গ্রহণ করে নিতে পারে।[৯৪]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خَيْثَمَ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ ؟ قَالَ نَعَمْ وَاِنْ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ ، اِنَّهُمْ اَحْدَثُوْا شَيْئًا لَمْ يَكُوْنُوْا يَصْنَعُوْنَهُ اِنَّ السَّلَفَ كَانَ اِذَا اَمَّ اَحَدُهُمُ النَّاسَ كَبَّرَ ثُمَّ اَنْصَتَ حَتّٰى يَظُنَّ اَنَّ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ... (أخرجه الحافظ ابن حجر فى تخريج الاذكار وصححه موقوفًا)

আব্দুল্লাহ ইবন উসমান ইবন খায়সাম বলেন, আমি সাঈদ ইবন যুবায়র (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়ার কি ? বললেন, হ্যাঁ, যদিও তুমি তার কিরা'আত শ্রবণ করে থাক। তাঁরা তো (সাহাবীগণ) এমন একটি জিনিস নতুনভাবে শুরু করেছে যা তারা করত না, আসলাফের কেউ যখন লোকদের ইমামতি করত তখন তাকবীর দিয়ে চুপ থাকত এ পরিমাণ সময় যে, মুক্তাদী ফাতিহা পড়ে নিয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

এটি হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (র) তাখরীজুল আযকারে বর্ণনা করে তা মাওকূফ বলে সহীহরূপে আখ্যায়িত করেন।

এর উত্তর এই যে, এ হাদীস থেকে শুধু এতটুকু প্রতিভাত হয় যে, ইমাম সাহেব প্রথম সাকতাটি দীর্ঘ করতেন। অন্যটি (ফাতিহার পরেরটি) নয়। তাছাড়া এর দ্বারা সাকতা ওয়াজিব

৯৪. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬১।

www.pathagar.com

হওয়ার বিষয়-প্রমাণিত হয় না। এতে তো শুধু এতটুকু হয় যে, সালাফগণ এ আমলটি সদা করে যেতেন।[৯৫]

فى بهجة المحافل انه ﷺ كَانَ يَسْكُتُ بَعْدَ التَّامِيْنِ سَكْنَةً طَوِيْلَةً بِحَيْثُ يَقْرَأُ الْمَامُوْهُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ .

বাহজাতুল মাহাফিলে বর্ণিত রয়েছে, নবী করীম (সা) 'আমীন' বলার পর সাকতা এতটুকু দীর্ঘ করতেন যে, মুক্তাদী ফাতিহা পড়ে নিতে পারত।

উত্তর ঃ এটি এ পর্যায়ের একটি সুন্নাত যে, খুবই কম সংখ্যক ইমাম এটিকে আমলেররূপ দান করেছেন। কাজেই এটি (سنة مهجورة) ছেড়ে দেয়া সুন্নাতবলীর অন্তর্ভুক্ত হবে। তাছাড়া হাদীসে তো এটা বলা হয়নি যে, এ সাকতা দ্বারা এটাই রাসূলের উদ্দেশ্য আর কোন উদ্দেশ্য নয়। তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ (সা) যে, মুক্তাদীর ফাতিহা পড়ার উদ্দেশ্যে সাকতা করতেন এটা তো তিনি বলেননি। হতে পারে অন্য কোন উদ্দেশ্য সাকতা করেছেন। তবে দীর্ঘ হওয়ার কারণে দর্শক মণ্ডলী ভেবেছেন যে এটি ফাতিহা পড়ার সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে করেছেন। বাস্তবে তাই হলে এটি লুকায়িত থাকত না। সুতরাং এ রিওয়ায়াতটি সুস্পষ্ট নয় বিধায় এর দ্বারা সাকতার মধ্যে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ করা যাবেনা।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র) কিতাবুস সালাতে সাকতা সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করার পর বলেন যে, মোটকথা কোন সহীহ কিংবা দুর্বল সনদে একথা প্রমাণিত নেই যে, নবী করীম (সা) ফাতিহা পড়ার পর মুক্তাদীদের ফাতিহা পড়ার জন্য সাকতা করতেন, যদি বিষয়টি এমনই হতো যে, তিনি দীর্ঘ সাকতা করতেন যাতে মুক্তাদীরা সে সময়ে ফাতিহা পড়ে নিতে পারে তাহলে তা তাঁর সাহাবীগণের নিকট অস্পষ্ট ও গোপণ থাকত না। তাঁরা অবশ্যই এ সম্পর্কে অবগত থাকতেন এবং প্রথম সাকতা (তাকবীরে তাহরীমার পরের সাকতা) বর্ণনা করার চেয়ে এটিকে অধিক গুরুত্বসহ বর্ণনা করতেন।[৯৬]

আল্লামা ইবনুল আমীর আল-ইয়ামানী 'সুবুলুস্-সালাম' গ্রন্থে (১/১৫৬) বলেন, ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়া ওয়াজিবের প্রবক্তাগণ পরস্পর মতনৈক্য করেছেন যে, তা কখন পড়া হবে। কেউ কেউ বলেন, ইমামের আয়াতসমূহের মধ্যে কৃত সাকতাগুলোর মধ্যে পড়ে নিবে। আর কারো মতে ইমাম ফাতিহা পূর্ণরূপে পড়ে চুপ করার সময় পড়ে নিবে। কিন্তু এতদুভয় অভিমতের কোনটির হাদীসে কোন প্রমাণ নেই।

মোটকথা, সাকতাগুলোতে মুক্তাদীর জন্য ফাতিহা পড়া ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি তখন সাব্যস্ত হতে পারে যদি সাকতা করা ওয়াজিব বলে প্রমাণিত হয়।[৯৭]

উপসংহার

কেউ উপরোক্ত সমস্ত আলোচনার সারমর্ম হলো এই যে, বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের আলোকে একথাই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মুক্তাদীর জন্য ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়া

৯৫. প্রাগুক্ত।

৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬২।

৯৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

জায়িয নয়। এমনকি সাকতা অবস্থায়ও নয়। যে সমস্ত হাদীস দ্বারা বাহ্যত মুক্তাদীর জন্য ফাতিহা পড়ার বিষয়টি জরুরী বলে মনে হয়। তা যথাযথ নয়। কেননা, হাদীসে স্পষ্টভাবে এ কথা বলা হয়নি যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদী কিরা'আত বা ফাতিহা না পড়লে তার নামায হবে না, পক্ষান্তের বহু হাদীসে বলা হয়েছে যে, যার ইমাম থাকবে ইমামের কিরা'আতই তার কিরা'আতের জন্য যথেষ্ট হবে। যথেষ্ট হবে না একথা কোথাও বর্ণিত নেই। বরং কিরা'আত পড়াকে বিভিন্ন হাদীসে অপছন্দ মনে করা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ নীরব থাকতে বলা হয়েছে।

অধিকন্তু যুক্তি ও বিবেকের অনিবার্য দাবী হচ্ছে এই যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরা'আত পড়া না জায়িয। নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি যুক্তি পেশ করা সমীচীন মনে করছি ঃ

যুক্তি নং ১

১. ইমাম তাহাভী (র) শারহে মা'আনিল আসারে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরা'আত পড়া ওয়াজিব না হওয়ার একটি অখণ্ডনযোগ্য যুক্তি পেশ করেছেন, সেটি হলো, কোন ব্যক্তি যদি এসে ইমামকে রুকূ' অবস্থায় পায় তাহলে সে তাকবীর দিয়ে ইমামের সাথে রুকূতে শামিল হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হবে যে, সে ঐ রাক'আতটি পেয়েছে। যদিও সে ইমামের কিরা'আত পায়নি তবু সেটি তার জন্য পূর্ণ রাক'আত বলে বিবেচিত হবে। এতে কারো কোন প্রকারের দ্বিমত নেই। এর থেকে প্রতিভাত হয় যে, মুক্তাদীর উপর কিরা'আত ফরয বা ওয়াজিব নয়। ইমামের কিরা'আতই তার কিরা'আতের জন্য যথেষ্ট। ফরয হলে নামায বাতিল হতো তার ওয়াজিব হলে নামায অসম্পূর্ণ হতো। কিন্তু এ কথা কেউই বলেন না। পক্ষান্তরে কেউ যদি ইমামকে রুকূ' অবস্থায় পেল; কিন্তু সে তাকবীর দিয়ে একটুও না দাঁড়িয়ে সরাসরি রুকূতে চলে গেল। তাহলে কিয়াম নাকরার কারণে তার সে রাক'আত হয়নি বলে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। কেননা কিয়াম করা ফরয, এমনিভাবে ইমামের সাথে রুকূ' সাজদার কোন একটি না করলে তার নামায হবে না। কেননা সেগুলোর ক্ষেত্রে ইমামের আমল মুক্তাদীর আমলের জন্য যথেষ্ট নয়।[৯৮]

যুক্তি নং ২

শাইখে আকবর বলেন, আল্লাহ তা'আলা জামা'আতের মধ্যে একজনকে ইমাম হিসাবে নির্বাচন করেছেন, যেন তিনি জামা'আতের পক্ষ থেকে আল্লাহর সাথে কথা বলেন। যেন তিনি তাকে তার এবং বান্দাদের মাঝখানে দোভাষী হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। অতএব এমতাবস্থায় জামা'আতে শরীক লোকদের চুপ থাকা উচিত তাদের ইমামের মাধ্যমে প্রভু ও সর্দারের পক্ষে থেকে কি আসে তার আশায় ও অপেক্ষায় থাকা। আর এরজন্য চুপ থাকাই সমীচীন।[৯৯]

যুক্তি নং -৩

হাফিয ইবন তাইমিয়্যা বলেন, যদি ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়া ওয়াজিবের বিষয়টি যাহরী নামাযে ধরা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দু'পন্থার কোন একটি অবশ্যই পাওয়া যাবে। হয়ত

---

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬৪।

৯৯. মাওলানা মোঃ আবুল হাসান, তানযীমুল আশতাত ঃ বাংলা ইসলামিক একাডেমী দেওবন্দ, সাহারানপুর, অধ্যায় ঃ সালাতঃ পরিচ্ছেদ; কিরা'আত খালফাল ইমাম, খ., ১, পৃ. ৩২২।

www.pathagar.com

ইমামের কিরা'আতের সাথে পড়বে এ অবস্থায় কুরআন হাদীস পরিপন্থী আমল হবে। কেননা তখন চুপ থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। অথবা মুক্তাদীর পড়ার জন্য ইমাম চুপ থাকবে। অথচ ইমামের মুক্তাদীর কিরা'আতের জন্য চুপ থাকা সর্বসম্মতি ক্রমে ওয়াজিব নয়। কেননা নবী করীম (সা) মুক্তাদীদের পড়ার জন্য চুপ থাকতেন না।[১০০]

যুক্তি নং ৪

ইমাম কুরআন তিলাওয়াত করছেন এমতাবস্থায় যদি মুক্তাদী ইমামের সাথে পড়া শুরু করে তাহলে এটা যেন তাকে এমন লোকদের সামনে কুরআন পড়ার হুকুম দেওয়া হলো যারা শ্রবণ করতে প্রস্তুত নয়। এটা ঐ ব্যক্তির ন্যায় হবে যে এমন লোকদের লক্ষ্য করে কথা বলছে যারা তার কথা শ্রবণ করেনা কিংবা এমন লোকদের সামনে বক্তব্য দিল যারা তা শ্রবণ করে না। তাহলে তার এ কথা ও বক্তব্য বোকামিরই নামান্তর হবে।[১০১]

যুক্তি নং ৫

বাদশার দরবারে এক দল লোক কোন বিষয়ের আবেদন পেশ করতে গেলে তার সম্মুখে সকলের পক্ষ থেকে একজনই কথা বলে। সকলে বললে বাদশাহ নিজেই বলে দেন যে, কোন একজন বল, বা তোমাদের প্রতিনিধি প্রধানকে বলতে দাও। তার কথাই সকলের কথা বলে ধরে নেওয়া হয়। এরূপ রহস্য নামাযের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এরই প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন। যার ইমাম থাকবে ইমামের কিরা'আতই তার কিরা'আতের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হবে।–এসব যুক্তির নিরিখেও আলোচ্য বিষয়ে হানাফী মাযহাব সুদৃঢ় ও শক্তিশালী প্রমাণিত হয়।[১০২]

---

১০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩।

১০১. প্রাগুক্ত।

১০২. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

নামাযে ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই নিঃশব্দে 'আমীন' বলবে

'আমীন' (امين) অর্থ يَا اَللّٰهُ اسْتَجِبْ دُعَائَنَا (হে আল্লাহ্ আমাদের দু'আ কবুল করুন)[১] অথবা এর অর্থ হচ্ছে, لَا تُخَيِّبْ رَجَائَنَا (আমাদের আশা নিরাশায় পরিণত করবেন না)[২] এ শব্দটি কোন ভাষার শব্দ এ সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিকদের মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে এটি আরবী শব্দ এবং اسم فعل। আবার কারো মতে এটি ইবরানী শব্দ। আবার কেউ বলেছেন, এটি সুরয়ানী শব্দ,[৩] এটিই সর্বাধিক শক্তিশালী অভিমত। কেননা, বাইবেল গ্রন্থে শব্দটি হুবহু এভাবেই বিদ্যমান। হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (র) المطالب العالية কিতাবে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, এক ইয়াহুদী ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর যবান মুবারক থেকে 'আমীন' (امين) শব্দটি শুনামাত্রই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।

'আমীন' (امين) শব্দের পাঠ প্রক্রিয়া ক্ষেত্রে একাধিক অভিমতের উল্লেখ পাওয়া যায়। আল্লামা ইউসুফ বানূরী (র) বলেন, এ শব্দটি চার ভাগে পড়া যায়। (১) امين بالمد والتخفيف অর্থাৎ امين এর الف অক্ষরে মাদ্দ এবং يا অক্ষরে জযম এর সাথে। (২) امين بالقصر والتخفيف অর্থাৎ امين এর الف অক্ষরে মাদ্দ ছাড়া এবং يا অক্ষরে জযমের সাথে। (৩) امين بالامالة অর্থাৎ আমীন শব্দটিকে ইমালা করে পড়া। (৪) امين بالمد والتشديد অর্থাৎ امين এর الف অক্ষরে মাদ্দ এবং ميم অক্ষরে তাশদীদ এর সাথে। উপরোক্ত পাঠে প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে প্রথম দু'টি প্রসিদ্ধ। এর মধ্যে আবার প্রথমটি অধিক প্রসিদ্ধ।

আল্লামা ইব্ন আবেদীন শামী (র) এর মতে আমীন (امين) শব্দটিকে নয়ভাবে পড়া যায়। তন্মধ্যে পাঁচ অবস্থায় নামায সহীহ হবে। এ পাঁচ অবস্থা বাদে অন্যান্য অবস্থায় নামায সহীহ হবে না।[৪]

জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা অবস্থায় সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের পর 'আমীন' বলা বড়ই সাওয়াবের কাজ। কাজেই ইমামের غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ তিলাওয়াতের পর ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই 'আমীন' বলবে এবং এই জন্যই বলা ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্যই সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে একাধিক হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

---

১. আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী (র) মা'আরিফুস সুনান, প্রকাশনায় দারুল কতুব দেওবন্দ, ভারত, বাবু মাজাআ ফিত তামীন, খ. ২য়, পৃ. ২৯৭।

২. মাওলানা মুহাম্মদ তকী উসমানী (র) দরসে তিরমিযী, প্রকাশনায় আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ ভারত, বাবু মা জাআ ফিত তামীন, খ. ১ম, পৃ. ৫১২।

৩. মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১।

৪. মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১।

www.pathagar.com

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ قَالَ اذا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَامِّنُوْا فَانَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِيْنُهُ تَامِيْنَ الْمَلٰئِكَة غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وكَانَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ . رواه البخارى واسناده صحيح

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ইমাম যখন আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা ফিরিশতাদের আমীন বলার সাথে যার আমীন বলার মিল হবে তার পূর্ববর্তী সকল গুণাহ মাফ হয়ে দেওয়া হবে। ইবন শিহাব (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ও আমীন বলতেন।[৫]

এই হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি নেই। এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, 'আমীন' বলা ইমাম ও মুকতাদী সকলের জন্যই সুন্নাত। আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী (র) বলেন ঃ

قوله فامنوا للندب عند الجمهور صرح به الحافظ فى الفتح (٢-٢١٩) وثبتت السنية بمواظبته ﷺ عليها ودليل المواظبة مرسل ابن شهاب ومراسيله وان كانت ضعيفة ولكنه اعتضد بالموصول ، كذا فى إعلاء السنن (٢-٢١٢)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী فَـامِّنُوْا শব্দটি এখানে জমহুর উলামায়ে কিরামের মতে ندب অর্থাৎ মুস্তাহাব হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (র) এ কথাটি তৎপ্রণীত 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে (২-২১৯) পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। আর নবী করীম (সা) যেহেতু এর উপর সব সময়ই আমল করেছেন তাই তাঁর এই আমলের দ্বারা 'আমীন' বলার বিষয়টি সুন্নাত হওয়া প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য যে 'আমীন' বলার উপর নবী করীম (সা)-এর مواظبت অর্থাৎ সর্বদা আমল করার বিষয়টি প্রমাণিত হয় ইবন শিহাব যুহরী (র)-এর مرسل বর্ণনার দ্বারা। তাঁর مرسل বর্ণনা দুর্বল (ضعيف) হলেও এটি যেহেতু অন্য موصول বর্ণনার দ্বারা সমর্থিত, তাই এর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি থাকার কথা নয়।[৬]

অপর এক হাদীসে আছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ اذا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ تَقُوْلُ

৫. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, আস সহীহ আল-বুখারী, প্রকাশনা আশরাফী বুক ডিপো দেওবন্দ, বাবু জাহরিল ইমাম বিতআমীন, খ. ১ম, পৃ. ১০৮।

৬ আল্লামা যফর আহমদ উসমানী (র), ই'লাউস সুনান, প্রকাশনায় ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূম আল-ইসলামিয়্যা, করাচী পাকিস্তান, বাবুম মা জাআ ফী সুন্নিয়্যাতিত তামীন ওয়াল ইখফা বিহা, খ. ২য়, পৃ. ২১২।

www.pathagar.com

اٰمِيْنَ وَاَنَّ الْاِمَامَ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ فَمَنْ وَافَقَ تَامِيْنُهٗ تَامِيْنَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهٗ ، مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ . رواه أحمد النسائى والدارمى واسناده صحيح "اثار السنن" (١-١٩١) ورواه ابن حيان فى صحيحه "زيلعى" (١-١٩٤) كذا فى إعلاء السنن (٢-٢١٢)

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ইমাম غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ বলার সময় তোমরা 'আমীন' বলবে। কেনানা ফিরিশতাগণ আমীন বলেন এবং ইমাম ও আমীন বলে। সুতরাং ফিরিশতাদের আমীনের সাথে যার আমীনের মিল হবে তার পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।[৭]

এই হাদীস থেকেও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই আমীন বলবে এবং আমীন বলা সকলের জন্যই সুন্নাত। কেননা হাদীসের প্রথমাংশে فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ বলে মুক্তাদীদেরকে আমীন বলার হুকুম দেওয়া হয়েছে। অতঃপর وَاَنَّ الاِمَامُ يَقُوْلُ اٰمِيْن বলে "ইমামও যে আমীন বলবে" সে কথার সংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

আল্লামা ইউসুফ বান্নৌরী (র) বলেন, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (র) বলেছেন,

ان قوله ﷺ اذا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا قِيْلَ هُوَ عِبَارَةُ النَّصِّ فِىْ تَامِيْنِ الْمَامُوْمِ وَاِشَارَةُ النَّصِّ فِىْ تَامِيْنِ الْاِمَامِ وَقَالَ الْحَافِظُ فِى الْفَتْحِ اَنَّ قَوْلَهٗ ﷺ اذا اَمَّنَ الْاِمَامُ ظَاهِرٌ فِىْ اَنَّ الاِمَامَ يُؤَمِّنُ يعنى اَنَّ الْحَدِيْثَ ظَاهِرٌ فِىْ تَامِيْنِ الاِمَامِ كَمَا هُوَ نَصٌّ فِىْ تَامِيْنِ الْمَامُوْمِ . كذا فى معارف السنن (٢ - ٤٢٤)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী اِذَا اَمَّنَ الاِمَامُ فَامِّنُوْا মুক্তাদীর আমীন বলার ক্ষেত্রে عبارة النص এবং ইমামের আমীন বলার ক্ষেত্রে اشارة النص। কিন্তু হাফিয ইবন হাজার (র) তৎপ্রণীত 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, اِذَا اَمَّنَ الاِمَامُ فَامِّنُوْا বাক্যটি ইমামের আমীন বলার ক্ষেত্রে ظاهر অর্থাৎ এই বাক্যটি ইমামের আমীন বলার ক্ষেত্রে ظاهر যেমনিভাবে তা মুক্তাদীর আমীন বলার ক্ষেত্রে نص[৮]। অপর এক হাদীসে আছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَّنَ الْقَارِىْ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَامِيْنُهٗ تَامِيْنَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ .

---

৭. প্রাগুক্ত।

৮. আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী (র), মা'আরিফুস্ সুনান, প্রকাশনায় দারুল কুতুব দেওবন্দ, ভারত বাবু মা জাআ ফী ফাযলিত তামীন, খ. ২য়, পৃ.৪২৪।

www.pathagar.com

رواه النسائى وقال الحافظ فى رواه هذا الحديث ان عمرو بن عثمان ثقة وبقية صدوق كثير التدليس عن الضعفاء والزبيدى ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهرى والزهرى متفق على جلالته واتقانه وأبو سلمة ثقة مكثر من الثالثة (ماخوذ من تقريب التهذيب)

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কারী (ইমাম) 'আমীন' বলার সময় তোমরাও 'আমীন' বলবে। কেননা তখন ফিরিশতাগণও 'আমীন' বলে। ফিরিশিতাদের আমীনের সাথে যার আমীনের মিল হবে তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে।[৯]

উক্ত হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই 'আমীন' বলবে। উপরোক্ত হাদীসটি হুবহু সহীহ বুখারীতেও বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْقَارِىْ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَاْمِيْنُهٗ تَاْمِيْنَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ . رواه البخارى واسناده صحيح .

আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তোমরাও আমীন বলবে। কেননা এ সময় ফিরিশতাগণও আমীন বলে। অতএব ফিরিশতার আমীনের সাথে যার আমীনের মিল হবে তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।[১০]

উক্ত হাদীস থেকেও পরিষ্কার এ কথা প্রমাণিত হয় যে 'আমীন' বলা শুধু মুক্তাদীর وظيفة (দায়িত্ব) নয়। বরং আমীন বলা ইমাম ও মুক্তাদী সকলেরই দায়িত্ব এবং এটি সকলের জন্যই সুন্নাত।

عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَءَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ قَرَاَ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقَالَ اٰمِيْنَ فَقَالَ النَّاسُ اٰمِيْنَ وَيَقُوْلُ كُلَّمَا سَجَدَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَاِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوْسِ فِىْ الاِثْنَتَيْنِ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَاِذَا سَلَّمَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنِّىْ لاَشْبَهُكُمْ صَلٰوةً بِرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . رواه النسائى واسناده صحيح وكذلك أخرجه الامام أبو داؤد وابن ماجة والدارقطنى والحاكم بفرق يسير كذا فى معارف السنن (ج : ١ ، ص : ٣٩٩)

৯. হাফিয আবূ আবদুর রহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব ইবন আলী আন নাসাঈ (র) সুনানে নাসাঈ, প্রকাশনায় আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়্যা, দেওবন্দ ভারত, বাবু জাহরিল ইমাম বিআমীন, খ. ১ম, পৃ. ১০৭।

১০. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২য়, পৃ. ৯৪৭।

www.pathagar.com

নু'আয়ম আল-মুজমির (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর পেছনে সালাত আদায়ে করেছি। তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করলেন। তিনি غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ পড়ার পর আমীন বলেছেন। তাঁর আমীন বলার পর লোকেরাও আমীন বলেছেন। তারপর তিনি সিজ্দায় যাওয়ার সময় এবং দ্বিতীয় রাক'আতের বৈঠক থেকে উঠার সময় 'আল্লাহু আকবর' বলেছেন। এরপর সালাম ফিরিয়ে তিনি বলেছেন, যে সত্তার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন তাঁর শপথ, তোমাদের নামাযের তুলনায় আমার নামাযই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামাযের সাথে অধিক সাদৃশ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১১]

উক্ত হাদীস থেকেও এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, 'আমীন' বলা ইমাম ও মুক্তাদী সকলের দায়িত্ব। শুধুমাত্র মুক্তাদীর দায়িত্ব নয়। এটাই জমহুর ফুকাহায়ে কিরামের অভিমত। অর্থাৎ ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র) সকলেই এই মত পোষণ করেন।

অবশ্য কোন কোন হাদীস থেকে বাহ্যত এ কথাও বুঝা যায় যে, আমীন বলা শুধুমাত্র মুক্তাদীর দায়িত্ব ইমামের নয়। যেমন এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . قَالَ اذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَانَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ . رواه البخارى .

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যখন ইমাম غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ পড়বে তখন তোমরা আমীন বলবে। কেননা ফিরিশতাদের কথার সাথে যার কথার মিল হবে তার পূর্ববর্তী সমুদয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।[১২]

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে ইমাম মালিক (র) বলেন 'আমীন' বলা শুধুমাত্র মুক্তাদীর কাজ, ইমামের নয়। কেননা এই হাদীসে যার যার দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ হাদীসে বলা হয়েছে যে, وَلَا الضَّالِّيْنَ পর্যন্ত বলা ইমামের কাজ আর মুক্তাদীর কাজ امين বলা। والقسمة تنافى الشركة অর্থাৎ বন্টন অংশীদারীত্বের পরিপন্থী।

জুমহুর ফুকাহায়ে কিরাম এর জবাবে বলেন 'যার যার দায়িত্ব বন্টন করা' এই হাদীসের উদ্দেশ্য নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হল, এ কথা বর্ণনা করা যে, ইমাম ও মুক্তাদীর সকলে একই সময় 'আমীন বলা' এবং এর পদ্ধতি হল এই যে, যখন ইমাম وَلَا الضَّالِّيْنَ বলে অবসর হবে তখন বিলম্ব না করে 'আমীন' বলবে যাতে সকলের 'আমীন' এক সাথে আদায় হয়। কেননা ইমামও এই সময়েই আমীন বলবে। সুনানে নাসাঈর বর্ণনায় পরিষ্কারভাবে এ কথাটি উল্লেখ পূর্বক বলা হয়েছে যে, فَانَّ الْمَلٰئِكَةَ تَقُوْلُ اٰمِيْنَ وَاَنَّ الامَامَ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ কেননা ফিরিশ্তাগণ আমীন বলে এবং ইমামও আমীন বলে।[১৩] মোদ্দাকথা হল, আমীন বলা শুধুমাত্র ইমামের দায়িত্ব নয়। বরং তা ইমাম ও মুক্তাদী সকলেরই দায়িত্ব এবং সকলের জন্যই সুন্নাত।

---

১১. সুনানে নাসাঈ, প্রাগুক্ত, কিরা'আত বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, পৃ. ১০৪-১০৫।

১২. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

১৩. মাওলানা মুহাম্মদ তকী উসমানী, দারসে তিরমিযী, প্রকাশনা আশরাফী বুক ডিপো দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত, বাবুম মা জা'আ ফিত তামীন, খ. ১ম, পৃষ্ঠা ৫১৩।

www.pathagar.com

আমীন নিঃশব্দে বলা উত্তম

নিঃশব্দে এবং সশব্দে উভয়ভাবেই 'আমীন' বলা জায়িয। তবে উত্তম কোনটি এ ব্যাপারে হাদীসের বক্তব্যে বিভিন্নতা থাকলেও অধিকাংশ হাদীসের বক্তব্য থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, 'আমীন' নিঃশব্দে বলাই উত্তম। এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ . رواه البخارى (ج : ١ ، ص : ١٠٨)

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যখন ইমাম غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ বলবে তখন তোমরা 'আমীন' বলবে। কেননা ফিরিশ্তার কথার সাথে যার কথার মিল হবে তার পূর্ববর্তী সমুদয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।[১৪]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা যফর আহমদ উসমানী (র) বলেন,

دَلَالَةُ الْحَدِيْثِ عَلٰى قَوْلِ الْمَامُوْمِ اٰمِيْنَ بَعْدَ قَوْلِ الْاِمَامِ وَلَا الضَّالِّيْنَ ظَاهِرَةٌ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ اَنَّ الْاِمَامَ يُخْفِىْ بِهَا لِاَنَّ تَامِيْنَ الْاِمَامِ لَوْ كَانَ مَشْرُوْعًا بِالْجَهْرِ لَمَا عَلَّقَ النَّبِىُّ ﷺ تَامِيْنَهُمْ بِقَوْلِهٖ وَلَا الضَّالِّيْنَ بَلْ عَلَّقَ بِقَوْلِهٖ اٰمِيْنَ . فَاِنْ قُلْتَ قَدْ جَاءَ فِىْ الْحَدِيْثِ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا وَفِيْهِ عَلَّقَ تَامِيْنَ الْمَامُوْمِيْنَ بِتَامِيْنِهٖ اِلَّا اَنْ يَّسْمَعُوْا قُلْتُ اَجَابَ عَنْهُ فِى "التَّعْلِيْقِ الْحَسَنِ" بِاَنَّ الْجَمْهُوْرَ عَمِلُوْا قَوْلَهُ اِذَا اَمَّنَ عَلَى الْمَجَازِ لِلْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهٖ ﷺ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ ، قَالُوْا بِاَنَّ الْمُرَادَ اِذَا اَرَادَ التَّامِيْنَ وَهٰذَا كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى "اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ" اَىْ اِذَا اَرَدْتُّمْ اِقَامَةَ الصَّلَاةِ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِى الْفَتْحِ قَالُوْا فَالْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ يَقْتَضِىْ حَمْلُ قَوْلِهٖ اِذَا اَمَّنَ عَلَى الْمَجَازِ "إعلاء السنن" (٢-٢١١) وَ مَعْلُوْمٌ لَّنَا اَنَّ الاِمَامَ مَتْبُوْعٌ وَالْمَامُوْمَ تَابِعٌ لَّهٗ وَالتَّابِعُ لَا يُخَالِفُ الْمَتْبُوْعَ فَيَنْبَغِىْ لِلْمَامُوْمِ اَنْ يُّخْفِىَ بِهَا كَمَا .

এই হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, ইমামের وَلَا الضَّالِّيْنَ বলার পরই মুক্তাদী 'আমীন' বলবে। এই হাদীস থেকে এ কথাও বুঝা যাচ্ছে যে, 'আমীন' নিঃশব্দে বলবে। কেননা সশব্দে 'আমীন' বলা ইমামের জন্য বৈধ হলে নবী করীম (সা) মুক্তাদীদের ইমামের বলার সাথে শর্তযুক্ত করতেন না। বরং ইমামের আমীনের সাথে শর্তযুক্ত করতেন। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে

১৪. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

www.pathagar.com

পারে যে, এক হাদীসে আছে اذا امَّنَ الامَامُ فَامِّنُوْا অর্থাৎ যখন ইমাম 'আমীন' বলবে, তোমরাও 'আমীন' বলবে। এখানে তো মুক্তাদীদের 'আমীন' বলাকে ইমামের আমীন বলার সাথে শর্তযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই উপরের যুক্তি যথার্থ নয়। এই প্রশ্নের জবাবে التعليق الحسن গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, জমহুর উলামায়ে কিরামের মতে اذا امَّنَ الامَامُ فَامِّنُوْا বাক্যটি এখানে مجاز অর্থাৎ রূপক অর্থের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। এভাবে উক্ত হাদীস এবং اذا قَالَ الامَامُ غَيْرَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ এর মাঝে সমন্বয় সম্ভব হবে। এ হিসাবে اذا امَّنَ الامَامُ অর্থ হবে اذا اَرَادَ التَّامِيْنَ (যখন ইমাম আমীন বলার ইচ্ছা করবে।) যেমন কুরআন মজীদের আয়াত اذا قُمْتُمْ الَى الصَّلاَةِ এর অর্থ হল اذا اَرَدْتُمْ اقَامَةَ الصَّلاَةِ (যেমন তোমার নামায কায়েমের ইচ্ছা করবে।) হাফিয ইব্‌ন হাজার (র) ফাতহুল বারী গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, উপরোক্ত দুই বর্ণনার মাঝে সমন্বয় করার দাবী হল, اذا امَّنَ الامَامُ বাক্যকে مجاز তথা রূপকার্থে গ্রহণ করা।[১৫]

এ কথা আমাদের সকলেরই জানা আছে যে, মুক্তাদী হচ্ছে অনুসারী বা অনুবর্তী (تابع) এবং ইমাম হচ্ছে متبوع অর্থাৎ অনুসরনীয়। আর অনুসরণকারী ব্যক্তি কখনো অনুসরনীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধাচারণ করে না। কাজেই মুক্তাদীর জন্য সমীচীন হল, নিঃশব্দে আমীন বলা, যেমন ইমাম নিঃশব্দে 'আমীন' বলে থাকে।

অন্য এক হাদীসে আছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ لِلّٰهِ ﷺ اذا قَالَ الْامَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَانَّ الْمَلٰئِكَةَ تَقُوْلُ اٰمِيْنَ وَاَنَّ الامَامَ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ فَمَنْ وَافَقَ تَامِيْنُه تَامِيْنَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ . رواه أحمد والنسائى والدارمى واسناده صحيح . اثار السنن (١-١٩١) ورواه ابن حبان فى صحيحة "زيلعى" (١-١٩٤) كذا فى إعلاء السنن (٢-٢١٢)

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, যখন غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ বলবে তোমরা আমীন বলবে। কেননা ফিরিশ্‌তাগণ 'আমীন' বলে এবং ইমামও আমীন বলে। আর ফিরিশ্‌তাদের আমীনের সাথে যার আমীনের মিল হবে তার পূর্ববর্তী সমুদয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।[১৬]

আল্লামা যফর আহমদ উসমানী (র)-এর হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

فِيْهِ دَلاَلَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى الْاخْفَاءِ بِاَمِيْنَ لِلْامَامِ وَالاَّ لَمْ يَحْتَجْ الَى اظْهَارِ فِعْلِهٖ بِقَوْلِهٖ وَاَنَّ الْاَمَامَ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ كَمَا لاَ يَخْفٰى كذا فى اعلاء السنن (٢-٢١٢)

---

১৫ ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১।

১৬. সুনানে নাসাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

www.pathagar.com

এই হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ইমাম নিঃশব্দে আমীন বলবে। যদি তা না হত তাহলে 'ইমামও আমীন বলে' এ বাক্যের মাধ্যমে তাঁর কাজটিকে প্রকাশ করার প্রয়োজন হত না।[১৭] আর মুক্তাদীর জন্য যেহেতু ইমামের বিপরীত করা ঠিক নয়, এ কারণে মুক্তাদীও নিঃশব্দে আমীন বলবে। অপর এক হাদীসে আছে ঃ

عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا تَذَاكَرَا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً اِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَحَفِظَ سَمُرَةَ وَاَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبَا فِىْ ذٰلِكَ اِلٰى اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَكَانَ فِىْ كِتَابِهٖ اِلَيْهِمَا اَوْ فِىْ رَدِّهٖ عَلَيْهِمَا اَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ . رواه أبو داؤد واخرون واسناده صالح "اثار السنن" (١-٩٥) وفى "التعليق الحسن" وفى "المرقاة" قال ابن حجر رواه أبو داؤد وسنده حسن بل صحيح كذا فى إعلاء السنن (٢-٢١٢)

হাসান (র) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা সামুরা ইবন জুনদুব (রা) এবং ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) পরস্পর আলোচনা করছিলেন। এ সময় সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) বললেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট থেকে দু'টি সাকতা-নিরব থাকার দু'টি মুহূর্তের কথা স্মরণ রেখেছেন। একটি হল তাকবীরের পর। অপরটি হল غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ বলার পর। সামুরা (রা) এগুলোকে স্বীয় স্মৃতিবদ্ধ করে নেন। কিন্তু ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) তা অস্বীকার করেন। অতঃপর জানার জন্য তাঁরা বিষয়টি হযরত উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) এর নিকট লিখিতভাবে পেশ করেন। উত্তরে তিনি তাঁদের প্রতি লিখেন যে, সামুরা যথার্থই স্মরণ রেখেছে।[১৮]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা যফর আহমদ উসমান (র) বলেন,

اَلاَظْهَرُ اَنَّ السَّكْتَةَ الْاُوْلٰى كَانَتْ لِقِرَأةِ الثَّنَاءِ وَالسَّكْتَةُ الثَّانِيَةَ لِلتَّامِيْنِ سِرًّا . كذا فى إعلاء السنن (٢-٢١٢)

এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, প্রথম সাকতা (নিরবতা) ছিল সানা পড়ার জন্য এবং দ্বিতীয় সাকতা (নিরবতা) ছিল নিঃশব্দে 'আমীন' বলার জন্য।[১৯]

অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে,

عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ كَانَ عَلِىٌّ وَعَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلاَ بِالتَّعْوِيْذِ وَبِالتَّامِيْنِ . رواه الطبرانى فى الكبير وفيه أبو

১৭. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২।

১৮. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩।

১৯. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩।

www.pathagar.com

سعد البقال وهو ثقة مدلس ، "مجمع الزوائد" (١-١٨٥) كذا فى اعلاء السنن (٢-٢١٥)

আবূ ওয়াইল (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আউযুবিল্লাহ এবং আমীন সশব্দে বলতেন না।[২০]

অনুরূপ অপর একটি বর্ণনা অপর এক সূত্রে বর্ণিত রয়েছে। বর্ণনাটি এই ঃ

اَنَا كُرَيْبٍ نَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (هو أبو سعد) عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ وَعَلِىٌّ يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلاَ بِاٰمِيْنَ . رواه ابن جرير الطبرى فى "تهذيب الاثار" الجوهر النقى" (١-١٣٠) قلت (الشيخ ظفر أحمد العثمانى) رجاله رجال الجماعة غير البقال وهو ثقة مدلس كما سر كذا فى إعلاء السنن (٢-٢١٥)

আবূ কুরায়র (র) ---আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর এবং হযরত আলী (রা) 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম এবং আমীন' সশব্দে বলতেন না।[২১]

উপরোক্ত রিওয়ায়াত দু'টো থেকেও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত উমর এবং আলী (রা) এর মত বড় বড় সাহাবায়ে কিরামও নিঃশব্দে 'আমীন' বলতেন। উল্লেখ্য যে, হাদীসের রাবী বাক্কাল সম্পর্কে ثقة مدلس বলে যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে তা দোষনীয় নয়। কেননা ثقة এ নির্ভরযোগ্য রাবীর تدليس আমাদের নিকট ক্ষতিকার নয়।

অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে যে,

رَوٰى شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ اَبِىْ الْعَنْبَسِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ صَلّٰى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ وَاَخْفٰى بِهَا صَوْتَهُ . رواه أحمد وأبو داؤد الطيالسى وأبو يعلى الموصلى فى مسانيدهم والدار قطنى فى "سننه" والحاكم فى "المستدرك" وأخرجه فى كتاب القراءة ولفظه وخفض بها صوته وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه زيلعى (١-٣٦٩)

শুবা (র)... আলকামা ইব্‌ন ওয়াইল (র)-এর পিতা ওয়াইল (রা) থেকে বর্ননা করেন। তিনি বলেন, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সালাত আদায় করছিলেন। সালাতরত

২০. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫।

২১. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫।

www.pathagar.com

অবস্থায় তিনি غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ বলার পর আমীন বলেন এবং নিঃশব্দে বলেছেন।[২২] এই হাদীস থেকেও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম নিঃশব্দে আমীন বলবে। আর মুক্তাদীগণ যেহেতু সালাতে ইমামের অনুবর্তী হয়ে থাকে, তাই মুক্তাদীগণও নিঃশব্দে আমীন বলবে। এভাবে নিঃশব্দে আমীন বলাই সকলের জন্য উত্তম। ইমাম আযম আবূ হানীফা, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম মালিক (র) এর অভিমত এটিই। তবে কোন কোন হাদীসের বক্তব্য এর থেকে ভিন্নতর। যেমন,

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ نَا سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ وَقَالَ اٰمِيْنَ وَمَدَّبِهَا صَوْتَهُ . رواه الترمذى (١-٥٧)

বুনদার (র) ------ওয়াইল ইব্ন হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি যে, নবী করীম (সা) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ পড়ে আমীন বলেছেন এবং এই আমীন তিনি টেনে উচ্চঃস্বরে পড়েছেন।[২৩]

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, 'আমীন' সশব্দে বলা উত্তম। ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) এই অভিমতই পোষণ করেন। তাদের পক্ষ হতে ইমাম তিরমিযী (র) শু'বা (র) কর্তৃক বর্ণিত ৫ নং হাদীসের উপর باب ما جاء فى التامين এ তিনটি আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তা নিম্নে প্রদত্ত হল,

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ حَدِيْثُ سُفْيَانَ اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ فِيْ هٰذَا وَاَخْطَأَ شُعْبَةُ فِيْ مَوَاضِعَ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ عَنْ حُجْرٍ اَبِيْ الْعَنْبَسِ وَاِنَّمَا هُوَ حُجْرُ بْنُ الْعَنْبَسِ وَيُكَنّٰى اَبَا السَّكْنِ وَزَادَ فِيْهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ وَلَيْسَ فِيْهِ عَنْ عَلْقَمَةَ وَاِنَّمَا هُوَ حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَقَالَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ وَاِنَّمَا هُوَ مَدَّبِهَا صَوْتَهُ .

উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে ইমাম তিরমিযী (র) এখানে তিনটি আপত্তি করেছেন।

১. শু'বা (র) কর্তৃক সালামা ইবন কুহায়ল (র)-এর উস্তাদের নাম উল্লেখের ব্যাপারে ভুল হয়ে গেছে। তাঁর নাম হুজর ইবনুল আম্বাস। কিন্তু শু'বা (রা) উক্ত নামের স্থলে হুজর আবুল আম্বাস উল্লেখ করেছেন। অথচ তার উপনাম আবুল আম্বাস নয়। বরং তা হচ্ছে আবুল সাকান।

২২. আল্লামা জামালুদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ আল-হানাফী আল-যায়লাঈ (র), নসবুর রায়া, প্রকাশনায় দারু নাশরি কুতুবিল ইসলামিয়্যা, লাহোর, পাকিস্তান, খ. ১ম, পৃ. ৩৬১।

২৩. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, প্রকাশনায় কুতুব খানায়ে রশীদিয়া, দেওবন্দ বাবু মা জা'আ ফিত তামীন, খ. ১ম, পৃ. ৫৭।

www.pathagar.com

২. শু'বা (র) হুজ্‌র ইবনুল আব্বাস এবং ওয়াইল উব্‌ন ওয়াইল (র)-এর সূত্র বর্ধিত করেছেন। অথচ এই দুই জনের মাঝে কোন অতিরিক্ত সূত্র নেই। যেমন সুফিয়ান (র)-এর বর্ণনায় এ জাতীয় তৃতীয় কোন ব্যক্তির নাম বিদ্যমান নেই।

৩. শু'বা (র) হাদীসের মূল পাঠে (متن) مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ এর স্থলে خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ রিওয়ায়াত করেছেন। অথচ সহীহ রিওয়ায়াত হল مَدَّبِهَا صَوْتَهُ।

৪. ইমাম তিরমিযী (র) চতুর্থ এক আপত্তি العلل الكبير। নাম কিতাবে বর্ণনা করেছেন। তা হল এই যে, আলকামা (র) এই হাদীস তার পিতা ওয়াইল ইব্‌ন হুজ্‌র (র) থেকে শ্রবণ করেন নি। কেননা পিতার ইনতিকালের ছয় মাস পর তাঁর জন্ম হয়েছে।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) এবং আল্লামা ইউসুফ বানূরী (র)-এ সব প্রশ্নও আপত্তির বিস্তারিত জবাব প্রদান করেছেন।

প্রথম প্রশ্নের জবাব হল এই যে, মূলত হুজ্‌র (র)-এর পিতা এবং ছেলে উভয়ের নাম আব্বাস ছিল। সুতরাং তাকে حجر أبو العنبس এবং حجر ابن العنبس উভয়টি বলাই যথার্থ। ইবন হিববান (র) كتاب الثقات-এর মধ্যে পরিষ্কারভাবে এ কথা বর্ণনা করেছেন যে, তাকে হুজ্‌র আবুল আব্বাস বলা হয় এবং হুজ্‌র ইবনুল আব্বাসও বলা হয়। 'তাহযীবুত তাহযীব' গ্রন্থে হাফিয ইব্‌ন হাজার (র) এ কথা স্বীকার করেছেন। তাই রিওয়ায়াত সমূহে তার নাম বিভিন্নভাবে উক্ত হয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ (র) এই রিওয়ায়াতটিই (১-১৩৪-১৩৫) সুফিয়ান (র) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে হুজ্‌র ইব্‌ন আব্বাসের স্থলে হুজ্‌র আবুল আব্বার উল্লেখ করেছেন। যেমনটি শু'বা (র) করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম ইবন হিববান (র) এই রিওয়ায়াতটিই (موارد الظمآن ص : ١٢٤ رقم : ٤٤٧) শু'বা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে হুজ্‌র আবুল আব্বাসের পরিবর্তে হুজ্‌র ইব্‌ন আব্বাস উল্লেখ করেছেন। ইমাম দারা কুতনীও (রা) (১-৩৩৩) এই রিওয়ায়াতটির উল্লেখ করেছেন। তাতে শব্দগুলো নিম্নরূপ عن حجر أبى العنبس। وهو ابن عنبس হুজ্‌র আবুল আব্বাস (র) থেকে এবং তিনি ইব্‌ন আব্বাসও বটে। উপরোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হুজ্‌র (র)-এর দুই নাম। আবুল আব্বাস এবং ইব্‌ন আব্বাস। সুতরাং শু'বা (র)-এর বর্ণনার উপর ইমাম তিরমিযী (র)-এর উপরোক্ত আপত্তি যথার্থ নয়।[২৪] দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হল এই যে, এরূপ বহু ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যে, কোন কোন রাবী একটি হাদীস بلا واسطة (প্রত্যক্ষ) এবং بالواسطة (পরোক্ষ) উভয়ভাবেই শ্রবণ করেন, অতিশয় উভয় পদ্ধতিতেই তা বর্ণনা করেন। এখানেও তা-ই হয়েছে। অর্থাৎ হুজ্‌র ইব্‌ন আব্বাস এই রিওয়ায়াত উভয়ের নিকট থেকে শ্রবণ করেছেন। একবার সরাসরি ওয়াইল ইব্‌ন হুজ্‌র (র) থেকে শ্রবণ করেছেন, যেরূপ সুফিয়ান (র) বর্ণনা করেছেন। আবার তিনি আলাকাম ইব্‌ন ওয়াইল (র)-এর সূত্রেও তা শ্রবণ করেছেন। যেরূপ বর্ণনা করেছেন শু'বা (রা)। আবূ দাউদ তায়ালিসীতে (পৃ. ১৩৮) এ কথার সমর্থন বিদ্যমান উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে,

২৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আবূ মুহাম্মদ মাহমুদ ইব্‌ন আহমদ আয়নী (র), উমদাতুল কারী, প্রকাশনায় যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, সাহারানপুর ভারত, বাবু জাহরিল ইমাম বিত্‌তামীন, খ. ৪র্থ পৃ.৫০২, মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০-৪০১।

www.pathagar.com

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِیْ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ حُجْرًا اَبَا الْعَنْبَسِ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلٍ وَقَدْ سَمِعْتُ بْنَ وَائِلٍ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ

উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে হুজ্র আবুল আম্বাস (র) এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি এই রিওয়ায়াতটি দু'ভাবেই শুনেছেন। তাছাড়া আল্লামা যহীর হাসান নীমভী (র) বলেছেন যে, মুসনাদে আহমদ সুনানে কুবরা (للبيهقى) এবং সুনানে আবু মুসলিম এও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। এমনিভাবে দারা কুতনী গ্রন্থেও এর সমর্থন বিদ্যমান । ইয়াযীদ ইবন যুরায় (زريع) (র) বলেন,

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ اَبِیْ الْعَنْبَسِ عَنْ عَلْقَمَةَ ثَنَا وَائِلٌ اَوْ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ٠

এতেও প্রতীয়মান হয় যে, হুজ্র (র) এই রিওয়ায়াতটি সরাসরি ওয়াইল ইব্ন হুজ্র (র) থেকেও শ্রবণ করেছেন। আবার তিনি এটি আলকামা ইব্ন ওয়াইল (র) থেকেও শ্রবণ করেছেন। উক্ত বক্তব্যের আলোকে ইমাম তিরমিযী (র) এর দ্বিতীয় আপত্তিও অসার বলে প্রমাণিত হয়।[২৫]

উপরের প্রশ্ন দু'টির নিরসন হয়ে যাওয়ার পর তৃতীয় প্রশ্নটি এমনিতেই শেষ হয়ে যায়। কেননা, শু'বা (র)-কে মুহাদ্দিসীনে কিরাম আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস ঘোষণা দিয়ে হাদীসের ক্ষেত্রে তার ইমামত নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ততা মেনে নিয়েছেন। এহেন অবস্থায় তাঁর প্রতি এরূপ ধারণা পোষণ করা আদৌ সমীচীন নয় যে, তিনি مَدَّبِهَا صَوْتَهٗ-এর স্থলে خفض بها صوته নিজ ইচ্ছামত বর্ণনা করেছেন।

উপরোক্ত বক্তেব্যের বিপক্ষে শাফিঈ মতাবলম্বী মুহাদ্দিসীনে কিয়ামের কেউ কেউ এ কথা বলেছেন যে, হাদীস রিওয়ায়াত করার ক্ষেত্রে শু'বা (র) এর কখনো কখনো وهم অর্থাৎ সংশয় হয়ে যেত। কিন্তু সুফিয়ান সাওরী (র) এর কখনো এমনটি হত না। কাজেই সুফিয়ান সাওরী (র) এর মুকাবিলয় শু'বা (র) এর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

এই প্রশ্নের জবাবে মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেছেন যে, উপরোক্ত আপত্তি সনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ কখনো কখনো রাবীদের নাম উল্লেখ করার ক্ষেত্রে শু'বা (র)-এর وهم তথা সন্দেহ এসে যেত। কিন্তু متن حديث অর্থাৎ হাদীসের মূল পাঠ মুখস্থ করার ক্ষেত্রে তাঁর কখনো এমনটি হত না। বরং এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব। সনদের ক্ষেত্রে তাঁর সন্দেহ (وهم) হওয়ার কারণ হল, তাঁর বেশির ভাগ মনোযোগ থাকত হাদীসের متن অর্থাৎ মূল পাঠের দিকে। এ কারণে সনদ বর্ণনায় তাঁর কখনো সন্দেহ এসে যেত। এ কথাটি تحفة الاحوذى কিতাবের গ্রন্থকার আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপুরী (র) ও অকপটে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন,

২৫. উমদাতুল কারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০২; মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১।

www.pathagar.com

قَالَ الْحَافِظُ فِىْ تَهْذِيْبِ التَّهْذِيْبِ فِىْ تَرْجَمَةِ شُعْبَةَ : ثِقَةٌ ثَبَتٌ فِىْ الْحَدِيْثِ وَكَانَ يُخْطِئُ فِىْ اَسْمَاءِ الرِّجَالِ قَلِيْلاً ... ثُمَّ قَالَ بَعْدَ عِدَّةِ اَسْطُرٍ وَاَمَّا مَا تَقَدَّمَ مِنْ اَنَّهُ يُخْطِئُ فِى الْاَسْمَاءِ فَقَدْ قَالَ الدَّارُ قُطْنِىْ فِى الْعِلَلِ كَانَ شُعْبَةُ يَخْطِئُ فِى اَسْمَاءِ الرِّجَالِ كَثِيْرًا لِتَشَاغُلِهٖ بِحِفْظِ الْمُتُوْنِ - كذا فى تحفة الاحوذى (٢-١٧)

হাফিয (র) 'তাহযীবুত তাহযীব' গ্রন্থে শু'বা (র)-এর পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, হাদীস শাস্ত্রে তিনি একজন নির্ভরযোগ্য এ বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তবে রাবীদের নাম বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তাঁর কখনো ভ্রম হয়ে যেত। ----অতঃপর কয়েক লাইন পরে তিনি বলেন যে, নামের ক্ষেত্রে তার ভ্রম হওয়ার কারণ নিরূপণ করতে গিয়ে ইমাম দারা কুতনী (র) علل গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, রাবীদের নাম বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর অনেক সময় ভ্রম হয়ে যেত। কেননা তাঁর বেশির ভাগ মনোযোগ থাকত হাদীসের متن অর্থাৎ মূল পাঠ মুখস্থ করার প্রতি।[২৬]

এমতাবস্থায় হাদীসের متن অর্থাৎ মূল পাঠের ব্যাপারে শু'বা (র)-এর প্রতি এত বড় ভুলের نسبت (সম্পর্ক যুক্ত) করা মারাত্মক ধরনের বাড়াবাড়ি এবং বে-ইনসাফী। (আসারুস সুনান, পৃ. ৯৮)[২৭] অতএব শু'বা (র) এর বর্ণনার উপর এই তৃতীয় আপত্তিও যথার্থ নয়।

"আলকামা (র)-এর سماع তাঁর পিতা ওয়াইল ইবন হুজ্‌র (র) থেকে সাবিত নেই" বলে ইমাম তিরমিযী (র) শু'বা (র)-এর বর্ণনার উপর যে আপত্তি উত্থাপন করেছেন তা একান্তই দুর্বল এবং অবাস্তব। কেননা আলকামা (র)-এর শ্রবণ তাঁর পিতা থেকে অবশ্যই সাব্যস্ত ও প্রমাণিত আছে। এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ওয়াইল ইবন হুজ্‌র (র)-এর দুই ছেলে ছিল। (১) আবদুল জাব্বার ইন ওয়াইল। (২) আলকামা ইব্‌ন ওয়াইল। আলকামা বড় এবং আবদুল জাব্বার হলেন ছোট। মূলত হযরত ওয়াইল (র)-এর যে ছেলে সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুর ছয় মাস পর জন্ম গ্রহণ করেছেন, তিনি আলকামা নন্ বরং তিনি হলেন, আবদুল জাব্বার ইবন ওয়াইল। ইমাম তিরমিযী (র) হুদূদ অধ্যায়ে باب ما جاء فى المرأة اذا استكرهت على الزناء শিরোনামে অধীনে এক হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন,

سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِيْهِ وَلاَ اَدْرَكَهُ يُقَالُ اَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ اَبِيْهِ بِاَشْهُرٍ . (١-٢٦٩)

আমি মুহাম্মদ (ইবনে ইসমাঈল)-কে বলতে শুনেছি যে, আবদুল জাব্বার ইব্‌ন ওয়াইল ইব্‌ন হুজ্‌র তাঁর পিতা থেকে (হাদীস) শুনেনি এবং তার সাথে তার সাক্ষাতও হয়নি। বলা হয়, তিনি তাঁর পিতার ইনতিকালের কয়েক মাস পর জন্ম গ্রহণ করেছেন।[২৮]

---

২৬. আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপুরী (রা), তুহফাতুল আহওয়াযী, প্রকাশনায় দারুল ফিক্‌র, বাবু মা-জাআ ফিত তামীন, খ. ২য়, পৃ. ৭১।

২৭. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৪-৫১৭।

২৮. জামে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১ম, পৃ. ২৬৯।

www.pathagar.com

এতে বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী (র) এর উক্তি আবদুল জাব্বার ইব্ন ওয়াইল সম্পর্কে, আলকামা ইব্ন ওয়াইল সম্পর্কে নয়। বরং নির্ভরযোগ্য অভিমত অনুযায়ী স্বয়ং আবদুল জব্বার সম্পর্কেও এ কথা বলা ঠিক নয় যে, তিনি তাঁর পিতার ইনতিকালের পর জন্মগ্রহণ করেছেন। আল্লামা নীমভী (র) (اثار السنن ٩٩-١٠٠) প্রমাণ করেছেন যে, আবদুল জাব্বার (র)-এর জন্ম হয়েছে তাঁর পিতা ওয়াইল ইব্ন হুজ্র (র)-এর জীবদ্দশায়। আর আলকামা (র) তো হলেন, তাঁর চেয়ে বড়। কাজেই ওয়াইল (র) এর ওফাতের পর তার জন্ম হওয়া এবং তার থেকে سماع (শ্রবণ) না থাকার কোন প্রশ্নই হতে পারে না। এ কারণেই স্বয়ং ইমাম তিরমিযী (র) তৎপ্রণীত সুনান তিরমিযী গ্রন্থে باب ما جاء فى المرأة اذا استكرهت على الزناء শিরোনামের অধীনে আলকামা (র)-এর শ্রবণের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে বলেন,

وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ سَمِعَ مِنْ اَبِيْهِ وَهُوَ اَكْبَرُ مِنْ عَبْدِ الْجَبَّارُ بْنُ وَائِلٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِيْهِ (١-٢٦٨)

আলকামা ইব্ন ওয়াইল ইব্ন হুজ্র (র) তার পিতা থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি আবদুল জাব্বার ইব্ন ওয়াইল (র) থেকে বয়সে বড়। আবদুল জাব্বার ইবন ওয়াইল (র) তাঁর পিতা থেকে হাদীস শ্রবণ করেন নি।[২৯] তাছাড়া বিভিন্ন রিওয়ায়াতে স্পষ্টভাবে এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে, তার পিতা থেকে তার শ্রবণের বিষয়টি প্রমাণিত। নাসাঈ শরীফের এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে,

اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ نَا الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنِىْ عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ ..... .

সুওয়ায়িদ ইবন নাসর (র) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবদুল ইব্ন মুবারক (র) কায়স ইব্ন মুসলিম (র) থেকে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আম্বরী (র) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আলকামা ইব্ন ওয়াইল আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন।[৩০]

এতে পিতা কর্তৃক তার নিকট تحديث অর্থাৎ হাদীস বর্ণনা করার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, سمعت ও حدثنى শব্দগুলো হচ্ছে الفاظ سماع অর্থাৎ শ্রবণ বোধকশব্দ। ইমাম বুখারী (র) ও এই হাদীসটি তৎপ্রণীত جزء رفع اليدين কিতাবে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمِ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ اَنْبَأَنَا قَيْسُ بْنُ سُلَيْمُ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ ....

আবূ নু'আয়ম আল-ফযল ইবন দুকায়ন (র) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কায়স ইবন সুলায়ম আম্বরী (র) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি

২৯. জামে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১ম, পৃ. ২৬৯।

৩০. সুনানে নাসাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

www.pathagar.com

আল-কামা ইব্ন ওয়াইল ইব্ন হুজ্র (র) থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন।[৩১]

এরূপ আরো বহু রিওয়ায়াত রয়েছে যদ্দ্বারা আলকামার স্বীয় পিতা থেকে তার শ্রবণের বিষয়টি দ্বিধাহীনভাবে প্রমাণিত হয়।[৩২]

মোদ্দাকথা হচ্ছে আলকামা (র)-এর سماع তাঁর পিতা ওয়াইল ইব্ন হুজ্র (র) থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। এতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোন অবকাশ নেই।

যারা সশব্দে 'আমীন' বলেন তাদের পক্ষ থেকে সুফিয়ান সাওরী (র) এর রিওয়ায়াতকে প্রাধান্য দেওয়ার লক্ষ্যে শু'বা (র)-এর রিওয়ায়েতের উপর আরো তিনটি আপত্তি উত্থাপন করা হয়।

১. সুফিয়ান (র)-এর রিওয়ায়াতের متابع আছে, কিন্তু শু'বা (র)-এর রিওয়ায়াতের কোন متابع নেই। কাজেই সুফিয়ান (র)-এর রিওয়ায়াতই প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

২. ইমাম বায়হাকী (র) শু'বা (র)-এর সুত্রে এমন একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন যাতে خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ-এর পরিবর্তে رَافِعًا بِهَا صَوْتَهُ শব্দ উদ্ধৃত রয়েছে। কাজেই 'আমীন' নিঃশব্দে নয়; বরং সশব্দে বলাই উত্তম।

৩. স্বয়ং শু'বা (র) সুফিয়ান (র) সম্পর্কে বলেছেন যে, سُفْيَانُ اَحْفَظُ مِنِّيْ (হাদীসের ক্ষেত্রে সুফিয়ান আমার চেয়েও বড় হাফিয।) কাজেই সুফিয়ান (র) এর রিওয়ায়াতই প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। অতএব আমীন নিঃশব্দে নয়, বরং সশব্দে বলাই উত্তম।

প্রথম আপত্তির জবাবে বলা হয় যে, ইমাম তিরমিযী (র) علاء بن صالح الاسدى (আলা ইব্ন সালিহ আল আসাদী (র)-কে সুফিয়ান (র)-এর متابع হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর متابعت-এর কারণে সুফিয়ান (র) এর রিওয়ায়াতকে راجح এবং শু'বা (র)-এর রিওয়ায়াতকে مرجوح সাব্যস্ত করা যায় না। কেননা আলা ইব্ন সালিহ সর্বসম্মতিক্রমে একজন দুর্বল (ضعيف) রাবী। কাজেই তার متابعت ধর্তব্য নয়। আল্লামা নীমভী (র) اثار السنن গ্রন্থে (পৃ. ৭৮) বর্ণনা করেছেন যে,

العلاء بن الصالح ليس من الثقات الاثبات قال فى التقريب صدوق له اوهام وقال الذهبى فى الميزان قال أبو حاتم كان من عتق الشيعة وقال ابن المدينى روى احاديث مناكير . كذا فى درس ترمذى (١-٥١٨)

আলা ইব্ন সালিহ নির্ভরযোগ্য রাবীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাকরীব গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এই লোকটি বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী বটে,কিন্তু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তার বহু وهم অর্থাৎ সংশয় হয়ে গেছে। আল্লামা যাহাবী (র) 'মীযান' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, আবূ হাতিম (র) বলেন, সে

৩১. আসারুস সুনান, পৃ. ৯৯।

৩২. মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২; দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭-৪১৮।

www.pathagar.com

ছিল শী'আদের একজন শীর্ষে স্থানীয় ব্যক্তি। ইবনুল মাদীনী (র) বলেন, সে অনেক মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৩]

এমনিভাবে সুফিয়ান (র) এর রিওয়ায়াতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে শু'বা (র) রিওয়ায়াতের বিপরীতে এ মর্মেও আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, আলা ইব্‌ন সালিহ ছাড়াও আরো দুইজন রাবী সুফিয়ান (র) এর متابعت করেছেন।

তারা হলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন কুহায়ল (محمد بن سلمة بن كهيل) এবং আলী ইব্‌ন সালিহ (كذا فى الدار قطنى ج ١ ، ص ٣٣٣-٣٣٤ والبيهقى ج ٢ ، ص ١٥٢)[৩৪]

উপরোক্ত বক্তব্যের জবাবে মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন কুহায়ল বর্ণনা করেন যে, আল্লামা জুযজানী (র) তার সম্পর্কে বলেছেন যে, ذاهب واهى الحديث (সে একজন সন্দেহবাদী দুর্বল রাবী) (كذا فى اثار السنن ، ص : ٩٨) কাজেই তার متابعت ধর্তব্য নয়। আর আলী ইব্‌ন সালিহ নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য রাবী। কিন্তু নির্ভরযোগ্য কথা হল এই যে, তাঁর রিওয়ায়াত শুধুমাত্র আবূ দাউদ শরীফে বিদ্যমান আছে। এই বর্ণনা সম্পর্কে হাফিয ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র) "التلخيص الحبير فى تخريج الرافعى الكبير" "নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, মূলত আবূ দাউদের রিওয়ায়াতে আলী ইব্‌ন সালিহের নাম উল্লেখের ব্যাপারে কোন كاتب (লিপিকর) অথবা রাবী থেকে ভুল হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে তার নাম আলী ইবন সালিহ নয় বরং তার নাম হচ্ছে আলা ইবন সালিহ। এর প্রমাণ আল্লামা নীমভী (র) اثار السنن গ্রন্থে (পৃ. ৯৮-৯৯) বর্ণনা করেছেন যে, এই রিওয়ায়াতটি তিনটি সূত্রে বর্ণিত আছে। সুনানে তিরমিযীতে এর সনদ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبَانٍ عَنْ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ .

মুসন্নাফে ইবন আবূ শায়বাতে এর সনদ হল ঃ

عَنْ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ صَالِحٍ .

আর আবূ দাউদ শরীফে এর সনদফ হল ঃ

عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خَالِدِ الشَّعِيْرِىْ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ نَا عَلِىُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ .

এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, উপরোক্ত সনদত্রয়ের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)। তার দুই শিষ্য অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবন আবান এবং আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা তার (ইব্‌ন নুমায়রের) উসতাদের নাম আলা ইব্‌ন সালিহ বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে মাখলাদ ইব্‌ন খালিদ

৩৩. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮।

৩৪. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯।

www.pathagar.com

তার নাম আলী ইবন সালিহ্ বর্ণনা করেছেন। বস্তুত এটি সিদ্ধান্তকৃত কথা যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবান এবং আবূ বকর ইব্‌ন খালিদের তুলনায় احفظ। অর্থাৎ বড় মাপের হাফিযুল হাদীস। কাজেই আলা ইব্‌ন খালিদের ব্যাপারে তাদের রিওয়ায়াতই প্রাধান্য পাওয়ার উপযুক্ত বলে গণ্য হবে। এর অপর একটি প্রমাণ এটাও যে, ইমাম বায়হাকী (র) তৎপ্রণীত সুনানে বায়হাকীতে সুফিয়ান (রা) এর متابع উল্লেখ করার ক্ষেত্রে প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন। এতদসত্ত্বেও তিনি আলা ইব্‌ন সালিহ্ এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ব্যতীত আর কাউকে متابع হিসাবে পেশ করতে পারেন নি। যদি আলা ইবন সালিহ ও সুফিয়ান (র)-এর متابعت করতেন তাহলে তিনি তা অবশ্যই পেশ করতেন। এতে স্পষ্টভাবে এ কথাই প্রতিভাত হয় যে, এই রিওয়ায়াতের রাবী আলা ইব্‌ন সালিহ (র) আলী ইব্‌ন সালিহ্ নন। আর পূর্বেও এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলা ইব্‌ন সালিহ্ একজন দুর্বল রাবী অতএব শু'বা (র) -এর বিপরীতে তাঁর متابعت ধর্তব্য নয়।

স্বয়ং শু'বা (র)-এর সূত্রে ইমাম বায়হাকী (র)-এর خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ পরিবর্তে رَافِعًا بِهَا صَوْتَهُ বর্ণনা করার যে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে এর জবাব আল্লামা নীমভী (র) اثار السنن গ্রন্থে এভাবে দিয়েছেন যে, ইমাম বায়হাকী (র)-এর এই রিওয়ায়াত সাধারণ রিওয়ায়াতের ব্যতিক্রম। কেননা এই রিওয়ায়াতটি শু'বা (র) থেকে বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে শুধু বায়হাকীর রিওয়ায়াতে رَافِعًا بِهَا صَوْتَهُ উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু অপরাপর ইমাম এবং হাফিযুল হাদীসগণ তাঁর থেকে خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ বর্ণনা করেছেন। কাজেই বায়হাকীর এই রিওয়ায়াতটি সাধারণ রিওয়ায়াত হতে ব্যতিক্রম হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য।

যাঁরা সশব্দে 'আমীন' বলার পক্ষে তাঁরা সুফিয়ান (র) এর বর্ণনার সমর্থনে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি পেশ করেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ تَرَكَ النَّاسُ التَّامِيْنَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ امِيْنَ حَتَّى يَسْمَعُهَا اَهْلُ الصَّفِّ الْاَوَّلِ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ . رواه ابن ماجه (٦١)

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা 'আমীন' বলা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ বলতেন তখন তিনি আমীনও বলতেন। এমন কি, তা প্রথম কাতারের লোকজনও শুনতেন। ফলে মসজিদে গুঞ্জরন সৃষ্টি হয়ে যেত।[৩৫]

উপরোক্ত হাদীসের জবাবে মুহাদ্দিসীনে কিরাম বললেন যে, এই হাদীসের কেন্দ্রবিন্দু হল, বিশ্‌র ইবন রাফি'। এই লোকটি মুহাদ্দিসীনে কিয়ামের সর্বসম্মত অভিমত অনুসারে দুর্বল। আল্লামা নীমভী(র) اثار السنن গ্রন্থে (পৃ. ৯৫), বর্ণনা করেছেন যে, হাফিয ইব্‌ন আবদুল বার (র) তৎপ্রণীত الانصاف কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে,

৩৫. সুনানে ইবন মাজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

www.pathagar.com

اتَّفَقُوْا عَلٰى اِنْكَارِ حَدِيْثِهِ وَطَرْحِ مَا رَوَاهُ وَتَرْكِ الْاِحْتِجَاجِ بِهِ لاَ يَخْتَلِفُ عُلَمَاءُ الْحَدِيْثِ فِىْ ذٰلِكَ .

বিশ্‌র ইবন রাফির হাদীস প্রত্যাখ্যান করা, বর্জন করা এবং তদ্দ্বারা প্রমাণ পেশ না করার ব্যাপারে সকলেই একমত। হাদীস বিশারদ উলামায়ে কিয়ামের এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই।[৩৬]

স্বয়ং শু'বা (র) এর বক্তব্য سُفْيَانُ اَحْفَظُ مِنِّىْ-এর দ্বারা শু'বা (র) এর রিওয়ায়াতের বিপরীতে সুফিয়ান (র) এর রিওয়ায়াতের পক্ষে যে, যুক্তি পেশ করেছেন, এর জবাবে মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন যে, নিঃসন্দেহে শু'বা (র) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে তার এ বক্তব্য নেক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। মূলত এটি হল ভক্তির কথা। আর যে সব উলামায়ে কিরাম এ কথা বলেছেন যে, اَنَّ الثَّوْرِىْ اَحْفَظُ مِنْ شُعْبَةَ (সুফিয়ান সাওরী (র) শু'বা থেকেও বড় মাপের হাফিযুল হাদীস।) তাদের এ কথা মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট ভিন্নতর মতামত রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র) كتاب العلل-এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে,

قَالَ عَلِىٌّ قُلْتُ لِيَحْىٰ اَيُّهُمَا كَانَ اَحْفَظَ لِلْاَحَادِيْثِ الطِّوَالِ سُفْيَانَ اَوْ شُعْبَةُ قَالَ كَانَ شُعْبَةُ اَسَرُّ فِيْهَا قَالَ يَحْىٰ بْنُ سَعِيْدٍ وَّكَانَ شُعْبَةُ اَعْلَمُ بِالرِّجَالِ فُلاَنٌ عَنْ فُلاَنٍ وَكَانَ سُفْيَانُ صَاحِبِ الْاَبْوَابِ . كذالك علل الترمذى (٣-٢٣٦)

আলী (র) বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া (র)-কে বললাম, বড় বড় হাদীস মুখস্থ করার ক্ষেত্রে সুফিয়ান (র) অগ্রগামী নাকি শু'বা (র)। জবাবে তিনি বললেন, এ ক্ষেত্রে শু'বা (র) অধিক শক্তিশালী। ইয়াহ্ইয়া ইবন মুঈন (র) বলেন, রিজাল শাস্ত্রের ব্যাপারে শু'বা (র) সর্বাধিক পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। আর সুফিয়ান (র) ছিলেন হাদীসের অধ্যায় বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে বড় পণ্ডিত ব্যক্তি।[৩৭]

শায়খ আবূ তালিব (র) ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (র) এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে,

شُعْبَةُ اَثْبَتَ فِى الْحُكْمِ مِنَ الْاَعْمَشِ وَاَعْلَمُ بِحَدِيْثِ الْحُكْمِ . وَلَوْ لاَ شُعْبَةُ ذَهَبَ حَدِيْثُ الْحُكْمِ وَشُعْبَةُ اَحْسَنُ حَدِيْثًا مِّنَ الثَّوْرِىْ لَمْ يَكُنْ فِىْ زَمَنِ شُعْبَةَ مِثْلُهُ فِى الْحَدِيْثِ وَلاَ اَحْسَنُ حَدِيْثًا مِّنْهُ قُسِّمَ لَهُ مِنْ هٰذَا حَظُّهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ النَّسَائِىْ سَأَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ مَنْ اَثْبَتُ

৩৬. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০।

৩৭. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭।

www.pathagar.com

شُعْبَةُ اَوْ سُفْيَانُ ؟ فَقَالَ كَانَ سُفْيَانُ رَجُلاً حَافِظًا وَّكَانَ رَجُلاً صَالِحًا وَّكَانَ شُعْبَةُ اَثْبَتَ مِنْهُ وَاَنْقَى رَجُلاً وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ عَنْ اَبِيْهِ كَانَ شُعْبَةُ اُمَّةً وَّحْدَةَ فِيْ هٰذَا الشَّانِ يَعْنِيْ فِى الرِّجَالِ وَبَصَرِهٖ بِالْحَدِيْثِ وَتَثَبُّتِهٖ وَتَيَقُّنِهٖ لِلرِّجَالِ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مَا اُبَالِىْ مَنْ خَالَفَنِىْ اِذَا وَافَقَنِىْ شُعْبَةُ فَاِذَا خَالَفَنِىْ شُعْبَةُ فِىْ شَىْءٍ تَرَكْتُهُ ، كَذَا فِىْ اِعْلَاءِ السُّنَنِ (٢-٢١٨)

শু'বা (র) আহকাম সম্পর্কিত হাদীসের ক্ষেত্রে আমাশা (র) থেকেও অধিক শক্তিশালী এবং অভিজ্ঞ। শু'বা (র) না হলে হুক্ম সংক্রান্ত হাদীসগুলো লাপাত্তা হয়ে যেত। বস্তুত হাদীসের ক্ষেত্রে শু'বা (র) সুফিয়ান (র)-এর তুলনায় অধিক শক্তিশালী ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। শু'বা (র) এর যমানায় হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর সমপর্যায়ে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ছিলেন না এবং তাঁর থেকে অধিক জ্ঞাতও আর কেউ ছিলেন না। তাঁকে হাদীসের বিরাট ভাণ্ডার প্রদান করা হয়েছে। মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাস নাসাঈ (র) বলেন, আমি আবূ আবদুল্লাহ (র)-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, শু'বা ও সুফিয়ান (রা)-এর মধ্যে অধিক ধীমান এবং অধিক যোগ্যতম ব্যক্তি কে? জবাবে তিনি বলেছেন সুফিয়ান (র) একজন হাফিযুল হাদীস ও নেককার ব্যক্তি। তবে শু'বা (র) তার থেকেও অধিক পণ্ডিত এবং পুণ্যবান আল্লাহভীরু ব্যক্তি। আবদুল্লাহ ইব্ন আহমাদ (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হাদীসের ক্ষেত্রে অর্থাৎ রিজাল শাস্ত্র এবং হাদীসের ব্যাপারে পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার ব্যাপারে শু'বা (র) একাই এক উম্মতের সমতুল্য। হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র) বলেন, শু'বা (র) যদি আমার সাথে একমত থাকেন তবে অন্য কেউ আমার বিরোধিতা করলে তাতে আমার কোন পরোয়া নেই। কিন্তু কোন হাদীসের ব্যাপারে শু'বা (র) যদি আমার বিরোধিতা করেন তবে ঐ হাদীস আমি প্রত্যাখ্যান করে থাকি।[৩৮]

وَقِيْلَ لِاَبِىْ دَاؤُدَ هُوَا اَحْسَنُ حَدِيْثًا مِّنْ سُفْيَانَ ؟ قَالَ لَيْسَ فِى الدُّنْيَا اَحْسَنُ حَدِيْثًا مِّنْ شُعْبَةَ وَمَالِكٍ .

একবার আবূ দাউদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, হাদীসের ক্ষেত্রে শু'বা (র) কি সুফিয়ান (রা) থেকেও অধিক জ্ঞানী ও অধিক বুৎপত্তির অধিকারী? জবাবে তিনি বলেছেন, দুনিয়াতে শু'বা ও মালিক (র) থেকে হাদীসের ব্যাপারে অধিক জ্ঞানী আর কেউ নেই।[৩৯]

শু'বা (র)-এর রিওয়ায়েতকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণসমূহ

মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতে সুফিয়ান (র)-এর রিওয়ায়াতের উপর শু'বা (র)-এর রিওয়ায়াতকে প্রাধান্য দেওয়ার বহুবিদ কারণ রয়েছে ঃ

---

৩৮. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭-২১৮।

৩৯. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮।

www.pathagar.com

১. সুফিয়ান সাওরী (র)-এর সুমহান ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনো কখনো تدليس করতেন। কিন্তু শু'বা (র) تدليس থেকে বহু দূরে থাকতেন এবং তিনি تدليس-কে اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا অর্থাৎ যিনা অপেক্ষা মারাত্মক ক্ষতিকর মনে করতেন। তার প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে لاَنْ اَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اُدَلِّسَ। তাদলীস করা অপেক্ষা আসমান থেকে পড়ে যাওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়। এর দ্বারা এ ব্যাপারে তার চরম সতর্কতা প্রতীয়মান হয়।

২. সুফিয়ান সাওরী (র) যদিও সশব্দে 'আমীন' বলার রাবী। কিন্তু তাঁর মাযহাব হচ্ছে শু'বা (র) এর রিওয়ায়াতের অনুরূপ নিঃশব্দে 'আমীন' বল।

৩. শু'বা (র) এর রিওয়ায়াত اَوْفَقُ بِالْقُرْاٰنِ অর্থাৎ কুরআন মজীদের সাথে অধিক সামঞ্জস্য পূর্ণ। কেননা কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً

"তোমরা বিনীতভাবে ও সংগোপনে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দু'আ কর।" (আ'রাফ -৭-৫৫)। আর আমীনও দু'আ। এর প্রমাণ হল কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا তিনি বললেন, তোমাদের দু'জনের দু'আ কবুল হল। (ইউনুস ১০-৮৯), এখানে দু'জনের দু'আর কথা বলা হয়েছে। অথচ হযরত হারূন (আ) কোন দু'আ করেন নি। তিনি শুধুমাত্র আমীন বলেছিলেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আমীনও দু'আর অন্তর্ভুক্ত।[৪০]

আতা (র) বলেন, اٰمِيْنَ دُعَاءٌ আমীন বলাও দু'আ। আযীযী গ্রন্থে মারফূভাবে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, دَعْوَةٌ فِى السِّرِّ تَعْدِلُ سَبْعِيْنَ دَعْوَةً فِي الْعَلاَنِيَةِ (গোপনে একবার দু'আ করা প্রকাশ্যে সত্তর বার দু'আ করার সমান) 'আল-বাহ্রুর রায়িক' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ইবন হিব্বান (র) তৎপ্রণীত সহীহ গ্রন্থে মারফূ'ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, خَيْرُ الدُّعَاءِ الْخَفِىُّ (গোপনে দু'আ করাই শ্রেষ্ঠ দু'আ।) সর্বোপরি আমীন নিঃশব্দে বলাই অধিক যুক্তি। কেননা আমীন বলা تعوذ অর্থাৎ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ বলা অপেক্ষা উত্তম নয়। আর তা কেমন করেই বা হতে পার। কেননা আমীন বলার হুকুম কুরআন মজীদে নেই। কিন্তু تعوذ পড়ার হুকুম কুরআন মজীদে আছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"যখন কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইবে।" (নাহল ঃ ১৬-৯৮)

এতদসত্ত্বেও হাদীসে এ কথা কোথাও উল্লেখ নেই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো تعوذ জোরে পড়েছেন। কাজেই আমীন জোরে না বলে আস্তে অর্থাৎ নিঃশব্দে বলাই উত্তম। অধিকন্তু যদি সশব্দে 'আমীন' বলা হয় তাহলে কেউ হয়তো ধারণা করতে পারে যে, আমীন কুরআন মজীদেরই অংশ বিশেষ। অতএব 'আমীন' সশব্দে না বলে নিঃশব্দে বলাই উত্তম।[৪১]

৪০ দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২১।

৪১. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।

www.pathagar.com

৪. সুফিয়ান (র)-এর রিওয়ায়াত অর্থাৎ সশব্দে আমীন বলার রিওয়ায়াতকে গ্রহণ করা হলে শু'বা (র) এর রিওয়ায়াতকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হয়। পক্ষান্তরে যদি শু'বা (র) এর রিওয়ায়াতকে গ্রহণ করা হয় তবে সুফিয়ান (র)-এর রিওয়ায়াতকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হয় না। কেননা একে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন সুফিয়ান (র) এর বর্ণিত শব্দ مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ-এর অর্থ হবে মাদ্দের হরফ الف এবং ياء-কে টেনে পড়া সশব্দে পড়া নয়। এই হিসাবে خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ-এর সাথে مَدَّبِهَا صَوْتَهُ-এর আর কোন বিরোধ থাকে না। বরং এরূপ ব্যাখ্যা করা হলে উভয়ের মাঝে সমন্বয় হয়ে যায়।

কিন্তু এই ব্যাখ্যার উপর শাফিঈ ফকীহগণের পক্ষ থেকে এই (প্রশ্ন) করা হয় যে, আবূ হুরায়রা (রা)-এর এক হাদীসে বর্ণিত আছে,

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ اُمِّ الْقُرْاٰنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ اٰمِيْنَ . رواه الدار قطني والحاكم وقال الدار قطني اسناده حسن والحاكم صحيح على شرطهما والبيهقى حسن صحيح كذا فى إعلاء السنن (٢-٢٢٠)

"রাসূলুল্লাহ (সা) সূরা ফাতিহা শেষ করে সশব্দে আমীন বলেছেন।"[৪২]

এমনিভাবে আলী (রা) যেতে বর্ণিত আছে ঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ، كذا فى إعلاء السنن (٢-٢٢١)

নবী করীম (সা) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ বলার পর আমীন বলতেন এবং তা জোরে বলতেন।[৪৩]

অনুরূপভাবে অপর এক হাদীসে আছে যে,

عَنِ ابْنِ اُمِّ حُصَيْنٍ عَنْ اُمِّهٖ اَنَّهَا صَلَّتْ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَالَ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ فَسَمِعَتْهُ وَهِيَ فِيْ صَفِّ النِّسَاءِ . كذا فى إعلاء السنن (٢-٢٢٢)

"ইব্ন উম্মে হুসায়ন (র) তাঁর মা উম্মে হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পেছনে নামায পড়লেন। নামায আদায়কালে তিনি وَلَا الضَّالِّيْنَ বলার পর আমীন বলেছেন। আমীনের এই শব্দ উম্মে হুসায়ন (রা) মহিলাদের কাতার থেকেই শুনতে পেয়েছেন।"[৪৪]

৪২ ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।

৪৩. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

৪৪. নাসবুর রায়া, প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ৩৭১।

www.pathagar.com

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, مَدَّبِهَا صَوْتَهُ-এর অর্থ الف এবং ياء টেনে পড়া নয়। বরং সশব্দে আমীন বলা। কাজেই আমীন সশব্দে বলাই উত্তম। এই প্রশ্নের জবাবে মুহাদ্দিসীনে কিরাম এবং হানাফী ফুকাহায়ে কিয়াম বলেন যে, প্রথমোক্ত হাদীসের ব্যাপার 'আল জাওহারুন নকী' গ্রন্থে (১-১৩২) বলা হয়েছে যে, এই হাদীসের একজন রাবী হলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন উসমান। তাঁর সম্পর্কে ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেছেন যে, তিনি একজন বিতর্কিত রাবী। আল-কাশিম গ্রন্থে আল্লামা যাহাবী (র) বলেছেন যে, তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ منكر বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত। তাঁর শায়খ হল ইসহাক আল যুবায়দী (র)। ইমাম আবূ দাঊদ (র) তার সম্পর্কে বলেছেন, لَيْسَ بِشَيْءٍ (সে কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিই নয়।) ইমাম নাসাঈ (র) বলেছেন, ليس بثقة (সে কোন সিকাহ ব্যক্তি নয়) মুহাম্মদ ইব্‌ন আওফ আত তাঈ (র) তাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবূ দাঊদ (র) থেকে বর্ণিত আছে, মুহাম্মদ ইবন আওন (র) বলেছেন, ইসহাক যিবরীক সচরাচর মিথ্যা রিওয়ায়াত করত।[৪৫]

দ্বিতীয় হাদীস অর্থাৎ হযরত আলী (রা)-এর রিওয়ায়াত সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন, এই রিওয়ায়াত হু-বহু ইব্‌ন মাজাহ শরীফে এইভাবে বর্ণিত আছে যে,

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ . اِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ . كذا فى إعلاء السنن (٢-٢٢١)

এই রিওয়ায়াতে يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ বাক্যটির কোন উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র আমীন শ্রবণ (سماع امين)-এর কথা উল্লেখ আছে। তবে শুধুমাত্র سماع (শ্রবণ) কথার দ্বারা সশব্দে আমীন বলার বিষয়টি প্রতীয়মান হয় না। কাছে থাকলে নিঃশব্দে আমীন বলা অবস্থায়ও শ্রবণ সম্ভব হতে পারে। সম্ভবত কোন রাবী سماع على অর্থাৎ আলী (রা)-এর শ্রবণের বিষয়টিকে روايت بالمعنى করতে গিয়ে رفع الصوت (সশব্দে বলা)-এর মাধ্যমে ব্যক্ত করে দিয়েছেন। এতদুভয়ের অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি।[৪৬]

ইব্‌ন উম্মে হুসায়ন (র) -এর হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসীন কিরাম বলেন যে, এই হাদীসের এক রাবী ইসমাঈল ইব্‌ন মুসলিম আল-মাক্কী। তিনি একজন দুর্বল রাবী। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন, هو منكر الحديث (তার বর্ণিত হাদীসটি মুনকার)। ইমাম নাসাঈ এবং অপরাপর ইমামগণের মতে এই ব্যক্তি হল متروك الحديث আলী ইবনুল মাদীনী (র) বলেন,

سَمِعْتُ يَحْيٰ سُئِلَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ مُسْلِمِ الْمَكِّىْ قَالَ كَانَ لَمْ يَزَلْ مُخْتَلِطًا وَعَنْ اِبْنِ مَعِيْنِ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُسْلِمِ الْمَكِّىْ لَيْسَ بِشَىْءٍ وَعَنْ عَلِىٍّ

৪৫. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।
৪৬. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

www.pathagar.com

بْنِ الْمَدِنِيْ قَالَ لاَ يُكْتَبُ حَدِيْثُهُ وَقَالَ السَّعْدِيْ وَاهٍ جِداً . كذا فى الميزان (١-١١٥)

আমি ইয়াহ্ইয়া (র)-কে বলতে শুনেছি যে, ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম আল-মক্কী সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বলেছেন যে, সে সর্বদাই مختلط الحديث হিসাবে গণ্য। ইব্ন মুঈন (র) বলেছেন, ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম আল-মক্কী গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তি নন। আলী ইব্ন মাদীনী (র) বলেছেন, তার হাদীস লেখবার মত নয়। সা'দী (র) বলেছেন, সে একজন দুর্বল রাবী।" (মিযানুল ইতিদাল, খ. ১ম, পৃ. ১১৫)।[৪৭]

৫. অধিকন্তু যদি এ কথ মেনেও নেওয়া হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে কখনো জোরে অর্থাৎ সশব্দে আমীন বলা প্রমাণিত আছে তাহলেও এর ভিত্তিতে এ কথা বলা যাবে না যে, আমীন সশব্দে বলাই উত্তম। কেননা এক্ষেত্রে এ কথা বলার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি সাহাবায়ে কিরামকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এভাবে সশব্দে আমীন বলেছেন। কেননা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) قرأت বিশিষ্ট নামাযেও কোন কোন সময় এক দুই. শব্দ জোরে সশব্দে পড়ে নিতেন। যাতে লোকজন জানতে পারে যে, তিনি কি পড়ছেন। বিশেষত হযরত ওয়াইল ইব্ন হুজ্র (র) ছিলেন ইয়ামনের অধিবাসী। তিনি শুধুমাত্র দুই একবার মদীনায় আগমন করেছেন। এ জন্য তাকে শুনানোর উদ্দেশ্যে প্রিয় নবী (সা) আমীন সশব্দে বলেছেন। নিম্নোক্ত হাদীসে এর সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ سَكَنٍ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ الثَّقَفِىْ قَالَ سَمِعْتُ وَائِلَ بْنَ حُجْرِ الْحَضْرَمِىَّ يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ حَتّٰى رَأَيْتُ خَدَّهُ مِنْ هٰذَا الْجَانِبِ وَمِنْ هٰذَا الْجَانِبِ وَقَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقَالَ اٰمِيْنَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ مَا اَرَاهُ اِلاَّ يُعَلِّمُنَا . أخرجه الحافظ أبو بشر الدولابى فى كتاب الاسماء والكنى .

"আবূ সাকান হুজ্র ইব্ন আম্বাস সাকাফী (র) বলেন, আমি ওয়াইল ইব্ন হুজ্র হাযরামী (রা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে,আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নামায থেকে ফারিগ হওয়ার পর দেখিছি। এমন কি আমি তাঁর গাল মুবারক ও এদিক-ওদিক থেকে দেখিছি এবং তিনি নামাযে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ পড়েছেন। তারপর সশব্দে আমীন বলেছেন। রাবী বলেন, আমার ধারণা, এটা তিনি কেবলমাত্র আমাদের শিখানোর জন্যই করেছেন। এই হাদীসটি হাফিয আবূ কিশ্র দুলাবী (র) كتاب الاسماء والكنى-তে বর্ণনা করেছেন।"[৪৮]

৬. অনুরূপভাবে এই বিয়টি ও গভীরভাবে লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাধারণ যদি সশব্দে আমীন বলা হত তাহলে এটা সমস্ত সাহাবীই শুনতে পেতেন এবং এই হাদীস

৪৭. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২।

৪৮. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭।

www.pathagar.com

মুতাওয়াতিরের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে যেত। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে সশব্দে 'আমীন' বলার বিবরণদাতা ওয়াইল ইব্‌ন হুজ্‌র ছাড়া আর কেউ নেই। আবার তাঁর রিওয়ায়াতটিতেও বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি স্বয়ং তার থেকেও শু'বা (র) নিঃশব্দে 'আমীন' বলার কথা বর্ণনা করেছেন। এতেও প্রতীয়মান হয় যে, নিঃশব্দে 'আমীন' বলাই উত্তম।[৪৯]

৭. শু'বা (র)-এর রিওয়ায়াতকে প্রাধান্য দেওয়ার অপর একটি যুক্তি হল এই যে, রিওয়ায়াতের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিলে সাহাবায়ে কিরামের আমল দিক নির্দেশক হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, হযরত শু'বা (রা) রিওয়ায়াতটি হযরত উমর, আলী এবং ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-সহ জালীলুল কাদ্‌র সাহাবায়ে কিরামের আমল দ্বারা সমর্থিত। কাজেই শু'বা (র)-এর হাদীসকে প্রাধান্য দিয়ে নিঃশব্দে 'আমীন' বলাই উত্তম।[৫০]

---

৪৯. দরাস তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৪।

৫০. ই'লাউস সুনান প্রাগুক্ত পৃ. ২১৯।

www.pathagar.com

নামাযে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্যত্র রাফে' ইয়াদাইন না করা উত্তম

রাফউন (رفع) শব্দের অর্থ উত্তোলন করা আর আল-ইয়াদাইন (اليدين) অর্থ হস্তদ্বয়। অতএব 'রাফউল ইয়াদাইন' অর্থ হল হস্তদ্বয় উত্তোলন করা। ফিকহের পরিভাষায় 'রাফউল ইয়াদাইন' বলতে বুঝায় নামাযের মধ্যে অকবীরে তাহরীমা কিংবা অন্য কোন সময় হস্তদ্বয় কান বরাবর উত্তোলন করা।

হাদীস গ্রন্থাবলীতে 'রাফউল ইয়াদাইন' (বা রাফে' ইয়াদাইন) মর্মে বহু হাদীস বিদ্যমান। ইমাম বুখারী (র) সহ বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিস শুধু এই একটি বিষয়ের উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করে গিয়েছেন।[১] সবগুলো হাদীস সামনে রাখা হলে দেখা যায় যে, মহানবী (সা) থেকে নামাযে মোট ৩টি স্থানে রাফে' ইয়াদাইন বর্ণিত হয়েছে। এক. তাকবীরে তাহরীমা অর্থাৎ নিয়্যত বাঁধার সময়, দুই. রুকু'তে যাওয়ার সময় ও রুকূ' থেকে উঠার পর, তিন. সিজ্‌দায় গমনের সময় ও সিজ্‌দা থেকে উঠার পর।

উপরোক্ত তিন স্থানের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি সম্পর্কে ফকীহগণের কারো কোন মতভিন্নতা নেই। তবে দ্বিতীয়টি সম্পর্কে মতভিন্নতা আছে। অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার সময় নবী (সা) 'রাফে' ইয়াদাইন' করতেন। ফকীহগণের সকলেও এ ক্ষেত্রে রাফে' ইয়াদাইনকে শরী'আত সম্মত বলে অভিমত গ্রহণ করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে শী'আদের একটি ক্ষুদ্র উপদল 'যায়দিয়্যা' ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন।[২] যায়দিয়্যাদের এই মতভিন্নতা জমহূরের উপর কোন প্রভাব ফেলে না। অনুরূপ তৃতীয় স্থান অর্থাৎ সিজ্‌দায় গমনের সময় ও সিজ্‌দা থেকে উঠার পর রাফে' ইয়াদাইন করার কথা কোন কোন হাদীসে উল্লেখ পাওয়া গেলেও এ ক্ষেত্রে 'রাফে ইয়াদাইন' নেই—এ মর্মে ফকীহগণের সকলে একমত। (এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে।) ফকীহগণের মতভিন্নতা কেবল দ্বিতীয় স্থানে। অর্থাৎ রুকূ'তে গমন ও রুকূ' থেকে উঠার পর 'রাফে' ইয়াদাইন' করা হবে কিনা—এ নিয়ে ফকীহগণের মতবিরোধ বিদ্যমান।[৩]

সে মতে দেখা যায় যে, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ, ইসহাক ইবন রাহওয়াই , আবূ সাওর, ইবন জারীর তাবারী, হাসান বাসরী, ইবন সীরীন, আতা ইবন আবু রাবাহ, তাঊস, মুজাহিদ, সালিহ, কাতাদা, মাকহূল, সাঈদ ইবন জুবায়র, ইবনুল মুবারক, সুফিয়ান ইবন

---

১. যেমন ইমাম বুখারী রচনা করেছেন 'আল জুযউ ফী রাফইল ইয়াদাইন; ইমাম মুহাম্মদ ইবন নাসর আল মারওয়াযী রচনা করেছেন 'কিতাবু রাফইল ইয়াদাইন'; আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রচনা করেছেন 'নাইলুল ফারকাদাইন ফী রাফইল ইয়াদাইন'।

২ আল্লামা তাকী উসমানী, দারসে তিরমিযী, করাচী : মাকতাবা দারুল উলূম, নভেঃ ১৯৮৭, খ. ২, পৃ. ২৬।

৩. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

উয়াইনা, প্রমুখ আলিমগণ রুকূতে যাওয়ার সময় ও রুকূ' থেকে উঠার পর রাফে' ইয়াদাইন করাকে সুন্নাত বলেছেন।এক বক্তব্য অনুসারে ইমাম মালিক থেকেও এ অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ, ইবন আবু লাইলা, আলকামা ইবন কায়স, আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ, আমির শাবী, আবূ ইসহাক সাবীঈ, মুগীরা, ওয়াকী, আসিম ইবন কুলাইব, যুফার প্রমুখ আলিমগণ বলেন, সিজ্‌দায় যেমন রাফে' ইয়াদাইন নেই তেমনি রুকুতেও রাফে' ইয়াদাইন নেই। রাফে' ইয়াদইন হবে মাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময়। প্রসিদ্ধ মত অনুসারে ইমাম মালিকও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সাহাবীগণের মধ্যে আশারা মুবাশ্‌শারার সকলে সহ হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, হযরত ইবন উমর, হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ, হযরত বারা ইবন আযিব, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) প্রমুখ এই অভিমতই ব্যক্ত করেছেন।[৪]

উপরোক্ত বিবরণ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, হাদীসে রাফে' ইয়াদাইনের বিষয়টি যত বিস্তারিতভাবে বিদ্যমান হানাফী শাফীঈ ও নির্বিশেষে কোন ইমামই তত বিস্তারিতভাবে তা গ্রহণ করেননি। বরং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ ও গবেষণা করে সংক্ষিপ্তভাবে গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে শাফিঈ আলিমগণ তাতে সংক্ষেপ করেছেন কম আর হানাফী আলিমাগণ সংক্ষেপ করেছেন তুলনামূলক একটু বেশী। অর্থাৎ সংক্ষেপ করার মর্মে সকলে অভিন্ন, তবে পরিমাণের দিক থেকে প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন।

আরো উল্লেখ্য যে, ফকীহগণের উপরোক্ত ইখতিলাফ শুধু ফযীলত। তথা উত্তম ও অনুত্তমের ইখতিলাফ। বৈধতা ও অবৈধতার ইখতিলাফ নয়। কাজেই সকলের মতেই রাফে' ইয়াদাইন করা বা না করা উভয়ই জায়িয। পার্থক্য কেবল এতখানি যে, শাফিঈ বা সে মতের অনুসারী আলিমগণ বলেন, রাফে' ইয়াদাইন করা উত্তম। আর অন্যরা বলেন, রাফে' ইয়াদাইন না করা উত্তম। নতুবা রাফে' ইয়াদাইন করা হলে কিংবা না করা হলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে কিংবা গুনাহ হবে–এমন মতামত কোন পক্ষের ইমামই দেননি।[৫]

কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সমাজে যখন মতদ্বয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল তখন অনেকে বিষয়টিকে কঠোর বাড়াবাড়ির পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। যেমন মুহাদ্দিসীনের মধ্যে ইমাম আওযাঈ, ইমাম হুমায়দী, ইবন খুযায়মা প্রমুখ রুকূর মধ্যে রাফে' ইয়াদাইন ওয়াজিব বলে দিয়েছেন। মুহাক্কিকীনের মতে মুহাদ্দিসগণের উপরোক্ত অভিমত তাঁদের 'তাফাররুদ' হিসাবে বিবেচিত হবে কিংবা এ অভিমত তাঁরা সাময়িক কোন ফিতনা দমনের লক্ষ্যে প্রদান করেছেন। কাজেই এই ভিত্তিতে কোন ফাতওয়া দেওয়া যাবে না। অনুরূপ দু'টি রায়ের উপর দালীলিক যুক্তিতর্ক যখন প্রকট আকার ধারণ করে তখন ফকীহগণের কারো কারোর মধ্যেও কঠোর মতামত গ্রহণের মানাসিকতা জেগে উঠে। তাই দেখা যায় যে, প্রথমোক্ত দলের কোন কোন ফকীহ 'রাফে' ইয়াদাইন' না করাকে নামায নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তদ্রূপ শেষোক্ত দলের কোন কোন ফকীহ রাফে' ইয়াদাইন করাকে মাকরূহ বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুত এটি হল যে

৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাসান, তানযীমুল আশতাত, চট্টগ্রাম ঃ আল হেলাল প্রকাশনী, তা. বি. খ. ১ পৃ. ২৯২।

৫. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত; আল্লামা মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নোরী, মা'আরিফুস সুনান, দেওবন্দ, আল মাকতাবাতুন নূরিয়্যা, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৪৫২।

www.pathagar.com

কোন গবেষণা ও তর্কযুদ্ধের অশুভ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নতুবা মূল মাস'আলা হল সেটিই যা পূর্ব বলা হয়েছে। অর্থাৎ রাফে' ইয়াদাইন করাও মাকরূহ নয়।[৬]

এ মর্মে হাদীসের বর্ণনা সম্পর্কে প্রথমেই জেনে রাখা উচিৎ যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) থেকে রুকূর সময়ে রাফে' ইয়াদাইন করার বিষয়টি যেভাবে বর্ণিত আছে তদ্রূপ সেটি বাদ দেওয়া ও না করার বিষয়টিও বর্ণিত আছে। কাজেই কোন পক্ষের অভিমতকে হাদীস বিরুদ্ধ অভিমত বলে আখ্যা দেওয়া উচিৎ নয়।

উপমহাদেশের খ্যাতিমান মুহাদ্দিস খাতিমাতুল মুহাক্কিকীন হযরত শাহ আনওয়ার কাশ্মীরী (র) 'নাইলুল ফারকাদাইন ফী রাফইল ইয়াদাইন' শিরোনামে রাফে' ইয়াদাইন প্রসঙ্গে গভীর গবেষণা সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

হযরত কাশ্মীরী (র) তাতে বলেন,

الترك والرفع كلاهما متواتر لامساغ لاحد ان ينكره نعم ان التواتر في الترك هو تواتر العمل، لا تواتر الاسناد ، كما في معارف السنن . ج : ١ ، ص : ٤٥٨

রাফে' ইয়াদাইন না করা বা করা উভয়ই মুতাওয়াতির সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত তাতে কারো অস্বীকারের সুযোগ নেই। হ্যাঁ, রাফে' ইয়াদাইন না করার বিষয়ে যে তাওয়াতুর পাওয়া যায় সেটি হল আমলের তাওয়াতুর বর্ণনার তাওয়াতুর নয়।[৭]

রাফে' ইয়াদাইন করা বিষয়ক হাদীসগুলো অর্থের দিক থেকে মুতাওয়াতির হানাফী ফকীহগণ তা অস্বীকার করেন না। তবে তাঁরা বলেন, যে, পাশাপাশি আরো খেয়াল রাখতে হবে যে, রাফে' ইয়াদাইন না করা বিষয়ক হাদীসগুলো আমলের দিক থেকে মুতাওয়াতির। কাজেই কোন পক্ষের ভিত্তিকে দুর্বল জ্ঞান করার সুযোগ নেই। অবস্থা দৃষ্টে বুঝা যায় শরী'আত উভয় অভিমত গ্রহণের জন্যই সুযোগ করে দিয়েছে।[৮]

আমলের দিক থেকে না করা মুতাওয়াতির হওয়ার দলীল হল যে, মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তম দু'টি মারকায মদীনা ও কূফার প্রায় সর্বত্র না করা। মদীনায় রাফে' ইয়াদাইন ছিল না মর্মে দলীল হল যেমন আল্লামা ইবন রুশদ 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' গ্রন্থে লিখেছেন-'ইমাম মালিক (র) রাফে' ইয়াদাইন না করার অভিমত গ্রহণ করেছেন মদীনাবাসীর তৎকালীন সাধারণ আমলের দিকে লক্ষ্য করেই। কাজেই বুঝা গেল যে, ইমাম মালিকের যুগ পর্যন্ত মদীনাবাসীর

---

৬ আল্লামা বিন্নৌরী বলেন,

ثم اعلم ان الرفع قبل الركوع وبعده غير معمول به وغير مندوب عندنا معاشر الحنفية لا انه مكروه ، ولم يصرح بالكراية الاصاحب منة المصلى حيث قال ويكره ان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الراس من الركوع وحكى عن مكحول النسفى كما فى الكبير وغيره القبول بالفساد عن الامام ، لكن خلاف ما عليه الكتب المعتمده كالذخيره ولوالجية حيث صرحوا بانه ان رفع لا تفسد صلوته ، كما فى الفوائد البيهة انظر معارف السنن ج : ٢ ، ص : ٤٥٨

৭. প্রাগুক্ত।

৮. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

www.pathagar.com

সকলের আমল ছিল রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন না করা। অনুরূপভাবে কূফাবাসী লোকেরা রাফে' ইয়াদাইন করতো না মর্মে দলীল হল শাফিঈ আলিম মুহাম্মদ ইবন নসর মারওয়াযী লিখেছেন,

ما جمع مصر من الامصار على ترك رفع اليدين ما أجمع عليه أهل الكوفة .

রাফে' ইয়াদাইন না করার মর্মে কূফাবাসী লোকদের যে ঐকমত্য পাওয়া যায় এমন ঐকমত্য অন্য কোন শহরের লোকদের মধ্যে পাওয়া যায় না।[৯] শাফিঈ আলিমের উপরোক্ত স্বীকারোক্তি প্রমাণ করে, ইল্‌মের অন্যতম মারকায কূফায় মধ্যেও রাফে' ইয়াদাইন না করার আমল চালু ছিল।

ইমাম শাফিঈ (র) রাফে' ইয়াদাইন করার পক্ষে মতামত গ্রহণের ভিত্তি হিসাবে মক্কাবাসী লোকদের প্রচলিত আমলকে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন।[১০] তাঁর এ উপস্থাপন প্রমাণ করে যে, মক্কাবাসীর আমল ছিল রাফে' ইয়াদাইন করা। তাহলে না করার বিষয়টি কি করে মুতাওয়াতির থাকে? এ প্রশ্নের ব্যাখ্যায় হযরত কাশ্মীরী বলেন, মক্কাবাসীর আমল পূর্বে রাফে' ইয়াদাইন করার পক্ষে ছিল না। এটি তাঁদের মধ্যে শুরু হয় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়রের শাসনামল থেকে। কেননা আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়র (রা) নিজে রাফে' ইয়াদাইন করার সমর্থক ছিলেন। তাঁর অনুসরণে গোটা মক্কাবাসী রাফে' ইয়াদাইন শুরু করে। এই প্রবাহকেই পরবর্তী কালে ইমাম শাফিঈ দেখতে পেয়েছিলেন।[১১] কাজেই গোড়া থেকে মক্কাবাসীর আমল রাফে' ইয়াদাইনের পক্ষে ছিল তা নিশ্চিত বলা যায় না।

রুকূতে রাফে' ইয়াদাইন করা কিংবা না করা বিষয়ক বিদ্যমান হাদীসগুলোকে সংখ্যার দিক থেকেও একটি মূল্যায়ন করা যায়। হযরত কাশ্মীরী (র) বলেন, যে সব হাদীসে রাফে' ইয়াদাইন করার কথা স্পষ্টভাবে (صراحةً) বলা আছে সনদের দিক থেকে এগুলোর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। পক্ষান্তরে যে সব হাদীসে রাফে' ইয়াদাইন না করার কথা স্পষ্টভাবে বলা আছে সেগুলোর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। এক কথায় শাফিঈ অভিমতের পক্ষে হাদীস সংখ্যাগতভাবে বেশি আর হানাফী অভিমতের পক্ষে হাদীস সংখ্যাগতভাবে কম। হযরত কাশ্মীরী (র) এ ক্ষেত্রে আরো গভীর দৃষ্টি আরোপ করে বলেন, তবে এখানে একটি জিনিস খুবই লক্ষণীয়। তা হল রাফে' ইয়াদাইন না করা মর্মে মাতামত গ্রহণকারীদের রায় হল একটি নেতিবাচক রায়। এ রায়ের পক্ষে না করা বিষয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে এমন হাদীসগুলো যেমন দলীল হিসাবে কাজ করে তেমনি নামাযের পদ্ধতি ও বিবরণ দানকারী সেই অসংখ্য

---

৯. আল্লামা বিন্নৌরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬০।

১০. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

১১. আল্লামা বিন্নৌরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯। তিনি বলেন,
واما الترك فاحاديثه قليلة ومع هذا هو ثابت بلا مرد، وهو متواتر عملاً لا اسناداً عند اهل الكوفة ، وقد كان فى سائر البلاد تاركون ، كثير من التاركين في المدينة فى عهد مالك ، وعليه بنى مختاره وكان اكثر اهل مكة يرفعون فبنى عليه الشافعى مذهبه وكانوا تعلموه من ابن الزبير وكان يرفع ، وتعلمه اهل الكوفه من ابن مسعود وعلى ، ورحلوا الى عمر لتعلم الصلوة ايضاً فروا تركه، واستمروا عليه، كما فى معارف السنن ج ٢ ص ٤٥٩ .

www.pathagar.com

হাদীসও দলীল হিসাবে অন্তর্ভুক্ত যেখানে রাফে' ইয়াদাইন করা বা না করার মর্মে কিছুই হয়নি। কেননা যদি রাফে' ইয়াদাইন থাকতো তা হলে নামাযের সিফাত বর্ণনাকারী এ হাদীসগুলোতে অবশ্যই তার উল্লেখ থকেত। অতএব সূক্ষ্ম এ দিক থেকে বিচার করলে সংখ্যাতগভাবে রাফে' ইয়াদাইন না করা বিষয়ক হাদীসের সংখ্যা করা বিষয়ক হাদীসের তুলনা অনেক অনেক গুণ বেশি প্রমাণিত হয়। [১২]

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নামাযের রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন করা কিংবা না করা বিষয়ক তর্কযুদ্ধ কোন কোন মুহাদ্দিস বা ফকীহের মধ্যে বাড়াবাড়ির উদ্রেক করে দিয়েছে। এ বাড়াবাড়ি রাফে' ইয়াদাইনের পক্ষে যেমন পাওয়া যায় তেমনি বিপক্ষেও বিদ্যমান। এমতাবস্থায় সরল অভিমত কি তা উপলব্ধির জন্য মহানবী (সা)-এর হাদীগুলো সরাসরিভাবে পর্যালোচনা করা যায়। নিম্ন এ মর্মে কয়েকটি হাদীস লক্ষণীয়:

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ اَلاَ اُصَلِّىْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلاَّ فِىْ اَوَّلِ مَرَّةٍ ، رواه الامام الترمذى فى باب رفع اليدين عند الركوعِ والنسائى فى كتاب الامامة باب الرخصة فى ترك ذلك (الرفع عند الركوع) وأبو داؤد فى باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ، وقال الترمذى هذا حديث حسن وصححه الحاكم وابن حزم فى المجلى .

হযরত আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায পড়ে দেখাবো? তখন তিনি (সবার সামনে) নামায পড়লেন কিন্তু শুরুতে তাহরীমার সময় ব্যতীত অন্য কোথাও রাফে' ইয়াদাইন করেননি।[১৩]

এ হাদীসে রুকূ'তে 'রাফে' ইয়াদাইন' নেই--এ কথা সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই তা করে দেখাতেন। বিশেষত শ্রোতা ও দর্শকরা যখন সে বিষয়কে লক্ষ্য রেখে জিনিসটি দেখছেন তখন রাফে' ইয়াদাইন না করা রাফে' ইয়াদাইন না থাকার বড় একটি দলীল। এ হাদীসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে, এটি বিষয়বস্তুর উপর যেমন সরীহ (সুস্পষ্ট) তেমনি সহীহ (বিশুদ্ধ)। এমন বৈশিষ্ট্য খুব কম হাদীসের মধ্যেই পাওয়া যায়।[১৪]

এ হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে অভিযোগকারীরা একাধিক অভিযোগ পেশ করেছেন। কিন্তু বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা কোন অভিযোগ যথার্থ নয়। যেমন এক. হাদীস খানার ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবন মুবারকের সূত্রে মন্তব্য করে বলেন,

---

১২. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

১৩. ইমাম তিরমিযী, আস সুনান, বাবু রাফয়িল ইয়াদাইন ইনদার রুকূ'; ইমাম আবূ দাউদ, আস সুনান, বাবু মান লাম ইয়াযকুরির রাফআ ইনদার রুকূ'; ইমাম নাসাঈ, আস সুনান, কিতাবুল ইমামা, বাবুর রুখসাতি ফী যালিকা।

১৪. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

www.pathagar.com

ولم يثبت حديث ابن مسعود اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَم يَرْفَعْ اِلاَّ فِىْ اَوَّلِ مرّ

হযরত ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীস যে, মহানবী (সা) হস্তদ্বয় উত্তোলন করেন নি তবে কেবল প্রথমে একবার'[১৫] এটি সনদের দিক থেকে প্রমাণিত নয়।

অভিযোগকারীরা বলেন, ইমাম তিরমিযীর উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে বুঝা গেল, হযরত ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধ নয়। কাজেই এটি দলীল হিসাবে উপস্থাপন যোগ্য থাকে না।

মুহাক্কিক আলিমগণ অভিযোগটির পর্যালোচনা করে বলেন যে, বস্তুত হযরত ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে দু'টি হাদীস। উভয় হাদীসের মূল বিষয় এক কিন্তু সনদ ও শব্দমালা ভিন্ন ভিন্ন। একটির মতন হল ان النبى ﷺ لم يرفع الا فى اول مرة আর অপরটির মতন হল الا اصلى بكم صلوة رسول الله ﷺ فصلى فلم يرفع الا فى اول مرة এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, হাদীসদ্বয়ের বক্তব্য ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমটি হল সরাসরি মহানবী (সা)-এর নামায প্রসঙ্গে আর দ্বিতীয়টি হল মহানবী (সা) কিভাবে নামায পড়তেন সেটি দেখিয়ে হযরত ইবন মাসউদের নামায পড়া প্রসঙ্গে।[১৬] হযরত আবদুল্লাহ ইবন মুবারকের সূত্রে ইমাম তিরমিযী যে মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। সেটি ছিল প্রথমোক্ত হাদীস সম্পর্কে। শেষোক্ত হাদীস সম্পর্কে নয়। আর দলীল হিসাবে যে হাদীস উত্থাপিত হয়েছে; সেটি হল শেষোক্ত হাদীস। কাজেই অভিযোগকারীদের অভিযোগ যথাস্থানে হয়নি। এক হাদীস সম্পর্কীয় মন্তব্য অন্য হাদীসের সাথে মিলিয়ে ফেলেছেন বলে অভিযোগকারীরা এ ভুলে পতিত হয়েছেন।

হযরত ইবন মুবারকের মন্তব্য শেষোক্ত হাদীস সম্পর্কে নয় এ দাবীর দলীল হল যে, সুনানে নাসাঈ গ্রন্থে এই হাদীস স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) থেকে এভাবে বর্ণিত আছে।[১৭]

أخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمٰن بن الأسواد عن علقمة عن عبد الله قال الا أخبركم بصلوة رسول الله ﷺ قال فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد

ইমাম নাসাঈ (র) বর্ণিত এ হাদীস বিশুদ্ধ। আর এটি স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবন মুবারকই বর্ণনা করছেন। বুঝা গেল, আবদুল্লাহ ইবন মুবারকের উপরোক্ত মন্তব্য এ হাদীস সম্পর্কে নয়। বরং অন্য হাদীস সম্পর্কে।

তাছাড়া ইমাম তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ ইবন মুবারকের মন্তব্য উদ্ধৃত করার পরে ভিন্ন সনদে الا اصلى بكم বিষয়ক হাদীস বর্ণনা করেন এবং শেষে নিজে মন্তব্য করে বলেন,

---

১৫. জামি তিরমিযী গ্রন্থ, বাবু রাফ'ইল ইয়াদাইন ইনদার রুকূ'।

১৬. তালীকাতু আসারিস সুনান, বাবু তারকি রাফইল ইয়াদাইন, পৃ. ১০৪।

১৭. ইমাম নাসাঈ, আস সুনান, খ. ১, পৃ. ১৫৮।

www.pathagar.com

قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن ، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى ﷺ والتابعين وهو قول سفيان وأهل الكوفة .

আবূ ঈসা (ইমাম তিরমিযী) বলেন, ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান শ্রেণীভুক্ত। আর এই অভিমতই প্রকাশ করেছেন আহলে ইলম সাহাবা ও তাবিঈনের অনেকে। এটি হল সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী লোকদের অভিমত।[১৮]

এতে বুঝা যায় যে, হযরত ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত (শেষোক্ত) হাদীস ইমাম তিরমিযীর মতে হাসান ও দলীলের উপযোগী হাদীস। তাছাড়া জামি তিরমিযী গ্রন্থের যে নুসখা আবদুল্লাহ ইবন সালিম বাসরী থেকে মুদ্রিত তাতে দেখা যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মুবারকের উপরোক্ত মন্তব্যে উল্লেখের পর 'বাব' সমাপ্ত, হয়ে গিয়েছে। অতঃপর باب من لم يرفع يديه الا فى اول مرة শিরোনামে নতুন 'বাব' শুরু হয়েছে। আর নতুন সেই বাবের মধ্যে হযরত ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত الا اصلى بكم এর হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে।[১৯] আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী (র) বলেন, পর্যালোচনায় বুঝা যায় যে, প্রচলিত নুসখার তুলনায় আবদুল্লাহ ইবন মালিকের নুসখা অধিকতর বিশুদ্ধ ও যক্তিযুক্ত। কেননা তিরমিযী গ্রন্থের রচনায় ইমাম তিরমিযী বিপরীত মতামত বিষয়ক হাদীসগুলোকে অনুসরণ করে আসছেন। সেটি প্রচলিত নুসখায় পাওয়া যায় না বরং আবদুল্লাহ ইবন আলিমের নুসখা পাওয়া যায়।[২০] মোটকথা এ সব আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, রাফে' ইয়াদাইন না করার মর্মে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে যে হাদীস ইতোপূর্বে দলীল হিসাবে পেশ করা হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মবুবারকের মন্তব্য সেই হাদীস সম্পর্কে নয়। কাজেই ইবন মুবারকের উদ্ধৃতি দিয়ে এ হাদীসের উপর অভিযোগ পেশ করার সুযোগ নেই।

দ্বিতীয়ত, ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীসের উপর অপর অভিযোগ করা হয় যে, এই হাদীসের 'মাদার' (বর্ণনাভিত্তি) হল হযরত আসিম ইবন কুলাইব। অর্থাৎ এটি একক কাজেই এটি 'তাফররুদ' বলে গণ্য যা দলীলের উপযোগী নয়।

মুহাক্কিকগণ বলেন, রাবী হিসাবে হযরত আসিম ইবন কুলাইব উচ্চমানের সিকা রাবী। ইমাম মুসলিম (র) তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। কাজেই এমন উচ্চমানের সিকা রাবীর বর্ণিত 'তাফাররুদ' ক্ষতিকর নয়। তাছাড়া আসিম ইবন কুলাইবের মুতাবি' নেই-এ কথা ঠিক নয়। হাদীস গ্রন্থে ইমাম ইযম আবূ হানীফা (র) সূত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী মুতাবি' বিদ্যমান। যেমন,

---

১৮. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

১৯. প্রাগুক্ত।

২০. আল্লামা বিন্নৌরী (র), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩। এ ক্ষেত্রে রশীদ আশরাফ সাইফী সংযুক্ত টীকায় লিখেছেন যে, ইমাম তিরমিযী وفى الباب শিরোনামে বিভিন্ন হাদীসের যে তালিকা সাধারণভাবে পেশ করেন তা প্রত্যেক বাব-এর আওতায় একবারই বলেন। কিন্তু এই বাবে দেখা যায় বিষয়টি বলেছেন দুই বার। বুঝা যায়, দুই শিরোনামের মাঝে ভিন্ন কোন ترجمة الباب রয়ে গিয়েছে। দ্র. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

www.pathagar.com

মুসনাদে ইমাম আযম গ্রন্থে এই হাদীস নিম্নোক্ত সনদে বর্ণিত হয়েছে।[২১]; عن حماد عن ابراهيم عن الاسود এই সনদ অত্যন্ত শক্তিশালী। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এটি সিলসিলাতুয যাহাব বা সোনালী পরম্পরা নামে অভিহিত। এই সনদ আসিম ইবন কুলাইব সূত্রের সমর্থন করে বিধায় আসিম ইবন কুলাইব সূত্রকে দলীল উপযোগী বলে মেনে নিতে কোন সমস্যা থাকে না।

তৃতীয়ত, অভিযোগ করা হয় যে, আসিম থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান সাওরী। আবার সুফিয়ান সাওরী থেকে ওয়াকী। তাঁও নিজ নিজ ক্ষেত্রে একক রাবী মাত্র।

মুহাক্কিকগণ বলেন, সুফিয়ান সাওরী ও ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (র) উভয়ে হাদীস জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমাম ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ ব্যক্তিত্ব। এমন ব্যক্তিত্বের 'তাফাররুদ' যদি গৃহীত না হয় তাহলে কোন মানুষের তাফাররুদই গ্রহণের উপযোগী থাকবে না। তা ছাড়া ইমাম আযম আবূ হানীফা (রা) বর্ণিত সনদে না সুফিয়ান আছেন, আর না ওয়াকী। সেটি তো এ সনদকে স্পষ্ট সমর্থন করছে। আরো উল্লেখ্য যে, হযরত সুফিয়ান থেকে হাদীসটি বর্ণনার মধ্যে ওয়াকী একক নয়। তার আরো মুতাবি রয়েছে। যেমন সুনানে নাসাঈ গ্রন্থে[২২] হযরত আবদুল্লাহ ইবন মুবারক এবং সুনানে আবূ দাঊদ গ্রন্থে[২৩] হযরত মু'আবিয়া, হযরত খালিদ ইবন আম্‌র, হযরত আবূ হুরায়রা (র) প্রমুখ ওয়াকী-এর মুতাবা'আত করেছেন মর্মে সনদ বিদ্যমান। এমতাবস্থায় এ অভিযোগও যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় না।

চতুর্থত, অভিযোগ করা হয় যে, হযরত আলকামা থেকে হযরত আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ এর শ্রবণ প্রমাণিত নয়। মুহাক্কিকগণ বলেন, এ অভিযোগও যথার্থ নয়। কারণ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হযরত আবদুর রহমান হলেন হযরত ইবরাহীম নাখঈর সমসাময়িক। আর ইরাহীম নাখঈ (র) হযরত আলকামা থেকে শ্রবণ করেছেন। তাতে অনুমান করা যায় যে, হযরত আবদুর রহমানও হযরত আলকামার সমসাময়িক হয়ে থাকবেন। আর ইমাম মুসলিমের মতে সনদ শুদ্ধ বিবেচিত হওয়ার জন্য রাবীদের মধ্যে পারস্পরিক সমসাময়িকতাই যথেষ্ট। তাছাড়া ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) এই হাদীস হযরত আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ-এর স্থলে ইবরাহীম নাখঈ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর আলকামা থেকে তার শ্রবণ সুনিশ্চিত।[২৪]

পঞ্চমত এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র) অভিযোগ করেন যে, হাদীসটি মা'লূল অর্থাৎ ত্রুটিপূর্ণ। কারণ এ হাদীসের মতন অংশের ثم لم يعد বাক্যটি আসিম ইবন কুলাইব-এর শিষ্যদের মধ্যে কেবল সুফিয়ান সাওরী উদ্ধৃত করেছেন (দ্র. নাসাঈ গ্রন্থের হাদীস)। হযরত আসিমের অপর শিষ্য আবদুল্লাহ ইবন ইদ্‌রীস রচিত গ্রন্থে এ বর্ধিত অংশ বিদ্যমান নেই।

এ প্রশ্নের উত্তরে মুহাক্কিকগণ বলেন, উপরোক্ত বর্ধিত অংশ সহীহ হিসাবে গণ্য না করা হলেও তাতে ক্ষতি কি? কেননা নামাযের রুকু'তে রাফে' ইয়াদাইন না থাকার বিষয়টি বর্ণিত

২১. জামিউল মাসানীদ, খ. ১, পৃ. ৩৫৫, আল-বাবুল খামিস ফিস সালাত।

২২. ইমাম নাসাঈ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৮, বাবু তারকি যালিকা।

২৩. ইমাম আবূ দাঊদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৯।

২৪ আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

www.pathagar.com

বর্ধিত অংশ ছাড়াও প্রমাণিত হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও বলা হচ্ছে যে, বর্দ্ধিত অংশটিও বিশুদ্ধ। কেননা বর্দ্ধিত অংশ বর্ণনা করছেন হযরত সুফিয়ান সাওরী। তিনি তার সঙ্গী আবদুল্লাহ ইবন ইদ্‌রীস অপেক্ষা অধিক ধীশক্তিমান। আর তুলানমূলক অধিক ধীশক্তিমানের বর্দ্ধিত অংশ রিজাল শাস্ত্রের নীতি অনুসারে গ্রহণযোগ্য।[২৫]

ষষ্ঠত, শাফিঈ আলিম আবূ বকর ইবন ইসহাক অভিযোগ করে বলেন, হতে পারে হযরত ইবন মাসঊদ (রা) ভুলক্রমে রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইনের কথা বাদ দিয়েছেন। মুহাক্কিক আলিমগণ উপরোক্ত উক্তির কারণে আবূ বকর ইবন ইসহাকের কঠিন সমালোচনা করেছেন। কারণ শুধু আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা)-এর মত জালীলুল কাদ্‌র সাহাবীই নয় সাধারণ কোন সাহাবী সম্পর্কে এ ধরনের দায়িত্বহীনতার অভিযোগ কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। মুহাক্কিকগণ বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) যিনি সাহাবীগণের মধ্যে افقه الصحابة (সর্বাধিক বিজ্ঞ) ও حبر الامة (উম্মতের বড় আলিম) উপাধিতে সুপরিচিত, যিনি মহানবী (সা)-এর সঙ্গে বাড়িতে-সফরে সকাল-সন্ধ্যায়, রাতে দিনে বছরের পর বছর একত্রে অবস্থান করে নামায আদায় করেছেন তার মহানবী (সা)-এর নামায সম্পর্কে কোন কিছু জানা বাকী ছিল কিংবা নবী (সা) থেকে নামায সংক্রান্ত কোন জিনিস পেয়ে তিনি ভুলে গিয়েছেন এমন মন্তব্য ধৃষ্টতা বৈ কিছু নয়।[২৬] মোটকথা অভিযোগ অনেক হতে পারে। বিশেষত কোন মাস'আলায় পারস্পরিক বিতর্ক শুরু হলে অভিযোগের সংখ্যা বেড়ে যায়। রাফে' ইয়াদাইনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। কিন্তু উপরোক্ত পর্যালোচনা দ্বারা দেখা যায় অভিযোগকারীদের কোন অভিযোগই যথার্থ নয়। কাজেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীস যথার্থ এবং হাদীসের আলোকে প্রমাণিত যে, নামাযের মধ্যে রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন নেই।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ اِلٰى قَرِيْبٍ مِّنْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ .

رواه أبو داؤد فى باب من لم يذكر الرفع عند الركوع رقمه ٧٥٠ ، وقال أبو داؤد حدثنا عبد اللّٰه بن محمد الزهرى حدثنا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل ثم لا يعود ، قال سفيان قال لنا بالكوفة بعد ثم لا يعود قال أبو داؤو رواى هذا الحديث هشيم وخالد وابن ادريس عن يزيد ، يذكروا ثم لا يعود ، وأخرجه الطحاوى فى شرح معانى الاثار ،

২৫. প্রাগুক্ত।

২৬. আল্লামা বিন্নৌরী (র) লিখেছেন,

ومن المؤسف انهم تبعوا ابا بكر بن اسحاق فى هفوته وكبوته ولم يدروا ان لكل جواد كبوة وابتهجوا بها لموافقتها أرائهم وغفلوا عن جلالة قدر ام عبد بما شحنت بها اسفار الاحاديث من جليل مناقبه وغفلوا عن كثرة اطلاعه بالسنة كما شهد به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذى بعثه أمير المؤمنين عمر الى أهل الكوفة ليعلمهم امور دينهم وكتب الى اهل الكوفة انى والله الذى لا اله الا هو اثرتكم به على نفسى فخذوا منه ، الخ، كما فى معارف السنن ٠ ج ٢ ، ٤٨٦

www.pathagar.com

وابن أبى شيبة فى صنفه تحت باب من كان يرفع يديه فى اول تكبير ثم لا يعود .

হযরত বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নামায শুরু করতেন তখন নিজের হস্তদ্বয় কর্ণদ্বয়ের কাছাকাছি পর্যন্ত উত্তোলন করতেন। তারপর পুনরায় এটি করতেন না।[২৭]

এ হাদীস প্রমাণ করছে যে, মহানবী (সা) রাফে' ইয়দাইন করেছেন শুধু নামাযের শুরুতে অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার সময়ে। তাকবীরে তাহরীমার পর নামায শেষ করা পর্যন্ত পূণর্বার অন্য কোথাও তা রুকূ'র সময়ে হোক বা সিজ্দার সময়ে রাফে' ইয়াদাইন করেননি। কাজেই যারা বলেন রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন নেই তারা এ হাদীসকে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেন।[২৮]

এ হাদীসের সনদ নিয়েও বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু মুহাক্কিক উলামা প্রতিটি প্রশ্নকেই বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা পূর্বক প্রমাণ করেছেন যে, কোন প্রশ্নই যথার্থ নয়। যেমন বলা হয় যে,

ইমাম আবূ দাঊদ (র) হাদীসটিকে যাঈফ বলেছেন। শুনানে আবূ দাঊদ গ্রন্থে আছে قال ابو داؤد هذا الحديث ليس بصحيح (আবূ দাউদ বলেন, এই হাদীস সহীহ নয়)[২৯]

মুহাক্কিকগণ বলেন, পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সুনানে আবূ দাঊদ গ্রন্থে হাদীসটি মোট তিনটি সনদে বর্ণিত আছে। প্রথম দু'টি সনদ রাবী ইয়াযীদ ইবন আবূ যিয়াদ সূত্রে আর বর্ণিত আর তৃতীয় সনদ রাবী আবদুর রহমান ইবন আবূ লাইলা সূত্রে বর্ণিত। ইমাম আবূ দাউদ যেই মন্তব্য করেছেন তা ছিল শুধু তৃতীয় সনদের ব্যাপারে। কারণ এই সনদের অপর দুই সনদ যা প্রথমেই বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ ইয়াযীদ ইবন আবূ যিয়াদ সূত্রে বর্ণিত সনদদ্বয় সম্পর্কে তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন। আর ইমাম আবূ দাউদের নীতি হল তার মতে যে হাদীস সহীহ সেটিতে তিনি কোন মন্তব্য না করে নীরবতা গ্রহণ করে থাকেন। বিধায় হাদীসদ্বয় বিশুদ্ধ।[৩০]

দ্বিতীয়ত, অভিযোগ করা হয় যে, এ হাদীসের ثم لا يعود কথাটি শুধু রাবী শরীক সূত্রে বর্ণিত। এটি তার তাফাররুদ। যেমন ইমাম আবূ দাউদ (র) মন্তব্য করে বলেছেন,

روای هذا الحديث هشيم وخالد وابن ادريس عن يزيد ولم يذكروا ثم لا يعود .

এ হাদীস রাবী ইয়াযীদ থেকে যথাক্রমে হুশাইম, খালিদ ও ইবন ইদ্রীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কেউ ثم لا يعود অংশটি উল্লেখ করেন নি।[৩১]

২৭. ইমাম আবূ দাউদ; প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৯; ইমাম তাহাভী, শারহু মা'আনিল আসার, খ.১, পৃ. ১১০; ইমাম ইবন আবু শায়রা, আল মুসান্নাফ, খ. ১, পৃ. ২৩৬।

২৮. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

২৯. ইমাম আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৭৫০।

৩০. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

৩১ প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

মুহাক্কিকগণ বলেন, এই বর্ধিত অংশের বর্ণনায় শরীক একক এ কথা ঠিক নয়। কেননা তাঁর একাধিক মুতাবি' বিদ্যমান। আল্লামা কাশ্মীরী (র) তাঁর 'নাইলুল ফারকাদাইন ফী রাফইল ইয়াদাইন' গ্রন্থে বলেন, ইবন আদী সংকলিত 'কামিল' গ্রন্থের বর্ণনায় হুশাইম ও ইসরাঈল ইবন ইউনুসের হাদীসে উপরোক্ত বর্ধিত অংশ উল্লেখ আছে। তাছাড়া দারা কুতনী ও মু'জামে তাবারানী গ্রন্থে রাবী হামযাতুয যাইয়াত থেকেও রাবী শরীক-এর মুতাবা'আত পাওয়া যায়। স্বয়ং সুনানে আবূ দাঊদ গ্রন্থেও এইটি হাদীস ثم لا يعود-এর বর্ধিত অংশসহ রাবী শরীক ছাড়া রাবী সুফিয়ানের সনদেও বিদ্যমান। কাজেই বর্ধিত অংশটি শুধু শরীক থেকে বর্ণিত এমন বলা সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিরোধী বক্তব্য।[৩২]

তৃতীয়ত, বলা হয় যে, হাদীসটি সম্পর্কে হযরত সুফিয়ান ইবন উয়াইনা (র) বলেছেন যে, হাদীসের রাবী ইয়াযীদ ইবন আবী যিয়াদ যতদিন মক্কা মুকাররমায় ছিলেন ততদিন পর্যন্ত হযরত বারা (রা)-এর এই হাদীস ثم لا يعود-এর বৃদ্ধি ব্যতীত বর্ণনা করেন। অতপর তিনি কূফা আগমন করলে তখন থেকে তিনি এই বৃদ্ধি বর্ণনা শুরু করেন। ইমাম বায়হাকী উপরোক্ত বর্ধিত অংশ সম্পর্কে সুফিয়ান ইবন উয়াইনা (র)-এর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন,

اظن ان أهل الكوفة لقنوه فتلقن

"আমার ধারণা কূফাবাসী লোকেরা তাঁকে বিষয়টি ধরিয়ে দেয় ফলত তিনি এটি গ্রহণ করে নেন।" ইমাম আবূ দাঊদ (র) ও এ দিকে ইঙ্গিত করে বলেন,

حدثنا عبد الله بن محمد الزهرى قال حدثنا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك ولم يقل ثم لا يعود قال سفيان قال لنا بالكوفة بعد "ثم لا يعود"

আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ যুহরী সুফিয়ান ইয়াযীদ সূত্রে শরীকের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এখানে ثم لا يعود কথাটি নেই। সুফিয়ান বলেন, ইয়াযীদ পরবর্তী সময়ে কূফা গমনের পর আমাদেরকে ثم لا يعود-এর বৃদ্ধিসহ বর্ণনা করেন।[৩৩]

আল্লামা কাশ্মীরী (র) এ প্রশ্নের পর্যালোচনায় স্পষ্ট বলেন, হযরত সুফিয়ান ইবন উয়ায়নার প্রতি উপরোক্ত উক্তির নিসবত সম্পূর্ণ একটি অসত্য বিষয়। কারণ প্রথমত ইমাম বায়হাকী হযরত সুফিয়ানের এ উক্তিটি মুহাম্মদ ইবন হুসায়ন আল-বারভারী ও ইবরাহীম আরবামাদী থেকে উদ্ধৃত করেছেন। উভয়েই একেবারেই দুর্বল রাবী। বারভারী সম্পর্কে হাফিয সাহাবী উদ্ধৃত করেছেন যে, সে ছিল কাযযাব বা মিথ্যাবাদী। অনুরূপে আরবামাদী সম্পর্কে 'মীযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে হাফিয যাহাবী (র) লিখেছেন যে, তিনি সুফিয়ান ইবন উয়াইনার দিকে এমন অনেক কথা নিসবত করে বর্ণনা করেছেন যেগুলো বস্তুত তিনি আদৌ বলেননি। হযরত কাশ্মীরী (র) বলেন, এহেন অনির্ভরযোগ্য রাবীদ্বয় থেকে বর্ণিত মন্তব্য কোন ক্রমেই গৃহীত হতে পারে না।[৩৪]

৩২. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত; আল্লামা কাশ্মীরী, নাইলুল ফারকাদাইন, পৃ. ৯০-৯৬।

৩৩. প্রাগুক্ত।

৩৪. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

অধিকন্তু ঐতিহাসিক বিচারেও সুফিয়ান ইবন উয়ায়নার সূত্রে বর্ণিত উক্তি সম্পূর্ণ অশুদ্ধ। কেননা এ উক্তিকে শুদ্ধ বলে মেনে নিলে বলতে হবে যে, ইয়ায়ীদ ইবন আবূ যিয়াদ প্রথমে মক্কা মুকাররমায় থাকতেন। তারপর পরবর্তী কোন সময়ে কূফায় গিয়ে থাকতে আরম্ভ করেন। অথচ বাস্তব অবস্থা মোটেও এ রকম নয়। ইয়াযীদ ইবন আবূ যিয়াদ-এর জন্মই ছিল কূফায়। তারপর তাঁর সমগ্র জীবন এই কূফাতেই অতিবাহিত হয়। কাজেই তিনি মক্কায় থাকতেন, কূফায় আসার পর কূফাবাসীর নির্দেশে অভিমত পরিবর্তন করেন--এ ঘটনাই এখানে নেই। আরো বড় কথা হল যে, ইয়াযীদে ইবন আবূ যিয়াদ ইন্তিকাল করেন হিজরী ১৩৬ সালে। এদিকে হযরত সুফিয়ানের জন্ম সাল হল হিজরী ১০৭। তার অর্থ দাঁড়ায় ইয়াযীদের ওফাতের সময় হযরত সুফিয়ানের বয়স আনুমানিক ২৯ বছর। হযরত সুফিয়ান (র) নিজেও কূফায় জন্মগ্রহণকারী। ইতিহাসে এ কথা সুস্পষ্ট আছে যে, তিনি মক্কা মুকাররমায় আগমন করেন হিজরী ১৬৩ সালে। এতে বুঝা গেল যে, সুফিয়ান (র) যখন মক্কায় আসলেন তখন ইয়াযীদ (র) ইন্তিকাল করার প্রায় ২৭ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। তাহলে কেমন করে সম্ভব যে, সুফিয়ান ইবন উয়ায়না এই উক্তি ইয়াযীদ ইবন আবূ যিয়াদ থেকে শ্রবণ করেছেন। ঐতিহাসিক এ সকল সনদ প্রমাণ করে হযরত সুফিয়ানের দিকে উপরোক্ত উক্তির নিসবত করা সম্পূর্ণ অসত্য একটি বিষয়।[৩৫]

প্রশ্ন উঠে বিষয়টি এতই অসত্য হয়ে থাকলে ইমাম আবূ দাউদের মত মুহাদ্দিস কিভাবে মেনে নিলেন। কেননা তিনিও হযরত সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত সনদ বর্ণনার পর বলেন, قال سفيان قال لنا فى الكوفة بعد ، "ثم لا يعود" তাতে বুঝা যায় যে, সুফিয়ান সূত্রে বর্ণিত উক্তির কোন ভিত্তি অবশ্যই আছে।

হযরত কাশ্মীরী (র) বলেন, হযরত ইমাম আবূ দাউদ (র) যা বলেছেন তাতে কূফাবাসী তাকে 'তালকীন' করেছেন এমন কথা উল্লেখ নেই। আসলে মূল ব্যাপারটি ছিল এরকমের যে, এ রিওয়ায়াতটি দুইভাবে বর্ণিত আছে। সংক্ষেপে অর্থাৎ ثم لا يعود-এর বৃদ্ধি ব্যতীত ও বিস্তারিতভাবে অর্থাৎ ثم لا يعود-এর বৃদ্ধিসহ। বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবীদের এমন ঘটনা অহরহ হয়। বর্ণনাকারীগণ কখনো কোন হাদীস সংক্ষেপে বর্ণনা করেন আবার কখনো বিস্তারিতভাবে। এখানেও তাই ঘটেছে। সুনানে দারা কুতনীতে দেখা যায় যে,[৩৬] হযরত ইয়াযীদ ইবন আবূ যিয়াদ হাদীসটি উভয় পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে। উভয় বর্ণনাই এখানে এক সঙ্গে বিদ্যমান। হতে পারে কোন হজ্জের সফরে উভয় একত্রে ছিলেন। তখন মক্কা মুকাররমায় সুফিয়ান ইবন উয়াইনা হাদীসটি হযরত ইয়াযীদ ইবন আবূ যিয়াদ থেকে বৃদ্ধিবিহীন শ্রবণ করেছেন। পুনরায় কূফায় তিনি এই হাদীসই বৃদ্ধিসহ শ্রবণ করেছেন। কাজেই এখানে কোন ইযতিরাব বা তালকীন (প্ররোচনা)-এর সন্দেহ করা ঠিক নয়। হ্যাঁ, বর্ণনাটি ছিল একবার সংক্ষেপে আরেকবার বিস্তারিতভাবে। আর এদিকেই ইশারা করেছেন ইমাম আবূ দাউদ।[৩৭]

মোটকথা এ সব পর্যালোচনা থেকেও বুঝা যায় যে, সাহাবী হযরত বারা ইবন আযিব (রা) বর্ণিত হাদীস সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ও সহীহ। এর উপর আরোপিত অভিযোগসমূহের কোন ভিত্তি নেই। আর এ হাদীস প্রমাণ করে যে, নামাযে রূকূর সময় রাফে' ইয়াদাইন নেই।

৩৫. প্রাগুক্ত।

৩৬. দ্র. ইমাম দারা কুতনী, আস সুনান, দিল্লী ঃ আল-মাতবাউল ফারূকী, তা. বি, বাবু যিকরিত তাকবীর ওয়া রাফইল ইয়াদাইন ইনদাল ইফতিতাহ ওয়ার রুকূ' ওয়ার রাফই মিনহু।

৩৭. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

www.pathagar.com

عن ابن عباس رضى الله عنه النبى ﷺ ترفع الايدى فى سبعة مواطن افتتاح الصلوة وإستقبال البيت والصفا والمروة والموقفين وعند الحجر .

رواه الطبرانى مرفوعا كما فى لجمع الزوائد فى باب رفع اليدين فى الصلوة ورواه ابن أبى شيبة موقوفا تحت فى مصنفه تحت من كان يرفع يديه فى أول تكبيرة ثم لا يعود ، وفى رواية لا ترفع الايدى لا فى سبعة مواطن حين يفتح الصلوة وحين يدخل المسجد الحرام الخ ، راوه الطبرانى فى الكبير وكذا فى رواية مصنف ابن أبى شيبه ، ورواه البخارى فى جزء رفع اليدين تعليقًا .

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, সাত জায়গায় হাত উত্তোলন করা হয়। নামাযের শুরুতে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের প্রথম দর্শনের সময়, সাফা ও মারওয়ার সাঈ করার সময়, আরাফাত ও মুদালিফায় উকূফ করার সময় এবং হাজরে আসওয়াদের সামনে।[৩৮]

এ হাদীস রাফে' ইয়াদাইনের স্থানগুলো স্পষ্ট নির্দেশ করে দিয়েছে। এই নির্দেশনার মধ্যে নামাযের শুরুতে তাক্‌বীরে তাহরীমার সময় রাফে' ইয়াদাইনের কথা বলা হয়েছে। রুকূ' কিংবা সিজ্‌দায় রাফে' ইয়াদাইনের কথা বলা হয়নি। বুঝা গেল, রুকূ' কিংবা সিজ্‌দায় রাফে' ইয়াদাইন নেই।

উল্লিখিত হাদীসখানার উপরেও বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। নাইলুল ফারকাদাইন গ্রন্থে হযরত কাশ্মীরী (র) বলেন, হাদীসটির উপর অভিযোগ যতই করা হোক না কেন নিরপেক্ষ বিচারে এ হাদীস দলীল যোগ্য। এটিকে এ মান থেকে সরানোর যৌক্তিক কোন সুযোগ নেই।[৩৯]

হাদীসখানার উপর প্রধানত, দু'টি অভিযোগ করা হয়। এক. হাদীসটি الحكم عن المقسم সূত্রে বর্ণিত। মুহাদ্দিসগণ বলেন, কথিত আছে হাকাম শুধু চারখানা হাদীস মিকসাম থেকে শুনেছেন। বর্ণিত হাদীস সেই চারের মধ্যে নেই। বুঝা গেল এটি হাকাম বর্ণিত হাদীস নয়।

অভিযোগটির ব্যাখ্যায় আল্লামা যায়লাঈ (র) 'নসবুর রায়া' গ্রন্থে এবং হানাফী অন্যান্য আলিমগণ বলেন, রাবী হাকম নিজ উস্তাদ মিকসাম থেকে শ্রবণকৃত হাদীসের যে সংখ্যা কথিত আছে বলে পাওয়া যায় সেটি প্রচলিত লোককথা পর্যায়ের একটি উক্তি, যাছাই বাছাই বা নিরীক্ষণমূলক ফলাফল পর্যায়ের নয়। নতুবা রাবী হাকাম নিজ উস্তাদ মিকসাম থেকে সেই চারটি সেই সনদে প্রাপ্ত হাদীসের সংখ্যা পাঁচটি বলেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) এমন আরো

৩৮. তাবারানী, মুসান্নাফা ইবন আবী শায়বা; ইমাম বুখারী, জুযউ রাফইল ইয়াদাইন।

৩৯ আল্লামা কাশ্মীরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

www.pathagar.com

কয়েকখানা হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যেগুলো সেই পাঁচেরও অন্তর্ভুক্ত নয়। তা ছাড়া আল্লামা যায়লাঈ (র) তাঁর 'নাসবুর রায়া' গ্রন্থে আরো অন্যান্য হাদীসও তুলে ধরেছেন। এ সব উপাত্ত থেকে বুঝা যায় মিকসাম থেকে হাকামের হাদীস বর্ণনা চারের মধ্যে আদৌ সীমাবদ্ধ নয়। তাই একটি ভিত্তিহীন লোক কথা দিয়ে হযরত ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত মূল হাদীসকে আহত করা যায় না।[৪০]হযরত ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের উপর অপর অভিযোগ হল যে, এটি মারফূ' না মাওকূফ ও বিষয়ে সনদের মধ্যে 'ইযতিরাব' (মতভিন্নতা) পাওয়া যায়। তাই এটি দলীলযোগ্য নয়।

এ প্রশ্নের ব্যাখ্যায় মুহাক্কিকগণ বলেন, কোন সনদে ইযাতিরাব থাকা দুষনীয় বিষয় নয়। ইযতিয়াব যে কোন সনদে থাকতে পার। আর ইযতিরাবে যদি তার সুষ্ঠ সমাধান বিদ্যমান থাকে তা হলে সমাধান অনুসারে এটি অবশ্যই দলীলযোগ্য। হ্যাঁ,যদি সমাধান অসম্ভব হয় তখন সেটি দলীলের উপযুক্ত থাকে না। মুহাদ্দিসগণ প্রমাণ করেছেন উপরোক্ত ইযতিরাবের সুষ্ঠ সমাধান আছে—বিধায় এটি দলীল বিবেচিত হতে কোন অসুবিধা নেই।

মুহাদ্দিসগণ বলে, হাদীসটির সনদ মারফূ' ও মাওকূফ উভয়ভাবেই আছে। হতে পারে হাদীস উভয় পদ্ধতিতেই বর্ণিত হয়েছে। রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টান্ত অসংখ্য। কেননা সাহাবী কখনো হাদীসটির সনদ মহানবী (সা) পর্যন্ত টেনে নেন। আবার কখনো টেনে নেন না। ফলে একই হাদীস দুইভাবে বর্ণিত হয়ে চলে। বরং বলা যায় যে, এ পর্যায়ের বর্ণনা একটি অপরটির ব্যাখ্যা। কাজেই একটুকু ইখতিলাফ দেখে হাদীসকে রদ করে দেওয়া অদৌ ঠিক নয়।[৪১]

عَنْ عَبَّادِ بْنِ زُبَيْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهَا فِىْ شَىْءٍ حَتّٰى يَفْرَغُ .

أخرجه الحافظ ابن حجر فى الدراية فى تخريج أحاديث الهداية وقال لينظر فى اسناده ، قال الكشميرى قد نظر فى سنده فوجد رجاله ثقات ، وأخرجه البيهقى فى الخلافيات كما فى نصب الراية والحديث مرسل .

হযরত আব্বাস ইবন যুবাইর থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিয়ম ছিল যে, তিনি যখন নামায শুরু করতেন তখন নামাযের শুরুতে রাফে' ইয়াদাইন করতেন। তারপর নামায শেষ করা পর্যন্ত অন্যত্র কোথাও রাফে' ইয়াদাইন করতেন না।[৪২]

এ হাদীস প্রমাণ করছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিয়মিত নামাযে রাফে' ইয়াদাইন ছিল মাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময়। তাকবীরে তাহরীমার পর নামাযের সালাম ফেরানো পর্যন্ত রুকূ' সিজ্দা কিংবা অন্যত্র কোথাও রাফে' ইয়াদাইন করতেন না। কাজেই বুঝা গেল রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন নেই।

৪০. আল্লামা যায়লাঈ, নসবুর রায়া, খ. ১, পৃ. ১৯০।

৪১. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

৪২. ইমাম বায়হাকী, আল-খিলাফিয়্যাত; ইবন হাজার আসকালানী, তাখিরীজু আহাদিসিল হিদায়া;

www.pathagar.com

হাদীসখানার সনদ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী (র) বলেন, হাদীসটির সনদ গভীরভাবে দেখার প্রয়োজন আছে। হযরত আল্লামা কাশ্মীরী (র) বলেন, সনদটি গভীরভাবে তলিয়ে দেখা হয়েছে। তাতে যা পাওয়া গিয়েছে তা হল, সনদে উল্লেখিত সব রাবী সিকাহ্। কেউ দুর্বল বা যাঈফ নেই। কাজেই এটি দলীল হিসাবে উপস্থাপিত হতে কোন অসুবিধা নেই। তবে হযরত আব্বাস ইবন যুবায়র নিজে হলেন একজন তাবিঈ। কাজেই হাদীস হল মুরসাল। আর মুরসাল হাদীস হানাফীসহ অনেক মুজতাহিদের কাছেই দলীল উপযোগী। অতএব শুধু মুরসাল বলে এ হাদীস প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ নেই।[৪৩]

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوْا اَيْدِيَهُمْ اِلاَّ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ .

أخرجه الدار قطني في سننه والبيهقي في سننه وأخرجه ابن عدى في الكامل عن محمد بن جابر عن حماد عن ابراهيم عن علقمة .

হযরত ইবন মাসঊদ (রা)-থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা)-এর সঙ্গে নামায পড়েছি, হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর সঙ্গেও নামায পড়েছি। তাঁদের কেউ নামাযের শুরু সময় ব্যতীত অন্য কোথাও রাফে' ইয়াদাইন করেন নি।[৪৪]

এ হাদীসও প্রমাণ করছে যে, রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন নেই। কেবল শুরুতে তাকবীরে তাহরীমার সময় তাঁরা রাফে' ইয়াদাইন করতেন। কাজেই রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন করার প্রশ্নই উঠে না।

এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে অভিযোগকারীরা বলেন যে, হাদীসটি রাবী 'মুহাম্মদ ইবন জাবির' থেকে বর্ণিত। মুহাম্মদ ইবন জাবির একজন বিতর্কিত রাবী। তার সম্পর্কে বলা হয় যে,

انه كان يسرق الحديث من كل من يذاكره حتى كثرت المناكير والموضوعات في حديثه .

বস্তুত মুহাম্মদ ইবন জাবির হলেন এমন রাবী যার বিপক্ষে যেমন মন্তব্য পাওয়া যায় তেমনি পক্ষেও অনেক অভিমত আছে। পক্ষ ও বিপক্ষ সব মিলিয়ে পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, তিনি অতি উচ্চমানের রাবী না হলেও দলীল হিসাবে পেশযোগ্য রাবী।[৪৫] ইবন আদী লিখেছেন, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইসহাক ইবন ইসরাঈল এই মুহাম্মদ ইবন জাবিরকে তার চেয়ে তদানীন্তন বড় বড় শায়খদের উপরেও প্রাধান্য দিতেন। হাদীসের বড় বড় ইমাম যেমন আইয়ূব, ইবন আউন, হিশাম ইবন হাস্সান, সুফিয়ান সাওরী, শু'বা, সুফিয়ান ইবন উয়ায়না (র) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ মুহাম্মদ ইবন জাবির-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (দ্র. নসবুর রায়া) আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী (র) তাঁকে صدوق বলে অভিহিত করেছেন। 'সাদূক' শব্দটি কারো সিকা হওয়াকেই

৪৩. আল্লামা কাশ্মীরী, প্রাগুক্ত।

৪৪. ইমাম দারা কুতনী; ইমাম বায়াহাকী; ইবন আদী প্রমুখের গ্রন্থ দ্র.।

৪৫. আল্লামা কাশ্মীরী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

নির্দেশ করে। মোটকথা মুহাম্মদ ইবন জাবিরকে قابل الاستدلال রাবীরূপে গণ্য করা যায় বিধায় তার হাদীস গ্রহণ যোগ্য বিবেচিত (দ্র. আত তালীক)[৪৬]

عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى ﷺ انه كان يرفع يديه فى أول تكبيرة ثم لا يعود ، رواه الطحاوى

হযরত ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা)-এর নিয়ম ছিল যে, তিনি হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন প্রথম তাক্‌বীরের সময়। তারপর এটি আর পুণর্বার করতেন না।[৪৭]

এখানে প্রথম তাকবীর মানে তাকবীরে তাহ্‌রীমা। এ ক্ষেত্রে রাফে' ইয়াদাইন করা সকলের মতেই স্বীকৃত। হাদীসের শেষাংশ ثم لا يعود বুঝায় তাকবীরে তাহ্‌রীমার পর অন্যত্র কোথাও রাফে' ইয়াদাইন নেই।

এ হাদীসের উপর ইবনুল কাত্তান (র) অভিযোগ করেন যে, হাদীসের মতনে অবস্থিত ثم لا يعود অংশটি কেবল রাবী ওয়াকী থেকে বর্ণিত। কাজেই এর কোন সমর্থন না থাকায় এটি গ্রহণযোগ্য নয়। মুহাক্কিক আলিমগণ বলেন, ওয়াকীর কোন সমর্থক নেই দাবী শুদ্ধ নয়। কেননা নাসাঈ গ্রন্থে আছে।

أخبرنا سويد حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن عاصم عن ابن الاسود عن علقمة عن ابن مسعود رضى الله عنه قال الا اخبركم بصلوة النبى ﷺ فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعود

অনুরূপ সুনান আবূ দাউদ গ্রন্থে আছে,

حدثنا معاوية وخالد وأبو حذيفة قالوا حدثنا سفيان الثورى باسناده المذكور قال فرفع يديه أول مرة وقال بعضهم مرة واحدة .

উপরোক্ত উদ্ধৃতিদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, ثم لم يعد কথাটি যে অর্থ নির্দেশ করে তা বর্ণনায় ওয়াকী একক নয়। বরং আবদুল্লাহ ইবন মুবারকের ন্যায় বড় বড় মুহাদ্দিস তাঁর বক্তব্য সমর্থন করে রিওয়ায়াত করেছেন।[৪৮] (দ্র. বাযলুল মাজহূদ)

তাছাড়া হাদীসখানার উপর আরো অভিযোগ করা হয় যে, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল ও ইমাম আবূ বকর ইবন আবু শায়বার মত মুহাদ্দিসগণ ثم لا يعود কথাটি বর্ণনা করেননি।

বিশ্লেষক পণ্ডিতগণ বলেন, ইমাম আহমদ কিংবা ইবন আবু শায়বা ثم لا يعود এই বাক্য বর্ণনা না করলেও এমন বাক্য অবশ্যই বর্ণনা করেছেন যা সেটিরই অর্থ বুঝায়। বরং এমন বাক্য বর্ণনা করেছেন যা মূল উদ্দেশ্যকে আরো স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। যেমন মুসনাদে আহমদে আছে,

---

৪৬. মাওলানা আবুল হাসান, তানযীমুল আশতাত, খ. ১, পৃ. ২৯৩।

৪৭. ইমাম আবূ জাফর আত তাহাভী, শারহু মা'আনিল আসার, বাবু রাফঈল ইয়াদাইন ইনদার রুকূ'।

৪৮. আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী, বাযলুল মাজহূদ, খ. ৩, পৃ. ৭।

www.pathagar.com

قال ابن مسعود رضى الله عنه الا اصلى لكم صلوة النبى ﷺ قال فصلى فلم يرفع يديه الا مرة

অনুরূপ মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বা (র) গ্রন্থে আছে,

قال عن ابن مسعود رضى الله قال الا اركم صلوة النبى ﷺ فلم يرفع يديه الا مرة

দেখা যায় যে, উপরোক্ত দু'টি হাদীসেই فلم يرفع يديه الا مرة কথাটি বিদ্যমান যা فرفع يديه ثم لا يعود কথার অর্থই নির্দেশ করছে।[৪৯] (بذل المجهود)

- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اذَا كَبَّرَ لافْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَكُوْنَ ابْهَامَاهُ قَرِيْبًا مِّنْ شَحْمَتِيْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ ، رواه أبو جعفر الطحاوى .

হযরত বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা) যখন নামায শুরু করার জন্য তাকবীর বলতেন তখন হস্তদ্বয় এতটুকু পরিমাণ উত্তোলন করতেন যে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠিদ্বয় কর্ণদ্বয়ের লতি বরাবরে উঠে যেত। তার পর পুনর্বার এরূপ করতেন না।[৫০]

এ হাদীসও নির্দেশ করছে যে, নামাযের রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন নেই। মহানবী (সা) তাকবীরে তাহরীমায় রাফে' ইয়াদাইন করতেন। তাহরীমার পর নামাযের অন্য কোথাও রাফে' ইয়াদাইন করতেন না।

উপরোক্ত হাদীসের সনদেও কেউ কেউ অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। যেমন অনেকে বলেছেন হাদীসটির ثم لا يعود অংশটি ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। পাশাপাশি শু'বা, সুফিয়ান সাওরী প্রমুখের বর্ণনায় এ অংশ নেই। ইয়াযীদ ইবন আবূ যিয়াদকে ইমাম বুখারী আহমাদ ইবন হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবন মুঈন; দারিমী, হুমায়দী প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। মুহাক্কিকগণ বলেন, পূর্বেও বলা হয়েছে হাদীসখানা আরো অনেক সনদে বর্ণিত আছে। যেমন ثم لا يعود-এর বৃদ্ধিসহ হাদীসটি ঈসা ইবন আবদুর রহমান, হাকাম ইবন উয়ায়না প্রমুখও বর্ণনা করেছেন। সুনান আবূ দাঊদ, সুনান বায়হাকী ও তাহাভী গ্রন্থে তাঁদের রিওয়ায়াত বিদ্যমান। ঈসা ও হাকাম উভয়ই নির্ভরযোগ্য রাবী। তাদের নিকট থেকে রিওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান। তাকে কেউ কেউ যাঈফ বললেও তার সম্পর্কে 'তাহযীবুত তাহযীব' গ্রন্থে আছে।[৫১]

---

৪৯. আল্লামা সাহারানপুরী, প্রাগুক্ত।

৫০. ইমাম তাহাভী, খ.১, পৃ. ১০০।

৫১. মাওলানা আবুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪।

www.pathagar.com

كان أفقه أهل الدنيا وقال العجلى كان فقيها صاحب سنة صدوقا جائز الحديث وكان عالمًا بالقرآن وقال يعقوب بن سفيان ثقه عدل الخ .

মোটকথা বিভিন্ন পর্যালোচনায় দেখা যায় এ হাদীসটিও দলীলযোগ্য। এটিও প্রমাণ করছে যে, নামাযের রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন নেই।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا لِىْ اَرَاكُمْ رَافِعِىْ اَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شَمُوسٍ ، اُسْكُنُوْا فِى الصَّلٰوةِ

أخرجه الامام مسلم فى صحيحه تحت باب الامر بالسكون فى الصلوة والنهي عن الاشارة باليد ورفعها عند السلام .

হযরত জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) গৃহ থেকে বের হয়ে আমাদের দিকে আসলেন এবং বললেন, কি হল, আমি তোমাদেরকে অশৃংখল ঘোড়ার লেজের মত হাত উত্তোলনকারী অবস্থায় দেখছি কেন? নামাযের মধ্যে তোমরা স্থির থাকবে।[৫২]

এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রা) বলেন,

من احتج بحديث جابر بن سمرة على منع الرفع عند الركوع فليس له حظ من العلم .

"যে ব্যক্তি হযরত জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত এই হাদীসকে রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন নেই মর্মে দলীল হিসাবে দাঁড় করাবে সে মূর্খ।" কেননা হাদীসটি বস্তুত সালামের সময় রাফে' ইয়াদাইন না করার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। কেননা সহীহ মুসলিম গ্রন্থে এই হাদীসই রাবী উবায়দুল্লাহ ইবনুল কিবতিয়্যা সূত্রে বর্ণিত আছে। সেখানে স্পষ্ট যায় যে, এটি সালামের সময় রাফে' ইয়াদাইন না করার মর্মে বর্ণিত। রুকূ' সময়ে রাফে' ইয়াদাইন না করার মর্মে নয়।[৫৩]

মুসলিম গ্রন্থে হাদীসটি হল ঃ

عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال كنا اذا صلينا مع رسول الله ﷺ قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله واشار بيده الى الجانبين فقال رسول الله ﷺ علام

৫২. ইমাম মুসলিম, আস সহীহ, বাবুল আমর বিস সূকুন ফিস সালাত ওয়ান নাহয়ীনিল ইশারা বিল ইয়াদ।

৫৩. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

www.pathagar.com

تؤمون بايدكم كانها اذناب خيل شمس انما يكفى أحدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله .

'নাসবুর রায়া' গ্রন্থে হাফিয যায়লাঈ (র) ইমাম বুখারীর জবাব দিয়ে বলেন, ইবনুল কিবতিয়্যা সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত সালামের সময় রাফে' ইয়াদাইন প্রসঙ্গে তাতে সন্দেহ নেই। তবে ইবনুল কিবতিয়্যা ছাড়া অন্যান্যদের রিওয়ায়াত নামাযের ভিতরে অবস্থিত সকল প্রকার রাফে' ইয়াদাইন প্রসঙ্গে। এ কারণে দেখা যায় যে, যে সকল সূত্রে সালামের সময় রাফে' ইয়াদাইনের কথা স্পষ্ট বলা নেই সেখানে اسكنوا فى الصلوة কথাটি উল্লেখ আছে। পক্ষান্তরে ইবনুল কিবতিয়্যার সূত্রে এ বাক্যটি উল্লেখ নেই। যা এ মর্মে দলীল যে, এ হুকুমটি নামাযের ভিতরে অবস্থিত কোন রাফে' ইয়াদাইন প্রসঙ্গে। সালামের সময়ে রাফে' ইয়াদাইনের প্রসঙ্গে নয়। কেননা সালামের সময় যে কাজ করা হয় সেটি خروج من الصلوة-এর আমল। এটিকে فى الصلوة বলা যায় না। 'ফাতহুল মুলহিম' গ্রন্থে আছে যে, হযরত জাবির ইবন সামুরা বর্ণিত হাদীসের পূর্বাপরের দিকে তাকালে বুঝা যায় যে, এ সময় মহানবী (সা) তাদের সঙ্গে নামাযে ছিলেন না। সাহাবীগণ নামায পড়ছিলেন নবী (সা) দেখলেন যে, তারা নামাযে বার বার রাফে' ইয়াদাইন করছেন। তাদের বারংবার হস্ত উত্তোলন তাঁর কাছে ঘোড়ার বারংবার লেজ নাড়ানোর মত দেখাচ্ছিল বিধায় মহানবী (সা) এ কথা বলেছেন।

তবে ইনসাফের কথা হল যে, এ হাদীস রাফে' ইয়াদাইন না করার দলীল হিসাবে উপস্থাপন করা খুব শক্তিশালী দাবী নয়। এটি শুধু সালামের সময় রাফে' ইয়াদাইন না করারই দলীল হিসাবে বেশি প্রযোজ্য। আল্লামা কাশ্মীরীও এ হাদীস রাফে' ইয়াদাইনের বিপক্ষ দলীল হিসাবে পেশ করা পছন্দ করেন নি।[৫৪]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ .

قال العلامة عابد بن أحمد السندى أخرجه البيهقى فى خلافياته من حديث مالك عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر الخ ، قال الحاكم والبيهقى ان حديث ابن عمر باطل موضوع .

হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা) যখন নামায শুরু করতেন তখন রাফে' ইয়াদাইন করতেন, তারপর তা পুনর্বার করতেন না।[৫৫]

এ হাদীসও প্রমাণ করছে যে, নামাযের রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন নেই। এ হাদীসে আরেকটি চমৎকার বিষয় হল যে, যারা রাফে' ইয়াদাইনের পক্ষে আছেন তাঁরা প্রধানত হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বর্ণিত একখানা হাদীসকেই দলীল হিসাবে বেশি উল্লেখ করেন।

৫৪. প্রাগুক্ত।

৫৫. দ্র. ইমাম বায়হাকী, আল-খিলাফিয়্যাত।

www.pathagar.com

উপরোক্ত হাদীস থেকে বুঝা গেল হযরত ইবন উমর (রা) থেকে শুধু রাফে' ইয়াদাইনের পক্ষেই নয় বিপক্ষেও রিওয়ায়াত বিদ্যমান।

হযরত ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসের সনদেও অভিযোগ করা হয়েছে। যেমন হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম হাকিম ও ইমাম বায়হাকী 'বাতিল' ও মাওযূ বলে মত দিয়েছেন।[৫৬] এ আপত্তির জবাবে 'আত তালীকুস সাবীহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, কোন হাদীসকে বাতিল বা বানোয়াট বলে দাবী করলেই হাদীসটি বাতিল হয়ে যায় না। দাবির স্বপক্ষে সুস্পষ্ট দলীল জরুরী। এ সনদে এমন কোন সুস্পষ্ট দলীল বা কারণ পাওয়া যায় না বিধায় ইমাম হাকিম ও বায়হাকীর কথা গ্রহণ করা যাচ্ছে না। পক্ষান্তরে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যায় হাদীসখানার সনদে অবস্থিত ব্যক্তিবর্গের সকলেই সহীহ হাদীসের ব্যক্তিবর্গের ন্যায়। কাজেই এ হাদীসকে দলীল হিসাবে পেশ করতে কোন সমস্যা নেই।[৫৭]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ ثُمَّ صَارَ اِلَى افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ وَتَرَكَ مَا سِوٰى ذٰلِكَ كَمَا فِى التَّعْلِيْقِ .

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা)-এর নিয়ম ছিল তিনি যখন রুকূ'তে যেতেন এবং রুকূ' থেকে উঠে দাঁড়াতেন তখন রাফে' ইয়াদাইন করতেন। পরে রাফে' ইয়াদাইন শুধু নামায শুরু করার সঙ্গে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং তিনি তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্যত্র রাফে' ইয়াদাইন করা বাদ দিয়ে দেন।[৫৮]

এ হাদীসও রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন নেই মর্মে প্রকৃষ্ট দলীল। হাদীস থেকে আরো বুঝা যায় যে, পূর্বে এক সময় রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন ছিল। এমন কি অন্য হাদীসে পাওয়া যায় সিজ্‌দায় যাওয়া ও সিজ্‌দা থেকে উঠার পরও রাফে' ইয়াদাইন ছিল। কিন্তু সেগুলো দিনে দিনে বাদ পড়ে গিয়েছে। তাই নবী (আ)-এর শেষ আমল এবং নামাযের যে পদ্ধতিটি চূড়ান্ত বিবেচনা করা হয়েছে সেই পদ্ধতিতে রাফে' ইয়াদাইন কেবল তাকবীরে তাহরীমার সময়ে, অন্যত্র নয়।

হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, সেই অসংখ্য হাদীস যেগুলো মারফূ' ও উচ্চপর্যায়ের বিশুদ্ধ, যেগুলো নামাযের সিফাত ও মুস্তাহাবাত বর্ণনা করেছে সেগুলোও হিসাব করলে রাফে' ইয়াদাইন না করার পক্ষে অন্যতম দলীল হিসাবে বিবেচিত। কেননা এ হাদীসগুলোতে নামাযের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র কোন কাজের কথা অনুল্লেখ রাখা হয়নি। এমতাবস্থায় রুকূ' বা সিজ্‌দায় রাফে' ইয়াদাইন মর্মে সে সব হাদীসে কোন বক্তব্য না থাকায় বুঝা যায়, নামাযের রুকূ' বা সিজ্‌দায় রাফে' ইয়াদাইন নেই। কেননা যদি থাকতো তাহলে রাবী অবশ্যই সেটি এ হাদীসে উল্লেখ করতেন।[৫৯] (كما فى عرف الشذى ، ص : ١٣١)

৫৬. মাওলানা আবুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪-২৯৫।

৫৭. তালীকুস সাবীহ, পৃ. ৩৪৯।

৫৮. প্রাগুক্ত।

৫৯. আল্লামা কাশ্মীরী, আল-উরফুস শাযী, পৃ. ১৩১।

www.pathagar.com

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ الاَّ فِى التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ .

أخرجه الطحاوى وفى البيهقى قال مُجَاهِدٌ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ عَشَرَ سِنِيْنَ فَلَمْ أرَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ الاَّ فِىْ تَكْبِيْرَةِ الْاِفْتِتَاحِ . كما فى الطحاوى تحت باب التكبير للسجود والمصنف لا بن أبى شيبه تحت من كان يرفع يديه فى أول مرة

হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত ইবন উমর (রা)-এর পেছনে নামায পড়েছি। (তখন দেখেছি যে,) তিনি নামাযে প্রথম তাক্‌বীরের সময় ব্যতীত অন্যত্র রাফে' ইয়াদাইন করেননি। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তাহাভী। বাইহাক্বী গ্রন্থের বর্ণনায় আছে, হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, আমি দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত হযরত ইবন উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমি তাকে নামাযের শুরুর তাক্‌বীরের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে রাফে' ইয়াদাইন করতে দেখিনি।[৬০]

এ হাদীসও প্রমাণ করেছে যে, নামাযের রুকূ' কিংবা সিজ্‌দায় রাফে' ইয়াদাইন নেই। বিশেষত হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত একখানা মারফূ' হাদীসে রাফে' ইয়াদাইরে কথা বলা থাকলেও আলোচ্য হাদীস প্রমাণ করছে যে, তাঁর ব্যক্তিগত আমল ছিল রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন না করা আলোচ্য হাদীস মারফূ' নয় বরং মাওকূফ। মাওকূফ হাদীস হানাফী ফুকাহাসহ বহু মুজতাহিদ মুহাদ্দিসের নিকট দলীল যোগ্য বিধায় এটিও দলীল হিসাবে পেশ করা যায়।

এ হাদীসের সনদেও কেউ কেউ আপত্তি তুলেছেন। যেমন বলা হয় যে, সনদে আবূ বকর ইবন আইয়াশ নামক একজন রাবী আছেন। তিনি শেষ বয়সে মুখতালাত অর্থাৎ এমন হয়ে গিয়েছিলেন যে, কথা এলোমেলো করে ফেলতেন। কাজেই সনদ দলীলযোগ্য নয়।

অভিযোগটির ব্যাখ্যায় মুহাক্কিকগণ বলেন, আবূ বকর ইবন আইয়াশ এতটা উচ্চমানের রাবী যার হাদীস ইমাম বুখারীও গ্রহণ করেছেন। তাঁর শেষ বয়সে মুখতালাত হয়ে যাওয়াও স্বীকৃত। তবে এ হাদীস তাঁর মুখতালাত হওয়ার পূর্বেকার। শেষ বয়সের নয়। কেননা তাঁর নিকট থেকে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন আহমাদ ইবন ইউনুস। তিনি হযরত আবূ বকর (রা) থেকে যে সব হাদীস গ্রহণ করেছেন সেগুলো পূর্বেকার সময়ে গ্রহণ করেছেন--মর্মে সকলেই একমত। কাজেই পরবর্তী কালীন অসুস্থতার অজুহাতে পূর্ববর্তী কালে বর্ণনাকৃত হাদীসকে অভিযুক্ত করা যায় না।[৬১]

এ হাদীসের উপর আরো অভিযোগ করা হয় যে, হযরত ইবন উমর (রা)-এর আমল কি ছিল তা মুজাহিদ সূত্রে রাফে' ইয়াদাইন না করার বর্ণনা পাওয়াত গেলেও তাঁর অপর শাগরিদ

৬০. আল্লামা সাহারানপুরী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৮।

৬১. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

www.pathagar.com

হযরত তাঊসের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি রুকূ'তে যাওয়া ও রুকূ' থেকে উঠার সময় রাফে' ইয়াদাইন করতেন। কাজেই দুই শাগিরদের বর্ণনা দুই রকম দেখা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় তাঊসের বর্ণনা যেহেতু হযরত ইবন উমরের মারফূ' হাদীসের সাথে মিলে যায় সেহেতু তাঊসের বক্তব্যকেই বেশি সঠিক বিবেচনা করা উচিত। পক্ষান্তরে মুজাহিদের বক্তব্য মারফূ' হাদীসের সাথে বিরোধপূর্ণ বিধায় এটি পরিত্যাজ্য বিবেচিত হতে পারে।[৬২]

মুহাক্কিকগণ বলেন, আসল ঘটনা হল হযরত ইবন উমর (রা) দুই রকমেই আমল করেছেন। কাজেই মুজাহিদ বা তাঊস কারো বক্তব্যই অসত্য নয়। দুই রকম আমলের কারণ ছিল যে, তিনি প্রথম সময়ে বর্ণিত মারফূ হাদীস অনুসারে চলতে থাকেন। ইত্যবসরে কোন সূত্রে তিনি এটি উত্তম হওয়ার বিষয়টি রহিত হয়ে গিয়েছে মর্মে জ্ঞাত হন। ফলে রাফে' ইয়াদাইন করা বাদ দেন। দুই শাগিরদ দুই সময়ে যে রূপ দেখেছেন। সেভাবে তাঁরা বর্ণনাও করেছেন।

তাছাড়া প্রবন্ধের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, মূল বিষয়টি হল এমন যে, রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন করা কিংবা না করা উভয়েই জায়িয। হতে পারে এই দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) কখনো রাফে' ইয়াদাইন করতেন। আবার কখনো ছেড়ে দিতেন। যেন সকল হাদীসের উপরই আমল হয়ে যায়। কাজেই দুই শাগিরদের বর্ণনা এখানে দুই রকম হওয়ার মধ্যে কোন আপত্তি থাকে না।[৬৩]

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الصَّلٰوةِ اِلاَّ فِى الْاِفْتِتَاحِ .

أخرجه الطحاوى فى كتابه وأبو بكر بن أبى شيبة واسناده جيد لكنه مرسل ، وأخرجه الدار قطنى وقال انه مرسل .

হযরত ইবরাহীম নাখঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা)-এর নিয়ম ছিল যে, তিনি নামাযে শুরুর তাক্‌বীর ব্যতীত অন্যত্র রাফে' ইয়াদাইন করতেন না।[৬৪]

হাদীসখানার উপর অভিযোগ হল যে, এটি মুরসাল হাদীস তাই দলীলযোগ্য নয়। মুহাক্কিকগণ বলেন, হাদীস মুরসাল তাতে সন্দেহ নেই। কেননা রাবী ইবরাহীম নাখঈ, সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদকে পাননি। তবে ইবরাহীম নাখঈর ব্যক্তিগত একটি নিয়ম ছিল ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত কোন হাদীস সমাজে মুতাওয়াতির পর্যায়ে চলে গেলেই তিনি সেই হাদীস মুরসালভাবে বর্ণনা করতেন, নতুবা নয়। তাছাড়া মুরসাল হাদীস জমহূরের রায় অনুসারে দলীল যোগ্য। তাই মুরসাল হলে তাতে আপত্তি কি? আরো বিবেচ্য বিষয় যে, হাদীসখানা উদ্ধৃত করে ইমাম বায়হাকী লিখেছেন,

৬২. প্রাগুক্ত।

৬৩. প্রাগুক্ত।

৬৪. ইমাম তাহাভী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

فهذه الرواية وان كان فيها ارسال فالنخعى أعلم الناس بابن مسعود وبرائه .

এই রিওয়ায়াতের মধ্যে যদিও 'ইরসাল' আছে তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, ইব্রাহীম নাখঈ (র) ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা)-এর রায়, অভিমত ও ফাতাওয়া সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তিত্ব। কাজেই তাঁর হাদীস দলীলরূপে গ্রহণ করা যায়।[৬৫]

عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ قَالَ وَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ قَالَ وَرَأَيْتَ اِبْرَاهِيْمَ وَالشَّعْبِىَّ يَفْعَلاَنِ كَذٰلِكَ .

أخرجه الطحاوى وابن أبى شيبة وقال الطحاوى وهو حديث صحيح لان مدار الحديث الذى هو الحسن بن عياش فانه ثقه حجة كما فانه يحى بن معين وقال بن التركمانى وهذا السند ايضا صحيح على شرط مسلم.

হযরত আসওয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি প্রথম তাক্বীরে রাফে' ইয়াদাইন করেছেন। তারপর আর পুনরায় করেননি। রাবী লেন, আমি হযরত ইবন উমর (রা)-কে দেখিছি। তিনিও প্রথম তাক্বীরে রাফে' ইয়াদাইন করেছেন। তারপর পুনরায় করেননি। রাবী বলেন, আমি ইব্রাহীম ও শা'বীকেও দেখেছি যে, তাঁরা অনুরূপ আমল করেন।[৬৬]

এ হাদীসে আমলে সাহাবার একটি সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়। এ বিবরণের আলোকেও প্রমাণিত হয় যে, রাফে' ইয়াদাইন কেবল তাকবীরে তাহরীমায় হবে। অন্যত্র রুকূ' বা সিজ্দায় রাফে' ইয়াদাইন নেই।[৬৭]

عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ مِّنَ الصَّلٰوةِ ثُمَّ لاَ يَرْفَعُ بَعْدَ .

رواه الطحاوى باسنادين قال الحافظ فى الدراية رجالة ثقاة وقال الحافظ الزيلعى هو اثر صحيح وقال العينى اسناد حديث عاصم بن كليب صحيح على شرط مسلم كما فى بذل المجهود .

৬৫. মাওলানা আবুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫।

৬৬. ইমাম তাহাভী প্রাগুক্ত।

৬৭. আল্লামা সাহারানপুরী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

হযরত আসিম ইবন কুলাইব (র) নিজ পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী ইবন আবূ তালিব (রা) নামাযের প্রথম তাক্‌বীরে রাফে' ইয়াদাইন করতেন। তারপর আর রাফে' ইয়াদাইন করতেন না।[৬৮]

এ হাদীসও রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন না থাকার অন্যতম দলীল। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল হযরত আলী (রা) যিনি অতি প্রাচীন মুসলমান এবং যিনি মহানবী (সা)-এর অতি নিকটের অবস্থান করতেন তাঁর কাছ থেকেও রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন নেই মর্মে দলীল পাওয়া যাচ্ছে। ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ শায়বানী (র) তো আরো স্পষ্ট করে বলেন যে, সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ও হযরত আলী (রা)-এর মত মানুষের আমল ছিল তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্যত্র রাফে' ইয়াদাইন না করা। পক্ষান্তরে তৎকালের শিশু সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমরের হাদীস হল রাফে' ইয়াদাইন করা। এ দু'টি অভিমতের মধ্যে আমরা বলতে পারি যে, হযরত ইবন মাসউদ ও হযরত আলীই এ বিষয়ে অধিক জ্ঞাত হবেন। কেননা তাঁরা নামাযে মহানবী (সা)-এর পেছনে হযরত ইবন উমর (রা) অপেক্ষা বেশি কাছে থাকতেন। কেননা হাদীসে আছে ঃ

اذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلْيَلِيْنِىْ مِنْكُمْ اُولُوْ الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ .

যখন নামায দাঁড়াবে তখন আমার কাছাকাছি থাকবে তোমাদের সে সব লোক যারা বয়স্ক ও সমজদার। তারপরে তাদের নিকটবর্তীরা। তারপরে তাদের নিকটবর্তীরা।

উল্লেখ্য এ নীতি অনুসারে স্পষ্টই বিবেচ্য যে, মহানবী (সা)-এর নামাযে বয়স্ক ও সমজদার সাহাবী হযরত ইবন মাসউদ ও হযরত আলী মহানবী (সা)-এর যতটা কাছে ছিলেন ততটা কাছে শিশু সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) ছিলেন না।[৬৯]

হযরত মাওলানা আবুল হাসান চাটগামী বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন। কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, বয়সের সল্পতার দরুন তাঁরা বদরী সাহাবী হতে পারেননি। কাজেই তৎকালে যাঁরা বদরী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন নামাযে তাঁরাই থাকতেন আগে আগে, বিধায় তাঁদের বক্তব্য অগ্রগণ্য।[৭০]

رُوِىَ اَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَاٰى رَجُلاً يَرْفَعُ يَدَيْهِ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ مَهْ كَانَ هٰذَا شَىْءٌ فَعَلَهُ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ تَرَكَهُ ، كما فى التعليق

বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন করছে। তখন তিনি বললেন, থামো। এ কাজটি মহানবী (সা) আগে করতেন। কিন্তু পরে বাদ দিয়ে দিয়েছেন।

---

৬৮. ইমাম তাহাবী প্রাগুক্ত।

৬৯. আল্লামা সাহারানপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

৭০. তানযীমুল আশতাত, খ. ১, পৃ. ২৯৬।

www.pathagar.com

বর্ণিত হাদীসও নির্দেশ করছে যে, রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন নেই। এই হাদীসে একটি বিশেষ তথ্য হল যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) সম্পর্কে সাধারণ অভিমত হল তিনি রাফে' ইয়াদাইন করতেন। এমন রাফে' ইয়াদাইনকারী ব্যক্তিত্বের এই অভিমত যে, "থামো বিষয়টি আগে ছিল পরে বাদ দেওয়া হয়েছে" একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত।[৭১]

روى ابو بكر بن ابى شيبة فى مصنفه عن ابى اسحاق قال كان اصحاب عبد الله بن مسعود واصحاب على رضى الله عنهما لا يرفعون ايديهم الا فى افتتاح الصلوة ، قال وكيع ثم لا يعودون .

قال العلامة الماردينى هذا ايضا مسند صحيح جليل .

আবূ বকর ইবন আবু শায়বা (র) নিজ গ্রন্থ আল-মুসান্নাফে আবূ ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর শাগিরদগণ নামাযের শুরুতে ব্যতীত অন্যত্র রাফে' ইয়াদাইন করতেন না। রাবী ওয়াকী বলেন, তাহরীমার সময় রাফে' ইয়াদাইন করার পর (নামায শেষ করা পর্যন্ত) পুনরায় আর রাফে' ইয়াদাইন করতেন না।[৭২]

এ হাদীসও নির্দেশ করছে যে, রাফে' ইয়াদাইন হবে মাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময়ে। এ ছাড়া নামাযের অন্যত্র অর্থাৎ রুকূ' ও সিজ্‌দায় রাফে' ইয়াদাইন হবে না।

হাদীসখানার সনদ সম্পর্কে বিশিষ্ট হাদীস বিশরদ আল্লামা মারদীনী (র) বলেন, এ সনদটিও উচ্চ পর্যায়ের ও বিশুদ্ধ। কাজেই এটি দলীল হিসাবে পেশ করা যায়।

روى الطحاوى عن ابى بكر بن عياش قال ما رأيت فقيها قط يرفع يديه فى غير تكبير التحريمة نقله العلامة العثمانى فى فتح الملهم . ج : ١ ، ص : ١٦

ইমাম তাহাভী (র) বলেন, আবূ বকর ইবন আইয়াশ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আমি এমন কোন ফকীহ দেখিনি যিনি তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্যত্র রাফে' ইয়াদাইন করেন।[৭৩]

উল্লেখ্য, সব যুগেই আলিম অনেক থাকেন। কিন্তু সব আলিম ফকীহ হন না। ফকীহ এমন ব্যক্তি যিনি কুরআন ও হাদীসের মতন জানার পাশাপাশি এর গভীর উপলব্ধি ও মূল দর্শন সম্পর্কেও পূর্ণ অভিজ্ঞ। যুগে যুগে তাঁদের সংখ্যা কমই ছিল। তবে তাঁরাই হল ইলমে দীনের বুনিয়াদ। আবূ বকর ইবন আইয়াশ (র)-এর উপরোক্ত উক্তির অর্থ হল তাঁর যুগ পর্যন্ত তিনি যে লোককে দীনের গভীর উপলব্ধি সম্পন্ন জ্ঞান করেছেন তাঁকেই পেয়েছেন রাফে' ইয়াদাইনের

৭১ প্রাগুক্ত।

৭২. প্রাগুক্ত।

৭৩. আল্লামা আইনী, উমদাতুল কারী, খ. ৩, পৃ. ৭।

www.pathagar.com

বিপক্ষে। তাতে বুঝা যায়, নামাযে রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন না করার অভিমতই প্রাজ্ঞদের অভিমত।

وَفِىْ الْبَدَائِعِ رَوٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ الْعَشَرَةُ الَّذِيْنَ شَهِدَ لَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ بِالْجَنَّةِ مَا كَانُوْا يَرْفَعُوْنَ اَيْدِيْهِمْ اِلاَّ فِى افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ . نقله الحافظ بدر الدين العينى ، ج : ١ ، ص : ٧

বাদায়িউস সানায়ি' গ্রন্থে আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, দশ জন সাহাবী যাঁদেরকে মহানবী (সা) (একখানা হাদীসের মধ্যে) জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ জানিয়েছেন তাঁরা নামাযে রাফে' ইয়াদাইন করতেন না তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত।[৭৪]

মোটকথা বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ফারূক, হযরত উসমান গনী, হযরত আলী মুরতাযা, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ প্রমুখ সাহাবা যাঁদেরকে জগতের শ্রেষ্ঠ ফকীহ সাহাবী জ্ঞান করা হয় তাঁরা এবং বহু সাহাবা, তাবিঈন ও তাবি-তাবিঈন নামাযের রুকতে রাফে' ইয়াদাইন না করাকে উত্তম মনে করতেন এবং ব্যক্তি জীবনে রাফে' ইয়াদাইন না করার উপর আমল করে গিয়েছেন। তাঁদের এই অনুভূতি ও আমল উম্মতের জন্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ নিঃসন্দেহে।

১৯. ফখরুল মুহাদ্দিসীন আল্লামা ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদী (র) বলেন, ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মুসলমানদের রাজধানী প্রথমে ছিল মদীনা মুনাওয়ারায়। ফলে সাহাবা ও তাবিয়ীনের প্রধান বসবাস স্থাপিত হয় মদীনায়। এই মদীনাবাসীর আমল ছিল রাফে' ইয়াদাইন না করা। তাঁরা রাফে' ইয়াদাইন করতেন না। মদীনাবাসীর এই আমলের ভিত্তিতেই ইমাম মালিক ইবন আনাস (র) নামাযের রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন না করার অভিমত গ্রহণ করেন। মালিকী ফিকহের প্রসিদ্ধ আলিম আল্লামা ইবন রুশদ 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' গ্রন্থে বলেন,

ان الامام مالك رجع الترك لانه جرى عليه تعالم السلف من أهل المدينة

পরবর্তী কালে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় কূফায়। ফলে সাহাবা ও তাবিঈনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বগণ কূফায় বসবাস শুরু করেন। তাঁদের আমল ছিল রাফে' ইয়াদাইন না করা ফলে রাফে' ইয়াদাইন না করাই কূফার গণ মানুষের আমলে পরিণত হয়। শারহুল ইহয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

لا نعلم مصراً من الامصار تركوا باجماعهم رفع اليدين عند الحفض والرفع الا أهل الكوفة

আল্লামা মুরাদাবাদী (র) বলেন, উপরোক্ত দু'টি উদ্ধৃতির আলোকে সম্পূর্ণ যৌক্তিকভাবেই এমন দাবী করা যায় যে, স্বল্প কয়েকজন সাহাবী ব্যতীত জমহূর সাহাবা ও জমহূর তাবিঈন

৭৪. আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী, ফাতহুল মুলহিম, খ. ২, পৃ. ১৬।

www.pathagar.com

রাফে' ইয়াদাইন না করারই পক্ষে ছিলেন। তাঁদের এই ঐক্যমত উম্মতের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলীল।[৭৫]

রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন না করার হাদীস সনদের দিক থেকে বেশি শক্তিশালী। হাদীস গ্রন্থে রাফে' ইয়াদাইন করা ও না করা উভয় সমর্থনেই হাদীস বিদ্যমান। কোন বিষয়ে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে এ রকম ভিন্নতা দেখা গেলে মুহাদ্দিসগণের সাধারণ নিয়ম হল তখন প্রত্যেক হাদীসের সনদ মূল্যায়ন করা তাতে যেই হাদীসের সনদ বেশি শক্তিশালী সেটি অগ্রাধিকার দেওয়া। এই নিয়মের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় যে, রাফে' ইয়াদাইন না করা বিষয়ক হাদীসের সনদ তুলনামূলকভাবে অধিকতর শক্তিশালী।[৭৬]

এ ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের একটি বিতর্ক অনুষ্ঠানের ঘটনা উদ্ধৃত করা যায়। একবার ইমাম আযম আবূ হানীফা ও ইমাম আওযাঈ (র) হজ্জের মৌসুমে মক্কা মুকাররমায় একত্রিত হন। মক্কার 'দারুল হানাতীন' নামক স্থানে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়।[৭৭] ইমাম আওযাঈ প্রথমেই ইমাম আবূ হানীফাকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি রুকূ'তে যাওয়া ও রুকূ' থেকে উঠে রাফে' ইয়াদাইন করেন না কেন? ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বললেন, যেহেতু এ ক্ষেত্রে মহানবী (সা) থেকে বর্ণিত কোন সহীহ্ হাদীস অগ্রাধিকার যোগ্য বলে পাওয়া যায় না। আওযাঈ (র) বললেন, কেন পাওয়া যায় না? দেখুন নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَعِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ .

ইমাম যুহরী (র) সালিম আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শুরুর করার সময় রাফে' ইয়াদাইন করতেন এবং রুকূ'তে যাওয়া ও রুকূ' থেকে উঠার সময়ে।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বললেন, তাহলে আপনিও দেখুন নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ ﷺ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ﷺ اِلاَّ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ بِشَىْءٍ مِّنْ ذٰلِكَ .

হাম্মাদ (র), ইবরাহীম নাখঈ (র) আলকামা ইবন মাসঊদ (র) রাসূলুল্লাহ্ (সা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শুরু করার সময় ব্যতীত অন্যত্র রাফে' ইয়াদাইন করতেন না। অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার পর পুনঃ রাফে' ইয়াদাইন করতেন না।

---

৭৫. মাওলানা আবুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬।

৭৬. প্রাগুক্ত।

৭৭. আল্লামা বেন্নৌরী (র) লিখেছেন,
ذكر هذه المناظرة الامام السرخسى فى كتابه المبسوط ج : ١ ، ص : ١٤ وابن الهمام فى الفتح ، ج : ١ ، ص ٢١٩ والحارثى فى جامع المسانيد ، ج : ١ ، ص ٣٥٢ وغيرهم كما فى معارف السنن ، ج : ١ ، ص : ٤٩٩

www.pathagar.com

আওযাঈ (র) বললেন, আমার পেশকৃত সনদ আপনার পেশকৃত সনদ অপেক্ষা অধিক অগ্রাধিকার যোগ্য। কারণ আমার সনদে সাহাবী পর্যন্ত মাধ্যম মাত্র দুই জন। (যুহরী ও মালিক) তাই এটি উচ্চতর সনদ। পক্ষান্তরে আপনার সনদে মাধ্যম হল তিন জন। (হাম্মাদ, ইবরাহীম ও আলকামা) তাই এটি তুলনামূলক নিম্নতর। উচ্চতর সনদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে উচ্চতর সনদ অগ্রাধিকার পায়। কাজেই আমার পেশকৃত সনদ অগ্রাধিকার পাবে।

ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বললেন, কোন বক্তব্যের বিশুদ্ধতা কিংবা শুদ্ধতামান নিরূপণ করার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীদের সংখ্যা কম হওয়া কোন মৌলিক বিষয় নয়। মৌলিক বিষয় হল বক্তব্যটি যাঁরা বর্ণনা করেছেন তাঁরা কতটা প্রাজ্ঞ? বর্ণনাকারীগণ যতটা প্রজ্ঞাবান হবেন তাঁদের বর্ণনাও ততটা উচ্চমান সম্পন্ন হবে। এই তুলাদণ্ডে বিচার করে দেখুন আমার পেশকৃত সনদে তুলনামূলকভাবে অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবি রাখে। কেননা উপরোক্ত দু'টি সনদকে একত্রিত করে বিচার করলে দেখা যায় দ্বিতীয় সনদের হাম্মাদ প্রথম সনদের যুহরী থেকে অধিক প্রাজ্ঞ। অনুরূপে ইবরাহীম সালিম অপেক্ষা অধিক প্রাজ্ঞ। আবার আলকামা হযরত ইবন উমর (র) থেকে অধিক প্রাজ্ঞ। হযরত ইবন উমর সাহাবী, এ দিক থেকে তিনি তাবিঈ আলকামা থেকে শ্রেষ্ঠ ও অধিক মর্যাদা সম্পন্ন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা হল, মর্যাদা বেশি হওয়া ভিন্ন জিনিস আর প্রাজ্ঞ হওয়া ভিন্ন জিনিস। তাই দেখা গেল দ্বিতীয় সনদের মাধ্যমগুলো সকল স্তরেই প্রথম সনদের মাধ্যমগুলোর তুলনায় বেশি প্রাজ্ঞ। আর এই প্রাজ্ঞদের গোড়ায় আছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) যিনি উম্মতের ফকীহ হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত। যিনি তুলনাহীনভাবে দ্বিতীয় সনদে বিদ্যমান। ইমাম সারাখ্সী ও শায়খ ইবন হুমাম বলেন, ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করে নিজ সনদের তারজীহ ও অগ্রাধিকার খুব সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন।[৭৮]

উপরোক্ত বিতর্ক থেকে বুঝা গেল যে, গভীর দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যায় যে, রাফে' ইয়াদাইন না করা বিষয়ক হাদীসের বর্ণনাকারীগণ তুলনামূলক বেশি প্রাজ্ঞ বিধায় তাঁদের সনদ অধিক শক্তিশালী।

২১. পবিত্র কুরআনের একখানা আয়াত থেকেও অনুমান হয় যে, নামাযের রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন না করা উত্তম।

আয়াতটি হল,

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ .

"নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা নিজেদের নামাযে অবলম্বন করে খুশু।" (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১-২) মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে খুশু দ্বারা উদ্দেশ্য হল সেই স্থিরতা অবলম্বন যেদিকে মহানবী (সা) اسكنوا فى الصلوة বলে ইঙ্গিত করেছেন। 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে হাফিয ইবন হাজারও বলেছেন, খুশু কখনো হৃদয় সম্পর্কিত হয় তখন তাকে বলা হয় খাশিয়াহ (الخشية) আবার কখনো শরীর সম্পর্কিত হয় তখন তাকে বলা হয় সুকুন। (السكون) সাহাবীগণের নামাযে এই সুকুন পাওয়া যেত। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র

৭৮. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

www.pathagar.com

সম্পর্কে মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, اذا كان في الصلوة كانه عود । তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় কোন নড়াচড়াবিহীন স্থির দাঁড়িয়ে থাকতেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নামায সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বর্ণিত আছে। আলিমগণ বলেন, উপরোক্ত আয়াতে যেহেতু নামাযে স্থিরতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেহেতু সে সব কাজ থেকে বিরত থাকা উত্তম যেগুলি স্থিরতা বিনষ্ট করে দেয়। কেননা বার বার হস্ত উত্তোলন বা রাফে' ইয়াদাইন করা স্থিরতা পরিপন্থি।[৭৯]

মোটকথা উপরোক্ত একুশটি দলীল থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নামাযের রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন না করা উত্তম। এটিই অভিমত হল ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও হানাফী ফকীহগণের তাঁরা বর্ণিত হাদীস সমূহের ভিত্তিমূলে এ রায় গ্রহণ করেছেন।

অবশ্য হাদীস গ্রন্থে কতিপয় হাদীস এমনও আছে যেখানে রাফে' ইয়াদাইন করার পক্ষে অভিমত পাওয়া যায়। যেমন :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَاِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذَالِكَ .

أخرجه الامام البخارى تحت باب رفع اليدين اذا كبر واذا ركع واذا رفع ، والامام مسلم تحت باب إستحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام والركوع والرفع من الركوع ، والنسائى تحت باب رفع اليدين للركوع حذو المنكبين وأبو داؤد تحت باب رفع اليدين وابن ماجه تحت باب رفع اليدين اذا ركع واذا رفع راسه من الركوع وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه . ج : ٢ ، ص ٦٧)

হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা)-এর নিয়ম ছিল যে, তিনি যখন নামায শুরু করতেন তখন হস্তদ্বয় কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন। আবার যখন রুকূ'র জন্য তাক্‌বীর বলতেন এবং যখন রুকূ' থেকে মাথা তুলতেন তখনো অনুরূপ রাফে' ইয়াদাইন করতেন।[৮০]

এ হাদীস নির্দেশ করছে যে মহানবী (সা)-এর নামাযে রাফে' ইয়াদাইন ছিল। মহানবী রুকূ'তে যাওয়া ও রুকূ' থকে উঠে রাফে' ইয়াদাইন করতেন। কাজেই নামাযের রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন করা শরী'আত সম্মত।

---

৭৯. মাওলানা আবুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭।

৮০. ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ اذَا دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ

رواه الامام البخارى تحت باب رفع اليدين اذا قام من الركعتين . رقمه : ٧٣٩

হযরত নাফি (র) থেকে বর্ণিত যে, হযরত ইবন উমর (রা) যখন নামায শুরু করতেন তখন আল্লাহু আকবর বলে রাফে' ইয়াদাইন করতেন, তারপর سمع الله لمن حمده বলে রাফে' ইয়াদাইন করতেন, তারপর দুই রাকা'আত শেষ করে যখন উঠে দাঁড়াতেন তখনো রাফে' ইয়াদাইন করতেন। রাবী বলেন, হযরত ইবন উমর হাদীসখানা মহানবী (সা) পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতেন।[৮১]

এ হাদীসও নির্দেশ করছ যে, নামাযে যেভাবে তাকবীরে তাহরীমায় রাফে' ইয়াদাইন করা হয় তদ্রূপ রুকু'তে যাওয়া ও রুকূ' থেকে মাথা তুলেও রাফে' ইয়াদাইন করা হবে। ফকীহগণের মধ্যে ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ প্রমুখ এই হাদীসের ভিত্তিমূলেই নামাযে রাফে' ইয়াদফাইন করার পক্ষে মতামত দেন।[৮২]

যাহোক এ হাদীস ইতোপূর্বে বর্ণিত ২১ দলীলে পেশকৃত বক্তব্যের পরিপন্থি। তাই মুহাক্কিকগণ হাদীসখানার এমন কোন ব্যাখ্যা উদ্ভাবনে সচেষ্ট হন যদ্বারা হাদীসটি পূর্ববর্তী হাদীসসমূহের সাথে অভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হতে পারে।

বিশ্লেষক আলিমগণ বলেন, হানাফী ও শাফিঈ নির্বিশেষে সকলের মতেই হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীস যেমন অতি উচ্চমানের হাদীস তদ্রূপ হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (র) বর্ণিত হাদীসও অতি উচ্চমানের। উভয় হাদীসের সনদই 'সিলসিলাতুয যাহাব' উপাধিতে ভূষিত। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, উভয়ের বক্তব্য ভিন্ন বরং বিপরীতধর্মী।

দ্বিতীয়ত, উভয় হাদীসের বক্তব্য বিপরীতমুখী হলেও এই ইখতিলাফ জায়িয নাজায়িযের ইখতিলাফ নয় বরং উত্তম ও অনুত্তমের ইখতিলাফ। অর্থ হল যে, দুইখানা হাদীসের ভিত্তিতে দু'টি অভিমতের জন্ম। দু'টি অভিমতের সাথে আছেন দুইদল মুজতাহিদ উলামা। দুই দলের রায় পরস্পর বিরোধী হয়েও প্রত্যেক দল নিজের বিপরীত দলের রায়কে অন্যায় কিংবা ভুল মনে হয়েও প্রত্যেক দল নিজের রায়কে আফযাল ও প্রতিপক্ষের রায়কে জায়িয মনে করেন মাত্র।[৮৩]

তৃতীয়ত, মুহাদ্দিসগণের অনেকে ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসকে অগ্রাধিকার দিলেও উম্মতের যাঁরা ফকীহ, যাঁরা নুসূসের গুরুতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত তাঁরা ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসকে অগ্রাধিকার দিতে অসুবিধা কি ছিল তা নির্ণয় করে বলেন যে, হযরত উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য সুনির্দিষ্ট নয়, সেখানে প্রচুর বিভিন্নতা আছে তাই এটিকে অগ্রাধিকার

৮১. ইমাম বুখারী।

৮২. আল্লামা তাকী উসমানী, পৃ. ৪০।

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

www.pathagar.com

দেওয়া যায়নি। এখানে একই সূত্র থেকে প্রাপ্ত সবগুলো হাদীস একত্রিত করলে দেখা যায় মূল বক্তব্য ছয় রকমের। কোথাও রাফে' বলা হয়েছে রাফে' ইয়াদাইন করা হবে একবার, কোথাও বলা হয়েছে দুইবার, কোথাও তিনবার, কোথাও চারবার, কোথাও পাঁচবার আবার কোথাও পাঁচেরও অধিক। তাতে দেখা যায় মূল বক্তব্য ছয় রকমের হয়ে যাচ্ছে। একবার প্রসঙ্গে যেমন, এ-عن مجاهد قال صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه الا فى التكبيره الاولى من الصلوة হাদীস শারহু মা'আনিল আসার গ্রন্থে আছে। এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, নিশ্চয় হযরত ইবন উমর (রা)-এর নিকট কোন রাফে' ইয়াদাইন একবার প্রসঙ্গে কোন মারফূ' হাদীস বিদ্যমান আছে। নতুবা তিনি এমনটা আমল করতেন না। দেখা যায় যে, المدونة الكبرى গ্রন্থে ইমাম মালিক (র) হযরত উমর (রা) সূত্রে এমন একখানা মারফূ' হাদীস বর্ণনা করছেন যেখানে শুধু একবার অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার সময় রাফে' ইয়াদাইন করার কথা বলা হয়েছে। শাফিঈ মতাবলম্বী আলিম ইমাম বায়হাকী خلافيات গ্রন্থে হযরত ইবন উমর সূত্রে এমন একখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন যেখানে মাহানবী (সা) তাকবীরে তাহরীমার সময়ে মাত্র রাফে' ইয়াদাইন করেছেন, পরে আর করননি মর্মে صراحة বলে দেওয়া আছে।[৮৪]

অনুরূপে দুই বার প্রসঙ্গে যেমন মু'আত্তা গ্রন্থে ইমাম মালিক হযরত ইবন উমর (রা) সূত্রে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন,

ان رسول الله ﷺ كان اذا افتتح الصلوة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذالك .

রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শুরুর সময়ে কাঁধ বরাবর রাফে' ইয়াদাইন করতেন। আবার রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে অনুরূপে রাফে' ইয়াদাইন করতেন।[৮৫]

এখানে দেখা যায় রাফে' ইয়াদাইন নামাযে দুই বার হবে। একবার তাকবীরে তাহরীমার সময়ে। আরেকবার রুকূ' থেকে উঠার পর। এ হাদীসও হযরত ইবন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। উল্লেখ্য এখাতে রুকূ'তে যাওয়ার সময় রাফে' ইয়াদাইন করার কথা বলা হয়নি।

অনুরূপে তিনবার প্রসঙ্গে রিওয়ায়াত যেমন সিহাহ গ্রন্থে আছে ঃ

عن ابن عمر رضى الله عنه قال رأيت رسول الله ﷺ اذا افتتح الصلوة يرفع يديه حتى يحاذى منكبيه واذا ركع واذا رفعه الخ

এ হাদীস হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তাই নির্দেশ করছে যে, নামাযে রাফে' ইয়াদাইন হবে তিনবার। একটি তাকবীরে তাহরীমার সময়, একটি রুকূ'তে যাওয়ার সময় আর একটি রুকূ' থেকে উঠে।

---

৮৪. আল্লামা বিন্নৌরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭৩। আল্লামা যায়লাঈ (র) বলেন,
وأخرجه البيهقى فى الخلافيات عن عبد الله بن عون الخراز ثنا مالك عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما ان النبى ﷺ كان يرفع يديه اذا افتتح الصلوة ثم لا يعود ، كذا فى نصب الراية ج ١ ، ص ٢١٠

৮৫. ইমাম মালিক, আল মু'আত্তা, বাবু ইফতিতাহিস সালাত, পৃ. ৫৯।

www.pathagar.com

অনুরূপে চারবার প্রসঙ্গে রিওয়ায়াত যেমন সহীহ্ বুখারীর হাদীস ঃ[৮৬]

ان ابن عمر رضى الله عنه كان اذا دخل فى الصلوة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يده واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر رضى الله عنه الى النبى ﷺ ، بخارى رقمه : ٧٣٩

এ হাদীসে দেখা যায় নামাযে রাফে' ইয়াদাইন হবে চারবার। পূর্বোক্ত তিনবার তো আছেই। অতিরিক্ত আরো একবার হল اذا قام من الركعتين অর্থাৎ দুই রাকা'আত শেষে প্রথম বৈঠক শেষ করে উঠে দাঁড়ানোর সময়ে। এটিও হযরত ইবন উমর থেকেই বর্ণিত।

পাঁচ বার প্রসঙ্গে রিওয়ায়াত যেমন স্বয়ং ইমাম বুখারী নিজের جزء رفع اليدين গ্রন্থে হযরত ইবন উমর (রা) থেকে এমন একখানা হাদীস পেশ করেন যেখানে সিজ্‌দায় গমনের সময়েও রাফে' ইয়াদাইনের কথা বলা হয়েছে। অনুরূপ রিওয়ায়াত ইমাম তাবারানী 'আল মু'জামুল আওসাত' গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন।[৮৭] যেমন ঃ

عن ابن عمر رضى الله عنه ان النبى ﷺ كان يرفع يديه عند التكبير للركوع وعند التكبير حين يهوى ساجداً .

হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা) রুকূ'র জন্য আল্লাহু আকবার বলার সময়ে রাফে' ইয়াদাইন করতেন এবং যখন সিজ্‌দার জন্য আল্লাহু আকবার বলে নিচের দিকে ঝুঁকতেন তখনো রাফে' ইয়াদাইন করতেন।

হাদীসখানা থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, সিজ্‌দায় গমনকালেও রাফে' ইয়াদাইন করা হবে। এভাবে নামাযে রাফে' ইয়াদাইনের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে পাঁচ বার। ১. তাকবীরে তাহরীমার সময়, ২. রুকূ'তে যাওয়ার সময়, ৩. রুকূ' থেকে উঠার পর, ৪. তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়ানোর সময়, ৫. সিজ্‌দায় গমনের সময়।

পাঁচের অধিকবার প্রসঙ্গে রিওয়ায়াত যেমন ইমাম তাহাভী 'মুশকিলুল আসার' গ্রন্থে এই হযরত ইবন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত একটি মারফূ' হাদীসে উদ্ধৃত করেন, عند كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين বুঝা গেল যে, ইবন উমর বর্ণিত রিওয়ায়াতে পাঁচের চেয়েও অধিক বার রাফে' ইয়াদাইন করার কথাও বলা হয়েছে।[৮৮]

আল্লামা তাকী উসমানী বলেন, রাফে' ইয়াদাইনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত ছয় রকম পদ্ধতির সবগুলোই হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। সবগুলোই সনদের দিক থেকে অতি উচ্চমানের না হলেও অন্তত দলীল হিসাবে পেশ যোগ্য তাতে সন্দেহ নেই। এই ছয় পদ্ধতির মধ্যে ইমাম শাফিঈ (র) যেমন কেবল একটি গ্রহণ করে অবশিষ্ট পাঁচটি ছেড়ে দেন, তেমনি ইমাম আবূ হানীফা (র) ও একটিকে গ্রহণ করে অবশিষ্ট পাঁচটি ছেড়ে দেন। দুঃখের বিষয় যে,

৮৬. ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং ৭৩৯।

৮৭. আল্লামা বিন্নোরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৪।

৮৮. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ইমাম শাফিঈ (র) প্রমুখ অবশিষ্ট পাঁচটি ছেড়ে দিয়েছেন তাতে কেউ শোর তোলে না। শোর তোলে ইমাম আবূ হানীফার উপর যে, তিনি হাদীস ছেড়ে দিয়েছেন।[৮৯]

ইমাম শাফিঈ (র) বর্ণিত ছয় পদ্ধতির তৃতীয়টি গ্রহণ করে বলেন যে, রাফে' ইয়াদাইন তিনবার করা হবে। তিনি এই একটি গ্রহণ করে বাকী পাঁচটি যে ছেড়ে দিলেন তার যেমন কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা তিনি দেননি, তেমনি তাঁর তৃতীয় পদ্ধতি গ্রহণের দ্বারা হযরত ইবন উমর বর্ণিত অভিমতের সাথে সাহাবী হযরত ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত অভিমতের কোন সমন্বয় সাধিত হয় না। পক্ষান্তরে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বর্ণিত ছয় পদ্ধতির প্রথমটি গ্রহণ করে বলেন যে, রাফে' ইয়াদাইন করা হবে মাত্র একবার। অবশিষ্ট পাঁচটি পদ্ধতি তিনি কেন ছেড়ে দিয়েছেন তাঁর যেমন উপযুক্ত ব্যাখ্যা তিনি পেশ করেছেন তেমনি তাঁর এ অভিমত গ্রহণের দ্বারা সাহাবী ইবন উমর (রা) বর্ণিত অভিমত ও সাহাবী ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত অভিমতের সুন্দর সমন্বয়ও সাধিত হচ্ছে--এটি কি উত্তম ব্যবস্থা নয়?[৯০]

হানাফী ফকীহগণ বলেন, নামায সংক্রান্ত সামগ্রিক বিষয়াদি সামনে রেখে অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, নামাযের ভিতরে অবস্থিত কাজগুলো শুরু থেকেই ক্রমে হরকত (নড়ছড়া) থেকে সুকুনের (স্থিরতা) দিকে পরিবর্তিত হতে থাকে। যেমন প্রথম দিকে নামাযে হাটাহাটির সুযোগ ছিল পরে সেটি রহিত হয়ে যায়। এভাবে পরস্পর কথাবলার অনুমতি ছিল পরে রহিত হয়ে যায়। এদিক সেদিক তাকানোর অনুমতি ছিল পরে রহিত হয়ে যায়। এই গতিশীলতা থেকে অনুমান মেলে যে, শুরু কালে নামাযে রাফে' ইয়াদাইনও ছিল অসংখ্য। প্রত্যেক পরিবর্তনের গোড়ায়ই তখন রাফে' ইয়াদাইন করা হত। রাফে' ইয়াদাইন করার মধ্যেও যেহেতু হরকত বিদ্যমান সেহেতু এটির সংখ্যা ধীরেধীরে কমিয়ে সুকূন বৃদ্ধি করার উদ্যোগ চলে। তাই এই সংখ্যা কমিয়ে পাঁচ, চার, তিন, দুই হয়ে সবশেষে মাত্র একবারের বিধান চূড়ান্ত করা হয়। আর এই একবারের বিধানটি যেমন হযরত ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীসে বিদ্যমান তেমনি হযরত ইবন উমর বর্ণিত হাদীসেও বিদ্যমান।[৯১]

এই বক্তব্যের উপর জনৈক শাফিঈ আলিম অভিযোগ করে বলেন[৯২] যে, সুনানে বায়হাকী গ্রন্থে হযরত ইবন উমর (রা) থেকে একটি বর্ণনা নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত আছে ঃ

عن ابن عمر رضى الله عنه ان رسول الله ﷺ كان اذا افتتح الصلوة رفع يديه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع وكان لا يفعل ذالك فى السجود فما زالت تلك صلوته حتى لقى الله تعالى ·

---

৮৯. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, যপৃ. ৪১।

৯০. প্রাগুক্ত।

৯১. প্রাগুক্ত।

৯২. মাওলানা রশীদ আশরাফ সাইফী লিখেছেন ঃ
ذكره النيموى فى اثار السنن فى صفحة ١٠٢٠١٠١ باب ما استدل به على ان رفع اليدين فى الركوع واطلب عليه النبى عليه السلام ما دام حيًا نقلا عن السنن الكبرى للبيهقى ، وقال رواه البيهقى وهى حديث ضعيف بل موضوع كما فى حاشية درس الترمذى ج ٢ ، ص ٤١

www.pathagar.com

হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শুরু করার সময়ে রাফে' ইয়াদাইন করতেন। তারপর রুকূ' করার সময় ও রুকূ' থেকে মাথা তোলার সময় রাফে' ইয়াদাইন করতেন। তবে তিনি সিজ্‌দায় রাফে' ইয়াদাইন করতেন না। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামাযের এ পদ্ধতি ওফাত পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় মহানবী (সা)-এর সর্বশেষ গৃহীত পদ্ধতি ছিল নামাযে তিনবার রাফে' ইয়াদাইন করা। এটি সর্বশেষ আমল হিসাবে এটিই হল নাসিখ আর অবশিষ্ট পাঁচ পদ্ধতি হল মানসূখ।

বিশেষজ্ঞ আলিমগণ বলেন, বায়হাকী বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের فما زالت تلك صلوته حتى لقى الله تعالى অংশটি চরম পর্যায়ের দুর্বল বরং বানোয়াট। কেননা এটি বর্ণনা করছেন রাবী আসমা ইবন মুহাম্মদ আনসারী ও রাবী আবদুর রহমান ইবন কুরায়শ। রাবীদের মধ্যে এই দুই জন চরম পর্যায়ের দুর্বল বরং হাদীস বানোয়াট করার অভিযোগে অভিযুক্ত। কাজেই তাঁদের কাছ থেকে বর্ণিত হাদীসের কোনই মূল্য নেই।[৯৩] তাছাড়া যুক্তির নিরিখেও তাদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য বিবেচিত নয়। কেননা অত্যন্ত বলিষ্ঠ সূত্রে এ কথা বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবন উমর (রা) মহানবী (সা)-এর ওফাতের পর নামাযে রাফে' ইয়াদাইন একবার শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় করেছেন। বর্ণিত বারীদ্বয়ের কথা যদি ঠিক হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পর ইবন উমর (রা) একবার রাফে' ইয়াদাইনের নামায আদায় কোনক্রমেই সম্ভব হতো না। রাফে' ইয়াদাইন করার প্রসঙ্গে আরো একখানা হাদীস, যেমন ঃ

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ لَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى حَاذَتَا اُذُنَيْهِ ثُمَّ اَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذٰلِكَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذٰلِكَ . رواه أبو داؤد .

হযরত ওয়াইল ইবন হুজ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা) একদা কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে রাফে' ইয়াদাইন করলেন। এতটুকু যে, তাঁর হস্তদ্বয় কান বরাবর হয়ে গিয়েছিল। তারপর ডানহাত দিয়ে বাম হাত চেপে ধরলেন। অতঃপর রুকূ'তে যাওয়ার সময় অনুরূপ রাফে' ইয়াদাইন করলেন। অতঃপর রুকূ' থেকে মাথা তুলে অনুরূপ রাফে' ইয়াদাইন করলেন।[৯৪]

সাহাবী হযরত ওয়াইলের উপরোক্ত হাদীস নির্দেশ করছে যে, নামাযের মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়াও রুকূ'তে যাওয়া ও রুকূ' থেকে উঠে রাফে' ইয়াদাইন করতে হয়। এ হাদীস হযরত ইবন উমর (রা) বর্ণিত ছয় পদ্ধতির মধ্যে তৃতীয় পদ্ধতির সমর্থন করছে। কিন্তু হযরত ইবন উমর (রা) বর্ণিত অবশিষ্ট পাঁচ পদ্ধতি ও হযরত ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত পদ্ধতির বিপরীত বক্তব্য পেশ করছে।

---

৯৩. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

৯৪. ইমাম আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

বিশেষজ্ঞ আলিমগণ বলেন, হযরত ওয়াইল (রা)-এর হাদীস দলীল হওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু এ হাদীসকে হযরত ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া যায় না। কারণ হযরত ওয়াইল (রা) তুলনায় হযরত ইবন মাসউদ (রা) বহু দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। ইসলাম গ্রহণের দিক থেকে তিনি প্রবীণ আর হযরত ওয়াইল এতটা অভিজ্ঞ হতে পারেননি। কেননা হযরত ওয়াইল (রা) মুসলমান হন হিজরী নবম সালে। ততদিনে হযরত ইবন মাসউদ মুসলমান হওয়ার ২২ বছর অতিক্রম হয়ে গিয়েছে। হযরত ইবন মাসউদ (রা) গোড়া থকেই বিজ্ঞ ফকীহ্ হিসাবে সাহাবীগণের মধ্যে স্বীকৃত ছিলেন অথচ হযরত ওয়াইলের সেই পরিচিতি ছিল না। এসব কারণেই একদা রাবী মুগীরা এ হাদীস বর্ণনা করলে ইব্রাহীম বললেন, যদি হযরত ওয়াইল (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একবার রাফে' ইয়াদাইন করতে দেখেছেন তাহলে হযরত ইবন মাসউদ (রা) মহানবী (সা)-কে রাফে' ইয়াদাইন বাদ দিয়ে নামায পড়তে দেখেছেন অন্তত পঞ্চাশবার। কাজেই হযরত ওয়াইলের তুলনায় হযরত ইবন মাসউদ (রা) বক্তব্যই অগ্রগণ্য হবে বেশি।[৯৫]

আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (র) 'বাযলুল মাজহূদ' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন যে, হযরত ওয়াইল থেকে উপরোক্ত হাদীস কয়েক সূত্রে হল عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل এই সূত্রে থেকে রিওয়ায়াত করেন দুই জন। শরীক ও বিশর। শরীক যা রিওয়ায়াত করেছেন তা বিশুদ্ধ কিন্তু সেখানে রুকূ'র সময় রাফে' ইয়াদাইন করার কথাটি উল্লেখ নেই। তবে বিশ্র ইবনুল মুফাযযাল যা বর্ণনা করেছেন তাতে রাফে' ইয়াদাইনের কথা উল্লেখ আছে। যা হোক তাদের উস্তাদ 'আসিম'-কে 'তাহাযীবুত তাহযীব' গ্রন্থে সিকা বলে উল্লেখ করা হলেও রিজাল শাস্ত্রের সুপণ্ডিত আলী ইবনুল মাদীনীর একটি মন্তব্য বলা হয় যে, আসিম দলীল হিসাবে পেশ যোগ্য রাবী নয়।[৯৬]

হাদীসটির অপর সূত্র হল عن عبد الجبار عن ابيه এই সূত্রে হাদীসটি মুরাসাল। একটি সূত্র হল عن عبد الجبار عن اهل بيته এ সূত্রের রাবীগণ অপরিচিত। একটি সূত্র হল عن عبد الجبار عن وائل بن علقمة عن وائل بن حجر এই সূত্রে প্রমাদ হল যে, এখানে وائل بن علقمة বলা হয়েছে। আসলে কথা হবে علقمة بن وائل। মোটকথা হযরত ওয়াইল থেকে বর্ণিত হাদীসটি পরবর্তী কালে সুষ্ঠু সনদ প্রাপ্ত হয়নি বিধায় অনেকে এটিকে দলীল যোগ্যও মনে করেন না। এমতাবস্থায় এটিকে হযরত ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত 'সিলসিলাতুয যাহাব' বিশিষ্ট হাদীসের উপর অগ্রাধিকার দেওয়ার কোন সুযোগ নেই।[৯৭]

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذٰلِكَ اِذَا قَضٰى قِرَاتَهُ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَيَصْنَعُ اِذَا فَرَغَ وَرَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ ، الحديث أخرجه الطحاوى .

---

৯৫. আল্লামা আইনী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯; ইমাম তাহাভী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৩৩।

৯৬. আল্লামা সাহারানপুরী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪।

৯৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর নিয়ম ছিল তিনি যখন ফরয নামায পড়তে দাঁড়াতেন তখন আল্লাহু আকবার বলে হস্তদ্বয় কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন। তারপর যখন কিরা'আত শেষ হত এবং তিনি রুকূ'তে যেতেন তখনও অনুরূপ করতেন। অনুরূপ করতেন যখন তিনি রুকূ' শেষ করে উঠে দাঁড়াতেন তখনো।[৯৮]

এ হাদীস থেকেও বুঝা যায় যে, রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন আছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, এ হাদীস সনদের দিক থেকে দুর্বল অধিকন্তু স্বয়ং হযরত আলী (রা) থেকে এর বিপরীত বক্তব্য বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী সনদে বর্ণিত আছে। যেমন ঃ

ان عاصم بن كليب روى عن أبيه ان عليا رضى الله عنه كان يرفع يديه فى أول تكبيرة من الصلوة ثم لا يرفع بعد . رواه الطحاوى وأبو بكر بن أبى شيبة فى مصنفه واسناده جيد صحيح على شرط مسلم

এখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমল সম্পর্কে হযরত আলীর বর্ণনা যা ইতোপূর্বে পেশ করা হল সেটি এবং হযরত আসিম থেকে বর্ণিত হযরত আলীর আমল--দু'টিকে একত্রিত করে চিন্তা করলে বলতে হবে যে, নিশ্চয় হযরত আলী (রা)-এর নিকট কোন নাসিখ (রহিতকারী) অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। নতুবা নবী (সা)-কে রাফে' ইয়াদাইন করতে দেখেও তিনি নিজে রাফে' ইয়াদাইন বাদ দিবেন তা চিন্তা করা যায় না।[৯৯]

ইমাম তাহাভী (র) বলেন,

وصح عن على رضى الله عنه ترك الرفع فى غير التكبيرة الاولى فاستحال ان يفعل على رضى الله عنه ذلك الترك بعد النبى ﷺ الا بعد ثبوت النسخ عنده .

তাছাড়া হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত এ হাদীসের সূত্রে আবদুর রহমান ইবন আবুয যিনাদ নামক একজন রাবী রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইমাম আহমদ 'মুযতারাবুল হাদীস' বলে অভিযোগ করেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইমাম আবূ হাতিম বলেছেন তার হাদীস দলীল হিসাবে পেশযোগ্য নয়।

আরো বলা যায় যে, হযরত আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত এ হাদীসকে যদি দলীলযোগ্য বলে মেনে নেয়াও হয় তাহলে যারা মেনে নিচ্ছেন তারা কি হাদীসখানার পূর্ণ বক্তব্যের উপর আমল করেন? কেননা সেই হাদীসে আছে, واذا قام من السجودتين رفع يديه كذالك كما فى الطحاوى অর্থাৎ সিজদা থেকে উঠে দাড়ানোর পরও রাফে' ইয়াদাইন করা। এটি তো দলীল হিসাবে গ্রহণ কারীরাও আমল করেন না। বুঝা গেল, এক পর্যায়ে তাঁরাও হাদীসটিকে সর্বাংশে দলীলযোগ্য মনে করেন না।[১০০]

---

৯৮. ইমাম তাহাভী, প্রাগুক্ত।

৯৯. মাওলানা আবুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮।

১০০ আল্লামা সাহারানপুরী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩।

www.pathagar.com

وَفِىْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى تُحَاذِىْ بِهِمَا مَنْكَبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَاُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَاْسَهُ فَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ . رواه أبو داؤد والطحاوي .

একখানা দীর্ঘ হাদীসে আছে, হযরত আবূ হুমায়দ আস সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা)-এর নিয়ম ছিল যে, তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন নিজের হস্তদ্বয় কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন। তারপর আল্লাহু আকবার বলতেন। তারপর কিরা'আত পড়তেন। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। তারপর রুকূ' করতেন। তারপর মাথা তুলে বলতেন سمع الله لمن حمدة। তারপর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।[১০১]

এ হাদীস স্পষ্ট নির্দেশ করছে যে, রুকূ'তে যাওয়া ও রুকূ' থেকে দাঁড়িয়ে রাফে' ইয়াদাইন করা হবে। মহানবী (সা) নিজ নামাযে এই রাফে' ইয়াদাইন করেছেন।

হযরত আবূ হুমায়দ (র) বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ বলেন, হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (র) বর্ণনা করেছেন একাধিক সূত্র থেকে। তন্মধ্যে কোন সূত্রই শক্তিশালী কিংবা সুস্পষ্ট নয়। যেমন একটি সূত্রে হল ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র)-এর সূত্র। এই সূত্রটি শক্তিশালী হলেও তাতে রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন করার বক্তব্য উল্লেখ আছে আবদুল হামীদ ইবন জাফর সূত্রে। কিন্তু আবদুল হামীদ নিজে হলেন দুর্বল রাবী। মুহাদ্দিগণ তার সূত্রে বর্ণিত হাদীস গ্রহণে আপত্তি করেছেন। কাজই এটিকে দলীল হিসাবে পেশ করা যায় না।[১০২]

মোটকথা হল, উপরে মোট পাঁচখানা হাদীস বর্ণিত হয়েছে যেগুলো থেকে রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন করার প্রমাণ মেলে। কিন্তু এ হাদীসগুলো গভীর দৃষ্টিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এগুলোর কোনটিই হয়ত দলীলযোগ্য বিবেচিত হতে পারে না কিংবা দলীলযোগ্য বিবেচিত হলেও হযরত ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে উচ্চতর মানসম্পন্ন বিবেচিত হয় না। আর এ কারণেই হানাফী ফকীহগণ বর্ণিত পাঁচ হাদীসকে প্রাধান্য দেননি।

হাদীস ও ফিকহের সুপণ্ডিত হযরত মাওলানা আবুল হাসান চাটগামী (র) বলেন, যতগুলো হাদীসে রাফে' ইয়াদাইন করার পক্ষে অভিমত পাওয়া যায় তার সবগুলোই বস্তুত মানসূখ ও রহিত হয়ে গিয়েছে। যেমন হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে এটি বুঝা যায়। তিনি বলেছেন,

كان النبى ﷺ يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع ثم صار إلى افتتاح الصلوة وترك الصلوة وترك ما سوى ذلك .

১০১. দ্র. সুনান আবূ দাঊদ ও শারহু মা'আনিল আসার।

১০২. আল্লামা আইনী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯; ইমাম তাহাভী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৩৩ ; আল্লামা সাহারানপুরী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫।

www.pathagar.com

মহানবী (সা) নামাযের প্রত্যেক ঝুকা ও উঠার মধ্যেই রাফে' ইয়াদাইন করতেন। তারপর এটি স্থিরতা লাভ করে শুধু তাকবীরে তাহরীমায় গিয়ে। এবং অবশিষ্টগুলো তিনি ক্রমান্বয়ে ছেড়ে দেন।[১০৩]

বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) বর্ণিত হাদীসে। সেখানে আছে ঃ

انه رای رجلا يرفع يديه من الركوع فقال مه كان هذا شئ فعله النبى ﷺ ثم تركه .

তিনি জনৈক ব্যক্তিকে রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন করতে দেখে বলেন, থামো, এটি করো না। কেননা এটি মহানবী (সা) এক সময় করতেন পরে ছেড়ে দেন। এ হাদীসদ্বয় থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইনের বিষয়টি মানসূখ (রহিত) হয়ে গিয়েছে।[১০৪]

তাছাড়া ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, হযরত উমর, হযরত ইবন উমর, হযরত আলী (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ রাফে' ইয়াদাইন করা বিষয়ক হাদীসের বর্ণনাকারী। অথচ তাঁদের ব্যক্তিগত আমল ছিল রাফে' ইয়াদাইন না করা। তাতে বুঝা যায় যে, অবশ্যই তাঁদের কাছে কোন নাসিখ বিদ্যমান ছিল। নতুবা তারা নিজের বর্ণনার ব্যতিক্রম আমল করতেন না।[১০৫]

হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান (র) বলেন, সকল ফকীহ এ কথা স্বীকার করেন যে, শরী'আতের কোন কোন বিধান সংকীর্ণতা থেকে ক্রমে প্রশস্থতার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যেমন কুকুর সংক্রান্ত মাস'আলা ও মদের বোতল ব্যবহার সংক্রান্ত মাস'আলা। এ সব ক্ষেত্রে বিধান প্রথমে খুব সংকীর্ণ ছিল। পরে ক্রমে তাতে বিভিন্ন প্রশস্থতার অবকাশ দান করা হয়। আবার কোন কোন বিধান হল এর বিপরীত। অর্থাৎ প্রশস্থতা থেকে ক্রমে সংকীর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নামাযে রাফে' ইয়াদাইন করা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বিধান। তাই দেখা যায়, প্রথম দিকে প্রত্যেক উঠা বসার মধ্যে রাফে' ইয়াদাইন করার বিধান ছিল। كما فى رواية أخرجها الطحاوى তারপর ক্রমান্নয়ে রাফে' ইয়াদাইন করার সংখ্যা সীমিত হতে থাকে। এভাবে সীমিত হয়ে মাত্র তিনটি স্থানে রাফে' ইয়াদাইন করার বিধান দেওয়া হয়। তারপর তাতেও সংখ্যা কমানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত মাত্র একস্থানে রাফে' ইয়াদানের বিধান দেওয়া হয়। كما يدل عليه روايات كثيرة صحيحة صريحة যেহেতু বিধানটি প্রশস্থতা থেকে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে সংকীর্ণতার চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। যেহেতু মুজতাহিদগণও নিজ নিজ দক্ষতা অনুসারে চিন্তা ও দর্শনের প্রশস্থতা থেকে ক্রমে চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে এসেছেন। এ থেকে প্রত্যেক মুজতাহিদের চিন্তার গভীরতাও স্পষ্ট হয়ে যায়। তাই দেখা যায় যে, মুজতাহিদগণের কেউ তো শুরু বিন্দুতেই দাঁড়িয়ে আছেন। যেমন আল্লামা ইবন হাযাম যাহিরী। তিনি প্রত্যেক তাকবীরের মধ্যে রাফে' ইয়াদাইন করার মতামত দিয়েছেন। এই অভিমত প্রশস্থতম অভিমত। তার চেয়ে আরেকটু সংক্ষিপ্ত অভিমত হল আল্লামা ইবনুল মুনযির প্রমুখ আলিমের। কেননা

---

১০৩. তানযীমুল আশতাত, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৮।

১০৪. প্রাগুক্ত।

১০৫. আল্লামা আইনী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৮।

www.pathagar.com

তিনি রাফে' ইয়াদাইন পাঁচ বার করার পক্ষে রায় দিয়েছেন। তার চেয়ে আরেকটু সংক্ষিপ্ত হল ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল প্রমুখ ফকীহগণের। কেননা তাঁরা রাফে' ইয়াদাইন করা তিন বারের পক্ষে মত দিয়েছেন। আর সম্পূর্ণ চূড়ান্ত পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত হল ইমাম আযম আবূ হানীফার অভিমত। তিনি ইমাম হিসাবে যেমন সকলের শীর্ষ স্থানীয় তেমনি তাঁর অভিমতও হল শীর্ষ স্থানীয়। তিনি বলেছেন যে, রাফে' ইয়াদাইন হবে একবার। আর সেটি হল তাকবীরে তাহরীমার সময়ে। কেননা সংক্ষেপ করার চূড়ান্ত পর্যায় হল মাত্র একবার করা।[১০৬]

হযরত মাওলানা তাকী উসমানী বলেন, রাফে' ইয়াদাইন প্রসঙ্গে গবেষক আলিমগণের মতবিরোধ ও বিতর্ক নিছক একটি ইল্‌মী বিষয়। এই বিতর্কের দ্বারা ইলমী তাহকীকাত বৃদ্ধি পায় তবে বাস্তবে এর ফলাফল তেমন কিছু নেই। কেননা এটি উত্তম অনুত্তমের ইখতিলাফ মাত্র। জায়িয নাজায়িযের ইখতিলাফ নয়। এ কারণে এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল وجوه الترجيح। অর্থাৎ সে সব দিক যেগুলোর কারণে এক অভিমতকে অপর অভিমতের উপর প্রাধান্য দেওয়া যায়।[১০৭]

তিনি বলেন, বিস্তারিত আলোচনায় দলীল ও মূল উপাত্ত হিসাবে বিভিন্ন হাদীস উত্থাপিত হলেও মৌলিক হাদীস হল দু'টি। একটি হযরত ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীস আর অপরটি হযরত ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীস উভয়ই উচ্চ পর্যায়ের বিশুদ্ধ হাদীস। হাদীসদ্বয় নিয়ে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। তারপর নিম্নোক্ত কয়েকটি দিক থেকে বিবেচনা করে তাঁরা হযরত ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীসকে হযরত ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।[১০৮]

এক. হযরত ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীসে রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন না করার কথা বলা হয়েছে। রাফে' ইয়াদাইন না করার এই বর্ণনাগুলো পবিত্র কুরআনের নির্দেশের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে; وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ এবং তোমরা নামাযে দাঁড়াও একান্তে আদবের সাথে। এই নির্দেশের স্বভাবিক চাহিদা হল নামাযের মধ্যে নড়াচড়া যথাসম্ভব যেন কম হয়। আয়াতের এ মূলনীতি সামনে রেখে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তুলনামূলকভাবে হযরত ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীস আয়াতের অধিক নিকটবর্তী। তাই এটি ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসের উপর প্রাধান্য পাওয়ার উপযুক্ত।

দুই. হযরত ইবন মাসঊদ (রা)-এর হাদীসে কোন ইখতিলাফ বা ইযতিবার নেই এবং তাঁর আজীবনের আমল কখনো নিজ বক্তব্যের ব্যতিক্রম ছিল না। তিনি বরাবরই রাফে' ইয়াদাইন না করার আমল করে গিয়েছেন। পক্ষান্তরে হযরত ইবন উমর (রা)-এর হাদীসে ছয় প্রকারের ইখতিলাফ পাওয়া যায়। তা ছাড়া তার ব্যক্তিগত আমলও যেমন রাফে' ইয়াদাইন করেছেন বলে পাওয়া যায়, তেমনি করেননি বলেও পাওয়া যায়। ইখতিলাফ ও ইযতিরাবের কারণে

১০৬. মাওলানা আবুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮-২৯৯।

১০৭. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

১০৮. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

রিওয়ায়াতের ওযন কমে যা বিধায় ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসের উপর ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীস প্রাধান্য প্রাপ্তির দাবি রাখে।[১০৯]

তিন. হাদীসের মধ্যে যখন পারস্পরিক বৈপরীত্য দেখা দেয় তখন এই বৈপরীত্য নিরসনের উপায় হল تعامل صحابه বা সাহাবীগণের সাধারণ আমল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করণে দেখা যায়, সাহাবীগণের মধ্যে যারা বয়স্ক, ধীমান, বিচক্ষণ এবং মহানবী (সা)-এর দীর্ঘকালের ঘনিষ্ট সাহাবী যেমন হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত ইবন মাসঊদ (রা) প্রমুখ তাঁদের আমল ছিল রাফে' ইয়াদাইন না করা। পক্ষান্তরে যাঁরা এ সব বিশেষণে বিভূষিত ছিলেন না তাঁদের আমল ছিল রাফে' ইয়াদাইন করা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত ইবন উমর, হযরত ইবন যুবায়র প্রমুখ। প্রথমোক্ত সাহাবীগণকে উলূমে সাহাবার খোলাসা জ্ঞান করা হয়। অতএব ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীস প্রথমোক্ত সাহাবীদের আমলের সাথে মিলে যাচ্ছে বিধায় এটিকে ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়।

চার. হাদীসের মধ্যে পারস্পরিক ইখতিলাফ দেখা দিলে তা নিরসন করা ও উত্তম দিক কোনটি তা খুঁজে পাওয়ার আরেকটি উপায় হল মদীনাবাসীর সাধারণ আমল (تعامل أهل المدينة) এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা। কেননা মদীনাবাসীরা গোড়া থেকেই মহানবী (সা)-এর সুহবত প্রাপ্ত। তা ছাড়া মদীনায় সর্ব সাধারণের মধ্যে যেই সভ্যতা ও আমলী জীবন পদ্ধতি গড়ে উঠেছে তার নির্মাতা ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)। এটিই পরবর্তীকালে পুরুষানুক্রমিকভাবে পরবর্তীদের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, মদীনা ও কূফার মানুষের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন না করা। তাঁদের এই تعامل তথা সাধারণ আমল যেহেতু হযরত ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীসের সমর্থন করছে সেহেতু ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীসকে ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতে হয়।[১১০]

পাঁচ. ইসলামে নামায বিধিবদ্ধ হওয়ার যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, নামাযকে নড়াছড়া ও হরকতের পরিস্থিতি থেকে ক্রমে স্থিরতা ও সুকূনের দিকে পরিবর্তিত করা হয়েছে। নামাযকে বিধিবদ্ধ করার এই প্রক্রিয়াও হযরত ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীসকে সমর্থন করছে বিধায় এটিকে হযরত ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতে হয়।[১১১]

ছয়. এটা স্পষ্ট যে, রাফে' ইয়াদাইন না করার মধ্যে সুকূন (স্থিরতা) পাওয়া যায় তেমনি রাফে' ইয়াদাইন করার মধ্যে আছে হযরত (নড়াচড়া)। নামাযে যথাসম্ভব সুকূনকে অবলম্বনের জন্য বহু হাদীসে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। যেমন সহীহ মুসলিম বর্ণিত হযরত জাবির ইবন সামুরা (রা)-এর নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত ঃ

---

১০৯. প্রাগুক্ত।

১১০. আল্লামা বিন্নৌরী, প্রাগুক্ত।

১১১. মাওলানা আবুল হাসান, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

قال أخرج علينا رسول الله ﷺ فقال ما لى اراكم رافعى أيديكم كأنها اذناب خيل شموس ، اسكنوا فى الصلوة .

এ হাদীস যদিও প্রধানত সালামের সময় রাফে' ইয়াদাইন না করা প্রসঙ্গে। তবুও হাদীসখানার মধ্যে এ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একটি মূলনীতি পাওয়া যায়। তা হল اسكنوا فى الصلوة বলে মহানবী (সা) রাফে' ইয়াদাইনকে নামাযে স্থিরতার বিপরীত সাব্যস্থ করছেন এবং নামাযের মধ্যে সুকূন অবলম্বনের জন্য অনুপ্রাণিত করছেন। বর্ণিত এই মূলনীতি যেহেতু হযরত ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসকে সমর্থন করছে সেহেতু এটিকে হযরত ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতে হয়।[১১২]

সাত. বিরোধমূলক হাদীসের মধ্যে অগ্রাধিকার বাছাই করার ক্ষেত্রে হাদীসটির বর্ণনাকারীদের প্রজ্ঞা ও গভীর উপলব্ধিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থাৎ কোন হাদীস একজন সাধারণ রাবী থেকে বর্ণিত হওয়া আর একজন প্রাজ্ঞ ফকীহ থেকে বর্ণিত হওয়া এক কথা নয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও দেখা যায় যে, হযরত ইবন মাসউদ (রা) সূত্রের হাদীসটি যারা বর্ণনা করেছেন তাঁদের সকলই ফকীহ রাবী। এটি রিওয়ায়াতের জগতে حديث سلسل بالفقهاء উপাধিতে ভূষিত। পক্ষান্তরে হযরত ইবন উমর (রা) সূত্রের হাদীস যারা বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বিশ্বস্ত রাবী বটে তবে ফকীহ নন। কিংবা অন্তত সেই মানের ফকীহ নন। এ কারণেও হযরত ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসকে প্রাধান্য দিতে হয়।[১১৩]

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, হাদীসদ্বয়ের সনদ বিষয়ে একবার একটি ইলমী বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও হযরত ইমাম আওযাঈ (র)-এর মধ্যে। বিতর্কে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র), হযরত ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসের রাবীগণকে ফকীহ হিসাবে পেশ করে জয় লাভ করেন।

বিতর্কে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেছিলেন যে, কোন সনদে মাধ্যম (রাবী) সংখ্যা কম হওয়ার চেয়ে মাধ্যমদের প্রাজ্ঞ হওয়ার দিকটি প্রাধান্য দানের কারণ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার অধিকতর উপযুক্ত। যুগে যুগে চিন্তাশীল গবেষকগণ তাঁর নীতিটিই পছন্দ করেছেন। হাদীসে স্বয়ং মহানবী (সা) থেকেও এই মূলনীতির সমর্থন বিদ্যমান। যেমন ইরশাদ হচ্ছে رب حامل فقه الى من هو افقه منه[১১৪]

তাছাড়া الترجيح بفقه الرواية لا يعلو الاسناد। এই নীতি শুধু ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এরই নয়। অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের মধ্যেও এ নীতি অবলম্বনের নজীর পাওয়া যায়। যেমন ইমাম হাকিম 'মারিফাতু উলূমিল হাদীস' গ্রন্থে আলী ইবন খাশরাম থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন,[১১৫]

---

১১২. আল্লামা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

১১৩. প্রাগুক্ত।

১১৪. প্রাগুক্ত।

১১৫. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

قال لنا وكيع اى الاسنادين أحب اليك الاعمش عن أبى وائل عن عبد الله أو سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ، فقال على بن حشرم والاعمش عن أبى وائل ، فقال وكيع سبحان الله الاعمش شيخ وأبو وائل شيخ ، وسفيان فقيه ومنصور فقيه وابراهيم وعلقمة فقيه ، وحديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ .

এই উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায় কোন হাদীস ফকীহ্ রাবীদের মাধ্যমে বর্ণিত হওয়া শায়খ রাবীদের মাধ্যমে বর্ণিত হওয়ার চেয়ে উত্তম নীতিটি হাদীস বিশারগণের মধ্যেও স্বীকৃত।

যাহোক উপরোক্ত কারণগুলোর নিরিখে হযরত ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীস প্রাধান্য পাচ্ছে। ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীস রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন না করার কথা বলা হয়েছে বিধায় রাফে' ইয়াদাইন না করার হুকুমটিও প্রাধান্য পেয়ে যাচ্ছে। তাই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও হানাফী ফকীহগণ বলেছেন, রুকূ'তে রাফে' ইয়াদাইন না করা উত্তম।[১১৬]

---

১১৬. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

নামাযে তা'দীলে আরকান ওয়াজিব

আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে নামায। ধীরে সুস্থে নামাযের সমস্ত আহকাম ও আরকান পালন করে নিবিষ্ট মনে সালাত আদায় করা আবশ্যক। ফিক্হী পরিভাষায় একে 'তা'দীলে আরকান' বলা হয়। এই তা'দীলে আরকান ওয়াজিব। ইমাম আযম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র) এই মত পোষণ করেন।[১] ভুলবশত এর ব্যত্যয় ঘটলে সাহু সিজ্দা দিলে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে।

নামাযের মধ্যে চার স্থানে তা'দীলে আরকান ওয়াজিব। (১) রুকূ'তে যেয়ে স্থির হওয়া (২) রুকূ' থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্থির হওয়া, (৩) সিজ্দাতে যেয়ে স্থির হওয়া এবং (৪) প্রথম সিজ্দা থেকে উঠে দ্বিতীয় সিজ্দা দেয়ার আগে স্থির হয়ে বসা।

এই অভিমতের সমর্থনে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) যে হাদীসের উদ্ধৃতি দেন তা হচ্ছে এই ঃ

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوْعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُوْدُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ مَا خَلاَ الْقِيَامِ وَالْقُعُوْدِ قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَاءِ –

اَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأحمد وطبرانى .

হযরত বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা)-এর রুকূ' এবং সিজ্দা, দুই সিজ্দার মাঝখানে বসা এবং যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন এগুলোর বিরতি প্রায় সমান ছিল।[২]

এ মতের সমর্থনে আরও যে হাদীস উল্লেখ করা যায় ঃ

عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوْعًا اَسْوَأُ النَّاسِ سَرَقَةً الَّذِىْ يَسْرِقُ مِنْ صَلوٰتِهٖ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلوٰتِهٖ قَالَ لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلاَ سُجُوْدَهَا اَوْ قَالَ لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِىْ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ . رواه أحمد والأربعة

হযরত কাতাদা (রা) থেকে মারফূ' হাদীস হিসাবে বর্ণিত, মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট চোর ঐ ব্যক্তি যে তার নামাযে চুরি করে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! নামাযে

১. তানযীমূল আশতাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

২. ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আহমাদ, তিবরানীর প্রাসঙ্গিক উপস্থাপন। দ্রঃ ফিক্হুস সুনান প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭, ৫৮।

www.pathagar.com

আবার চুরি করে কিভাবে ?" রাসূলল্লাহ (সা) বললেন, 'যে তার নামাযে রুকূ' এবং সিজ্‌দাকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করে না।' অথবা তিনি বলেছেন, 'যে রুকূ' ও সিজ্‌দা হতে বরাবর অর্থাৎ সোজা হয় না।" এতে বুঝা যাচ্ছে যে, নামাযে তাড়াহুড়া করলে বা সংক্ষিপ্ত করে আদায় করলে তা সহীহ্ শুদ্ধ হবে না।[৩]

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ لاَ تُجْزِئْ صَلٰوةُ اَحَدٍ لاَ يُقِيْمُ فِيْهَا ظَهْرَهٗ فِىْ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ واصله الصّحيحين من مسئ الصلوة .

হযরত আবূ মাসউদ (আনসারী) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ঐ ব্যক্তির নামায হয় না যে ব্যক্তি রুকূ' ও সিজ্‌দা থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ায় না এবং স্থির হয়ে বসে না।[৪]

ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তা'দীলে আরকান ফরয।[৫]

তাঁদের মতের, সমর্থনে আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস উল্লেখ করা যায়। যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ত্রুটিপূর্ণ নামায আদায়কারীর তা'দীলে আরকান আদায় না হওয়াতে তিনি বলেছিলেন (قم فصل فانك لم تصل (متفق عليه এই হাদীসে তা'দীলে আরকান পরিত্যাগকারীকে তার নামাযই হয়নি বলে তিনি অভিহিত করেছেন। এতে বুঝা যাচ্ছে, তা'দীলে আরকান ফরয। আহনাফের পক্ষ থেকে উক্ত মতের জবাবে বলা হয় خبر واحد দ্বারা শরী'আতের কোন فرض প্রমাণ করা যায় না, খুব বেশি হলে واجب প্রমাণ করা যায়। কেননা যে ব্যক্তির নামাযে তা'দীলে আরকান হয়নি, তার নামাযকে একেবারে রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযই নয় তা বলেননি।

হযরত শায়খুল হিন্দ (র) বলেন, ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর দৃষ্টিতে উক্ত হাদীসে نفى صحت বুঝানো হয়নি বরং نفى كمال বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ নামায একেবারেই হবে না তা নয়। বরং পরিপূর্ণ সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে।

সিজ্‌দায় যাওয়ার সুন্নাত তরীকা

সিজদা করা সালাতের রুকনসমূহের অন্যতম একটি। মহান আল্লাহ্র সম্মুখে সর্বোচ্চ ভক্তি নিবেদনের উৎকৃষ্ট মাধ্যম হচ্ছে সিজ্‌দা। এই সিজ্‌দার মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। সালাতের সিজ্‌দার মত শুকরিয়া আদায়ের সিজ্‌দা এবং কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের সিজ্‌দা একই পদ্ধতিতে আদায় করতে হয়। অধিকাংশ হাদীসের বক্তব্য (المتن) প্রমাণ করে যে, সিজ্‌দা করার সময় প্রথমে দুই হাঁটু অতঃপর দুই হাত, অতঃপর নাক ও কপাল স্থাপন করে সিজ্‌দা করা সুন্নাত। সিজ্‌দা করার সময় দুই হাতের তালু কান বরাবর বা কান সোজা অবস্থায় থাকবে এবং হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিত অবস্থায় থাকবে।

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীস সমূহ নিম্নরূপ ঃ

৩. ফিক্‌হুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

৪. ফিক্‌হুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

৫. তানযীমুল আশতাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

www.pathagar.com

عَنْ وَائِل بْنِ حُجْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَاِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ .

أخرجه الأربعة وحسنه الترمذى وأخرجه ابن خزيمة وابن جنبان وابن السكن وللطحاوى نحوه عن عمر موقوفا بسند صحيح

হযরত ওয়াইল ইবন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে সিজ্দা করতে দেখেছি। যখন তিনি সিজ্দা করতেন, তখন দু' হাত মাটিতে স্থাপন করার পূর্বে দু'হাটু মাটিতে স্থাপন করতেন। আর যখন (সিজদা থেকে) উঠতেন, তখন হাঁটু তোলার আগে হাত উঠাতেন।[৬]

এটি ইমাম আযম আবূ হানীফা (র), তাঁর অনুসারীগণ, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ, ইসহাক, মুসলিম ইবন ইয়াসার প্রমুখ ফকীহ্গণের মত।[৭]

এ ব্যাপারে আরও কিছু হাদীস থেকে সমর্থন পাওয়া যায় ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ.

كما رواه أبو بكر بن شيبه والاثرا فى سننه .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেউ সিজ্দা করবে তখন সে যেন তার দু'হাত স্থাপন করার পূর্বে তার দু'হাটু দ্বারা সিজ্দা শুরু করে।[৮]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সিজ্দা করার সময় আগে হাঁটু স্থাপন অতঃপর দু'হাত স্থাপন করা সুন্নাত।

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ اعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطْ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ .

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা সিজ্দার মধ্যে স্থিরতা অবলম্বন কর এবং সিজ্দার মধ্যে তোমাদের কেউ যেন তার দু'হাত কুকুরের মত বিছিয়ে না দেয়।[৯]

---

৬ ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম ইবন মাজার ও ইমাম তাহাভীর প্রাসঙ্গিক উপস্থাপন। দ্রঃ মুফতী আমীমুল ইহসান, ফিকহুস সুনান, মাজীদিয়া, কানপুর পৃ. ১৫, সালাত অধ্যায়। সিজ্দা অনুঃ, পৃ. ৫৮।

৭. মাওলানা আবুল হাসান, তানযীমুল আশতাত, ইসলাহী কুতুবখানা, ইউ, পি. দেওবন্দ, সালাত অধ্যায় : সালাত, সিজ্দা অনুঃ, পৃ. ১১৬।

৮. তানযীমুল আশতাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

৯. ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের প্রাসঙ্গিক উপস্থাপন। দ্রঃ আল্লামা মুল্লা আলী কারী হানাফী, মিরকাত, বৈরুত, লেবানন।

www.pathagar.com

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَبْدُوَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ .

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন মালিক (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন সিজ্‌দা করতেন, তখন তাঁর দু'হাত এমন ফাঁক করে রাখতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখা যেত।[১০]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, সিজ্‌দার সময় দু'হাতের কনুই বগল থেকে দূরে রাখা সুন্নাত। এতে নামাযীর মধ্যে সচেতনতার ভাব পরিলক্ষিত হয়।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً مِّنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِيْ عَلٰى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ .

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমার সাথে থাকার কথা ছিল সে রাত্রিতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হারিয়ে ফেললাম। ফলে আমি তাকে তালাশ করলাম, তখন তিনি, নামাযের স্থানে সিজ্‌দা রত ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর দু'পায়ের গোঁড়ালী সোজা দাঁড় করান অবস্থায় ছিল।[১১]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সিজ্‌দা করার সময় পায়ের গোঁড়ালী সোজা থাকা এবং পায়ের আঙ্গুলগুলোর বাঁকিয়ে কিবলামুখী রাখা সুন্নাত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যমীনে প্রথমে সে অঙ্গ স্থাপন করতেন, যেটি মাটির বেশি কাছাকাছি, সেটি স্বাভাবিকভাবে আগে মাটিতে স্থাপিত হত। আবার উঠনোর সময় একটির পর একটি করে সেসব অঙ্গ আগে উঠাতেন, যেগুলো পর্যায়ক্রমে মাটি থেকে বেশি উপরে থাকত। তিনি সিজ্‌দায় যাবার সময় প্রথম দু'হাটু রাখতেন, তারপর দু'হাত, তারপর কপাল। আবার সিজ্‌দা থেকে উঠার সময় প্রথমে মাথা উঠাতেন তারপর দু' হাত, তারপর দু'হাটু।

এখানে একটি ভিন্ন মতও রয়েছে। তাদের মতে সিজ্‌দায় প্রথমে হাত রাখতে হবে। যাঁদের মতে হাঁটুর আগে হাত রাখতে হবে তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম মালিক ও ইমাম আওযাঈ (র)। তাঁরা আবূ হুরায়রা (রা) থেকে একটি মারফূ' হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হল ঃ তোমাদের কেউ যখন সিজ্‌দায় যাবে, সে যেন উটের নিয়মে না বসে, বরং সে যেন দু'হাঁটুর আগে দু'হাত রাখে। (আবূ দাঊদ)

জমহুর ফুকাহার মতো হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হুরায়রা (রা)-এর এ সনদে ইয়াহইয়া ইবন সালামা ইবন কুহাইল নামক একজন রাবী রয়েছেন। ইমাম নাসাঈ বলেন, এ ব্যক্তি রাবী হিসেবে পরিত্যাজ্য। (متروك)

হাঁটুর আগে হাত স্থাপন সম্পর্কিত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসটির মূল বক্তব্যে اضطراب (ত্রুটি) রয়েছে। কখনো বলা হয়েছে যে, হাঁটুর আগে যেন হাত রাখে। কখনো বলা হয়েছে। হাতের আগে যেন হাঁটু রাখে। কখনো মূল বক্তব্যের কিছু অংশ বাদ দিয়ে বলা হয়েছে।

---

১০. ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের প্রাসঙ্গিক উপস্থাপন। দ্রঃ আল্লামা মুল্লা আলী কারী হানাফী, মিরকাত, বৈরুত, লেবানন, পৃ. ৩১৯।

১১. মুল্লা আলী কারী হানাফী. মিরকাত, বৈরুত, সালাত অধ্যায়, পৃ. ৩২০।

www.pathagar.com

ইমাম বুখারী, দারু কুত্নী (র) প্রমুখ বড় বড় হাদীসবিশারদগণ উক্ত হাদীসকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন।[১২]

সালাতে মহিলাদের সিজ্দা করার বিষয়টি পুরুষদের থেকে একটু ভিন্ন ধরনের। তাদের এক পায়ের রানের উপর অন্য পা আড়াআড়ি করে বসার বিধান রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা যায় যেমন ঃ

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ (رضـ) اَنَّهُ ﷺ مَرَّ عَلٰى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ اِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ اِلَى الْاَرْضِ فَاِنَّ الْمَرْأَةَ فِىْ ذٰلِكَ لَيْسَتْ كَالرَّجُلِ .

رواه أبو داؤد فى مراسيله .

হযরত ইয়াযিদ ইবন আবূ হাবীব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) নামাযরতা দু'জন মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তাদেরকে বললেন, যখন তোমরা সিজ্দা করবে তখন তোমরা গোশ্তের কিছু অংশ মাটিতে মিলিয়ে রাখবে। কেননা এ ব্যাপারে মহিলারা পুরুষের মত নয়।[১৩]

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا اِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِى الصَّلٰوةِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا كَاَسْتَرِ مَا يَكُوْنُ .

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে মারফূ' হিসেবে বর্ণিত। যখন মহিলা নামাযের মধ্যে বসবে তখন তাদের একটি রান অপর রানের উপর রাখবে। আর যখন সিজ্দায় যাবে তখন তার পেট রানের সাথে যতটুকু সম্ভব মিলিয়ে রাখবে।[১৪]

মহিলাদের নামাযে বসার ব্যাপারটি পুরুষদের থেকে ভিন্ন। তাদের শারীরিক কাঠামোর কারণে এ ধরনের বিধান দেয়া হয়েছে।

নামাযে হযরত ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত তাশাহ্হুদ পড়া উত্তম

হানাফী মাযহাব মতে সালাতের ১ম ও শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠ করা ওয়াজিব। তাশাহ্হুদের বাক্য কোন্ ধরনের হবে এ বিষয়ে হাদীসে প্রধানত তিন ধরনের বক্তব্য এসেছে। অর্থাৎ তিন রকম তাশাহ্হুদ পাঠের প্রচলন আছে।[১৫] (১) আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)-এর তাশাহ্হুদ (২) আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা)-এর তাশাহ্হুদ (৩) আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর তাশাহ্হুদ।

---

১২. হাফিয ইবনুল কায়্যিম, আল্লাহ্র রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন। (আবদুশ শহীদ নাসিম অনূদিত) বর্ণালী বুক সেন্টার, ঢাকা, পৃ. ৪৪-৪৭।

১৩. মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০ টিকা।

১৪. মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানী, ইলাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

১৫. মাওলানা শিব্বির আহমাদ, ঈযাহুত তাহাভী, যাকারিয়া বুক ডিপো, পৃ. ১০৬, তাশাহ্হুদ অধ্যায়।

www.pathagar.com

ইমাম আযম আবূ হানীফা, সুফিয়ান সাওরী, আবদুল্লাহ্ ইবন মুবারাক, ইব্রাহীম নাখঈ, ইমাম আহমাদ, প্রমুখের মতে আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদের তাশাহ্হুদ পাঠ করা উত্তম।[১৬]

এ মতের সমর্থনে ইমাম আযম আবূ হানীফা ও তাঁর অনুসারীগণ যে হাদীস পেশ করে থাকেন তা হচ্ছে ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَعَدْنَا فِىْ الرَّكْعَتَيْنِ اَنْ نَّقُوْلَ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন আমরা দ্বিতীয় রাক'আতে বসি, তখন যেন আমরা বলি, সকল মর্যাদাপূর্ণ সম্বোধন আল্লাহ্র জন্য। সমস্ত শান্তি, কল্যাণ ও প্রাচুর্যের মালিক আল্লাহ্, সর্বপ্রকার পবিত্রতার মালিকও তিনি। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের প্রতি এবং আল্লাহ্র সকল নেক বান্দার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল।[১৭]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, নামাযে আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদের তাশাহ্হুদ পাঠ করা উত্তম। প্রসিদ্ধ ফিক্হ্ গ্রন্থ হিদায়ায় উল্লেখ্য আছে এ তাশাহ্হুদের ব্যাপারে আদেশসূচক ক্রিয়া ব্যবহার হয়েছে।

যেমন বর্ণনায় এসেছে ঃ

اَنَّهُ قَالَ اَخَذَ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِىْ وَعَلَّمَنِىْ التَّشَهُّدَ كَمَا كَانَ يُعَلِّمُنِىْ سُوْرَةً مِّنَ الْقُرْاٰنِ وَقَالَ قُلْ اَلتَّحِيَّاتُ الخ

ইমাম মুসলিমের একটি বর্ণনায় এসেছে ঃ

اِذَا قَعَدَ اَحَدُكُمْ فِىْ الصَّلٰوةِ فَلْيَقُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ . الخ

এ সকল আদেশসূচক ক্রিয়া দ্বারা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা)-এর তাশাহ্হুদ পাঠ করা কমপক্ষে মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা)-এর তাশাহ্হুদ শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন ঃ

---

১৬. ঈযাহুত তাহাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

১৭. ইমাম তিরমিযী, তিরমিযী, ১ম খণ্ড, কুতুবখানা রশীদিয়া, দেওবন্দ, সালাত অধ্যায় তাশাহ্হুদ অনুচ্ছেদ, পৃ. ৬৫।

www.pathagar.com

نقل ابن الهمام والعينى ان ابا حنيفة (رح) قال أخذ حماد بيدى فقال حماد أخذ ابراهيم النخعى وقال ابراهيم اخذ علقمة بيدى وقال علقمة اخذ ابن مسعود (رضـ) بيدى وقال ابن مسعود (رضـ) اخذ النبى ﷺ وعلمنى التشهد كما يعلمنى السورة من القران - الخ

ইব্‌ন হুমাম ও আইনী (র) বর্ণনা করেন, ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন-হাম্মাদ আমার হাত ধরেন, হাম্মাদ বলেন, ইব্‌রাহীম নাখঈ আমার হাত ধরেন, ইব্‌রাহীম নাখঈ বলেন, আলকামা আমার হাত ধরেন, আলকামা বলেন আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) আমার হাত ধরেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার হাত ধরেন এবং আমাকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দেন যেমন পবিত্র কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন।[১৮]

আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদের তাশাহহুদ روايت-এর বিচারে افضل। প্রমাণিত হয়। যেমন শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন ঃ

وجاء فى التشهد صيغ اصحها تشهد ابن مسعود ثم ابن عباس وعمر.

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, একদা তিনি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখলেন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললেন, সাধারণ লোকজন তাশাহ্‌হুদের ব্যাপারে বেশ বির্তক করছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদের তাশহ্‌হুদ পাঠ করার পরামর্শ দিলেন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, ইবন মাসঊদের তাশাহ্‌হুদ افضل।[১৯]

ইমাম মালিক (র) হযরত ইবন উমার (রা)-এর তাশাহ্‌হুদ উত্তম বলে থাকেন। এর উত্তরে বলা যায় যে, হযরত ইবন উমার (রা)-এর বর্ণনা موقوف। আর এর মধ্যে প্রাধান্য দেওয়ার মত যে বর্ণনা রয়েছে তা হচ্ছে مرفوع। অতএব, مرفوع বর্ণনা যা ইবন মাসঊদ (রা) থেকে রয়েছে তা راجع হবে।

ইমাম শাফিঈ (র) আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাসের তাশাহ্‌হুদ أفضل বলে থাকেন। তিনি বলেন, এ তাশাহ্‌হুদের মধ্যে مبارك বাক্য বেশী আছে। এর উত্তরে আহনাফ বলেন مبارك বাক্যই যদি ধরতে হয় তাহলে جابر এর তাশাহ্‌হুদই পাঠ করা উত্তম হবে। কেননা সেখানে بسم الله الرحمن الرحيم বাক্য আছে।[২০]

সবশেষে বলা যায়, তাশাহ্‌হুদের ব্যাপারে সাহাবীগণের মধ্যে অনেক বির্তক আছে। তবে ইবন মাসঊদের ব্যাপারে জমহূর সাহাবা ঐকমত্য পোষণ করেন এবং হযরত আবূ বকর (রা) এ তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিতেন বিধায় তা পাঠ করা উত্তম।

---

১৮. তানযীমুল আশতাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

১৯. তানযীমুল আশতাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

২০. তানযীমুল আশতাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

www.pathagar.com

সিজ্‌দায় কপাল ও নাক উভয়টি স্থাপন করা

সালাতের রুকনসমূহের একটি হল সিজ্‌দা। এ ব্যাপারে ফকীহ্‌গণের মধ্যে কারও দ্বিমত নেই। কিন্তু সিজ্‌দা করার সময় মুখমণ্ডলের কোন্ কোন্ অঙ্গ মাটিতে রাখা সুন্নাত এ বিষয়ে হাদীসের বক্তব্যে বিভিন্নতা আছে। অধিকাংশ হাদীসের বক্তব্য (متن) প্রমাণ করে যে, সিজ্‌দা করার সময় কপাল ও নাক উভয়টি মাটিতে স্থাপন করা সুন্নাত।

বর্ণিত হাদীসমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا أُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظَمَ عَلَى الْجَبْهَةِ وَاَشَارَ بِيَدِهِ اِلٰى اَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَاَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلاَ الشَّعْرَ . أخرجه الشيخان .

ইবন আব্বাস (রা) থেকে (মারফূ' হিসেবে) বর্ণিত আছে–আমি সাত অঙ্গে সিজ্‌দা করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। কপাল, তিনি হাত দ্বারা নাকের দিকে ইঙ্গিত করলেন, দু'হাত, দু'হাঁটু এবং দু'পায়ের সম্মুখভাগ এবং আমরা যেন (সিজ্‌দার সময়) কাপড় ও চুল টেনে না ধরি।[২১]

উপরোক্ত হাদীস প্রমাণ করছে যে, সিজ্‌দা করার সময় কপাল ও নাক উভয়টি স্থাপন করা সুন্নাত। এটি ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও হানাফী ফকীহ্‌গণের অভিমত।[২২]

এ ব্যাপারে আরও কিছু হাদীস থেকে সমর্থন পাওয়া যায় ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : أُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظَمٍ الْجَبْهَةِ وَاَشَارَ بِيَدِهِ عَلٰى اَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَاَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلاَ الشَّعْرَ . رواه مسلم (١-١٩٢)

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বলেছেন, আমাকে সাত অঙ্গের উপর সিজ্‌দা করতে বলা হয়েছে। কপাল, তখন তিনি হাত দ্বারা নাকের দিকে ইঙ্গিত করলেন, দু'হাত, দু'পা (হাঁটু) এবং দু'পায়ের অগ্রভাগ এবং আমরা যেন কাপড় চুল টেনে না ধরি। এখানে ইমাম মুসলিম ও ইমাম বুখারীর বর্ণনায় কিছুটা শব্দগত পার্থক্য রয়েছে। বুখারীর বর্ণনায় ركبتين এবং মুসলিমের বর্ণনায় رجلين উল্লেখ রয়েছে। শব্দগত পার্থক্য থাকলেও এখানে অর্থে কোন পার্থক্য নেই।[২৩]

---

২১. ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের প্রাসঙ্গিক উপস্থাপন। দ্রঃ সাইয়্যেদ মুফতী আমীমুল ইহসান, ফিক্‌হুস সুনান, সালাত অধ্যায় সিজ্‌দা অনুচ্ছেদ, পৃ. ৫৮।

২২. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কপাল ও নাক উভয়টি স্থাপন করে সিজ্‌দা করলে মাকরূহ হবে না। তবে দু'টির যে কোন একটি দ্বারা সিজ্‌দা করা ওয়াজিব। দু'টি সিজ্‌দা ওয়াজিব নয় বরং সুন্নাত। মাওলানা আবুল হাসান, তানযীমুল আশতাত, সালাত অধ্যায়, সিজ্‌দা অনুচ্ছেদ। ইসলাহী কুতুবখানা, পৃ. ১১৫।

২৩. ইমাম মুসলিমের প্রাসঙ্গিক উপস্থাপন। দ্রঃ যাফর আহমদ উসমানী ঃ ই'লাউস সুনান ঃ সালাত অধ্যায়, তরীকুস সুজূদ অনুচ্ছেদ, পৃ. ১৪।

www.pathagar.com

عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَمْكَنَ اَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ الاَرْضَ نَحَّا يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ .

আবূ হুমাইদ সাঈদী (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) যখন সিজ্‌দা করতেন, তখন তিনি তাঁর নাক ও কপাল মাটিতে স্থাপন করতেন এবং তাঁর দু'হাত দু'বগল থেকে দূরে রাখতেন এবং তাঁর দু'হাত দু'বগল থেকে দূরে রাখতেন এবং তাঁর দু'হাতের তালু তাঁর দু'কাঁধ বরাবর রাখতেন। (উল্লেখ্য, এ সময়ে দু'হাতের বুড়ো আঙ্গুলের অগ্রভাগ দু'কানের লতি বরাবর থাকবে।)[২৪]

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন, নাক ও কপালের হাড় একসাথে সংযুক্ত বিধায় এ দু'য়ের যে কোন একটি দ্বারা সিজ্‌দা করলে যথেষ্ট হবে। আর নাক ও কপাল দু'অঙ্গ হিসাব করলে সাত অঙ্গের স্থলে আট অঙ্গ হয়ে যাবে। যা সরাসরি সহীহ হাদীসের বিরুদ্ধে যাবে। তাই নাক ও কপালকে এক অঙ্গ হিসাব করে এর যে কোন একটি দ্বারা সিজ্‌দা করা ওয়াজিব এবং এই দু'টি একত্রে স্থাপন করা সুন্নাত।[২৫]

ফিকহুস সুনানে উল্লিখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সাত অঙ্গ দ্বারা সিজ্‌দা করতে হয়। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কপালের কথা উল্লেখ করলেন, তখন তিনি নাকের দিকে ইশারা করেন। বাস্তবে কপাল দ্বারা সিজ্‌দা করলে ফরয আদায় হবে। তবে সুন্নাত হবে উভয়ের একসাথে স্থাপন করা। এতে বিনয় প্রদর্শনে সর্বোচ্চমান প্রদর্শিত হয়।

আব্‌দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা)-এর امرت ان اسجد হাদীস দ্বারা ইমাম আহমাদ, ইমাম ইসহাক এবং ইমাম শাফিঈ (র)-এর এক বর্ণনা মতে সাত অঙ্গ দ্বারা সিজ্‌দা করা ফরয। ইমাম শাফিঈ (র)-এর ২য় মত (তা'লীকুস সাবীহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯১) হচ্ছে শুধু কপাল স্থাপন করলেই সিজ্‌দা আদায় হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) রিফা'আর হাদীসের শুধু কপাল স্থাপন যথেষ্ট বলেছেন এবং বাকী ছয় অঙ্গ স্থাপন সুন্নাত বলেছেন।[২৬]

ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইসহাক (র) امرت ان اسجد হাদীসের জবাবে বলেন دليل ظنى দ্বারা কখনও فرض প্রমাণ করা যায় না আর امرت ক্রিয়া وجوب এবং ندب উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়।[২৭]

ইমাম মালিক, আওযাঈ ও সাওরী (র)-এর মতে কপাল ও নাক উভয়ই একত্রে স্থাপন করে সিজ্‌দা করা ওয়াজিব,[২৮] তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসটি তাঁদের সমর্থনে ব্যক্ত করেন ঃ

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى رَجُلاً مَّا يُصِيْبُ اَنْفُهُ بِشَىْءٍ مِّنَ الْاَرْضِ فَقَالَ لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لاَ يُصِيْبُ اَنْفُهُ مِنَ الاَرْضِ مَا يُصِيْبُ جَبِيْنُهُ .

---

২৪. ইমাম তিরমিযী ঃ ১ম খণ্ড, সালাত অধ্যায়ঃ সিজ্‌দায় নাক ও কপাল স্থাপন অনুচ্ছেদ, দেওবন্দ কুতুবখানা রশীদিয়া, পৃ. ৬১।

২৫. তানযীমুল আশতাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

২৬. তানযীমূল আশতাত, পৃ. ১১৫, প্রাগুক্ত।

২৭. তানযীমুল আশতাত, পৃ. ১১৫, প্রাগুক্ত।

২৮. তানযীমুল আশতাত, পৃ. ১১৫, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

একদা নবী (সা) এক ব্যক্তিকে নাক স্থাপন ব্যতীত সিজ্‌দা করতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি কপাল স্থাপনের সাথে নাক স্থাপন করে না তার নামায হয় না।"[২৯]

এ হাদীসের উত্তরে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন, এ نفى দ্বারা نفى كمال উদ্দেশ্য। একেবারে নামায না হওয়া উদ্দেশ্য নয়।[৩০] যেমন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী ঃ لا صلوة لجــار المسجد الا فى المسجد। তবে সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, নাক ব্যতীত শুধু কপাল দ্বারা সিজ্‌দা করা হলে, তা যথেষ্ট হবে।[৩১] কেননা ইবন উমার (রা), আতা, তাউস, হাসান, ইবন শীরীন, কাসিম, শা'বী, যুহরী, ইমাম (শাফিঈ (দুই মতের প্রধান মত), ইমাম মালিক, আবূ ইউসুফ, সাওরী (র)-এর মতে নাক ও কপাল একত্রে স্থাপন করে সিজ্‌দা করা মুস্‌তাহাব।[৩২] ফকীহ্‌গণের মতের ভিন্নতা মূলত আক্ষরিক অর্থে। হানাফী ফকীগৃগণের সামগ্রিক বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁদের মতে কপাল ও নাক উভয়টি স্থাপন করে সিজ্‌দা করা সুন্নাত। উল্লেখ্য, সুন্নাত ও মুস্‌তাহাবের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। মূলত মুস্তাহাব সুন্নাতেরই একটি শাখা। সিজ্‌দা করার সময় প্রথমে আলতোভাবে নাক ও পরে কপাল স্থাপন করা এবং মাথা উত্তোলন করার সময় প্রথমে কপাল ও পরে নাক তোলা সঠিক পদ্ধতি।

---

২৯. ইমাম আলাউদ্দীন ঃ বাদাইউস সানায়ে', সালাত অধ্যায়, ১ম খণ্ড, দেওবন্দ, শাহারানপুর, পৃ. ৪৯২।

৩০. তানযীমুল আশতাত, পৃ. ১১৫, প্রাগুক্ত।

৩১. তানযীমুল আশতাত, পৃ. ১১৫, প্রাগুক্ত।

৩২. তানযীমুল আশতাত, পৃ. ১১৫, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে নামায শেষ করা ওয়াজিব

'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে নামায শেষ করা অতি জরুরী। এ বিষয়ে ফকীহগণের কারো দ্বিমত নেই। তবে এ কাজটি ফরয না ওয়াজিব এ নিয়ে তাঁদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। এর কারণ উক্ত বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহের বক্তব্যের বিভিন্নতা। তবে অধিকাংশ হাদীস প্রমাণ করে যে, 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে নামায শেষ করা ওয়াজিব, ফরয নয়।

বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ حَدِيْثِ التَّشَهُّدِ وَقَالَ بَعْدَ قَوْلِه : وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ قَالَ وَاِذَا قَضَيْتَ هٰذَا اَوْ قَالَ فَاِذَا فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلٰوتَكَ فَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَقُوْمَ فَقُمْ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ رواه أحمد

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) তাশহহুদ বিষয়ক হাদীসে বর্ণনা করেন—রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন—তুমি যখন (তাশাহহুদে) আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদু হুওয়া রাসূলুহু পর্যন্ত পড়ে নিলে তখন তোমার নামায পূর্ণ হয়ে গেল। ইচ্ছে হলে তুমি দাঁড়িয়ে যেতে পারো আর বসার ইচ্ছে হলে তুমি বসতে পারো।[১]

এ হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তাশাহহুদ পড়া অথবা তৎপরিমাণ সময় বসার পর নামাযের আর কোন রুকন বা ফরয অবশিষ্ট থাকে না। এটাই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত।

অন্যান্য হাদীসে ও এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন,

عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ اَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّ صَلٰوتُهٗ رواه البيهقى فى السنن واسناده حسن ·

হযরত আলী (রা) বলেন, নামাযরত ব্যক্তি যদি তাশাহ্হুদ পরিমাণ সময় বসে অতঃপর তার পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার নামায পূর্ণ হয়ে যায়।[২]

---

১. আবূ দাঊদ, খ. ১ পৃ. ১৩৯, তাশাহহুদ অনুচ্ছেদ, নাশেরানে কুরআন মজীদ ও ইসলামী কুতুব, দেওবন্দ, সাহারানপুর; আল্লামা যফর আহমদ উসমানী (র) ই'লাউস সুনান, খণ্ড ২, পৃ. ১৪০, হাদীস ৮৭৭৩।

২. বায়হাকী, দ্র. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৮৭৫।
এ হাদীসটি যদিও সাহাবীর উক্তি (موقوف) কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্তির (مرفوع) সমমর্যাদার কারণ বিষয়টি যুক্তির উর্ধ্বে বিষয়, এ ধরনের বিষয় কিয়াস করে বলা সম্ভব নয়। তাই এটা সুনিশ্চিত যে সাহাবী, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ থেকে জেনেই এরূপ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তাছাড়া রাসূলের সরাসরি উক্তি মারফূ' হাদীসেও এর সমর্থন রয়েছে। ই'লাউস সুনান, খ. ২ পৃ. ১৪৪।

www.pathagar.com

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَحْدَثَ يَعْنِى الرَّجُلُ وَقَدْ جَلَسَ فِىْ اٰخِرِ صَلٰوتِهٖ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلٰوتُهٗ أخرجه الترمذى

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আম্‌র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নামাযরত ব্যক্তি যদি নামাযের শেষ বৈঠকে বসে অতঃপর সালাম ফিরানোর পূর্বেই তার পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার নামায বৈধ হবে।[৩]

এছাড়াও এ ধরনের অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এসব হাদীস স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, তাশাহ্‌হুদ পড়া অথবা তৎপরিমাণ বসার পরে নামাযের আর কোন ফরয অবশিষ্ট থাকেনা।

তবে অন্য একটি হাদীসের বাহ্য বক্তব্য হতে সালাম ফরয হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয়।[৪] হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ رواه الترمذى

হযরত আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ পবিত্রতা নামাযের চাবি। আর নামাযের সূচনা হচ্ছে তাকবীরের মাধ্যমে এবং সমাপ্তি সালামের মাধ্যমে।[৫]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ফকীহগণ বলেন যে, এটি খবার ওয়াহিদ। এ পর্যায়ের হাদীস দ্বারা কোন বিষয়ের ফরয হওয়া সাব্যস্ত হয় না। তবে ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হতে পারে। তা ছাড়া প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিয়মিত সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করতেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিয়মিত আমল সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিষয়টির ওয়াজিব হওয়ারই প্রমাণ বহন করে।[৬]

তাছাড়া এ হাদীসটিকে ওয়াজিব এর অর্থে গ্রহণ করা হলে সালাম ব্যতীত নামায পূর্ণ হয়ে যাওয়া বক্তব্য সম্বলিত পূর্বোক্ত হাদীসসমূহের সাথে এর কোন বৈপরিত্য অবশিষ্ট থাকে না। তখন প্রথমোক্ত হাদীসগুলির অর্থ দাঁড়াবে তাশাহহুদের পর 'আসসালামু আলাইকুম' না বলে নামায শেষ করলেও নামায কিছুটা ত্রুটি পূর্ণভাবে আদায় হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে নামায শেষ করা ওয়াজিব হওয়ার প্রেক্ষিতেই ইমাম আযম আবূ হানাফী (র)-এর অভিমত হলো এই যে, তাশাহ্‌হুদের পর কারো পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গেলে সে নামায ছেড়ে দিয়ে অযূ করে আসবে। অতঃপর পবিত্রাবস্থায় সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করবে।

---

৩. সুনানে তিরমিযী। দ্র. আল্লামা যফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, খ. ২, পৃ. ১৪৪, হাদীস নং ৮৭৬।

৪. ইমাম শাফিঈ (র), ইমাম মালিক (র) ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল (র)-এর অভিমতও তাই।

৫. তিরমিযী, ১ম খ., পৃ. ৫৫, টিকা ও ব্যাখ্যাযুক্ত সংস্করণ।

৬. আল্লামা তাকী উসমানী, দরসে তিরমিযী, খ., ১, পৃ. ৪৯৫-৯৬।

www.pathagar.com

দুই দিকে সালাম ফিরানো ওয়াজিব

নামাযে সালাম ফিরানোর বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ দু'রকম বক্তব্য রয়েছে। অধিকাংশ হাদীসে নামাযে দু'দিকে সালাম ফিরানোর কথা রয়েছে। আর দু'একটি হাদীসের বক্তব্যে শুধু সামনের দিকে সালাম ফিরিয়ে ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়ার কথা রয়েছে। তবে সার্বিক বিচার বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে, দুই দিকে সালাম ফিরানোই ওয়াজিব।

বর্ণিত হাদীস সমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (هو ابن مسعود) عَنْ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ يَسَارِهٖ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ .

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) ডান এবং বাম দিকে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলে সালাম ফিরাতেন।[৭]

এ হাদীস হতে প্রমাণিত হয় যে দুই দিকে সালাম ফিরানোই নবীজীর নিয়মিত আমল ছিল, যা সংশ্লিষ্ট বিষয়টি ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এটাই ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও হানাফী ফকীহগণের অভিমত। এ ক্ষেত্রে শাফিঈ ও হাম্বলী ফকীহগণও একই অভিমত পোষণ করেন।

উপরোক্ত হাদীসের সমর্থনে আরও অনেক হাদীস রয়েছে। যেমন ঃ

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ يَسَارِهٖ حَتّٰى اَرٰى بَيَاضَ خَدِّهٖ . رواه مسلم .

হযরত আমির ইবন সা'দ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, যে আমি দেখতাম রাসূলুল্লাহ (সা) ডান এবং বাম দিকে সালাম ফিরাতেন। এমনটি আমি তার গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখতে পেতাম।[৮]

وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهٖ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَنْ شِمَالِهٖ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ . رواه أبو داؤد .

হযরত ওয়াইল ইবন হুজর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে নামায আদায় করেছি। তিনি ডান দিকে ফিরে বলতেন ঃ 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু' এবং বাম দিকে ফিরে বলতেন 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'।[৯]

---

৭ সুনানে তিরমিযী, ব্যাখ্যাযুক্ত সংস্করণ, সালাত অধ্যায় অনুচ্ছেদ, নামাযে সালাম ফিরানো, আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়াহহ দেওবন্দ, খ. ১, পৃ. ৬৫।

৮. মুসলিম শরীফ, মুখতার এন্ড কোম্পানী, খ. ১, পৃ. ২১৬।

৯. সুনানে আবূ দাউদ, দ্র. মাওলানা যফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়াহ, দেওবন্দ, খ. ৩, পৃ. ১৭৪, হাদীস নং-৮৯৭।

www.pathagar.com

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُوْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ مَرْفُوْعٍ : اِنَّمَا يَكْفِيْ اَحَدَكُمْ اَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلٰى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلٰى اَخِيْهِ مَنْ عَلٰى يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ . رواه مسلم .

হযরত জাবির ইবন সামুরাহ (রা) একটি দীর্ঘ মারফূ' হাদীসে বর্ণনা করেন তোমাদের কারোর জন্য এটাই যথেষ্ট যে সে তার উরুর উপর হাত রাখবে অতঃপর তার ডান ও বামের ভ্রাতাগণের প্রতি সালাম দিবে।[১০]

এ সব হাদীস প্রমাণ করে যে নামাযে দুই দিকেই সালাম ফিরানো ওয়াজিব।

তবে দু'একটি হাদীসের বক্তব্যে রয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) সামনের দিকে সালাম ফিরিয়ে ডান দিকে খানিকটা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন। যেমন,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِيْ الصَّلٰوةِ تَسْلِيْمَةً وَّاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ثُمَّ يَمِيْلُ اِلَى الشِّقِّ الاَيْمَنِ شَيْئًا . رواه الترمذى

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে শুধু সামনের দিকে এক সালাম ফিরাতেন, অতঃপর ডান দিকে একটু মুখ ঘুরিয়ে নিতেন।[১১]

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ এ হাদীস সম্বন্ধে বলেন যে, এ হাদীসটি দুর্বল, কারণ এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে যুহায়ের ইবন মুহাম্মদ নামক এক ব্যক্তি রয়েছেন। এ ব্যক্তি সম্পর্কে ইমাম বুখারীর (র) মন্তব্য হচ্ছে সিরিয়াবাসীরা এ ব্যক্তি হতে মুনকার (অগ্রহণযোগ্য পর্যায়ের) হাদীস বর্ণনা করে। আর এ হাদীসটিও সিরিয়াবাসী কর্তৃক বর্ণিত। তবে নির্ভরযোগ্য সনদে এ বিষয়ের আরেকটা হাদীস বর্ণিত রয়েছে। যা নিম্নরূপ ঃ

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فِيْ قِصَّةِ السَّفَرِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ سَلَّمَ وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمْ اَمْرٌ يَّخْشَى فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ .

সালিম ইবন আবদুল্লাহ এক সফরের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন যে, (তাঁর পিতা, আবদুল্লাহ ইবন উমর সামনের দিকে মাত্র এক সালাম ফিরিয়েছেন। অতঃপর বলেছেন, যখন তোমাদের কারো নিকট এমন কোন ব্যাপার উপস্থিত হয় যা হারিয়ে যাওয়ার অশংকা হয়, তাহলে সে যেন এভাবে নামায আদায় করে।[১২]

---

১০. সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ১৮১।

১১. সুনানে তিরমিযী, আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়াহ, দেওবন্দ, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নামাযে সালাম ফিরানো, খ. ১, পৃ. ৬৬।

১২. সুনানে নাসাঈ, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফির কখন মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করবে। মুখতার এণ্ড কোম্পানী, নাশেরানে কুরআন মজীদ ও ইসলাম কুতুব, দেওবন্দ। খ. ১, পৃ. ৯৯।

www.pathagar.com

মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ এ হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা নিম্নরূপ ঃ

ক. আল্লামা আইনী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন কোন সময়ে এত ক্ষীণ স্বরে দ্বিতীয় সালাম উচ্চারণ করেছেন যে, অনেক সাহাবী তা শুনতেই পান নি। কারণ সালামের মাধ্যমে নামায সমাপ্তির অবগতি দেয়ার কাজটি এক সালামের মাধ্যমেই সম্ভব হয়ে থাকে ।

খ. বিশেষ কোন অপারগতার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ করেছেন।[১৩]

গ. রাসূলুল্লাহ (সা) কেবলামুখী হয়ে সালামের উচ্চারণ শুরু করে ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন। অতঃপর বাম দিকেও সালাম ফিরিয়েছেন।

এক সালামের বক্তব্য সম্বলিত হাদীসের এ ব্যাখ্যাদ্বয়ের কোন একটি মেনে নিলে দুই সালামের সমর্থক হাদীস সমূহের সাথে এর আর কোন বৈপরিত্য অবশিষ্ট থাকেনা।[১৪]

তাছাড়া মুহাদ্দিসগণ দুই সালাম বিষয়ক হাদীসগুলির আধিক্য বিবেচনা করেও একথা বলেছেন যে, এত অধিক সংখ্যক হাদীসের বিপরীতে ভিন্ন বক্তব্য সম্বলিত দু'একটি হাদীসের বক্তব্যকে প্রাধান্য দেয়া যায় না।[১৫]

অবশ্য এক সালাম বিষয়ক হাদীসের উল্লিখিত ব্যাখ্যাত্রয়ের কোন একটি মেনে নিলে এ বিষয়ের কোন হাদীসই উপক্ষিত হয় না।

নামাযে ইসতিরাহাত সুন্নাত নয়

নামাযে 'ইসতিরাহাত' কথাটির অর্থ হচ্ছে প্রথম রাক'আত ও তৃতীয় রাক'আতের পর কিছুক্ষণ বসা। এ ইসতিরাহাত সুন্নাত কিনা এ বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। এ মতভিন্নতার কারণ হচ্ছে হাদীসের বক্তব্যের বিভিন্নতা। তবে অধিকাংশ হাদীস প্রমাণ করে যে 'ইসতিরাহাত' সুন্নাত নয়।

বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَفِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِخَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِىَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِىْ صَلٰوتِكَ كُلِّهَا . رواه البخارى فى كتاب الايمان .

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত......রাসূলুল্লাহ (সা) খাল্লাদ ইবনে রাফি'কে (নামায শিক্ষা দেয়ার ধারাবাহিকতায়) বলেছেন, অতঃপর তুমি উঠে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে তারপর এভাবেই তোমার পুরো নামায শেষ করবে।[১৬]

---

১৩. এক সালাম বিষয়ক দ্বিতীয় হাদীসটির শেষাংশই এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়। কারণ তাতে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমদের কারো নিকট এমন কোন ব্যাপার উপস্থিত হয় যা সে হারানোর আশংকা করে তখন যেন সে এভাবে নামায আদায় করে। আল্লামা তাকী উসমানী, দরসে তিরমিযী, মাওলানা রশিদ আশরাফ, আশরাফ বুক ডিপো দেওবন্দ, খ. ২, পৃ. ৬৫।

১৪. আল্লামা আইনী (র) বিশজন সাহাবীর সূত্রে এ বিষয়ের হাদীসগুলি বর্ণনা করেছেন। তার সবকটিতে দুই সালামের কথাই রয়েছে। মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাসান, তানযীমুল আশতাত, খ. ১, পৃ. ৩৪৬।

১৫. আল্লামা তকী উসমানী, দরসে তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৬৫।

১৬. বুখারী, শপথ ও মানত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ ভুলক্রমে শপথ ভঙ্গ করে। খ. ২, পৃ. ৯৮৬। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (র) অন্য আরেক সূত্রে ও বর্ণনা করেছেন, তাতে حتى تستوى قائما-এর পরিবর্তে حتى تطمئن جالسا

www.pathagar.com

এ হাদীসে দ্বিতীয় সিজ্‌দার পরে দাঁড়িয়ে যাওয়ার যে নির্দেশটি রয়েছে তা ব্যাপক। আর এক্ষেত্রে প্রথম তাশাহহুদ ও দ্বিতীয় তাশাহহুদ সম্বলিত রাক'আত বাদ দিলে প্রথম ও তৃতীয় রাক'আতের ক্ষেত্রেই নির্দেশটি বহাল থাকে। তাই এ হাদীসের বক্তব্যে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম রাকা'আত ও তৃতীয় রাক'আতে দ্বিতীয় সিজ্‌দার পরে ইসতিরাহাত সুন্নাত নয়। বরং সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়াই সুন্নাত। এটাই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও হানাফী ফকীহগণের অভিমত।[১৭] ইমাম মালিক (র) এবং ইমাম আহমাদ (র) ও একই অভিমত পোষণ করেন।

অন্যান্য হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : رَمَضْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فِىْ الصَّلٰوةِ فَرَاَيْتُهُ يَنْهَضُ وَلاَ يَجْلِسُ قَالَ يَنْهَضُ عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى وَالثَّالِثَةِ . رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح والبيهقى فى السنن الكبرى وصحّحه .

আবদুর রহমান ইবন ইয়াযিদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত ইবন মাসঊদ (রা)-র নামায পর্যবেক্ষণ করেছি। দেখেছি তিনি নামাযে (সিজ্‌দা হতে) সোজা দাঁড়িয়ে যান, বসেন না। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি প্রথম ও তৃতীয় রাক'আতে পায়ের অগ্রভাগে ভর করে দাঁড়িয়ে যান।[১৮]

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَنْهَضُ فِى الصَّلٰوةِ عَلٰى صُدُوْرِ قَوْمِهِ رواه الترمذى (١ : ٣٩) وَقَالَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُوْنَ اَنْ يَّنْهَضَ الرَّجُلُ فِى الصَّلٰوةِ عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ وَخَالِدُ بْنُ اِيَّاسٍ (الراوى فى هذا السّند) ضَعِيْفٌ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে (দ্বিতীয় সিজ্‌দা হতে)পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর করে সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন।[১৯]

কথাটি রয়েছে। কিন্তু বুখারী শরীফের ভাষ্যকার ইবন হাজার আসকালানী (র) নিজেই স্বীকার করেন যে, এ অংশটুকু কোন বর্ণনাকারীর সংশয় প্রসূত। বিশুদ্ধ রিওয়ায়েত হচ্ছে حتى تستوى قائما স্বয়ং ইমাম বুখারী (র)-এর উপস্থাপনা ও সে কথার সমর্থ করে। তিনি হাদীসাংশ বর্ণনা করে বলেন قال ابو اسامة فى الاخر حتى تستوى قائما অর্থাৎ আবূ উসামা হাদীসের শেষাংশ সম্পর্কে বলেন -এখানে সঠিক শব্দমালা হচ্ছে حتى تستوى قائما। আল্লামা তকী উসমানী দরসে তিরমিযী মওলানা রশীদ আশরাফ সংকলিত। খ. ২, পৃ. ৫৬।

১৭. আল্লামা তকী উসমানী, দরসে তিরমিযী, মাওলানা রশীদ আশরাফ সংকলিত, আশরাফ বুক ডিপো দেওবন্দ খণ্ড-২, পৃ. ৫৬।

১৮. তাবারানী ও বায়হাকী, দ্র. আল্লামা যফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ইসতিরাহাতের বৈঠক না করা। আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়াহ, দেওবন্দ, খ. ২, পৃ. ৪৪৯, হাদীস নং ৮০৪।

১৯. সুনানে তিরমিযী। দ্র. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৮০৭। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন যে, এ হাদীসের উপরই আলিমগণের আমল। তবে তিনি এর সনদের উপর আপত্তি উথাপন করে বলেন যে, এর সনদে খালেদ ইবনে ইয়্যাস নামক বর্ণনাকারী দুর্বল। শায়খ ইবনুল হুমাম এ অভিযোগের জবাবে বলেন যে, সনদগত দুর্বলতা সত্ত্বেও অন্যান্য হাদীসের সমর্থনে এ হাদীসের বিষয়বস্তু শুদ্ধ। স্বয়ং ইমাম তিরমিযীই এ হাদীসের উপর আলিমগণের

www.pathagar.com

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ اَبِىْ عَيَّاشٍ قَالَ : اَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فِىْ اَوَّلِ رَكْعَةٍ وَالثَّالِثَةِ قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ . رواه أبو بكر بن أبى شيبة واسناده حسن (اثار السنن . ج : ١ ، ص ١٢١)

নু'মান ইবনে আবু আইয়াশ বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একাধিক সাহাবীকে পেয়েছি তাঁরা যখন প্রথম ও তৃতীয় রাক'আতে সিজ্‌দা হতে মস্তক উত্তোলন করতেন তখন সেভাবেই দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বসতেন না।[২০]

এ সকল হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরামের আসল কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই প্রমাণ করে যে, নামাযে 'ইসতিরাহাত' সুন্নাত নয়। তবে দু'একটি হাদীসের বক্তব্যে রাসূলুল্লাহ (সা) এক্ষেত্রে 'ইসতিরাহাত' করেছেন বলেও জানা যায়। তবে প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিশেষ কোন কারণে তিনি এরূপ করেছেন। এটা তার সাধারণ আমল ছিল না। 'ইসতিরাহাত' করার বক্তব্য সম্বলিত হাদীস নিম্নরূপ ঃ

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِىُّ اَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّ فَكَانَ اِذَا كَانَ فِىْ وِتْرٍ مِّنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ جَالِسًا .

মালিক ইবনুল হুয়াইরিস লাইসা হতে বর্ণিত, যে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে নামায আদায় করতে দেখেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন বেজোড় রাক'আতের সিজ্‌দা আদায় করতেন তখন সোজা হয়ে না বসে দাঁড়াতেন না।[২১]

মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসের দু'টি ব্যাখ্যাত দিয়েছেন। যা নিম্নরূপ ঃ

ক. রাসূলুল্লাহ (সা) অসুস্থতা অথবা বার্ধক্যজনিত কারণে এরূপ ইসতিরাহাত করেছেন। কারণ শেষ বয়সে নবীজীর শরীর ভারী হয়ে গিয়েছিল। ইমাম তাহাবী (র) বলেন, যেহেতু ইসতিরাহাত বিষয়ে হাদীসের বর্ণনায় বিভিন্নতা রয়েছে, তাই উভয় প্রকার হাদীসের সমন্বয় কল্পে আমরা বলব যে, বিশেষ কোন অপারগতার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ করেছেন। এক হাদীসে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন-

لاَ تُبَادِرُوْنِىْ فَانِّىْ قَدْ بَدَّنْتُ .

অর্থাৎ তোমরা নামাযে (এক রুকন হতে অন্য রুকনে) আমার অগ্রে চলে যেও না, কারণ আমার শরীর ভারী হয়ে গেছে।[২২]

খ. এ হাদীসে নামাযে 'ইসতিরাহাত' জায়িজ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর পূর্বোক্ত হাদীসসমূহে তা সুন্নাত না হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে।

আমলের কথা উল্লেখ করেছেন। দ্র. আল্লামা তকী উসমানী, দরসে তিরমিযী, মওলানা রশীদ আশরাফ সংকলিত খ. ২, পৃ. ৫৬।

২০. আল্লামা যফর আহমদ উসমানী, ই'লাইস সুনান, খ. ২, পৃ. ৪৮।

২১. সুনানে তিরমিযী, ব্যাখ্যা ও টিকা যুক্ত সংস্করণ, আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়াহ, দেওবন্দ, খ. ১, পৃ. ৬৪।

২২. দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাসান, তানযীমুল আশতাত, খ. ১, পৃ. ৩০০।

www.pathagar.com

এ ব্যাখ্যা দ্বয়ের কোন একটি মেনে নিলে 'ইসতিরাহাত' বিষয়ক পূর্বোক্ত হাদীস সমূহের সাথে এ হাদীসের আর কোন বৈপরিত্য অবশিষ্ট থাকে না।[২৩]

তাশাহহুদ পড়ার সময় বসার পদ্ধতি

নামাযে তাশাহহুদ পড়ার সময় বসার দু'টি পদ্ধতির কথা হাদীসে রয়েছে। একটি পদ্ধতি হচ্ছে ইফতিরাশ--অর্থাৎ বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা খাড়া রাখা ও তার আঙ্গুলিসমূহ কিবলামুখী রাখা। অপর পদ্ধতিটি হচ্ছে তাওয়াররুক--অর্থাৎ বাম নিতম্বের উপর বসা এবং পা ডান দিকে বের করে রাখা।

হাদীসের বিভিন্ন বক্তব্যে পৃথক পৃথকভাবে উভয় পদ্ধতির উল্লেখ থাকলে ও চূড়ান্ত বিচার বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমোক্ত পদ্ধতিটিই পুরুষের বেলায় উত্তম আর দ্বিতীয়োক্ত পদ্ধতিটি মহিলাদের জন্য উত্তম।

বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلٰى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا جَلَسَ يَعْنِيْ لِلتَّشَهُّدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى يَعْنِيْ عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى .

হযরত ওয়াইল ইবন হুজ্র (রা) বলেন, আমি মদীনায় এসে ভাবলাম যে, আমি নবীজীর নামায দেখব। অতঃপর নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসলেন তখন তিনি বাম পা বিছিয়ে দিলেন এবং তাঁর বাম হাত বাম উরুর উপর রাখলেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখলেন।[২৪]

এ হাদীস স্পষ্টত নবীজীর 'ইফতিরাশ' পদ্ধতিতে বসার কথা উল্লিখিত হয়েছে। এটাই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও হানাফী ফকীহগণের অভিমত আর ও বহুসংখ্যক হাদীসে এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلٰوةَ بِالتَّكْبِيْرِ اِلٰى اَنْ قَالَتْ وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাক্বীরের মাধ্যমে নামায শুরু করতেন......এবং তিনি তার বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন।[২৫]

---

২৩. আল্লামা তকী উসমানী, দরসে তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৫৭।

২৪. তিরমিযী শরীফ, ব্যাখ্যা ও টিকাযুক্ত সংস্করণ, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ তাশাহহুদে বসার পদ্ধতি। আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়াহ, দেওবন্দ, খ. ১, পৃ. ৬৫
ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, এটি حسن صحيح এবং অধিকাংশ উলামার আমল এ হাদীসের উপর।

২৫. মুসলিম শরীফ, মুখতার এণ্ড কোম্পানী, নাশেরানে কুরআন মজীদ ও ইসলামী কতুব, দেওবন্দ, সাহারানপুর, খ. ১, পৃ. ১৯৪।

www.pathagar.com

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ وَقَالَ اِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلٰوةِ اَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى وَتَثْنِىَ الْيُسْرٰى فَقُلْتُ اِنَّكَ تَفْعَلُ ذٰلِكَ (اَىْ التَّرَبُّعَ) فَقَالَ اِنَّ رِجْلَاىَ لَا تَحْمِلَانِىْ . رواه البخارى ورواه النسائى ولفظه قال : وَمِنْ سُنَّةِ الصَّلٰوةِ اَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنٰى وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ وَالْجُلُوْسَ عَلَى الْيُسْرٰى واسناده صحيح .

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, নামাযের সুন্নাত হচ্ছে তুমি তোমারর ডান পা খাড়া রাখবে এবং বাম পা বাঁকা করে (বিছিয়ে) রাখবে। বর্ণনাকারী[২৬] বলেন, আমি বললাম আপনি তো নামাযে আসন পেতে বসেন। ইবন উমর (রা) বললেন-আমার পদদ্বয় আমার শরীরকে বহন করতে পারে না।[২৭] এ হাদীস নাসাঈ শরীফে নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে—নামাযের সুন্নাত হচ্ছে ডান পা খাড়া রাখা এবং তার অঙ্গুলিসমূহ কেবলামুখী রাখা আর বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসা।[২৮]

ইফতিরাশ পদ্ধতির বসার সমর্থনে এরূপ আরও অনেক হাদীস রয়েছে।[২৯] এ সকল হাদীস কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই স্পষ্টত প্রমাণ করে যে, তাশাহহুদ ছাড়ার সময় 'ইফতিরাশ' পদ্ধতিতে বসাই উত্তম।[৩০] এটাই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও হানাফী ফকীহগণের অভিমত।[৩১]

তবে দু'একটি হাদীস তাওয়াররুক পদ্ধতিতে বসার কথাও পাওয়া যায়। তবে সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তা বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত বলেই মনে হয়।

---

২৬. এ বর্ণনাকারী হচ্ছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমরের পুত্র আবদুল্লাহ (রা)। তিনি নিজেই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) নামাযে যখন তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসতেন তখন আসন পেতে বসতেন। ফলে আমিও একদিন নামাযে সেভাবে বসি। আমি তখন অল্পবয়সী বালক। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) তখন আমাকে এভাবে বসতে বারণ করলেন, এবং বললেন, নামাযের সুন্নাত হচ্ছে এই যে তুমি ডান পা খাড়া রাখবে এবং বাম পা বিছিয়ে দেবে। আমি বললাম, আপনি তো আসন পেতে বসেন। তখন তিনি বললেন, আমার পদদ্বয় আমার শরীরকে বহন করতে পারেনা। বুখারী, অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহহুদে বসার সুন্নাত, আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, খ. ১, পৃ. ১১৪।

২৭ এ কথা স্পষ্টতঃই প্রমাণ করে যে, তিনি শারীরিক কোন অসুবিধার কারণেই ইফতিরাশ পদ্ধতিতে বসতে পারেননি।

২৮. দ্র. আল্লামা যফর আহমদ উসমানী (র) ই'লাউস সুনান, আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়াহ, দেওবন্দ, খ. ১, পৃ. ১০০, হাদীস নং ৮৩৪।

২৯. দেখুন প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-১০৫।

৩০. উল্লেখ্য যে সুস্পষ্টত ইফতিরাশ পদ্ধতির নির্দেশক এ সকল হাদীসের বক্তব্যকে শুধু প্রথম বৈঠকের সাথে সম্পর্কিত করার দাবী দলীল নির্ভর নয়। কারণ বর্ণিত হাদীসগুলিতে এর পক্ষে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই। সাধারণভাবেই তাশাহহুদ পড়ার সময় এ পদ্ধতিতে বসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম বৈঠক ও দ্বিতীয় বৈঠকের কোন পার্থক্য থাকলে এসব হাদীসে তা উল্লেখ করা হতো, বিশেষত প্রথমোক্ত হাদীস বর্ণনাকারী হযরত ওয়াইল ইবন হুজ্র (রা) তা অবশ্যই বর্ণনা করতেন। কারণ তিনি নবীজীর নামায গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যেই মদীনায় আগমণ করেছিলেন। ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

৩১. আল্লামা তকী উসমানী, দরসে তিরমিযী, মাওলানা রশীদ আশরাফ সংকলিত, আশরাফী বুক ডিপো দেওবন্দ, খণ্ড ২, পৃ. ৬০।

www.pathagar.com

عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىُّ وَفِيْهِ حَتّٰى كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِى تَنْقَضِىْ فِيْهَا صَلَوَاتُهُ اَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَقَعَدَ عَلٰى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ .

হযরত আবূ হুমাইদ সাঈদী বলেন, অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (সা) শেষ রাক'আতে বসতেন তখন বাম পা বের করে দিতেন এবং বাম নিতম্বের উপর বসতেন, তারপর সালাম ফিরাতেন।[৩২]

এ হাদীসে তাওয়াররুক পদ্ধতিতে বসার কথা উল্লিখিত হয়েছে। ফকীহগণ এ হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যে নিম্নরূপ ঃ

এ হাদীসে এবং এ জাতীয় হাদীসে অসুস্থাবস্থায় বসার কথা নির্দেশ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমরের হাদীসটিই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। কারণ উক্ত হাদীসে তিনি তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ (রা)-কে তাশাহহুদে বসার প্রকৃত সুন্নাত জানিয়ে নিজে সেভাবে বসতে না পারার জন্য অপারগতা প্রকাশ করেছেন।

খ. এ হাদীসে তাশাহহুদে বসার একটি বৈধ পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। তবে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে ইফতিরাশ।

গ. তাশাহহুদের সাথে যদি কেউ দীর্ঘক্ষণ অন্যান্য দু'আ দরূদ পড়তে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে তাওয়াররুক পদ্ধতিতে বসা অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ ইফতিরাশ পদ্ধতিতে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা খুবই কষ্ট সাধ্য।[৩৩]

উল্লিখিত ব্যাখ্যাত্রয়ের যে কোন একটি মেনে নিলে ইফতিরাশ পদ্ধতির সমর্থক হাদীসসমূহের সাথে হাদীসের কোন বৈপরিত্য থাকে না বরং উভয় হাদীসের মধ্যে একটি চমৎকার সমন্বয় সাধিত হয়।[৩৪]

---

৩২. ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমত হচ্ছে প্রথম তাশাহহুদ পড়ার সময় ইফতিরাশ পদ্ধতিতে এবং শেষ বৈঠকে তাওয়াররুক পদ্ধতিতে বসা সুন্নাত, ইমাম মালিক (র) এর মতে উভয় বৈঠকেই তাওয়াররুক পদ্ধতি সুন্নাত, দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত।

৩৩. অবশ্য মহিলাদের জন্যে সর্বাবস্থায় তাওয়াররুক পদ্ধতিতে বসাই উত্তম। কারণ তা তাদের সতরের পক্ষে অধিক সহায়ক, শায়খুল ইসলাম মুরগীনানী আল-হিদায়াহ, আশরাফী বুক ডিপো, খ. ১, পৃ. ১১১।

৩৪. দ্র. তিরমিযী শরীফ, টিকা নং-৩, আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়াহ, দেওবন্দ, খ. ১, পৃ. ৬৭,

www.pathagar.com

'সাহু সিজ্‌দা' সালামের পর আদায় করা উত্তম

সাহু সিজ্‌দার বিধান সালামের আগে না পরে সে ব্যাপারে হাদীসে দুই ধরনের আমল বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু এতদ সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহের মাঝে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এ কথাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সাহু সিজ্‌দা সালামের পর করাই উত্তম।[১]

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا : اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ . (رواه البخارى)

হযরত ইবন মাসউদ (রা) থেকে (মারফূ'রূপে) বর্ণিত আছে, তোমাদের কারো নামাযে যদি সন্দেহ সৃষ্টি হয় তবে সঠিক দিক অনুসন্ধান পূর্বক নামায পরিপূর্ণ করবে, অতঃপর সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজ্‌দা দিবে, (বুখারী)

এ হাদীসে সালামের পর সাহু সিজ্‌দা আদায়ের আদেশ প্রদান করা হয়েছে।[২]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ جَالِسًا ثُمَّ سَلَّمَ .

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফিরিয়ে বসা অবস্থাতেই সাহু সিজ্‌দা আদায় করেছেন। এরপর সালাম ফিরিয়েছেন।[৩] (নাসাঈ)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ . فَقَالَ الْخِرْبَاقُ ، اِنَّكَ صَلَّيْتَ ثَلَاثًا ، فَصَلَّ بِهِمُ الرَّجْعَةَ الْبَاقِيَةَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ .

---

১. আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আবেদীন শামী ঃ রাদ্দুল মুহতার, যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ, সাহরানপুর, ভারত, অধ্যায়, সাহু সিজ্‌দা। খণ্ড, ২ পৃ. ৫৪১

(খ) আল্লামা শাইখ ওয়াহাবাতুল্লাহ যুহায়লী ঃ আল-ফিকহুল ইসলামী, মাকাতাবায়ে হক্কানীয়া, মহল্লা জঙ্গী, সিরকী রোড. . . .পাকিস্তান, প্রসঙ্গ সিজ্‌দায়ে সাহুর বিবরণ ও তার স্থল। পৃ. ১০৫-১০৬, খণ্ড ২

(গ) আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম ঃ ফাতহুল কাদীর মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা পাকিস্তান ঃ অধ্যায় ঃ সিজ্‌দা সাহু, খণ্ড ১, পৃ. ৪৩৪-৪৩৫।

(ঘ) ফাতাওয়া আলমগীরী। মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান, দ্বাদশ অধ্যায়, সাহু সিজ্‌দা প্রসঙ্গে, খণ্ড, ১ পৃ. ১২৫

২. আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউসসুনান ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামিয়া, করাচী, পাকিস্তান। পরিচ্ছেদ ঃ সাহু সিজ্‌দা ওয়াজিব এবং তা সালামের পর আদায় করা হবে, খণ্ড ৭, পৃ. ১৫১, হাদীস নং ১৮৬৫

৩. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৮৬৬।

www.pathagar.com

হযরত ইমরান ইবন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) একদা তিন রাক'আত নামায আদায় করে সালাম ফিরিয়ে ছিলেন। তখন খিরবাকা বলল, (ইয়া রাসূলাল্লাহ !) আপনি তো তিন রাক'আত পড়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে নিয়ে অবশিষ্ট রাক'আত পড়ে (বসার পর) সালাম ফিরিয়েছেন। এরপর সাহু সিজ্‌দা আদায় করেছেন। এর পর সালাম ফিরিয়েছেন।[৪]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَكَّ فِىْ صَلَاتِهٖ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ . رواه أبو داؤد والنسائى، ورواه البيهقى وقال : اسناده لا بأس به زيلعى وفى الدراية ، وصححه ابن خزيمة ١٢٥

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার নামাযে সন্দেহ করে সে যেন সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজ্‌দা প্রদান করে।[৫] (আবু দাঊদ, নাসাঈ, বায়হাকী, ইবন খুযায়মা)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهٗ اَزِيْدَ فِىْ الصَّلَاةِ اَمْ وَنَسِيْتَ ؟ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ . قال ابو عيسى ، هذا حديث حسن صحيح

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একদা নবী করীম রাসূলুল্লাহ (সা) যুহর পাঁচ রাক'আত পড়লে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, নামায কি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে না কি আপনি ভুলে গেছেন ? তখন তিনি সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজ্‌দা প্রদান করলেন।[৬] (তিরমিযী)

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সালামের পরই সিজ্‌দায়ে সাহু আদায় করা উত্তম। আর এ অভিমতই পোষণ করেন ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)।

উল্লেখ্য যে উপরোক্ত হাদীসসমূহকে প্রাধান্য দেওয়ার কয়েকটি দিক নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

(ক) হানাফী মাযহাবের مستدلات এর মধ্যে قولى ও فعلى উভয় ধরনের হাদীস পাওয়া যায় অথচ অপরাপর মাযহাবের পক্ষে শুধু فعلى হাদীস পাওয়া যায়। সে সম্পর্কে হানাফী ফকীহগণ বলেন; তা জায়িয হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(খ) তাছাড়া قولى হাদীস ও فعلى হাদীসের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে নিয়মানুযায়ী قولى হাদীসের প্রাধান্য লাভ হয় তাতে হানাফী মাযহাব শক্তিশালী হওয়ার দিকটিই সুস্পষ্ট।

---

৪. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৮৬৭।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১-১৫২, হাদীস নং ১৮৬৮

৬. ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী, তিরমিযী শরীফ, কুতুবখানায়ে রশিদিয়া দিল্লী, অধ্যায় সালাত, পরিচ্ছেদ, সালাম-কালামের পর সিজ্‌দা সাহু প্রসঙ্গে, পৃ. ৫২ খ. ১

www.pathagar.com

(গ) রাসূলুল্লাহ (সা) ছাড়াও আরো অনেক সাহাবী ও তাবিঈ কিরামের আমল হানাফী মাযহাব মুতাবিক ছিল বলে বহু হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি নমুনা স্বরূপ পেশ করা হল ঃ

হযরত আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-এর সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করেছিলাম। তাতে তিনি দুই রাক'আত অন্তে সালাম ফিরালেন, এরপর দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এক রাক'আত পড়ে সালাম ফিরালেন। এরপর দুই সিজ্‌দা করলেন। (আতা বলেন) আমি তাৎক্ষণিকভাবে ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি দৃঢ়তাও নিশ্চয়তার স্বরে বললেন, সে তো (ইবন যুবাইর) রাসূলুল্লাহ (সা)-র সুন্নাত পরিপন্থী কিছু করেনি। (তাবাকাতঃ ইবনে সা'দ, উমদাতুল কারী ঃ ৩ ঃ ৭৩৬) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে আতা বলেন, অতঃপর আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট ছুটে গেলাম এবং তাকে ইবন যুবায়র (রা)-এর এ কাজটি সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি বললেন, খুব ভাল করেছে এবং সঠিক করেছে।[৭]

যিয়াদ ইবনে আলাকাহ (র) বলেন, একদা মুগীরাহ ইবন শু'বা (রা) আমাদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন, তাতে তিনি দু'রাক'আত অন্তে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন, পেছন থেকে লোকেরা আওয়াজ দিলে তিনি তাদেরকে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিলেন। অতঃপর নামাযের শেষে সালাম ফিরিয়ে সাহু সিজ্‌দা আদায় করে নিলেন।

নামায শেষ করার পর আমাদের দিকে ফিরে ঘোষণা দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এরূপই করতে দেখেছি।[৮] (আবু দাউদ, তিরমিযী, তাহাভী) ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) সাহু সিজ্‌দা সম্পর্কে বলেন, প্রথমে সালাম ফিরাবে অতঃপর সাহু সিজ্‌দা দিবে। এরপর সালাম ফিরাবে।[৯] (তাহাভী)

এ সকল সাহাবীদের আমল ও ফাতাওয়া হানাফী মাযহাবের মুতাবিক। অতএব এ অভিমতটিই হবে অন্য সব মতাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। কেননা নিয়ম হলো ঃ

কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর اقوال ও افعال এর মধ্যে পরস্পর বিরোধ দেখা গেলে সে ক্ষেত্রে সাহাবীদের اقوال ও افعال কে সামনে রেখে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আবশ্যক হয়ে দাড়ায়। সুতরাং রাসূলের যে আমল বা মতের সাথে সাহাবীর আমল ও মত মিল খায় সেটাই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।[১০]

মোটকথা রাসূলুল্লাহ (সা) অধিকাংশ সময় সাহু সিজ্‌দা সালামের পর আদায় করেছেন। যা হানাফী মাযহাব প্রাধান্য পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ প্রমাণ বলে গণ্য।[১১]

---

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭, হাদীস নং ১৮৭০।

৮. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৮৭১।

৯. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৮৭২।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫-১৫৬।

www.pathagar.com

কিন্তু কিছু কিছু হাদীস বাহ্যত হানাফী মাযাহাবের বিপরীত দেখা যায় বিধায় হানাফী ফকীহগণ তার যথোচিত ব্যাখ্যা প্রদান করে আলোচ্য মাস'আলার সাথে সম্পর্কিত সকল হাদীসের মাঝে বিশেষ সমন্বয় বিধান করেন।

নিম্নে তা পেশ করা হল ঃ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهٖ فَلَمْ يَدْرِكَمْ صَلّٰى ثَلَاثًا اَوْ اَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلٰى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ ، فَاِنْ كَانَ صَلّٰى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهٗ صَلَاتَهٗ وَاِنْ كَانَ صَلّٰى اِتْمَامًا لِاَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ . (رواه مسلم : ١/٢١١)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে মারফূ'ভাবে বর্ণিত, যখন তোমাদের কেউ নামাযে সন্দেহ করে যে, তিন রাক'আত পড়ল না চার রাক'আত? তাহলে সে যেন সন্দেহ পরিত্যাগ করে নিশ্চিত (তিন) রাক'আতের উপর ভিত্তি (বিনা) করে (নামায শেষ করে)। অতঃপর সালাম ফিরাবার আগে দু'টি সিজ্‌দা করে, যদি সে বাস্তবে পাঁচ রাক'আতই পড়ে থাকে তাহলে এই দুই সিজ্‌দা তার নামাযকে (বিজোড় হতে) জোড়ে পরিণত করবে। আর যদি সে বাস্তবে চার রাক'আত পড়ে থাকে তাহলে এই দুই সিজ্‌দার পরিণামে শয়তানের অপমান ঘটবে।[১২]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ مَرْفُوْعًا اِذَا سَهَا اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهٖ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلّٰى اَوْثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلٰى وَاحِدَةٍ فَاِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلّٰى اَوْثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلٰى ثِنْتَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلّٰى اَوْ اَرْبَعًا، فَلْيَبْنِ عَلٰى ثَلَاثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ .

হযরত আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রা) থেকে মারফূ'রূপে বর্ণিত আছে যে, তোমাদের কেউ যদি নামাযে ভুলে যায়, অর্থাৎ সে জানেনা, এক রাক'আত পড়ল কি দুই রাক'আত? তবে যেন সে এক রাক'আতের উপর বিনা করে। আর যদি দুই রাক'আত এবং তিন রাক'আতের মাঝে সন্দিহান হয় তাহলে দুই রাক'আতের উপর বিনা করবে। আর যদি তিন রাক'আত এবং চার রাক'আতের মধ্যে সন্দিহান হয় তবে তিন রাক'আতের উপর বিনা করবে এবং সালামের পূর্বে দু'টি সিজ্‌দা দিবে।[১৩] (তিরমিযী ঃ ১ ঃ ৫৩)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّهٗ قَالَ : صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهٗ ، فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهٗ ،

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

১৩. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

وَنَظَرْنَا تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ.

رواه البخارى

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) কোন এক নামাযের মধ্যে দু'রাক'আত অন্তে (না বসে) দাঁড়িয়ে গেলেন, আর বসলেন না, তাঁর সাথে লোকেরাও দাঁড়িয়ে গেল, যখন তিনি নামায শেষ করলেন এবং আমরা তার সালামের অপেক্ষায় ছিলাম তখন সালামের পূর্বে তাক্‌বীর দিয়ে দু'টি সিজ্‌দা দিলেন। তখন তিনি ছিলেন বসা অবস্থায়, অতঃপর সালাম ফিরিয়েছেন।[১৪]

উপরোক্ত হাদীসসমূহে সালামের পূর্বে সাহু সিজ্‌দা করার কথা উল্লেখ রয়েছে। হানাফী ফকীহগণ বলেন ঃ (ক) এ সকল হাদীস জায়িয হওয়া বা বৈধতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থাৎ সালামের পূর্বে সাহু সিজ্‌দা করা জায়িয এতে নামায নষ্ট হবে না। (ফাতহুল বারী, ৩ ঃ ৭৫)

(খ) এখানে 'সালামের পূর্বে' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ঐ সালাম যা সাহু সিজ্‌দার পরে তাশাহহুদ পাঠ করে নামায থেকে ফারিগ হওয়ার নিয়্যতে বলা হয় একে (সালামে তাহলীল ও বলা হয়), সাহু সিজ্‌দার সাথে সম্পৃক্ত সালাম উদ্দেশ্য নয়।[১৫]

কেউ কেউ 'মাজমাউয যাওয়াইদে' উল্লেখিত (১ ঃ ২৭৩) হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস হানাফীদের বিপক্ষে দাড় করানোর চেষ্টা করেছেন, হাদীসটি হলো ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَهَا قَبْلَ التَّمَامِ فَسَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ ، وَقَالَ : مَنْ سَهَا قَبْلَ التَّمَامِ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ وَاِذَا سَهَا بَعْدَ التَّمَامِ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ بَعْدَ اَنْ يُّسَلِّمَ .

হযরত আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) নামায পূর্ণ করার আগে সাহু করলেন এবং সালামের আগে তিনি সাহু সিজ্‌দা করলেন। অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তি নামায পরিপূর্ণ করার আগে সাহু করে সে যেন সালামের আগেই সিজ্‌দা দেয়। আর যদি নামায পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর সাহু করে তাহলে সালামের পর সাহু সিজ্‌দা দিবে।

এ হাদীসটি হানাফীদের-বিপক্ষে পেশ করা যাবেনা এবং তা প্রমাণ যোগ্য নয়। কেননা দু'টি দুর্বল হাদীস এর সনদে ঈসা ইবনে মায়মূন রয়েছে, তার হাদীস গ্রহযোগ্যতার ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। আর অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরাম তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী (র) বলেন, উল্লেখিত হাদীসটি দুর্বল, তিনি আরো বলেন, প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষে (পূর্বোক্ত হাদীসসমূহের জবাবে বর্ণিত ব্যাখ্যার) একটি বিশেষ দলীল।

---

১৪. প্রাগুক্ত।

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩-১৫৪, দরসে তিরমিযী, পৃ. ১৪৬

www.pathagar.com

হানাফী ফকীগণ বলেন, হাদীসের সহীহ্ অর্থ হল যে ব্যক্তি নামাযে ভুল করে ফেলে এবং তা নামায পূর্ণ করার আগেআগে স্মরণ হয় তবে সে ঐ সালামের পূর্বে সিজ্‌দা দিয়ে নিবে যে সালাম দ্বারা নামায শেষ করা হয়। (যাকে সালামে তাহলীল বলা হয়) আর যদি নামায পরিপূর্ণরূপে আদায়ের পর অর্থাৎ নামাযের সকল রুকন আদায় করে সালাম ফিরানোর পর মনে পড়ে যে, তার উপর সাহু সিজ্‌দা ওয়াজিব ছিল তবে সে সালামে তাহলীলের পরেও সাহু সিজ্‌দা করবে। কেননা হানাফী মাযহাবে যার উপর সাহু সিজ্‌দা ওয়াজিব থাকে সে তাহলীলের নিয়্যতে সালাম–ফিরালেও তার নামায খতম হয়না। এ ক্ষেত্রে সে সাহু সিজ্‌দা করে পুনরায় তাশাহুদ পড়ে সালামে তাহলীল করবে।[১৬]

কোন কোন শাফিঈ ফকীহ ইমাম শাফীঈ থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতের প্রেক্ষিতে সালামের পর সিজ্‌দার বিধানকে মানুসূখ বা রহিত বলে আখ্যা দিয়েছেন,

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ وَاٰخِرُ الْاَمْرَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ .

ইমাম যুহরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগে এবং পরে সাহু সিজ্‌দা করেছেন। তবে এতদুভয়ের মধ্যে সালামের পূর্বে সিজ্‌দা করাই ছিল সর্বশেষ আমল।

এতে বুঝা যায় যে, সালামের পরের আমলটি রহিত। ইমাম আবু ঈসা (র) তিরমিযী শরীফে ইমাম শাফিঈর অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা হাযিমী (র) উক্ত রিওয়ায়াত ই'তিবার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং এ রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ করাকে ভুল ও ত্রুটিযুক্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন ঃ এ হাদীসটি منقطع। অতএব এর দ্বারা নসখ প্রমাণ হতে পারে না এবং তা অন্যান্য সহীহ হাদীসের মুকাবিলায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অধিকন্তু মারাসীলে যুহরী সম্পর্কে খতীব (র) কিফায়ায় উল্লেখ করেছেন যে ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তানের নিকট সে কোন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব নয়। অনুরূপভাবে ইমাম বায়হাকী (র) বলেন, যুহরী (র)-এর একথায় বিদ্যমান। কেননা তিনি কোন সাহাবীর দিকে সম্পর্কিত করে বলেননি।

তাছাড়া এ রিওয়ায়াতের বর্ণনাকারী মুতাররিফ ইবনে মাযিন শক্তিশালী রাবী নন। আল জাওহারুন নাকীর লিখক বলেন, বায়হাকী এখানে তো মুতাররিফের বিষয়কে খানিকটা নরম ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

অথচ 'যাবীল কুরবার অংশ' পরিচ্ছেদে তাকে সরাসরি দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লামা ইবনুল জাওযী (র)-এর কিতাবে উল্লেখ আছে, যে ইয়াহইয়া (র) বলেন, মুতাররিফ মিথ্যুক, সা'দী ও নাসাঈ (র) বলেন ঃ সে সিকাহ নয়। ইবন হিব্বান (র) বলেন, সে যা শুনত না তাও হাদীসরূপে বর্ণনা করত। তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা জায়িয নয়। তবে উপদেশ বা শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যায়।[১৭]

---

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

১৭. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০; মাআরিফুস সুনান, খণ্ড ৩, পৃ. ৪৯০।

www.pathagar.com

২. আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী (র) বলেন, এ সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ও দুর্বলতার কথা বাদ দিলেও তা গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। কেননা হযরত উমর ইবন আব্দুল আযীয (র) যুহরী (র)-এর এ রিওয়ায়াতটি রদ করে দিয়েছেন। এর প্রমাণ তাহাভী শরীফের একটি হাদীসে পাওয়া যায় (১৪২-৫৩)

قَالَ الطَّحَاوِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَهُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنِىْ الزُّهْرِىُّ قَالَ : قُلْتُ : لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ السُّجُوْدُ قَبْلَ السَّلَامَ فَلَمْ يَأْخُذْ بِهٖ .

সাঈদ ইবন আব্দুল আযীয (র) থেকে বর্ণিত যুহুরী (র) বলেছেন, আমি উমর ইব্ন আব্দুল আযীয (র)-কে বললাম, সাহু সিজ্দা সালামের আগে হবে। কথাটি শুনে তিনি তা গ্রহণ করেননি। কাজেই اٰخِرُ الْاَمْرَيْنِ قَبْلَ السَّلَامَ একথাটি ইমাম যুহরী (র) অনুমান করে বলেছেন, বলেই সুস্পষ্টাকারে বুঝে আসে।[১৮]

কিয়াস ও যুক্তির নিরীখেও একথা প্রতীয়মান হয় যে সাহু সিজ্দা সালামের পর হওয়া চাই, আগে নয়।

যখনই নামাযে ভুল হয় তখনই সিজ্দা দেওয়ার বিধান শরী'আতে নেই। শরী'আতে সাহু সিজ্দার বিধান নামাযের শেষে রাখা হয়েছে শুধু এ হিক্মতের প্রতি লক্ষ্য রেখে, যেন নামাযের মধ্যে সংঘটিত সমস্ত ভুল এক বারের সাহু সিজ্দার মাধ্যমেই যথেষ্ট হয়ে যায়। কেননা ভুল একের পর এক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, বার বার সিজ্দার বিধান হলে তা কষ্টকর হবে।

হানাফী ফকীহগণ বলেন, উক্ত ভুল তো সালাম না দেওয়া পর্যন্তও হতে পারে। যেমন কেউ সালামের পূর্বে সাহু সিজ্দা করল, অতঃপর তার সন্দেহ সৃষ্টি হল, তিন রাক'আত পড়েছে না কি চার রাক'আত এ সন্দেহে লিপ্ত হয়ে সালাম বিলম্বে ফিরালো। এরপর তার মনে হল যে সে চার রাক'আতই পড়েছে, এহেন অবস্থায় (সালাম ফিরানো এই) ওয়াজিবটি বিলম্বে আদায়ের কারণে সে যদি সাহু সিজ্দা দেয় তাহলে একই নামাযে সাহু সিজ্দা দু'বার হয়ে যায়। অথচ শরী'আতে এর কোন নিয়ম নেই যা স্বাভাবিক বিধান পরিপন্থী। আর যদি সাহু সিজ্দা না করে তাহলে সে ত্রুটিটি অপূরণ অবস্থায়ই থেকে যায়? অতএব তা পূরণের লক্ষ্যে সালামের পর সিজ্দায়ে সাহু আদায় করা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হল।[১৯]

নামাযে সন্দেহ দেখা দিলে তা নিরসনের উপায়

কারো নামাযে সন্দেহ দেখা দিল, যে, সে কত রাক'আত পড়েছে? এরূপ সন্দেহ নিরসনের কি পদ্ধতি সে সম্পর্কে হাদীসের বক্তব্যে বিভিন্নতা রয়েছে। অধিকাংশ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে,

১৮. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত।

১৯. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

(ক) যদি এটি তার জীবনের প্রথম সন্দেহ হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য পুনরায় নামায আদায় করা ওয়াজিব[২০]। তবে উক্ত সন্দেহ যদি সালাম ফিরানোর পরে সৃষ্টি হয় তাহলে নামায দোহরানো ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে সালামের পূর্বে তাশাহ্হুদ পরিমাণ বৈঠক করার পর সন্দেহ দেখা দিলে নামায দোহরানো ওয়াজিব নয়।

(খ) আর যদি তার জীবনে বার বার এমন ঘটনা ঘটে তাহলে নামায দোহরানো ওয়াজিব নয়। বরং এ ক্ষেত্রে (তাহাররী) সঠিক দিক অনুসন্ধানের চেষ্টা করতে হবে এবং তাহাররী করে যেদিকে প্রবল ধারণা জন্মে সে অনুযায়ী আমল করবে।

(গ) আর যদি কোন দিকের ধারণা প্রবল না হয় তাহলে بِنَاءٌ عَلَى الْاَقَلِّ (কম সংখ্যক রাক'আতের উপর বিনা) করে অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করবে এবং শেষে সাহু সিজ্‌দা করবে। তবে বিনা আলাল আকাল্লের সূরতে অবশ্যই প্রত্যেক ঐ রাক'আতের পর বৈঠক করবে যার সম্পর্কে সম্ভাবনা থাকে যে এটি তার শেষ রাক'আত[২১]। আর এটিই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। অতএব যদি চার রাক'আত বিশিষ্ট নামাযে সন্দেহ জাগে যে, এটা প্রথম রাক'আত না দ্বিতীয় রাক'আত ? তাহলে এতে প্রথম রাক'আত বলে ধার্য করত বৈঠক করবে (কেননা এটা দ্বিতীয় রাক'আত ও হতে পারে) অতঃপর দাড়িয়ে আরেক রাক'আত পড়েও বৈঠক করবে (কেননা এটা দ্বিতীয় রাক'আত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে) অতঃপর দাঁড়িয়ে আরেক রাক'আত বৈঠক করবে। কেননা (এটি তৃতীয় রাক'আতও হতে পারে–এবং) চতুর্থ রাক'আতও হতে পারে।

অতঃপর দাড়িয়ে আরেক রাক'আত পড়ে বৈঠক করবে, এভাবে মোট চার বৈঠক করবে তন্মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ বৈঠক ফরয স্বরূপ। আর বাকি দুই বৈঠক ওয়াজিব বলে গণ্য হবে।[২২]

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ

মোটকথা নামাযে সন্দেহ সৃষ্টি হলে তা নিরসনের তিন অবস্থায় তিনটি পদ্ধতি। নিম্নে প্রতিটি পদ্ধতি পৃথকপৃথক উল্লেখ করে তদসংশ্লিষ্ট হাদীস পেশ করা হল ঃ

(ক) জীবনের প্রথম সন্দেহ হয়ে থাকলে নামায দোহারানো ওয়াজিব।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ، اَنَّهُ قَالَ فِيْ الَّذِىْ لاَ يَدْرِىْ كَمْ صَلَّى اَثَلاَثًا اَوْ اَرْبَعًا ، قَالَ : «يُعِيْدُ حَتَّى يَحْفَظَ» وَفِىْ لَفْظٍ عَنْ اَبِنْ سِيْرِيْنَ "اَمَا اَنَا اِذَا لَمْ اَدرِكَمْ صَلَّيْتُ فَاِنِّى اُعِيْدُ" .

---

২০. আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাসূল মুহতাদ্দু, যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ।

২১. অধিকাংশ শাইখগণের মতে এ হুকুম বালিগ হওয়ার পরে প্রযোজ্য ঃ রাদ্দুল মুহতার, খণ্ড. ৩ পৃ. ৫৬১ ঃ প্রাগুক্ত।

২২. (ক) আল ফিকহুল ইসলামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫ পরিচ্ছেদ ঃ নামাযে সন্দেহ
(খ) ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, পরিচ্ছেদ সিজ্‌দায়ে সাহু।
(গ) ফাতাওয়া আলমগীরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।
(ঘ) বাহরুর রাইক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১০৯।
ই'লাউস সুনান; প্রাগুক্ত ঃ পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের রাকা'আতসমূহে সন্দেহ দেখা দিলে তার বিধান, পৃ. ১৭৮, খণ্ড ৭, হাদীস নং ১৮৮৭।

www.pathagar.com

أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ، كذا فى البناية (٩٢١/١) وسكت عنه الحافظ فى الدراية (ص : ٢٦) وقال : وأخرج أبى ابن أبى شيبة نحوه عن سعيد بن جبير وشريح وابن الحنفية اه وفى نيل الأوطار ٥٠٤/) وهو روى عن ابن عباس ، و ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة ، واليه ذهب عطاء ، والأوزاعى ، والشعبى، وأبو حنيفة .

সাঈদ ইবন জুবায়র (র) হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জানেনা যে, সে কত রাক'আত পড়েছে, তিন রাক'আত না চার রাক'আত ? তাহলে সে স্মরণ না আসা পর্যন্ত নামায পুনরায় পড়ে নিবে।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فِىْ صَلَاتِهٖ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلّٰى؟ فَقَالَ : لِيُعِدْ صَلَاتَهُ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَاعِدًا .

أخرجه الطبرانى فى الكبير وهو من رواية اسحاق بن يحى بن عبادة بن الصامت ، قال القرافى : لم يسمع عن جده عبادة كذا فى نيل الأوطار ٣٦٥/٢، قلت : قال البخارى : احاديثه معروفة ، وذكره ابن حبانى فى الثقات فى التابعين كما فى التهذيب (٢٥٦/١) وسكوت العراقى من بقيته الرواة يشعر بان كلهم ثقات . والانقطاع فى القرون الثلاثة لا يضر عندنا .

হযরত উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল যে নামাযে ভুলে নিঃপতিত হয়েছে। ফলে জানেনা সে কত রাক'আত পড়েছে ? জবাবে তিনি বললেন সে নামায পুনরায় পড়ে নিবে এবং বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্‌দা দিবে[২৩]। (তাবারানী কাবীর)

محمد : قال أخبرنا مالك بن مغول من عطاء بن اَبِىْ رَبَاحٍ اَنَّهٗ قَالَ : يُعِيْدُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهٖ نَاْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِىْ حَنِيْفَةَ .

হযরত আতা ইব্‌ন আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এরূপ ব্যক্তি) নামায দোহরায়ে নিবে। মুহাম্মদ (র) বলেন, এটাই আমাদের অভিমত, এটাই হল ইমাম আযম আবু হানীফার মত।

---

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩, হাদীস নং ১৮৯২।

www.pathagar.com

(খ) যদি এরূপ ঘটনা তার জীবনে বারবার হয়-অর্থাৎ প্রায়ই তার নামাযে সন্দেহ হয়ে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে দোহরানো ওয়াজিব নয়। এ ক্ষেত্রে তাহাররী অনুযায়ী আমল করবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا اذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهٖ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ .

رواه مسلم (۱/۲۲) وفى رواية له : فَلْيَتَحَرَّ اَقْرَبَ ذَالِكَ إِلَى الصَّوَابِ ، وَفِيْ أُخْرٰى لَهٗ فَلْيَنْظُرْ أُخْرٰى ذٰلِكَ لِلصَّوَابِ .

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে মারফূরূপে বর্ণিত যখন তোমাদের কারো নামাযে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তখন সে যেন সঠিক দিকে উপনীত হওয়ার জন্য তাহাররী (অনুসন্ধান বা চেষ্টা) করে এবং এর উপর ভিত্তি করে বাকি নামায সম্পূর্ণ করে। অতঃপর দু'টি সিজ্‌দা আদায় করবে, (মুসলিম) অর্থাৎ সাহু সিজ্‌দা দিবে[২৪]।-

عَنْ طَاؤُسٍ قَالَ : اذَا صَلَّيْتَ فَلَمْ تَدْرِكَمْ صَلَّيْتَ فَاَعِدْهَا مَرَّةً فَانْ اُنْسِيْتَ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰى فَلَا تُعِدْهَا .

أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (۲/۲۸) باب من قال اذا شك فلم يدركم صلى اعاد .

হযরত তাঊস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামায পড়াকালে তুমি যদি না জান কত রাক'আত পড়েছ ? তাহলে তা এক বারের মত দোহরিয়ে নিবে, আর যদি দ্বিতীয়বার যদি এরূপ ভুল হয় তবে দোহরাবে না। (মুসান্নাফে ইবন আবু শাইবা)

مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فِيْمَنْ نَسِيَ الْفَرِيْضَةَ فَلَا يَدْرِيْ اَرْبَعًا صَلّٰى اَمْ ثَلَاثًا ، قَالَ : اِنْ كَانَ اَوَّلَ بِنِسْيَانِهٖ اَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَاِنْ كَانَ يُكْثِرُ النِّسْيَانَ يَتَحَرَّى الصَّوَابَ ، وَاِنْ كَانَ اَكْبَرَ رَائِيْهِ اَنَّهٗ اَتَمَّ الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَاِنْ كَانَ اَكْبَرَ رَأْيِهٖ اَنَّهٗ صَلّٰى ثَلَاثًا أَضَافَ اِلَيْهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَيِ السَّهْوِ .

أخرجه فى كتاب الاثار ص : ۳۲ وسنده صحيح .

হযরত ইমাম আবু হানীফা (র) হাম্মাদের সূত্রে ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তির নামাযে ভুল হয় অর্থাৎ সে জানেনা যে, চার রাক'আত পড়ল না তিন রাক'আত। তার

২৪. মুসান্নাফে ইবনে আবু শাইবা ঃ باب من قال اذا شك فلم يدركم صلى اعاد, পৃ. ২৮, খণ্ড ২, সূত্রঃ দরসে তিরমিযী ঃ টীকা নং ১, পৃ. ১৪৮, খণ্ড ২।

www.pathagar.com

সম্পর্কে ইবরাহীম (র) বলেন, এটি যদি তার প্রথমবারের মত হয়ে থাকে, তাহলে নামায দোহরিয়ে নিবে। আর যদি ভুল বারংবার হয়ে থাকে তাহলে সঠিক দিকের অনুসন্ধান (তাহাররী) করবে, যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, নামায পূর্ণ করে নিয়েছে তাহলে শেষে দু'টি সিজ্‌দায়ে সাহু দিবে। আর যদি প্রবল ধারণা হয় যে তিন রাক'আত পড়েছে তবে তার সাতে আরো এক রাক'আত মিলাবে। এরপর সাহু সিজ্‌দা করবে।[২৫] (কিতাবুল আসার, ৩২)

(গ) যদি কোন দিকের প্রতিই ধারণা প্রবল না হয় তবে بِنَاءُ عَلَى الاَقَلِّ করবে এবং শেষে সাহু সিজ্‌দা দিয়ে নিবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ : اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهٖ فَلَمْ يَدْرِكَمْ صَلّٰى ثَلَاثًا أَمْ اَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلٰى مَا اسْتَقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ . رواه مسلم (١/٢١١ ، ٢١٢)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কারো নামাযে সন্দেহ সৃষ্টি হয় ফলে সে জানেনা যে সে কত রাক'আত পড়েছে। তিন রাক'আত না চার রাক'আত ? তাহলে সে যেন সন্দেহ (যুক্ত রাক'আতকে পরিত্যাগ করে এবং নিশ্চিত (তিন) রাক'আতের উপর বিনা করে। অতএব দু'টি সিজ্‌দা আদায় করে। (মুসলিম)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهٖ فَلَمْ يَدْرِ اِثْنَتَيْنِ صَلّٰى اَوْ ثَلَاثًا فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِيْنِ .

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন (আমাদের কারো নামাযে সন্দেহ দেখা দেয় ফলে সে বলতে পারে না, যে, দুই রাক'আত পড়েছে না তিন রাক'আত ? তখন সে যেন সন্দেহকে পরিত্যাগ করে নিশ্চিত রাক'আতের উপর বিনা করে।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ، اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهٖ فَلَمْ يَدْرِ اَوَاحِدَةً صَلّٰى اَمْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَاِذَا لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلّٰى اَمْ ثَلَاثًا فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَاِذَا لَمْ يَدْرِىْ ثَلَاثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَسْجُدْ اِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهٖ .

الحديث رواه أحمد وابن ماجة والترمذى وصححه كذا فى النيل ص ٢٦٤ :

---

২৫. ই'লাউস্ সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯-১৮০; হাদীস নং ১৮৮৮; প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৮৯১ পৃ. ১৮৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৮৯৪ পৃ. ১৮৫

www.pathagar.com

হযরত আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যদি তোমাদের কারো নামাযে সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং সে জানেনা যে সে এক রাক'আত পড়েছে না দু' রাক'আত ? তবে সে (بِنَاءً عَلَى الأَقَلِّ এর নিয়মানুসারে) ধরে নিবে এক রাক'আত পড়েছে। আর যদি সন্দেহ দুই এবং তিন রাক'আতের মাঝে হয় তাহলে ধরে নিবে রাক'আত। আর যদি সন্দেহ হয়। তিন রাক'আত পড়লি কি চার রাক'আত তাহলে তিন রাক'আত ধরে নিবে এরপর নামায শেষে সাহু সিজ্‌দা করবে[২৬]। (আহমাদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

উপরোক্ত হাদীসসমূহের আলোকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, নামাযে সন্দেহ দেখা দিলে তা নিরসনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন উপায় রয়েছে। কাজেই সাধারণভাবে বলা যাবে না যে, সর্বাবস্থায় নামায দোহরানো ওয়াজিব কিংবা সর্বাবস্থায় 'বিনা আলাল আকাল' ওয়াজিব। কেননা এরূপ বললে কিছু হাদীসের উপর আমল হবে আবার কিছু হাদীস বাদ দেওয়া হবে। এ কারণেই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) তিন অবস্থায় তিন প্রক্রিয়া অবলম্বন করার কথা বলে থাকেন।

সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব

সিজ্‌দায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব না সুন্নাত, এ সম্পর্কে হাদীসের বক্তব্যে বিভিন্নতা থাকলেও অধিকাংশ হাদীস থেকে এ কথাই প্রতিভাত হয় যে সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব, সুন্নাত নয়।[২৭] হযরত উসমান, আব্দুল্লাহ ইবন উমর, নাফি' সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইবরাহীম নাখঈ হাসান ও হাম্মাদ ইবন আবু সুলাইমান প্রমুখ সাহাবী এবং তাবিঈ থেকে এ অভিমতটি বর্ণিত রয়েছে।[২৮]

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا قَرَأَ ابْنُ اٰدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِىْ يَقُوْلُ : يَا وَيْلَتِىْ : اُمِرَ ابْنُ اٰدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَاُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَاَبَيْتُ فَلِىَ النَّارُ .

---

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪, হাদীস নং ১৮৯৩

২৭. (ক) আল্লামা মুহাম্মদ ইবন আবেদীন শামী ঃ রদ্দুল মুহতার মাকতাবায়ে যাকারিয়া দেওবন্দ। সাহারানপুর ভারত, পরিচ্ছেদ : সাজদায়ে তিলাওয়াত, খণ্ড ২ পৃ. ৫৭৫

(খ) শাইখ ওয়াহ্ বাতুল্লাহ যুহায়লী, আল-ফিকহুল ইসলামী, মাকব্যাবায়ে হক্কানিয়া, মহল্লা জঙ্গী, পেশাওয়ার, পাকিস্তান, সিজ্‌দায়ে তেলাওয়াত ও তার হুকুম প্রসঙ্গে, খণ্ড ২, পৃ. ১১০।

(গ) আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম. ফতেহুল ক্বদীর মাকত্যাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান। পরিচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত ঃ খণ্ডঃ ১ পৃ. ৪৬৫

২৮. মা'আরিফ সুনান, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

(أخرجه مسلم فى كتاب الايمان من الصحيح ٦١/١ كذا فى الزيلعى ٢٠٥/١ وجمع الفوائد ٩١/١)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, আদম সন্তান যখন সিজ্‌দার আয়াত তিলাওয়াত করে, সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ে তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে যায় এবং বলতে থাকে, হায় আফসোস আমার! আদম সন্তানকে সিজ্‌দার আদেশ দেওয়া হলো অমনি সে সিজ্‌দা করে নিল। অতএব সে জান্নাত পাবে। পক্ষান্তরে আমাকে সিজ্‌দার আদেশ দেওয়া হলে আমি তা অস্বীকার করলাম ফলে আমার ঠিকানা হল জাহান্নাম[২৯]।

এই হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব। মালিকুল উলামা আল্লামা কাসানীর নিজ গ্রন্থ 'বাদাইউস্ সানাই'তে এর প্রামাণ্যের দিকটি এভাবে তুলে ধরেছেন যে, মূলনীতি হলো, কোন একটি হুকুম যদি বিধানদাতা-হাকিম ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে আদেশসূচকভাবে ব্যক্ত করা হয়, আর পরবর্তীতে-এর ব্যাপারে অস্বীকৃতি প্রকাশ না করা হয় তাহলে তাতে এ কথা প্রতিভাত হয় যে এই আদেশটি সঠিক ও বাস্তব। কাজেই হাদীসে বর্ণিত বনী আদমের জন্য সিজ্‌দার আদেশটি বহাল থাকবে। উসূল বিদগণের মতে শরী'আতে বর্ণিত আদেশসূচক ক্রিয়া সাধারণত ওয়াজিব বুঝায়। সুতরাং সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে এ হাদীসটি, প্রমাণ স্বরূপ বিবেচিত। তাই হযরত উসমান, আলী, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) প্রমুখ বলেছেন ঃ

اَلسَّجْدَةُ عَلٰى مَنْ تَلاَهَا : وَعَلٰى مَنْ سَمِعَهَا ، وَعَلٰى مَنْ جَلَسَ لَهَا

'সিজ্‌দার আয়াত যে তিলাওয়াত করবে তার উপর সিজ্‌দা ওয়াজিব, যে শ্রবণ করবে তার উপরও ওয়াজিব এবং যে তা তিলাওয়াত বা শ্রবণের জন্য বসবে তার উপরও ওয়াজিব।' উল্লেখ্য যে, على শব্দটি ওয়াজিব বুঝায়। তাছাড়া সিজ্‌দা না করার দরুন আল্লাহ্ বহু সম্প্রদায়কে নিন্দা করত ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لاَ يَسْجُدُوْنَ .

আর ওয়াজিব তরক করলেই নিন্দা পাওয়ার যোগ্য হয়। সুতরাং সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব প্রমাণিত হল।[৩০]

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : «كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَءُ السُّوْرَةَ الَّتِىْ فِيْهَا السَّجْدَةُ ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتّٰى لاَ يَجِدُ اَحَدُنَا مَكَانًا مَوْضِعِ جَبْهَتِهٖ فِىْ غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

(أخرجه الشيخان وأبو داؤد ، جمع الفوائد ٩٥/١)

---

২৯. আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান ঃ ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামিয়া, করাচী, পাকিস্তান, পরিচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত প্রসঙ্গে, খণ্ড ৭, পৃ. ২২৩, হাদীস নং ১৯২৭।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩, বাদাইস সানা প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮-৪২৯, খণ্ড ১।

www.pathagar.com

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ সূরা পড়তেন যাতে সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াতে রয়েছে। অতঃপর সিজ্‌দা দিতেন, আমরাও তার সাথে সিজ্‌দা দিতাম, এমন কি–সালাতের সময় ছাড়াই (প্রচণ্ড ভীড়ের কারণে) আমাদের কেউ কেউ সিজ্‌দা নিজ কপাল রাখার জন্য কোন স্থান পেত না।[৩১] (বুখারী, মুসলিম, আবু দাঊদ)

সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াতের বিষয়টিকে এরূপ গুরুত্ব দেওয়া এবং তার প্রতি সবিশেষ যত্নবান হওয়ার দ্বারা এ কথাই প্রতিভাত হয় যে, তা ওয়াজিব।

কারণ, সুন্নাতে যায়িদাহ কিংবা মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে এরূপ গুরুত্বারোপ সাধারণত করা হয় না। হবে অধিকন্তু এ হাদীস দ্বারা এত বুঝে আসে যে, শ্রোতাদের উপরও সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হয়।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنَ ، فَاِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ سَجَدْنَا مَعَهُ

رواه أبو داؤد ٢٥٤/١ وسكت عنه ، وفى التلخيص الحبير (١١٤/١) وفيه العمرى عبد الله المكبر وهو ضعيف واخرجه الحاكم من رواية العمرى ايضًا لكنه وقع عنده مصفرًا وهو الثقة ، قال : إنه على شرط الشيخين ، قلت : ليس لفظ "كبر" فى "المستدرك" الموجود عندنا ، وعبد الله المكبر حسن الحديث، وثقه ابن معين وابن عدى والعجلى، وأحمد بن يونس ، وروى عنه ابن مهدى ، وهو لا يروى الا عن ثقة ، وحسن حديث يعقوب بن شيبه ، وضعفه أحمد وغيره كما فى التهذيب (٢٢٧/٥)

৩. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সামনে কুরআন পড়তেন। যখন সিজ্‌দার আয়াত পড়তেন তখন তাক্‌বীর দিয়ে সিজ্‌দায় যেতেন এবং আমরাও তার সাথে সিজ্‌দায় যেতাম।[৩২] (আবূ দাঊদ)

عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ سَجْدَةِ ص فَقَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ اَيْنَ سَجَدْتَّ ؟ فَقَالَ : اَوْمَا تَقْرَأُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰهُمُ اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ . فَكَانَ دَاوُدُ مِمَّنْ اُمِرَ نَبِيُّكُمْ اَنْ يَّقْتَدِيَ بِهٖ فَسَجَدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . (أخرجه البخارى ٧٠/٢)

হযরত আওয়াম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুজাহিদের নিকট সূরা ص (সাদ)-এর সিজ্‌দা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমিও হযরত ইব্‌ন আব্বাস

৩১. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯, হাদীস নং ১৯৩৮।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৯-২৫০, হাদীস নং ১৯৫৬।

www.pathagar.com

(রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি কোত্থেকে (সা'দে) সিজ্‌দা দিলেন ? তখন তিনি বললেন, তুমি কি এ আয়াত পড়নি ?

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ . أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَهُمُ اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ .

দাউদ (আ) ছিলেন এমন নবী যার অনুকরণ করার জন্য তোমাদের নবী (মুহাম্মদ সা) আদেশ প্রাপ্ত হয়েছেন। কাজেই রাসূলুল্লাহ (সা) তাতে সিজ্‌দা করেছেন।[৩৩] (বুখারী শরীফ)

ইমাম আবূ বকর রাযী (র) স্বরচিত গ্রন্থ 'আহকামুল কুরআনে' এ হাদীসের আলোকে সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াতকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করতে যেয়ে বলেন, সাঈদ ইবন জুবাইরের রিওয়ায়াতে ইবন আব্বাস (রা)-এর এ বক্তব্য যে, নবী করীম (সা)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার ফরমান ঃ "অতএব তুমি তাদের পথ অনুকরণ করে চল" এর ভিত্তিতে হযরত দাঊদ (আ)-এর অনুসরণ করে সিজ্‌দাকারী দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সিজ্‌দাকে ওয়াজিব বলে বিবেচনা করেছেন।

কেননা অর্থাৎ আদেশসূচক ক্রিয়া ওয়াজিব বুঝায়। তাহাভী শরীফে (১/২১২) আতওয়াম (র)-এর হাদীসটি নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে ঃ

سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ السُّجُوْدِ فِىْ ص ، فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : اسْجُدْ فِىْ ص ، فَتَلاَ هٰذِهِ الاياتِ مِنَ الانْعَامِ ، فَذَكَرَهَا فَكَانَ دَاوُدُ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ ﷺ اَنْ يَقْتَدِىْ بِهٖ .

এখানে বলা হয়েছে যে মুজাহিদ (র) ইবন আব্বাস (রা)-কে সা'দ -এর সিজ্‌দা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আদেশমূলক ক্রিয়া উল্লেখপূর্বক বলেছেন اسْجُدْ فِىْ ص। (তুমি সা'দে সিজ্‌দা দিবে) যা ওয়াজিব হওয়ার উপর সুস্পষ্ট দলীল[৩৪]।

---

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪, হাদীস নং ১৯৪২।

৩৪. প্রাগুক্ত, (টীকা নং ২)
মালিকুল উলামা আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী (র) বলেন, কুরআনে বিদ্যমান সিজ্‌দার আয়াতসমূহ তিন ধরনের (ক) কিছু আয়াত এমন রয়েছে যাতে সিজ্‌দার আদেশ প্রদান করা হয়েছে যথা كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (সূরা আলাক)
আর আদেশসূচক ক্রিয়া ওয়াজিব বুঝায় কাজেই সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব।
(খ) কিছু আয়াত এমনও আছে যাতে সিজ্‌দা না করার কারণে কাফির ও মুশরিকদের তিরস্কার করা হয়েছে যথা وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ (ইনশিকাক) কোন জিনিস মুস্তাহাব বা সাধারণ পর্যায়ের হলে তাতে সালাম ও তিরস্কার করা হয় না। এতে বুঝা যায় যে, সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব। তাছাড়া কাফির মুশরিকদের বিরোধিতা করণার্থেও মুসলমানদের সিজ্‌দা করা আবশ্যক। কেননা কুরআন ও হাদীসে তাদের বিরুদ্ধাচারণ করার নির্দেষ প্রদান করা হয়েছে। এবং তাদের সদৃশ্যতা থেকে বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে। যেমন يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا হে মু'মিনগণ! তোমরা কাফিরদের মত হয়োনা। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৬)
(গ) কিছু আয়াত এমনও আছে যাতে আল্লাহ তা'আলা তার অনুগতশীল বিশেষ বান্দা নবী-ওলীদের তাঁরই স্মরণে সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ার সংবাদ উম্মতে মুহাম্মদীকে জানিয়েছেন ঃ যথা وَظَنَّ دَاوُدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ رَاكِعًا وَّاَنَابَ এবং তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলার আদেশ প্রদান করেছেন। কাজেই এর দাবীও হল, তাদের অনুসরণ করলাম সিজ্‌দায়ে তিলওয়াত ওয়াজিব হওয়া। বাদাইউস সানায়ে, প্রাগুক্ত, খণ্ড. ১, পৃ. ৪২৯।

www.pathagar.com

উপরোক্ত হাদীসসমূহের আলোকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, সিজ্দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব, সুন্নাত নয়। আর ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) একথাই বলেছেন। অবশ্য কিছু কিছু হাদীস এমন রয়েছে যার দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, সিজ্দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব নয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে সেগুলো দ্বারা ওয়াজিব না হওয়ার পক্ষে প্রমাণ পেশ করা যথার্থ নয়। সর্বোপরি বাস্তবে সে সকল হাদীস হানাফী মাযহাবের বিপক্ষে নয়। হানাফী ফকীহ্গণ সে সমস্ত হাদীসের যথোচিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, নিম্নে ঐ সমস্ত হাদীস পেশ করা হল ঃ

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا أَحَدٌ . متفق عليه كذا في المغني (١/٢٥٤)

(ক) যায়িদ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর সামনে সূরা النجم। নাজ্ম পড়লাম। কিন্তু আমাদের কেউ সিজ্দা করেনি।

সুনানে ইব্ন আবু শায়বাতে ইব্ন আজ্লানের সূত্রে বর্ণিত আছে, যে, হযরত যায়দ ইবন আসলাম (র) বলেন, একজন বালক নবী করীম (সা)-এর সামনে সিজ্দার আয়াত পড়ল। অতঃপর সে নবী করীম (সা)-এর সিজ্দার অপেক্ষায় ছিল রাসূলুল্লাহ (সা) সিজ্দা না দেওয়াতে সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ আয়াতে কি সিজ্দা নেই ? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু তুমি ছিলে এ ক্ষেত্রে আমাদের ইমাম। যদি তুমি সিজ্দা দিতে তাহলে আমরা সিজ্দা করতাম, (ফাতহুল বারী (২/৪৫৭)

এর উত্তর হলো, প্রথমত, হাদীসদ্বয়ের মধ্যে সিজ্দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব নয় এরূপ কথা বা নির্দেশিকা বিদ্যমান নেই। দ্বিতীয়ত, হানাফী মাযহাবে সিজ্দায়ে তিলাওয়াত নামাযের বাইরে على الفور। বা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব নয়। এবং এ ক্ষেত্রে পরে যে কোন সময় আদায়ের অবকাশ রয়েছে। কাজেই হতে পারে, বিশেষ কোন কারণে সে মুহূর্তে তিনি সিজ্দা করেননি, পরবর্তীতে তা আদায় করে নিয়েছেন। আর দ্বিতীয় হাদীসটির মর্ম হলো, সমবেত লোকজনের সম্মুখে কোন ব্যক্তি সিজ্দার আয়াত পাঠ করলে উপস্থিত শ্রোতাদের জন্য উচিৎ হবেনা, তিলাওয়াতকারীর। আগে সিজ্দা না দেওয়া বরং তার সাথে একসঙ্গে সিজ্দা দিবে। যায়িদ (রা) ছিলেন তিলাওয়াতকারী সুতরাং তিনি সিজ্দা না দেওয়ায় নবী কারীম (সা) সিজ্দা করেননি। তাই তো তিনি বলে দিয়েছেন, তুমি ছিলে আমাদের ইমাম, তুমি সিজ্দা দিলে আমরাও সিজ্দা দিতাম।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণ এ আয়াতে সিজ্দার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে সিজ্দা দেননি তার কোন প্রমাণ হাদীসে বিদ্যমান নেই। কাজেই এরূপ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে উপরোক্ত হাদীদ্বয় দ্বারা সিজ্দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব না হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করা বাস্তব সম্মত নয়।[৩৫]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُوْرَةِ النَّمْلِ حَتّٰى اِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ ،

৩৫. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৭, পৃ. ২২৩-২২৪।

www.pathagar.com

حَتّٰى اِذَا كَانَتِ الْجُمْعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَبِهَا حَتّٰى اِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ : يٰاَيُّهَا النَّاسُ ! اِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُوْدِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ اَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ لَه عُمَرُ .

وَفِىْ لفظ : اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرِضْ عَلَيْنَا السُّجُوْدَ اِلاَّ اَنْ نَشَاءَ ، وَفِىْ الْمُوْطَّا فَلَمْ يَسْجُدْ وَمَنَعَهُمْ اَنْ يَسْجُدُوْا .

(খ) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি জুমু'আর দিন মিম্বারে সূরা নামল পড়লেন অতঃপর যখন তিনি সিজ্‌দার আয়াত পড়লেন তখন সাথে সাথে মিম্বার থেকে অবতরণ করে সিজ্‌দা করলেন এবং উপস্থিত লোকেরাও তার সাথে সিজ্‌দা করলেন। পরবর্তী জুমু'আ আসলেও তিনি এই একই সূরা পড়লেন। এক পর্যায়ে সিজ্‌দার আয়াতটিতে পৌঁছলে বললেন, হে লোক সকল! আমরা সিজ্‌দার আয়াত পড়ি, অতএব যে সিজ্‌দা দিল সে সঠিক কাজ করল। আর যে সিজ্‌দা দিল না তার উপর কোন গুনাহ নেই। কিন্তু উমর (রা) সিজ্‌দা করেননি (বুখারী)

অপর এক বর্ণনায় আছে, উমর (রা) বলেছেন, আল্লাহ্ আমাদের উপর সিজ্‌দাকে ফরয বা আবশ্যক করেননি। কিন্তু আমরা ইচ্ছা করলে তা করতে পারি। মু'আত্তার বর্ণনায় আছে, তিনি সিজ্‌দা করেননি। এমনকি তাদেরকে সিজ্‌দা করতে নিবারণ করেছেন।

যারকানী (র) বলেন, উমর (রা)-এর এ কথার উপর কোন একজন সাহাবীর অস্বীকৃতি না প্রকাশ করায় প্রমাণ হল যে, সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব নয়।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হানাফী ফকীহগণ বলেন, হযরত উমর (রা)-এর কথা مَنْ سَجَدَ فَقَدْ اَصَابَ وَمَنْ لَّمْ يَسْجُدْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ এর অর্থ হল যে ব্যক্তি আয়াতে সিজ্‌দা তিলাওয়াত কিংবা শ্রবণ মাত্রই সিজ্‌দা করে সে সঠিক ও উত্তম কাজ করল। আর যে তাৎক্ষণিকভাবে সিজ্‌দা করল না তাহলে তাতে তার কোন গুনাহ হবে না। অপর বর্ণনায় তার বক্তব্য اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرِضْ عَلَيْنَا اِلاَّ اِنْ نَشَاءَ দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়, কেননা اِلاَّ اَنْ نَشَاءَ। অর্থ হল وَقْتَ الْمَشِيْئَةِ (অর্থাৎ আমরা যখন সিজ্‌দার ইচ্ছায় সিজ্‌দায় করব তখনই আমাদের একাজটি ওয়াজিব স্বরূপ আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে।)

কেননা আরবীতে মাসাদার থেকে ظرف কে ফেলে দেওয়ার বহুল প্রচলন রয়েছে। এ ছাড়া অন্য কিছু হযফ করার বিষয়টি খুবই বিরল। আর استثناء-এর দুই প্রকারের মধ্যে মৌলিক দিক হচ্ছে, مُتَّصل (মুত্তাসিল) হওয়া, منقطع (মুনকাতি) নয়। অতএব হাদীসের অর্থ হবে اِنَّ السُّجُوْدَ فَرِضٌ وَقْتَ الْمَشِيْئَةِ

অতএব এ আসারটি হানাফীদের বিপক্ষে নয়; বরং তা হানাফীদের সপক্ষেই একটি প্রমাণ, এতদার্থে যে, সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত হানাফী মাযহাবে নামাযের বাইরে على الفور বা তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজিব নয়; বরং على التراخي ওয়াজিব।[৩৬]

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪-২২৫।

www.pathagar.com

যদি প্রশ্ন করা হয় যে তিলাওয়াত এবং শ্রবণের পর তাৎক্ষণিকভাবে সিজ্‌দা করা যদি সঠিক ও উত্তম কাজ হয়ে থাকে, তাহলে উমর (রা) তাদেরকে তখন সিজ্‌দা করতে বারণ করলেন কেন ?

এর উত্তর হল : তখন ইমাম সাহেব মিম্বারে খুৎবা পঠে ছিলেন। আর খুৎবা শ্রবণ ওয়াজিব। সে মুহূর্তে খুৎবা শ্রবণ ব্যতীত অন্য কোন কাজ জায়িয নয়। হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, ইমাম যখন খুৎবার উদ্দেশ্যে বের হবেন তখন কোনরূপ কথাও নামায চলবেনা। অতএব যেহেতু সে মুহূর্তে সিজ্‌দা দিতে গেলে খুৎবা শ্রবণ ওয়াজিব ব্যহত হয় এবং হাদীস পরিপন্থী কাজ হয়। আর যে ওয়াজিবটি (على التـــراخى অর্থাৎ) পরবর্তীতে আদায়ের অবকাশ রয়েছে তার জন্য আরেকটি ওয়াজিব বাদ দেওয়া জায়িয নয়। এ জন্যই হযরত উমর (রা) তখন তাদেরকে সে মুহূর্তের জন্য সিজ্‌দা করতে বারণ করেছিলেন। তিনি মোটেই সিজ্‌দা করতে নিষেধ করেছেন এরূপ কথা উল্লেখ নেই।[৩৭]

روى البـخـارىُّ تَعْلِيْـقًـا : قِـيْلَ لِعِـمْـرَانَ بْنِ حُـصَيْنٍ : الرَّجُلُ يَـسْـمَعُ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا ، قَالَ أَرَأَيْتَ لَنْ قَعَدَ لَهَا ؟ كَأَنَّهُ لاَ يُوْجِبُهُ عَلَيْهِ .

(গ) হযরত ইমরান ইবন হুসাইন (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, ঐ ব্যক্তির কি হুকুম যে সিজ্‌দার আয়াত শ্রবণ করল কিন্তু এতদুদ্দেশ্যে সে বসল না ? বললেন, তোমার কি মত যদি তার উদ্দেশ্যেই বাসে থাকে ? যেন তিনি বলতে চান যে ঐ ব্যক্তির উপর সিজ্‌দা ওয়াজিব নয়। মুসান্নাফে আব্দুর রায্‌যাকে মুতাররাফের সূত্রে বর্ণিত আছে, একদা হযরত ইমরান ইবন হুসাইন (রা) এক ওয়াযকারীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তখন ওয়াযকারী আয়াতে সিজ্‌দা তিলাওয়াত করেছিল। কিন্তু ইমরান (রা) তার সাথে সিজ্‌দা না করেই চলে গেলেন।

এর জবাবে একই কথা প্রযোজ্য হতে পারে যে, হয়তো তখন করেননি কিন্তু পরবর্তীতে আদায় করে নিয়েছেন। অধিকন্তু أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا দ্বারা ওয়াজিব না হওয়া বুঝায় না বরং এর দ্বারা ওয়াজিব হওয়া বুঝায় অর্থাৎ ইমরানের উদ্দেশ্য ছিল, যে ব্যক্তি সিজ্‌দার আয়াত শ্রবণের উদ্দেশ্যে বসে তার যে হুকুম এখানে সে ব্যক্তিরও ঠিক একই হুকুম। আর সে হুকুমটি ওয়াজিব হওয়াই বাঞ্ছনীয়[৩৮]।

روى الامـامُ الـبـخـارىُّ تَعْلِيْـقًـا وَوَصَلَهُ عَـبْـدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَـرِيْقِ عَـبْـدِ الرَّحْمٰنِ الصُّلْحِى قَـالَ : مَـرَّ سُلَيْـمَـانُ عَلٰى قَـوْمٍ قُـعُودٍ فَـقَـرَأُوْا الـسَّـجْـدَةَ فَسَجَدُوْا ، فَقِيْلَ لَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لِهٰذَا غَدَوْنَا (واسناده صحيح)

(ঘ) আব্দুর রহমান সুলামী (র) বলেন, একদা সুলাইমান (র) একদল বসা লোকের সামনে দিয়ে পথ অতিক্রম করার মুহূর্তে তারা সিজ্‌দার আয়াত পড়ল, তখন তারা সিজ্‌দা করল।

---

৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫।

৩৮. প্রাগুক্ত,

www.pathagar.com

(কিন্তু সুলাইমান সিজ্‌দা করেনি এজন্য) তাকে জিজ্ঞাসা করে হলে তিনি বললেন, এজন্য আমি এখানে উপস্থিত হইনি। (বুখারী)

এর উত্তর হলো সুলায়মান (র)-এর উক্ত আসারটি প্রতিপক্ষের দলীল হতে পারেনা এজন্য যে, তার কথা لَيْسَ لِهٰذَا غَدَوْنَا দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তিনি সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিয়ে ঘর থেকে বের হননি। হয়ত সে মুহূর্তে তার অযূ ছিলনা বা প্রস্তুত ছিলেন না বিধায় সিজ্‌দা করেননি। কিন্তু তিনি পরবর্তীতে এরজন্য মোটেই সিজ্‌দা করেননি কিংবা সিজ্‌দা ওয়াজিব নয় এরূপ কোন কথাতো উল্লেখ নেই। অতএব এ হাদীসটি হানাফীদের বিপক্ষে দলীল নয়।[৩৯]

عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ اَنَّ عُثْمَانَ مَرَّ بِقَاصٍ فَقَرَأَ سَجْدَةً لِّيَسْجُدَ مَعَهُ عُثْمَانُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : اِنَّمَا السُّجُوْدُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَ ، ثُمَّ مَضٰى وَلَمْ يَسْجُدْ .

(رواه البخارى تعليقا ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن ابن المسيب) وَفِىْ طَرِيْقٍ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ اِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلٰى مَنْ جَلَسَ لَهَا وَاسْتَمَعَ (والطريق ان صحيحان كذا فى الفتح ص : ٢/٤٥٩)

(ঙ) হযরত সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণিত, একদা হযরত উসমান (রা) কোন এক ওয়ায়িজের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করা কালে সে আয়াতে সিজ্‌দা তিলাওয়াত করেছিল যেন, উসমান ও তার সাথে সিজ্‌দা করেন, তখন উসমান (রা) বললেন, সিজ্‌দা তো ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব যে তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে। যাহোক উসমান (রা) বলে গেলেন আর সিজ্‌দা করলেন না। (বুখারী)

কাতাদা (র) সূত্রে বর্ণিত আছে, সাইদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব বলেন, হযরত উসমান (রা) বলেছেন, সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব যে এতদুদ্দেশে বসে এবং মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে। প্রতিপক্ষের বক্তব্য হলো ঃ যেহেতু হযরত উসমান (রা) তখন সিজ্‌দা করেননি এতে বুঝা যায় যে, সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব নয়। হানাফী ফকীহগণ বলেন, হযরত উসমান (রা)-এর সে মুহূর্তে সিজ্‌দা না করার ক্ষেত্রে ঐ একই কথা প্রযোজ্য।

কিংবা এজন্য সিজ্‌দা দেননি যে, ওয়ায়িয বা ঘটনা বর্ণনাকারীদের ঘটনা বর্ণনা ওয়াযের মধ্যে আয়াতে সিজ্‌দা পাঠ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ছোট বড় সকলেই যেন তাদের ইকতিদা করে আর সে তাদের ইমাম বনে অথচ এর মধ্যে ইখলাসের লেশমাত্রও ছিলনা। তাদের এই ফাসিদ ও ইখলাস শূন্য উদ্দেশ্যকে রদ ও ঘৃণা করত তাদের সাথে সিজ্‌দা দেননি। আর এ কারণেই

৩৯. প্রাগুক্ত,

www.pathagar.com

হযরত ইমরান ইব্‌ন হুসাইনও সিজ্‌দা দেননি। কিন্তু আয়াতে সিজ্‌দা শ্রবণ করে পরবর্তীতে সিজ্‌দা আদায় করেননি এর কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না।[৪০]

হযরত উসমান (রা)-এর বাণী ঃ اِنَّمَا السُّجُوْدُ عَلٰى مَنِ اسْتَمَعَ। হানাফী মাযহাব সম্মত কেননা এতে عَلٰى শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। আর ফিকহী পরিভাষানুযায়ী عَلٰى শব্দটি ওয়াজিবের অর্থ প্রদান করে। তাহলে এর দ্বারা অন্ততপক্ষে এতটুকু তো বুঝে আসে, যে ব্যক্তি সিজ্‌দার আয়াত শ্রবণের উদ্দেশ্য বসে কিংবা মনোযোগসহ শুনে তার উপর সিজ্‌দা ওয়াজিব। অতএব এক পর্যায়ে হাদীসটি সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হওয়াকেও প্রমাণ করে। তবে এর দ্বারা যদিও এ কথা বুঝে আসে যে, মনোযোগসহ শ্রবণ না করলে বা এ উদ্দেশ্যে না বসলে তার উপর সিজ্‌দা ওয়াজিব নয়। এতে কোন সমস্যা নেই। কেননা এখানে এও হতে পারে যে, হযরত উসমান (রা) তখন সিজ্‌দার আয়াত শ্রবণ করেননি এবং তার কথা السجدة على من استمع। এর মধ্যে اِسْتَمَعَ। শব্দটি سَمِعَ শ্রবণ করার অর্থেই ব্যবহৃত।

তার প্রমাণ হলো, এই রিওয়ায়াতটি ইউনুসের সূত্রে (استمعها। এর স্থলে) سمعها বর্ণিত আছে। অতএব হযরত উসমান (রা) আয়াতে সিজ্‌দা শ্রবণ না করার ভিত্তিতে সিজ্‌দা দেননি। যার কারণ স্বরূপ ব্যক্তি করেছেন اِنَّمَا السُّجُوْدُ عَلٰى مَنِ اسْتَمَعَ। (অর্থাৎ সিজ্‌দা তো শ্রবণকারীর উপর ওয়াজিব)

اِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلٰى مَنِ اسْتَمَعَهَا وَجَلَسَ لَهَا।-এর অর্থ হলো, শ্রবণকারী ব্যক্তি তিলাওয়াতকারীর সঙ্গে তখনই সিজ্‌দা দিবেন যদি শ্রবণকারী ব্যক্তি শ্রবণের উদ্দেশ্যেই বসে থাকে এবং মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে।

অতএব যে এতদুদ্দেশ্যে না বসবে এবং মনোযোগ সহকারে না শুনবে তার জন্য তিলাওয়াতকারীর সাথে সিজ্‌দা দেওয়া জরুরী নয়। এরূপ কথায় কারো কোন দ্বিমত নেই। অতএব হযরত সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণিত উসমানের আমলটি এরূপ অর্থেই প্রযোজ্য অর্থাৎ তিনি ওয়ায়িয বা ঘটনা বর্ণনাকারীর সিজ্‌দায়ে তিলওয়াত পাঠে সিজ্‌দা দিতেন না এজন্য সে তিনি এ উদ্দেশ্যে বসতেন না বা মনোযোগসহ শুনতেন না। অনুরূপ উত্তর হযরত ইমরান ইবন হুসাইনের আমলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং এর দ্বারা সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত না হওয়া প্রমাণিত হয় না।[৪১]

স্মর্তব্য যে সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব। তবে নামাযের মধ্যে على الفور। বা তাৎক্ষণিক ওয়াজিব। আর নামাযের বাইরে على التراخى। বিলম্বে ওয়াজিব অর্থাৎ পরবর্তীতে যে কোন সময় আদায় করলে ওয়াজিব পালিত হয়ে যাবে। অবশ্য উত্তম হলো তাৎক্ষণিক সিজ্‌দা করে নেওয়া।[৪২]

সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত পাঠকারী ও শ্রবণকারী উভয়ের উপর ওয়াজিব

সিজ্‌দা ওয়াজিব হওয়ার কারণ দু'টি ঃ

---

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫-২২৬।

৪১. প্রাগুক্ত।

৪২. বাদাইউসসানাই ফোটনোট ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯ খণ্ড ১

www.pathagar.com

(ক) তিলাওয়াত। (খ) শ্রবণ, চাই ইচ্ছাকৃতভাবে তিলাওয়াত করুক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে এমনিভাবে, চাই ইচ্ছাকৃত শ্রবণ করুক বা অনিচ্ছাকৃত শ্রবণ করুক, চাই মনোযোগসহ শুনুক বা অমনোযোগের সাথে তাতে কোন পার্থক্য হবেনা।[৪৩]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوْفًا السَّجْدَةُ عَلٰى مَنْ سَمِعَهَا أخرجه ابن أبى شيبة ولعبد الرزاق مثله ذكرهما الحافظ فى الدراية (١٢٧) واثر عثمان بهذا اللفظ قد مرّ ذكره عن الفتح وسنده صحيح وسكوت الحافظ عن اثر بن عمر مُسْعِرٌ بِحسنه أو صحته عنده فانه أجل من يسكت عن شئ فيه عليه .

হযরত ইবন উমর (রা) থেকে মাকুফরূপে বর্ণিত, শ্রবণকারীর উপর সিজ্দা করা ওয়াজিব।[৪৪]

روى ابن أبى شيبة عن حفص عن حجاجٍ عن ابراهيم ونافع وسعيد بن جبير أنَّهُمْ قَالُوْا : مَنْ سَمِعَ السَّجْدَةَ فَعَلَيْهِ اَنْ يَسْجُدَ (كذا فى العمدة ٣/٥٠٥ :

ইব্নে আবু শাইবা (র) হযরত হাফসের সূত্রে ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবরাহীম নাফি' এবং সাঈদ ইবন জুবাইর (র) বলেছেন, যে ব্যক্তি সিজ্দার আয়াত শ্রবণ করবে তার জন্য সিজ্দা দেওয়া ওয়াজিব।[৪৫] (উমদাতুল কারী, ৩/৫০৫)

عَنْ اِبْرَهِيْمَ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ : اذَا سَمِعَ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يُصَلِّ فَلْيَسْجُدْ . (كذا فى العمدة ٣/٥٠٥)

হযরত ইবরাহীম (র) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে যে, নামায পড়া অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি থেকে কেউ সিজ্দার আয়াত শ্রবণ করে তবে যেন সে সিজ্দা আদায় করে।[৪৬] (অর্থাৎ নামাযের বাইরে)। (উমদাতুল কারী, ৩/৫০৫)

وَعَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ : كَانَ اَصْحَابُ عَبْدِ اللّٰه اذَا سَمِعُوْا السَّجْدَةَ سَجَدُوْا فِىْ صَلَاةٍ كَانُوْا اَوْ غَيْرِهَا . (كذا فى العمدة ٣/٥٠٥)

শা'বী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ (র)-এর শাগারিদবৃন্দ নামাযে কিংবা নামাযের বাইরে সিজ্দার আয়াত শুনলে সিজ্দা আদায় করতেন।[৪৭] (উমদাতুল কারী, ৩ ঃ ৫০৫)

---

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩০

৪৪. ই'লতিসসুনান প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬-২২৭

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

৪৬. প্রাগুক্ত।

৪৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِى الْجُنُبِ اِذَا سَمِعَ السَّجْدَةَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَقْرَأُهَا فَيَسْجُدُهَا (رجاله ثقات) (كذا فى العمدة ٣/٥٠٥)

মুগীরাহ (র) থেকে বর্ণিত, ইবরাহীম (রা) বলতেন, যদি জুনুবী ব্যক্তি আয়াতে সিজ্‌দা শ্রবণ করে তাহলে সে গোসল করবে অতঃপর সিজ্‌দা আদায় করবে।[৪৮] (উমদাতুল কারী, ৩/৫০৫) উপরোক্ত রিওয়ায়াতসমূহের মধ্যে শুধু শ্রবণের ভিত্তিতে সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে-এখানে মনোযোগ বা মনোযোগ ছাড়া উদ্দেশ্যমূলক বা উদ্দেশ্যহীন এ ধরনের কোন দিক বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়নি। কাজেই শ্রবণ যেভাবেই হোক তাতে সিজ্‌দা ওয়াজিব হবে। মুসান্নাফে আব্দুর রায্‌যাকের একটি রিওয়ায়াত দ্বারা এ বিষয়টি আরো দৃঢ় ও শক্তিশালী বলে বিবেচিত হয়। রিওয়ায়াতটি নিম্নরূপ ঃ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبْ عَنْ عُثْمَانَ فِى الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ تُؤْمِى بِرَأْسِهَا وَتَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ

হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণিত। হযরত উসমান (রা) বলেন, হায়িযা (ঋতুমতী) মহিলা সিজ্‌দার আয়াত শ্রবণ করলে নিজ মাথা দ্বারা ইশারা করবে এবং বলবে اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ (হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য সিজ্‌দা করলাম)

হাদীসটির সারমর্ম হল, ঋতুমতী মহিলা ঋতু চলাকালে সিজ্‌দার আয়াত শুনতে পেলে মুসল্লী বা সিজ্‌দাকারীর সাদৃশ অবলম্বন করত শুধু মাথা দ্বারা ইশারা করবে। তবে সিজ্‌দা দিবেনা এটা হলে। উসমান (রা)-এর ফাত্‌ওয়া।

হানাফী ফকীহগণ বলেন, এ হাদীস দ্বারা দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয় (ক) সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব (খ) উদ্দেশ্যহীন কিংবা অমনোযোগিতার সাথে শ্রবণ করলেও সিজ্‌দা করা ওয়াজিব হবে এ জন্যই হায়িযা মহিলার সিজ্‌দাকারী বা মুসল্লীর সাদৃশ্য অবলম্বন করা মুস্তাহাব কেননা কারো সাথে সাদৃশ্য অবলম্বনের বিষয়টি ওয়াজিব আমলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে। স্রাবের কারণে ঋতুমতী মহিলার উপর সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব নয় বটে তবে স্রাবমুক্ত অবস্থায় তার উপর সিজ্‌দা ওয়াজিব। কাজেই সে আহলে ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত। এরই নিমিত্তে তার জন্য স্রাব চলাকালে আয়াতে সিজ্‌দা শ্রবণ করলে সিজ্‌দাকারীর সাদৃশ্য অবলম্বন মুস্তাহাব।[৪৯] (তাহতাবী, আলা মারাকিল ফালাহ্‌, পৃ. ২৮০)

সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত চৌদ্দটি

পবিত্র কুরআনে সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াতের সংখ্যা কতগুলো এ বিষয়ে হাদীসের বক্তব্যে বিভিন্নতা রয়েছে। তাবে অধিকাংশ হাদীস থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এর সংখ্যা হল চৌদ্দটি। হানাফী মাযহাবে সাজ্‌দায়ে তিলাওয়াতে সর্বমোট চৌদ্দটি।[৫০]

---

৪৮. প্রাগুক্ত।

৪৯. প্রাগুক্ত।

৫০. ১. সূরা আরাফ, ২০৬,
২. সূরা রা'দ, ১৫,
৩. সূরা নাহ্‌ল, ৫০,

www.pathagar.com

সূরা হজ্জে সিজ্‌দা সংখ্যা ১টি, সূরা সাদে সিজ্‌দা ১টি।

এমনিভাবে সূরা নাজ্‌ম, আলাক এবং ইন্‌শিকাকের মধ্যেও একটি করে সিজ্‌দা রয়েছে।

নিম্নে এ চারটি বিষয়কে পর্যায়ক্রমে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত করা হবে।

সূরা হজ্জে ওয়াজিব সিজ্‌দা প্রথমটি দ্বিতীয়টি নয় এ প্রসঙ্গে

নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ লক্ষণীয় ঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : فِىْ سُجُوْدِ الْحَجِّ الاَوَّلُ عَزِيْمَةٌ وَالْاٰخَرُ تَعْلِيْمٌ.

اَخْرَجَهُ الطَّحَاوِىُّ (١-١٢) وَرِجاله كلهم ثقات ، وعبد الاعلى من رجال الاربعة ، روى عنه شعبة ، ويحى القطّان ولايرويان الا عن ثقة ، وقال يعقوب : فى حديثه لين ، وصحح الطبرى حديثه فى الكسوف وحسن له الترمذى ، وصحح له الحاكم وضعّفه اخرون كما فى التهذيب (٦ : ٩٥) فالحديث حسن .

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি সূরা হজ্জের সিজ্‌দা সম্পর্কে বলেন, প্রথমটি হল, আবশ্যিক বিধান আর দ্বিতীয়টি হল শিক্ষামূলক।[৫১]

হানাফী ফকীহ্‌গণ বলেন, এ হাদীসটি স্পষ্ট দলীল যে সূরা হজ্জের দ্বিতীয় সিজ্‌দাটি সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত নয়। কেননা এখানে

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ .

আয়াতের মধ্যে সিজ্‌দার সাথে রুকূ'র কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। নিয়ম হলো কুরআনের মধ্যে যেখানে রুকূ' সিজ্‌দার কথা একত্রে উল্লেখ করা হয় সেখানে এর দ্বারা সালাতের রুকূ সিজ্‌দা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

যেমন সূরা আলে ইমরানে উল্লেখ আছে ঃ

---

৪. সূরা বনী ইসরাঈল, ১০৯,
৫. সূরা মারয়াম, ৫৮,
৬. সূরা হজ্জ, ১৮,
৭. সূরা ফুরকান, ৬০,
৮. সূরা নাম্‌ল, ২৬,
৯. সূরা আলিফলাম সাজদা, ১৫,
১০. সূরা সাদ, ২৪,
১১. সূরা হা মীম সাজদা, ৩৮,
১২. সূরা নাজ্‌ম, ৬২,
১৩. সূরা ইনশিকাক, ২১,
১৪. সূরা আলাক, ১৯

৫১. ই'লাউস সুনান ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১, হাদীস নং ১৯৪৮।

www.pathagar.com

وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ .

এখানে সালাতের রুকূ' সিজ্দা উদ্দেশ্য (৩-৪৩) অতএব সূরা হজ্জের এ আয়াতেও সালাতের রুকূ' সিজ্দা উদ্দেশ্য হবে, সিজ্দায়ে তিলাওয়াত নয়। বাদাইউস সানাই গ্রন্থে আল্লামা কাসানী (র) উল্লেখ করেন,

আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস এবং আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেছেন ঃ

سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ فِى الْحَجِّ هِىَ الْأُوْلٰى وَالثَّانِيَةُ سَجْدَةُ الصَّلَاةِ .

সূরা হজ্জে সিজ্দায়ে তিলাওয়াত হল প্রথমটি আর দ্বিতীয়টি হল সিজ্দায়ে সালাত।

এঁদের কথাটি কিয়াস ও যুক্তিসঙ্গত। এ কথা স্বীকৃত যে, সাহাবীদের বক্তেব্যের মাঝে কোনরূপ দ্বন্দ্ব দেখা গেলে সে ক্ষেত্রে ঐ মতটিই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় যা যুক্তি বা কিয়াস দ্বারা সমর্থিত। কেননা সহীহ কিয়াস ও শরী'আতের প্রমাণ চতুষ্টয়ের একটি।[৫২]

তবে মুসতাদরাকে হাকিমে উল্লেখিত (৩ ঃ ৩৯০) আবুল আ'লিয়ার সূত্রে বর্ণিত আরেকটি হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, হজ্জের মধ্যে সিজ্দা দু'টি,

عَنْ اَبِىْ الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فِىْ سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ

আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা হজ্জে দু'টি সিজ্দা রয়েছে।

এ হাদীসটি বাহ্যত পূর্বের হাদীসের বিপরীত। হানাফী ফকীহগণ বলেন, হাদীসদ্বয়ের মাঝে বাহ্যত দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য দেখা গেলেও আসলে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কেননা আবুল আলিয়ার সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট। পক্ষান্তরে সাঈদ ইবন জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি স্পষ্ট বিবরণ সম্পন্ন। তাতেও দুই সিজ্দার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এইদুই সিজ্দার হুকুম বা শারঈ বিধান সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা আছে ঃ যা আবুল আলিয়ার রিওয়ায়াতে উল্লেখ করা হয়নি, তবে সাঈদ ইব্ন জুবাইরের রিওয়ায়াতে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ প্রথম সিজ্দাটি অবশ্যক স্বরূপ, আর দ্বিতীয়টি তালীম স্বরূপ। এটাই হল, হানাফী ফকীহদের অভিমত। কাজেই এ হাদীসটি হানাফী মাযহাব পরিপন্থী নয়।[৫৩] এ জন্যই ইমাম মুহাম্মদ (র) মু'আত্তায় (পরিচ্ছেদ ঃ কুরআনের সিজ্দাসমূহ ঃ ১৪৮) উল্লেখ করেছেন যে,

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى فِىْ سُوْرَةِ الْحَجِّ اِلَّا سَجْدَةً وَاحِدَةً الْأُوْلٰى .

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অভিমত হল সূরা হজ্জে মাত্র একটি সিজ্দা অর্থাৎ প্রথমটি।[৫৪]

عَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ قَالَ : سَجَدْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اِحْدٰى عَشْرَةَ سَجْدَةً لَيْسَ فِيْهَا مِنَ الْمُفَصَّلِ شَئٌ الْاَعْرَافُ ، وَالرَّعْدُ ، وَالنَّحْلُ وَبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ

---

৫২. বাদাইস সানায়ে' প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫২, খণ্ড ২।

৫৩. ই'লাউসসুনান প্রাগুক্ত পৃ. ২৪২।

৫৪. দরাস তিরমিযী ঃ খণ্ড, ২ পৃ. ৩৫৪।

www.pathagar.com

وَمَرْيَمَ وَالْحَجُّ وَسَجْدَةَ الْفُرْقَانِ ، وَسُلَيْمَانِ سُوْرَةِ النَّمْلِ ، وَالسَّجْدَةَ وَفِيْ ص وَسَجْدَةُ الْحَوَامِيْمِ .

হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর সাথে এগারটি সিজ্‌দা করেছি। তন্মধ্যে মুফাস্‌সালের কোন সিজ্‌দা ছিলনা। (সিজ্‌দাগুলো হলো) আ'রাফ, রা'দ, নাহল, বনী ইসরাঈল, মারইয়াম, হাজ্জ, সিজ্‌দাতুল ফুরকান, নামল, সিজ্‌দা, সাদ ও সিজ্‌দাতুল হাওয়ামীম[৫৫] (ইবন মাজাহ)

এ হাদীস দ্বারা ও প্রমাণিত হয় যে, সূরা ঃ হজ্জে সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত একটি। কেননা তাতে সিজ্‌দা দু'টি হলে হাদীসে ১১টির স্থলে ১২ উল্লেখ করা দরকার ছিল।

অনেকে নিম্নের হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সূরা হজ্জের সিজ্‌দা দু'টি।

عَنْ عَمْرِ وبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَقْرَاَ فِيْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْاٰنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ ، وَفِيْ سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ .

رواه أبو داؤد (٥٣٠/١) وسكت عنه وفي التخليص الحبير حسنه المنظرى والنووى (١١٤/١)

عَنْ عُقْبَةُ بْنِ عَاجِرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ فِيْ سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَمَنْ لَّمْ يَسْجُدْهَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا .

رواه أبو داؤد وسكت عنه (٥٣٠/١)

হযরত আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) আমাকে কুরআনের মধ্যে পনেরটি সিজ্‌দার আয়াত বলেছেন। তন্মধ্যে মুফাস্‌সালের তিনটি এবং সূরা হজ্জের দু'টি সিজ্‌দা আছে।[৫৬] (আবু দাউদ)

হযরত উকবাহ ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সূরা হজ্জে দু'টি সিজ্‌দা ? বললেন, হ্যা! যে সে দু'টি সিজ্‌দা আদায় না করবে সে যেন তা না পড়ে।[৫৭]

এ হাদীসদ্বয় বাহ্যত হানাফী মাযহাবের পরিপন্থী মনে হচ্ছে। হানাফী ফকীহগণ বলেন, হাদীসদ্বয়ের কোনটিই দুই সিজ্‌দার ক্ষেত্রে প্রমাণযোগ্য নয়। কেননা প্রথম হাদীসটির দাবী হল এ কথা প্রমাণ করা যে, সূরা সাদের সিজ্‌দাটি সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াতে সিজ্‌দায়ে শোকর নয়।

৫৫. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫ হাদীস নং ১৯৫০।

৫৬. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪২

৫৭ প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

কেননা, সাদকে শামিল না করলে প্রশ্ন হয়, যারা বলেন, হজ্জে সিজ্‌দা দু'টি এবং এক্ষেত্রে এ হাদীসকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করে তাদের বক্তব্য অনুসারে প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য-এর বিপরীত করা উচিত নয়। তাঁরা তো সাদ এর সিজ্‌দাকে অস্বীকার কারেন। অথচ এ হাদীস দ্বারা সাদের সিজ্‌দার বিষয়টি ও প্রমাণিত হয়। তাহলে তাঁরা এ হাদীস মাফিক আমল করলেন কোথায় ? কাজেই এটি হানাফী মাযহাবের বিপক্ষে দলীল হতে পারেনা বরং সূরা সা'দেও একটি সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াতে রয়েছে, এ ক্ষেত্রে হানাফীদের স্বপক্ষে একটি দলীল। অবশ্য হজ্জের মধ্যে দুই সিজ্‌দার কথা উল্লেখ আছে এতে হানাফীদের দ্বিমত নেই। তবে পূর্বেই বলা হয়েছে যে এদু'টির কেবল প্রথমটি হল সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সিজ্‌দায়ে তা'লীম।

দ্বিতীয় হাদীসটির মর্ম হলো, যে ব্যক্তি সিজ্‌দার আয়াত তিলাওয়াত করবে তার জন্য সিজ্‌দা দেওয়া ওয়াজিব। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) তার এক কথা مَنْ لاَ يَسْجُدْهُمَا فَلاَ يَقْرَأهُمَا দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন যে সিজ্‌দা আদায় করবে না যেন সে গুনাহের ভাগী না হয়। কারণ, আয়াতে সিজ্‌দা তিলাওয়াত করে সিজ্‌দা না দেওয়া গুনাহের কাজ। অতএব এর দ্বারা তো এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, সিজ্‌দায়ে তিলওয়াত ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথা দ্বারা ওয়াজিবের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। এটাই হাদীসের দাবী। সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত যদি সাধারণ সুন্নাত বা মুস্তাহাব হতো আহলে অন্তত তিলাওয়াত থেকে বারণ করতেন না। কেননা একটি মুস্তাহাব কাজ ছাড়ার সুবাদে অন্য একটি মুস্তাহাব কাজ (তিলাওয়াত) থেকে বারণ করা হয় না। কাজেই হাদীসটি সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব বিষয়ে হানাফীদের একটি দলীলরূপে বিবেচিত।[৫৮]

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হল যে, সূরা হাজ্জে কি সিজ্‌দা দু'টি ? উত্তরে তিনি বললেন হ্যাঁ', এটাও হানাফীদের বিপক্ষে নয়। কেননা হানাফী ফকীহগণও দুই সিজ্‌দার কথা স্বীকার করেন। তবে প্রথমটি সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত আর দ্বিতীয়টি সিজ্‌দায়ে তালীম। তাছাড়া এ হাদীসটি সনদের দিক থেকে অতি দুর্বল। কেননা তাতে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মানীন ও ইবন লাহী'আ রয়েছে–যাদের সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ অনেক সমালোচনা করেছেন এতে তাদের প্রতি অনাস্থার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (র) 'তালখীসুল হাবীর' গ্রন্থে বলেন, আব্দুল হক এবং ইবনুল কাত্তান হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-এর হাদীসকে এ মর্মে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন যে এর সনাদে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মানীন রয়েছে, সে একজন অজ্ঞাত ও অপরিচিত রাবী। এমনিভাবে তার থেকে বর্ণনাকারী হারিস ইবনে সাঈদ আতাকী ও অজ্ঞাত ও অপরিচিত রাবী।[৫৯] নসবুর রায়া গ্রন্থে (১ ঃ ৩০৬) বলা হয়েছে শায়খ আব্দুল হক বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন মানীন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নয়। এর কারণ হিসাবে ইবনুল কাত্তান (র) বলেন যে, সে অজ্ঞাত ও অপরিচিত, তার অবস্থা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়না।

'আওনুল মাবূদ' গ্রন্থে আছে, মুনযিরী (র) বলেন, উকবা (রা)-এর হাদীসের সনদে আব্দুল্লাহ ইবন লাহী'আ এবং মুশারাহ ইব্‌ন হা'আন বিদ্যমান। এদের হাদীস

---

৫৮. প্রাগুক্ত।

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩।

www.pathagar.com

প্রমাণযোগ্য নয়। অবশ্য কেউ কেউ এঁদেরকে নির্ভরযোগ্যও বলেছেন। (তাহযীব, ২/১৪২, তাকরীব ৩২)

কাজেই এরা দুর্বল না হলেও সমালোচিত ও বিতর্কিত রাবী। সুতরাং প্রতিপক্ষের জন্য এ হাদীসটি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা সমীচীন নয়।[৬০]

হাকিম (র) বলেন, এ প্রসঙ্গে অনুরূপ রিওয়ায়াত উমর ইবন উমর, ইবন আব্বাস, আবুদ দারদা, আবূ মূসা ও আম্মার (রা) প্রমুখ থেকে মাওকূফভাবে বর্ণিত রয়েছে। এছাড়া এতদসংশ্লিষ্ট আরো কিছু মুরসাল রিওয়ায়াতও রয়েছে, নিম্নে তার কয়েকটি পেশ করা হল ঃ

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : فُضِّلَتْ سُوْرَةُ الْحَجِّ عَلَى الْقُرْاٰنِ بِسَجْدَتَيْنِ (أخرجه ابو داؤد فى المراسيل)

(ক) খালিদ ইবন মা'দান (র) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কুরআনের মধ্যে সূরা হজ্জ দু' সিজ্দার কারণে মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে।[৬১]

عَنْ نَافِعٍ مَوْلٰى بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ مِصْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَاَ سُوْرَةَ الْحَجِّ فَسَجَدَ فِيْهَا سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : اِنَّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ . أخرجه مالك فى مؤطأ (٧٠)

(খ) নাফি' (র) বর্ণনা করেন যে, একজন মিশরী লোক তাঁকে খবর দিয়েছে যে, হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) সূরা হজ্জ তিলাওয়াত করে তাতে দু'টি সিজ্দা করেছেন। এরপর বলেছেন, নিশ্চয় এ সূরাটি দু'সিজ্দার কারণে মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে।[৬২]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ الصُّبْحَ فَسَجَدَ فِى الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ . أخرجه الحاكم

(গ) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন সা'লাবা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত উমর (রা)-এর সাথে ফজর আদায় করেছিলেন। তখন তিনি হজ্জে দু'টি সিজ্দা আদায় করেছেন।[৬৩] (হাকিম)

عَنْ نَافِعٍ : اَنَّ اِبْنَ عُمَرَ سَجَدَ فِى الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ . أخرجه الحاكم

নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, হযরত ইব্ন উমর সূরা হজ্জে সিজ্দা দু'টি আদায় করেছেন।[৬৪]

---

৬০. প্রাগুক্ত।

৬১. প্রাগুক্ত।

৬২. প্রাগুক্ত।

৬৩. প্রাগুক্ত।

৬৪. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

এ সকল মাওকূফ হাদীসসমূহ বাহ্যত হানাফী মাযহাবের বিপক্ষে। তাই হানাফী ফকীহগণ এগুলোর ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, একটি হল সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত আর অপরটি হল তালীমের জন্য। তাছাড়া হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর আমল ও ফাতওয়া পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যা হানাফী মাযহাব সম্মত। হানাফী ফকীহগণ বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়েতেটি অন্যান্য মাওকূফ হাদীসের উপর নিম্নে বর্ণিত তিনটি কারণে প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। (ক) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াতটি বিশ্লেষণমূলক। কেননা এতে দু'টি সিজ্‌দার পৃথক পৃথক হুকুম বলে দেওয়া হয়েছে।

(খ) এটি কিয়াস সম্মত।

(গ) পবিত্র কুরআনের একটি গতানুগতিক ধারা হল, যে আয়াতে শুধু রুকূ' কিংবা শুধু সিজ্‌দার কথা উল্লেখ করা হয় সেখানে সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত উদ্দেশ্য, আর যেখান রুকূ ও সিজ্‌দা একত্রিত করে উল্লেখ করা হয় সেখানে সালাতের রুকূ' সিজ্‌দা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত নয়। কিন্তু সূরা হজ্জের সিজ্‌দাদ্বয়ের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা হল, নামাযের বাইরে তিলাওয়াত করলে দু'টি সিজ্‌দা করবে, আর নামাযের মধ্যে তিলাওয়াত করলে প্রথমটিতে সিজ্‌দায় চলে যাবে আর দ্বিতীয়টিতে রুকূ'তে যাবে এবং এর দ্বারা সিজ্‌দায় নিয়্যত করবে তবে এর জন্য পৃথক সিজ্‌দা দিবেনা। এরূপ পন্থা অবলম্বনে মতভেদ বাকি থাকেনা।[৬৫]

সূরা সাদ (ص)-এর সিজ্‌দা ওয়াজিব

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ سَجَدَنِىْ ص أخرجه الدار قطنى ورواته ثقات كذا فى الدراية (١٢٨)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) সূরা সাদে সিজ্‌দা করেছেন।[৬৬] (দারাকুতনী)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ : قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ص فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَه فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ اٰخَرَ قَرَأَهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَزَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُوْدِ فَقَالَ ﷺ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنَّمَا هِىَ تَوْبَةُ نَبِىٍّ ، وَلٰكِنِّىْ رَاَيْتُكُمْ تَشَزَّنْتُمْ لِلْسُّجُوْدِ فَسَجَدَ وَسَجَدُوْا رواه ابو داؤد وسكت عنه هو المنذرى عون العبود (٥٣٢/١) وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى تفسير سورة ص (٤٣١/٢) وقال :

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫।

৬৬. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৯৪১, পৃ. ২৩১।

www.pathagar.com

صحيح على شرط الشيخين واقرّه عليه الذهبى فى تلخيصه ، وقال النووى فى االخلاصة سنده صحيح على شرط البخارى زيلعى (١/٣٠٧) وأخرجه ابن خزيمة أيضًا فى صحيحه كما فى فتح البارى (٢/٤٥١)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বরে থাকা অবস্থায় সূরা সাদ পড়েছিলেন। যখন তিনি সিজ্‌দার আয়াতে পৌছালেন তখন মিম্বার থেকে অবতরণ করে সিজ্‌দা করলেন এবং তাঁর সাথে লোকেরাও সিজ্‌দা করল। আরেক দিন নবী করীম (সা) সে সূরাটি পড়লেন। যখন সিজ্‌দার আয়াতে পৌছলেন তখন লোকেরা সিজ্‌দার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এটি তো একজন নবীর তাওবা মাত্র। কিন্তু আমি তো তোমাদেরকে দেখছিলাম সিজ্‌দার প্রস্তুতি নিতে। তখন তিনি সিজ্‌দা করলেন এবং তারাও সিজ্‌দা করল।[৬৭] (আবূ দাউদ)

গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে এ হাদীস দ্বারা সূরা সাদের সিজ্‌দার বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। অবশ্য কেউ কেউ এর দ্বারা একথাও প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সাদে সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত তো নেই তবে সিজ্‌দায়ে শুক্‌র আছে। কেননা হাদীস বলা হয়েছে, "এটি একজন নবীর তাওবা মাত্র"।

কাজেই এটি ওয়াজিব বা আবশ্যিক সিজ্‌দা নয়। অতএব এ সিজ্‌দাটি এমন এক উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত যা কেবল ঐ নবীর মধ্যেই পাওয়া যায়, তিনি ছাড়া অন্যদের সাথে এর সংশ্লিষ্টতা নেই। কাজেই তা পরবর্তী নবী বা তার উম্মাতের ক্ষেত্রে ওয়াজিবরূপে বিবেচিত হতে পারেনা। হানাফী ফকীহগণ বলেন, উপরোক্ত ব্যাখ্যা ছাড়া হাদীসটির এব্যাখ্যাও তো হতে পারে যে اِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ দ্বারা রাসূলের উদ্দেশ্য এ আয়াতে সিজ্‌দা দেওয়ার কারণ বর্ণনা করা। অর্থাৎ ঐ নবীর এরূপ অবস্থার পেক্ষিতে শুকরানা সিজ্‌দা করাটাই হচ্ছে আমাদের সিজ্‌দা দেওয়ার কারণ। কেননা সিজ্‌দার আদেশ প্রদান করা হয়েছে সেখানে আদেশের ভিত্তিতে সিজ্‌দা ওয়াজিব-কিংবা সিজ্‌দাকারীর প্রশংসা করা হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে নবী ওলীদের অনুকরণের আদেশও প্রদান করা হয়েছে। সেখানে নবীদের অনুকরণ ও অনুসরণ ওয়াজিব এর ভিত্তিতে সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব। কিংবা সিজ্‌দার আদেশ অমান্যকারীদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং শরী'আতে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব সে ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করার ভিত্তিতে সিজ্‌দা ওয়াজিব।[৬৮]

সূরা সাদের আয়াতে সিজ্‌দায় একজন নবীর তাওবার কথা উল্লেখ রয়েছে যা প্রশংসনীয় কাজ। আল্লাহ প্রশংসা স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন। অতএব এরূপ প্রশংসনীয় কাজে আমাদের জন্য সে নবীর অনুকরণ করা ওয়াজিব বলে বিবেচিত হয়। অবশ্য তা আদায় করা। তাৎক্ষণিকভাবে জরুরী নয়। অথচ আমি দেখছি যে, তোমরা তাৎক্ষণিক সিজ্‌দা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯, হাদীস নং ১৯৩৯।

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪-২৩৫, খণ্ড. ৭।

www.pathagar.com

দিয়েছ। এরপর তিনি অবতরণ করে সিজ্‌দা আদায় করবে তাঁর সাথে শ্রোতারাও সিজ্‌দা আদায় করে নেয়।

অধিকন্তু জুমু'আর খুৎবা বাদ দিয়ে এর সিজ্‌দা আদায়ে ব্যস্ত হওয়াটা একথাই প্রমাণ করে যে সাদের সিজ্‌দাটি ওয়াজিব সিজ্‌দা শুকরানা নয়। কেননা খতীবের জন্য খুৎবার মধ্যে সিজ্‌দার আয়াত বিধেয় নয়। তবে জুমু'আয় সঙ্গেসঙ্গে সিজ্‌দা না করা একথা বুঝায় না যে, এটা ওয়াজিব সিজ্‌দা নয়। বরং তিনি এ সিজ্‌দাটি পরে আদায় করবেন বলে তাৎক্ষণিক আদায় করেননি।

যেহেতু এ হাদীসে দু'ধরনের ব্যাখ্যারই অবকাশ রয়েছে সেহেতু এর দ্বারা সূরা সাদে সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত না হওয়ার ক্ষেত্রে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা বাতিল গণ্য হবে, কেননা একটি নিয়ম আছে اذا جاءَ الاحْتمَالُ بطَلَ الاسْتدْلاَلُ।[৬৯]

তবে এটি হানাফী মাযহাবেরও দলীল হতে পারে। কেননা হানাফীদের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যার সমর্থনে আরো বহু শক্তিশালী রিওয়ায়াত রয়েছে ঃ

عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيْ اَنَّ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَأى مُرْؤْيَا انَّهُ يَكْتُبُ ص ، فَلَمَّا بَلَغَ إِلى سَجْدَتَيْهَا قَالَ : رَأى الدَّوَاةَ وَالْقَلَمَ وَكُلَّ شَيْءٍ يَحْضَرَتِهِ انْقَلَبَ سَاجِدًا قَالَ : فَقَصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يَسْجُدْ بِهَا بَعْدُ

رواه الامام أحمد فى مسنده (٧٨/٢) ورجاله ثقات ، من رجال الجماعة وأخرجه المنذرى فى الترغيب (٢٥٣/١) وقال : رواته داؤد الصحيح .

হযরত আবু বকর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ মুযানী (র) থেকে বর্ণিত। হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) একদা স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি সূরা ص লিখছেন। যখন তিনি আয়াতে সিজ্‌দায় পৌঁছলেন তখন দেখলেন যে, দোয়াত কলমসহ যা কিছু তার সমানে ছিল সব সিজ্‌দায়ে লুটিয়ে পড়ল। তিনি বলেন, এ ঘটনাটি নবী করীম (সা)-কে শুনানো হলে এরপর থেকে তিনি সব সময় এখানে সিজ্‌দা করতেন।[৭০] (আহমাদ)

عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ سَجْدَةِ ص ؟ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ اَيْنَ سَجَدْتَ ؟ فَقَالَ : هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدهْ فَكَانَ دَاؤُدُ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ اَنْ يَقْتَدِيْ بِهِ فَسَجَدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

(أخرجه البخارى ٧٠/٢)

---

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।

৭০. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৯৪৩, পৃ. ২৩৫-২৩৬।

www.pathagar.com

হযরত আওয়াম (র) বলেন, আমি মুজাহিদকে সাদের সিজ্‌দা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি ও ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি সিজ্‌দা কোথায় পেলেন ? বললেন, তুমি কি পড়নি ঃ

"দাঊদ আলাইহিস সালাম ছিলেন এমন এক নবী যার অনুকরণ করার জন্য তোমাদের নবী আদিষ্ট হয়েছেন।"

কাজেই রাসূলুল্লাহ (সা) তাতে (দাঊদ (আ)-এর অনুকরণার্থে সিজ্‌দা করেছেন।[৭১] (বুখারী)

এ হাদীসটি সাদের সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে একটি মজবুত দলীল। তাই ইমাম আবু বকর রাযী (র) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর এ উক্তি যে, "নবী করীম (সা) আল্লাহর বাণী ঃ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ এর নিমিত্তে দাঊদ (আ)-এর অনুকরণ করত সিজ্‌দা করেছেন এ কথা প্রমাণ করে যে, তিনি এটাকে ওয়াজিব বলে নিরূপণ করেছেন। কেননা ঃ اقتده। তথা আদেশসূচক ক্রিয়া, যা সাধারণত ওয়াজিবের অর্থ প্রদান করে।

অধিকন্তু যখন আমাদের সামনে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে নবী করীম (সা) অপরাপর আয়াতে সিজ্‌দার ন্যায় এ আয়াতেও সিজ্‌দা করেছেন তাতে বুঝা যায় যে, এ আয়াতে সিজ্‌দার সাথে অন্যান্যগুলোর কোন পার্থক্য নেই।[৭২]

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ سَجَدَ فِىْ ص وَقَالَ سَجَدَهَا دَاوُد تَوْبَة وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا

رواه النسائى (١/١٨٢) وسكت عنه ، وفى الدراية رجاله ثقات اهـ (ص : ١٢٨) وصححه ابن السكن كما فى التلخيص (١/١١٤)

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) সাদে সিজ্‌দা করেছেন এবং বলেছেন যে, দাঊদ (আ) এখানে তাওবা স্বরূপ সিজ্‌দা করেছেন আর আমরা শুকরিয়া স্বরূপ সিজ্‌দা করি।[৭৩] (নাসাঈ)

এ হাদীসটি মৌলিকভাবে এ কথা প্রমাণ করে যে, সূরা সাদের সিজ্‌দাটি সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত, কিন্তু কেউ কেউ উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে বলেন যে, সূরা সাদে সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত নেই, অবশ্য এটি সিজ্‌দায়ে শোকর।

আল্লামা মুল্লা আলী কারী (র) 'মিরকাত' গ্রন্থে বলেন যে, এ আয়াতটি সিজ্‌দায়ে শোকর হওয়ার দ্বারা এ কথা প্রমাণ হয়না যে, এটি সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াতে নয়। কেননা একটি সিজ্‌দা ওয়াজিব হয়েও শুকরানামূলক হতে পারে। তাছাড়া পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সিজ্‌দার সম্পর্ক তিলাওয়াত বা শ্রবণের সাথে। অতএব কোন আয়াতে সিজ্‌দা তিলাওয়াত বা শ্রবণ করলেই

৭১. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৯৪২, পৃ. ২৩৪।

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।

৭৩. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৯৪০।

www.pathagar.com

সিজ্‌দা ওয়াজিব হবে। এটাই হল, সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াতের প্রকৃত অর্থ। চাই উক্ত সিজ্‌দাটি আদেশসূচক হোক কিংবা শোকরিয়ামূলক বা অন্য কোন ধরনের তাতে কোন পার্থক্য হবেনা। (২/৫৮)

মুহাক্কিক কামাল ইবনুল হুমাম (র) বলেন, এ হাদীসের সারমর্ম হল রাসূলুল্লাহ (সা) এখানে দাঊদ (আ)-এর সিজ্‌দার কারণ কি আর আমাদের সিজ্‌দার কারণ কি তা দর্শাতে চেয়েছেন, এছাড়া অন্য কিছু নয়। কাজেই হুকুম বর্ণনা উদ্দেশ্য নয় বরং কারণ বর্ণনা উদ্দেশ্য। আর সিজ্‌দা শোকরিয়া হওয়া ওয়াজিব হওয়াকে রহিত করে না।

গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, শরী'আতের সকল আহকাম তথা ফারয, ওয়াজিব ইবাদতের মূলে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামতরাজির শোকরিয়া আদায়।[৭৪]

কেউ কেউ এখানে প্রশ্ন করেছেন এ মর্মে যে, উক্ত আয়াতের বিষয়টি অন্যান্য আয়াতের থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এখানে বিশেষভাবে শোকর উদ্দেশ্য, কাজেই এ সিজ্‌দাটি সিজ্‌দায়ে শোকর বলেই গণ্য হবে। যা শরী'আতে মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয় এবং নামাযের মধ্যে আদায় করা চলেনা। হাফিয ইবন হাজার (র) ফাতহুল বারীতে (২/৪৫৬) বলেন, ইমাম শাফীঈ (র) এ হাদীসের শব্দ "شكر" দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, আয়াতে নামাযের মধ্যে সিজ্‌দা দেওয়া যাবেনা। কেননা নামাযের মধ্যে শোকরানা সিজ্‌দা আদায়ের বিধান নেই।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) সাদের সিজ্‌দাকে سُجُوْدُ الْقُرْآن এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর কুরআনে বর্ণিত সকল সিজ্‌দাই নামাযের ভিতরে বাইরে সর্বাবস্থায় আদায় করার বিধান রয়েছে। তাছাড়া বর্ণিত আছে যে, হযরত উসমান (রা) এ সিজ্‌দাটি নামাযে আদায় করেছেন।[৭৫]

اَخْرَجَ ابن مردوية عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ الْفَجْرِ فَقَرَأَ سُوْرَةَ ص فَسَجَدَ فِيْهَا ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ مَا بَقِيَ مِنْهَا ثُمَّ رَكَعَ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ! اَمِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ ؟ قَالَ : سَجَدَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (كذا فى كنز العمال (٤/٢١٦)

হযরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান (রা)-এর পিছনে ফজর নামায পড়লাম। তিনি তাতে সূরা সাদ পড়লেন এবং সিজ্‌দা করলেন, এরপর দাড়িয়ে বাকি অংশ তিলাওয়াত করলেন। তখন কিছু লোকে তাকে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! এটি কি ওয়াজিব সিজ্‌দা? জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এ সূরায় সিজ্‌দা করেছেন।[৭৬] (কানযুল উম্মাল)

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২।

৭৫. প্রাগুক্ত।

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২।

www.pathagar.com

ইমাম তাহাভী (র) 'মুশকিলুল আসারে' (৪/৩৪) বর্ণনা করেছেন, সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) বলেন, আমি হযরত উমর (রা)-কে সূরা সাদে সিজ্‌দা করতে দেখেছি।[৭৭]

দুররে মনসূরে সাঈদ ইবন মানসূরের সূত্রে বর্ণিত রয়েছে, হাসান (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সাদে সিজ্‌দা দিতেন না এক পর্যায়ে নাযিল হল ঃ أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ তখন থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) তাতে সিজ্‌দা করা আরম্ভ করেন।[৭৮] (দুররে মানসূর, ৫/৩০৫)

এ হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, নবী করীম (সা) এ আয়াত নাযিলের পূর্বে নিয়মিত এবং আবশ্যকরূপে সিজ্‌দা করতেন না তবে আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর থেকে পাবন্দীর সাথে সিজ্‌দা আদায় করেন যা ওয়াজিব বলে প্রমাণ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ لِىْ ابْنُ عُمَرَ : اَتَسْجُدُ فِىْ ص قُلْتُ لاَ : قَالَ : فَاسْجُدْ فِيْهَا ، فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ : اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ أخرجه الطحاوى فى مشكل الاثار (ص : ٣٥) وسنده حسن

হযরত সাঈদ ইবন জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) আমাকে বললেন, তুমি সাদে সিজ্‌দা কর কি ? আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন, তাতে সিজ্‌দা আদায় কর। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন[৭৯] ঃ اولئك الذين هدا هم الله فبهداهم اقتده

মুফাস্‌সালের সিজ্‌দা প্রসঙ্গে

বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَرَأَ النَّبِىُّ ﷺ النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيْهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ اَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى اَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ ، وَقَالَ : يَكْفِى هٰذَا فَرَاَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا . رواه البخارى (١٤٦/١)

হযরত আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় সূরায়ে নাজ্‌ম পাঠ করে তাতে সিজ্‌দা করেছিলেন এবং তাঁর সাথে যারা ছিলেন তারাও সিজ্‌দা করেছিলেন, তবে একজন বৃদ্ধ সিজ্‌দা করেনি। অবশ্য সে মাটি কিংবা পাথর মুষ্টিভরে নিয়ে কপাল পর্যন্ত উত্তোলন করে বলেছে, এটাই যথেষ্ট। পরবর্তীতে আমি তাকে কাফির অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। (বুখারী)

৭৭ প্রাগুক্ত।

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭, হাদীস নং ১৯৫২।

www.pathagar.com

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : انَّ النَّبِىَّ ﷺ كُتِبَتْ عِنْدَهُ سُوْرَةُ النَّجْمِ فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ سَجَدَ ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ وَسَجَدَتِ الدَّوَاتُ وَالْقَلَمُ .

رواه البزار باسناد جيد كذا فى الترغيب للمنذرى (١/٢٥٤)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা)-এর নিকট সূরা নাজ্‌ম লেখা হচ্ছিল। যখন সিজ্‌দার আয়াতে পৌছল, তখন তিনি সিজ্‌দা করলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সিজ্‌দা করলাম। এমন কি কলম-দোয়াত সিজ্‌দা করেছিল।[৮০] (বায্‌যার)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ : صَلّٰى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابُ الْفَجْرَ بِمَكَّةَ ، فَقَرَاءَ فِىْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِالنَّجْمِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ ، فَقَرَأَ اذَا زُلْزِلَتْ .

أخرجه الطحاوى (١/٢٠٩) ، قلت ورجاله رجال الصحبة الا شيخ الطحاوى وهوثقة صحّح حديْثه الشّيْخ ابن دقيق العيد فى الامام ، كما فى فتح القدير (٢/٩١)، قلت : وأخرج الطحاوى بعده عن عثمان رضى اللّه عنه نحوه وسنده حسن .

হযরত আব্দুর রহমান ইবন আবূ লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা) মক্কায় আমাদের নিয়ে ফজরের নামায পড়েছিলেন, তিনি দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা নাজ্‌ম পড়লেন। অতঃপর সিজ্‌দা করে পুনরায় দাঁড়িয়ে সূরা যিলযাল পড়লেন।[৮১] (তাহাভী ঃ ১ ঃ ২০৯)

এ সকল হাদীস দ্বারা এ কথাই প্রতিভাত হয় যে, মুফাস্‌সালের মধ্যে সূরা নাজ্‌মে সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত রয়েছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : سَجَدْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ .

رواه مسلم (١/٢١٥) وقال أبو داؤد (فى بعض نسخ الناسخين) /٢٠٦ ١ وسلم أبوهرية فى سنة ست عام خير ومن السجود من رسول اللّه ﷺ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (সা)-এর সাথে সূরা ইনশিকাক ও সূরা আলাকে সিজ্‌দা করেছি।[৮২] (মুসলিম)

---

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮, হাদীস নং ১৯৪৫।

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮, হাদীস নং ১৯৪৬।

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪, হাদীস নং ১৯৫৯।

www.pathagar.com

এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুফাস্সালের মধ্যে সূরা ইনশিকাক ও সূরা আলাকে সিজ্দায়ে তিলাওয়াত রয়েছে। মোটকথা, মুফাস্সালের তিনটি সিজ্দায়ে তিলাওয়াত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

কিন্তু কিছু কিছু হাদীসে বাহ্যত এর বিপরীত পরিলক্ষিত হয় তাই এর যথাযথ ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا .

(ক) যায়িদ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট সূরা নাজ্ম পাঠ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাতে সিজ্দা করেননি।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় হানাফী ফকীহগণ বলেন, সূরা নাজ্মে সিজ্দা না হওয়ার ক্ষেত্রে এ হাদীসটি প্রমাণ হতে পারেনা। এজন্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মোটেই সিজ্দা করেননি এ কথাতো কোথাও উল্লেখ নেই। হানাফী মাযহাবে সিজ্দা তিলাওয়াত তাৎক্ষণিক ওয়াজিব নয়, বরং তা على التراخى বা বিলম্বের অবকাশসহ ওয়াজিব হয়। আর এ হাদীসে وجوب على التراخى কেই বুঝানো হয়েছে।

তাই হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (র) ফাতহুল বারীতে (২/৪৫৮) উল্লেখ করেন যে, সূরা নাজমে এ অবস্থায় সিজ্দা ছেড়ে দেওয়া মোটেই সিজ্দা না করা বুঝায় না। কেননা হতে পারে তখন বিশেষ কারণবশত সিজ্দা করেননি যেমন অযূ না থাকা কিংবা মাযূর হওয়া, কিংবা সময় অনুপযোগী হওয়া বা তিলাওয়াতকারী এখনও সিজ্দা দেয়নি সেজন্য, কিংবা এটা বিলম্বিত করার অবকাশ রয়েছে এ কথা বুঝানোর জন্য। আর এটাই হল ইমাম শাফিঈর সুদৃঢ় অভিমত।[৮৩]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَسْجُدْ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ . رواه أبو داؤد (١/٥٣٠) وسكت عنه

(খ) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) মুফাস্সালের কোন সূরাতেই মদীনায় হিজরতের পর আর সিজ্দা করেননি। (আবূ দাউদ)

মুফাসসালে সূরাসমূহে সিজ্দা নেই। এর জবাবে হানাফী ফকীহগণ বলেন, প্রথমত, নবী করীম (সা) মোটেই সিজ্দা করেননি এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়না। হতে পারে তিনি তাৎক্ষণিক করেননি পরবর্তীতে তা করে নিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, হতে পারে হযরত ইবন আব্বাস (রা) নবীজীকে এ ক্ষেত্রে সিজ্দা করতে দেখেননি। কিন্তু অন্যান্য সাহাবীগণ দেখেছেন বরং নবীর সাথে এসবস্থলে সিজ্দাও করেছেন বলে হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যা ইতোপূর্বে হানাফীদের দলীল বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ দর্শকদের হাদীস ও বক্তব্য

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮।

www.pathagar.com

অন্যদের বক্তব্যের উপর প্রাধান্য পানে। কেননা নিয়ম হলো, ইতিবাচক এবং নেতিবাচক হাদীসের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে ইতিবাচক হাদীস প্রাধান্যপ্রাপ্ত হয়।

তাছাড়া সিজ্‌দা করা ওয়াজিব বিষয়ক হাদীসসমূহ অধিক শক্তিশালী। কেননা তা মুসলিম ও বুখারী কর্তৃক বর্ণিত।[৮৪]

আতা ইবন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতের মধ্যে আছে ঃ

اَنَّهُ سَأَلَ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ هَلْ فِى الْمُفَصَّلِ سَجْدَةٌ ؟ قَالَ : لاَ .

(গ) একদা তিনি উবাই ইবন কা'বকে জিজ্ঞাসা করলেন মুফাস্‌সালে সিজ্‌দা আছে কী ? জবাবে বললেন, না। (তাহাভী ১/২০৮) এই রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে ও ঠিক একই জবাব প্রযোজ্য হবে।

ইমাম তাহাভী (র) বলেন, উবাই ইবন কা'ব (রা) উক্ত বিপরীত সাহাবাদের একটি বিরাট জামা'আত যেমন ঃ হযরত আলী, উমর, উসমান, আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ, ইবন উমর, আম্মার ও আবু হুরায়রা (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তাঁরা এসব সূরায় সিজ্‌দা করেছেন। অতএব এ ক্ষেত্রে এ অধিক সংখ্যকের আমল এবং বক্তব্যই প্রাধান্য পাবে।[৮৫]

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮-২৩৯।

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০, ২৪১।

www.pathagar.com

জামা'আত দাঁড়িয়ে গেলেও ফজরের সুন্নাত পড়ার নিয়ম

ফজরের নামায (ফরয) জামা'আতের সাথে শুরু হয়ে গেলেও যদি এমন ধারণা হয় যে, দুই রাক'আত সুন্নাতে মু'আক্কাদা আদায়ের পর শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদে হলেও জামা'আতের সাথে শরীক হওয়া যাবে তাহলে সুন্নাত পড়ে নিবে।[১] আর যদি শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদে শরীক হতে পারার আশা না থাকে তাহলে সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শরীক হয়ে যাবে।[২] কেননা ফজরের এই দুই রাক'আত সুন্নাতকে শরী'আত অন্যান্য নামাযের সুন্নাতের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং বহু ফকীহ সাহাবী এ সুন্নাতকে জামা'আত শুরু হয়ে যাওয়ার পরেও ব্যক্তিগতভাবে আদায় করে জামা'আতে শামিল হতেন বলে বর্ণিত রয়েছে। উল্লেখ্য, ফজরের সুন্নাতকে এমন গুরুত্ব দেওয়া হত বলেই ফকীহগণ এটিকে آكَدُ السُّنَنِ বলে অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো লক্ষণীয় ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَدْعُوْهَا (ركعتى الفجر) وَاِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ ، رواه أبو داؤد تحت باب التطوع وركعات السنة ، رقم الحديث : ١٢٥٨ ص : ١٨٩، ورواه أحمد واثار السنن فى باب تاكيد ركعتى الفجر ص : ١٨٠ .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাতে মু'আক্কাদা পরিত্যাগ করো না। এমনকি যদি তোমাদেরকে শত্রুর ঘোড়া হাঁকিয়ে নিতে থাকে তখনো নয়।[৩]

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ : اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلٰى شَيْءٍ مِّنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِّنْهُ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ ، رواه مسلم رقمه :

---

১. তবে এরূপ অবস্থায় সুন্নাত পড়তে হবে মসজিদের বাইরে। মসজিদের ভিতরে জামা'আত চলা অবস্থায় বারান্দায় কিংবা কোন এক প্রান্তে সুন্নাত পড়া হলে সেটি বাইরে পড়ারই শামিল বলে গণ্য হবে। --মুফতী রশীদ আহমাদ, আহসানুল ফাতাওয়া, দেওবন্দ ঃ যাকারিয়া বুক ডিপো, নভে: ১৯৯৪, খ. ৩, পৃ. ২৫৭।

২ উল্লেখ্য এরূপ ছেড়ে দেওয়া সুন্নাত জামা'আতের পরে সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়া জায়িয নেই। সূর্যোদয়ের পর এর কাযা পড়ে নিবে। তবে সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে পড়ে নেওয়া উত্তম। অনুরূপে যদি কোন কারণে ফজরের ফরযসহ তা কাযা হয়ে যায় তাহলে সেটি সুন্নাতসহ কাযা করে নেওয়া চাই। মুফতী রশীদ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭।

৩. ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, রিয়াদ, দারুস সালাম লিন নাশর ওয়াত তাওযী, এপ্রিল ১৯৯৯, হাদীস নং ১২৫৮, পৃ. ১৮৯; আসারুস সুনান, পৃ. ১৮০।

www.pathagar.com

١٦٨٦ ، ص : ٢٩٤، باب إستحباب ركعتى سنة الفجر والحث عليها وتخفيفها والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب ان يقراء فيها .

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা) ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত যতটা গুরুত্বের সাথে আদায় করতেন এমন গুরুত্ব তিনি অন্য কোন নফলের ক্ষেত্রে প্রদান করতেন না।[৪] (ক)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا : عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، رواه مسلم فى الباب المذكور، رقمه : ١٦٨٨ ، ص : ٢٩٤

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে অবস্থিত সকল জিনিসের চেয়ে উত্তম। ৪ (খ)

উপরোক্ত হাদীসগুলো স্পষ্ট প্রমাণ করছে যে, ফজর নামাযের দুই রাক'আত সুন্নাত অন্যান্য নামাযের যে কোন সুন্নাত থেকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই এটিকে 'আকাদুস সুনান' (যা ওয়াজিব নয় তবে ওয়াজিবের কাছাকাছি) বলা হয়েছে। অন্যান্য নামাযে সাধারণত ফরযের জামা'আত দাঁড়িয়ে গেলে সুন্নাত আদায় করা যায় না। কিন্তু 'আকাদুস সুনান' হিসাবে ফজরের সুন্নাত আদায় হবে। তবে এ শর্তের উপর যেন জামা'আত একেবারে ছুটে যাওয়ার আশংকা না থাকে। উল্লেখ্য যে, ফজর নামাযে মাসনূন কিরা'আত 'তিওয়ালে মুফাস্সাল' পড়া হয় বিধায় কিরা'আত দীর্ঘ হয়ে থাকে যা অন্য নামাযে সচরাচর হয় না। এমতাবস্থায় ফজরের সুন্নাত পৃথকভাবে আদায় করে নেওয়ার এই ব্যতিক্রম (مستثنى) হুকুম অযৌক্তিক কিছুই নয়। নবী (সা) থেকে সাহাবীগণ এ শিক্ষাই পেয়েছিলেন। তাই দেখা যায়, বহু ফকীহ্ সাহাবী ফজরের জামা'আত শুরু হয়ে যাওয়ার পরও পৃথকভাবে সুন্নাত আদায়ের পর ফরজের জামা'আতে শামিল হতেন। যেমন,

عَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسَ صُفُوْفٌ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَيُصَلِّىْ الرَّكْعَتَيْنِ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِى الصَّلٰوةِ ، رواه الطحاوى فى شرح معانى الاثار تحت باب الرجل يدخل المسجد والامام فى صلاة الفجر ولم يكن ركع ايركع او لا يركع ، ص : ٢٥٤

হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, (কখনো কখনো) তিনি মসজিদে এমন সময়ে প্রবেশ করতেন যখন লোকজন ফজর নামাযের জামা'আতে কাতারবন্দী হয়ে নামায শুরু

---

৪. ইমাম মুসলিম, আস সহীহ্, রিয়াদ, দারুস সালাম লিন নাশর ওয়াত তাওযী, জুলাই ১৯৯৮, হাদীস নং ১৬৮৬, পৃ. ২৯৪।

www.pathagar.com

করে দিয়েছে। এ সময় তিনি মসজিদের এক কোণে দাঁড়িয়ে দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় করে নিতেন। তারপর লোকজনের সাথে নামাযে শরীক হতেন।[৫]

وَعَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ قَالَ كُنَّا تَأْتِى عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ قَبْلَ اَنْ فَنُصَلِّىْ الرَّكْعَتَيْنِ فِىْ اٰخِرِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ نَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِىْ صَلٰوتِهِمْ بحوالة المذكورة .

হযরত আবূ উসমান নাহদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন কোন সময় আমরা ফজরের পূর্বে দুই রাক'আত সুন্নাত পড়ার আগেই হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর দরবারে চলে যেতাম। সে সময় তিনি থাকতেন ফরয নামায আদায়রত। তখন আমরা মসজিদের শেষ কোণে দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় করে নিতাম। তারপর লোকজনের সাথে তাদের জামা'আতে শামিল হয়ে যেতাম।[৬]

وَعَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَالْاِمَامُ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلَّى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الاِمَامِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُمْ ، بِحَوَالَةِ المذكورة .

হযরত আবূ উসমান আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) এমন সময় এসে প্রবেশ করলেন, যখন ইমাম ফজরের জামা'আত শুরু করে দিয়েছেন, অথচ তিনি তখনো ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত পড়েননি। অতএব আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (প্রথমত) ইমামের পেছনে এক স্থানে দাঁড়িয়ে দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় করে নেন। তারপর লোকজনের সাথে জামা'আতে শামিল হয়ে যান।[৭]

ইমাম আবূ জাফর তাহাভী (র) এ পর্যায়ে আরো কয়েকজন সাহাবীর আমল বর্ণনা করেছেন। এই সাহাবীগণের সকলেই ছিলেন ফকীহ। তাঁদের উপরোক্ত আমল নির্দেশ করছে যে, ফজরের জামা'আত শুরু হয়ে গেলেও জামা'আত পাওয়ার সম্ভবনা থাকলে পৃথকভাবে সুন্নাত আদায় করে নিবে। এটিই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এবং হানাফী ফকীহগণের অভিমত।

কিন্তু ইমাম শাফীঈ, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) প্রমুখ ফকীহগণ ফজরের সুন্নাতকে অন্যান্য নামাযের সুন্নাত থেকে পৃথক চিন্তা না করে একই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত রেখে বলেন, অন্যান্য নামাযের মধ্যে যেমন জামা'আত দাঁড়িয়ে গেলে পূর্ববর্তী সুন্নাত শুরু করা যায় না বরং সরাসরি জামা'আতে শামিল হয়ে যেতে হয় তদ্রূপ ফজরের জামা'আত শুরু হয়ে গেলে সুন্নাত

৫. ইমাম আবূ জাফর তাহাভী, শারহু মা'আনিল আসার, দেওবন্দ আশরাফী বুক ডিপো, তাবি, খ. ১, পৃ. ২৫৪।

৬. প্রাগুক্ত।

৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

না পড়ে সরাসরি জামা'আতে শামিল হয়ে যাবে। তাঁরা সুনানে তিরমিযীতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস দলীলরূপে পেশ করেন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوْةُ فَلاَ صَلٰوْةَ الاَّ الْمَكْتُوْبَةُ ، قال أبو عيسى حديث أبى هريرة حديث حسن ، وروى حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ولم يرفعاه ، رقمه : ٤٢١ ، تحت باب ما جاء اذا اقيمت الصلوة فلا صلاة الا المكتوبة ، ص : ١١٤

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন নামাযের ইকামত দেওয়া হবে তখন ফরযের জামা'আতে শামিল হওয়া ব্যতিরেকে আর কোন নামায নেই।[৮]

শাফীঈ ফকীহগণের সার বক্তব্য হল যে, উপরোক্ত হাদীস ব্যাপকার্থক। কাজেই ফজরের সুন্নাত দ্বারা এ ব্যাপকতা ক্ষুণ্ন করা যাবে না। হানাফী ফকীহগণ বলেন, কোন সন্দেহ নেই যে, উপরোক্ত হাদীসের অর্থে যে ব্যাপকতা বিদ্যমান সেটি শাফীঈগণও সংরক্ষণ করেননি। যেমন শাফীঈ ফকীহগণের মতেও মসজিদে ফজর নামাযের জামা'আত শুরু হয়ে যাওয়ার পরও কোন ব্যক্তি যদি ঘরে সুন্নাত আদায় করে এসে জামা'আতে শামিল হয় তাতে কোন আপত্তি নেই। অথচ হাদীসের বক্তব্যে কোথাও ঘরে পড়া বা মসজিদে পড়ার মধ্যে ব্যবধান উল্লেখ নেই। যদি তারা ব্যাপকতাকে এতটাই সংরক্ষণ করতেন তাহলে জামা'আত দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর ঘরে সুন্নাত আদায়ের জন্য অনুমতি দিতেন না।[৯]

অনুরূপভাবে হাদীসে বর্ণিত الا المكتوبة (ফরয ব্যতিরেকে) শব্দটি লক্ষণীয়। এটি ব্যাপকার্থক শব্দ। অর্থাৎ এটি সব ধরনের ফরয নামাযকে বুঝায়, চাই তা কাযা হোক কিংবা আদা। তাহলে হাদীসের মর্মানুসারে কেউ যদি ফরযের ইকামত হয়ে যাওয়ার পর কোন কাযা নামায শুরু করতে চায় তাহলে তার জন্য কাযা নামায পড়ার অনুমতি থাকতে হবে। অথচ শাফিঈ ফকীহগণ এমন কাযা শুরু করার অনুমতি দেন না।

এ দু'টি উদাহরণ থেকে বুঝা যায় হাদীসখানাকে শাফিঈ বা হাম্বলী ফকীহগণ সাধারণভাবে عام -ব্যাপকার্থক দাবী করলেও মূলত তাঁরা এটিকে عام মানেন না। বরং কার্যত তাঁদের মতে

৮. ইমাম তিরমিযী ঃ আস সুনান, রিয়াদ, দারুস সালাম লিন নাশর ওয়াত তাওযী, হাদীস নং ৪২১, পৃ. ১১৪।

৯. ইমাম শাফিঈ (র) সম্ভবত নিম্নোক্ত হাদীসখানার কারণে গৃহে সুন্নাত আদায় করাকে عام করেছেন। হাদীস খানা হল ঃ

عن نافع عن ابن عمر بينا هو يجلس فى الصبح اذ سمع الاقامة فصلى فى الحجرة ركعتى الفجر ثم خرج فصلى مع الناس قال وكان ابن عمر اذا وجد الامام يصلى ولم يكن ركعهما ، دخل مع الامام ثم يصليهما بعد طلوع الشمس .

(দ্র. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, খ. ২, পৃ. ৪৪৩, হাদীস নং ৪০১৯।

www.pathagar.com

এটি عـام خص عنه البـعض (এমন ব্যাপকার্থক যা থেকে কিছু অংশকে বাদ দেওয়া হয়েছে) সুতরাং কোন হাদীসের عموم থেকে শাফিঈগণ কোন افراد কে বাদ দিলে যদি দোষের বিষয় না হয় তাহলে ঐ হাদীসের عموم থেকে تعامل صحابه-এর কারণে হানাফী ফকীহগণ যদি কোন افراد কে বাদ সেটি দোষের বিষয় হবে কেন?[১০]

কোন কোন আলিম হানাফী ফকীহগণের সমর্থনে সুনান বায়হাকীতে বর্ণিত এই হাদীসের ভিন্ন সূত্রের একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেন। বায়হাকীর সেই রিওয়ায়াতে ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাতকে মূল ব্যাপকতা থেকে স্পষ্ট শব্দে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ আছে। পূর্ণ রিওয়ায়াতটি নিম্নরূপ ঃ

اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلاَ صَلٰوةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ اِلاَّ رَكْعَتَىْ الصُّبْحِ .

উক্ত আলিমগণ রিওয়ায়াতটিকে দলীলরূপে পেশ করলেও মূলত এটি দলীল হিসাবে উপস্থাপন যোগ্য নয়। কেননা রিওয়ায়াতটি অত্যন্ত যাঈফ। স্বয়ং ইমাম বায়হাকী রিওয়ায়াতটি সম্পর্কে বলেন, هذه الزيادة لا أصل لها মূল হাদীস থেকে বর্ধিত অংশটির সনদগত কোন ভিত্তি নেই।[১১] তবে হানাফীগণের মাস'আলা এই বর্ধিত অংশের উপর নির্ভরশীল নয় বিধায় রিওয়ায়াতটি উপস্থাপনযোগ্য না হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই।

অনুরূপভাবে কোন কোন শাফিঈ আলিম এই হাদীসেরই অপর একটি বর্ণনা করেন। সেখানে বর্ধিত অংশ হিসাবে বলা হয়েছে ঃ

قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَلاَ رَكْعَتَىْ الْفَجْرِ ، قَالَ وَلاَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ ،

তখন, প্রশ্ন করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাতকেও শুরু করা হবে না ? মহানবী (সা) বললেন, না, ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাতও নয়।

উল্লেখ্য, বর্ধিত এ অংশের সনদগত দুর্বলতা পূর্বোক্ত রিওয়ায়াতের দুর্বলতার চেয়েও বেশি। কাজেই এটির দ্বারাও দলীল পেশ করা যায় না।[১২]

নামাযে কথা বললে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়

নামাযের ভিতর কোন প্রকার কথা বলা যায় না। মালিকুল উলামা আল্লামা কাসানী (র) লিখেছেন, ইচ্ছা করে হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক মুখ থেকে কোন প্রকার কথা বের হলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়।[১৩]

---

১০. মাওলানা তাকী উসমানী ঃ দরসে তিরমিযী, করাচী ঃ মাকতাবা দারুল উলূম, নভে ঃ ১৯৮৭, খ২, পৃ.১৮৮।

১১. সুনান বায়হাকী, খ ২, পৃ. ৪৮৩।

১২. মাওলানা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

১৩. মালিকুল ইলামা আল্লামা কাসানী, বাদায়িউস সানায়ি' ফী তারতীবিশ শারাঈ, বাইরূত ঃ দারু ইহয়ায়িত তুরাস আল আরাবী, ২০০০, খ ১, পৃ. ৫৩৭।

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে ইজ্‌মা প্রতিষ্ঠিত। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বিষয়টি আরো পরিচ্ছন্ন করে বলেছেন, ইচ্ছা করে হোক কিংবা অনিচ্ছায়, না জেনে হোক কিংবা ভুলক্রমে, নামায শুদ্ধ করার জন্য হোক কিংবা অন্য কোন কারণে সর্বপ্রকার কথা বলার দ্বারাই নামায ভঙ্গ হয়ে যায়।[১৪] কেননা পবিত্র কুরআনে নামাযে কথা বলার বিষয়টিকে শর্তহীনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। প্রথম দিকে মুসলমানদের জন্য নামাযের ভিতর নিজেদের পারস্পরিক কথা বলার অনুমতি ছিল। সাহাবীগণ প্রয়োজনীয় কথাবার্তা নামাযের ভিতর করতেন। পরে এ কথাবার্তা বলা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ্ নামাযে নিরব দাঁড়িয়ে থাকার আদেশ দিয়ে নাযিল করেন ঃ

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ .

"তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান থাকবে বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের মধ্যে এবং তোমরা দাঁড়াবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিরবে বিনীতভাবে"।[১৫]

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম সহ হাদীস গ্রন্থের বিশুদ্ধ বর্ণনা এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, উপরোক্ত আয়াত নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষেধ করার মর্মে নাযিল হয়েছে। উল্লেখ্য, এখানে কথা বলাকে কোন বিশেষ অবস্থার সাথে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি বিধায় বুঝা যায় যে, সর্বপ্রকার কথা বলাই নিষিদ্ধ।

عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِىْ قَالَ قَالَ لِىْ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنْ كُنَّا يُكَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ يُكَلِّمُ اَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتّٰى نَزَلَتْ «حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ».

হযরত আবূ আম্‌র শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত যায়িদ ইবন আরকাম (রা) আমাকে বলেছেন যে, মহানবী (সা)-এর সময়ে (প্রথম দিকে) আমাদের অবস্থা ছিল এমন যে, আমরা নামাযের ভিতর কথাবার্তা বলতাম। তখন আমাদের কেউ কোন প্রয়োজনবোধ করলে নামাযরত নিজের সাথীর সাথে কথা সেরে নিত। অবশেষে নাযিল হল حَافِظُوْا الصَّلَوٰات وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ আয়াতখানা। অতঃপর আমাদেরকে কথাবার্তা বাদ দিয়ে নিরব থাকার আদেশ দেওয়া হল।[১৬]

---

১৪. মাওলানা তাকী উসমানী ঃ দারসে তিরমিযী, করাচী, মাকতাবা দারুশ উলূম, নভে ঃ ১৯৮৭, খ ২, পৃ. ১৫০।

১৫. আল-কুরআন, বাকারা ২ ঃ

১৬. ইমাম বুখারী ঃ আস সহীহ, রিয়াদ, দারুস সালাম লিন্ নাশর ওয়াত তাওযী, মার্চ ১৯৯৯, হাদীস নং ১২০০, পৃ. ১৯১। এ প্রসঙ্গে আরো লক্ষণীয় যে,
انه عليه السلام قال ..... ولكن على صلوة ما لم يتكلم اى جواز البناء الى غاية التكلم فيقضى انتها ، الجواز بالتكلم، كما فى البدائع ، ص : ٥٣٨

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِىِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ اِنَّ فِى الصَّلٰوةِ شُغْلاً ، رواه الامام البخارى فى الباب المذكور ، رقمه ١١٩٩ ، وايضا تحت باب لا يرد السلام فى الصلوة رقمه ١٣١٦، وتحت باب هجرة الحبشه رقمه ٣٨٧٥ وزاد فيه فقلنا يا رسول الله ، انَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا قَالَ اِنَّ فِى الصَّلٰوةِ شُغْلاً ، فَقُلْتُ لِاِبْرَاهِيْمَ كَيْفَ تَصْنَعُ اَنْتَ ، قَالَ اَرُدُّ فِىْ نَفْسِىْ .

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিয়ম ছিল যে, আমরা মহানবী (সা)-কে নামায পড়া অবস্থায়ও সালাম দিতাম এবং তিনি আমাদের সালামের উত্তর দিতেন। অতঃপর আমরা যখন নাজাশীর দরবার থেকে প্রত্যাবর্তন করে আসলাম তখন মহানবী (সা)-কে নামাযরত অবস্থায় সালাম দিলাম। তখন তিনি আমাদের সালামের জবাব দেননি। নামায শেষ করে বললেন, নামাযের মধ্যে (নামায সংক্রান্ত কাজের) ব্যস্ততা থাকে (বিধায় সালামের জবাব দেওয়া সম্ভব হয়নি।) অপর বর্ণনায় আছে, হযরত ইবন মাসঊদ (রা) বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা ইতোপূর্বে আপনাকে সালাম দিতাম এবং আপনিও আমাদের সালামের জবাব দিতেন। মহানবী (সা) বললেন, নামাযের মধ্যে (নামায সংক্রান্ত কাজের) ব্যস্ততা থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাবী ইব্‌রাহীমকে বললাম, তাহলে আপনি কিভাবে জবাব দিয়ে থাকেন ? তিনি বললেন, আমি মনে মনে জবাব দেই।[১৭]

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا اَنَا اُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ عَطَسَ رَجُلُ بْنِ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَرَمَانِى الْقَوْمُ بِاَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثكل اُمِّيَاهُ مَا شَانُكُمْ تَنْظُرُوْنَ اِلَىَّ فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ عَلٰى اَفْخَاذِهِمْ ، فَلَمَّا رَاَيْتُهُمْ يُصَمِّتُوْنَنِىْ لٰكِنِّىْ سَكَتُّ ، فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبِاَبِىْ هُوَ وَاُمِّىْ مَا رَاَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ اَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِنْهُ فَوَاللّٰهِ مَا كَهَرَنِىْ وَلَا ضَرَبَنِىْ وَلَا شَتَمَنِىْ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَىْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، اِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَائَةِ الْقُرْاٰنِ ، الخ .

---

১৭. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১১৯৯, ১২১৬, ৩৮৭৫, পৃ. ২৯২। আরো দ্র. ইমাম শাফিঈ, আস সুনান, খ. ১, পৃ. ১৯১; ইবন আবু শায়বা : আল মুসান্নাফ, খ. ২, পৃ. ৭৩; আহমাদ ইবন হাম্বল, আল মুসনাদ, খ. ১, পৃ. ৩৭৭, ৪৩৫, ৪৬৩।

www.pathagar.com

رواه الامام مسلم فى صحيحه تحت باب تحريم الكلام فى الصلواة ونسخ ما كان من ابحته رقمه ١١٩ ، صفحه ٢١٨، وايضًا لحرجه النسائى فى سننه ج : ١ ، ص : ١٧٩، فى باب الكلام .

হযরত মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম আস সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এদা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে (জামা'আতে) নামায আদায় করছিলাম। এ সময়ে জামা'আতের একজন হাঁচি দিল। আমি বললাম يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহমত করুন) এ কথা শুনে লোকজন আমার দিকে চোখ উঁচিয়ে তাকাতে লাগল। আমি বললাম, হায়! আমার মায়ের, পুত্রশোক! তোমাদের কি হল যে, তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে আছ ? তখন তারা নিজেদের হাত নিজেদের উরুতে মারতে শুরু করল। আমি যখন দেখলাম যে, তারা আমাকে জোরপূর্বক চুপ করাতে চাচ্ছে (তখন আমি রেগে গেলাম, তবে রাগের মাথায় কোন কাজ করিনি) অবশেষে আমি নিজ থেকেই চুপ হয়ে গেলাম। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায শেষ করলেন। আমার পিতামাতা তাঁর জন্য উৎসর্গিত হোক। তাঁর পূর্বে এবং তাঁর পরে আমি এমন কোন শিক্ষাদানকারী দেখিনি ও পাইনি যে তাঁর চেয়ে অধিকতর সুন্দর শিক্ষাদানে পারদর্শী। আল্লাহ্র শপথ ! তিনি আমাকে না কোন ধমক দিয়েছেন, না প্রহার করেছেন, না গালি দিয়েছেন। তিনি শুধু বলেছেন, এই নামায এমন জিনিস যে, এখানে মানুষের কথাবার্তা কোন কিছু স্থানুপযোগী নয়। এটি তো হল কেবল তাসবীহ্, তাকবীর ও কুরআন তিলাওয়াত বিষয়ক জিনিস।[১৮]

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عنه قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا السَّلَامَ حَتّٰى قَدِمْنَا مِنْ اَرْضِ الْحَبَشَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ فَاَخَذَنِىْ مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ فَجَلَسْتُ حَتّٰى اِذَا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ مِنْ اَمْرِهٖ مَا يَشَاءُ وَاِنَّهُ قَدْ اَحْدَثَ مِنْ اَمْرِهٖ اَنْ لَا يُتَكَلَّمُ فِى الصَّلٰوةِ ، رواه الامام النسائى ، تحت باب الكلام فى الصلواة رقمه : ١٢٢٢، ص : ١٧٠

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মহানবী (সা)-কে নামাযের মধ্যেও সালাম দিতাম এবং তিনি আমাদের সালামের জবাব দিতেন। অবশেষে আমরা হাবশা ভূখণ্ড থেকে ফিরে এসে তাঁকে সালাম করলে তিনি সালামের জবাব দেননি। (বিষয়টি আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল) আমার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী বিভিন্ন ঘটনা আমার মনকে ঘিরে ধরল। ফরে আমি বসে গেলাম। মহানবী (সা) নামায শেষ করে বললেন, মহান আল্লাহ্ তাঁর বিধানের ক্ষেত্রে যত চান নতুনভাবে নাযিল করেন।

১৮. ইমাম মুসলিম ঃ আস সহীহ, রিয়াদ, দারুস সালাম লিন নাশর ওয়াত তাওযী, মার্চ ১৯৯৯, হাদীস নং ১১৯৯, পৃ. ২১৮; ইমাম নাসাঈ ঃ আস সুনান, খ. ১, পৃ. ১৭৯; ইমাম আবূ দাউদ ঃ আস সুনান, বাবু তাশমীতিল আতিস, হাদীস নং ৯৩০; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং -২২৪৮।

www.pathagar.com

তার নতুন নাযিলকৃত বিধানের মধ্যে একটি হল, নামাযের মধ্যে কোন কথাবার্তা বলা যাবে না।[১৯]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ স্পষ্ট প্রমাণ করছে যে, নামাযের মধ্যে মানুষের কথাবার্তা مطلقا (সর্বাবস্থায়) নিষিদ্ধ। মানুষের কথা (كلام الناس) তা যে কোন পর্যায়ের হোক না কেন এর দ্বারা নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। এটিই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত।

কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, মানুষের কথাবার্তা যদি ভুলক্রমে হয় কিংবা হুকুম থেকে অজ্ঞতার কারণে হয় তাহলে সেই কথাবার্তা দ্বারা নামায ভঙ্গ হয় না। তবে শর্ত হল কথাবার্তা দীর্ঘ না হওয়া চাই।[২০] ইমাম আওয়াঈ (র)-এর মতে কারো কথাবার্তা যদি নামায শুদ্ধ করে দেওয়ার জন্য হয়ে থাকে তাহলে সেই কথা নামায ভঙ্গকারী নয়। ইমাম মালিক (র) থেকেও এরূপ একটি অভিমত পাওয়া যায়। অবশ্য ইমাম মালিক (র)-এর অপর মতামত হানাফীগণের অনুকূলে। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) থেকে এ ব্যাপারে চারটি অভিমত পাওয়া যায়। তিনটি অভিমত পূর্বোক্ত তিন ইমামের অভিমতের ন্যায়। আর চতুর্থ অভিমত হল যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজের নামায এখনো শেষ হয়নি জেনে কথা বলে তার সেই কথা যে পর্যায়েরই হোক না কেন এটি নামায ভঙ্গকারী বলে বিবেচিত হবে। আর যদি নিজ নামায যথারীতি শেষ হয়ে গিয়েছে জেনে কথা বলে তবে তার সেই কথার দ্বারা নামায ভঙ্গ হবে না। মোটকথা ইমামত্রয়ের সকলেই নামাযের ভিতর কোন না কোন পর্যায়ের কথাবার্তাকে নামায ভঙ্গকারী নয় বলে মতামত দিয়েছেন। পক্ষান্তরে হানাফী ফকীহগণ কথাবার্তাকে সম্পূর্ণভাবে নামায ভঙ্গকারী বলেছেন। তাতে কথাবার্তার কোন অংশকে বাদ দেওয়া হয়নি।[২১]

ইমাম শাফিঈ প্রমুখ ফকীহগণ তাঁদের দলীল হিসাবে যুল-ইয়াদাইন (রা)-এর হাদীসকে পেশ করে থাকেন।

হাদীসখানা নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَنْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُوْ الْيَدَيْنِ اَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ اَمْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَصَدَقَ ذُوْ الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ اُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِه اَوْ اَطْوَلَ ، قَالَ اَبُو عيسى الترمذى حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح ، رقم الحديث : ٣٩٩ ، ص : ١٠٧

---

১৯. ইমাম নাসাঈ, আস সুনান, রিয়াদ, দারুস সালাম লিন নাশর ওয়াত তাওযী, এপ্রিল ১৯৯৯, হাদীস নং, ১২২২, পৃ. ১৭০।

২০. قال الامام النورى القول الثالث ان يتكلم ناسيا ولا يطول كلامه فمذهبنا انه لا تبطل صلوته

২১. মাওলানা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

www.pathagar.com

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মহানবী (সা) (চার রাক'আত নামাযের মধ্যে) দুই রাক'আত পড়েই নামায শেষ করে বেরিয়ে আসেন। তখন তাকে সাহাবী যুল-ইয়াদাইন (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! নামাযের রাক'আত (সংখ্যা) হ্রাস করা হয়েছে, না আপনি ভুলে গিয়েছেন ? একথা শুনে মহানবী (সা) বললেন, যুল-ইয়াদাইন কি সত্য বলছে ? লোকজন উত্তর দিল, জী হ্যাঁ। তখন নবী (আ) পুনরায় দাঁড়ালেন এবং অবশিষ্ট দুই রাক'আত নামায আদায় করলেন। মহানবী (সা) (সাহু সিজ্দা আদায়ের নিমিত্তে) সালাম ফিরালেন তারপর তাক্বীর বলে সিজ্দা করলেন। তার এই সিজ্দা ছিল সাধারণ নামাযের সিজ্দার ন্যায় কিংবা তার চেয়ে একটু দীর্ঘ। তারপর তাক্বীর বলে মাথা তুললেন এবং আবার সিজ্দায় গেলেন। এ সিজ্দাও ছিল অন্যান্য সিজ্দার ন্যায় কিংবা তা থেকে একটু দীর্ঘ।[২২]

হযরত ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, এ হাদীসে দেখা যায় যে, সাহাবী যুল-ইয়াদাইন (রা) কথা বলেছেন, এবং মহানবী (সা) থেকেও কথা বলা পাওয়া গিয়েছে। উভয়ের কথা বলার ঘটনাটি ঘটল নামাযের ভিতরে। কেননা মহানবী (সা) কথা বলার পর নামায পুনরায় শুরু থেকে পড়েননি। বরং পূর্বের দুই রাক'আতের সাথে অবশিষ্ট দুই রাক'আত যুক্ত করে দিয়েছেন। তবে কথা বলার বিষয়টি দুই জন থেকে পাওয়া গিয়েছে দুই দৃষ্টিকোণ থেকে। যুল-ইয়াদাইন (রা) বলেছেন হুকুম না জানার কারণে। আর মহানবী (সা) বলেছেন, ভুল সংঘটিত হওয়ার কারণে। কথাবার্তা পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও যেহেতু মহানবী (সা) নামায বাতিল না করে সংযুক্তি মিলিয়ে নিয়েছেন সেহেতু বুঝা যে, যায় এই দুই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি ইমাম বা মুক্তাদীর পক্ষ থেকে কথা বলা পাওয়া যায় তাহলে সেটি নামায ভঙ্গকারী বিবেচিত হবে না।[২৩]

ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) প্রমুখ ফকীহগণও বলেছেন এ পর্যায়ের কথা বলা দ্বারা নামায নষ্ট হয় না। অবশ্য তাঁরা দৃষ্টিকোণ নিরূপণে ইমাম শাফিঈ (র) থেকে ভিন্ন মত গ্রহণ করেছেন। যেমন ইমাম মালিক (র) বলেছেন যে, উভয়ের উপরোক্ত কথাবার্তা ছিল নামায শুদ্ধ করার লক্ষ্যে অতএব বুঝা যায় যে, নামায শুদ্ধ করার লক্ষ্যে কথাবার্তা পাওয়া গেলে তা নামায ভঙ্গকারী বলে বিবেচিত হবে না। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) বলেছেন যে, উভয়ের কথাবার্তা এ কথা মনে করে সংঘটিত হয়েছিল যে, নামায শেষ হয়ে গিয়েছে। কেননা মহানবী (সা) তো কথা বলেছেন এ কথা মনে করেই যে, তিনি চার রাক'আত পড়েছেন। আর চার রাক'আত পড়া দ্বারা নামায সমাপ্ত হয়। যদিও বাস্তব অবস্থা তা ছিল না। এদিকে হযরত যুল-ইয়াদাইন (রা) নিজেও ভাবছিলেন যে, নামাযের রাক'আত সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানোর সুযোগ তো আছে। হয়ত এমন কিছু ঘটে গিয়েছে বলে নবীজী (সা) নামায হ্রাস

২২. ইমাম তিরমিযী, আল জামি', রিয়াদ, দারুস সালাম লিন নাশর ওয়াত তাওযী, এপ্রিল ১৯৯৯, হাদীস নং-৩৯৯, পৃ. ১০৭; আরো দেখুন ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৭১৪, ১২২৮, ৭২৫০; ইমাম আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১০০৯; ইমাম নাসায়ী।

২৩. এ প্রসঙ্গে আরো এক খানা হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করেন। তা হল ঃ
رفع عن امتى الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه ، وايضًا لان كلام الفاسى لمنزلة سلام الناسى وذلك لايوجب فساد الصلوة ، كما فى البدائع ، ج ١ ، ص : ٥٣٨

www.pathagar.com

করেছেন। যদিও তার জানা নেই। কাজেই তিনি বিষয়টি স্পষ্টভাবে জেনে নেওয়ার জন্য প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। মোটকথা, বুঝা যায় যে, নামায সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে জ্ঞান করে কথাবার্তা বলা হলে সেটি নামায ভঙ্গকারী হবে না।[২৪]

হানাফী ফকীহগণ বলেন, হযরত যুল-ইয়াদাইন (রা) বর্ণিত হাদীসখানা হল পূর্বেকার ঘটনা। তখনকার দিনে নামাযে কথাবার্তা বলার অনুমতি ছিল। তাই নবীজী (সা) নামাযকে বাতিল ঘোষণা দেননি। বরং অবশিষ্ট দুই রাক'আত সংযুক্ত করে দিয়েছেন। পরবর্তী কালে নামাযে কথা বলার অনুমতি রহিত করে দেওয়া হলে যুল-ইয়াদাইন (রা) বর্ণিত হাদীসের হুকুম রহিত হয়ে যায়। এই নসখের দলীল হল পূর্বে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর হাদীস।[২৫] কেননা সেখানে স্পষ্ট বর্ণিত আছে যে, কথা বলার বিষয়টিতে আগে অনুমতি ছিল। বর্তমানে নতুন হুকুম হিসাবে বিধান হল নামাযে কথা না বলা। শাফিঈ ফকীহগণ বলেন, হযরত যুল-ইয়াদাইন (রা)-এর এই ঘটনা ছিল নামাযে কথা বলার অনুমতি রহিত হওয়ার পরবর্তী সময়ের ঘটনা। কাজেই এ ঘটনাকে হযরত ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত ঘটনার দ্বারা মানসূখ বলা যায় না। কেননা যুল-ইয়াদাইন (রা)-এর ঘটনা ঘটে ছিল মদীনায় হিজরতের পরে। আর ইবন মাসউদ (রা)-এর ঘটনা ঘটে ছিল মক্কায়, তিনি যখন প্রথমবার হাবশা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে ছিলেন। অতএব পূর্ববর্তী ঘটনাকে পরবর্তী ঘটনার জন্য নাসিখ সাব্যস্ত করা যায় না।[২৬]

হানাফী ফকীহগণ বলেন, নামাযে কথা বলার অনুমতি রহিত হওয়ার ঘটনা হিজরতের পূর্বে ঘটেছে এমন দাবী আদৌ ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে এ নসখ সম্পাদিত হয় হিজরতের পর মদীনায় ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের কিছু আগে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর হিজরত প্রসঙ্গে যতটুকু জানা যায় তা হল, তিন হাবশা দেশের উদ্দেশ্যে দুইবার হিজরত করেছিলেন। প্রথম বার হিজরত করে সেখানে চলে গেলে কিছু দিন পর তার কানে (উড়ো খবর) পৌঁছল যে, কুরাইশের সকলে সদলবলে মুসলমান হয়ে গিয়েছে। এতে তিনি খুব খুশী হন। ভাবলেন, তাহলে মক্কায় তো মুসলমানদের জন্য আর কোন সমস্যাই থাকবে না। আমাকে ফিরে যাওয়া উচিৎ । অতএব তিনি সেখান থেকে নববী পঞ্চম সনের রামাযান মাসে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু মক্কায় পৌছে দেখলেন সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি দুঃখিত হন এবং পুনরায় অন্যান্য মুসলমানদের সাথে হাবশার উদ্দেশ্যে হিজরত করে যান। এই দ্বিতীয় বারের হিজরতের পর তাঁর প্রত্যাবার্তন ঘটে হিজরী দ্বিতীয় সনে,[২৭] ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের প্রককালে। শাফিঈ আলিমগণের মধ্যে হাফিয ইবন হাজার আসকালানী, আল্লামা ইবনুল আসীরসহ বহু

---

২৪. মাওলানা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

২৫. দ্র. ইমাম নাসায়ী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১২২২, পৃ. ১৭০।
قال العلامة لكل ساني حديث ذى اليدين محمول على الحالة التى كان يباح فيها التكلم فى الصلوة وهى ابتداء الاسلام بدليل ان ذا اليدين وابا بكر وعمر تكلموا فى الصلوة عامدين ، ولم يأ رهم بالاستقبال مع ان الكلام العمد مفسد للصلوة بالاجماع ، والرفع المذكور فى الحديث (رفع عن امتى الخ) محمول على رفع اتم والعقاب ، كما فى البدائع ، ج ١ ، ص ٥٢٨

২৬. মাওলানা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

২৭. كما صرح به موسى بن عقبه فى معاز يه ومعاز يه اصح المغازى عند اهل الحديث প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

বিশেষজ্ঞ উলামা ও মুহাদ্দিসীনে কিরাম স্বীকার করেছেন যে, হযরত ইবন মাসঊদ (রা)-এর প্রত্যাবর্তন হিজরী দ্বিতীয় সনে ঘটেছিল।[২৮] কাজেই হযরত ইবন মাসঊদ (রা)-এর এ ঘটনা মাদানী যুগের ঘটনা হিসাবে এটিকে নাসিখ আর হযরত যুল-ইয়াদাইন (রা)-এর ঘটনাকে মানসূখ মানতে কোন সমস্যা থাকে না।

তা ছাড়া নামাযে কথাবার্তা বলা মানসূখ হওয়ার বিষয়টি হিজরতের অব্যবহিত পরেই মদীনায় সম্পাদিত হওয়ার একটি সমর্থন হযরত মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম আস সুলামী (রা)-এর হাদীস থেকেও পাওয়া যায়। কেননা হযরত মু'আবিয়া আস সুলামীর ঘটনা (হাঁচির উত্তর দান ও লোকজনের তাঁর দিকে তাকান) মদীনাতেই ঘটে ছিল। কেননা তিনি নিজে ছিলেন আনসারী সাহাবী। তিনি হিজরতের পর মুসলমান হন। কাজেই ঘটনাটি হিজরতের পরে হওয়াই স্পষ্ট বুঝা যায়।

সবচেয়ে বড় কথা হল, আলিমগণের সকলে এ মর্মে একমত যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর বাণী وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ পবিত্র মদীনায় নাযিল হয়েছে। যেমন 'আল খাসাইসুল কুবরা' গ্রন্থে আল্লামা সুয়ূতী (র) সুনানে সাঈদ ইবন মানসূরের বরাত দিয়ে মুহাম্মদ ইবন কা'ব কুরাযীর কথা উদ্ধৃত করে বলেন,

قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ الْمَدِيْنَةَ وَالنَّاسُ يَتَكَلَّمُوْنَ فِى الصَّلٰوةِ فِىْ حَوَائِجِهِمْ كَمَا يَتَكَلَّمُ اَهْلُ الْكِتَابِ فِىْ الصَّلٰوةِ فِى حَوَائِجِهِمْ حَتّٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ .

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় হিজরত করে আসলেন তখনো লোকেরা নামাযের ভিতর নিজেদের প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলত যেভাবে আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদ ও নাসারাগণ নিজেদের নামাযের ভিতর কথাবার্তা বলে থাকে। অবশেষে নাযিল হল, নিম্নোক্ত আয়াত وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ এই উদ্ধৃতির মধ্যে স্পষ্টই পাওয়া যাচ্ছে যে, কালাম মানসূখ হওয়ার বিষয়টি মদীনাতেই সংঘটিত হয়েছে।[২৯]

শাফিঈ উলামায়ে কিরাম বলেন, নামাযে কথাবার্তা মানসূখ হওয়ার সময়কাল হিজরতের পর বদর যুদ্ধের প্রক্কালে মদীনায় মেনে নিলেও এ কথা বলতে কোন আপত্তি নেই যে, যুল-ইয়াদাইন (রা)-এর ঘটনা হল আরো পরের। বদর যুদ্ধ হয়েছে হিজরী দ্বিতীয় সালে। আর যুল-ইয়াদাইন (রা)-এর ঘটনা ঘটেছে হিজরী সপ্তম সালের পরে। কাজেই দ্বিতীয় সালের কোন ঘটনা সপ্তম সালের পরে সংঘটিত ঘটনাকে কিভাবে মানসূখ করবে? তারা দলীল দিয়ে বলেন যে, যুল-ইয়াদাইন (রা)-এর হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী হলেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা)। তিনি নিজ বর্ণনার কোথাও কোথাও বাক্য এরূপ ব্যবহার করেছেন যে, صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

---

২৮. হাফিয ইবন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, খ. ২, পৃ. ৬০ ; ইবন কাসীর, আত তারীখ, খ. ৩, পৃ. ৬৯ ; ইউসুফ বিন্নৌরী, মা'আরিফুস সুনান, খ. ৩, পৃ. ৫১০-৫১১।

২৯. আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী, মা'আরিফুস সুনান, খ. ৩, পৃ. ৫০৯।

www.pathagar.com

(রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নামায পড়াচ্ছিলেন)[৩০] আবার কোথাও আছে صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ (মহানবী (সা) আমাদের নিয়ে নামায পড়িয়েছিলেন)[৩১] কোথাও বলেছেন بَيْنَا اَنَا اُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ (একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে নামায পড়ছিলাম)।[৩২] এ সকল বাক্য নির্দেশ করছে যে, যুল-ইয়াদাইন (রা)-এর ঘটনায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা) স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। আর এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হিজরী সপ্তম সালে মুসলমান হন। কাজেই এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, যুল-ইয়াদাইন (রা)-এর ঘটনা নিশ্চয় এই সপ্তম সাল কিংবা আরো পরবর্তী কোন সময়ের ঘটনা হবে।

এ দলীলের জবাবে হানাফী উলামায়ে কিরামে বলেন, কোন সন্দেহ নেই যে, সাহাবী হযরত যুল-ইয়াদাইন (রা)-এর ঘটনা হল হিজরী দ্বিতীয় সালের পূর্ববর্তী কোন ঘটনা। এ মর্মে হানাফীগণের দলীল হল যে, হযরত যুল-ইয়াদাইন (রা) ছিলেন অন্যতম বদরী সাহাবী। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বদর যুদ্ধেই তিনি শাহাদত লাভ করেন। যেই সাহাবী হিজরী দ্বিতীয় সালে শহীদ হয়ে যান তার ঘটনা হিজরী সপ্তম সালের পরে সংঘটিত হওয়ার কথা বলা অহেতুক বাক্যব্যয় মাত্র। কাজেই এ কথা বলাই শুদ্ধ যে, ঘটনাটি ঘটেছে বদর যুদ্ধের পূর্ববর্তী কোন এক সময়ে মদীনায় এবং তা মানসূখ হয়ে যায়।

হযরত ইমাম শাফিঈ (রা) 'কিতাবুল উম্ম' গ্রন্থে এ প্রশ্নের একটি জবাবে বলেন, বস্তুত এখানে ব্যক্তি হলেন দুই জন। একজন হলেন যুল-ইয়াদাইন যার মূল নাম ছিল খিরবাক ইবন আমর। ইনি ছিলেন, বানূ সুলাইম গোত্রের লোক। আর অপর জন হলেন যুশ-শিমালাইন যার মূল নাম ছিল উবায়দ ইবন আমর। ইতি ছিলেন বানূ খুযা'আর সদস্য। হাদীসে নামাযে ভিতর কথা বলার কাহিনীটি ছিল হযরত যুল-ইয়াদাইন (রা)-এর পক্ষান্তরে বদর যুদ্ধে যিনি শহীদ হন। তিনি ছিলেন হযরত যুশ-শিমালাইন। লোকেরা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেনি বিধায় দুই ব্যক্তিকে এক ব্যক্তি জ্ঞান করে ফেলেছে। ফলে রিওয়ায়াতের মধ্যে সাযূজ্য বিধান জটিল হয়ে গিয়েছে। শাফিঈ উলামায়ে কিরাম এ মর্মে ইতিহাস গ্রন্থের কিছু উদ্ধৃতি দলীল হিসাবে দেখিয়ে থাকেন।[৩৩]

এ সবের জবাবে হানাফী ফকীহগণ বলেন, ইতিহাস গ্রন্থাবলী থেকে লওয়া উদ্ধৃতির সনদগত কোন মূল্য নেই। পক্ষান্তরে সুনানে নাসায়ী গ্রন্থের সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যে, যিনি হযরত যুল-ইয়াদাইন (রা) তিনিই হযরত যুশ-শিমালাইন। নাম দু'টি, কিন্তু ব্যক্তি একজনই। ঘটনা হল, এই সাহাবীর প্রকৃত নাম হল উবায়দ ইবন আমর। জাহেলী যুগে তাঁর উপাধি ছিল 'খিরাক'। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি যুল-ইয়াদাইন বা যুশ-শিমালাইন উপাধিতে ভূষিত হন। আর বানূ সুলাইম বস্তুত বানূ খুযা'আরই অন্তর্ভুক্ত একটি শাখা গোত্র। কাজেই রিজাল

৩০. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১২৯০, পৃ. ২৩৩।

৩১. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১২৮৮।

৩২. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১২৯২।

৩৩. বিস্তারিত লিখেছেন আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী। দ্র. মা'আরিফুস সুনান, খ ৩, পৃ. ৫২২।

www.pathagar.com

গ্রন্থে তার পরিচয় উভয় গোত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট করে পেশ করা হয়েছে।[৩৪] এই সাহাবীর হস্তদ্বয় সাধারণ মানুষের হস্তদ্বয় অপেক্ষ তুলনামূলক কিছুটা লম্বা ছিল। এই সূত্রে ইসলামের প্রাথমিক সময়ে তিনি লোকমুখে যুশ-শিমালাইন নামে পরিচিত হন। শিমাল শব্দটি খুব পছন্দনীয় নয়। বিধায় শব্দটির প্রয়োগ মহানবী (সা)-এর কানে পৌঁছলে তিনি তা পরিবর্তিত করে দেন এবং তাকে যুল-ইয়াদাইন বলে ডাকেন। এখানে দু'টি উপাধ যে একই ব্যক্তির তা সুনানে নাসায়ীর বর্ণনা থেকে স্পষ্ট ফুটে উঠছে। কেননা এখানে উপাধিদ্বয়কে একই সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া মূল নাম ইবন আমর বলেও উল্লেখ রয়েছে।

বর্ণনাটি নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ اَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ وَانْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ ذُوْ الشِّمَلَيْنِ بْنُ عَمْرٍو اَنْقَصَتِ الصَّلٰوةُ اَمْ نَسِيْتَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا يَقُوْلُ ذُوْا الْيَدَيْنِ فَقَالُوْا صَدَقَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ فَاَتَمَّ بِهِمْ الرَّكْعَتَيْنِ الَّتَيْنِ نَقَصَ ، رواه الامام النسائى تحت باب ما يفعل من مسلم من ركعتين . ناسئا وتكلم رقمه : ١٢٣١ ، ص : ١٧١

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুহর কিংবা আসর নামায পড়াচ্ছিলেন। এ সময় তিনি দুই রাক'আত পড়িয়ে নামায শেষ করে দেন। তখন তাঁকে যুশ-শিমালাইন ইবন আমর (রা) বললেন, নামায রাক'আত সংখ্যার দিক থেকে হ্রাস করা হয়েছে, না আপনি ভুলে গিয়েছেন ? মহানবী (সা) বললেন, যুল-ইয়াদাইন কী বলছে ? লোকজন উত্তর দিল, যুল-ইয়াদাইন যা বলেছে সত্য বলেছে হে আল্লাহ্র নবী ! তখন মহানবী সকলকে নিয়ে ছুটে যাওয়া অবশিষ্ট দুই রাক'আত পূর্ণ করে নেন।[৩৫]

এখানে কোন কোন শাফিঈ আলিম অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন যে, বর্ণনাটি ইমাম যুহরী (র) থেকে এককভাবে বর্ণিত (تفرد)। তাঁর কোন متابعة বা সমর্থক বর্ণনা নেই। বস্তুত এ অভিযোগ সঠিক নয়। কারণ স্বয়ং নাসাঈ গ্রন্থেই ইমাম যুহরী (র) থেকে আরো অনেকেই যে হাদীস খানা বর্ণনা করেছেন তা বিদ্যমান। নাসাঈ গ্রন্থে একই অধ্যায়ে (হাদীস নং ১২২৯) ইমরান ইবন আবু আনাস (র) হাদীসখানা যুহরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সেখানে হাদীসের শুরু দিকে আছে, اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ فِىْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاَدْرَكَهُ ذُوْ الشِّمَالَيْنِ এবং শেষ দিকে আছে, قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصَدَقَ ذُوْ الْيَدَيْنِ তাছাড়া এই হাদীস ইমাম তাহাভী (র) শারহু মা'আনিল আসার গ্রন্থে ইবরাহীম ইবন মুনকিয (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৩৬] ইবরাহীম ইবন মুনকিযের সনদ ; قال حدثنا ادريس عن عبد الله بن عباس عن ابن هرمز عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه তাছাড়া মুসান্নাফে ইবন আবু শায়বা গ্রন্থে এই হাদীস

৩৪. মাওলানা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

৩৫. ইমাম নাসাঈ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১২৩১, পৃ. ১৭১।

৩৬. দ্র. ইমাম তাহাভী ঃ শারহু মা'আনিল আসার, খ ১, পৃ. ২১৫।

www.pathagar.com

হযরত ইকরিমা (রা) সূত্রেও বর্ণিত আছে।[৩৭] যেখানে হাদীসের বাক্য নিম্নরূপ ; اَکَــذَالِكَ يَا ذَا الْيَدَيْنِ وَكَانَ يُسَمَّى ذُوْ الشِّمَالَيْنِ

উল্লেখ্য যে, ইমাম তাহাভী (র) হযরত ইবন উমর (রা)-এর একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন।[৩৮] এ উদ্ধৃতি সামগ্রিক মাস'আলাকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে দেয়। তিনি বলেন, انه ذكر له حديث ذى اليدين فقال كان اسلام أبى هريرة بعد ما قتل ذو اليدين তাহাবী বর্ণিত উপরোক্ত উদ্ধৃতির রাবীগণ সকলেই সিকাহ।[৩৯] কেবল একজন রাবী আবদুল্লাহ্ আল উমারী বিতর্কিত। তাকে কেউ কেউ নির্ভরযোগ্য বলেছেন আবার কেউ কেউ অনির্ভরযোগ্যও বলেছেন। হাফিয যাহাবী (র) 'মীযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তার সম্পর্কে সামগ্রিক পর্যালোচনার পর রায় দিয়েছেন যে, তিনি صـدوق فى حـفظه شئ নির্ভরযোগ্য তবে তার মেধায় কিছু ত্রুটি আছে। উল্লেখ্য হাফিয যাহাবী (রা)-এর এই বাক্য তারই উসূল অনুসারে তাওসীক করাকে নির্দেশ করে। অনুরূপভাবে হাফিয যাহাবী নিজেই আবদুল্লাহ আল-উমারী সম্পর্কে ইমাম দারেমীর উদ্ধৃতি পেশ করে বলেন,[৪০]

قلت لا بن معين كيف حله فى نافع قال صالح تقه ،

ইমাম তাহাভী হাদীসখানা নাফি' সূত্রেই বর্ণনা করেছেন। অতএব এ বর্ণনা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য। এ বর্ণনা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, যুল-ইয়াদাইন আর যুশ-শিমালাইন একই ব্যক্তির দু'টি উপাধি এবং তিনি বদর যুদ্ধে শহীদ হন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) তার ওফাতের অনেক পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

এবার প্রশ্ন থেকে যায় যে, যদি হযরত যুল-ইয়াদাইন বদর যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে সপ্তম হিজরীতে ইসলাম কবুলকারী সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নিজ বর্ণনায় কিভাবে বললেন যে, صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ মহানবী (সা) আমাদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন।---------

এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম তাহাভী (র) বলেন, এখানে صَلَّى بِنَا অর্থ হল صَلَّى بِالْمُسْلِمِيْنَ আমাদেরকে নিয়ে মানে মুসলমানদেরকে নিয়ে মহানবী (সা) নামায পড়ছিলেন। কেননা এমন বহু বর্ণনা হাদীস গ্রন্থে বিদ্যমান যে, বর্ণনাকারী নিজে আদৌ মূল ঘটনায় জড়িত ছিলেন না। অথচ বর্ণনার সময়ে তিনি উত্তম পুরুষ শব্দে অর্থে 'আমরা' শব্দ দিয়ে ঘটনাটির বর্ণনা পেশ করেছেন। সাধারণত কোন দল যদি কারো নিজের দল হয় তাহলে মানুষ সাধারণত সেই দলের কথা কাজ ইত্যাদিকে নিজের কথা কাজ ইত্যাদি হিসাবে বর্ণনা দেয়। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। যেমন হযরত নাযযাল ইব্ন সাব্রা (র) বলেন,

قال لنا رسول الله ﷺ انا واياكم كنا ندعى بنى عبد مناف ٠

---

৩৭. দ্র. মুসান্নাফে ইবন আবু শাইবা, খ ২, পৃ. ৩৭।

৩৮. ইমাম তাহাভী, প্রাগুক্ত, খ ১, পৃ. ২১৮।

৩৯. সনদখানা হল নিম্নরূপ ;
حدثنا بن أبى داؤد قال حدثنا سعيد بن أبى مريم قال اخبرنا الليث بن سعد قال حدثنى عبد الله بن وهب عن عبد الله العمرى عن نافع بن عمر كما فى الطحاوى ج ١ ، ص : ٢١٨

৪০. দ্র. আত তালীকুল হাসান আলা আসারিস সুনান, পৃ. ১৪৩।

www.pathagar.com

অথচ হযরত নাযযাল ইবন সাবরা (র) কখনো মহানবী (সা)-কে দেখেননি। কাজেই তিনি যে বলেছেন قال لنا -এর অর্থ হল قال لقومنا। অনুরূপভাবে হযরত তাউস (র) বলেন, قدم علينا معاذ بن جبل فلم ياخذ من الخضروات شيئًا অথচ যে সময় হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা) গভর্নর নিযুক্ত হয়ে ইয়ামান দেশে গমন করেন সে সময়ে হযরত তাউসের জন্মও হয়নি। কাজেই তার বক্তব্য قدم علينا দ্বারা নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্য হল قدم على قومنا । অনুরূপভাবে হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, خطبنا عتبة بن غزوان অথচ যে সময়ে উতবা ইবন গাযওয়ান বসরায় বক্তব্য দেন সে সময় সেখানে হযরত হাসান বাসরী (র) উপস্থিত ছিলেন না। তাহলে নিশ্চয় তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল, خَطَبَ اَهْلَ الْبَصْرَةِ তিনি বসরাবাসীর কাছে বক্তব্য দেন।[৪১] অনুরূপ-ভাবে ইমাম আবূ দাউদ (র) কর্তৃক বর্ণিত একখানা হাদীস লক্ষণীয়। হাদীস খানায় ইয়াহূদীদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কারের বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এ ঘটনার বহু পরে মদীনা আসেন এবং মুসলমান হন।

অথচ হাদীসে তিনি বলছেন :

بَيْنَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ اِذْ خَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ انْطَلِقُوْا اِلٰى يَهُوْدَ فَخَرَجْنَا مَعَه حَتّٰى جِئْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَادَهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا الخ ،

رواه أبو داؤد تحت باب كيف كان أخراج اليهود من المدينة رقمه : ٣٠٠٣ ، ص : ٤٣٩

একদা আমরা মসজিদে নববীতে ছিলাম। এমন সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের দিকে এসে বললেন, চল ইয়াহূদীদের এলাকায় যাবো। আমরা তাঁর সাথে বেরিয়ে পড়ি এবং ইয়াহূদীদের এলাকায় পৌঁছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন দাঁড়িয়ে তাদের ডাক দিয়ে বললেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়। তোমরা ইসলাম কবূল কর তাহলে নিরাপদে থাকতে পারবে . . . . . ।[৪২]

উল্লেখ্য যে, এ বর্ণনা থেকে বাহ্যিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। আসলে তা নয়। তিনি এখানে আমরা বলে মুসলমানদের জামা'আতকে বুঝিয়েছেন মাত্র। নতুবা ইয়াহূদী তথা বানূ কুরায়যাকে মদীনা থেকে বহিষ্কারের অনেক দিন পরে তিনি মুসলমান হন। হাদীসে যুল-ইয়াদাইন (রা)-এর বর্ণনায় এরূপই ঘটেছিল। নতুবা স্বয়ং আবূ হুরায়রা (রা) যুল-ইয়াদাইন (রা)-এর ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন না।[৪৩]

---

৪১. উপরোক্ত তুলনাগুলো ইমাম তাহাভী (র)-এর শারহু মা'আনিল আসার থেকে গৃহীত। বিস্তারিত দেখুন শারহু মা'আনিল আসার, খ ১, পৃ. ২১৮।

৪২. ইমাম আবূ দাউদ; প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩০০৩, পৃ. ৪৩৯।

৪৩. আল্লামা ইউসুফ বিন্নোরী ঃ মা'আরিফুস সুনান গ্রন্থে এ ধরনের আরো বহু উদাহরণ পেশ করেছেন যেখানে রাবী জমা মুতাকাল্লিম শব্দ ব্যবহার করেছেন অথচ মুতাকাল্লিম নিজে সেই জমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। দ্র. মা'আরিফুস সুনান, খ ৩, পৃ. ৫১২-৫১৬।

www.pathagar.com

তারপর অবশিষ্ট থাকে শুধু একটি বর্ণনা যেখানে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর جمع متكل ব্যবহার না করে واحد متكلم এর ব্যবহার করেছেন। যেমন সহীহ মুসলিম গ্রন্থের বর্ণনায় আছে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, بَيْنَا اَنَا اُصَلِّيْ مَعَ رَسُــوْلِ اللهِ ﷺ (একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে নামায পড়ছিলাম) এখানে শব্দটি উত্তম পুরুষ একবচনে (আমি), তাই এ শব্দ দ্বারা মুসলমানদের জামা'আত অর্থ নেওয়া কঠিন।

এ প্রশ্নের সমাধানে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, ওয়াহিদ মুতাকাল্লিম শব্দটি শুধু একজন রাবী অর্থাৎ শায়বান থেকে বর্ণিত। এটি তার تفرد (একক বিষয়)। তিনি ব্যতিরেকে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর অপর কোন শাগিরদ بَيْنَا اَنَا اُصَلِّي বর্ণনা করেননি। বর্ণনাটিকে অন্যান্য বর্ণনার সাথে মিলিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এ বর্ণনাটিও মূলত ছিল اُصَلِّيْ بِنَا। অর্থাৎ আবূ হুরায়রা মুসলমানদের জামা'আত উদ্দেশ্য করে জমা মতাকাল্লিমই ব্যবহার করে ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে বর্ণনাটি রাবীদের কাছে روايت بالمعنى হিসাবে শব্দগত পরিবর্তনের মধ্যে পড়ে যায়। ফলে কেউ শব্দটি জমা মুত্তাকাল্লিম থেকে ওয়াহিদ মুতাকাল্লিমে বদলিয়ে ফেলে। হাদীস ভুবনে روايت بالمعنى -এর কারণে এ ধরনের পরিবর্তন ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। যেমন মুস্তাদরাকে হাকিম গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকেই বর্ণিত একখানা হাদীসে আছে, دَخَلْتُ عَلٰى رُقَيَّةَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ (আমি মহানবী (সা)-এর কন্যা রুকাইয়া (রা)-এর কাছে গেলাম)[৪৪] অথচ হযরত রুকাইয়া (রা) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ৫ বছর পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। কাজেই হযরত আবূ হুরায়রা (রা) তার কাছে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। কাজেই এখানে دَخَلْتُ শব্দটি دَخَلْنَا অর্থে এবং دَخَلْنَا-কে دَخَلَ الْمُسْلِمُوْنَ অর্থে ব্যবহার করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। ঠিক একই ব্যাখ্যা بينا انا اصلى -এর ক্ষেত্রেও করা ব্যতিরেকে গত্যন্তর নেই। কেননা এই একটি ওয়াহিদ মুতাকাল্লিম শব্দ সেসব নিশ্চিত দলীলগুলোকে রদ করতে সক্ষম নয় যেগুলো প্রমাণ করছে যে, যুল-ইয়াদাইন (রা)-এর ঘটনা হিজরী দ্বিতীয় সালে ঘটেছিল।[৪৫]

আল্লামা কাশ্মীরী (র) আরো বলেন, এ সম্পর্কে আরো অনেক দলীল বিদ্যমান রয়েছে যেগুলো একমাত্র নির্দেশ করে যে, হযরত যুল-ইয়াদাইন (রা)-এর ঘটনা দ্বিতীয় হিজরী সালের অনেক আগেই ঘটেছিল। উদারহণ স্বরূপ সিহাহ গ্রন্থে[৪৬] আছে, মহানবী (সা) দুই রাক'আতের পর সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করে; فَقَامَ اِلٰى خَشَبَةٍ مَعْرُوْضَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَاَنَّهُ غَضْبَانُ মুসনাদে আহমদের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, خشبة معروضة হল উস্তয়ানায়ে হান্নানা।[৪৭] এদিকে উস্তয়ানায়ে হান্নানা সম্পর্কে বলা আছে যে, এটি মসজিদ নববীর মিম্বর নির্মিত হওয়ার

৪৪. আল্লামা ইউসুফ বিন্নোরী, প্রাগুক্ত, খ ৩, পৃ. ৫১৭। মুসতাদরাকে হাকিম, খ ৪, পৃ. ৪৮।

৪৫. মাওলানা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

৪৬. যেমন সহীহায়নের মধ্যে আছে ثم اتى جذعًا في قبلة المسجد فاستند اليها مغضبًا দ্র. সহীহ বুখারী, বাবু তাশবীকিল আসাবি ফীল মাসজিদ ; সহীহ মুসলিম, বাবুস সাহব ফিস সালাত ওয়াস সুজূদ।

৪৭. দ্র. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল ঃ আল মুসনাদ; খ ২, পৃ. ২৪৮।

www.pathagar.com

পূর্বে ছিল। মিম্বর নির্মিত হওয়ার পর এটিকে দাফন করে দেওয়া হয়।[৪৮] আর মিম্বর নির্মিত হয় দ্বিতীয় হিজরীর পূর্বে। কেননা বহু রিওয়ায়াতের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত যে, মহানবী (সা) কিবলা পরিবর্তনের যে ঘোষণা প্রদান করেন সেটি ঘোষণা করেছিলেন মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে।[৪৯] কিবলা পরিবর্তনের হুকম সর্বসম্মতিক্রমে ঘটে ছিল হিজরী দ্বিতীয় সনে।[৫০] অতএব বুঝা যায় যে, যুল-ইয়াদাইন (রা)-এর ঘটনা অবশ্যই হিজরী দ্বিতীয় সনের পূর্বেকার কোন ঘটনা যা পরবর্তী কালে আয়াত নাযিল হওয়ার দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে।

ইমামত্রয়ের দলীল হাদীসে যুল-ইয়াদাইনের জবাব হানাফী ফকীহগণ এভাবেও দিয়ে থাকেন যে, যুল-ইয়াদাইন (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি জটিল পর্যায়ের একটি মুযতারাব (مضطرب) হাদীস। এ হাদীস থেকে ইযতিরাব (اضطراب) দূর করে হাদীসটিকে সুনিস্তিত অবস্থানে আনা যায় না বলে এ দ্বারা কোন ধরনের দলীল পেশ করা নীতিগতভাবে অসম্ভব। কাজেই অন্যান্য আয়াত ও সুনিশ্চিত অবস্থানযুক্ত সহীহ্ হাদীসের বিপরীতে এটিকে দলীল হিসাবে পেশ করা যায় না।

হাদীসখানার উপরোক্ত ইযতিরাব পাওয়া যায় মতনের মধ্যে। প্রায় বার ধরনের ইখতিলাফ এই মতনের মধ্যে বিদ্যমান। যেমন কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, এটি যুহর নামাযের ফরযের ঘটনা।[৫১] আবার কোন কোন বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, এটি আসর[৫২] নামাযের ফরযে ঘটনা। আবার কোন বর্ণনায় দুই নামাযকে মিলিয়ে বলা হয়েছে فِىْ اِحْدَى صَلٰوتَىْ الْعَشَاءِ অর্থাৎ বৈকালীন[৫৩] দুই নামাযের কোন একটিতে। কোন কোন বর্ণনায় সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, নামায কোনটি ছিল আমি ভুলে গিয়েছি।[৫৪] কোথাও আছে রাবী মুহাম্মদ ইবন সীরীন (রা) বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হাদীসখানা বর্ণনা করার সময় নামাযটি হযরত আবূ হুরায়রা (র) নির্দিষ্ট করেই বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ মুহূর্তে আমি তা ভুলে গিয়েছি।[৫৫]

তাছাড়া রাক'আত নির্ধারণেও ইযতিরাব বিদ্যমান। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত দু'টি হাদীসের বক্তব্য এরূপ যে, মহানবী (সা) দুই রাক'আতের মাথায় সালাম ফিরিয়ে দেন।[৫৬] অথচ হযরত ইমরান ইবন হুসাইনের বর্ণনায় আছে যে, মহানবী (সা) তিন রাক'আতের মাথায় সালাম ফিরিয়েছেন।[৫৭]

---

৪৮. দ্র. মুসনাদে দারেমী 'হাদীসু আবী সাঈদ, খ ৬, পৃ. ৪৪৩; মা'আরিফুস সুনান, খ ৩, পৃ. ৫২৯।

৪৯. মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ ২, পৃ. ১২-১৩।

৫০. প্রাগুক্ত, খ ২, পৃ. ১২।

৫১. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১২৯১, পৃ. ২৩৩।

৫২. প্রাগুক্ত, হাদীস নং - ১২৯০।

৫৩. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১২৮৮।

৫৪. মাওলানা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।

৫৫. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং -৪৮২, পৃ. ৮৩।

৫৬. ইমাম তিরমিযী, আল জামি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৯৯, পৃ. ১০৭।

৫৭. ইমাম মুসলিম, আস সহীহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং -১২৯৩।

www.pathagar.com

অনুরূপ মহানবী (সা) সালাম ফিরানোর পর কতটুকু দূর পর্যন্ত চলে গিয়ে ছিলেন তাতেও ইযতিরাব বিদ্যমান। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে,

ثُمَّ قَامَ اِلَى خَشَبَةٍ فِىْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا .

এ থেকে বুঝা যায় যে, মহানবী (সা) নামায থেকে সালাম ফিরানোর পর মসজিদের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। তবে মসজিদ থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে যাননি।[৫৮] পক্ষান্তরে হযরত ইমরান ইবন হুসাইন (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, মহানবী মসজিদ থেকে বের হয়ে রীতিমত গৃহের অভ্যন্তরে চলে গিয়ে ছিলেন।[৫৯]

আরো ইযতিরাব হল যে, ফিরে এসে অবশিষ্ট নামায যুক্ত করে দেওয়ার পর নামায শেষে মহানবী (সা) সাহু সিজ্‌দা করে ছিলেন কি না? সেটিও কোন কোন বর্ণনা বুঝায় যে, সাহূ সিজ্‌দা করে ছিলেন।[৬০] আবার কোন কোন বর্ণনা নিদেশ করে যে, তিনি সাহূ সিজ্‌দা করেননি।[৬১]

মুহাদ্দিসগণ উপরোক্ত ইযতিরাবগুলো দূর করে হাদীসখানাকে একটি সুনিশ্চিত অবস্থানে আনার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আনা সম্ভব হয়নি বলে তাঁরা এটিকে 'জটিল মুযতারাবুল মতন' বলে অভিহিত করেছেন। কাজেই হাদীসটির দ্বারা ইসতিদলাল সঠিক নয়।

তাছাড়া হাদীসে যুল-ইয়াদাইন সম্পর্কে আরেকটি জিনিস লক্ষণীয় যে, হাদীসখানার সকল جزء (অংশ)-এর উপর কোন ফকীহই আমল করেন না। এমন কি যে সব ফকীহ এ হাদীসকে দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন তাঁরাও হাদীসে বর্ণিত সকল কিছুকে মানেন না। উদাহরণ স্বরূপ শাফিঈ উলামায়ে কিরামের কথা বলা যায়। কেননা শাওয়াফিঈ-এর মতানুসারে কালাম ফিস সালাত অর্থাৎ নামাযের মধ্যে কথা বলার ব্যাপারটি যদি ভুলক্রমে কিংবা মাস'আলা না জেনে ঘটে থাকল তাহলে তো নামায নষ্ট না হওয়ার কথা। অথচ এই হাদীসে বর্ণিত ঘটনায় মহানবী (সা), সাহাবীগণ বিশেষত হযরত যুল-ইয়াদাইন যা উচ্চারণ করেছেন তা ভুল-ক্রমে ঘটেছিল এমন কথা মোটেই বলা যাচ্ছে না।[৬২]

অনুরূপ হাদীসের মধ্যে বর্ণিত কাজ তথা দুই রাক'আতের মাথায় মহানবী (সা) মসজিদের শেষ প্রান্তে হোক কিংবা গৃহ পর্যন্ত যাওয়া আবার ফিরে আসা এদিক সালাম ফিরানোর পর ত্বরাকারী মুসল্লীদের অনেকে মসজিদের বাইরে চলে যাওয়া আবার সংবাদ শুনে ফিরে আসা ইত্যাদি অনেক কাজ হওয়ার প্রমাণ বিদ্যমান। এ কাজগুলোর প্রত্যেকটিই 'আমলে কাসীর' (عمل كثير) যাওয়া ও ফিরে আসার মধ্যে নিজের সীনাসহ কিবলা মুখীতা আদৌ রক্ষিত হয় না। আমলে কাসীর শাফিঈ উলামায়ে, কিরামের মতেও নামায ভঙ্গকারী। অতএব শাফিঈ উলামায়ে

---

৫৮. সহীহ বুখারী , প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৮২।

৫৯. সহীহ মুসলিম প্রাগুক্তা, হাদীস নং-১২৯৪।

৬০. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণিত হাদীস সমূহ দ্র.

৬১. كما فى حديث أبى داؤد فركع ركعتين اخرين ثم انصرف ولم يسجد سجدتى السهوء وفى حديث النسائى عن ابى هريرة انه قال لم يسجد رسول الله ﷺ يومئذٍ قبل السلام ولا بعده،

৬২. মাওলানা তাকী উসমানী, প্রাগুক্তা, পৃ. ১৬২।

www.pathagar.com

কিরাম যদি হাদীসখানার সর্বাংশে আমল গ্রহণ করতেন তাহলে তাঁরা আমলে কাসীরকে নামায ভঙ্গকারী বলতেন না।[৬৩]

কাজেই আমলে কাসীর প্রসঙ্গে যদি এই হাদীসটি তাদের দৃষ্টিতে আমলযোগ্য বিবেচিত না হয় তাহলে 'কালাম' প্রসঙ্গে এটিকে কেন আমলযোগ্য বিবেচনা করা হবে? তাই উপসংহারে বলা যায় যে, হযরত যুল-ইয়াদাইন (রা) সম্পর্কে বর্ণিত এই হাদীস একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। এটা কোন মৌল বিধান নির্দেশ করে না। তাই এটি মানসূখ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান। তাছাড়া এর মতনের মধ্যেও বহু ইখতিলাফ ও ইযতিরাব বিদ্যমান এবং বিভিন্ন অংশের উপর আমল পরিত্যাজ্য হওয়ার ইজ্মা পাওয়া যাচ্ছে। এমতবস্থায় এই দুর্বল জিনিসটির উপর কোন ফিকহী আইনের ভিত রচনা যায় না। এসব কারণেই হানাফী ফকীহগণ বিচ্ছিন্ন ঘটনার দিকে না গিয়ে সরাসরি আয়াত যা নির্দেশ করছে এবং এমন হাদীস যেগুলো বিশুদ্ধ ও কাওলী যা কোন মূলনীতিকে নির্দেশ করছে সেই মোতাবেক আমল করা পছন্দ করেছেন।[৬৪]

ওযরবসত বসে নামায আদায়কারীর পেছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা জায়িয

ফরয ও ওয়াজিব নামায দাঁড়িয়ে আদায় করা ফরয। বসে আদায় করলে তা দুরস্ত হবে না। অবশ্য মাযূর ব্যক্তির জন্য ওযরের কারণে দাঁড়ানোর স্থলে বসে নামায আদায়ের অনুমতি আছে। ইমাম যদি শরী'আত সম্মত কোন ওযরের কারণে বসে নামায পড়েন তাহলে মুক্তাদীরা কীভাবে নামায আদায় করবেন--বসে না দাঁড়িয়ে। এ ক্ষেত্রে ওফাতে নব্বীর পূর্বক্ষণে সাহাবীগণের যে আমল বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তারই অনুসরণে ইমাম বসে নামায আদায় করলেও মুক্তাদীগণ তাঁর পেছনে নামায আদায় করবেন দাঁড়িয়ে। এটিই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। মালিকুল উলামা আল্লামা কাসানী (র) লিখেছেন ঃ

ويجوز اقتداء القائم الذى يركع ويسجد بالقاعد الذى يركع ويسجد استحسانًا .

নামাযে রুকূ ও সিজ্দা দাঁড়িয়ে আদায়কারী ব্যক্তির জন্য রুকূ ও সিজ্দা বসে আদায়কারীর পেছনে ইক্তিদা করা জায়িয আছে। এটি ইসতিহসান দ্বারা-স্বীকৃত।[৬৫]

এক্ষেত্রে ফকীহগণের তিনটি অভিমত পাওয়া যায়।

এক. ইমাম মালিক ইবন আনাস (র)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত হল বসে নামায আদায়কারী ইমামের পেছনে কোন অবস্থাতেই অন্যদের ইক্তিদা করা দুরস্ত নয়। মুক্তাদীরা তার পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়ুক কিংবা বসে পড়ুক সর্বাবস্থায়ই তাদের ইক্তিদা অশুদ্ধ। হ্যাঁ, মুক্তাদীরাও

৬৩. প্রাগুক্ত।

৬৪. প্রাগুক্ত।

৬৫. আল্লামা কাসানী ঃ বাদায়িউস সানায়ি' ফী তারতীবিশ শারাঈ; বাইরূতঃ দারু ইয়াহয়ায়িত তুরাস আল আরাবী, ২০০০, খ. ১, পৃ. ৩৫৫।

www.pathagar.com

যদি ইমামের মত দাঁড়িয়ে নামায আদায়ে মাযূর হয়ে থাকে তাহলে তাদের জন্য ইক্তিদা করা জায়িয আছে। তবে অধিকাংশ মালিকী ফকীহের মতে মাযূর মুক্তাদীর জন্যও মাযূর ইমামের ইক্তিদা করা মাকরূহ। তাদের কোন কোন ফকীহ এ পর্যায়ের ইক্তিদাকে সম্পূর্ণ অশুদ্ধ বলেও অভিমত দিয়েছেন।[৬৬]

নিম্নোক্ত হাদীস থেকে তাদের উপরোক্ত অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায় ঃ

اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لاَ يَؤُمَّنَّ رَجُلٌ بَعْدِىْ جَالِسًا ، كذا فى مصنف عبد الرزاق ج ٢ ، ص : ٤٦٣ ، رقم الحديث ٤٠٨٧ ، ٤٠٨٨ ، باب هل يوم الرجل جالسًا ، وأخرجه الدار قطنى فى سننه ج : ٣ ، ص : ٣٩٨ فى كتاب الصلواة باب صلواة المريض جالسا بالماموين ولفظه لا يومن أحد بعدى جالسًا ، قال الدار قطنى لم يرده غير جابر الجعفى عن الشعبى وهو متروك ، واخرجه البيهقى فى سننه ج ٣ ، ص : ٨٠ وضعفه مرسلا من الشعبى ، وقال عبد الحق فى أحكامه ، ورواه عن الجعفى مجالد وهو أيضا ضعيف وقال البيهقى فى كتابه المعرفة ، الحديث مرسل لا تقوم به حجة وفيه حابر الجعفى وهو متروك فى روايته و مذموم فى رائه ، انظر نصب الراية ج ٨ ، ص : ٤٩-٥٠.

মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, আমার পরে কোন ব্যক্তি বসে নামায পড়া অবস্থায় কারো ইমামত করবে না।[৬৭]

এ হাদীসে নির্দেশ করছে যে, বসে নামায পড়া অবস্থায় কারো ইমামত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। হাদীস আরো প্রমাণ করছে যে, মহানবী (সা) নিজে বসে নামায পড়া অবস্থায় যে ইমামত করেছিলেন সেটি তাঁর জন্যই খাস ছিল। তাই বর্তমানে কারো পক্ষে বসে নামায পড়া অবস্থায় ইমামত করারই সুযোগ নেই।

জমহূর ফকীহগণ বলেন, মালিকীগণের পেশকৃত হাদীসখানার সনদ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সনদটি জাবির জু'ফীর উপর নির্ভরশীল। আর জাবির জু'ফী আইম্মায়ে হাদীসের দৃষ্টিতে অত্যন্ত দুর্বল পর্যায়ের ব্যক্তি। ইমাম দারা কুতনী (র) স্পষ্ট লিখেছেন যে, জাবির জু'ফীর বর্ণিত এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করার কোন সুযোগ নেই।[৬৮]

---

৬৬. মাওলানা তাকী উসমানী, দরসে তিরামিযী, করাচী ঃ মাকতাবা দারুল উলূম, নভে ঃ ১৯৮৭, খ. ২, পৃ. ১৩২।

৬৭. আবদুর রাযযাক ঃ আল মুসান্নাফ, খ. ২, পৃ. ৪৬৩, হাদীস নং ৪০৮৭, ৪০৮৮; দারা কুতনী, খ. ১, পৃ. ৩৯৮; বায়হাকী, খ. ৩, পৃ. ৮০; নসবুর রায়া, খ. ৮, পৃ. ৪৯-৫০।

৬৮. আল্লামা কাসানী ঃ প্রাগুক্ত ; দারা কুতনী, খ. ১, পৃ. ৩৯৮।

www.pathagar.com

দুই. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, আওযাঈ, ইসহাক রাহওয়াই ও আহলে যাহির উলামায়ে কিরামের মতে ইমাম অসুস্থতা কিংবা অন্য কোন ওযরের কারণে যদি বসে নামায পড়েন তাহলে অন্যান্য সুস্থ মুক্তাদীরা তাঁর পেছনে ইক্তিদা করা জায়িয তবে সে ক্ষেত্রে মুক্তাদীরা সুস্থ কিংবা অসুস্থ সকলকে নামায আদায় করতে হবে বসে বসে, দাঁড়িয়ে নয়। তবে আল্লামা হাফিয ইরাকী 'শারহুত তাকরীব' গ্রন্থে এবং আল্লামা ইবন কুদামা 'আল-মুগনী' গ্রন্থে বলেন, ইমাম আহমাদ (র) মুক্তাদীদের এভাবে বসে বসে নামায পড়ার ব্যাপারটি কয়েকটি শর্তের সাথে সংযুক্ত রেখেছেন। এক. ইমাম শুরু থেকেই বসে নামায পড়ছেন। দুই. এই ইমাম নির্ধারিত কোন ইমাম (الامـام الراتب) হবেন। কোন মাযূরকে ইমাম বানিয়ে নিজেরা বসে নামায পড়লে হবে না। তিন. ইমামের সেই ওযর কোন স্থায়ী ওযর না হওয়া।[৬৯] নিম্নোক্ত হাদীসগুলো থেকে ইমাম আহমাদ (র) প্রমুখের উপরোক্ত অভিমত প্রসঙ্গে সমর্থন পাওয়া যায়।

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَقَطَ النَّبِىُّ عَنْ فَرَسٍ فَجُمِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوْدُهُ فَصَلَّيْنَا وَرَائَهُ قُعُوْدًا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةِ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهٖ ، فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا ، وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا صَلّٰى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا اَجْمَعُوْنَ .

رواه الامام مسلم فى صحيحه تحت باب ائتمام المأموم بالامام ، رقم الحديث : ٩٢١، ص : ١٧٩ ، وَاَيْضًا بالرقم ٩٢٣، وفيه فَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا ، وبالرقم ٩٢٦، وفيه فصلّوا بصلوته قِيَامًا ، فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنِ اجْلِسُوْا فَجَلَسُوْا ... وَاِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا وبالرقم ٩٣٠. وفيه فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعُوْنَ .

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী (সা) ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। ফলে তাঁর ডান পাঁজর আহত হয়।[৭০] তাই আমরা নবী (সা)-এর শুশ্রূষার জন্য গেলাম। তখন নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল তিনি আমাদের নিয়ে বসে নামায পড়লেন। আমরাও তাঁর পেছনে বসে নামায পড়লাম। অতঃপর নামায শেষ করে নবী (সা) বললেন, ইমামকে ইমাম নিযুক্ত করা হয় তার অনুসরণ করার জন্যই। অতএব তিনি যখন তাকবীর বলবেন তখন তোমরা তাক্বীর বলবে। তিনি যখন সিজ্‌দায় যাবেন তখন তোমরা সিজ্‌দায় যাবে। তিনি যখন মাথা তুলবেন তোমরাও তুলবে। তিনি যখন বলবেন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

৬৯. মাওলানা তাকী উসমানী ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২।

৭০. এ ঘটনাটি ঘটে ছিল হাফিয ইবন হিব্বানের মতে হিজরী ৫ম সালে। বিস্তারিত দলীলের জন্য দ্র. ফাতহুল বারী, খ. ২, পৃ. ১৪৯; মা'আরিফুস সুনান, খণ্ড ৩, পৃ. ৪১৬।

www.pathagar.com

তখন তোমরা বলবে رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ। আর তিনি যখন বসে নামায পড়বেন তখন তোমরাও সকলে বসে নামায পড়বে।[৭১]

তিন. পক্ষান্তরে ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম সুফিয়ান সাওরী, আবূ সাত্তর ও ইমাম বুখারী (র) সহ জমহূর উলামায়ে কিরাম বলেন, বসে নামায পড়ছেন এমন ইমামের পেছনে ইক্তিদা করলে মাযূর মুক্তাদীরা বসে নামায পড়বে। কিন্তু মুক্তাদীদের যাদের দাঁড়িয়ে নামায পড়তে উযর নেই তারা অবশ্যই দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। তাঁরা বসে ইক্তিদা করলে নামায দুরস্ত হবে না। ইমাম হাযেমী (র) এটি অধিকাংশ ফকীহের অভিমত বলে উল্লেখ করেছেন।[৭২]

উপরোক্ত অভিমতের সমর্থনে জমহুর ফুকাহায়ে কিরাম নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ দলীল হিসাবে পেশ করেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী : وَقُومُوا لله قَانِتِينَ এবং তোমরা দাঁড়াও আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে।[৭৩] এ আয়াতে নামাযের মধ্যে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায পড়াকে মুতলাকভাবে ফরয বলে নির্দেশ করা হয়েছে। আদেশটি এখানে ব্যাপকার্থক। তবে অপর একখানা আয়াত উক্ত হুকুম থেকে মাযূর তথা অপারগদেরকে অব্যাহতি দিয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী : لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا "আল্লাহ কারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত"।[৭৪] কাজেই অবশিষ্ট থাকছে যারা মাযূর নয় তারা। তাই তাদেরকে অবশ্যই দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে হবে। যদিও ইমাম বসে নামায আদায় করছেন। তাছাড়া নবী (সা)-এর হাদীসে রয়েছে যেমন ঃ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ بِيْ النَّاصُوْرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ، أخرجه الامام أبوداؤد تحت باب فى صلواة القاعد ، رقمه ٩٥٣ : ١٤٥

হযরত ইমরান ইবন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমার ফোঁড়া হয়েছিল। আমি মহানবী (সা)-কে সমস্যার কথা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে চেষ্টা কর। যদি না পার তাহলে বসে পড়। আর যদি বসেও পড়তে না পার তাহলে শুয়ে নামায পড়।[৭৫]

এ হাদীস স্পষ্ট নির্দেশ করছে যে, দাঁড়িয়ে নামায পড়া ফরয। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম বিবেচিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে বসে নামায আদায়ের

---

৭১. ইমাম মুসলিম ঃ আস সহীহ, রিয়াদ; দারুস সালাম লিন নাশর ওয়াত তাওযী, মার্চ ১৯৯৯, হাদীস নং ৯১২, পৃ. ১৭৪, আরো দ্র. হাদীস নং-৯২৩, ৯২৬, ৯৩০; ইমাম বুখারী, আস সহীহ, হাদীস নং-৬৮৮, ৬৮৯, পৃ. ১১২-১১৩।

৭২. ইমাম হাযেমী ঃ কিতাবুল ইতিবার ফী বায়ানিন নাসিখ ওয়াল মানসূখ মিনাল আসার, পৃ. ১০৯।

৭৩. আল-কুরআন, সূরা বাকারা ২ ঃ ২৩৮।

৭৪. আল-কুরআন, বাকারা ২ ঃ ২৮৬।

৭৫. ইমাম আবূ দাউদ ঃ আস সুনান, রিয়াদ ঃ দারুস সালাম লিন নাশর ওয়াত তাওযী, এপ্রিল ১৯৯৯, হাদীস নং ৯৫২, পৃ. ১৪৫।

www.pathagar.com

অনুমতি দেওয়া হবে না। ইমাম বসে নামায পড়ার ক্ষেত্রে তিনি নিজে মাযূর বিধায় তার জন্য বসে পড়ার অনুমতি আছে। কিন্তু মুক্তাদীরা মাযূর নয় বিধায় তাদের জন্য সেই অনুমতি নেই। অতএব তাদেরকে নামায আদায় করতে হবে দাঁড়িয়েই।

وَعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَلاَ تُحَدِّثِيْنِىْ عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ بَلٰى ثَقُلَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ ، فَقُلْنَا لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ .... فَاَرْسَلَ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلاً رَفِيْقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَنْتَ اَحَقُّ بِذَالِكَ فَصَلّٰى اَبُوْبَكْرٍ تِلْكَ الاَيَّامَ ، ثُمَّ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَجَدَ فِىْ نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ بِصَلٰوةِ الظُّهْرِ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا رَاٰهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَهَبَ لِيَتَاَخَّرَ ، فَاَوْمَاءَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ بِاَنْ لاَ يَتَاَخَّرَ ، قَالَ اَجْلِسَانِىْ اِلٰى جَنْبِهِ ، فَاَجْلَسَاهُ اِلٰى جَنْبِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ فَجَعَلَ اَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّىْ وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلٰوةِ النَّبِىِّ ﷺ وَالنَّاسُ بِصَلٰوةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَالنَّبِىِّ قَاعِدٌ ، ..... قَالَ اَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِىْ كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لاَ هُوَ عَلِىٌّ ابْنُ اَبِىْ طَالِبٍ ،

أخرجه البخارى تحت باب انما جعل الامام ليؤتم به ، رقم الحديث ٦٨٧، ص ١١٢-١١٣، وايضا برقم ٢٥٨٨، ٤٤٤٢، ٥٧١٤، ومسلم برقم ٤١٧، وأخرجه عبد الرزاق برقم ٩٧٥٤ والعبدى برقم ٢٣٣

হযরত উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উতবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর কাছ গিয়ে বললাম, আপনি কি আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত পূর্ব অসুস্থতা সংক্রান্ত হাদীসটি শুনাবেন না? তিনি বললেন, অবশ্যই শোনাব। (রোগ যন্ত্রণার কারণে) মহানবী (সা)-এর শরীর যখন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল (এবং উঠে গিয়ে তিনি নামাযে শরীক হতে সক্ষম হচ্ছিলেন না) তখন জিজ্ঞাসা করলেন, লোকজন কি নামায পড়ে নিয়েছে? আমরা বললাম, জী না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।-------- তখন নবী (সা) হযরত আবূ বকরের কাছে সংবাদ পাঠান, তিনি যেন লোকজনকে নিয়ে নামায আদায় করে নেন। সংবাদদাতা হযরত আবূ বকরের নিকট এসে বলল, রাসূলুল্লাহ (সা) আপনাকে আদেশ করেছেন যেন আপনি লোকজনকে নিয়ে নামায আদায় করে নেন। হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন কোমল প্রাণের মানুষ। তাই তিনি হযরত উমরকে বললেন, আপনি নামায পড়ান। হযরত উমর (রা) বললেন, এ ব্যাপারে আপনি অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি। অতএব সে দিনগুলোতে আবূ বকর ইমামত করে যান। তারপর নবী (সা) শরীরে কিছু সুস্থতা অনুভব

www.pathagar.com

করলে দুই জনের কাঁধের উপর ভর করে যুহর নামায পড়ার জন্য ঘর থেকে বের হলেন। এ দুইজনের একজন ছিলেন হযরত আব্বাস (রা)। এ সময়ে হযরত আবূ বকর (রা) যথারীতি লোকজনকে নিয়ে নামাযের ইমামত শুরু করে দিয়েছিলেন। নামাযের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) মহানবী (সা)-এর উপস্থিতি টের পেয়ে পেছনের দিকে সরে আসতে চাইলেন। কিন্তু নবী (সা) তাঁর দিকে ইশারা করে বললেন, না, পেছনে যেয়ো না। তারপর বললেন, তোমরা দুইজন আমাকে আবূ বকরের পার্শ্বে বসিয়ে দাও। ফলে তাঁরা উভয়ে নবী (সা)-কে আবূ বকর (রা)-এর পার্শ্বে বসিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, সে মুহূর্ত থেকে আবূ বকর (রা) দাঁড়িয়ে মহানবী (সা)-এর পেছনে ইক্তিদা করলেন আর লোকজন আবূ বকর (রা)-এর পেছনে ইক্তিদা করলেন। অথচ নবী (সা) তখন নামায পড়লেন বসা অবস্থায়।[৭৬] ----------- রাবী বলেন, হযরত আয়েশা (রা) কি তোমাকে হযরত আব্বাসের সঙ্গী অপর ব্যক্তির নাম শুনিয়েছেন? আমি বললাম, জী, না। তিনি বললেন, তিনি ছিলেন হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা)।[৭৭]

উপরোক্ত হাদীসে দেখা যায়, মহানবী (সা) জামা'আতে শামিল হয়ে গেলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইমামতের অবস্থান থেকে 'মুকাব্বির'-এর অবস্থানে চলে আসেন। মৌলিকভাবে ইমামত করেন মহানবী (সা) নিজে। তিনি ইমামত করেছেন অসুস্থতার কারণে বসা অবস্থায় আর তাঁর পেছনে হযরত আবূ বকর সহ অন্যরা যারা ইক্তিদা করেছেন তাঁরা ইক্তিদা করেছেন দাঁড়ানো অবস্থায়। বুঝা গেল, ইমাম বসে নামায পড়ালেও মুক্তাদীগণ তাঁর ইক্তিদা করবেন দাঁড়ানো অবস্থায়।

---

৭৬. এই নামাযে ইমাম হিসাবে আবূ বকর (রা) নামায শুরু করলেও পরে তিনি নবীজীকে ইমাম হিসাবে গ্রহণ করেন আর নবীজীও তাঁকে মুক্তাদী হিসাবে গ্রহণ করেন। নবীজী (সা) ইমাম ছিলেন মর্মে দলীল হল১. নবীজীকে তখন আবূ বকরের সামান্য আগে বাম দিকে বসানো হয়েছিল। (দ্র. তাহাভী) ২. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, তখন আবূ বকর (রা) নামাযের জাহরী কিরা'আত বন্ধ করে দেন এবং নবীজী কিরা'আত পড়তে থাকেন। (দ্র. আত তালীকুস সাবীহ) অবশ্য জামি' তিরমিযী ও নাসাঈ বর্ণিত দু'টি হাদীস থেকে ইশারা হয় যে, মহানবী (সা) হযরত আবূ বকরের পেছনে ইক্তিদা করে নামায পড়েছেন। উভয় বক্তব্যের বিরোধ নিরসনে আলিমগণ বলেন, প্রথমোক্ত বক্তব্যটি সহীহাইন বর্ণিত হাদীসের সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত বলে এটি অগ্রাধিকার যোগ্য। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ঘটনা হল দু'টি। একটিতে আবূ বকর (রা) ইমাম ছিলেন আর অপরটিতে ইমাম ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)। দ্র.আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী, আল ফাতহুল মুলহিম, খ. ২ পৃ. ৫৭। ইমাম বায়হাকী (র) বিষয়টির সুন্দর সমাধান পেশ করেছেন। তিনি বলেন, যে নামাযে মহানবী (সা) উঠে গিয়ে নামাযের মধ্যে ইমামত গ্রহণ করেন সেটি ছিল শনি কিংবা রোববার-এর যুহরের নামায। এই নামাযে মহানবী (সা) হযরত আলী ও হযরত আব্বাসের কাধের উপর হাতে ভর করে এসে নামাযে শরীক হন এবং হযরত আবূ বকর (র) পেছনে সরে মুক্তাদী তথা মুকাব্বির হয়ে যান। আর যে নামাযে মহানবী (সা) সম্পূর্ণ মুক্তাদী হিসাবে নামায পড়েন সেটি ছিল পরবর্তী সোম বারের ফজর-এর নামায। এই নামাযে তিনি হযরত ফযল ইবন আব্বাস ও এক গোলামের কাঁধের উপর ভর করে এসে শরীক হন। এটিই ছিল মহানবীর সর্বশেষ নামায। দ্র. ফাতহুল কাদীর, আত্ তালীকুস সাবীহ, তানযীমুল আশতাত, মাওলানা আবুল হাসান, চট্টগ্রাম ঃ আল হেলাল প্রকাশনী, তাবি ; খ. ১, পৃ. ৩৯৮।

৭৭. ইমাম বুখারী ঃ আস সহীহ, রিয়াদ, দারুস সালাম রিন নাশর ওয়াত তাওযী, মার্চ ১৯৯৯, হাদীস নং ৬৮৭, পৃ. ১১২-১২৩ ; আরো দ্র. হাদীস নং ২৫৮৮, ৪৪৪২, ৫৭১৪ ; ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪১৭, মুসান্নাদে আবদুর রাযযাক, হাদীস নং ৯৭৫৪, হুমায়দী, হাদীস নং ২৩৩।

www.pathagar.com

তাছাড়া মহানবী (সা)-এর বসে নামায পড়ানোর এই ঘটনা হল জীবনের সম্পূর্ণ শেষ প্রান্তের ঘটনা। কাজেই বুঝা যায় যে, ইতোপূর্বে ভিন্ন রকমের কোন হুকুম দিয়ে থাকলেও সেটি এই ঘটনার দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে এবং এটি اخر الامرين হিসাবে প্রতিষ্ঠিত আছে।

জমহুর উলামার উপরোক্ত দলীলের উপর হাম্বলী আলিমগণ একাধিক আপত্তি উত্থাপন করে থাকেন। যেমন হাম্বলী আলিমগণ বলেন, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক গ্রন্থে হযরত আতা ইবন আবু রাবাহ (রা) থেকে বর্ণিত একখানা মুরসাল হাদীসে আছে যে, এ ঘটনায় মহানবী (সা) বসে ইমামত করেছিলেন আর সাহাবীগণ ইক্তিদা করেছেন দাঁড়িয়ে। তাই নামায শেষে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন[৭৮] ঃ

لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا صَلَّيْتُ الاَّ قُعُوْدًا وَصَلوٰةُ اِمَامِكُمْ مَا كَانَ يُصَلِّ قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا .

তাতে বুঝা যায় যে, সাহাবীগণ তখন দাঁড়িয়ে ইক্তিদা করলেও মহানবী (সা)-এর শেষ রায় ছিল তাদের বসে ইক্তিদা করা।

এ আপত্তির জবাবে বলা হয় যে, হযরত আতা (র) বর্ণিত মুরসাল হাদীসখানার মূল পাঠের কোথাও এ ইঙ্গিত নেই যে, এটি ওফাত কালীন অসুস্থতার নামায প্রসঙ্গে ছিল। বরং বাহ্যিকভাবে যতটুকু দেখা যায় তাতে বুঝা যায় যে, এটি ছিল হিজরী পঞ্চম সালে মহানবী (সা) ঘোড়া থেকে পড়ে আঘাত পাওয়ার কারণে বসে বসে যে নামায আদায় করেছিলেন সে সময়কার ঘটনা। তখনও মহানবী (সা) কয়েকদিন পর্যন্ত হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে মুকীম ছিলেন। তখন হতে পারে মহানবী (সা)-এর নিকট আগন্তুক সাহাবীগণ শুরু দিকে এক দুই বেলার নামায তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে আদায় করেছিলেন। পরে তিনি তাঁদেরকে বসে নামায পড়তে নির্দেশ দেন। ইবন হিব্বান প্রমূখ মুহাদ্দিসগণের অভিমত অনুসারে এ সবই ছিল ৫ম হিজরী সনের ঘটনা। তারপর ওফাত পূর্বকালের ঘটনার দ্বারা পূর্বোক্ত সব নিয়মই রহিত করে দেওয়া হয়। কাজেই আতা বর্ণিত মুরসাল হাদীসখানাও রহিত অভিমতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে।[৭৯]

তাছাড়া হযরত আতা (র) আবু রাবাহ (র) বর্ণিত মুরসাল হাদীস উসূলে হাদীসের নীতি অনুসারে হযরত হাসান বাসরী (র) কর্তৃক মুরসালের মত দুর্বল হিসাবে পরিগণিত। উভয় বুযর্গের মারাসীল সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের প্রসিদ্ধ মন্তব্য হল; لَيْسَ فِى الْمُرْسَلاَتِ اَضْعَفُ مِنْ مُرْسَلاَتِ الْحَسَنِ وَعَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ হাসান ও আতা ইবন আবু রাবাহের বর্ণিত মুরসাল অপেক্ষা অধিকতর দুর্বল মুরসাল আর নেই।[৮০] কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, হযরত আতা (র) বর্ণিত এই মুরসালে কোন রাবীর হয়ত বর্ণনায় ভ্রম হয়ে গিয়েছে। ফলে তিনি ঘোড়া

৭৮. আবদুর রাযযাক ঃ আল মুসান্নাফা , খ. ২, পৃ. ৪৫৮, হাদীস নং ৪০৭৪।

৭৯. মাওলানা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

৮০. আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী, মা'আরিফুস সুনান, খ. ৩, পৃ. ৪০২।

www.pathagar.com

থেকে পড়ে যাওয়ার প্রকৃত ঘটনাকে ওফাতকালীন ঘটনার সাথে মিলিয়ে সব এলামেলো করে ফেলেছেন।

জমহূর ফুকাহায়ে কিরামের পেশকৃত দলীলের উপর আরেকটি আপত্তি এমন উত্থাপন করা হয় যে, ইমাম আবূ দাঊদ (র) বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَكِبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ فَرَسًا بِالْمَدِيْنَةِ فَصَرَعَهُ عَلٰى جِذْمِ نَخْلَةٍ ، فَانْكَفَتْ قَدْمُهُ فَاَتَيْنَاهُ نُعُوْدُهُ فَوَجَدْنَاهُ فِىْ مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُسَبِّحُ جَالِسًا قَالَ فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَسَكَتَ عَنَّا ثُمَّ اَتَيْنَاهُ مَرَّةً اُخْرٰى نَعُوْدُهُ فَصَلّٰى الْمَكْتُوْبَةَ جَالِسًا فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَسَكَتَ عَنَّا ثُمَّ اَتَيْنَاهُ مَرَّةً اُخْرٰى نَعُوْدُهُ فَصَلّٰى الْمُكْتُوْبَةُ جَالِسًا فَقُمْنَا خُلْفَهُ فَاَشَارَ اِلَيْنَا فَقَعَدْنَا قَالَ فَلَمَّا قَضٰى الصَّلٰوةِ قَالَ اِذَا صَلّٰى الْاِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا وَاِذَا صَلّٰى الْاِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَلاَ تَفْعَلُوْا كَمَا يَفْعَلُ اَهْلُ فَارِسٍ بِعُظَمَاءِهَا .

رواه أبو داؤد تحت باب الامام يصلى من قعود ، رقم الحديث ٦٠٢ ، ص : ٩٨

হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনা শরীফে একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোড়ায় আরোহন করলে ঘোড়াটি তাঁকে ফেলে দেয় একটি খেজুর বৃক্ষের গোড়ায়। ফলে তার পা আহত হয়। আমরা তাঁর শুশ্রূষার জন্য গেলাম। গিয়ে দেখলাম তিনি হযরত আয়েশা (রা) ঘরে বসা অবস্থায় নামায আদায় করছেন। জাবির (রা) বলেন, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পেছনে দাঁড়িয়ে ইক্তিদা করলাম, তিনি আমাদের দাড়ানোর ব্যাপারে কিছুই বললেন না। তারপর আবার তাঁর শুশ্রূষার জন্য হাযির হলাম। তখন তিনি বসা অবস্থায় ফরয নামায আদায় করছিলেন। আমরাও তার পেছনে দাঁড়িয়ে ইক্তিদা করতে মনস্থ করলাম। এমন সময় তিনি আমাদের প্রতি ইশারা করলেন যেন আমরা বসা অবস্থায় ইক্তিদা করি। এভাবে নামায শেষ হলে মহানবী (সা) বললেন, ইমাম যখন দাঁড়িয়ে নামায পড়বে তখন তোমরাও নামায পড়বে দাঁড়িয়ে। আর ইমাম যখন বসা অবস্থায় নামায পড়বে তখন তোমরাও নামায পড়বে বসা অবস্থায়। পারস্যবাসী নিজেদের রাজা বাদশাহদের সাথে যেমন আচরণ (রাজা বসে থাকেন আর অন্যরা সব থাকে দাঁড়িয়ে) করে তোমরা তেমন করবে না।[৮১]

হাম্বলী ফকীহগণ বলেন, এ হাদীসে মহানবী (সা) 'ইক্তিদা' সম্পর্কীয় মূলনীতি আলোচনা করেছেন। ইমাম যেভাবে নামায পড়বেন মুক্তাদী তার অনুগত হিসাবে সেভাবেই নামায পড়বে। তাছাড়া মূলনীতির কখনো পরিবর্তন ঘটে না। তাছাড়া এ মূলনীতির 'ইল্লত' বা

৮১. ইমাম আবূ দাউদ ঃ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬০২, পৃ. ৯৮।

www.pathagar.com

কারণটিও হাদীসে মহানবী (সা) উল্লেখ করে বলেন لَا تَفْعَلُوْا كَمَا يَفْعَلُ اَهْلُ فَارِس بِعُظَمَائِهَا অর্থাৎ তোমাদের নামায বাহ্যতভাবেও যেন অগ্নি পুজকদের ইবাদত, কৃষ্টি ও সভ্যতার সাথে এক রকম না দেখায়। এই ইল্লত এখনো বিদ্যমান। কাজেই তার 'দলিল' এখনো বিদ্যমান থাকা আবশ্যক বিধায় এটি মানসূখ হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। অতএব ওফাতকালীন অসুস্থতা জনিত নামায দ্বারা এ হাদীস মানসূখ হয়ে গিয়েছে এমন দাবী করা যায় না।

এ প্রেক্ষিতে ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র) বলেন, প্রকৃত কথা হল যে, ইসলামের প্রথম দিকে যখন মুসলমানরা সবেমাত্র আসমানী নতুন কৃষ্টি ও সভ্যতার সাথে পরিচিত হচ্ছিল এবং পুরাতন বর্বর ও কুফরী নীতি থেকে ধীরেধীরে উঠে আসছিল তখন নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বেশ কঠোরতা আরোপিত ছিল। ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের অন্তরে ও আচরণে ইসলামী আকীদা ও তাহযীব তামাদ্দুন পাকা পোক্ত করা। এ আকীদা ও তাহযীব তামাদ্দুনকে নিখুঁত ও পোক্ত বানানোর জন্য শুরু দিকে সাধারণ কিংবা তুচ্ছ পর্যায়ের দুর্বলতা অনুমতি দেওয়া হয়নি। অতঃপর দিনে দিনে যখন মুসলিম সমাজের আকীদা, চিন্তাধারা, কৃষ্টি ও সভ্যতা নিজস্ব অবস্থানের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যায় তখন পূর্বেকার সে সব কঠোরতা তুলে নেওয়া হয়। ৫ম হিজরী সনে ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার ঘটনার সময় উপরোক্ত কঠোরতার নিরিখে দাঁড়িয়ে ইক্তিদা করতে নিষেধ করা হয়েছিল। আর মরযুল ওফাতের ঘটনায় সবকিছুর পাকাপোক্ততা সম্পাদিত হয়ে গিয়েছে বিধায় বসে ইক্তিদার নিয়ম অনুমোদন করে পূর্বেকার হুকুম মানসূখ করে দেওয়া হয়।[৮২]

হাম্বলী ফকীহগণ নিজেদের অভিমতের সমর্থনে ইমাম মুসলিম (র) বর্ণিত হযরত আনাস ইবন মালিকের যেই হাদীস (ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়া বিষয়ক হাদীস নং-৯২১) পেশ করে থাকেন তার জবাবে জমহূর ফুকাহায়ে কিরামের প্রথমত, অভিমত হল যে, এটি মানসূখ। ইতোপূর্বে তা প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মানসূখ আগে থাকে আর নাসিখ পরে আসে। হযরত আনাসের হাদীস ৫ম হিজরী সনের আর মরযুল ওফাতের হাদীস ১১ হিজরী সনের। সুতরাং মরযুল ওফাতের হাদীস দ্বারা হযরত আনাসের হাদীস রহিত হয়ে গিয়েছে বলে এটির মাধ্যমে বর্তমানে আর দলীল পেশ করার সুযোগ নেই।

দ্বিতীয়ত, বলা যেতে পারে যে, হযরত আনাসের এই হাদীস হল নফল নামায প্রসঙ্গে। ফরয নামায প্রসঙ্গে নয়। নফলের ক্ষেত্রে অনেক ছাড় আছে। নফল নামাযে কিয়াম ফরয নয়। কেউ বসে বসে নফল নামায পড়লে সাওয়াব কম হবে কিন্তু নামায শুদ্ধ। সুতরাং মহানবী (সা) হয়ত নফল নামায পড়ছিলেন আর সাহাবীগণও নফলের জন্য তার পেছনে ইক্তিদা করেছিলেন। সম্পূর্ণ ব্যপারটি নফল হওয়ার কারণে মহানবী (সা) আদেশ দেন যে, ইমাম বসা অবস্থায় নামায পড়লে তোমরাও সকলে বসা অবস্থায় নামায পড়বে।

এ জবাবে অবশ্য একটা পুনঃ আপত্তি এ রকম থেকে যায় যে, সুনানে আবূ দাঊদ গ্রন্থে হাদীস স্বয়ং মহানবী (সা) ফরয নামায পড়েছেন আর ঐ নামাযেই সাহাবীগণ তাঁর ইক্তিদা করছেন বলে উল্লেখ রয়েছে। (দ্র. হাদীস নং ৬০২) এ প্রসঙ্গে জমহূর ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, মহানবী (সা)-এর নিজের নামায যদিও ছিল ফরয (যা হাদীসের শব্দ থেকে বুঝা যায়) কিন্তু

৮২. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী ঃ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খ. ২, পৃ. ২৭।

www.pathagar.com

আগন্তুক যারা তাঁর পেছনে ইক্তিদা করেছিলেন তাঁদের নামায ছিল নফল। এটির দলীল হল এক. সেই হাদীসে সাহাবীগণ নিজেরা যে ফরয আদায় করছেন সে মর্মে কোন ইঙ্গিত বিদ্যমান নেই। দুই. ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার ঘটনায় নবীজী (সা) এক নাগাড়ে কয়েকদিন পর্যন্ত অসুস্থ থাকেন। তিনি এই কয়দিন হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করেন। মসজিদে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এখন যদি মনে করা হয় যে, সাহাবীগণ এ কয়দিন ফরয নামাযগুলো তাঁর কাছে এসে এখানে আদায় করছেন তাহলে বিষয়টি কি দাঁড়াচ্ছে? নবীজী (সা) শুশ্রূষার জন্য শুধু যে মসজিদে নববীর মুসল্লীরা আসতেন তা নয়। দূর দূর থেকেও মুসল্লীদের আগমন ছিল। তাই এই কয়দিন মসজিদে নব্বীসহ অন্যান্য সকল মসজিদে ফরয নামাযের জামা'আত বন্ধ ছিল, সকলে গিয়ে হযরত আয়েশার ঘরে নামায পড়ছেন—এমনটি না ইতিহাসে আছে, আর না বাস্তব সম্মত। তা ছাড়া হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘর ও তার আয়তন সম্পর্কে যে বর্ণনা হাদীসে আছে তাতে বুঝা যায়, এত সংখ্যক মুক্তাদী সেখানে সংকুলান হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। এ কারণে স্পষ্ট যা বুঝা যায় তা হল, সাহাবীগণ তখন মসজিদে নব্বী কিংবা নিজেদের মসজিদে যথারীতি জামা'আতে ফরয আদায় করতেন। অতঃপর মহানবী (সা)-এর শুশ্রূষার জন্য হযরত আয়েশার ঘরে যেতেন। তখন মহানবী (সা) যদি নামাযে থাকতেন তা ফরয হোক কিংবা নফল তারা নিজেরা নবী (সা)-এর পেছনে ইক্তিদার সাওয়াব প্রাপ্তির লক্ষ্যে নফলের নিয়্যতে তাঁর পেছনে নামায শুরু করতেন। তাঁদের এই নামায নফল ছিল বলেই মহানবী (সা) তাঁদেরকে বসা অবস্থায় আদায়ের নিদেশ দেন।[৮৩] মোটকথা হযরত আনাস (রা)-এর এ হাদীস নফল নামাযে প্রযোজ্য তবে ফরয নামাযে প্রযোজ্য নয়।

খাতিমাতুল মুহাদ্দিসীন হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসখানা মাসবূক সংক্রান্ত হাদীস। অর্থাৎ এখানে اقتداء القائم কিংবা اقتداء القاعد এর কথা বলা হয়নি; বরং মুক্তাদী অবিলম্বে ইমামের যথা অবস্থানের সাথে শামিল হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। হযরত কাশ্মীরী (র) বলেন, ইসলামের শুরু দিকে নিয়ম ছিল যে, কোন ব্যক্তি যদি জামা'আত শুরুর পরে এসে শামিল হত (মাসবূক) তাহলে সে ইমামের তো ইক্তিদা করত কিন্তু কিয়াম কিংবা কুউদ-এর ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণের পরিবর্তে নিজ রাক'আত সংখ্যা হিসাবে আমল করত। পদ্ধতি ছিল এমন যেমন কোন ব্যক্তি হয়ত ইমামকে দ্বিতীয় রাক'আতে পেয়েছে। সে ইমামের সঙ্গে দ্বিতীয় রাক'আত আদায়ের পর সিজদা থেকে উঠে ইমাম তো বসে যেতেন কিন্তু মাসবূক নিজের দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যেত। অনুরূপ যদি ইমামের নামায হত তিন রাক'আত আর মাসবূকের হত দুই রাক'আত তাহলে মাসবূক বসে যেত। পক্ষান্তরে ইমাম দাঁড়িয়ে যেতেন।[৮৪] এভাবেই নামায চলছিল। অবশেষে একদিন দেখা গেল যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) মাসবূক হন। তিনি ইক্তিদা করার পর তাঁর নামাযে রাক'আত সংখ্যা ইমামের রাক'আত সংখ্যার সাথে মিল না হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইমামকেই অনুসরণ করে যান। নামাযের

---

৮৩. মাওলানা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

৮৪. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

মাঝখানে ব্যক্তিগত অপূর্ণতা পূর্ণ করার দিকে মনোযোগী হননি। এগুলো সালাম শেষ করার পর পূর্ণ করে নেন।

তখন মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً فَاسْتَنُّوْهَا .

"ইবন মাসউদ (রা) তোমাদের জন্য একটি সুন্দর পদ্ধতি চালু করেছে। তোমরা এটি নামাযের পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করে নাও।"[৮৫] শাহ্ সাহেব (র) বলেন, হতে পারে হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসে এ নির্দেশটিই প্রদান করা হয়েছে যে, ইমামকে তোমরা যে অবস্থায় পাও সে অবস্থার উপরেই তার ইক্তিদা করে নাও। তারপর ইমাম উঠা বসা যা যা করেন সকল ক্ষেত্রে তাঁরই অনুসরণ চালিয়ে যাও। তারপর সালাম ফিরানোর পর তোমার ছুট যাওয়া নামায পূরণ করে নাও। হাদীসখানাকে যদি মাসবূক বিষয়ক বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে এটির দ্বারা হাম্বলীগণের পক্ষে আর দলীল প্রদানের সুযোগ থাকে না।[৮৬]

জমহূর ফুকাহায়ে কিরামের পক্ষ থেকে হযরত আনাসের হাদীসের আরেকটি জবাব এভাবে দেওয়া হয় যে, এ বিধান একমাত্র মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য খাস। উম্মাতের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়। পয়গাম্বর হিসাবে মাহানবী (সা)-এর জন্য বিশেষ কিছু বিধান শরী'আতে স্বীকৃত আছে। তন্মধ্যে একটি হল, তিনি কোন কারণে বসা অবস্থায় নামায পড়লে অন্যদের ও বসা অবস্থায় নামায পড়তে হবে। কিয়াম আদায় করতে গিয়ে নবুওয়াতের আনুগত্য ও অনুসরণ বর্জন করা যাবে না। তবে এ হুকুম একান্তই তার নিজ সম্পর্কীত বিধায় উম্মতের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে না। উম্মাতের কেউ বসে নামায পড়ালে মুক্তাদীদের দাঁড়িয়ে নামায পড়াই আবশ্যক। এ মর্মে হযরত উরওয়া (র) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসকে দলীলরূপে পেশ করা যায়। তিনি বলেন, بَلَغَنِيْ اَنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ لاَحَدٍ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ আমার নিকট নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য সনদে এ কথা পৌছেছে যে, এটি মহানবী (সা)-এর জন্য খাস হুকুম। মহানবী (সা) ছাড়া অন্য কারোর ক্ষেত্রে এ হুকুম কার্যকরী নয়।[৮৭]

উল্লেখ যে, হযরত উরওয়া (র) বয়োবৃদ্ধ তাবিঈন ও মদীনার সপ্ত ফকীহের অন্যতম। তাঁর বর্ণিত 'বালাগাত' মুহাদ্দিসীনের দৃষ্টিতে সন্দেহাতীতভাবে শক্তিশালী ও গৃহীত। মাওলানা তাকী উসমানী বলেন হযরত উরওয়া (র)-এর উপরোক্ত 'বালাগাত' আল্লামা আলী মুত্তাকী (র) 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থে মুসন্নাফে আবদুর রাযযাকের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন। আধুনিক কালে মজলিসে ইলমী প্রকাশিত মুসান্নাফে আবদুর রাযযাকের যে কপি মুদ্রিত আছে তাতে উক্তিটি হযরত উরওয়ার-এর বলে পাওয়া যায়নি। উক্তিটিকে তার স্থরে আবূ উরওয়া যা হযরত মা'মার ইবন রাশিদের একটি উপনাম সে দিকে নিসবত করা হয়েছে। আর হযরত মা'মার ইবন রাশিদ (র) ছিলেন স্বয়ং হযরত আবদুর রাযযাক-এর উস্তাদ।[৮৮]

---

৮৫. আবদুর রাযযাক ঃ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩১৭৬, খ. ২, পৃ. ২২৯।

৮৬. আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী প্রাগুক্ত।

৮৭. আল্লামা আলী মুত্তাকী বুরহানপুরী, কানযুল উম্মাল, খ. ৪, পৃ. ২৫৮; আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪২৩।

৮৮. মাওলানা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৬।

www.pathagar.com

উপরোক্ত ব্যাখ্যার উপর অবশ্য ইমাম আবূ দাঊদ (র) কর্তৃক বর্ণিত একখানা হাদীসের অমিল ফুটে উঠছে। কেননা আবূ দাঊদের হাদীসে নবী (আ)-কে খাস না করে সাধারণভাবে যে কোন ইমাম প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে। হাদীসখানা হল ঃ

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ اَنَّهٗ كَانَ يَؤُمُّهُمْ قَالَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُهٗ (فَقَالُوْا) يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنَّ اِمَامُنَا مَرِيْضٌ فَقَالَ اِذَا صَلّٰى قَاقِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا . رواه الامام أبو داؤد تحت باب الامام يصلى من قعود ، رقم الحديث ٦٠٧ ، ص : ٩٩ ، وقال ابو داؤد هذا الحديث ليس بمتصل .

হযরত উসায়দ ইবন হুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি লোকজনের ইমামত করতেন। তিনি বলেন, একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর শুশ্রূষার জন্য তাশরীফ আনলেন। উপস্থিত লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ইমাম তো অসুস্থ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন, তাতে কি আছে? ইমাম যখন বসা অবস্থায় নামায পড়াবে তখন তোমরাও বসা অবস্থায় নামায পড়বে।[৮৯]

এ হাদীস বুঝাচ্ছে যে, বিষয়টি মহানবীর একান্ত নিজের বিধান তা নয় বরং উম্মাতের অন্যান্য ইমামের ক্ষেত্রেও এটি সমভাবে প্রযোজ্য। জমহূর ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, ইমাম আবূ দাঊদ (র) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীস সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম যা বলেছেন তাহলে এটি সনদগত দিক থেকে মুত্তাসিল নয়।[৯০] কেননা فَاِنَّهٗ لَمْ يَسْمَعْ حُصَيْنٌ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ কজেই এটি দলীল হিসাবে পেশ যোগ্যই নয়।[৯১]

উপসংহার বলা যায় যে, হাম্বলী ফকীহগণ নিজেদের মতের সমর্থনে হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পেশ করলেও বিভিন্ন বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করলে এ হাদীস দলীল যোগ্য থাকে না। পক্ষান্তরে জমহূর ফুকাহায়ে কিরাম মরযুল ওফাত সংক্রান্ত হাদীসের আলোকে যা বলেছেন সেটিই অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও যুক্তিসঙ্গত। তাদের দলীল মযবুত ও গবেষণালব্ধ। অর্থাৎ ইমাম যদি ওযরবশত বসে নামায পড়ে তাহলে মুক্তাদীগণ তার পেছনে ইক্তিদা করবেন দাঁড়িয়ে।[৯২] এটিই ইমাম আযম আবূ হানীফা ও হানাফী ফকীহগণের অভিমত।

নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা জায়িয নয়

নফল নামায আদায়কারী ব্যক্তির পেছনে কোন ফরয নামায আদায়কারী ব্যক্তির ইক্তিদা জায়িয নয়। এতে ইক্তিদাকারী ফরয আদায়কারী ব্যক্তির নামায শুদ্ধ হবে না। কারণ ইক্তিদা শব্দের অর্থ হল নির্ভর করা, অনুসরণ করা ইত্যাদি। নামাযে কেউ কারো ইক্তিদা করার মানে

৮৯. ইমাম আবূ দাঊদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬০৭, পৃ. ৯৯।

৯০. প্রাগুক্ত।

৯১. মাওলানা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত।

৯২. মাওলানা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

একজনের নামাযকে অপর জনের নামাযের উপর নির্ভরশীল বানানো। তার নির্ভরশীলতার জন্য প্রয়োজন হল, নির্ভরশীল জিনিসটি মান ও শক্তির দিক থেকে নির্ভরকারীর সমান কিংবা বড় হওয়া। নতুবা নির্ভরশীলতা যথার্থ থাকে না। এ কারণেই মহানবী (সা) একখানা হাদীসে এ নীতির ক্ষেত্রে ইমাম মুক্তাদীর মাঝে যেন ব্যতিক্রম অবস্থা না ঘটে সে দিকে ইশারা করে দিয়েছেন। মানগত দিক থেকে যেহেতু নফল নামায ফরয নামায অপেক্ষা দুর্বল। ফরয হল সবল। কাজেই নফল ফরযের উপর নির্ভরশীল হতে পারে, কিন্তু কোন ফরয কোন নফলের উপর নির্ভরশীল হতে পারে না।[৯৩] এ জন্য ফকীহগণ বলেছেন, নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা জায়িয নয়।

দলীল হিসাবে নিম্নোক্ত হাদীস লক্ষণীয় ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰه عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ ، فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا ،

رواه الامام مسلم تحت باب ائتمام المأموم بالامام رقم الحديث : ٩٣٠، ص : ١٧٦.

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, ইমামকে ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য। কাজেই তোমরা ইমামের ব্যতিক্রম অবস্থা অবলম্বন করো না। অতএব ইমাম যখন তাকবীর বলবে তখন তোমরা তাকবীর বলবে। ইমাম যখন রুকূ' করবে তখন তোমরা রুকূ' করবে। ইমাম যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলবে তখন তোমরা বলবে। اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ। ইমাম যখন সিজ্‌দা দিবে তখন তোমরা সিজ্‌দা করবে।[৯৪]

উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত ইমামের প্রতি মুক্তাদীর আনুগত্য বজায় রাখা ও ব্যতিক্রম না ঘটানোর নির্দেশ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মূল নামায, নামাযের মান ও গুণগত অবস্থা, কাজকর্ম ও নিয়্যত প্রভৃতির ক্ষেত্রে মুক্তাদীর জন্য ইমামের অনুসরণ আবশ্যক। মুক্তাদীর নামায ইমামের ক্ষেত্রে এমন উপযোগিতা বিদ্যমান থাকা চাই। এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম হলে চলবে না। নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদায় যেহেতু সেই উপযোগিতা বিদ্যমান নেই বরং ব্যতিক্রম ঘটে যায় সেহেতু এটি জায়িয নয়।[৯৫] এটিই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত।

এ প্রসঙ্গে আরো অন্যান্য হাদীস নিম্নরূপ ঃ

---

৯৩. আল্লাহ কাসানী, বাদাইউস সানায়ি, বাইরাত, দারু ইহয়ায়িত তুরাস আল আরাবী, ২০০০, খ. ১, পৃ. ৩৫৮।

৯৪. ইমাম মুসলিম, আস সহীহ; রিয়াদ, দারুস সালাম, জুলাই ১৯৯৮, হাদীস নং ৯৩০, পৃ. ১৭৬।

৯৫. মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাসান, তানযীমুল আশতাত, চট্টগ্রাম, আল হেলাল প্রকাশনী, তাবি, খ. ১, পৃ. ৩৩১।

www.pathagar.com

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَاَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوْا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِىْ لَمْ تُصَلِّ فَجَاؤُوْا فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، رواه الامام البخارى فى أبواب صلواة الخوف ، رقمه ٩٤٣، ص: ١٥١، أيضا برقم ٩٤٣، ٤١٣٢، ٤١٣٣، ٤٥٣٥، رواه الامام مسلم رقمه ١٩٤٣، ص : ٣٣٨

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা)-এর সঙ্গে নজদের দিকে এক যুদ্ধে গমন করি। অতঃপর আমরা যখন শত্রুদের মুখামুখি হলাম তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের ইমামতের জন্য নামাযে দাঁড়ালেন। (এ সময় আমরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যাই। তন্মধ্যে) আমাদের একটি দল মহানবী (সা)-এর সঙ্গে নামাযে দাঁড়িয়ে যায় আর অপর দলটি শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) সঙ্গী দলটি নিয়ে (প্রথম রাক'আতে রুকূ' ও সিজ্দা সম্পন্ন করলে তারা স্বস্থানে ফিরে আসে। অতঃপর যে দলটি এখনো নামাযে শরীক হয়নি তারা আগমন করে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের নিয়ে (দ্বিতীয় রাক'আতের) রুকূ' সিজ্দা সম্পন্ন করে যখন সালাম ফিরান তখন (দ্বিতীয় দলের) প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে নিজের ছুটে যাওয়া রাক'আত রুকূ' সাজ্দা আদায়ের মাধ্যমে পূর্ণ করে নেয়। (অতঃপর প্রথম দলটি ফিরে এসে নিজেদের অবশিষ্ট রাক'আত পূর্ণ করে নেয়।)[৯৬]

এ হাদীসে সালাতুল খাওফের একটি পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। সালাতুল খাওফের আরো অন্যান্য পদ্ধতিও আছে। আল্লামা কাসানী (র) বলেন, এখানে লক্ষণীয় যে, আমলে কাসীর যা নামাযের পরিপন্থি বিষয় এবং এদিক ওদিক যাওয়া বা হাটাহাটি করা কিংবা উঠা বসা ইত্যাকার বিষয়গুলো নামাযের অনুকূল বিষয় নয়। এতদসত্ত্বেও মহানবী (সা) এগুলোকে নামাযের মধ্যে অনুমোদন করার মধ্যে নিশ্চয় বড় ধরনের কোন কারণ রয়েছে। এখানে বিবেচনার ব্যাপার হল যদি নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা সহীহ হয়ে থাকত তাহলে মহানবী (সা) নিজের দুই রাক'আত ফরযকে এমন প্রতিকূল বিষয়াদির অনুমোদন সহ দুই দলের মধ্যে বণ্টনের চেষ্টা করতেন না। বরং প্রথম দলের সাথে ফরয দুই রাক'আত আদায় করে তাদের বিদায় দিয়ে দিতেন। তারপর নিজে নফল শুরু করতেন আর পেছনে দ্বিতীয় দল তাঁর ইক্তিদা করলে দ্বিতীয় দলকেও নামায পড়িয়ে দিতেন। সহজ পদ্ধতি ছেড়ে জটিল পদ্ধতি গ্রহণ করা থেকেও বুঝা যায় যে, মহানবী

৯৬. ইমাম বুখারী, আস সহীহ, রিয়াদ ঃ দারুস সালাম, মার্চ ১৯৯৯, হাদীস নং ৯৪২, পৃ. ১৫১; আরো দ্র. হাদীস নং ৯৪৩, ৪১৩৪, ৪১৩৩, ৪৫৩৫; ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৯৪৩, পৃ. ৩৩৮।

www.pathagar.com

(সা)-এর দৃষ্টিতেও নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারীর নামায শুদ্ধ বলে বিবেচিত ছিল না।[৯৭]

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ الْاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ ، اَللّٰهُمَّ اَرْشِدِ الْاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ .

رواه الامام الترمذى تحت باب ما جاء ان الامام ضامن الخ ، رقم الحديث ٢٠٧، ص : ٥٨ وَقَالَ حَدِيْث اَبِىْ هُرَيْرَةَ رواه سفيان الثورى وحفص بن غياث وغير واحد عن الاعمش عن أبى صالح ، وايضًا قال سمعت محمدًا يقول حديث أبى صالح عن عائشة أصح ، وذكر عن على بن المدينى انه لم يثبت حديث أبى صالح عن أبى هريرة ، ولا حديث أبى صالح عن عائشة فى هذا .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, ইমাম হল যিম্মাদার তথা অপরের নামায ধারণকারী আর মু'আয্যিন হল আমানতদার। হে আল্লাহ্! ইমামদের তুমি সরল পথ দেখাও আর আযান দানকারীদের তুমি ক্ষমা করে দাও।[৯৮]

উপরোক্ত হাদীসে ضَـامِن শব্দটি বিবেচ্য বিষয়। যামিন অর্থ হল কাফীল। কাফালতের বিধান হল, কাফীল-এর ফাসাদের কারণে মাকফুল আনহু ফাসিদ হয়ে যায়। এ কারণে ইমামের নামাযে ভুল হলে মুক্তাদীকেও সিজ্দা সাহ্ করতে হয়। আবার ইমামের নামায নষ্ট হয়ে গেলে মুক্তাদীকেও নামায পুনরায় পড়তে হয়। 'ইনায়া' গ্রন্থে শায়খ আকমালুদ্দীন (র) বলেন হাদীসে বর্ণিত ضامن শব্দটি تضمن থেকে গৃহীত। تضمن মানে কোন জিনিসকে অভ্যন্তরে ধারণ করা। ইমামের নামায মুক্তাদীর নামাযের জন্য যামিন মানে ইমামের নামায নিজের অভ্যন্তরে মুক্তাদীর নামাযকে ধারণ করে রাখে। আর এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, কোন বস্তু নিজ অপেক্ষা বড় মাপের অপর বস্তুকে নিজ অভ্যন্তরে ধারণ করতে পারে না। ফরয নামায নফল নামায অপেক্ষা সকল বিবেচনায় বড় মাপের ও উচ্চ মর্যাদার। কাজেই কোন নফলের পক্ষে সম্ভব নয় কোন ফরযকে নিজ অভ্যন্তরে ধারণ করা।[৯৯] আর এ কারণেই নফল আদায়কারীকে ইমাম বানিয়ে ফরয আদায়কারীও নামায সম্পাদন করার সুযোগ নেই।

অবশ্য কেউ কেউ ضامن শব্দকে নেগরান ও পাহারাদার বলেও অর্থ করেছেন। এ তরজমা করা যেমন আরবী অভিধান বিরোধী, তেমনি এটি হাদীসের বাহ্য বক্তব্য এবং রিওয়ায়াত বিরোধীও বটে। এ প্রসঙ্গে আরো দুইখানা হাদীস সুনানে ইব্ন মাজা গ্রন্থে আছে। একটি হযরত সাহল ইব্ন সা'দ আস সাঈদী (রা) থেকে। আর অপরটি হযরত উকবা ইবন আমির (রা) থেকে। উভয় সাহাবীই হাদীসখানায় 'যামিন' শব্দ থেকে 'কাফীল' অর্থ গ্রহণ করেছেন

৯৭. আল্লাহ কাসানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮।

৯৮. ইমাম তিরমিযী, আল জামি, রিয়াদ, দারুস সালাম, এপ্রিল ১৯৯৯, হাদীস নং ২০৭, পৃ. ৫৮।

৯৯. মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২।

www.pathagar.com

এবং সে অনুসারে ব্যাখ্যা করেছেন।[১০০] হযরত উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

وَعَنْ اَبِىْ عَلِىٍّ الْهَمْدَانِىِّ اَنَّهُ خَرَجَ فِىْ سَفِيْنَةٍ فِيْهَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِىْ فَحَانَتْ صَلاَةٌ مِّنَ الصَّلَوٰاتِ فَاَمَرْنَاهُ اَنْ يَؤُمَّنَا وَقُلْنَا لَهُ اِنَّكَ اَحَقُّ بِذٰلِكَ اَنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَبٰى فَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَمَّ النَّاسَ فَاَصَابَ فَالصَّلاَةُ لَهُ وَلَهُمْ وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ ،

رواه بن ماجه تحت باب ما يجب على الامام رقمه ٩٨٣، ص : ١٣٨ ، وايضا بالرقم ٨٩١ ، وفيه الامام ضامن فَاِنْ اَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَاِنْ اَسَاءَ يَعْنِىْ فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ .

হযরত আবূ আলী আল-হামদানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নৌযান যোগে সফরে বের হলেন। সে নৌযানে হযরত উকবা ইবন আমির আল-জুহানী (রা) ও ছিলেন। ইত্যবসরে কোন নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তিনি বলেন, আমরা হযরত উকবা ইবন আমির (রা)-কে বললাম, আমাদের ইমামত করুন। কেননা-এ ব্যাপারে আপনি অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তি। আপনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর (সম্মানিত) সাহাবী। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি তিনি বলছেন, যে ব্যক্তি লোকজনের ইমামত করে এবং সঠিকভাবে ইমামতের কাজ সম্পাদন করে তার সেই নামায তার নিজের উপকার করে এবং লোকজনেরও উপকার করে। (আর সঠিকভাবে সম্পাদন না করলে তার নিজের নামায নষ্ট হবে এবং অন্যদের নামাযও) আর যে ব্যক্তি এই দায়িত্ব পালনে কোন ক্রটি করে সেটির গুনাহ তার (ইমামের) নিজের উপর বর্তাবে, লোকজনের উপর নয়।[১০১]

উপরোক্ত হাদীসে সাহাবী উকবা ইবন আমির (রা) যে কথাটি বলে ইমামত করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করলেন সেটি নির্দেশ করছে যে, তার মতে 'যামিন' শব্দের মর্ম হল সম্পূর্ণভাবে দায়িত্বশীল-কাফীল হওয়া। ইমামের নামায নষ্ট হওয়ার দ্বারা যদি মুক্তাদীর নামায ফাসিদ না হতো তাহলে হযরত উকবা উপরোক্ত কারণ পেশ করে অস্বীকৃতি জানানোর প্রশ্নই উঠে না। নামায হয়ে যাওয়ার পরও অর্ন্তনিহিত কোন ক্রটি ইমামের নামাযে হয়ত থাকতে পারে। ইমামকে এ ব্যাপারেও সাবধান থাকা উচিৎ। তবে এটি যেহেতু শুদ্ধতা বা অশুদ্ধতা বিষয়ক নয় সেহেতু সাহাবী আরো বলে দেন যে, ইমামের নামাযে কোন ক্রটিজনিত গুনাহ হয়ে

১০০. মাওলানা তাকী উসমানী, দরসে তিরমিযী, করাচী, মাকতাবা দারুল উলূম, নভেঃ ১৯৮৭, খ. ১, পৃ. ৪৭৪।

১০১. ইমাম ইবন মাজাহ, আস সুনান, রিয়াদ, দারুস সালাম, এপ্রিল ১৯৯৯, হাদীস নং ৯৮৩, পৃ. ১৩৮; আরো দ্র. হাদীস নং ৯৮১।

www.pathagar.com

গেলে সেটি একান্তই তার উপর বর্তাবে, মুক্তাদীর উপর নয়।[১০২] মোটকথা ইমামের নামায মুক্তাদীর নামাযকে ধারণ করে রাখে বিধায় নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা শুদ্ধ নয়। নফল ফরযকে ধারণ করার শক্তি রাখে না। এই নিরিখেই ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম যুহরী, হাসান বাসরী, সাঈদ ইবুল মুসায়্যাব, ইবরাহীম নাখঈ, আবূ কিলাবা, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল আনসারী, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলও এক অভিমত অনুসারে ইমাম মালিক (র) বলেন, নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা জায়িয় নয়।

পক্ষান্তরে হযরত ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমত হল যে, নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা জায়িয আছে।

দলীল হিসাবে তিনি নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন ঃ

عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا قَالَ مَرَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّى بِقَوْمِهٖ فَاَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الصَّلٰوةَ وَقَالَ مَرَّةً الْعِشَاءِ ، فَصَلّٰى مُعَاذٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ جَاءَ يَوْمٌ قَوْمَهُ فَقَرَاَ الْبَقَرَةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَصَلّٰى فَقِيْلَ نَافَقْتَ يَا فُلاَنُ ! فَقَالَ مَا نَافَقْتُ ، فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّى مَعَكَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ! اِنَّمَا نَحْنُ اَصْحَابُ نَوَاضِحَ وَنَعْمَلُ بِاَيْدِيْنَا ، وَاِنَّهُ جَاءَ يَؤُمُّنَا فَقَرَاَ بِسُوْرَةِ فَقَالَ يَا مُعَاذُ اَفَتَّانٌ اَنْتَ ، اَفَتَّانٌ اَنْتَ ، أَقْرَأْ بِكَذَا اقْرَأْ بِكَذَا ، قَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى .

رواه الامام أبو داؤد تحت باب تخفيف الصلوة رقمه ٧٩٠ ، ص : ١٢٣، وايضا بالرقم : ١٠٠، وأخرجه البخارى فى صحيحه فى الاذان رقمه ٧٠٠ ، ٧٠١ والامام مسلم فى باب القرأة فى العشاء وأخرجه أيضًا الشافعى ج ١ ، ص : ١٠٣، وأحمد ج ٣ ، ص : ٣٠٨، والحميدى برقم ١٢٤٦ والنسائى ج ٣ ، ص : ٩٧ في باب الامامة وابن ماجه بالرقم ٩٨٦ والطحاوى ج ١ ، ص : ٤٠٩

১০২. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৪। ইমাম শাফিঈর এ ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের আয়াত وَلَا تَزِرُوْا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى কেউ অন্য কারো ভার গ্রহণ করবে না। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৬৪)-এর আলোকে বলেন, ইমাম ও মুক্তাদীর প্রত্যেকেই নিজ নিজ নামাযের যিম্মাদার। ইমামের নামায নষ্ট হলে মুক্তাদীর নামায বাতিল হবে না। হানাফী ফকীহগণ বলেন, আয়াতের বক্তব্য হল সাওয়াব ও গুনাহ প্রসঙ্গে। কোন কিছুর শুদ্ধতা কিংবা অশুদ্ধতা প্রসঙ্গে নয়। কাজেই ভিন্ন প্রসঙ্গের আয়াতকে এখানে টেনে আনার সুযোগ নেই।

www.pathagar.com

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মু'আয (রা) মহানবী (সা)-এর সাথে নামায পড়ে ফিরে এসে আমাদের ইমামত করতেন। বর্ণনাকারী কখনো কখনো বলেছেন, তারপর ফিরে আসতেন ও নিজ সম্প্রদায়ের ইমামত করতেন। একরাতে মহানবী (সা) নামায রাবীর বর্ণনা মতে এশা-এর নামায বিলম্ব করেছিলেন। তখন মু'আয (রা) মহানবী (সা)-এর সঙ্গে নামায আদায় করেন তারপর ফিরে এসে নিজ সম্প্রদায়ের ইমামত করেন। (এ নামাযে তিনি) সূরা বাকারা তিলাওয়াত করেছিলেন। (নামাযের বিলম্ব ও দীর্ঘ তিলাওয়াত দেখে) জামা'আত থেকে এক ব্যক্তি আলাদা হয়ে যায় এবং নিজে নামায পড়ে নেয়, তাকে বলা হল, হে অমুক! তুমি মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। লোকটি উত্তর দিল, না, আমি নিফাক গ্রহণ করিনি। তাই সে মহানবী (সা)-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! মু'আয আপনার সঙ্গে নামায পড়েন। তারপর ফিরে এসে আমাদের ইমামত করেন। আর আমরা তো হলাম উটনী চালক শ্রমিক-কায়িক প্ররিশ্রম করে থাকি। তিনি এসে আমাদের ইমামত করেন। নামাযে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করেন। তখন মহানবী (সা) বললেন, তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি হে মু'আয! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী হে মু'আয! তুমি অমুক সূরা পড়বে। তুমি অমুক সূরা পড়বে। আবুয যুবায়র বলেন, অর্থাৎ সূরা আ'লা ও সূরা লায়ল।[১০৩]

হযরত ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, উপরোক্ত হাদীসে দেখা যায় যে, হযরত মু'আয (রা) মহানবী (সা)-এর পেছনে ইশার নামায পড়তেন (كما فى اكثر الروايات)। তারপর নিজ এলাকায় পৌছে সেই নামাযই আবার পড়াতেন। কাজেই দ্বিতীয়বারে তিনি থাকতেন নফল আদায়কারী। আর যারা তার ইক্তিদা করতেন তারা ছিলেন ফরয আদায়কারী। অতএব বুঝা গেল যে, নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা করা দুরস্ত আছে।

এ বক্তব্যের জবাবে ইমাম তাহাভী (র) বলেন, হযরত মু'আয (রা)-এর এ ঘটনা ছিল সেই সময়কার ঘটনা যখন মুসলমানদের জন্য একই ফরয নামায একাধিকবার পড়ার অনুমতি ছিল। পরবর্তীকালে মহানবী (সা) এভাবে একই ফরয নামায একাধিকবার পড়তে নিষেধ করে দেন।[১০৪] যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, نَهَى النَّبِيُّ اَنْ تُصَلَّى فَرِيْضَةً فِىْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ। মহানবী (সা) একই দিনে একই ফরয নামায একাধিকবার পড়তে নিষেধ করেছেন।[১০৫] এ হাদীস নির্দেশ করছে যে, এটির মাধ্যমে হযরত মু'আয-এর পদ্ধতিকে নিষেধ ও রহিত করে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ নীতি হল, কোন জিনিসের ইবাহাত তথা অনুমতি আগে থাকে। আর নিষেজ্ঞা আসে পরে। হযরত মু'আযের নামাযে অনুমতির বিষয়টি ছিল পূর্বেকার আর নিষেধাজ্ঞার হুকুমটি হল পরের। কাজেই পরবর্তী কালের বিধান পূর্ববর্তী কালের বিধান পূর্ববর্তী কালের বিধানের জন্য নাসিখ গণ্য হতে কোন আপত্তি নেই।

১০৩. ইমাম আবূ দাউদ, আস সুনান, রিয়াদ, দারুস সালাম, এপ্রিল, ১৯৯৯, হাদীস নং ৭৯০, পৃ. ১২৩। আরো দ্র. হাদীস নং -৬০০। তা ছাড়া দেখুন সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৭০০, ৭০১; সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত।

১০৪. ইমাম আবূ জা'ফর আত তাহাভী, শারহু মা'আনিল আসার, দেওবন্দ, আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া ঃ তাবি, খ. ১. পৃ. ২৭৩-২৭৫।

১০৫. ইমাম কুতনী, আস সুনান, باب لا يصلى المكتوبة فى يوم مرتين খ, ১।

www.pathagar.com

হানাফী ফকীহগণ আরো বলেন, মু'আযের হাদীসের যে ব্যাখ্যা ইমাম শাফিঈ (র) করেছেন সেটিই একমাত্র ব্যাখ্যা নয়। কেননা হতে পারে যে, যেহেতু হযরত মু'আয (রা) ছিলেন মহানবী (সা)-এর খাদিমগণের একজন। তাই তিনি সারা দিন মহানবী (সা)-এর দরবারে থাকতেন। তাঁর পেছনে নামায পড়তেন। অবশেষে রাত হয়ে গেলে বাড়ি চলে যেতেন। সেখানে লোকজনকে নিয়ে এশার নামায পড়তেন। এখানে দুই সময়ের ভিন্ন ভিন্ন দুই নামাযের কথা বলা হয়েছে। তবে বর্ণনাকারী এ দু'টি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে একত্রে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারীর আদৌ এমন উদ্দেশ্য নয় যে, হযরত মু'আয (রা) একই সময়ে একই নামায একবার মহানবী (সা)-এর পেছনে পড়েছেন আবার স্বয়ং ইমাম হয়ে নিজ এলাকার লোকজনকে নিয়ে আবার পড়েছেন। এ ব্যাখ্যার আলোকে মু'আযের হাদীস ইমাম শাফিঈ (র)-এর সমর্থনে দলীল হিসাবে আদৌ কার্যকরী থাকে না।[১০৬]

তৃতীয়ত, মু'আয (রা)-এর হাদীস হল ইমাম মুসলিম বর্ণিত হাদীস اِنَّمَا جُعِلَ الاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ সুস্পষ্ট ও ভিন্ন ব্যাখ্যার সম্ভাবনামুক্ত।[১০৭] পক্ষান্তরে হযরত মু'আযের হাদীস একদিকে যেমন সুস্পষ্ট নয় অপর দিকে এখানে নানাবিধ ব্যাখ্যার সম্ভাবনা বিদ্যমান। কাজেই সম্ভাবনামুক্ত দলীলের বিপরীতে সম্ভাবনাযুক্ত দলীলকে অগ্রাধিকার দেওয়া যায় না।

চতুর্থত, ইমাম তাহাভী (র) বলেন, হযরত মু'আয (রা) ইশার নামায পড়ে গিয়েও যদি কাওমের সেই ইশার নামাযেরই ইমামত করে থাকেন তাতেও আপত্তি নেই। এটি ছিল হযরত মু'আযের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্তের সাথে মহানবী (সা)-এর কোন নির্দেশ কিংবা অনুমোদন ছিল না। কাজেই হযরত মু'আয (রা)-এর এ সিদ্ধান্তকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করার সুযোগ নেই। অন্যদিকে এলাকার মুক্তাদীদের ধারণা ছিল যে, হযরত মু'আয (রা) হয়ত কাজটি মহানবী (সা)-এর অনুমতি ক্রমেই করছেন বিধায় তাঁরা কোন আপত্তি না জানিয়ে নীরব থাকেন। কাজেই মুক্তাদীদের নিরবতাকেও বৈধতার প্রমাণরূপে পেশ করা যায় না।

পঞ্চমত, আল্লামা ইবনুল মালিক (র) বলেন, হযরত মু'আয (রা) মহানবী (সা)-এর সাথে যে নামায পড়েছেন সেটি নফল নামাযের নিয়্যতে এবং নামায পড়ার পদ্ধতি রপ্ত করার উদ্দেশ্যে। তারপর এলাকায় গিয়ে ইমামতের মাধ্যমে যে নামায পড়েন সেটি ছিল ফরযের নিয়্যতে। তিনি এমনটা করতেন এ উদ্দেশ্যে যেন মহানবী (সা)-এর ইক্তিদা ও ইমামত উভয়ের ফযীলত তিনি লাভ করতে পারেন।[১০৮]

এ ব্যাখ্যার উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, বায়হাকী ও দারা কুতনীর বর্ণনায় হাদীসখানার একটি বর্ধিত অংশে আছে। هِىَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَرِيْضَةٌ দ্বিতীয় বারের সেই নামায হযরত মু'আযের জন্য ছিল নফল আর তার মুক্তাদীদের জন্য ছিল ফরয।[১০৯] কাজেই ইতোপূর্বে

---

১০৬. মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২।

১০৭. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৯৩০, পৃ. ১৭৫-১৭৬।

১০৮. মাওলানা আবুল হাসান, প্রাগুক্ত।

১০৯. ইমাম বায়হাকী আস সুনান, باب الفريضة خلف من يصلى النافلة খ. ৩, পৃ. ৮৬; ইমাম দারা কুতনী, আস সুনান, باب ذكر صلوة المفترض خلف المتنفل খ. ১, পৃ. ২৭৪।

www.pathagar.com

হযরত মু'আয নবী (আ)-এর সঙ্গে নফলের নিয়্যত শরীক হওয়া আর নিজে ফরযে নিয়্যতে ইমামত করার ব্যাখ্যা সঠিক থকে না।

প্রশ্নটির নিরসনে আল্লামা আয়নী (র) বলেন, বায়হাকী ও দারা কুতনীর সেই বর্ধিত অংশ সনদের দিক থেকে দলীলযোগ্য নয়। ইমাম ইবন তাইমিয়া (র) বলেন, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) উপরোক্ত বর্ধিত অংশ সম্পর্কে পর্যালোচনা করে অভিমত দেন যে, اَخْشٰى اَنْ لَا تَكُوْنَ مَحْفُوْظَةً আমি আশংকাবোধ করছি, বর্ধিত অংশটি সংরক্ষিত নয়। আর আল্লামা ইবনুল জাওযী (র) বর্ধিত অংশটি সহীহ নয় বলে স্পষ্টই অভিমত দেন। অতএব এটির মাধ্যমে অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ নেই।[১১০]

তারপরেও যদি বলা হয় যে, হযরত মু'আয (রা) নফলের নিয়্যতেই ইমামত করেছেন তাহলে উত্তর হবে যে, সেটি ছিল হযরত মু'আযের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্তের সাথে মহানবী (সা)-এর সমর্থন নেই। বরং মহানবী (সা)-এর সিদ্ধান্ত ছিল এর বিপরীত যা মুসনাদে আহমদের বর্ণনা থেকে বুঝা যায়। মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় আছে, মু'আযের কাওমের জনৈক ব্যক্তি মহানবী (সা)-এর কাছে এসে অভিযোগ করে বলেন যে, মু'আয দেরী করে আসেন এবং দীর্ঘ কিরা'আত পড়েন।

ফলে নবীজী (সা) হযরত মু'আযকে ডেকে বললেন :

يَا مُعَاذُ لَاتَكُنْ فَتَانًا اِمَّا اَنْ تُصَلِّيْ مَعِيَ وَاِمَّا اَنْ تُخَفِّفَ عَلٰى قَوْمِكَ .

হে মু'আয! লোকজনকে ফিতনায় নিপতিত করবে না। তুমি হয় আমার সঙ্গে নামায পড়ে নিবে নতুবা মুসল্লীদের জন্য নামায হালকাভাবে পড়বে।[১১১] এখানে দেখা যায় যে, মহানবী হযরত মু'আযকে مطلقًا ইমামত করতে নিষেধ করেন নি। বরং দু'টি বিকল্পের কোন একটি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। এক হয়ত মহানবী (সা)-এর সঙ্গে নামায শেষ করে নিবে এবং নিজ এলাকায় গিয়ে পুনঃ ইমামত করবে না। দুই. নয়ত নিজ এলাকায় মুসল্লীদের সাথে হালকা কিরা'আতে ইমামত করবে এবং মহানবী (সা)-এর সঙ্গে নামায পড়বে না।[১১২] মোটকথা মহানবী (সা)-এর পেছনে নামায পড়লে পুনঃ ইমামত করতে নিষেধ করাই ইশারা করছে যে, তিনি মহানবী (সা)-এর সঙ্গে যে ইক্তিদা করতেন সেটি হত তার নফল নামাযের নিয়্যতে ফরয নামাযের নিয়্যতে নয়।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, হযরত মু'আয (রা) মহানবী (সা)-এর পেছনে এশার নামায পড়ে গিয়ে কাওমের এশার নামাযে ইমামত করতেন--বস্তুত ব্যাপারটি এমন ছিল না। আসল ঘটনা ছিল, হযরত মু'আয (রা) মহানবী (সা)-এর পেছনে মাগরিব নামায পড়তেন। আর নিজ কাওমে গিয়ে পড়াতেন এশার নামায। কাজেই নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়ের প্রশ্নই উঠে না। কেননা তিরমিযী (র) বর্ণিত হাদীসে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে ঃ

---

১১০. আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নী, উমদাতুল কারী, খ. ৫, পৃ. ২৩৭।

১১১. মাজমাউয যাওয়ায়িদ, باب من ام الناس فليخفف খ. ২, পৃ. ৭২।

১১২. মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাসান ঃ প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِمْ ۔

হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মাগরিব নামায পড়তেন। তারপর নিজ কাওমে ফিরে এসে তাদের নামায পড়াতেন।[১১৩]

এখানে প্রশ্ন উঠে, যদি এমনই হতো তাহলে হযরত মু'আয (রা) বিলম্ব করে আসতেন এমন অভিযোগ উঠেছিল কেন ? এর জবাবে ফকীহগণ বলেন, আরো অন্যান্য বর্ণনার আলোকে বুঝা যায় যে, হযরত মু'আয (রা) মাগরিব শেষেই চলে আসতেন তা নয় তিনি কিছুক্ষণ মহানবী (সা)-এর খিদমতে অবস্থান করতেন। তাতে কোন কোন সময় দেরীও হয়ে যেত। ফলে এশার নামায পড়ানোর জন্য নিজ কাওমে ফিরে আসতে কখনো কখনো বিলম্ব হয়ে যেত।[১১৪]

হযরত কাশ্মীরীর উপরোক্ত ব্যাখ্যার উপর আরেকটি অভিযোগ হল যে, কোন কোন বর্ণনায় স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা আছে যে, ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّ بِهِمْ تِلْكَ الصَّلٰوةَ তারপর তিনি নিজ কাওমে ফিরে আসতেন এবং তাদের নিয়ে সেই নামাযই আদায় করতেন।[১১৫] এখানে تِلْكَ الصَّلٰوةَ শব্দটি বুঝায় যে, মু'আয (রা) মাগরিব নয় বরং মহানবী (সা)-এর পেছনে এশার নামায পড়ে এসেই ইমামত করতেন। এ অভিযোগের জবাবে হযরত কাশ্মীর (র) বলেন, বস্তুত হযরত মু'আয (রা)-এর সাধারণ আমল ছিল মাগরিবের নামায পড়ে গিয়ে কাওমে এশার নামায পড়ানো। হয়ত কোন একদিন অধিক বিলম্ব হয়ে যাওয়ায় তিনি মহানবী (সা)-এর পেছনে এশাও পড়েন। বর্ণিত হাদীসে ঘটনাক্রমে সূচিত সেই দিনটির কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর সেই দিনটির নামায সম্পর্কে আমরা তিনটি বিকল্প চিন্তা করতে পারি। এক. হয়ত সেই দিন হযরত মু'আয (রা) কাওমে ফিরে গিয়েছেন তবে নামায পড়াননি। এই বিকল্প অনুসারে فَيُصَلِّ بِهِمْ تِلْكَ الصَّلٰوةَ অর্থ হবে (আগের দিন) এ নামাযে তিনি ইমামত করেছিলেন। দুই. নয়ত সেই দিন তিনি কাওমের ইমামত করেছেন। তবে মহানবী (সা)-এর পেছনে ইক্তিদা করে ছিলেন নফলের নিয়্যতে আর নিজে ইমামত করার সময় নামায পড়িয়েছেন ফরযের নিয়্যতে। যদি এ বিকল্প গ্রহণ করা হয় তাতে কোনই আপত্তি থাকে না। তিন. নয়ত তিনি ইক্তদা করেছিলেন ফরযের নিয়্যতে আর ইমামত করেছেন নফলের নিয়্যতে। কিংবা উভয় স্থলেই তিনি ফরযের নিয়্যতে নামায পড়েছেন কিংবা উভয় স্থলেই নফলের নিয়্যতে। তাহলে বলা হবে যে, তৃতীয় বিকল্পের সূরতগুলো একান্ত হযরত মু'আয (রা)-এর নিজস্ব ইজতিহাদ। এগুলোর ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর কোন সমর্থন নেই এবং পাওয়া যায় না। মোটকথা হযরত

---

১১৩ ইমাম তিরমিযী, আস সুনান, রিয়াদ দারুস সালাম, এপ্রিল ১৯৯৯ باب مـــا جـــاء فى الذى يصلى الفريضة ثم يوم الناس بعد ذلك হাদীস নং ৫৮৩, পৃ. ১৫২।

১১৪. মাওলানা তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত। -এ প্রসঙ্গে সহীহ ইবন খুযাইমার বরাত দিয়ে আল্লামা আয়নী হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-এর একখানা হাদীস উদ্ধৃত করেন। সেই হাদীসের নিম্নোক্ত অংশটি লক্ষণীয় ঃ

فقال معاذ يعنى الفتى يتناولنى ولاخبرن النبى ﷺ فلما اخبره يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطول علينا الخ ،
انظر عمدة القارى ج ٥ ، ص : ٢٢٦

১১৫. ইমাম তাহাভী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

মু'আযের হাদীসে নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায় করা হয়েছিল--এ ব্যাখ্যা দাঁড় করানো কঠিন। কাজেই এই হাদীস দ্বারা নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায় কারীর ইক্তিদা দুরস্ত আছে মর্মে দলীল পেশ করা যায় না।[১১৬]

নামাযীর সম্মুখ দিয়ে কোন কিছু অতিক্রম করলে নামায ভঙ্গ হয় না

নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে যাওয়া নাজায়িয।[১১৭] এটি মারাত্মক গুনাহের কাজ। এ কারণে শরী'আতের বিধান হল খোলা মাঠে কিংবা গমনাগমনের সম্ভাব্য স্থানে নামাযে দাঁড়াতে হলে সম্মুখে সুতরা স্থাপন করে নামাযে দাঁড়াবে। সুতরার বাহির দিয়ে হাটা হাটিতে গুণাহ্ হয় না। তবে সুতরাবিহীন অবস্থায় কোন মানুষ কিংবা কোন জীব জন্তু যদি নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে যায় তাহলে নামাযী ব্যক্তির নামাযের কোন ক্ষতি আছে কি না? সে বিষয়ে ফকীহগণের একাধিক মতামত পাওয়া যায়। জমহূর ফুকাহার মতে নামাযীর সম্মুখ দিয়ে কোন কিছু অতিক্রম করলে নামায ভঙ্গ হয় না।

এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীস সমূহ লক্ষণীয়ঃ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ شَىْءٌ وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ .

رواه أبو داؤد ، تحت باب من قال لا يقطع الصلوة شيئ رقم الحديث ٧١٩، ص : ١١٣، قال الامام الزيلعى ورد هذا الحديث عن أربعة من الصحابة فقد روى من حديث ابى سعيد الخدرى ومن حديث ابن عمر ومن حديث أبى امامة ومن حديث انس كما فى نصب الراية ، وأيضًا قال فى سنده مجالد بن سعيد فيه مقال وأخرجه له مسلم مقرونًا بجماعة من أصحاب الشعبى ، انظر نصب الراية ، ج ٢، ص : ٧٦

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, কোন জিনিসের অতিক্রম নামাযকে ভঙ্গ করে দেয় না। তবে তোমরা যথাসাধ্য তা প্রতিহত করবো। কেননা এটি হল শয়তান।[১১৮]

---

১১৬. আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী ঃ মা'আরিফুস সুনান, খ. ৫, পৃ. ১০২।

১১৭. আল্লামা কাসানী (র) বলেন,

يكره للماران يمر بين يدى المصلى لقول النبى ﷺ لو يعلم المار بين يدى المصلى ما عليه من الوزر لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر بين يديه ، ولم يوقت يومًا او شهرًا او سنة ولم يذكر فى الكتاب قدر المرور، واختلف المشائخ فيه قال بعضهم قدر موضع السجود وقال بعضهم مقدار الصفين وقال بعضهم قدر ما يقع بصره على المار لو صدى بخشوع وفيما وراء ذالك لا يكره وهو الاصح ، انظر بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ، دار احياء التراث العربى، بيروت ، ٢٠٠٠، ج ١ ، ص : ٥٠٩

১১৮. ইমাম আবূ দাউদ ঃ আস সুনান, রিয়াদ : দারুস সালাম লিন নাশর ওয়াত তাওযী, এপ্রিল ১৯৯৯, হাদীস নং-৭১৯, পৃ. ১১৩। আরো দ্র. আল্লামা যায়লাঈ, নাসবুর রায়া, খ. ২, পৃ. ৭৬।

www.pathagar.com

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, নামাযের সম্মুখ দিয়ে কোন মানুষ কিংবা কোন জীবজন্তু বা কোন জিনিস অতিক্রম করে গেলে নামাযীর নামায ভঙ্গ হবে না। এটিই ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক (র) প্রমুখ ফকীহগণের অভিমত। এক বর্ণনা মতে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) থেকেও নামায নষ্ট না হওয়ার অভিমত পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকখানা হাদীস বর্ণিত আছে যেমন ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَقَدْ رَاَيْتُمُوْنِيْ مُعْتَرِضَةً بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ يُصَلِّ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ فَضَمَمْتُهَا اِلَيَّ ثُمَّ يَسْجُدُ .

رواه الامام النسائى تحت باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة ، رقم الحديث ١٦٧ ص : ٢٣، وايضا بالرقم : ١٦٦، ورواه أبو داؤد فى باب من قال المرأة لا تقطع الصلوة بالرقم ٧١١، ٧١٣، ٧١٤، ص : ١١٢، والحديث صحيح .

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অবশ্যই তোমরা আমাকে দেখ যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে আড়াআড়িভাবে শোয়া আর তিনি নামাযে রত। তারপর যখন তিনি সিজ্‌দার ইচ্ছা করতেন তখন আমার পায়ে চিমটি দিতেন, অমনি আমি আমার পা নিজের দিকে গুটিয়ে নিতাম। তারপর তিনি সাজ্‌দা করতেন।[১১৯]

وَعَنْ اَبِيْ الصَّهْبَاءِ قَالَ تَذَاكَرْنَا مَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةِ عِنْدَ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ جِئْتُ اَنَا وَغُلَامٌ مِّنْ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلٰى حِمَارٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ ، فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ اَمَامَ الصَّفِّ فَمَا بَالَاهُ وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَدَخَلَتَا بَيْنَ الصَّفِّ فَمَا بَالِي ذٰلِكَ ، رواه الامام أبو داؤد تحت باب من قال الحمار لا تقطع الصلوة ، رقم الحديث ٧١٦، ص : ١١٢، والحديث صحيح .

হযরত আবুস সাহবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা)-এর মজলিসে ما يقطع الصلوة (নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমের দ্বারা নামায ভঙ্গ হওয়া)-এর প্রসঙ্গে কতাবার্তা বলছিলাম। তখন হযরত ইবন আব্বাস (রা) বললেন, একবার আমি ও বানূ আবদুল মুত্তালিব এর জনৈক বালক একটি গাধার পিঠে আরোহন করে আসলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন নামাযরত। অতঃপর বালক নিচে নামল। আমিও নামলাম।

---

১১৯. ইমাম নাসাঈ ঃ আস সুনান, রিয়াদ : দারুস সালাম, মার্চ ১৯৯৯, হাদীস নং-১৬৭, পৃ. ২৩, আরো দ্র. ১৬৬' ইমাম আবূ দাউদ ঃ প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৭১১, ৭১৩, ৭১৪, পৃ. ১১২।

www.pathagar.com

আমরা গাধাটি ছেড়ে রাখলাম (এটি হাটাহাটি করছে) কাতারের সম্মুখ দিয়ে। কিন্তু মহানবী (সা) তাতে কোন পরোয়া করেননি। অতঃপর বানূ আবদুল মুত্তালিবের দুই বালিকা তখন আসে। তারাও কাতারের সম্মুখে প্রবেশ করে। মহানবী (সা)-এরও কোন পরোয়া করেননি।[১২০]

وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِىْ بَارِيَةٍ لَنَا ، وَمَعَهُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَصَلَّى فِىْ صَحْرَاءِ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالَىٰ ذٰلِكَ ،

رواه الامام أبو داؤد تحت باب من قال الكلب لا يقطع الصلوة رقم الحديث : ٧١٨، ص : ١١٢، وسكت عن الكلام والحديث صحيح .

হযরত ফযল ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা আমাদের গ্রামের বাড়িতে ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের এখানে তাশরীফ আনেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হযরত আব্বাস (রা)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন খোলা মাঠে নামায পড়লেন, তাঁর সম্মুখে কোন সুতরা ছিল না। অথচ আমাদের একটি ছোট গাধা ও একটি ছোট কুকুর তখন তাঁর সম্মুখ দিয়ে হাটাহাটি করেছিল এবং তিনি তার কোন পরোয়া করেন নি।[১২১]

উপরোক্ত হাদীসগুলোর সবই বিশুদ্ধ ও দলীলযোগ্য। এগুলো স্পষ্ট নির্দেশ করছে যে, মহিলা কিংবা কুকুর যদি নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে তা হলে তার নামায ভঙ্গ হয় না। যদি ভঙ্গ হত তাহলে মহানবী (সা) অবশ্যই নিজের উপরোক্ত নামাযগুলো পুনরায় পড়ে নিতেন। মোটকথা হল, বর্ণিত হাদীসগুলো একথা প্রমাণ করছে য, নামাযীর সম্মুখ দিয়ে কোন কিছু অতিক্রম করলে নামায ভঙ্গ হয় না। এটিই ইমাম আযম আবূ হানীফা ও জমহূর ফুকাহায়ে কিয়ামের ফাত্ওয়া।[১২২]

উল্লেখ্য যে, এ অধ্যায়ে যে, এ অধ্যায়ে এমন কিছু হাদীসও রয়েছে যেগুলো মূলত ব্যাখ্যা সাপেক্ষ এবং যেগুলোর বাহ্য বক্তব্য থেকে এর বিপরীত নির্দেশ বুঝা যায়। যেমন ঃ

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْطَعُ صَلوٰةَ الرَّجُلِ اِذَا لَمْ تَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَيْدَ اٰخِرَةِ الرَّجُلِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الاَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الاَسْوَدِ مِنَ الاَحْمَرِ مِنَ الاَصْفَرِ مِنَ الاَبْيَضِ ، فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ ! سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِىْ فَقَالَ الْكَلْبُ الاَسْوَدُ شَيْطَانٌ .

رواه أبو داؤد تحت باب ما يقطع الصلوة رقم الحديث : ٧١٢ ص : ١١٠ .

১২০. ইমাম আবূ দাউদ, আস সুনান, প্রাগুক্ত হাদীস নং-৭১৬, পৃ. ১১২।

১২১. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৭১৮, পৃ. ১১২।

১২২ আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী, মা'আরিফুস সুনান, করাচী, মাকতাবা বিন্নৌরিয়্যা, তাবি, খ. ৩, পৃ. ৩৫৫-৩৬০।

www.pathagar.com

হযরত আবূ যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, নামাযীর সম্মুখে যদি হওদার পেছনে অবস্থিত কাষ্ঠ খণ্ডের পরিমাণ (জিনিস সুতরা হিসাবে বিদ্যমান) না থাকে তাহলে গাধা, কাল কুকুর কিংবা মহিলার গমনাগমন নামাযীর নামাযকে নষ্ট করে দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত আবূ যরকে বললাম, সাদা কিংবা হলুদ কিংবা লাল কুকুর না হয়ে কাল কুকুর চিহ্নিত হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন, হে আমার ভ্রাতষ্পুত্র! তুমি আমাকে যেমন প্রশ্ন করেছ আমিও তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছিলেন, কাল কুকুর হল শয়তান।[১২৩]

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ .... قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَاِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ الْحِمَارُ وَالْخِنْزِيْرُ وَالْيَهُوْدِيُّ وَالْمَجُوْسِيُّ وَالْمَرْأَةُ ، وَيَجْزِئُ عَنْهُ اِذَا مَرُّوْا بِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلٰى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ .

رواه أبو داؤد تحت باب ما يقطع للصلوة رقمه ٧٠١٤، ص : ٧١١، لم اسمع هذا الحديث الا من محمد بن اسماعيل واحسبه وهم لانه كان يحدثنا من حفظه .

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন সুতরা ছাড়া নামাযে দাঁড়ায় তখন তার নামায ভেঙ্গে দেয় কুকুর, গাধা, শূকর, ইয়াহূদী, অগ্নিপূজক কিংবা মহিলা (-এর গমনাগমন)। মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে চলতে হলে তার সামনে অন্তত পাথরের একটি কোন্ (টুকরা) হলেও থাকা চাই।[১২৪]

উল্লেখিত দু'টো হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, নামাযীর সম্মুখ দিয়ে কোন কিছু অতিক্রম করে গেলে তাতে নামাযীর নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। এ অভিমতই গ্রহণ করেছেন ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) এবং কতিপয় আহলে যাহির উলামা। তাদের মতে গাধা, কাল কুকুর ও মহিলার গমন দ্বারা নামায নষ্ট হয়ে যায়।

জমহূর ফকীহগণ হাদীসদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত শেষোক্ত হাদীস ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁর সুনান গ্রন্থে উল্লেখ করলেও এটি দলীলযোগ্য নয়। কারণ হাদীসটির মৌলিকত্ব সম্পর্কে ইমাম আবূ দাউদ (র) স্বয়ং আপত্তি উত্থাপন করেছেন। আর প্রথমোক্ত হাদীস সম্পর্কে জমহূরের বক্তব্য হল যে, এখানে يَقْطَعُ অর্থ নামায ভেঙ্গে দেওয়া নয় বরং নামাযের মনোযোগিতা নষ্ট করা। এ ব্যাখ্যা অনুসারে পূর্বোক্ত হাদীসগুলোর সঙ্গে এ হাদীসের কোন বিপরীত্য অবশিষ্ট থাকে না।

প্রশ্ন উঠে যে, মনোযোগিতা যে কোন জিনিসের গমনাগমণ দ্বারাই নষ্ট হয়। তাহলে হাদীসে তিনটি জিনিস (মহিলা, গাধা, কাল কুকুর) কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ কি?

১২৩. ইমাম আবূ দাউদ, আস সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৭১২, পৃ. ১১০।

১২৪. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৭১৪, পৃ. ৭১১।

www.pathagar.com

এ প্রশ্নের ব্যাখ্যায় জমহূর ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, উল্লেখিত তিনটি জিনিসের মধ্যে শয়তানের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান থাকে। যেমন তিরমিযী গ্রন্থের হাদীসে আছে اَلْكَلْبُ الاَسْوَدُ شَيْطَانٌ কাল কুকুর শয়তান,[১২৫] মহিলাদের ব্যাপারে আছে اَلنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ (বেপর্দা) মহিলারা শয়তানের জাল।[১২৬] গাধা সম্পর্কে আছে اِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللهِ فَاِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا তোমরা যখন গাধার চিৎকার ধ্বনি শুনবে তখন আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাইবে। কারণ গাধাটির নজরে তখন শয়তান থাকে।[১২৭] মোটকথা এ তিনটি জিনিসের সাথে শয়তানের সবিশেষ প্রভাব বিদ্যমান আছে বলেই নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম সংক্রান্ত হাদীসে তিন জিনসকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

জামা'আতে মহিলাদের শরীক হওয়া মাকরূহ

মহিলাদের জন্য মসজিদ কিংবা ঈদগাহের জামা'আতে শরীক হওয়ার বিধান আলোচনার পূর্বে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা হিসাবে ইসলামে পর্দা-পুশিদার গুরুত্ব কতখানি তার কিঞ্চিত আলোচনা আবশ্যক। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক বালিগ মুসলমান নর-নারীর উপর পর্দার বিধান মেনে চলা ফরয। পর্দহীনতা সম্পূর্ণ হারাম ও কবীরা গুণাহ। মহানবী (সা) স্পষ্ট ইরশাদ করেছেন পর্দাশীলতা ও লজ্জা ঈমানের অঙ্গ[১২৮]। এ অঙ্গের বিদ্যমানতা ইসলামী জীবন যাত্রার রক্ষণকবচ। কোন কারণে এই অঙ্গে হানি ঘটলে মানুষ বেয়াড়া ও অশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তখন তার কাছে হালাল-হারাম, জায়িয নাজায়িয, উচিৎ-অনুচিৎ সব কাজই এক রকম হয়ে যায়। মানুষের জীবন পদ্ধতি এবং পশুর জীবন পদ্ধতির মধ্যে ব্যবধান হল, পর্দা।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۔

"(হে রাসূল!) মু'মিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। এটিই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।" (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩০) আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ الخ ۔

---

১২৫. ইমাম তিরমিযী, আল জামি باب ما جاء انه لا يقطع الصلوة الا الكلب والحمار والمرأة ।

১২৬ মিশকাতুল মাসাবীহ, الفصل الثالث من كتاب الرقاق فى حديث حذيفة খ. ২, পৃ. ৪৪৪।

১২৭. সহীহ মুসলিম ঃ كتاب الذكر والدعاء والتوبة ، باب استحباب الدعاء عند صباح الديك, খ. ২, পৃ. ৩৫১।

১২৮. ইমাম বুখারী, আস সহীহ্, রিয়াদ, দারুস সালাম লিন নাশর ওয়াত তাওযী, মার্চ, ১৯৯৯, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ২৪, পৃ. ৭; আরো দ্র. হাদীস নং ৬১১৮।

www.pathagar.com

"(হে রাসূল!) মু'মিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে ও লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন (শরীরের) যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে। তারা যেন নিজেদের গ্রীবা ও বক্ষ মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখে।" (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩০)

পর্দা রক্ষা করে চলার বিষয়ে মহানবী (সা)-এর হাদীসেও বহু তাকীদ করা হয়েছে। যেমন,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابُ رِقَاقُ فَاَعْرَضَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ يَا اَسْمَاءَ اِنَّ الْمَرْاَةَ اِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضِ لَمْ يُصْلَحْ لَهَا اَنْ يُرٰى مِنْهَا اِلاَّ هٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى وَجْهِهٖ وَكَفَّيْهِ ،

أخرجه أبو داؤد تحت باب فيما تبدى المرأة من زينتها رقم الحديث ٤١٠٤ ، ص : ٥٧٨ وقال أبو داؤد هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة وأيضًا سعيد بن بشير ليس بالقوى ،

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন, তাঁর ছোট ভগ্নি) হযরত আসমা বিনত আবূ বাকর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে আগমন করেন। তখন তার পরনে ছিল পাতলা পোশাক। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, হে আসমা! নারী যখন বালিগা হয়ে যায় তখন তার শরীরের এই এই অংশ ব্যতিরেকে অন্য কিছু প্রদর্শিত হওয়া ঠিক নয়। এই এই বলে মহানবী (সা) নারীদের মুখমণ্ডল ও তালুদ্বয়কে বুঝিয়েছেন।[১২৯]

পর্দা রক্ষার এই আবশ্যকতার নিরিখেই ইসলাম নারী ও পুরুষের জন্য বিশেষ যে সব বিধান নির্ণয় করেছে তন্মধ্যে আছে, নারীরা যথাসম্ভব নিজেদের শরীর ও সৌন্দর্য পুরুষের দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখবে। কখনো তা প্রদর্শিত করবে না। তাদের কণ্ঠস্বরও সতরের অন্তর্ভুক্ত। বাহিরাঙ্গনের বল্গাহীন পরিবেশ তাদের আত্মমর্যাদার আদৌ উপযোগী নয়।

নারী-পুরুষের পারস্পরিক দৃষ্টির ব্যাপারে মহানবী (সা) ইরশাদ করেন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ نَصِيْبُهُ مِنَ الزِّنٰى مُدْرِكٌ ذٰلِكَ لاَ مُحَالَةَ ، الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالاُذْنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَا مَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوٰى وَيَتَمَنّٰى وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ اَوْ يُكَذِّبُهُ .

১২৯. ইমাম আবূ দাউদ আস সুনান, রিয়াদ, দারুস সালাম লিন নাশর ওয়াত তাওযী, এপ্রিল ১৯৯৯, হাদীস নং ৪১০৪, পৃ. ৫৭৮।

www.pathagar.com

أخرجه الامام النبوى فى رياض الصالحين رقمه ١٦٢٠، ص : ٦٢٢، وقال الحديث متفق عليه وهذا لفظ مسلم ورواية البخارى مختصرة .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা)-ইরশাদ করেছেন। আদম সন্তানের উপর ব্যভিচারের একটি অংশ লিপিবদ্ধ করা আছে। তাকে এ অংশটির সম্মুখীন হতেই হয়। চক্ষুদ্বয়-এগুলোর ব্যভিচার হল দৃষ্টি, কর্ণদ্বয়ের যিনা হল শ্রবণ, জিহ্বার যিনা হল অশ্লীল কথা বলা, হস্তদ্বয়ের ব্যভিচার হল হস্তক্ষেপ করণ, পায়ের ব্যভিচার হল পদচারণা আর মনের কাজ হল ইচ্ছাপোষণ ও আকাংখা করা। লজ্জাস্থান সেই জিনিষকে বাস্তবে রূপায়িত করে কিংবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।[130]

মহিলারা সাজসজ্জা করে গৃহ থেকে বের হওয়াকে মহানবী (সা) খুবই অপছন্দ করেছেন। একখানা হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرْهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَاَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءَ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤُسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَاِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا كَذَا .

أخرجه الامام النووى تحت باب تحريم تشبة الرجال بالنساء والنساء بالرجال فى لباس وحركة على ذلك رقم الحديث ١٦٣١ ص : ٣٦٥، وقال الحديث رواه الامام مسلم رقمه ٧١٩٤-٥٥٨٢

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, যারা জাহান্নামে যাবে এমন মানুষের দু'টি দল শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবে যাদেরকে এখনো আমি দেখিনি। তন্মধ্যে একটি হল, এমন দল (গুণ্ডাশ্রেণী) যাদের সঙ্গে থাকবে চাবুক। এর দ্বারা মানুষকে অহেতুক প্রহার করবে ও কষ্ট দিবে। তন্মধ্যে অপর দলটি হল, বেহায়া মহিলা শ্রেণী যারা পোষাক পরেও থাকবে উলঙ্গ, যারা পুরুষদেরকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করবে এবং নিজেরাও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। যাদের মাথার বেণী হবে উটের পিঠের উঁচু হাড় বা কুঁজের ন্যায় এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ এত এত দূর থেকেও পাওয়া যাবে।[131]

১৩০. মুহীউদ্দীন আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহ্ইয়া ইবন শরফ আন নববী, রিয়াদুস সালিহীন, দেওবন্দ ঃ মাকতাবা থানবী, তাবি, হাদীস নং-১৬২০ পৃ. ৬২২ ; ইমাম মুসলিম, আস সহীহ, রিয়াদ ঃ দারুস সালাম লিন নাশর ওয়াত তাওযী, জুলাই, ১৯৯৮, হাদীস নং ৬৭৫৪, পৃ. ১১৫৭।

১৩১. ইমাম নববী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৬৩১, পৃ. ২৬৫; ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৫৮২, পৃ. ৯৫১, আরো দ্র. ৭১৯৪, পৃ. ১২৩৮।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে শুধুমাত্র যে পর্দা পুশিদা রক্ষার হুকুম পাওয়া যায় তাই নয় বরং মহিলাদের বহির্গমন ও নিরুৎ সাহিত করে। মহিলাদের বহির্গমনে নিরুৎসাহিত করার জন্য ইসলাম নিজ বিধানের বহু ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে মহিলার তারতম্য করে দিয়েছে। যেন মহিলারা নিজ অবস্থানস্থলে সসম্মানে নিরাপদ থাকে, বহির্গমনের প্রয়োজনই না হয়। পর্দা-পুশিদার ব্যাপারে ইসলামের এই দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে মসজিদ কিংবা ঈদগাহের জামা'আতে মহিলাদের শরীক হওয়ার মাস'আলা এখন আলোচনা করা যেতে পারে।

মহিলাদের জন্য কোথাও নামায পড়া উত্তম এমর্মে মহানবী (সা) থেকে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন ঃ

عَنْ اُمِّ حُمَيْدٍ امْرَاَةِ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهَا جَاءَتْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُحِبُّ الصَّلٰوةَ مَعَكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّكِ تُحِبِّيْنَ الصَّلٰوةَ مَعِىْ وَصَلَاتُكِ فِىْ بَيْتِكِ خَيْرٌ مِّنْ صَلَاتِكِ حُجْرَتِكِ فَصَلَاتُكِ فِىْ حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِّنْ صَلَاتِكِ فِىْ دَارِكِ ، فَصَلَاتُكِ فِىْ دَارِكِ خَيْرٌ مِّنْ صَلَاتِكِ فِىْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ، فَصَلَاتُكِ فِىْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٍ مِّنْ صَلَاتِكِ فِىْ مَسْجِدِىْ ، قَالَ فَاَمَرَتْ فَبُنِىَ لَهَا مَسْجِدٌ فِىْ اَقْصٰى شَىْءٍ مِّنْ بَيْتِهَا وَاَظْلَمِهِ وَكَانَتْ تُصَلِّىْ فِيْهِ حَتّٰى لَقِيَتِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ .

أخرجه ابن أبى شيبه فى مصنفه ٤/٣٨٤-٣٨٥، وأحمد فى المسند ٦/٣٧١ ورجاله رجال الصحيح ، كما فى المجمع ٢/٣٣-٣٤، فاصحه ابن خزيمة برقم ١٦٨٩ ، وابن حبان قرقم : ٣١٧، وقد ذكره الامام المنذرى فى الترهيب رقمه : ٥٠٢، ص : ٧١

আবূ হুমায়দ আস সাঈদীর স্ত্রী হযরত উম্মে হুমায়দ (রা) মহানবী (সা)-এর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার সঙ্গে নামায পড়তে আমার খুবই ইচ্ছা করে। মহানবী (সা) বললেন, হ্যাঁ, জানি আমার সঙ্গে (মসজিদে জামা'আতে শরীক হয়ে) নামায পড়তে তুমি খুবই ভালবাস। তবে বাস্তব অবস্থা হল এই যে, তোমার জন্য বিশেষ কামরায় নামায পড়া অনেক বেশী মূল্যবান ঘরে নামায পড়ার তুলনায়। আবার ঘরে নামায পড়া অনেক বেশি মূল্যবান বাড়িতে নামায পড়ার তুলনায়। আবার বাড়িতে নামায পড়া অনেক বেশি মূল্যবান মহল্লার মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার তুলনায়। আবার মহল্লার মসজিদে নামায পড়া অনেক বেশি মূল্যবান আমার পেছনে মসজিদে নববীতে নামায পড়ার তুলনায়। বর্ণনাকারী বলেন, তখন হযরত উম্মে হুমায়দ (রা) নিজ পরিবারের লোকজনকে হুকুম করলেন তার জন্য ঘরের

www.pathagar.com

শেষ কোণে অন্ধকার অংশে নামাযের স্থান তৈরি করে দিতে। ফলে ইন্তিকাল অবধি তিনি সেখানেই নামায পড়েন।[১৩২]

এ হাদীসের নিরিখে ফকীহগণ বলেন, জামা'আতের সাথে নামায পড়া এবং মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার যে বিধান ও ফযীলতের কথা বলা আছে সেটি একান্তই পুরুষদের জন্য। মহিলাদের জন্য তা প্রযোজ্য নয়। পুরুষ কোন নামায ঘরের ভিতর একাকী আদায় করলে একটি নামাযের সাওয়াব দেওয়া হয়। আর এই নামাযই সে মসজিদে জামা'আতের সাথে আদায় করলে সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াব পায়। এ বিধান নারীদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। মহিলা কোন নামায মসজিদে জামা'আতের সাথে আদায় করলে হয়ত নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে তবে সে অন্যদের ন্যায় সাতাশ গুণ সাওয়াব পাবে না, একটি নামাযের সাওয়াবই পাবে। অথচ এই নামায সে ঘরের অভ্যন্তরে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে একাকী আদায় করলে এক নামাযের বিনিময়ে পঞ্চাশ হাজার নামাযের চেয়েও বেশি নামায আদায়ের সাওয়াব লাভ করবে। মহিলাদের জন্য ঘরের কোণে নামায পড়া মসজিদে নববীতে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম বলেই মহানবী (সা) হযরত উম্মে হুমায়দ (রা)-কে তার প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও মসজিদে আসতে উৎসাহিত করেন নি।

অপর হাদীসে আছে ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِىْ بَيْتِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِىْ حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِىْ مُخْدَعِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِىْ بَيْتِهَا .

أخرجه الامام أبو داؤد فى كتاب الصلوة برقم ٥٧٠ وابن خزيمة ٩٥/٣ فى صحيحه وتردد فى سماع قتادة هذا الخبر من مورق ، ذكره الامام المنذرى فى الترغيب والترهيب رقمه ٥٠٨ ، ص : ٧٢

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা) ইরশাদ করেছন, মহিলার ঘরে নামায পড়ার চেয়ে কামরার ভিতরে গিয়ে নামায পড়া উত্তম। আবার কামরার ভিতরে নামায পড়ার চেয়ে নিজের একান্ত বিশেষ কুঠরিতে নামায পড়া উত্তম।

وَعَنْ اَبِىْ عُمْرِو الشَّيْبَانِىْ اَنَّهُ رَاَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يُخْرِجُ النِّسَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقُوْلُ اُخْرُجْنَ اِلٰى بُيُوْتِكُنَّ خَيْرٌ لَكُنَّ ، أخرجه

---

১৩২. হাফিয যাকীউদ্দীন আবদুল আযীয আল মুনযিরী, আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ইবন হাযাম, ২০০১, হাদীস নং ৫০৩, পৃ. ৭১। হাফিয মুনযিরী (র) হাদীসখানা বর্ণনার পর বলেন,

قد بوب عليه ابن خزيمة باب اختيار صلوة فى حجرتها فى دارها وصلاتها فى مسجد قومها على صلاتها فى مسجد النبى ﷺ وان كانت صلاة فى مسجد النبى ﷺ تعدل الف صلاة فى غيره من المساجد والوكيل على ان قول النبى ﷺ صلاة فى مسجد فى هذا افضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد ، انما اراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء ، هذا كلامه .

www.pathagar.com

الطبرانی فی الکبیر باسناد لا باس به ، وأخرجه الامام المنذری برقم : ٥١١ ، ص : ٧٢

হযরত আবূ আমর আশ্ শায়বাণী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে দেখেছেন যে, তিনি শুক্রবারে জুমু'আর জন্য আগত মহিলাদেরকে মসজিদ থেকে এ কথা বলে বের করে দিতেন যে, তোমরা বেরিয়ে নিজ নিজ ঘরে চলে যাও। ঘরের ভিতর নামায পড়া তোমাদের জন্য অধিকতর উত্তম।[১৩৩]

উপরোক্ত হাদীসগুলোর নিরখে আলিমগণ বলেন, মহিলারা মসজিদে গিয়ে জামা'আতে শরীক হবে না। তারা ঘরের অন্দর মহলে নামায আদায় করবে। মালিকুল উলামা আল্লামা কাসানী (র) বলেন, মহানবী (সা)-এর হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মহিলারা অন্দর মহল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসলে শয়তান তাদের মনের ভিতর ও দর্শনকারী পুরুষদের মনের ভিতর নানা কুমন্ত্রণার উদ্রেক করে থাকে এবং বিভিন্ন রকমের বিপর্যয় ঘটায়। বিপর্যয় ঘটানো নিষিদ্ধ বিধায় এ সব ফিতনা ও বিপর্যয়ের অনিবার্য কারণগুলোও নিষিদ্ধ। তাই জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য মহিলাদের জন্য বহির্গমন করা মাকরূহে তাহরীমী। এটিই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও হানাফী ফকীহগণের ফাতওয়া ও চূড়ান্ত অভিমত।[১৩৪]

তবে এ অধ্যায়ে কয়েকটি হাদীস এমনও পাওয়া যায় যার আলোকে মহিলাদের জন্য জামা'আতে শরীক হওয়ার অনুমতি বুঝা যায়। যেমন ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَائُكُمْ بِاللَّيْلِ اِلَى الْمَسْجِدِ فَاْذَنُوْا لَهُنَّ .

أخرجه الامام البخاری تحت باب خروج النساء الی المساجد باللیل والغلس رقمه : ٨٦٥ ص : ١٤٠ ، وأیضا بالرقم ٨٧٣-٨٩٩-٩٠٠-٥٢٣٨

وقال الامام تابعه شعبه عن الاعمش عن مجاحد عن ابن عمر .

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মহিলারা যদি রাত্রিকালে মসজিদে গমনের জন্য তোমাদের কাছে অনুমতি চায় তাহলে তোমরা তাদেরকে অনুমতি দিও।[১৩৫]

---

১৩৩. ইমাম আবূ দাউদ, আস সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং ৫৭০, পৃ. ৯৪; ইবন খুযায়মা খণ্ড. ৩, পৃ.৯৫; হাফিয মুনযারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫০৮, পৃ. ৭২।

১৩৪. ইমাম আল মুনযারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫১১, পৃ. ৭২।

১৩৫. আল্লামা কাসানী, বাদাইউস সানায়ি' ফী তারতীবিশ শারাঈ, বায়রূত, দারু ইহয়ায়িত তুরাস আল আরাবী, ২০০০, খণ্ড. ১, পৃ. ৬১৭; আরো দ্র. ফাতাওয়া দারুল উলূম, খণ্ড. ৩, পৃ. ৪৯; আযীযুল ফাতাওয়া, খণ্ড. ১, পৃ. ২১৯; ফাতাওয়া শামী, খণ্ড ১, পৃ. ৫২৯; আহসানুল ফাতাওয়া, খণ্ড. ৩, পৃ. ২৮৩; শামী গ্রন্থে বলা হয়েছে :

قال فی شرح التنویر ویکره حضور هن الجماعة ولو لجمعة وعید ووعظ مطلقا ولو عجوزًا لیلاً علی المذهب المفتی به لفساد الزمان ، در المختار ج ١ ، ص : ٥٢٩

www.pathagar.com

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِيْ طَبَاعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيْلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِيْنَ وَقَدْ تَعْلَمِيْنَ اَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذٰلِكَ وَيَغَارُ فَقَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ اَنْ يَنْهَانِيْ قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ .

أخرجه الشافعي في مسنده ١/١٢٧ وعبد الرزاق في مصنفه بالرقم ٥١٢١ وأحمد في المسند ٢/٥٢٧ وابن أبي شيبه في مصنفه ٢/٣٨٣٨ والدارمي في سننه ١/٢٩٣ وصححه ابن خزيمة برقم ١٦٨٩ وابن حبان برقم ٢٢١٤ عن أبي هريرة رضي الله عنه برقم ٢٢١١ عن زيد بن خالد مرفوعًا وأخرجه البخاري في صحيحه برقم ٩٠٠ ومسلم في صحيحه برقم ٩٩٠ مختصرًا .

হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা)-এর জনৈকা স্ত্রী ফজর ও এশার নামাযে মসজিদে গিয়ে জামা'আতে শরীক হত। তখন তাকে বলা হল যে, তুমি ঘর থেকে বের হও কেন ? অথচ তুমি জান যে, উমর এটি পছন্দ করেন না এবং এটিকে আত্মমর্যাদার পরিপন্থী মনে করেন। স্ত্রী বলল, তাহলে আমাকে সরাসরি নিষেধ করতে তাকে কে বারণ করল। আপত্তি উত্থাপনকারী জবাব দিলেন, উমরকে নিষেধ করা থেকে বারণ করে রেখেছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বাণীটি" তোমরা আল্লাহ্র দাসীদেরকে মসজিদে গমন করা থেকে নিষেধ করো না।"[১৩৬]

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, মহিলাদের জন্য মসজিদের জামা'আতে শরীক হওয়ার অনুমতি আছে। তাছাড়া এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর যুগে মহিলারা মসজিদে গিয়ে জামা'আতে শামিল হতেন। তাদের মসজিদে গমন ও প্রবেশের সুবিধার্থে মহানবী (সা) পৃথক দরজার ব্যবস্থাও করে দিয়ে ছিলেন। অধিকন্তু ইরশাদ করেন যে, নারীরা প্রশস্ত চাদরে নিজেকে আবৃত করে আপদ-মস্তক ঢেকে যেন মসজিদে উপস্থিত হয় এবং নামাযের পরে এভাবে যেন বাড়ি ফিরে যে, তাকে চেনা যায় না। মসজিদে গমনের প্রয়োজন তাদেরকে ঘরের বাইরে আসতে হত বিধায় মহানবী (সা) সেই সময় তাদের কোন প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করতে নিষেধ করেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَهِدَتْ اَحْدٰتكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمُسَّ طِيْبًا ، أخرجه الامام مسلم في

---

১৩৬. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৮৭৩, ৮৯৯, ৯০০, ৫২৩৮।

www.pathagar.com

صحيحه تحت باب خروج النساء الى المساجد اذا لم يترتب عليه فتنة وانها لا تخرج مطيبة رقم الحديث ٩٩٧ ، ص : ١٨٧ وايضا بالرقم : ٩٩٦ ،

আবদুল্লাহর স্ত্রী হযরত যায়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে বলেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা করে তখন সে যেন কোন ধরনের সুগন্ধি শরীরে না লাগায়।[১৩৭]

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ ، أجرجه الامام البخارى فى صحيحه تحت انتظار الناس قيام الامام العالم ، رقم الحديث ٨٦٧ ، ص : ١٤٠ وايضا برقم : ٤٧٢

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামায শেষ করতেই মহিলারা বড় চাদরে নিজেদেরকে জড়িয়ে মসজিদ থেকে বাড়ির দিকে ফিরতেন। তখন অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেত না।[১৩৮]

وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِيْنَ يَقْضِىْ تَسْلِيْمَهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِىْ مَقَامِهِ يَسْرًا قَبْلَ اَنْ يَّقُوْمَ قَالَ نَرٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اَنَّ ذٰلِكَ كَانَ لِكَىْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ اَنْ يُدْرِكُهُنَّ اَحَدٌ مِّنَ الرِّجَالِ ، أخرجه الامام البخارى فى صحيحه تحت باب صلاة النساء خلف الرجال ، رقم الحديث ٨٧٠ ، ص : ١٤٠

হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সালাম ফিরাতেন তখন সালাম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহিলারা দাঁড়িয়ে যেতেন। তবে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে উঠার আগে স্বস্থানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন। তিনি বলেন, আমাদের ধারণা আল্লাহই ভাল জানেন মহানবী (সা) এমনটি এ জন্য করতেন যেন পুরুষেরা তাদেরকে রাস্তায় পাওয়ার পূর্বেই তারা বাড়ি ফিরে যেতে পারে।[১৩৯]

এ হাদীসগুলো থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, নবী যুগে মহিলারা মসজিদে গিয়ে জামা'আতে শরীক হতেন। ইমাম শাফিঈ (র) নবী যুগে মহিলাদের মসজিদে গমন বিষয়ক হাদীস ও ইতোপূর্বে উল্লেখকৃত মহিলাদেরকে মসজিদে গমনের অনুমতি প্রদান মর্মে মহানবী (সা)-এর আদেশ বিষয়ক হাদীসের আলোকে বলেন, মহিলাদের জন্য মসজিদের জামা'আতে

১৩৭. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৯০০ পৃ, ১৪৪ ; ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৯৯০, পৃ. ১৮৬।

১৩৮. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৯৯৭, পৃ. ১৮৭, আরো দ্র. হাদীস নং ৯৯৬, পৃ. ১৮৭।

১৩৯. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৮৬৭, পৃ. ১৪০, আরো দ্র. হাদীস নং ৩৭২, পৃ. ৬৬।

www.pathagar.com

গিয়ে শরীক হওয়া মাকরূহ নয় বরং মুবাহ। এর কাছাকাছি বক্তব্য ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকেও বর্ণিত আছে। তাঁরা বলেন, কোন মহিলা যদি এমন বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে যায় যে, তার বাইরে গমনাগমন ফিতনার কারণ হয় না এমন বৃদ্ধাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে আদায় করার অনুমতি আছে। তবে যারা বৃদ্ধা নয় তাদের জন্য মাকরূহ তাহরীমী। মোটকথা সাহিবাইন উপরোক্ত হাদীসগুলোকে বৃদ্ধাদের জন্য প্রযোজ্য বলে মনে করেন। ইমাম মালিক (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনিও উপরোক্ত হাদীসগুলোকে বৃদ্ধাদের জন্য প্রযোজ্য বলে অভিমত দিয়েছেন। এক মতানুসারে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেছেন যে, لا بأس للعجوزة ان تخرج فى الفجر والمغرب والعشاء بوجه حصول الامن বৃদ্ধ মহিলাদের জন্য ফজর, মাগরিব ও এশার জামা'আতে শরীক হতে কোন আপত্তি নেই।[১৪০] কেননা এ সময়গুলো নিরাপদ সময়। অতএব যারা বৃদ্ধা নয় তাদের জন্য এবং বৃদ্ধাদের জন্যও যুহর আসরের সময় জামা'আতে শরীক হওয়া মাকরূহ। তবে মুতাআখ্খিরীনে হানাফিয়া ও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অপর মত অনুসারে বৃদ্ধা কিংবা যুবতী কারোর জন্যই অনুমতি নেই। সকলের জন্যই ঘর ছেড়ে বের হয়ে জামা'আতে শরীক হওয়া মাকরূহ তাহরীমী।[১৪১] আর এটিই হানাফী মাযহাবের গৃহীত ফাতওয়া।

মুহাক্কিকীন ও মুতাআখ্খিরীনে আহনাফ ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দান ও নবীযুগে মহিলারা মসজিদে জামা'আতে শরীক হওয়ার কারণ ছিল আহকামে শরী'আতের শিক্ষা লাভ করা। তৎকালে এই মসজিদেই ছিল শিক্ষা লাভের একমাত্র মাধ্যম। বর্তমান যুগে আহকামে শরী'আতের শিক্ষা গ্রহণের আরো অনেক মাধ্যম চালু আছে। মসজিদে গমন না করেও মহিলাদের জন্য ইলমে দীন শিখার সুযোগ বর্তমানে রয়েছে। দীন শিখতে চাইলে নিজ ঘরের অভ্যন্তরে পর্দা-পুশিদা ও দীনদারী রক্ষা করেও দীন শিখা সম্ভব। মোটকথা নবী যুগে দীন শিখার জন্য মসজিদে গমন ব্যতিরেকে অন্য কোন বিকল্প না থাকায় বাইরে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তাই বর্তমানে অন্য বিকল্প বিদ্যমান থাকায় সেই অনুমতি আপনা থেকেই রহিত হয়ে গিয়েছে।

মুহাক্কিকীন উলামায়ে কিরাম আরো বলেন, মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দান বিষয়ক হাদীসগুলো ছিল ইসলামের প্রথম যুগের। তখন পর্দার হুকুম নাযিল হয়নি এবং মসজিদে গমন তাদের জন্য ছিল মুবাহ। কেননা সে আমলে সামাজিক অবস্থান ভাল ছিল। কোন বেগানার প্রতি কুদৃষ্টি আরোপের মত নোংরা পরিবেশ ছিল না। পরবর্তী সময়ে পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার কারণে এবং সামাজিক পরিস্থিতি ক্রমে অবনতির দিকে চলে যাওয়া জরূরতের কারণে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।[১৪২]

এ ব্যাপারে সবচেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা হল যে, মহানবী (সা) তাঁর মুবারক যুগে মহিলাদেরকে মসজিদে আসার অনুমতি দিয়েছেন। প্রশ্ন হল তবে মহানবী (সা) কখনো তাদেরকে মসজিদে আসতে উৎসাহিত করে ছিলেন কি না? এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, নবী (সা) তাদেরকে

---

১৪০. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৮৭০, পৃ. ১৪০।

১৪১. মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাসান, তানযীমুল আশতাত, চট্টগ্রাম, আল হেলাল প্রকাশনী, তবি, খণ্ড ১, পৃ. ৩৭৮।

১৪২ প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

কখনো উৎসাহিত করেন নি বরং বিভিন্নভাবে মসজিদে আসা থেকে নিরুৎসাহিত করে গিয়েছেন। যেমন তাদের জন্য তাদের গৃহকোণই হল নামাযের উত্তম স্থান, ঘরের অন্ধকার কোনে নামায আদায় করা শুধু জামে মসজিদ কেন মসজিদে নব্বীতে নামায পড়ার চেয়েও বেশি উত্তম ইত্যাদি বলে বস্তুত তাদেরকে মসজিদে আসার প্রতি অনুৎসাহিত করা হয়েছে। তারপরেও সেই যুগে যতটুকু অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সেটি দেওয়া হয়েছিল তৎকালে পরিবেশগত ফিতনা-ফাসাদ কম থাকার কারণে। তৎকালে ফিতনা ফাসাদ কম ছিল তারপরেও মসজিদে আসার ক্ষেত্রে রাত্র কালে আসা, অন্ধকারে আসা, সর্বশেষ কাতারে দাড়ানো, সালাম ফিরানোর সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের আগেই চলে যাওয়া ইত্যাদি বহু শর্ত আরোপিত ছিল। যা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, নবী (আ) তাদেরকে জরুরতের কারণে মসজিদে আসতে অনুমতি দিলেও মহানবী (সা)-এর মনের আসল ইচ্ছা হল তাদের মসজিদে না আসা, বরং গৃহকোণে নামায আদায় করা।

নবীযুগের পর থেকে ক্রমে সামাজিক অবনতি ঘটতে থাকলে ফিতনা ফাসাদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তখন সাহাবা যুগ থেকে দীনদার মহিলারা সেই ফাসাদের কারণে মসজিদে গমন বন্ধ করে দেন। সাহাবায়ে কিরাম ফিতনার আশংকা দেখে মহিলাদের মসজিদে গমন অপছন্দ করতেন। হযরত উমর (রা) তো এ ব্যাপারে তাদেরকে নিষেধ করে দিতেন। বিষয়টি নিয়ে কিছু মহিলা হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট নালিশ জানালে হযরত আয়েশা (রা) হযরত উমর (রা)-এর অভিমত সমর্থন করেন। নালিশকারীনীদের কথায় কোনই পাত্তা দেননি।

এ মর্মে স্বয়ং হযরত আয়েশা (রা)-এর একটি বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَوْ اَدْرَكَ النَّبِىُّ ﷺ مَا اَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نَسَاءُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ اَوْ مُنِعْنَ قَالَتْ نَعَمْ ، أخرجه الامام البخارى فى صحيحه تحت باب خروج النساء الى المساجد بالليل والغلس رقم الحديث ٨٦٩ ، ص : ١٤٠ ، وأخرجه الامام مسلم فى صحيحه برقم ٩٩٩ ، ص : ١٨٧

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহিলারা বর্তমানে যেই চরিত্রের সৃষ্টি করেছে যদি তা মহানবী (সা) দেখতেন তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করে দিতেন। যেভাবে বনী ইসরাঈলের মহিলাদেরকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনাকারীনী 'আম্‌রাহ' (عمرة)-কে বললাম, তবে কি তাদেরকে (অনুমতি দানের পর) নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[১৪৩]

হযরত উমরের এক স্ত্রী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি মসজিদে গিয়ে জামা'আতে শরীক হতেন। বিষয়টি হযরত উমরের দৃষ্টিতে আদৌ পছন্দনীয় ছিল না। হযরত উমর (রা) স্পষ্ট বাক্যে স্ত্রীকে মসজিদে যেতে নিষেধ করেননি তবে একটি কৌশল অবলম্বন করলেন, যাতে মুখে বাধা দিতে না হয় আর স্ত্রী নিজ থেকেই বিরত হয়ে যান। কৌশলটি ছিল একদা রাতের বেলায় অবস্থা অন্ধকার ছিল। তাঁর স্ত্রী মসজিদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলেন। স্ত্রীর

১৪৩. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

আপাদমস্তক চাদর আবৃত ছিল এবং চাদরের একাংশ পেছনে মাটিতে ঝুলছিল। হযরত উমর (রা) চুপিসারে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়ান এবং ঝুলন্ত চাদরের অংশে হঠাৎ পা দিয়ে চাপ দিয়ে পেছনের দিকে দ্রুত চলে গেলেন। স্ত্রী পেছনের দিকে তাকিয়েছেন কিন্তু অন্ধকারের দরুন চিনতে সক্ষম হননি। ফলে মনে মনে খুব পেরেশান হয়ে গেলেন। তারপর ঘরে ফিরে এসে বললেন, এখন আর মহিলাদের জন্য মসজিদে যাওয়ার যুগ নেই। পরিবেশ দিনে দিনে প্রতিকূল হয়ে আসছে। আমি আর মসজিদে গিয়ে জামা'আতে শরীক হবো না। হযরত উমর (রা) বলেন এ করণেই আমি পূর্ব থেকে মহিলাদের জন্য ঘর থেকে বের হওয়াটা পছন্দ করি নাই। উল্লেখ্য এ সব কারণেই বর্তমান যুগে মুহাক্কিক ফকীহ ও মুফ্তীগণ বলেন, মহিলাদের জন্য সে চাই বৃদ্ধা হোক কিংবা যুবতী—ওয়াক্তিয়া নামায কিংবা জুমু'আর নামায কোন নামাযের জন্যই ঘর ছেড়ে মসজিদে গমন করা সাওয়াবের জিনিস তো নয়ই বরং গুনাহের কাজ মাকরূহে তাহরীমী।[১৪৪]

মহিলারা ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামাযে শরীক হওয়ার অনুমতি আছে কিনা সে প্রসঙ্গে ইমাম শাফিঈ ও ইমাম মালিক (র) প্রমুখের মত হল ঈদের জন্য তাদের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি আছে। তাদের জন্য ঈদের জামা'আতে শরীক হওয়া মুবাহ। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) থেকেও অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত আছে। তবে মুহাক্কিকীন আহনাফের অভিমত হল, ঈদের জন্যও মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়া মাকরূহে তাহরীমী। তারা বলেন, পাঞ্জেগানা নামাযের জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য মসজিদে গমন যে সব আয়াত ও হাদীসের আলোকে মাকরূহ প্রমাণিত হয়ে থাকে সেগুলোর দ্বারা ঈদের জামা'আতে শরীক হওয়াও মাকরূহ প্রমাণিত হয়। আল্লামা কাসানী (র) বলেন, মহান আল্লাহর বাণী, وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى আয়াত তাদের জন্য ঈদের জামা'আতে শরীক হওয়াকেও নিষেধ করছে। আল্লামা ইবন হুমাম (র) বলেন, বৃদ্ধা মহিলাগণ ঈদের জামা'আতে শরীক হতে পারে। তবে অন্যদের জন্য অনুমতি নেই। মোল্লা আলী কারী (র) বলেন সে ক্ষেত্রেও শর্ত হল, বয়সের দিক থেকে বৃদ্ধা হয়েও শারীরিকভাবে পুরুষকে আকৃষ্ট করে এমন না হতে হবে। তাছাড়া কোন প্রকার সাজসজ্জা ব্যতিরেকে ঈদগাহে যেতে হবে। ফাতওয়া গ্রন্থ 'দুররুল মুখতারে' বলা হয়েছে যে, বর্তমান কালে যেহেতু মানুষের নৈতিক অবক্ষয় প্রচণ্ড রকমের সেহেতু বৃদ্ধাদের জন্যও ঈদগাহে কিংবা ওয়ায মাহফিলে বা অন্য কোন দেন-দরবারে হাজির হওয়ার অনুমতি নেই, হাজির হওয়া মাকরূহে তাহরীমী।[১৪৫] কিন্তু একখানা হাদীসে মহিলাদের জন্য ঈদগাহে গমনের নির্দেশ পাওয়া যায়। যেমন ঃ

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُخْرِجْنَ فِى الْفِطْرِ وَالاَضْحٰى اَلْعَوَاتِقِ وَالْحُيَّضِ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ ، فَاَمَّا الْحُيَّضُ

১৪৪. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৮৬৯, পৃ. ১৪০; ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৯৯৯, পৃ. ১৮৭।

১৪৫. মুফতী রশীদ আহমদ, আহসানুল ফাতাওয়া সাহারানপুর, যাকারিয়া বুক ডিপো, নভেঃ ১৯৯৪, খণ্ড ৩, পৃ. ২৮৩।

www.pathagar.com

فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِحْدَانَا لاَ يَكُوْنُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا اُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا .

أخرجه الامام مسلم فى صحيحه تحت باب ذكر اباحة خروج النساء فى العيدين الى المصلى وشهود الخطبة ومفارقات الرجال ، رقم الحديث ٢٠٥٦ ، ايضًا بالرقم : ٢٠٥٦،٢٠٥٤ ، ص : ٣٥٦

হযরত উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে আদেশ করেছেন, আমরা যেন ঈদুল ফিতর ও ঈদুর আযহার জামা'আতে মহিলাদের সাথে নিয়ে শরীক হই। আমাদের কন্যা, ঋতুমতী মহিলা ও পর্দার আড়ালের বউদেরকেও যেন নিয়ে যাই। তবে ঋতুবতীরা নামাযে শরীক হওয়া থেকে বিরত থাকবে। তারা কল্যাণকর কাজ ও দু'আর ক্ষেত্রে অন্যান্য মুসলমানদের সাথে শরীক থাকবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের এমন কেউ কেউ আছে যার কাছে বাইরে আসার মত কোন ওড়না নেই। মহানবী (সা) বললেন, তার অন্য কোন বোন তাকে সাময়িক পরিধানের জন্য একটি ওড়না দিয়ে সাহায্য করবে।[১৪৬]

উপরোক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে মহানবী (সা) মহিলাদেরকে ঈদগাহের জামা'আতে গমনের জন্য তাকীদসহ নির্দেশ দিচ্ছেন। কাজেই তাদের এ গমনকে মাকরূহ বলার সুযোগ নেই। উল্লেখ্য এ পর্যায়ের আরো কয়েকখানা হাদীসও হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায়। এ সব হাদীসের কারণে এক বক্তব্য মোতাবেক ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) মহিলাদের জন্য ঈদগাহের গমনের অনুমতি দেন। তবে তার চূড়ান্ত অভিমত অনুসারে ঈদগাহের জামা'আতে শরীক হওয়াও মহিলাদের জন্য মাকরূহ তাহরীমী।

হানাফী ফুকাহায়ে কিরামের পক্ষ থেকে ইমাম তাহাভী (র) উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, মহানবী (সা)-এর উপরোক্ত নির্দেশের বিধানটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক কালের। তখন কাফির মুশরিকদের সম্মুখে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি করে দেখানোর একটা প্রয়োজন ছিল। যেন কাফিররা মুসলমানদেরকে সংখ্যায় দুর্বল ভাবতে না পারে। মক্কা বিজয়ের পর বর্তমান যুগ পর্যন্ত যেহেতু সেই প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান নেই সে কারণে এই হুকুম পরবর্তী সময়ে আর কার্যকর নয়।[১৪৭]

আল্লামা ইবনুল হুমাম (র) বলেন, তাছাড়া মহানবী (সা)-এর যুগটি ছিল সার্বিক নিরাপত্তা ও ফাসাদমুক্ত যুগ। তখন মহিলারা ঘর থেকে বের হলে কোন ফিতনার আশংকা ছিল না। বর্তমানে সেই পরিস্থিতি নেই। বরং ফিতনার আশংকা আছে প্রতি পদে পদে। এ কারণে তখনকার জন্য ঈদগাহে মহিলাদের গমনের অনুমতি থাকলেও বর্তমানে সেই অনুমতি নেই। এটিই হানাফী ফকীহগণের ফাতওয়া।

১৪৬. মুফতী রশীদ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৫।

১৪৭. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৬০৫৬, ২০৫৪-২০৫৬, পৃ. ৩৫৬।

www.pathagar.com

বিতর নামায আদায় করা ওয়াজিব

শরী'আতের দৃষ্টিতে বিতর নামায একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ফুকাহায়ে কিরামের এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, বিতর পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ন্যায় ফরয নয়, কিন্তু তা ওয়াজিব না সুন্নাত এ বিষয়ে হাদীসের আলোকে বিভিন্ন বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। তবে এতদসংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ গভীরভাবে পর্যাবেক্ষণ করলে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিতর নামায ওয়াজিব।[১]

এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا ، اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا .

رواه أبو داؤد (١-٥٣٤) وسكت عنه ورواه الحاكم فى المستدرك وصححه (١-٣٠٦) وقال أبو المنيب العتكى : مروزى ثقة، يجمع حديثه، لم يخرجاه ، وقال النيموى فى التعليق الحسن (٢/٤) والحق ان اسناده حسن واليه ذهب ابن الهمام .

---

১. (ক) আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (র) রাদ্দুল মুহতার, মাকতাবায়ে যাকারিয়্যা, দেওবন্দ, ইউ পি ভারত, অধ্যায় ঃ বিতর ও নফল নামায, খণ্ড ২য়, পৃ.. ৪৩৮/৪০৯।

(খ) শাইখ আবু মুহাম্মদ আল-আইনী, বিনায়া, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান অধ্যায়, বিতরের নামায, খণ্ড ২য়, পৃ. ৫৬৫।

(গ) বাদশাহ আবুল মুযাফ্ফর মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আওরংযেব আলমগীর, ফাতাওয়া আলামগীরী, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, সিরকি রোড, কোয়েটা, পাকিস্তান, পরিচ্ছেদ, বিতরের নামায, খণ্ড ১, পৃ. ১১১।

(ঘ) শায়খ যায়নুদ্দীন ইবনে নুজাইম মিশরী, আল-বাহরুর রাইক, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, সিরকী রোড কোয়েটা, পাকিস্তান, অধ্যায়, বিতর ও নফল নামায, খণ্ড ২য়, পৃ. ৩৭।

(ঙ) শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান মুরগীনানী, হিদায়া, ইয়াসির এন্ড নদীম কোম্পানী দেওবন্দ, সাহারানপুর, ইউ, পি, ভারত, অধ্যায়, বিতর ও নফল, খণ্ড ১, পৃ. ১৪৪।

(চ) আল্লামা তাহত্বাবী (র), হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ, মাকতাবায়ে নু'মানিয়্য দেওবন্দ, (মূল দেমস্ক) অধ্যায় বিতর, পৃ. ২০৫।

(ছ) শাইখ ইবরাহীম হালবী, গুনয়াতুল মুতামাল্লী, (হালবী কবীরী) সুহায়ল একাডেমী, লাহোর, পাকিস্তান, পরিচ্ছেদ নফল নামায, প্রসঙ্গ বিতর, পৃ. ৪১১।

(জ) মালিকুল উলামা শায়খ আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ বাসানী, বাদইউস্ সানাই, মাকতাবায়ে নাঈমিয়া দেওবন্দ, পরিচ্ছেদ, ওয়াজিব নামায, খণ্ড ১ম, পৃ. ৬০৫-৬০৬।

(ঝ) শায়খ খলীল আহমদ সাহারানপুরী, বায়লূল মাজহুদ, মানবায়ে খলীলিয়া, মুযাহিরুল উলূম, সাহারানপুর, অধ্যায় বিতর, খণ্ড ২, পৃ. ৩২০-৩২১।

www.pathagar.com

হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, বিতর নামায অপরিহার্য। অতএব যে বিতর নামায আদায় করবে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। বিতর অপরিহার্য। অতএব যে বিতর নামায করবে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। বিতর অপরিহার্য। অতএব যে ব্যক্তি বিত্‌র আদায় করবে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।[২]

উক্ত হাদীস থেকে নানাভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিতর নামায ওয়াজিব। কেননা তাতে বিতর তরককারীর প্রতি কঠোর হুশিয়ারী করা হয়েছে। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে সে আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের দলভূক্ত নয়। শরী'আতে এধরনের কঠোরোক্তি সাধারণত ফরয কিংবা ওয়াজিবের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, নফল বা সুন্নাতের ক্ষেত্রে নয়। উপরন্তু এ কঠোরোক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) ক্রমান্বয়ে তিনবার উচ্চারণ করেছেন। এতেও এর ওয়াজিব হওয়ায় বিষয়টি আরো বেশী সুদৃঢ়রূপ লাভ করে। কিন্তু এ হাদীসের উপর দু'টি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে।

(ক) এই হাদীসের সনদে আবুল মুনীব উবায়দুল্লাহ্ ইবন আব্দুল্লাহ্ আল-আতাকী রয়েছেন। তিনি একজন দুর্বল রাবী বলে আখ্যায়িত। কাজেই হাদীসটি দুর্বল। এতে হাদীসের প্রামাণ্যতা অসার মনে হয়। এর জবাব হচ্ছে, ইমাম বুখারী, বায়হাকী ও আবু আহমাদ প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কিরাম আবুল মুনীবকে দুর্বল বারী বলে চিহ্নিত করলেও বাস্তবে তিনি দুর্বল রাবী নন। কেননা, এরূপ বহুসংখ্যক মুহাদ্দিসীনে কিরাম রয়েছেন যারা তার নির্ভরযোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। ইবনে মুঈন (র) বলেন, তিনি হলেন صالح الحديث। এমনকি তিনি ইমাম বুখারী (র)-এর উপর সমালোচনা করত বিস্মিতস্বরে বলেন, আমি জানিনা, তিনি আবুল মুনীবের ন্যায় একজন সিকা রাবীকে কি করে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করলেন।[৩]

ইমাম ইবন আদী (র) বলেন, هُوَ عِنْدِىْ لاَ بَأْسَ بِهِ হুমায়দ ইবনে আদম বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) তাঁর থেকে বহু হাদীস বর্ণণা করেছেন। সে সমস্ত হাদীস সুনানের গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ রয়েছে। হযরত আব্বাস ইবনে মুস'আব (র) বলেছেন, তিনি হযরত আনাস (র)-কে দেখেছেন, এবং বহু সংখ্যাক তাবিঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হলেন সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) বহু সংখ্যক তাবিঈ থেকে হাদীস বর্ণণা করেছেন। তিনি হলেন সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবী তাই তো ইমাম আবু দাউদ (র)-এর সূত্রে বলেন : ليس به بأس হয়ত এক্ষেত্রে ইমাম আবূ দাউদ (র) এ কারণেই নীরবতা অবলম্বন করেছেন। কোন হাদীসের উপর ইমাম আবু দাউদ (র)-এর নীরবতা অবলম্বন করা এ কথার প্রতি নির্দেশ করে যে, হাদীসটি সহীহ কিংবা হাসান। অধিকন্তু ইমাম হাকিম (র) ও উক্ত হাদীসকে শায়খাইনের শর্তানুসারে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব বিতর ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে হাদীসটি প্রমাণযোগ্য।[৪]

---

২. আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী (র) ই'লাউস সুনান, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমূল ইসলামিয়া করাচী, পকিস্তান, অধ্যায় বিতর, পরিচ্ছেদ ; বিতর ওয়াজিব ও তার সময় প্রসঙ্গে, খ: ৬, পৃ. ১।

৩. আল্লামা তাকী উসমানী, দরসে তিরমিযী, দারুল কিতাব দেওবন্দ, ভারত, অধ্যায় বিতর, খণ্ড ২, পৃ. ২০৮।

৪. দরসে তিরমিযী ; প্রাগুক্ত; ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭; হলবী কবীরী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

(২) দ্বিতীয় প্রশ্ন : "اَلْوِتْرُ حَقٌّ" এ বাক্যটি দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। কেননা حق এর অর্থ ثَابِتٌ (সাব্যস্ত)। অতএব কোন কিছু সাব্যস্ত বা স্থির হওয়ার দ্বারা তা ওয়াজিব জরুরী নয়, হতেও পারে নাও হতে পারে। কাজেই حَقٌّ শব্দ দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। এর উত্তর হলো ঃ আরবীতে حق শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে একটি অর্থ হচ্ছে ওয়াজিব। আলোচ্য বিষয়ে এ অর্থই বুঝানো উদ্দেশ্যে এর সমর্থনে কয়েকটি হাদীস পাওয়া যায় ঃ আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত একটি মারফূ' রিওয়ায়াতে حَقٌّ এর সঙ্গে وَاجِبٌ শব্দটি যুক্ত রয়েছে।

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الاَنْصَارِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

الحديث : أخرجه أحمد وابن حبان وأصحاب السنن الا الترمذى كذا فى الدراية للحافظ (ص : ١١٣)[৫]

অনুরূপভাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে একটি মার'ফূ রিওয়ায়াত রয়েছে তাতে حق শব্দটি স্থলে واجب শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে।[৬]

عن عبد اللّٰه ابن مسعود رفعه : اَلْوِتْرُ وَاجِبٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ (أخرجه البزار)

প্রত্যেক মুসলমানের উপর বিতরের নামায ওয়াজিব[৭]। অনেকে প্রশ্ন করেছেন, যে হাদীসটি দুর্বল, কেননা এর সনদে জাবির জু'ফী রয়েছেন, তিনি একজন দুর্বল রাবী, ইমাম বাযযার (র) বলেছেন, তিনি এককভাবেই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কাজেই তা এ মাস'আলার ক্ষেত্রে প্রমাণযোগ্য নয়। এর উত্তর জাবির জূ'ফী সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কিরাম থেকে উভয় ধরনের অভিমত পাওয়া যায়। ইমাম শু'বার ন্যায় একজন বিদগ্ধ হাদীস বিশারদ তাঁকে নির্ভরযোগ্য রাবী বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইব্‌ন আলী (র) বলেন, জাবির জু'ফীর হাদীস গ্রহণযোগ্য। অনেকেই তার রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কেউই তার ব্যাপারে দ্বিমত করেনি। ইমাম সাওরী (র) বলেন, হাদীসের ব্যাপারে জাবির জু'ফীর মত অধিক সতর্ক ও পরহেযগার কাউকে দেখিনি। আল-জাওহারুল নাকী (১-৭) সুতরাং হাদীসটি 'হাসান' এর পর্যায়ভুক্ত।[৮]

---

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৬ প্রাগুক্ত, প্র. ১১।

৭. হলবী কবীরী, প্রাগুক্ত।

৮. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ رضی اللّٰهُ عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ اذَا ذَكَرَهُ .

رواه أبو داؤد (١-٥٣١) وسكت عنه ، وفى نيل الأوطار (٢٩٣ : ٢) الحديث أخرجه الترمذى وزاد «فاذا استيقظ» وأخرجه ايضًا ابن ماجة والحاكم فى المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ، واسناد الطريق التى أخرجه منها أبو داؤد صحيح كما قال العراقى .

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বিত্র আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ল কিংবা বিতর আদায় করতে ভুলে গেল সে যেন স্মরণ হওয়া মাত্রই বিতরের নামায আদায় করে নেয়।[৯]

উক্ত হাদীসে বিতরের নামায সম্পর্কে কাযার বিধান দেওয়া হয়েছে। অথচ কাযা শুধু ফরযের হয়, সুন্নাতের কাযা নেই। বুঝা গেল যে, বিতর ওয়াজিব, অন্যথায় তার কাযার বিধান আরোপ করা হতো না।[১০]

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حَذَافَةَ الْعَدَوِىِّ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِىَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعْمِ ، وَهِىَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلٰى صَلَاةِ الْفَجْرِ .

اخرجه الحاكم فى المستدرك (١-٣٠٦) وقال : صحيح الاسناد ، ولم يخرجاه ، وصححه الذهبى أيضًا فى تلخيصه ، وقال تبعًا للحاكم : تركه لتفرد التابعى عن الصحابى اهـ قلت : كانه ليثين إلى ان خارجة لم يروه عنه غير ابن آبى مرة ، ليس كذا لك ، فقد روى عنه عبد الرحمن بن حبيرايضًا عند المصرين ، وخارجة هذا كان أحدا الفرسان ، قيل ، كان يعد بالف فرس ، وامد به عمر عمرو بن العباس فشهد معه واختط بها وكان على شرطة عمرو بن العاص (هو صحابى معروف) ولكن لم يرو عنه غير المصريين ، كذا فى الاصابة للحافظ ابن حجر (٢-٨٤) وقال أبو زيد فى كتاب الاسرار هو حديث مشهور كذا فى العمدة للعينى اهـ (١-٤١٣)

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

১০. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত পৃ. ২০৯; বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৪-৫৭২।

www.pathagar.com

হযরত খারিজা ইব্ন হুযাফা আল-আদাভী বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেরিয়ে আমাদের কাছে আসলেন, অতঃপর কললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে এমন একটি নামায বৃদ্ধি করে দিয়েছেন যা তোমাদের জন্য লাল উট অপেক্ষা অধিক শ্রেয়। সেটা হল, বিতরের নামায। তিনি তোমাদের জন্য ইশা এবং ফজরের মধ্যবর্তীতে এ নামাযের সময় নির্ধারণ করেছেন।[১১]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের দু'টি অংশ রয়েছে (ক) বিতরের নামাযের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা, (খ) বিতরের নামায আদায়ের সময় প্রথম অংশের বিবরণে বলা হয়েছে ঃ

ان اللّٰه امدكم بصلاة .... وهى الوتر

অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য একটি নামায (বিতর) বৃদ্ধি করেছেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, বৃদ্ধি করার বিষয়টি আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। আল্লামা আইনী উমদাতুল কারীতে লিখেন (৩-৪১৪) বৃদ্ধির সম্পর্কে আল্লাহ্র সাথে হলে ওয়াজিব বা ফরয সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ্র তরফ থেকে বৃদ্ধিকৃত বিধান নফল হতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি নবী করীম (সা)-এর দিকে বৃদ্ধির সম্পর্ক করা হয়। তাহলে তদ্দ্বারা সুন্নাত বা নফল সাব্যস্ত হয়। এখানে বিতর বৃদ্ধি করার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এতে বুঝা গেল যে, বিত্র ওয়াজিব। যদি বিতর শুধু সুন্নাত হত তাহলে এক্ষেত্রে আল্লাহ্র দিকে নিসবত না করে স্বয়ং নিজের দিকেই নিসবত করতেন।[১২]

উক্ত হাদীস দ্বারা বিতর ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি ভিন্নভাবেও প্রমাণিত হতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, হাদীসের মৌলিক অর্থের প্রতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে একথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বিতর ওয়াজিব, সুন্নাত নয়। কেননা হাদীসের মধ্যে বিতরকে অপরাপর ফরয নামাযের মধ্যে বৃদ্ধিকৃত নামায বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ কথা সর্বজন বিদিত যে, কোন জিনিসের মধ্যে কিছু বৃদ্ধি করতে হলে বৃদ্ধিকৃত বস্তু ঐ জিনিসের যাত বা ধরন থেকে হতে হয়। কেননা বৃদ্ধিকৃত বস্তু অন্য জাতীয় হলে তাকে বৃদ্ধি বলা হয় না। বরং মিশ্রণ বা মিলানো বলে আখ্যায়িত করা হয়, যেমন দুধের সাথে আরো দুধ মিশালে বলা হবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর পানি মিশালে বলা হবে সংমিশ্রন ঘটানো হয়েছে। যেহেতু হাদীসের মধ্যে বলা হয়েছে, ফরয নামাযসমূহের মধ্যে আল্লাহ্ বিত্র ও বৃদ্ধি করেছেন। সেহেতু বুঝতে হবে বিতর ফরয নামাযের পর্যায়ভূক্ত, সুতরাং বিতর সুন্নাত নয়, ওয়াজিব বলেই বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।[১৩] এজন্য ফুকাহা কিরাম বলেন : বিত্র আক্বীদাগত দিকে থেকে ওয়াজিব। কার্যত ফরয এবং তা সুন্নাত অর্থাৎ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত।[১৪]

---

১১. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, ফতহুল কাদীর. প্রাগুক্ত পৃ. ৩৭০, বিনায়া, প্রাগুক্ত, ৫৬৯, ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে মূসা তিরমিযী, সূনান তিরমিযী, রশিদিয়া কুতুবখানা দিল্লী, ভারত অধ্যায় : বিতরের ফযীলত প্রসঙ্গে : খণ্ড ১ম, পৃ. ৬০; ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান সাজিস্তানী সুনানে আবূ দাউদ মাকতাবায় থানবী দেহবন্দ, ভারত, অধ্যায়, বিতর মুস্তাহাব, খণ্ড ১ম, পৃ. ২০১।

১২. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ ইবন মাজাহ, সুনান ইবন মাজাহ মাকতাবায়ে রশিদিয়া দিল্লী, ভারত, অধ্যায় : রমযান মাসে রাত্রিতে নামায আদায় প্রসঙ্গে, খণ্ড ১, পৃ. ৯৪।

১৩. দারসে তিরমিযী প্রাগুক্ত; বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩।

১৪. বিনায়া, প্রাগুক্ত।

৬২—

www.pathagar.com

উক্ত দলীলের উপর হাফিয শামসুদ্দীন ইবন আব্দুল হাদী হাম্বালী (র) 'আত্তানক্বীহ লিত-তাহ্কীক' গ্রন্থে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, اَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ (বা زَادَكُمْ صَلَاةً (নামায বৃদ্ধি করেছেন) এবাক্য দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হতে পারে না। কেননা, বৃদ্ধিকৃত বস্তু যার মধ্যে বৃদ্ধি করা হয়েছে তার জাতীয় হওয়া অনাবশ্যক। যা নিম্নোক্ত হাদীসের আলোকে ফুটে উঠে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ مَرْفُوْعًا : اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى زَادَكُمْ صَلَاةً اِلٰى صَلَوَاتِكُمْ هِىَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ حُمْرِ النَّعَمْ اَلَا وَهِىَ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ . (رواه الحاكم بسنده ، قال وهو حديث صحيح)

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে (মারফূভাবে) বর্ণিত, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য একটি নামায বৃদ্ধি করেছেন যা লাল উট থেকেও শ্রেয়, তা হল ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাক'আত সুন্নাত[১৫]। এ হাদীসেও দুই রাক'আত ফজরের সুন্নাতের বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে এবং পূর্বের হাদীসের সাথে এ হাদীসের ভাষ্যের পূর্ণ মিল আছে অথচ ফজরের দুই রাক'আত নামায সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নাত ওয়াজিব কিংবা ফরয নয়। যুক্তির দাবী হল, এই যে, পূর্বের হাদীসে اَمَدَّكُمْ বা (زَادَكُمْ) এর ভিত্তিতে যদি বিত্রকে ওয়াজিব বলা হয় তাহলে এ হাদীসে উল্লেখিত زَادَكُمْ صَلَاةً এর ভিত্তিতে ফজরের সুন্নাতকেও ওয়াজিব বলা উচিত। অথচ কেউ তা বলে না। কাজেই اَمَدَّكُمْ বা زَادَكُمْ এর ভিত্তিতে—বিতরকে ওয়াজিব প্রমাণিত করা অযৌক্তিক মনে হয়।[১৬]

এর উত্তর হলো, বাস্তব কথা সেটাই যে বৃদ্ধিকৃত বস্তু যার মধ্যে বৃদ্ধি করা হয়েছে তার جنس থেকে হতে হবে। এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তবে আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের ভাষ্য থেকে ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাতকে ওয়াজিব বলা যাবে না। কারণ ফজরের দুই রাক'আতের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির কথাটি শুধু এই একটি হাদীসেই উল্লেখিত। এর সমর্থনে আর অন্য কোন হাদীস পাওয়া যায় না। এই হাদীসে সচরাচর অন্যান্য সুন্নাতের চাইতে ফজরের সুন্নাতকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বুঝানোর জন্যই বলা হয়েছে। এজন্য একে اكد السنن। বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে বিতরের নামাযের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির কথাটি বিভিন্ন হাদীসের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে।

এ হাদীসের আলোকেই একে ওয়াজিব বলা হয়েছে।

وَفِىْ الدَّارِ قُطْنِىْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ تُرٰى الْبِشْرِ وَالسُّرُوْرِ فِىْ وَجْهِهِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِىَ الْوِتْرُ .

(ক) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম (সা) বেরিয়ে তাদের কাছে আসলেন। তখন তাঁর চেহারা মুবারকে খুশী ও আনন্দের ছাপ দেখা যাচ্ছিল। তিনি

---

১৫. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত ; বিনায়া প্রাগুক্ত, ৫৭৩/৫৭৪।

১৬. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য আরেকটি নামায বৃদ্ধি করেছেন সেটা হলো, বিত্র।[১৭]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ : مَكَثْنَا زَمَانًا لَا نَزِيْدُ عَلٰى الصَّلَوٰاتِ الْخَمْسِ فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاجْتَمَعْنَا فَحَمِدَ اللّٰهُ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ، قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ قَدْ زَادَ كُمْ صَلَاةً فَاَمَرَنَا بِالْوِتْرِ .

فالحديث حسن صالح للاستشهاد ، لا سيما العرزى متابع فيه، فقد رواه أحمد فى مسنده عن الحجاز بن ارطاة عن عمرو بن شعيب كما فى نصب الراية (١-٢٧٤)

(খ) আম্‌র ইবন শু'আইব সূত্রে তার পিতা থেকে এবং তদকর্তৃক তার দাদা থেকে আমরা এক দীর্ঘ কাল যাবৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উপর অন্য কোন নামায বৃদ্ধি না করেই শুধু এই নামায আদায় করেই চলছিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে আদেশ দিলেন আমরা সমবেত হলাম, অতঃপর তিনি আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা আদায়ের পর বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য একটি নামায বৃদ্ধি করেছেন। অতঃপর তিনি আমাদেরকে বিতর আদায়ের আদেশ দিলেন।[১৮]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلَاةً هِىَ لَكُمْ خَيْرٌ مِّنْ حُمُرِ النَّعَمِ الْوِتْرُ وَهِىَ لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلٰى صَلَاةِ الْفَجْرِ .

(গ) মোটকথা বিতরের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির কথা ৮-৯জন সাহাবী (খারিজা ইবনে হুযাফা, আবু সাঈদ খুদরী, আবু বস্‌রা, ইবন আব্বাস, আম্‌র ইবনুল আস, উকবাহ্ ইবন আমির, আবদুল্লাহ ইবন উমর ও আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা) উল্লেখ করেছেন অথচ ফজরের দু'রাক'আতের ব্যাপারে কেবল আবু সাঈদ খুদরী (র) উল্লেখ করেছেন। কাজেই হাদীসের সনদ সহীহ হলেও তার মর্মার্থ (বিরল) شاذ বলে গণ্য হবে। অধিকন্তু বিতরের বেলায় (اَمَدَّكُمْ বা زَادَكُمْ এর মধ্যে) زِيَادَة (অর্থাৎ বৃদ্ধি করা) দ্বারা ওয়াজিব অর্থ নিলে তার বিপক্ষ রিওয়ায়াত দেখা যায় না। বরং এর সপক্ষে বিভিন্ন হাদীস পাওয়া যায় যেমন হাদীস ঃ[১৯]

(ক) اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

(খ) اَلْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

(গ) اَوْتِرُوْا صَلَاةَ اللَّيْلِ

---

১৭. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত ৪।

১৮. প্রগুক্ত।

১৯. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

এ হাদীসে (আদেশমূলক ক্রিয়া)-এর সীগা ব্যবহার করা হয়েছে যা ওয়াজিবের প্রতি নির্দেশ করে, এছাড়া আরো বহু হাদীস রয়েছে যার দ্বারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়।[২০]

পক্ষান্তরে ফজরের সুন্নাতের ক্ষেত্রে (زيادة) 'বৃদ্ধি' দ্বারা ওয়াজিব অর্থ নিলে বহু রিওয়ায়াত তার পরপন্থীরূপে দাঁড়ায়। যেমন ঃ

عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى شَيْءٍ مِّنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ (رواه البخارى)

উক্ত হাদীসে হযরত আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদায়কৃত দুই রাক'আতকে নফলের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ওয়াজিব নয়। এবং এক্ষেত্রে مزيد فيه - مزيد এর جنس থেকে নয়। সুতরাং ফজরের দু'রাক'আতকে ওয়াজিব বলে আখ্যায়িত করা যাবে না।

عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الاَنْصَارِيِّ رضى اللّٰهُ عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ اَلْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ .

الحديث أخرجه أحمد وابن حبان وأصحاب السنن الا الترمذى كذا فى الدراية للحافظ (٢-١١٣) قلت، ولفظ واجب ليس عند أصحاب السنن فلعله عند ابن حبان ، وقال الحافظ فى الفتح (٢-٤٠٠) أخرجه أبو داؤد والنسائى ومحمد ابن حبان والحاكم اهـ قلت وأجرجه دار قطنى (١-١٧١) ايضًا بلفظ واجب ، وفى التعليق المغنى رواية كلهم ثقات وصحح أبو حاتم والذهلى والدار قطنى فى العلل ، والبيهقى وغير واحد وفقه ، وهو الصواب اهـ.

قلت : قد ذكرنا فى المقدمة ان دفع الثقة حديثًا وقفه غيره ولو أكثر منه حفظا وعددًا أرجح والحكم له لكونه زيادة من الثقة لا تنافى رواية الثقات فتقبل اهـ .

হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, বিতরের নামায প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপরিহার্য ও ওয়াজিব। এ হাদীসে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, বিতরের নামায ওয়াজিব।[২১]

عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمْ الْمَكْتُوْبَةِ وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْتَرَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ ! اَوْتِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُّحِبُّ الْوِتْرَ .

---

২০. প্রাগুক্ত।

২১. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত ৮।

www.pathagar.com

أخرجه الحاكم فى المستدرك (١-٣٠٠) ، وسكت عنه هو الذهبى ، والترمذى وقال حديث على حسن (١-٦٠)

হযরত আসিম ইব্ন যামারাহ আলী (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, নিশ্চয়ই বিত্র তোমাদের ফরয নামাযের মত আবশ্যক পূর্ণ নয়, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিতরের নামায পড়েছেন। অতঃপর বলেছেন, হে কুরআনের ধারক ব্যক্তিগণ। তোমরা বিত্র আদায় কর। কেননা আল্লাহ্ হলেন বিত্র (বেজোড়) তিনি বিত্রকে (বেজোড়কে) পছন্দ করেন।[২২]

উক্ত হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী বুঝা যায় যে, বিত্র এবং ফরয দু'টিই আবশ্য করণীয় তবে উভয়ের আবশ্যকতার মাঝে ব্যবধান রয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায উচু পর্যায়ের গুরুত্ব সম্পন্ন আর বিত্র তার চেয়ে একটু নিম্ন পর্যায়ের অর্থাৎ ওয়াজিব। তাই ফুকাহায়ে কিয়াম বলেন, ফরয নামাযসমূহ আক্বীদাগত দিক থেকে ওয়াজিব আর কার্যত ফরয।[২৩] কিন্তু তিরমিযী শরীফে বর্ণিত নিম্নোক্ত ঃ

الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمْ الْمَكْتُوْبَةِ وَلٰكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

বিত্র তোমাদের ফরয নামায সমূহের ন্যায় আবশ্যকপূর্ণ নয়। তবে তা সুন্নাত যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) জারী করেছেন। হাদীসে ভাষ্যানুযায়ী বুঝা যায় যে, বিত্র সুন্নাত। এ কারণে —অনেকেই উক্ত হাদীসের আলোকে দাবী করে বলেছেন যে, বিত্র সুন্নাতই ওয়াজিব নয়। কেননা, এখানে স্পষ্টভাবে সুন্নাত (سنّة) শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। এর উত্তর হলো, আরবীতে سَنَّ শব্দের বহু অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি অর্থ হল, شَرَعَ 'বিধান দেওয়া' উক্ত হাদীসে এই অর্থই উদ্দেশ্য। হাদীসের অনেক ক্ষেত্রেই سَنَّ দ্বারা شَرَعَ অর্থ নেওয়া হয়েছে বলে প্রমাণ রয়েছে। যেমন যাকাত প্রসঙ্গে একটি হাদীসে রয়েছে ঃ

سَنَّ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءِ وَالْعُيُوْنُ أَوْكَانَ عُشْرِيًّا الْعُشْرِ

হাদীস বিশারদগণের সর্বসম্মতি রায় অনুসারে এখানে سَنَّ - شَرَعَ এর অর্থই ব্যবহৃত হয়েছে।[২৪]

আলোচ্য হাদীস বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ বিত্রকে পছন্দ করেন', এর দ্বারা এ কথা বুঝার যৌক্তিকতা হতে পারে না যে, বিত্র একটি পছন্দনীয় কাজ মাত্র, অতএব তা ওয়াজিব হতে পারে না। আর ওয়াজিব আমল ও যথাযথ ও উপযোগী এতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই মহব্বত শব্দটি দ্বারা এখানে পারিভাষিক মুস্তাহাব কিংবা সুন্নাত বুঝানোর অবকাশ নেই।[২৫]

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ فَأَوْتِرُوْا وَيَا أَهْلَ الْقُرْآنِ

---

২২. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত ; তিরমিযী শরীফ, প্রাগুক্ত অধ্যায়, বিত্র অপরিহার্য নয়, খ. ১, পৃ. ৬০।

২৩. ই'লাউন সুনান, প্রাগুক্ত, ১০।

২৪. প্রাগুক্ত।

২৫. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

اَوْتِرُوْا শব্দটি আমর (অর্থাৎ আদেশসূচক ক্রিয়া) এর অর্থ হল ঃ তোমরা বিতর আদায় কর। ফুকাহাদের পরিভাষায় 'আমর' কোন বিষয়ের ওয়াজিব হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। অতএব বুঝা গেল, বিত্র ওয়াজিব।[২৬]

উমদাতুল কারীতে বর্ণিত আছে, ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, হাদীসে উল্লেখিত أَهْلَ الْقُرْآنِ দ্বারা উদ্দেশ্য হাফেয ও ক্বারীগণ, সাধারণ মুসলমান নয়। খাত্তাবীর উক্ত বক্তব্যানুসারে বুঝা যায়, বিত্র ওয়াজিব নয়। কেননা ওয়াজিব হলে তা সামগ্রিকভাবে সকলের উপর আরোপিত হত। এর উত্তরে আল্লামা আইনী (র) বলেন, أَهْلَ الْقُرْآنِ এর দু'টি অর্থ রয়েছে। একটি হল বিশেষ অর্থ ঃ কুরআন চর্চাকারী (অর্থাৎ হাফেয ও ক্বারীগণ)। আর দ্বিতীয়টি হল ঃ ব্যাপাক অর্থাৎ কুরআন অনুযায়ী ধর্মাবলম্বী বা যার সাথে কুরআনের ন্যূনতম সম্পর্কে বিদ্যমান রয়েছে অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায়। এতে হাফেয ও ক্বারীসহ অন্যান্য সকলেই শামিল। এখানেই এ অর্থই বুঝানো হয়েছে। অতএব فَاَوْتِرُوْا وَيَا أَهْلَ الْقُرْآنِ বাক্যটি فَاَوْتِرُوْا وَيَا اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ সদৃশ হল, অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! তোমরা বিতর আদায় কর।[২৭]

أَهْلَ الْقُرْآنِ এটা মুলসমানদের উপাধি। যেমন أَهْلَ التَّوْرَاةِ ইয়াহুদীদের উপাধি, أَهْلَ الْاِنْجِيْلِ নাসারাদের উপাধি, أَهْلَ الْكِتَابِ এটাও তাদের উপাধি।[২৮]

উপরোক্ত হাদীসে সমূহের আলোকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, বিত্র নামায ওয়াজিব। সুন্নত নয়।

আর এটাই হচ্ছে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর সর্বশেষ সিদ্ধান্তমূলক অভিমত। আল্লামা ইবনে নুজাইম মিসরী (র) বলেন, এটাই ইমাম আযম আবু হানীফার (র) সর্বশেষ অভিমত ও সিদ্ধান্ত।[২৯] বিত্র ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি শুধু ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এর একাজ বক্তব্য রয়েছে বলে ফিক্হ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। যেমন কাযী আবু বকর ইবনুর আরাবী (র) সাহনূন ও আসবাগের ন্যায় বিশিষ্ট ফকীহদ্বয় থেকেও ওয়াজিব—অভিমতটি বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইব্ন কুদামাহ আল-মুগনীতে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) থেকে উক্ত অভিমত বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইব্ন শায়বা ও হযরত ইবনুল মুসায়্যিব, আবু উবায়দা ইব্ন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, যাহ্হাক ও মুজাহিদ (র) প্রমূখ থেকেও এ অভিমত বর্ণনা করেন। ইবন বাত্তাল (র) বলেন, হযরত ইবন মাসউদ, হুযাইফা, ইব্রাহীম নাখঈ ও শাইখ ইউসুফ ইবন খালিদ সিমতীরও এই একই অভিমত।[৩০]

আলোচ্য মাসা'আলা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন হাদীসের জবাব ও ব্যাখ্যা

আলোচ্য মাস'আলা সম্পর্কে এমন কিছু হাদীস রয়েছে যার দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে বিত্র ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নাত। এ সকল হাদীসের যথাযথ ব্যাখ্যা নিম্নে পেশ করা হল।

---

২৬. প্রাগুক্ত, বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

২৭. প্রাগুক্ত।

২৮. প্রাগুক্ত।

২৯. রাহরুর রাইক, প্রাগুক্ত।

৩০. মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।

www.pathagar.com

عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اَلْوِتْرُ حَسَنٌ جَمِيْلٌ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ . رواية ثقات قاله البيهقى من التلخيص (١-١١٦)

(ক) হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিতর একটি সুন্দর ও উত্তম আমল। নবী কারীম (সা) এবং তাঁর পরবর্তী ব্যক্তিবর্গ এ আমলটি পালন করেছেন, তবে তা ওয়াজিব নয়।[৩১] এই হাদীসটির ব্যাখ্যা প্রদানের পূর্বে জানতে হবে যে হযরত ইব্‌ন উমর (রা) ইরশাদ করেছেন : যে, اَوْتَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَوْتَرى الْمُسْلِمُوْنَ এর দ্বারা ইবন উমর (রা)-এর উদ্দেশ্য হল, যে বিত্‌র একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। নবী কারীম ও সকল মুসলমান (সাহাবা) তা আদায় করতেন। উক্ত হাদীসে اَلْوِتْرُ حَسَنٌ جَمِيْلٌ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُ দ্বারা উবাদা ইবন সামিত (রা)-এর একই উদ্দেশ্য। এরূপ বাক্য দ্বারা কোন বিষয়ের ওয়াজিব হওয়া রদ হয় না বরং কোন কোন সময় এ জাতীয় কাজের মাধ্যমে ওয়াজিব হওয়ার দিক আরো দৃঢ় ও মজবুত বলে প্রমাণিত হয়। এখানে বিষয়টি এরূপই, কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাদের পরবর্তী লোকেরা এ নামাযকে কখনো ছাড়েন নি।

কখনো ছুটে গেলে তা পরবর্তীতে কাযা করে নিতেন, অধিকন্তু حَسَنٌ جَمِيْلٌ শব্দটি শরী'আত বিধিত প্রত্যেক আমলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য চাই তা ফরয হোক বা ওয়াজিব, সুন্নাত হোক কিংবা নফল তাতে কোন পার্থক্য নেই। আর وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বিতরের নামায পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযসমূহের ন্যায় নয়, বরং এর গুরুত্ব ফরযের চেয়ে একটু নিম্নমানের যা পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।[৩২]

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَامَ بِهِمْ فِيْ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ وَاَوْتَرَ ثُمَّ انْتَظَرُوْهُ وَمِنَ الْقَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ فَسَاَلُوْهُ ، فَقَالَ : خَشِيْتُ اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرَ .

(খ) হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) তাদের নিয়ে রমজানে আট রাক'আত নামায পড়লেন। এবং বিত্‌র আদায় করলেন। অতঃপর সাহাবা আগামী রাতেও এর অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু তিনি বিত্‌র পড়ার জন্য তাদের কাছে আর আসেননি। তখন সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তোমাদের উপর বিত্‌র অপরিহার্য দেয়ার ভয়ে। আমি এরূপ করেছি।[৩৩]

* এহাদীস দ্বারাও বুঝা যায় যে, বিত্‌র ওয়াজিবে নয়। তাই মুহাক্কিক ইবনুল ইমাম (র)-এর উত্তরে বলেন, উক্ত ঘটনা ওয়াজিব হওয়ার পূর্বেকার অবস্থার সাথে সম্পর্কিত কিংবা এ

---

৩১. প্রাগুক্ত, ১৭ পৃ.।

৩২. প্রাগুক্ত।

৩৩. প্রাগুক্ত, ১৭ পৃ.।

www.pathagar.com

হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বিত্‌র সহ রাতের নফলসমূহ। আর এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো যে, শুধু বিত্‌র ওয়াজিব, তার সাথে রাতের নফল নামাযসমূহ ওয়াজিব নয়, এখানে বিত্‌রকে সালাতুল্লাইলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম বিত্‌রকে সালাতুল্লাইলের অন্তর্ভুক্ত করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাতের নামায বা সালাতুল্লাইল সমষ্টিগতরূপে একটি আর তা হলো বেজোড়। হাদীসের উল্লেখিত বিত্‌র দ্বারা এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য। অতএব خَشِيْتُ اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ এর অর্থ হবে আমি ভয় করছিলাম যে তোমাদের উপর সালাতুল্লাইল ফরয হয়ে যায় নাকি। বুখারী শরীফে উল্লেখিত একটি হাদীসে আমাদের এ বক্তব্যের সসমর্থন পাওয়া যায়।

إِنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ

এখানে বিত্‌রের স্থলে 'সালাতুল্লাইন' শব্দটি সরাসরি প্রয়োগ করা হয়েছে। কাজেই উক্ত হাদীসের আলোকে বিত্‌রকে সুন্নাতে বলা যথাযথ বলে বিবেচিত নয়।[৩৪]

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ - الحديث وفيه - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ . قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ (بخاری ومسلم)

(গ) হযরত তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নজদ বাসীদের থেকে জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, রাত দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয। লোকটি বলল, এ ছাড়া আমার উপর আর কিছু বর্তায় কি ? রাসূল (সা) বললেন, না তবে নফল নামায আদায় শুরু করলে তা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।[৩৫]

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে মুসলমানদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পালন করা কর্তব্য। এর চেয়ে বেশী নয়। অতএব যদি বিত্‌রকে ওয়াজিব বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তাহলে হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তে নামায অবধারিত হওয়ার বিষয়টি রহিত হয়ে যায়। কেননা এ অবস্থায় দৈনিকের ওজীফা হয় ওয়াক্ত নামাযে পরিণত হয়ে যায়। সর্বোপরি নিয়ম আছে যে, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কুরআন ও মশহুর হাদীসকে রহিত করা যায়না অথচ বিতরকে ওয়াজিব বললে কুরআন ও মশহুর হাদীসকে রহিত করা সাব্যস্ত হয় যা নিতান্তই অগ্রহণযোগ্য। তবে বিত্‌রকে সুন্নাত বললে এ দোষ থেকে মুক্ত থাকা যায়। কাজেই বিত্‌র সুন্নাত বলে প্রমাণিত হল।

এর উত্তর হল, মূলত বিত্‌র পাঁচ ওয়াক্তের বহির্ভূত কোন নামায নয় বরং তা পাঁচ ওয়াক্তেরই অন্তর্ভুক্ত। এতদার্থে যে, তা এশার অনুবর্তী।

সুতরাং বিত্‌র যখন স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে ফরযরূপে ধর্তব্য নয় তাই তার বৃদ্ধির মাধ্যমে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের ওজিফা ছয় ওয়াক্তে পরিণত হলোনা। কাজেই এ কথা বলার অবকাশ নেই যে,

---

৩৪. প্রাগুক্ত।

৩৫. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

বিত্‌র ওয়াজিব বলার দ্বারা খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কুরআন ও মশহুর হাদীসকে রহিত করা হয়েছে। কেননা বিত্‌র বৃদ্ধির পরও পাঁচ ওয়াক্তই দিন রাতের ওজীফারূপে বহাল আছে।[৩৬]

عَنْ سَعِيْدُ بْنُ يَسَابَ اَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ اَسِيْرُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَقَالَ سَعِيْدَ : فَلَمَّا خَشِيْتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَاَوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ ، فَقَالَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : اَيْنَ كُنْتَ ؟ فَقُلْتُ : خَشِيْتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَاَوْتَرْتُ ، فَقَالَ عَبْدِ اللّٰهِ اَمَالَكَ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُسْوَةٌ ؟ فَقُلْتُ : بَلٰى قَالَ : ان رسول اللّٰه ﷺ كَانَ يُوْتِرُ عَلَى الْبَعِيْرِ .

এ হাদীসের শেষে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওটের পিঠে বিত্‌র আদায় করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে ঃ[৩৭]

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهٖ حَيْثُ تَوجهت به يترى ايماء صلاة الليل الا الفرائض ويوتر على راحلته .

নবী কারীম (সা) সফর আবস্থায় তাঁর সাওয়ারীতে ফরয নামায ছাড়া অন্যান্য নামায ইশারার মাধ্যমে আদায় করতেন। এমনকি বিতর ও সাওয়ারীর পিঠে পড়তেন।

এ দুই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, বিত্‌র সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। কেননা ফকীহগণ লিখেন, ফরয ওয়াজিব বাহন জন্তুর উপর জায়িয নয়। তবে সুন্নাত জায়িয আছে। অতএব বিত্‌র ওয়াজিব হলে রাসূলুল্লাহ (সা) অন্যান্য ফরয নামায়ের ন্যায় বিতরও ভূমিতে অবতরণ করেই আদায় করতেন।

মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম (র) এ হাদীসের উত্তরে বলেন যে, নবী করীম (সা) সাওয়ারীর উপর নামায পড়ার বিষয়টি একটি বিশেষ অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। কাজেই এর দ্বারা ব্যাপক বিধান বুঝানোর অবকাশ নেই। হতে পারে তিনি কোন ওযরবশত কিংবা বিশেষ কোন কারণে বিত্‌র সাওয়ারীর উপর আদায় করেছেন। ফুকাহায়ে কিরাম লিখেন, ওযরবশত যেমন বৃষ্টি কাদা মাটি, শত্রু ইত্যাদির কারণে ফরয নামাযও সাওয়ারীর পিঠে জায়িয (১-৩৭১)

অতএব ইবন উমর (রা)-এর ইবন সাঈদ ইবন ইয়াসিরের প্রতি লক্ষ্য করে একথা اَمَالَكَ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (রাসূলুল্লাহ্ (সা) জীবনাদর্শ তোমার জন্য উত্তম নমুনা নয় কি) বলার অর্থ হল এখন তুমি যে অবস্থায় উপনীত, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) সাওয়ারীর উপর নামায পড়তেন। কাজেই এটাই তোমার জন্য নমুনা। আর তা হলো, ওযরের অবস্থা।

এর দ্বারা কখনো এ উদ্দেশ্য নয় যে, সর্বাবস্থায় সাওয়ারীর উপর বিত্‌র আদায় জায়িয রয়েছে। এর প্রমাণ হলো এই যে, সাঈদ (র) ভূমিতে অবতরণ করেই বিত্‌র আদায় করতেন।

---

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮/১৯।

৩৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

এ কথা এটাই প্রমাণ করে যে তার মতানুযায়ী সাওয়ারীর উপর বিতর জায়িয নেই। কিন্তু ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীস অনুযায়ী এ উত্তরটি বাহ্যত অগ্রহণযোগ্য মনে হয়। কেননা, তাতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরয নামায ব্যতীত নফল ও বিত্‌র সাওয়ারীর উপর পড়তেন। অতএব যদি বলা হয় যে, রাসূল (সা) ওযরের কারণে সাওয়ারীতে বিত্‌র আদায় করেছেন। তাহলে ফরয পড়তে কি বাধা ছিল ? কাজেই তিনি ফরয আদায়ের জন্য ভূমিতে অবতরণ করেছেন আর বিতরের জন্য অবতরণ করেন নি, তাতে বুঝা যায় যে, তিনি সম্পূর্ণ ওযর মুক্ত ছিলেন। এর দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, বিত্‌র-নফলের পর্যায়ভুক্ত। এর জবাব হল বিতর ছাড়া শুধু ফরয নামাযের জন্য ভূমিতে অবতরণ করার কারণে একথা বলা চলেনা যে তিনি ওযর মুক্ত ছিলেন, কেননা এটাও হতে পারে যে, শুধু ফরযের ক্ষেত্রে কোন ওযর ছিলনা।

ফযর নামাযসমূহ পূর্ণ দিবসে ও রাতের শুরু অংশে মুক্তভাবে জামা'আতর সাথে আদায়ের সু-ব্যবস্থা থাকে। পক্ষান্তরে বিতরের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা বিতরের সময় হল এশার পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত। গভীর এবং শেষ রাতে ও বিতরের সুযোগ আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাধারণত এশার নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে রাতভর নফল পড়ে শেষ রাতে বিতর আদায় করতেন। সে মুহূর্তে বিশেষত সফর অবস্থায় শত্রু ইত্যাদির কারণে ওযর থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই ওযর মুক্ততার সময় তিনি ভূমিতে অবতরণ করে বিতর আদায় করেছেন বলেও হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং বিত্‌র আদায়ের ক্ষেত্রে রাসূলের উভয় ধরনের আমল বিদ্যমান। (ক্) সাওয়ারীর উপর (খ) সাওয়ারী থেকে অবতরণ করে ভূমিতে। সাওয়ারীর উপর আদায় ছিলো ওযরের ভিত্তিতে। আর ভূমিতে অবতরণ করে আদায় ছিল ওযর মুক্ততার অবস্থায়।

অবশ্য যদি একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি বিতরের জন্য কখনই ভূমিতে অবতরণ করেননি তাহলে একটু অবকাশ ছিল যে বিতর সুন্নাতের পর্যায় ভূক্ত ফরযের পর্যায়ভূক্ত নয়। কিন্তু এর কোন প্রমাণ নেই কেনা হাদীস বর্ণণাকারী আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) সাওয়ারীতে নফল ইত্যাদি আদায়ের পর ভূমিতে অবতরণ করে বিতর আদায় করতেন এমর্মে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও এরূপ করতেন।[৩৮]

ইমাম তাহাভী (র) শারাহ মা'আনিল আসারে বর্ণনা করেন :

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوْتِرُ بِالْاَرْضِ وَيَزْعُمُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ كَذٰلِكَ .

নাফি' (র) বর্ণনা করেন যে, ইবন উমর (রা) নিজ সাওয়ারীতে বসে নামায পড়তেন এবং বিত্‌র আদায় করতেন ভূমিতে নেমে। তিনি মনে করতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ করতেন।[৩৯]

ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস দ্বারা দু'টি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে ১. ইবন উমর (রা) বিত্‌র ভূমিতে অবতরণ করে পড়তেন। ২. বিত্‌রের জন্য ভূমিতে অবতরণ করে তা

৩৮. প্রাগুক্ত, ১৯-২০।

৩৯. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

আদায় করা নবী কারীম (সা)-এর একটি যথারীতি আমল ছিল,।[৪০] এর দ্বারা একটি বিষয়টি সাব্যস্ত হয় যে, নবী করীম (সা) ওযরের ভিত্তিতে সাওয়ারীতে বিতর আদায় করতেন। আর ওযর না থাকলে সব সময় ভূমিতেই পড়তেন। এটাই ছিল ইব্‌ন উমর (রা)-এর অনুসৃত আমল।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ (مرفوعًا) ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَىَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوَّعٌ ، النَّحْرُ ، والوتر ، وَرَكْعَتَا الضُّحٰى .

(ছ) হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা) বলেছেন, তিনটি জিনিস এমন যা আমার উপর ফরয। আর তোমাদের জন্য তা নফল। তাহলে কুরবানী, বিত্‌র এবং চাশতের দু'রাক'আত নামায।[৪১]

* এ হাদীসের আলোকে অনেকে বলেছেন যে, বিতর উম্মতের উপর ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নাত, এর জবাব হল, প্রথমত, এই হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল যা প্রমাণযোগ্য নয়। ইমাম আহমদ, বায়হাকী ইবনে সালাহ ইবনুল জাওযী এবং ইমাম নববী (র) প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদিসটিকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। (তালখীসুল হাবীর, ১-১১৭)

দ্বিতীয়ত, মতনের (মূলপাঠ) দিক থেকে হাদীসটি مُضْطَرَب বিভিন্ন সনদে বিভিন্ন রকমের ভাষ্য পাওয়া যায়। যেমন,

عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظٍ : ثَلَاثَةٌ هُنَّ عَلَىَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ سُنَّةٌ ، وَالْوِتْرُ وَالسِّوَاكُ ، وَقِيَامُ اللَّيْلِ .

(তাবরানী ঃ আওসাত, বায়হাকী ঃ সুনান)

عَنْ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ (مرفوعا) ثَلَاثَةٌ هُنَّ عَلَىَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ النَّحْرُ وَالْوِتْرُ ، وَرَكْعَتَا الضُّحٰى .

(আহমদ, দারাকুতনী, বায়হাকী, হাকিম)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَىَّ فَرَائِضِ وَلَكُمْ تَطَوَّعٌ ، النَّحْرُ وَالْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ .

(হাকিম, দারা কুত্‌নী)

এই হাদীসে رَكْعَتَا الضُّحٰى এর পরিবর্তে رَكْعَتَا الْفَجْرِ বলা হয়েছে।

عَنْ عَبَّاسٍ : ثَلَاثٌ عَلَىَّ فَرِيْضَةٌ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوَّعٌ ، الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ وَرَكْعَتَا الضُّحٰى .

---

৪০. প্রাগুক্ত।

৪১. প্রাগুক্ত, ২২।

www.pathagar.com

(আহমাদ, তাবরানী) এখানে فجر এর স্থলে رَكْعَتَا الْفَجْرِ বলা হয়েছে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (مرفوعًا) : اَلْوِتْرُ عَلَىَّ فَرِيْضَةً وَهُوَ بِكُمْ تَطَوَّعٌ ، والاَضْحٰى ، عَلَىَّ فَرِيْضَةٌ وَهُوَ لَكُمْ تَطَوَّعٌ

এ হাদীসে رَكْعَتَا الضُّحٰى এর স্থলে غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ এর উল্লেখ রয়েছে–তাছাড়া হাদীসের বচনভঙ্গিও ভিন্ন ধরনের। নিয়ম আছে যে, اِضْطِرَابْ সম্বলিত হাদীস প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও তার রাবীগণ সিকাহ হোক না কেন। সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা বিত্র সুন্নাত বলে সাব্যস্ত হতে পারে না।[৪২]

বিত্র নামায এক সালামে তিন রাক'আত আদায় করা ওয়াজিব

বিত্রের নামায কত সালামে কত রাক'আত আদায় করতে হবে ? এ ক্ষেত্রে হাদীসের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা বিদ্যমান থাকলেও অধিকাংশ হাদীস থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিত্রের নামায এক সালামেই তিন রাক'আত আদায় করা ওয়াজিব। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবাগণের সারা জীবনের আমল।[৪৩]

এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عنهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ ، يَقْرَأُ فِىْ الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى ، وَفِىْ الثَّانِيَةِ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ .

رواه الدار قطنى والطحاوى والحاكم وصححه آثار السنن (٣-١٢)

وقال الحافظ فى التلخيص الحبير (٣-١١٨) : قال العقيلى : اسناده صالح ولكن حديث ابن العباس وابى ابن كعب باسقاط المعوذتين أصح ، وقال ابن الجوزى : انكر أحمد محى بن معين زيادة المعوذتين اهـ .

আমারা (র) হযরত আয়েশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে নবী করীম (সা) বিত্র তিন রাক'আত আদায় করতেন। প্রথম রাক'আতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى (সূরা আল-আলা) দ্বিতীয় রাক'আতে قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ (সূরা কাফিরূন) এবং তৃতীয় রাক'আতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

---

৪২. প্রাগুক্ত।

৪৩. (ক) রাদ্দুল মুহতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪১।
(খ) বাদাইউস সানায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ, ৬০৯।
(গ) বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭৫।

www.pathagar.com

(সূরা-ইখলাস) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ও (সূরা-আল-ফালাক) ও قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (সূরা-নাস) পাঠ করতেন।[৪৪]

عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهٗ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ (اى تهجد) رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ فِىْ غَيْرِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّىْ ثَلاَثًا .

الحديث رواه البخارى (١-١٥٤) ومسلم (١-٢٥٤)

হযরত আবু সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান একদা হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। রামাযানের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) -র নামায (তাহাজ্জুদ) কিরূপ ছিল ? তখন তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) রমযান ও রমযানের বাইরে এগার রাক'আতের চেয়ে বেশী পড়তেন না। প্রথমে চার রাক'আত আদায় করতেন। এর সৌন্দর্যের কথা জিজ্ঞাসার দরকার নেই। অতঃপর আরো চার রাক'আত পড়তেন যার দীর্ঘতা ও সৌন্দর্যের কথা জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। সর্বশেষে তিনি তিন রাক'আত (বিত্‌র) আদায় করতেন।[৪৫] (বুখারী মুসলিম)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ دَخَلَ الْمَنْزِلَ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهُمَا رَكْعَتَيْنِ اَطْوَلَ مِنْهَا ، ثُمَّ اَوْتَرَ بِثَلاَثٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ .

رواه أحمد واسناده يعتبر به ، اثار السنن (ص : ١٠) قلت : اما أبو النصر فلا سئل عنه فان شيوخ احمد ثقات كلهم ، ومحمد بن راشد متكلم فيه وقد وثق ويزيد بن يعفر قال الدار قطنى يعبر به ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال الذهبى فى الميزان، ليس بحجة تعجيل المنفعة (ص : ٤٥٥) وهذا تليسين هين ، فالاسناد حسن ، وذكره الحافظ فى التلخيص (١-١١٤(ايضا وسكت عنه .

হযরত সাঈদ ইব্‌ন হিশাম (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এশার নামায আদায় করে ঘরে আসতেন। অতঃপর দুই রাক'আত নামায পড়তেন, এরপর পূর্বের চেয়ে লম্বা করে আরো দু'রাক'আত আদায় করতেন এর পর তিন রাক'আত বিতর পড়তেন যার মাঝে কোন ব্যবধান সৃষ্টি করতেন না।[৪৬] (আহমাদ)

---

৪৪. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, ২৭ পৃ অধ্যায় : বিতর তিন রাক'আত এক সালামে।

৪৫. ই'লাউস-সুনান, প্রাগুক্ত, ২৯, খণ্ড-৬।

৪৬. প্রাগুক্ত ২৭ পৃ. খ. ৬।

www.pathagar.com

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِكَمْ كَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ ؟ قَالَتْ : بِاَرْبَعٍ وَّثَلٰثٍ ، وَسِتٍّ وَّثَلٰثٍ وَّثَمَانٍ وَّثَلٰثٍ وَعَشَرَةٍ وَّثَلٰثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِاَكْثَرِ مِنْ ثَلٰثَ عَشَرَةَ وَلاَ انْقَصَ مِنْ سَبْعٍ .

رواه أحمد وأبو داؤد الطحاوى واسناده حسن (اثار السنن ، ص : ١١/٢)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবু কায়স (র) বলেন, আমি হযরত আয়েশা(রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয় রাক'আত দ্বারা (রাত্রের নামাযকে) বিতর (বেজোড়) করতেন ? আয়েশা (রা) বললেন, কখনো চার রাক'আত (নফল) পড়ে তিন রাক'আত দ্বারা (নামাযকে) বেজোড়ে করতেন, কখনো ছয় রাক'আত পড়ে তিন রাক'আত দ্বারা বেজোড় করতেন, কখনো আট রাক'আত পড়ে তিন রাক'আত দ্বারা বেজোড় বানাতেন, কখনো দশ রাক'আত পড়ে তিন রাক'আত দ্বারা বেজোড় করতেন। কিন্তু তিনি (তাহাজ্জুদসহ) মোট সাত রাক'আতের কম এবং তের রাক'আতের অধিক কখনো (রাতের) বেজোড় নামায পড়েন নি।[৪৭] (আহমাদ, আবূ দাউদ ও ত্বহাবী)

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামায তো পর্যায়ক্রমে কম বেশী হতো। কিন্তু তিনি বিতর সর্বদা তিন রাক'আতই আদায় করতেন। এতে কোন পরিবর্তন হতো না। এই হাদীস দ্বারা বিতর তিন রাক'আত হওয়ার বিষয়টি সুদৃঢ়ভাবেই পমাণিত হয়।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَيْقَظَ وَتَوَضَّا، وَهُوَ يَقُوْلُ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى خَتَمَ السُّوْرَةَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّ رَكْعَتَيْنِ فَاطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ ، ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ كُلَّ ذٰلِكَ يَسْتَاكَ وَيَتَوَضَّاَ وَيَقْرَاَ هٰؤُلاَءِ الْاٰيَاتِ ثُمَّ اَوْتَرَ بِثَلاَثٍ .

الحديث رواه مسلم بطريق على بن عبد اللّٰه بن عباس عنه (١-٢٦١)

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিদ্রা গিয়ে ছিলেন। অতঃপর (দেখলেন যে) তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে উঁচু করে ইন্না ফী খালকিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পড়লেন। এর পর দাঁড়িয়ে দু'রাক'আত নামায আদায় করলেন। এতে কিয়াম, রুকূ' ও সিজ্দা খুব দীর্ঘায়িত করলেন। অতঃপর বিছানায় ফিরে আসলেন এবং নাক ডেকে ঘুমালেন। অতঃপর তিনি এরূপ তিন বারে ছয় রাক'আত পড়লেন প্রত্যেকবারেই-(জাগ্রত হয়ে) মিসওয়াক করে অযু করতেন এবং এ সব

৪৭. প্রাগুক্ত, ২৫।

www.pathagar.com

আয়াত পাঠ করতেন। অতঃপর তিন রাক'আত বিত্‌র আদায় করেন।[৪৮] উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে বিতর তিন রাক'আত। আর এটাই হচ্ছে হানাফী মাযহাব।

এ ক্ষেত্রে কিছু কিছু হাদীস এমনও রয়েছে যার দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, বিতর তিন রাক'আতের চেয়ে কম বা তার চেয়ে বেশী। নিম্নে সে সমস্ত হাদীসের যথাযথ ব্যাখ্যা পেশ করা হল।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা বুঝার পূর্বে বুঝতে হবে যে, হাদীসসমূহের মধ্যে اِيْتَارٌ শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে : (ক) শুধু বিতরের অর্থে (খ) সালাতুল্লাইলের (রাতের নামায) অর্থে।[৪৯]

উল্লেখ্য যে, (اِيْتَارٌ بِرَكْعَةٍ থেকে اِيْتَارٌ بِسَبْعِ عَشَرَةَ رَكْعَةً) অর্থাৎ এক রাক'আত থেকে শুরু করে সতের রাক'আত পর্যন্ত বিতর পড়ার কথা হাদীসে পাওয়া যায়।

যেই সমস্ত হাদীসে كَانَ يُوْتِرُ بِاَحْدٰى عَشَرَ ، كَانَ يُوْتِرُ بِتِسْعٍ كَانَ يُوْتِرُ بِسَبْعِ عَشَرَةَ ، كَانَ يُوْتِرُ بِخَمْسِ عَشَرَةَ ، كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثَ عَشَرَةَ বর্ণিত আছে এই সকল হাদীসের ক্ষেত্রে সকল ফুকাহায়ে কিরাম একমত পোষণ করেছেন যে, এখানো اِيْتَار দ্বারা উদ্দেশ্য সালাতুল্লাইল। (তাহাজ্জুদের নামায)

ফুকাহায়ে আহনাফ বলেন, অনুরূপ যে হাদীসে كَانَ يُوْتِرُ بِخَمْسٍ বা كَانَ يُوْتِرُ بِسَبْعٍ উল্লেখ রয়েছে তাতেও اِيْتَار দ্বারা সালাতুল্লাইল উদ্দেশ্য। এ হিসাবে সাত রাক'আতের ক্ষেত্রে চার রাক'আত নফল আর তিন রাক'আত বিত্‌র এবং পাঁচ রাক'আতের ক্ষেত্রে দুই রাক'আত নফল আর তিন রাক'আত বিত্‌র বলে গণ্য হবে।[৫০]

কিন্তু আয়েশা (রা)-এর একটি হাদীস দ্বারা উক্ত বিশ্লেষণের উপর একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। উক্ত হাদীসটি তিরমিযী শরীফে উল্লেখ আছে ঃ[৫১]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْ ذٰلِكَ بِخَمْسٍ لَايَجْلِسُ فِىْ شَىْءٍ مِنْهُنَّ اِلاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ .

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায তের রাক'আত দিল তন্মধ্যে পাঁচ রাক'আত দ্বারা বিতর পড়তেন এবং এই পাঁচ রাক'আতের শেষে তিনি বৈঠক করতেন। এই হাদীস এক সালামে পাঁচ রাক'আত আদায়ের কথা উল্লেখ রয়েছে যার দ্বারা বুঝা যায় যে, বিতর পাঁচ রাক'আত।

এর উত্তর হলো, আসলে তিন রাক'আত বিতরের সাথে দু'রাক'আত নফলও শামিল রয়েছে। যা হাদীসে উল্লেখিত لَا يَجْلِسُ (তিনি বসতেন না)-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল তিনি দু'আ ও যিকির ইত্যাদির জন্য তেমন লম্বা বৈঠক করতেন না। এর দ্বারা মৌলিক বৈঠককে বাদ দেওয়া

---

৪৮. ই'লাউস সুনান, ৩১ পৃ. খণ্ড ৬।

৪৯. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮।

৫১. তিরমিযী শরীফ, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য নয়। তাই তো দেখা যায় যে, বিতরের পর দু'আ করা হয় না এবং নফলের পরই করা হয়।

আল্লামা শাববীর আহমদ উসমানী (র) ফাত্হুল মুলহিমে এর আরেকটি উত্তর এরূপ দিয়েছেন, উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হল ঃ

مَا كَانَ يُصَلِّى شَيْئًا مِّنْ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ جَالِسًا اِلاَّ الرَّكْعَتَيْنِ الْاٰخِرَتَيْنِ فَانَّهُ كَانَ يُصَلِّيْهِمَا جَالِسًا .

রাসূলুল্লাহ (সা) এই নামাযের কোন অংশই বসে আদায় করতেন না। তবে শেষ দু'রাক'আত তিনি বসে পড়তেন। অর্থাৎ তের রাক'আতের মধ্যে আট রাক'আত নফল ও তিন রাক'আত বিতর দাঁড়িয়ে অতঃপর সর্বশেষ দুই রাক'আত নফল বসে আদায় করতেন।[৫২] এ ব্যাখ্যাটি অতি উত্তম। কেননা নবী করীম (সা) কখনো কখনো তাহাজ্জুদের নামায বিতরের পূর্বে বা পরে বসে পড়তেন। বিতরের পরে দুই রাক'আত নফল বসে পড়া অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন নাসাঈ, অধ্যায় দিনে নফল ও রাতে তাহাজ্জুদ, পরিচ্ছেদ বিতর এবং ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাতের মাঝে নামায পড়া জায়িয। খ. ১, পৃ. ২৫৩-তে আছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، تِسْعَ رَكْعَاتٍ قَائِمًا يُوْتِرُ فِيْهَا وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَيَفْعَلُ ذٰلِكَ بَعْدَ الْوِتْرِ .

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) (রাতে) এগার রাক'আত নামায পড়তেন। তন্মধ্যে বিতরসহ নয় রাক'আত দাড়িয়ে আর বাকি দুই রাক'আত বসে পড়তেন। তবে রুকূ'র সময় দাঁড়িয়ে রুকূ করতেন অতঃপর সিজ্দা দিতেন। তিনি বিতরের পরে এরূপ করতেন।

সহীহ বুখারী শরীফের হযরত আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসেও এ বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যায়।

لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ صَلاَةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتّٰى اَسَنَّ فَكَانَ يَقْرَاءُ قَاعِدًا حَتّٰى اِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ قَامَ الخ .

আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাতুল্লাইল কখনো বসে আদায় করতে দেখিনি। তবে যখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হলেন তখন বসে কিরা'আত পড়তেন এবং রুকূর সময় উঠে গিয়ে রুকূ করতেন।[৫৩] (বুখারী, খণ্ড ১, পৃ. ১৫০)।

হযরত সা'দ ইব্ন হিশামের সূত্রে আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে সহীহ মুসলিম উল্লেখিত এক হাদীসে বর্ণিত আছে। সা'দ ইব্ন হিশাম (র) বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ

---

৫২. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-২১৯।

৫৩. (টীকা নং ১) দরসে তিরমিযী।

www.pathagar.com

يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْبِئِيْنِىْ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : كُنَّا نَعُدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ مَا شَاءَ اَنْ يَّبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلَيَّسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّى تِسْعَ رَكَعَاتٍ ، لاَ يَجْلِسُ فِيْهَا الاَّ فِىْ الثَّامِنَةِ ، فَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُوْمُ وَيُصَلِّى التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا ، ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَىَّ .

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতে মোট এগার রাক'আত নামায পড়তেন। তন্মধ্যে বিত্র সহ নয় রাক'আত এক সাল্লামে দুই বৈঠকে আদায় করতেন। প্রথম বৈঠক অষ্টম রাক'আতের শেষে এবং শেষ বৈঠক করতেন নবম রাক'আতের পরে। অতঃএব সালাম ফিরাতেন। এরপর দুই রাক'আত নফল পড়তেন। এতে মুশকিলের বিষয় হল প্রথম বৈঠক আট রাক'আতের মাথায় হওয়া এবং তাহাজ্জুদ ও বিতরের মাঝে মাঝে কোন ব্যবধান না করা।

আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী ফাতহুল মুসহিমে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর এভাবে দিয়েছেন যে, মৌলিকভাবে এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, রাসূলুল্লাহ (সা) এর রাতের নামাযের বিবরণ প্রদান করা ঃ এ মর্মে যে, এগারো রাক'আতের মধ্যে ছয় রাক'আত তাহাজ্জুদের তিন রাক'আত বিত্‌রের আর বিত্‌রের পরে আরো দুই রাক'আত নফল, তবে لاَ يَجْلِسُ الاَّ فِى الثَّامِنَةِ বাক্যের দ্বারা স্বাভাবিক বৈঠক বাদ দেওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং এরূপ বৈঠকের নফী করা উদ্দেশ্য যার পরে সালাম হয় না। সারকথা হলে, তিনি আট রাক'আতের আগে আগে প্রত্যেক বৈঠকে সালাম ফিরাতেন কিন্তু অষ্টম রাক'আতে এসে সালাম না ফিরিয়ে শুধু আত্‌তাহিয়্যাতুর বৈঠক করে নবম রাক'আতের জন্য দাড়িয়ে যেতেন যা আসলে বিত্‌রের তৃতীয় রাক'আত ছিল। অতঃপর তিনি বিত্‌র পড়ে দু' রাক'আত নফল পড়তেন। এ ব্যাখ্যার আলোকে উক্ত হাদীস হানাফী মাযহাবের সপক্ষে এসে যায়। তাছাড়া উক্ত হাদীসের এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান না করা ছাড়া কোন গত্যান্তরও নেই। কেননা স্বয়ং হযরত আয়েশা (রা) থেকে এরূপ বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে যার দ্বারা একথা সাব্যস্ত হয় যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক দু' রাক'আতের শেষে বসে সালাম ফিরাতেন। সর্বশেষে তিন রাক'আত বিত্‌র আদায় করতেন।[৫৪] এর সমর্থনে নিম্নে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হল ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ دَخَلَ الْمَنْزِلَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهُمَا رَكْعَتَيْنِ اَطْوَلَ مِنْهُمَا ثُمَّ اَوْتَرٰى بِثَلاَثٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ . رواه أحمد باسناد يعتبر به آثار السنن (١٦٢) باب الوتر بثلاثة ركعات

৫৪. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০-৩২৩।

এ হাদীস দ্বারা বুঝে আসে, হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসে উল্লেখিত দ্বারা বাহ্যিক অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়।[৫৫]

আল্লামা আইনী (রা) উমদাতুল কারীতে (খণ্ড ঃ ৭, পৃ. ৮) হাদীসটির ব্যাখ্যা ভিন্নভাবে প্রদান করত বলেন যে, এখানে প্রশ্ন কারী সা'দ ইবন হিশাম-এর উদ্দেশ্য আয়েশা (রা) থেকে নবী করীম (সা)-এর বিত্‌র আদায় প্রসঙ্গে ছিল, সালাতুল্লাইল সম্পর্কে নয়। এ জন্য হযরত আয়েশা (রা) মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সংক্ষিপ্তাকারে উত্তর প্রদান করেছেন। তাই বিত্‌রের বৈঠক ও সালামের কথা তো উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অন্যান্য রাক'আত সমূহের বৈঠক ও সালামের কথা উল্লেখ করেননি। لاَ يَجْلِسُ الاَّ فِى الثَّـامِنَةِ সালাতুল্লাইলের বৈঠক ও সালাম অস্বীকার করা তার মোটেই উদ্দেশ্য ছিলনা। বরং তার উদ্দেশ্য হল, সালাতুল্লাইলের সমষ্টি থেকে অষ্টম রাক'আত হত বিতরের দ্বিতীয় রাক'আত তাতে তিনি বসতেন সালাম ফিরাতেন না। এরপর তৃতীয় রাক'আত মিলিয়ে সালাম ফিরাতেন। এভাবে বিতর তিন রাক'আত আদায় করতেন। যেন আয়েশার এ কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিতরের মধ্যে দুই রাক'আত অন্তে সালাম ফিরাতেন না বরং তৃতীয় রাক'আত অন্তে সালাম ফিরাতেন।[৫৬] আল্লামা যফর আহমদ উসমানী (র) 'ইলাউস সুনান' গ্রন্থে এ হাদীসটির তৃতীয় একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, لاَ يَجْلِسُ فِيْهَا الا فِى الثَّامِنَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا এর অর্থ হল, لاَ يَقْعُدُ الْقُعُوْدَ الطَّوِيْلِ وَلاَ يُسَلِّمُ بِالْجَهْرِ وَالشَّدَّةَ حَتّٰى يَقْعُدَ فِى الثَّامنَةَ فَيُطِيْلُ الْقُعُوْدَ وَلاَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّى التَّاسِعَةَ فَيَقْعُدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً شَدِيْدَةً অর্থাৎ তিনি লম্বা বৈঠক করতেন না এবং উচ্চস্বরে সালাম দিতেন না। তবে অষ্টম রাক'আত শেষ করে বসতেন, কিন্তু সালাম ফিরাতেন না। এর পর নবম রাক'আত পড়ে নিতেন। অতঃপর উচ্চস্বরে সালাম ফিরাতেন। আল্লামা উসমানী (র) বলেন, এ কথা স্পষ্ট যে, এরূপ তারও ভাষ্য দ্বারা দুই রাক'আত অন্তর সালাম না ফিরানো এবং বৈঠক বর্জন করা আদৌ বুঝা যায় না। তবে এতটুকু সাব্যস্ত হয় যে তিনি অষ্টম ও নবম রাক'আতের আগে লম্বা বৈঠক করতেন না এবং উচ্চস্বরে সালামও ফিরাতেন না।[৫৭]

তিন রাক'আত এক সালামেই আদায় সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ، كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يُوْتِرُ بِثَلٰثٍ لاَ يُسَلِّمُ الاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ.

أخرجه الحاكم (١-٢٠٤) واستشهد به وقال : وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعنه أخذه أهل المدينة ...... وسكت عنه الذهب فى تلخيص نحو حسن وكذا نقله الزيلعى (١-٢٧٧) فى نصب الراية بلفظ

৫৫. টিকা– দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত. পৃ. ২২২।

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২/১।

৫৭. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, ৪৪ পৃ.।

www.pathagar.com

"لايسلم" وكـذا نقله الحـافظ فى الدراية (١١٤) بلفظ "لا يسلم الا فى اخرهن، وكلاهما عزاه الى الحاكم .

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বিতর তিন রাক'আত পড়তেন এবং সমস্ত রাক'আত শেষ করেই সালাম ফিরাতেন।[৫৮] (হাকিম)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لاَ يُسَلِّمُ فِىْ رَكْعَتَى الْوِتْرِ .

رواه النسائى (١-٢٤٨) وفى اثار السنن (٢-١٢) اسناده صحيح ، أخرجه الحاكم فى المستدرك (١-٢٠٤) بلفظ : قالت : كان رسول اللّٰه ﷺ فى الركعتين الاولين من الوتر ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، واقره عليه الذهبى فى تلخيصه وقال على شرطها .

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিতরের দুই রাক'আত অন্তে সালাম ফিরাতেন না।[৫৯] (নাসাঈ)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلٰثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ .

أخرجه الدار قطنى (١-١٧٣ وقال يحى بن ذكريا هذا يقال له ابن ابى الحواجب ضعيف ولم يروه عن اعمش غيره اهـ قلت ، ابن ابى الحواجب ذكره ابن حبان فى الثقات كما فى إللسان (٦-٢٥٥) فارجل مختلف فيه ومثله يعتبر به الاسيما ولما رواه شاهد فقد اخرج الدار قطنى أيضا عن اسماعيل بن مسلم المكى عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة مرفوعًا نحوه سواء ومن طريق الدار قطنى رواه ابن الجوزى فى العلل ، واعله اسماعيل بن مسلم المكى كما فى نصب الراية (١-٢٧٧) واسماعيل هذا وان ضعفه الناس ولكن قال أبو حاتم ليس بمتروك يكتب حديث وكذا قال ابن عدى : انه ممن يكتب حدثه ، وقال ابن سعد ، قال محمد بن عبد اللّٰه الانصارى : كان له رائى وفتوى

৫৮. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, ৩৩ পৃ.।

৫৯. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

وبصـر وحـفظ للحـديث ، فكنت اكـتب عنه لنبـاهـة اهـ من التـهـذيب ملخصا ٢٣٢ ، فالحديث حسن مرفوعًا على الاهل الذى ذكرناه غير مرة ، والرفع زيادة لا تنا فى الوقف ، فـتـقـبل ممن اخـتلف فى توثيـقـه ، وبالأولى اذا كان له شاهد مثله ، ....

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, দিনের বিতর অর্থাৎ মাগরিবের নামাযের ন্যায় রাতের বিতরও তিন রাক'আত।[৬০]

এ হাদীসে নবী করীম (সা) রাতের বিতরকে দিনের বিতর মাগরিবের নামাযের সাথে তুলনা করেছেন এবং উভয়ের সাদৃশ্যতা ব্যক্ত করেছেন। এর দাবী এটাই যে, মাগরিবের ন্যায় বিতরও এক সালামেই তিন রাক'আত আদায় করা হবে।

عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : قَالَ : يَا اَبَا مُحَمَّدٍ! خُذْ عَنِّيْ ، فَاِنِّيْ اَخَذْتُ عَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، وَاَخَذُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللّٰهَ ، وَلَنْ تَأْخُذَ عَنْ اَحَدٍ اَوْثَقَ مِنِّيْ قَالَ ، ثُمَّ صَلّٰى بِيْ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلّٰى سِتَّ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكَعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ بِثَلٰثٍ يُسَلِّمُ فِيْ اٰخِرِهِنَّ .

رواه وابن عساكر ورجاله ثقات ، كنز العمال (٤-١٩٦) قلت وهذا فى حكم المرفوع .

হযরত সাবিত আনাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একদা আনাস (রা) বললেন, হে আবু মুহাম্মদ ! তুমি আমার থেকে গ্রহণ কর, কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে গ্রহণ করেছি। আর রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ্ পাকের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন, (জেনে রাখ) তুমি আমার চেয়ে নির্ভরযোগ্য অন্য কারো থেকে গ্রহণ করতে পারবে না। সাবিত (রা) বললেন, অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে এশার নামায পড়লেন। অতঃপর ছয় রাক'আত পড়লেন এবং প্রতি দুই রাক'আত অন্তে সালাম ফিরালেন। অতঃপর তিন রাক'আত আদায় করলেন এবং শেষে সালাম ফিরালেন।[৬১] (অর্থাৎ এক সালামেই তিন রাক'আত বিত্‌র পড়েছেন)

উপরোল্লেখিত হাদীসের মাঝে বিতর তিন রাক'আত এক সালামে আদায় করার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া বিতর মোট তিন রাক'আত। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীস সমূহের মধ্যে কোথাও দুই সালামে আদায়ের কথা উল্লেখ নেই। বাস্তবেই যদি দুই সালামের সাথে তিন রাক'আত পড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমল হতো, তাহলে এটি একটি অস্বাভাবিক আমল বলে গণ্য হতো, এবং সাহাবায়ে কিরাম এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অবশ্যই উম্মাতের সম্মুখে . তুলে ধরতেন।

---

৬০. প্রাগুক্ত, ৪০ পৃ.।

৬১. প্রাগুক্ত, ৪১।

www.pathagar.com

কাজেই হাদীসের মধ্যে যেহেতু সরাসরি দুই সালামের কথা উল্লেখ নেই তাই একথা বলাই যথাযোগ্য যে, নবী করীম (সা) বিতরের তিন রাক'আত মাগরিবের ন্যায় এক সালামেই আদায় করতেন।

তবে মুসতাদরাকে হাকিম গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, كَانَ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ وَكَانَ يَتَكَلَّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিতর এক রাক'আত পড়তেন এবং তিনি এক রাক'আত ও দুই রাক'আতের মধ্যবর্তী সময়ে কথাবার্তা বলতেন।[৬২]

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে নবী করীম (সা) দুই রাক'আতের মাথায় সালাম ফিরিয়ে এক রাক'আত দ্বারা বিত্র করতেন। এর দ্বারা বাহ্যত দুই সালামে বিতর পড়ার বিষয়টি ফুটে উঠে। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র)-এর উত্তরে বলেন যে, এ হাদীসে تكلم (কথাবার্তা) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফজরের দু রাক'আত সুন্নাত এবং বিতরের মধ্যবর্তী সময়ে কথাবার্তা বলতেন। অর্থাৎ নবী করীম (সা) সালাতুল্লাইল এবং বিত্রের নামায শেষ পরে ফজরের সুন্নাতের পূর্বে কিছু কথাবার্তা আলাপ আলোচনা করে নিতেন। যেন হাদীসে উল্লেখিত, كَانَ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ একটি প্রথম ও স্বয়ং সম্পূর্ণ বাক্য যার মর্ম হল, রাসুলুল্লাহ্ (সা) পূর্বের দুই রাক'আতের সাথে এক রাক'আত যোগ করে বিতর সম্পূর্ণ করতেন। অনুরূপভাবে وَكَانَ يَتَكَلَّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ এটিও একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বাক্য। এখানে رَكْعَتَيْنِ (দুই রাক'আত) দ্বারা উদ্দেশ্য ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত আর رَكْعَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ঐ এক রাক'আত যার দ্বারা পূর্বের দুই রাক'আতকে বিতর করতেন।

মোদ্দাকথা হল, ركعتين দ্বারা ফজরের সুন্নাত বুঝানো উদ্দেশ্য বিতরের প্রথম দুই রাক'আত নয়, সম্ভবত এ কারণেই হাদীসে وَكَانَ يَتَكَلَّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ مِنَ الْوِتْرِ (এবং তিনি বিতরের প্রথম দুই রাক'আত এবং শেষের রাক'আতের মাঝে কথা বলতেন) এরূপ ভাষা প্রয়োজন করা হয়নি। অতএব এক সালামে তিন রাক'আত বিতর আদায় সম্বলিত হাদীস সমূহের মধ্যে কোন প্রকারের দ্বন্দ্ব বা জটিলতা নেই বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।[৬৩] সর্বোপরি প্রায় সকল মনীষীই বিতর এক সালাম তিন রাক'আত আদায় করতেন বলে কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি নমুনা পেশ করা হল।

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ : دَفَنَّا اَبَا بَكْرٍ لَيْلاً ، فَقَالَ عُمَرُ : اِنِّىْ لَمْ اُوْتِرَ ، فَقَامَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ ، فَصَلَّى بِنَا ثَلٰثَ رَكَعَاتٍ لَمْ يُسَلِّمْ اِلاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ .

أخرجه الطحاوى (١-١٧٣) وفى اثار السنن : اسناده صحيح (١٢-٢)

৬২. ২ নং টিকা–দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ২২৩-২২৪ পৃ.।

৬৩. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

(ক) মিসওয়ার ইবন মাখরাখা (রা) বলেন, আমরা হযরত আবূ বকর (রা)-এর দাফনকার্য রাত্রি বেলায় সমাধা করলাম। সে মুহূর্তে হযরত উমর (রা) বললেন, আমি তো বিত্‌র পড়িনি, তখন আমরা তাঁর পিছনে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে তিন রাক'আত পড়লেন এবং সর্বশেষে সালাম ফিরালেন।[৬৪] (তাহাভী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : اَلْوِتْرُ ثَلٰثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ .

أخرجه الطحاوى (١-١٧٣) وفى اثار السنن : اسناده صحيح (١٢-٢)

(খ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, বিতর তিন রাক'আত দিনের বিতরের (মাগরিবের নামাযের) ন্যায়।[৬৫]

عَنْ اَنَسٍ قَالَ : اَلْوِتْرُ ثَلٰثُ رَكَعَاتٍ ، وَكَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ

قال الحافظ فى الدراية (١١٥) اسناده صحيح أخرجه الطحاوى فى معانى الاثار (١-١٧٣)

(গ) হযরত আনাস (রা) বলেন, বিতর তিন রাক'আত এবং তিনি নিজেও বিতর তিন রাক'আত আদায় করতেন।[৬৬]

عَنْ اَبِىْ الزِّنَادِ قَالَ : اَثْبَتَ عُمَرَ بْنُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ الْوِتْرَ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ ثَلَاثًا لَا يُسَلِّمُ اِلاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ . (رواه الطحاوى ، وفى اثار السنن اسناده صحيح) ١-١٧٥

(ঘ) আবুয যিনাদ (র) বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) ফুকাহায়ে কিরামের মতানুযায়ী এ কথার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, বিতর তিন রাক'আত। তন্মধ্যে সর্বশেষ রাক'আতের পরই সালাম ফিরাতে হবে।[৬৭]

হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-কর্তৃক ফুকাহায়ে কিরামের মতানুযায়ী এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ উক্ত বিষয়ে মদীনা বাসীদের ঐকমত্য পোষণের একটি বিশেষ দলীল।

সাহাবায়ে বিরামের মধ্যে শুধু আবদুল্লাহ্ ইবন উমর, সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্‌কাসা এবং মু'আবিয়া (রা) সম্পর্কেই জানা যায়,যে, তাঁরা বিতর তিন রাক'আত দুই সালামে আদায় করতেন। অথচ হাদীস ভাণ্ডারে এর স্পষ্ট কোন দলীল নেই–অবশ্য ইবন উমর (র) সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে,

৬৪. ই'লাউস সুনান, ৩৫ পৃ.।

৬৫. প্রাগুক্ত, ৩৬ পৃ.।

৬৬. প্রাগুক্ত।

৬৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ : « أَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ شَفْعَهُ وَوِتْرِهِ بِتَسْلِيْمَةٍ وَأَخْبَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ » (رواه الطحاوى وقال : إسناده قوى)

হযরত সালিম তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি (বিতরের) প্রথম দুই রাক'আত এবং শেষ রাক'আতের মাঝে সালামের দ্বারা ফাসিলা সৃষ্টি করতেন। (অর্থাৎ দুই সালামে বিত্‌র পড়তেন) এবং তিনি (উদ্বৃতি দিয়ে) বলতেন যে, করীম (সা) এরূপ করতেন।[৬৮]

হাফিয ইব্‌ন হাজার আসকালানী (ফাতহুল বারী, ২ ঃ ২০১) গ্রন্থে বলেন : হাদীসের বাহ্যিক ভাষ্য হল, ইবন উমর (রা)-এর সাধারণ নিয়ম ছিল একই সাথে তিন রাক'আত নামায পড়া। তবে কোন প্রয়োজন বা সমস্যা দেখা দিলে তিনি দু'রাকআত পড়ে ক্ষান্ত করতেন। অতঃপর তার উপর বিনা করে আরেক রাক'আত পড়ে নিতেন। ইব্‌ন উমর (রা) সহ আরো কয়েক জন মনীষীর মতে বিতরের মধ্যে সালাম কালামের পর এমনকি পেশাব পায়খানা এবং ঘুমের পরও শেষ রাক'আতের-বিনা প্রথমাংশের উপর জায়িয রয়েছে। কিন্তু জমহুর ফুকাহায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত মাশহুর ও সহীহ্ হাদীসসমূহের আলোকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, নামাযে (চাই তা বিতর হোক বা অন্য কোন নামায হোক) যে কোন দুনিয়াবী কথা কলার দ্বারা ভঙ্গ হয়ে যায়। কথা কমহোক বা বেশী হোক ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাতে কোন পার্থক্য নেই।[৬৯]

মোটকথা হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) সাধারণত তিন রাক'আত এক সাথেই পড়তেন। তবে দুই রাক'আত অন্তে সালাম কালাম করা তৃতীয় রাক'আতের বিনার ক্ষেত্রে তাঁর মতে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। আর এ সালাম কালামে পূর্বের তাহরীমা অটুট থাকবে। তাহলে এ ব্যাপারে ইবন উমর (রা) থেকেও একটি মত এ মর্মে পাওয়া গেল যে বিতর মোট তিন রাক'আত এক রাক'আত নয়। এর আরো প্রমাণ হল যে, উকবা ইব্‌ন মুসলিম (র) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর নিকট বিতর সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি জান ? দিনের বিতর সম্পর্কে ? আমি বললাম হ্যাঁ মাগরিবের নামায অর্থাৎ বিতরের নামায মাগরিবের নামাযের ন্যায়।[৭০]

তবে ইব্‌ন উমর (রা)-এর বক্তব্য اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ (নবী করীম (সা) এরূপ করতেন)-এর জবাব হলো আমাদের জানামত বিতরের রাক'আত সমূহের মঝে ফাসিলা বা বিরতির কথা مرفوع রূপে ইব্‌ন উমর (রা) ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

অথচ মনীষীদের এক বিশাল জামা'আত থেকে এর বিপরীত বর্ণনা রয়েছে। যেমন হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত আছে اَنَّهُ ﷺ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِىْ رَكْعَتَىِ الْوِتْرِ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিতরের

---

৬৮. প্রাগুক্ত, ২৪ পৃ.।

৬৯. প্রাগুক্ত।

৭০. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

দু'রাক'আত অন্তে সালাম ফিরাতেন না। তার থেকেই বর্ণিত অপর রিওয়ায়াতে আছে كَانَ يُوْتِرُ بِثَلاَثٍ لاَ يُسَلِّمُ فِى رَكْعَتَى الْوِتْرِ

অপর এক বর্ণনায় كَانَ يُوْتِرُ بِثَلاَثٍ لاَ يُسَلِّمُ فِىْ اٰخِرِهِنَّ

অপর এক বর্ণনায় : ثُمَّ اَوْ تَرَ بِثَلاَثٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত আছে: وَلاَ يُسَلِّمُ اِلاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ

ইবনে মাসঊদ (রা) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلٰثَ كَوِتْرَ النَّهَارِ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ

রাতের বিতর দিনের বিতর মাগরিবের নামাযের মত তিন রাক'আত বিশিষ্ট।

এই সাদৃশ্যতাই প্রমাণ করে যে, মাঝে কোন সালাম নেই।[৭১] অনেক অনুসন্ধানের পর জানা যায় যে, ইবনে উমর উমর (রা)-র এ আমলটি শুধু শ্রবণের ভিত্তিতেই করেছেন। তিনি স্বচক্ষে নবী করীম (সা)-কে এ রূপে নামায পড়তে দেখেন নি। এ জন্যই দেখা যায় যে, কোথাও এ কথা উল্লেখ নেই, যে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ ধরনের আমল অর্জন করেছেন, কিংবা রাসূল তাঁকে শিখিয়েছেন।[৭২] সহীহ মুসলিমে তার থেকে বর্ণিত একটি হাদীস আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন। اَلْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ বিতর হল শেষ রাতে এক রাক'আত নামায। মূলত এ হাদীসই হল দুই সালাম প্রমাণের কেন্দ্রবিন্দু। উমর (রা) যখন দেখলেন যে, এ হাদীসে বিতর এক রাক'আত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে অন্য হাদীসে বিতর তিন রাক'আত বলেও নবী করীম (সা) থেকে সাব্যস্ত রয়েছে, এ জন্য তিনি উভয় হাদীসের মাঝে মিলও সামঞ্জস্য বজায় রাখতে গিয়ে বা উভয় হাদীসের উপর অমিল করার চিন্তা ধারায় তিন রাক'আত দুই সালামে আদায় করতেন। আর এটা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ইজাতিহাদ।[৭৩] কোন কোন ফকীহ ইবন উমর (রা)-এর ইজতিহাদমূলক আমলকে কেন্দ্র করে এমত ব্যক্ত করেন যে বিতর দুই সালামে আদায় করা চাই।

পক্ষান্তরে ফুকাহায়ে কিরাম বলেন যে, اَلْوِتْرُ رَكْعَةً مِّنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ মর্ম হল তাহাজ্জুদের দুই রাক'আত নামাযের সাথে আরেক রাক'আত যোগ করে উক্ত নামাযকে (বিতরের বা) তিন রাক'আতে পরিণত করা এ উদ্দেশ্য নয় যে, শেষ রাতে বিতরের কেবল এক রাক'আত আলাদা করা।

১. اِيتَار بِرَكْعَةٍ وَّاحِدَةٍ এর ক্ষেত্রে যদি ফুকাহায়ে কিরামের প্রদত্ত ব্যাখ্যা না মানা হয় তাহলে নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْبُتَيْرَاءِ اَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَاحِدَةً يُوْتِرُبِهَا .

---

৭১. প্রাগুক্ত।

৭২. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫।

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬।

www.pathagar.com

(রাসূলুল্লাহ্ (সা) بُتَيْرَاء থেকে নিষেধ করেছেন 'বুতাইরা' হল নামায এক রাক'আত পড়া।)-এর সাথে তার تعارض হয়ে যায়। নিয়ম আছে যে পন্থাবলম্বনে হাদীসদ্বয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয় তাই গ্রহণ করা উত্তম।

অতএব হানাফীদের প্রদত্ত ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। তাছাড়া نَهْى عَنِ الْبُتَيْرَاء এ হাদীসটি قولى হাদীস যার সারমর্শ হল রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক রাক'আত বিত্‌র স্বরূপ পড়তে নিষেধ করেছেন। আর ইব্‌ন উমর (রা) রিওয়ায়াতটি হল, فعلى (বা আমলী) তাতে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি এক রাক'আত (বিত্‌র স্বরূপ) পড়তেন। অতএব হাদীসদ্বয়ের মাঝে تعارض সৃষ্টি হল। নিয়ম হল قولى এবং فعلى রিওয়ায়াতের মাঝে تعارض হলে قولى রিওয়ায়াত প্রাধান্য পায়।

অধিকন্তু ইব্‌ন উমর (রা)-এর রিওয়ায়াতটি হল"مُبِيْحٌ" (বৈধকারী) আর نَهْى عَنِ الْبُتَيْرَاء-র হাদীসটি"مُحَرِّمٌ" (হারামকারী) নিয়ম হল, "مُبِيْحٌ" এবং"مُحَرِّمٌ" এর মাঝে تعارض হলে"مُحَرِّمٌ" এ প্রাধান্য পায়। কাজে ইবন উমর (রা) এর রিওয়ায়াতটি গ্রহণযোগ্য নয়।[৭৪]

কিন্তু এখানে এটা প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لاَ تُوْتِرُوْا بِثَلاَثٍ ، اَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ اَوْ بِسَبْعٍ وَّلاَ تُشَبِّهُوْا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ . (رواه الدار قطنى فى سنن ص : ٢٥ ج ٢)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, তোমরা তিন রাক'আতের দ্বারা বিত্‌র কর না বরং পাঁচ কিংবা সাত রাক'আত দ্বারা বিত্‌র কর। আর মাগরিবের নামাযের সাদৃশ্য গ্রহণ কর না।

বাহ্যতা এ হাদীসে দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিত্‌র তিন রাক'আত পড়তে নিষেধ করার পাশাপাশি মাগরিবের নামাযের সাদৃশ্য থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। এতে করে বুঝা যায় যে, উক্ত উপমার আমরা এক সালামে তিন রাক'আত আদায়ের বিষয়টি প্রমাণিত করা সঠিক নয়।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র) ফাতহুল মুলহিমে (খণ্ড ২য়, পৃ. ২৯৩, অধ্যায় ৯ সালাতুল্লাইল) বিস্তারিতভাবে এর উত্তর প্রদান করেছেন। তার সারাংশ হল। হাদীসটির মাঝে সজাগ দৃষ্টির সাথে মনোনিবেশ করলে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্য হল, তোমরা রাতের বিত্‌র আদায় করার ক্ষেত্রে মাগরিবের ন্যায় শুধু তিন রাক'আত পড়ে ক্ষান্ত হয়ো না এবং এর আগে দু'চার রাক'আত তাহাজ্জুদও পড়ে নিও।[৭৫]

উল্লেখ্য যে, হানাফী ফকীহগণ বিত্‌রের ক্ষেত্রে যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উম্মাতের সামনে তুলে ধরেছেন তাতে বিত্‌র সম্পর্কিত সমগ্র হাদীসে উপর আমল করা সহজ হয়ে যায়, এতে কোনে হাদীসের উপর আমল বাদ পড়ে না। পক্ষান্তরে যদি বিত্‌রের মধ্যে তিন এর কম বা বেশী কিংবা দুই সালামের আদায়ের প্রসঙ্গ টানা হয় তাহলে এতে করে অনেক হাদীসের উপর আমল করা থেকে বঞ্চিত হতে হয় এবং বহু হাদীসকে বাদ দিতে হয়।

৭৪. টীকা নং ২ দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮। দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১-২৩২।

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৩৪।

www.pathagar.com

কাজেই সামগ্রিক বিবেচনায় হানাফী ফকীহগণের দৃষ্টিভঙ্গি উম্মাতের জন্য সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে এবং সর্বোতভাবে হাদীসে নববীর সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় রাখে।[৭৬] সুতরাং বিত্র নামায এক সালামেই তিন রাক'আত আদায় করা অপরিহার্য।

বিত্র নামাযে সব সময় দু'আ কুনূত পড়া ওয়াজিব

দু'আয়ে কুনূত বিত্র নামাযের একটি বিশেষ অংশ। সারা বছরই বিত্রের শেষ রাক'আতে রুকূর পূর্বে দু'আয়ে কুনুত পড়া ওয়াজিব। দু'আয়ে কুনূত পাঠ সম্বন্ধীয় হাদীস সমূহের মাঝে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এ কথাই প্রতিভাত হয় যে সারা বছরই রুকূ'র পূর্বে পড়া ওয়াজিব।[৭৭]

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ الْاُوْلٰى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِيْ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِيْ الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ .

رواه النسائى (١-٧٤٨) وفى التلخيص الحبير (١-١١٨)

হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বিত্র তিন রাক'আত পড়তেন। তন্মধ্যে প্রথম রাক'আতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى (সূরায়ে আ'লা) দ্বিতীয় রাক'আতে قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ (সূরা কাফিরুন) এবং তৃতীয় রাক'আতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (সূরা ইখলাস) পড়তেন এবং রুকূ'র পূর্বে কুনূত পাঠ করতেন।[৭৮] (নাসাঈ)

عَنْ عَلْقَمَةَ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدَ وَاَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوْا يَقْنُتُوْنَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ .

رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه وهذا اسناد صحيح على شرط مسلم اسناده حسن (ص : ١١٦ ٢) وقال أبو بكر ابن ابى شيبة هذا الامر عندنا

হযরত আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। ইব্ন মাসউদ (রা) এবং নবী করীম (সা)-এর সাহাবাগণ বিত্রের মধ্যে রুকূ'র পূর্বে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করতেন।[৭৯] (মুসান্নাফে ইবন আবু শায়বা)

---

৭৬. প্রাগুক্ত।

৭৭. (ক) ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩-২৭৪।
(খ) বাদাইউস সানায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১২।

৭৮. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮, অধ্যায় দু'আ কুনূত প্রসঙ্গে।

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

www.pathagar.com

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ رَكْعَاتٍ وَيَجْعَلُ الْقُنُوْتَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ .

رواه الطبراني في الاوسط ، وفيه سهل بن العباس الترمذى ، قال الدار قطني ، ليس بثقة كذا في مجمع الزوائد (١-١٩٧ قلت ذكرناه اعتضادًا .

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বিতর নামায তিন রাক'আত আদায় করতেন এবং রুকূ'র পূর্বে দু'আয়ে কুনূত পড়তেন।[৮০] (তাবারানী– আওসাত)

উপরোল্লেখিত হাদীসত্রয়ের মাঝে দু'টি বিষয় লক্ষণীয় ঃ

প্রথমত, নবী করীম (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ বিত্‌রে দু'আয়ে কুনূত পড়তেন রুকূর পূর্বে। কিন্তু এতে নির্দৃষ্টভাবে একমাস বা দুইমাস বা রমযানের শুরু বা শেষে কিংবা অর্ধ বছর এরূপ কোন সময় সীমার কথা উল্লেখ নেই। হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহে একথা স্পষ্ট লিখা রয়েছে যে, নবী করীম ও সাহাবাগণ সারা বছরই বিত্‌রের নামাযে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করতেন। সুতরাং বর্ণিত হাদীস সমুহ দ্বারা সারা বছর দু'আয়ে কুনূত পাঠ করার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয়ত, হাদীসে বলা হয়েছে كَانَ يَقْنُتُ বা كَانُوْا يَقْنُتُوْنَ। এখানে يَقْنُتُ শব্দটি فعل مضارع (বর্তমান বা ভবিষ্যতকালে ব্যাপক ক্রিয়া)। এর পূর্বে كان এসেছে। ব্যাকরণিক নিয়ম হলো فعل مضارع এর পূর্বে كان যোগ হলে তা অবিরাম ও নিরচ্ছন্নতার অর্থ প্রদান করে। যথা قرأ অর্থ সে পড়েছে يَقْرَأُ সে পড়েছে বা পড়বে كَانَ يَقْرَأُ সে পড়ছিল অর্থাৎ তার পড়ার কাজটি সব সময় অব্যাহত ছিল।

অতএব كَانَ يَقْنُتُ এ অর্থ হবে : তিনি (নবী : করীম সা:) কুনূত পড়তেন। كَانُوْا يَقْنُتُوْنَ সাহাবীগণ কুনূত পড়তেন। অর্থাৎ–নবী করীম (সা) ও সাহাবীগণের কুনূত পড়ার আমলটি সারা বছর জারী ছিল বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। উপরন্ত নবী করীম (সা)-এর সাহাবীদের কেউই ইচ্ছাপূর্বক দু'আ কুনূত বাদ দিয়ে বিতরের নামায আদায় করেছেন বলে সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কাজেই দু'আ কুনূত সারা বছর পড়া ওয়াজিব।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : اَرْسَلْتُ اُمِّيْ لَيْلَةً لِتَبِيْتَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَتَنْظُرَ كَيْفَ كَانَ يُوْتِرُ ، فَصَلّٰى مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يُصَلِّيَ حَتّٰى اِذَا كَانَ اٰخِرَ اللَّيْلِ وَاَرَادَ الْوِتْرَ قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى ، فِي الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى ، وَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ثُمَّ قَعَدَ ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا بِالسَّلَامِ ثُمَّ قَرَأَ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ فَدَعَا بِمَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدْعُوْ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ .

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

www.pathagar.com

أخرجه الحافظ ابن عبد البرّ فى الاستيعاب (٢-٧٩٩) له ولم يتكلم عليه بشئ بل قال : ويعرف بها (اى ام معبد) حديث ابن مسعود يرويه حفظ بن سليمان وهذا يشعر بكون هذا الحديث معروفًا عندنا .

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার আম্মাকে রাত্রি বেলায় পাঠালাম যেন নবী করীম (সা)-র ঘরে রাত্রি যাপন করে লক্ষ্য করে যে, তিনি কিভাবে বিতর পড়েন। অতঃপর নবী করীম (সা) আল্লাহ্‌র তাওফীক অনুযায়ী দীর্ঘক্ষণ নামায পড়লেন এক পর্যায়ে যখন রাত শেষের দিকে হল আর তিনি বিতর পড়ার ইচ্ছা করলেন তখন প্রথম রাক'আতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (সূরা আ'লা) দ্বিতীয় রাক'আতে قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ (সূরা কাফিরূন) পড়ে বৈঠক করলেন। অতঃপর সালাম ফিরানো ছাড়াই দাড়িয়ে গেলেনএবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (সূরা ইখলাস) পড়ে ফারিগ হলেন এবং তাকরীর দিয়ে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করলেন। তাতে তিনি আল্লাহ্‌র তাওফীক অনুযায়ী যা দু'আ করার করলেন। অতঃপর তাকবীর বলে রুকূ'তে গেলেন।[৮১]

উপরোক্ত হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, সারা বছরই বিতরের মধ্যে দু'আয়ের কুনূত পাঠ করা আবশ্যক। যদি বিতরের নামাযে নির্দিষ্ট কালের জন্য দু'আয়ে কুনূত পড়ার বিধান থাকত তাহলে নবী করীম (সা) নিজ হাদীস আমল দ্বারা এ বিষয়ে সকল উম্মতকে অবগত করতেন। আর তাই ছিল রিসালাতের দায়িত্ব। অথচ এ ধরনের কোন হাদীস পাওয়া যায়নি যে, নবী করীম (সা) কিছু নির্দিষ্ট কাল দু'আয়ে কুনূত পড়েছেন, আর বাকি সময় পড়েননি। এজন্য ইমাম নবীব শারহে মুহায্‌যাবে উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন, প্রমাণগত দিক থেকে হানাফীদের বর্ণিত অভিমত শক্তিশালী।[৮২]

এটাই হচ্ছে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ, হাসান ইবরাহীম নাখঈ, ইবনুল মুবারক, আবদুল হক আবু সাত্তার, সুফিয়ান ও ইসহাক প্রমুখ ফুকাহায়ে কিরাম থেকেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত আছে। আল্লামা ইবনে কুদামাহ (র) মুগনীতে (১-৭৮৮, ৭৯১) বলেন, এটাই হচ্ছে, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের প্রসিদ্ধ রিওয়ায়াত। হযরত হাসান (র) ও এর সাথে একমত পোষণ করেছেন।[৮৩]

আল্লামা ইবনুল মুনযির (র) উক্ত অভিমতটি হযরত উমর, আলী, হযরত আবু মূসা আশ'আরী, হযরত বারা, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস, হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয, আবীদাহ সালামানী, হুমাইদ-আততাবীল এবং আবদুর রহমান ইবন আবু লায়লা (র) প্রমুখ থেকে বর্ণিত রয়েছে।

অনুরূপভাবে ইমাম ইবন শায়বা আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) সহ বহু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম থেকে এবং ইবরাহীম সাঈদ ইবনে যুবাইর ও হুসাইন ইবন আলী থেকেও উক্ত অভিমত বর্ণিইত রয়েছে।

---

৮১. প্রাগুক্ত, ৬৭-৬৮ পৃ.।

৮২. মা'আরিফুস-সুনান, প্রাগুক্ত ; ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

৮৩.

www.pathagar.com

ইমাম নববী (র) শারহুল মুহায্যাবে (৪/১৫) বলেন, এটাই হলো আমাদের মাযহাবের বিশিষ্ট চার ফকীহ আবদুল্লাহ যুবাইরী, আবুল ওয়ালীদ নীসাপুরী, আবুল ফযল ইবন আবদান এবং আবু মানসূর ইবন মিহরান (র)-এর অভিমত। তিনি আরো বলেন, প্রমাণগত দিক থেকে এ অভিমতটিই হলো শক্তিশালী।

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَقْنُتُ فِى السَّنَةِ كُلِّهَا فِى الْفَجْرِ وَيَقْنُتُ فِىْ الْوِتْرِ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ الرُّكُوْعِ

أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف أيضًا الجوهر النقى (١-٢١٢) وسنده صحيح الا انه مرسل مراسيل ابراهيم عن أبى مسعود خاصة جحة لاسيما وقد روى موصولا أيضًا

ইবরাহীম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) ফজরের মধ্যে সারা বছর দু'আয়ে কুনূত পড়তেন না। তবে বিতরের মধ্যে প্রত্যেক রাতে রুকূ'র পূর্বে কুনূত পড়তেন।[৮৪] (মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা)

মু'আত্তা ইমাম মুহাম্মদে আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি সারা বছর বিতরের মধ্যে রুকূ'র পূর্বে দু'আয়ে কুনূত পড়তেন। (আল-আসার-৩৭)

তবে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّهُ كَانَ لاَ يَقْنُتُ اِلاَّ فِى النِّصْفِ الْاٰخِرِيْنَ رَمَضَانَ وَكَانَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوْعِ .

(হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কেবল রামাযানের শেষার্ধে দু'আয়ে কুনূত পড়তেন। আর তিনি রুকূ'র পর কুনূত পড়তেন) এই হাদীস দ্বারা এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, কুনূতের বিধান সারা বছর নয়। তা না হলে আলী (রা)-এর মত বিশিষ্ট সাহাবী কি করে শুধুমাত্র রমযানের শেষার্ধে (১০ দিন) বিতরে কুনূত পড়তেন। এর উত্তর বলা হয়— প্রথমত, এটা হলো হযরত আলী (রাঃ)-এর নিজস্ব ইজতিহাদ, যা অপরাপর হাদীস এবং নবী ও বিপুল সংখ্যক সাহাবীদের আমলের বিপরীত ধর্তব্য নয়।[৮৫] কি করেই বা তা হতে পারে। অথচ নবী করীম (সা)সহ প্রায় সমস্ত সাহাবী ও তাবিঈনে কিরাম মৃত্যু পর্যন্ত বিতরের মধ্যে দু'আয়ে কুনূতের আমল অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে করে গেছেন।

এর প্রমাণ মুসনাদে ইমাম বায্যারে বর্ণিত একটি হাদীসে পাওয়া যায় ঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَنَتَ حَتّٰى مَاتَ ، وَاَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى مَاتَ وَعُمَرَ حَتّٰى مَاتَ .

৮৪. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, ৭৩ পৃ.।

৮৫. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : বিতরে কুনূত পাঠ।

www.pathagar.com

رواه البزار ورجاله موثوقون مجمع الزوائد (١-١٩٧)

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মৃত্যু পর্যন্ত দু'আয়ে কুনূত পড়েছেন, আবূ বকর মৃত্যু পর্যন্ত দু'আয়ে কুনূত পড়েছেন। এবং উমর (রা) ও মৃত্যু পর্যন্ত কুনূত পড়েছেন।[৮৬]

হযরত আনাস (রা) ছিলেন নবী করীমের একান্ত খাদিম। আবাসে প্রবাসে সর্বাবস্থায় নবী করীম (সা)-এর সাথে থেকে তাঁর চালচলন ইবাদত ও আমলের ধরন গভীরভাবে লক্ষ্য করেছে। নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের সাহচার্যে থাকেন। কাজেই আলোচ্য বিষয়ে তাঁর বিবরণও হাদীসে যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে।

দ্বিতীয়ত, (আলী (রা)-এর হাদীসে কুনূত দ্বারা উদ্দেশ্য قِيَامٌ طَوِيْلٌ (দীর্ঘ-কিয়াম) অর্থাৎ হযরত আলী (রা) সারা বছরই বিতরের মধ্যে দু'আয়ে কুনূত পড়তেন। তবে রামাযানের শেষার্ধে যে পরিমাণ দীর্ঘ কিয়াম করতেন তা বছরের অন্যান্য সময়ে করতেন না। অতএব হাদীসটি হানাফী মাযহাবের অভিমতের সমর্থক, বিপক্ষে নয়।[৮৭]

৮৬. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, ৭৫ পৃ,।

৮৭. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

বিতর নামাযে কুনূতের মাসনূন দু'আ

কুনূতের মাসনূন দু'আ

দু'আ কুনূত দু' প্রকার ঃ (এক) কুনূতে রাতিবা (দুই) কুনূতে নাযিলা। কুনূতে রাতিবার দু'আটি সারা বছর এশার নামাযবাদ সুবহি সাদিকের পূর্বে তিন রাক'আত বিশিষ্ট বিত্‌র নামাযে তৃতীয় রাক'আতের রুকূতে যাওয়ার পূর্বে যথাবিধি হাতোত্তোলন ও তাক্‌বীর বলে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ই নিঃশব্দে পাঠ করবেন এবং তা পাঠ করা ওয়াজিব। এটাই ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত।

শাফিঈ মাযহাবের ফিকহ মতে কুনূতে রাতিবা শুধু রমাযান মাসের শেষ পনের দিনই এশার নামায বাদ বিতর নামাযে পাঠ করার বিধান রয়েছে।

কুনূতে রাতিবার দু'আ কোনটি এ বিষয়ে হাদীসের বক্তব্যে (متن) বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ফিক্‌হে হানাফী মতে অধিকতর প্রসিদ্ধ মাসনূন দু'আটি হাদীসের সনদসহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ عَبْدِ الْقَاهِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِىْ عِمْرَانَ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْا عَلٰى مُضَرَ اِذْ جَاءَ جِبْرَءِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاَوْمَا اِلَيْهِ اَنِ اسْكُتْ فَسَكَتَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَبْعَثْكَ لَعَّانًا وَلاَ سَبَّابًا وَاِنَّمَا يَبْعَثُكَ رَحْمَةً وَلَمْ يَبْعَثْكَ عَذَابًا ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ﴾ قَالَ ثُمَّ عَلَّمَهُ هٰذَا الْقُنُوْتَ - اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ - وَنُؤْمِنُوْبِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُوْكَ وَنَخْلَعُوْا وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُوْا وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ .

رواه أبو داؤد فى المراسيل ومن المعلوم ان مراسيل أبى داؤد بحكم السند - ومرسل الثقة مقبول عند الجمهور . وأخرجه البيهقى أيضا بهذا اللفظ عن معاوية بن صالح على ما ذكره السيوطى فى الدر المنثور وفى الحصن - ورواه ابن أبى شيبة موقوفا على ابن مسعود

www.pathagar.com

আব্দুল কাহির ইবন আবদুল্লাহ (র) হতে, তিনি হযরত খালিদ ইব্‌ন আবূ ইমরান (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ এক সময় রাসূলুল্লাহ (সা) মুযার গোত্রের উপর লা'নত করছিলেন। এ সময় সেখানে হযরত জিব্রাঈল (আ) এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নীরব হতে ইংগিত করলেন, তিনি নীরব হলেন। তখন তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, হে মুহাম্মাদ! মহান আল্লাহ আপনাকে লা'নতের দু'আ করা ও অভিশাপ দেয়ার জন্য প্রেরণ করেননি। তিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন করুণার জন্য, শাস্তির জন্য নয়। (আল্লাহ বলেছেন,) "তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা শাস্তি দিবেন, এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নেই। কারণ তারা অত্যাচারী।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১২৮)হযরত খালিদ (রা) বলেন, এরপর তিনি তাঁকে এ দু'আ (কুনূত)টি শিক্ষা দিলেন (অর্থ)

"হে আল্লাহ! আমরা আপনার সাহায্য চাই, এবং আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আপনার প্রতি ঈমান এনেছি আর আপনার উপর ভরসা করি। এবং উত্তমভাবে আপনার গুণকীর্তণ করি ও শুকরিয়া আদায় করি। কোনো সময়ই অকৃতজ্ঞ হই না, আর যারা আপনার নাফরমানী করে আমরা তাদের পরিত্যাগ করি এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।

হে আল্লাহ!, আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার জন্যই নামায আদায় করি। আপনাকেই সিজ্‌দা করি ও আপনার প্রতিই ধাবিত হই এবং দৌড়াই আর আপনার করুণা কামনা করি। আপনার শাস্তিকে ভয় করি। অবশ্যই আপনার শাস্তি কাফিরদের সাথে সংযুক্ত হবে।"[১] ফিকহ্ শাফিঈ মতে কুনূতের মাসুনূন দু'আ সম্বলিত হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ فِى الْوِتْرِ - اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَفِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ - فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهُ لاَ يُذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ - تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ .

رواه الترمذى وقال أبو عيس هذا حديث حسن لا نعرف فى القنوت شيئا أحسن من هذا .

---

১. আবু দাঊদ সুলায়মান ইবন আশা'আস-মারাসিলে। আবূ দাউদের উক্ত কিতাবের হাদীসসমূহ হাদীসে মুসনাদের হুকুম রাখে, এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মুরসাল হাদীসসমুহর মুহাদ্দিসীনের বিবেচনায় শারঈ দলীল হিসেবে গৃহীত। বায়হাকী শরীফে উক্ত হাদীস একই শব্দমালাসহ মু'আবিয়া ইবন সালিহ থেকে বর্ণিত ও হয়েছে।

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) হাদীসটি তাঁর প্রাণিত তাফসীরে 'দুররে মানসূর' গ্রন্থে নির্ভযোগ্য বলে বর্ণনা করেছেন, এবং একাধিক সনদের বর্ণনা করে বলেছেন যে এ হাদীসে বর্ণিত দু'আ কুনূত মূলত পবিত্র কুরআন শরীফের সুরাতুল খালা ও সূরাতুল হাফদ দু'টি সূরা হিসেবে হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা) সংকলিত কুরআন শরীফে স্থান লাভ করেছিল। এর তিলাওয়াত মানুসূখ (রহিত) হলেও দু'আ হিসেবে রাসুলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবা-ই- কিরাম এটা বিতর নামাযে পাঠ করেছেন।

হাদীসটি মুরসাল বলা হয়েছে এ জন্য যে, বর্ণনাকারী হযরত খালিদ একজন তাবিঈ, তিনি তাঁর পিতা সাহাবা হযরত আবূ ইমরান (রা) থেকে বর্ণনা না করে সরাসরি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

হযরত হাসান ইবন আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে কয়েকটি বাক্য শিখিয়েছেন যেন তা আমি বিতর নামাযে পাঠ করি। (অর্থ)

"হে আল্লাহ! আপনি যাদেরকে সঠিক পথে দৃঢ়পদ রেখেছেন, আমাকে তাদের পথ প্রদর্শন করুন এবং যাদেরকে বিপদ মুক্ত রেখেছেন, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত (নিরাপদ) রাখুন, আর যাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন, আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করুন।

আপনি আমাকে যা কিছু দান করেছেন, তাতে আমার কল্যাণ নিহিত রাখুন। আর আপনি যা কিছু ফয়সালা করেছেন তার অকল্যাণ হতে আমাকে রক্ষা করুন, কেননা আপনিই সবকিছু ফয়সালা করেন আর আপনার বিপক্ষে কোনো কিছুই ফয়সালা হয় না।

আর আপনি যাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন, সে সময়ই অপমানিত হয় না।

হে আমাদের প্রভু! মহাকল্যাণময় আপনি এবং আপনি সর্বোচ্চ মহীয়ান।"

আবূ ঈসা (র) বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান, দু'আ কুনূত প্রসঙ্গে এর চেয়ে সুন্দরতম হাদীস আমার জানা নেই।[২]

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ اٰخِرِ وِتْرِهٖ - اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ لاَ اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ كَمَا فِي الْمَشْكُوْةِ ونقله ظفر أحمد العثمانى فى إعلاء السنن ج ٢ ، ص ١١٠/١١١.

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বিত্‌র নামাযে শেষে বলতেন ঃ

হে আল্লাহ! আমি আপনার অসন্তুষ্টি থেকে সন্তুটির আশ্রয় কামনা করি। এবং আপনার শাস্তি প্রদান হতে নিরাপত্তা প্রদানের প্রার্থনা করি। আর আপনার ক্রোধ হতে আপনার সমীপে পানাহ চাই, আপনি স্বয়ং যে পরিমাণ স্বীয় প্রশংসা করেছেন তা আমি গণনা করার শক্তি রাখি না।[৩]"

عَنْ اَبِي الْحُسَيْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَرٰى وَلاَ نَرٰى - وَاَنْتَ بِالْمَنْظَرِ الْاَعْلٰى - وَاِنَّ اِلَيْكَ الرُّجْعٰى وَاِنَّ لَكَ الْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى - اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ نَزِلَّ وَنَخْزٰى نقله بدر الدين العينى فى عمدة القارى فى شرح البخارى ج ٥ ، ص ٤٣٨

---

২ তিরমিযী, আবু ঈসা মুহাম্মাদ জামেউত তিরমিযী, ১ম খণ্ড, কিতাবুস সালাতি, দু'আ কুনূত অধ্যায়, পৃ. ১০৬।

৩. মিশকাত শেখ ওয়ালীউদ্দীন, কিতাবুস সালাতুল বিত্‌র অধ্যায়; যাফর আহমাদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, ৬ খণ্ড, পৃ. ১১০-১১১।

৬৬—

www.pathagar.com

হযরত আবুল হুসাইন আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি স্বয়ং বিত্‌র নামাযের দু'আ কুনূত এভাবে পাঠ করতেন–

"হে আল্লাহ, আপনি অবশ্যই সবকিছু দেখেন, আমরা তা দেখিনা, আপনি সর্বোচ্চদৃশ্য স্থলের অধিপতি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাগমন, ইহকাল-করকাল সবকিছুরই মালিক আপনিই।

হে আল্লাহ। আমরা অপমান ও লাঞ্ছনা হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।"[৪]

عَنْ اُبَیِّ بْنِ کَعْبٍ قَالَ کَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ فِیْ الْوِتْرِ قَالَ سُبْحَانَکَ الْمَلِکُ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ یُطِیْلُ. رواه أبو داؤد فی سننه .

হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বিত্‌র নামাযের সালাম ফিরিয়ে বলতেন, আমি মহাপবিত্র মালিকের পবিত্রতা বর্ণনা করি। এ দু'আটি তিনি টেনে টেনে (দীর্ঘ করে) তিনবার বলতেন।[৫]

উপরোক্ত হাদীসগুলো সনদ ও মতনের দিক দিয়ে বিভিন্নতা বিদ্যমান। প্রত্যেকটি হাদীসের বক্তব্যে বর্ণিত দু'আকে বিত্‌র নামাযের দু'আর কুনূত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আরো কয়েকটি হাদীসে বিত্‌রের দু'আর কুনূত সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

کَمَا اَوْرَدَ ابْنُ الْهُمَامِ مِنْ حَدِیْثِ خَالِدِ بْنِ اَبِیْ عِمْرَانَ اَنَّ لَمْ یُحْسِنِ الْقُنُوْتَ یَقُوْلُ فِی الْوِتْرِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ .

আল্লামা ইবনুল হুমাম হযরত খালিদ ইব্‌ন আবূ ইমরানের হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে দু'আ, কুনূত পড়তে সক্ষম নয় সে তিনবার 'আল্লাহুম্মাগ ফিরলী' বলবে, দু'আটির অর্থ, আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন। আর এক বর্ণনায় নিম্নের দু'আটি পড়ার কথা উল্লেখ আছে।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّفِیْ الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

"ও হে প্রভু! আমাদের ইহকালে কল্যাণ ও পরকালের কল্যাণ প্রদান করুন এবং দোযখের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।"

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিত্‌র নামাযের দু'আ কুনূত প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসসমূহে বিভিন্নতা আছে।

এ জন্য মুহাদ্দিসগণ দু'আ কুনূতের হাদীসগুলো পর্যালোচনা করে বলেছেন, যে ঃ

(ক) উল্লিখিত হাদীসগুলোর মধ্যে তৃতীয় হাদীসে বর্ণিত দু'আটি বিত্‌র শেষে (فِیْ اٰخِرِ وِتْرِ) পাঠ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে মোল্লা আলী আল-কারী (র) বলেন যে, اَیْ بَعْدَ السَّلَامِ অর্থাৎ বিত্‌র নামাযের সমাপ্তি সূচক সালাম ফিরানের পর এই দু'আটি পড়তেন, এটা হযরত আলী (রা) এর ব্যক্তিগত আমল ছিল।

---

৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী ফী-শারহে বুখারী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৮।

৫. আবূ দাঊদ সুলায়মান ইব্‌ন আশ'আস, সূনান, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০২।

www.pathagar.com

كَمَا فِى رِوَايَةَ مِرْكٍ فِىْ اِحْدٰى رِوَايَاتِ النَّسَائِىْ - كَانَ يَقُوْلُ اِذَا فَرغَ مِنْ صَلاَتِهِ . كَمَا فِىْ الْمِرْقَاتِ فِىْ شَرْحِ الْمَشْكُوْةِ لِعَلِىِّ الْقَارِىْ اَلْمُجَلَّدُ الثَّانِىْ رقم الورق ١٥٨

যেমন মিরকের বর্ণনা মতে নাসাঈ শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, এ দু'আটি বিত্‌র নামায হতে ফারিগ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) পড়েছেন। অতএব দু'আটি বিতর নামাযের আলোচ্য দু'আ কুনূতের পর্যায় পড়ে না।[৬]

(খ) চতুর্থ হাদীসটি ও হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত এ নিয়ে তাঁর থেকে দু'আ কুনূত সম্পর্কে দু'টি হাদীস বর্ণিত হলো। মুহাদ্দিসগণ এটিকে,ও বিতর নামাযের পরে পাঠ করার কথা উল্লেখ করেছেন, কোনো মযহাবের ফিক্‌হে এটাকে দু'আ কুনূত বলে সিদ্ধান্ত দেখা যায়না, এমন কি হযরত আলী (রা) ও এ দু'আটি বিতর নামাযে পাঠ করেছেন বলে উল্লেখ নেই, সম্ভবত তিনি এটা বিতর নামায শেষে পাঠ করেছেন।

(গ) পাঁচ নাম্বারে উল্লিখিত হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) এ দু'আটি বিতর নামাযের সমাপ্তি সূচক সালাম ফিরানের পর পাঠ করেছেন। সুতরাং হাদীসে উল্লেখিত তিনটি দু'আর একটি ও বিতর নামাযের কুনূতে (রাতিবা) সময় পঠিত দু'আ নয়; এ কথা স্পষ্ঠভাবে বুঝা যাচ্ছে।

এরূপ যে সকল নামাযী বিতর নামাযের নির্দ্ধারিত দু'আ কুনূত এখনও শিখতে পারেনি বা আপাতত দু'আ কুনূত পাঠ করতে অক্ষম, তাদেরকে সাময়িকভাবে কয়েকটি দু'আ পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে–এ গুলো ও বিতর নামাযের দু'আ, কুনূত নয়। এর পরও দেখা যায় সে, সাহাবা-ই-কিরাম (রা) থেকে বিতর নামাযের দু'আ কুনূত সম্পর্কে সনদ ও মতনের বিভিন্নতা নিয়ে দু'টি হাদীস বিদ্যমান রয়েছে ঃ

(এক) "আল্লাহুমা ইন্না নাস্তায়ীনুকা" শিরোনামের দু'আ কুনূত, এটি-ই হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এর সমর্থিত এবং ফিকহে হানাফী মতে গৃহীত প্রসিদ্ধ দু'আ কুনূত।

(দুই) "আল্লাহুমা-ইহ্‌দিনী" শিরোনামের দু'আ কুনূত। এটি-ই হযরত ইমাম শাফিঈ ও হযরত ইমাম মালিক (র) বিতর নামাযের দু'আয়ে কুনূত হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

উল্লিখিত দু'আ কুনূতের দু'টি হাদীস সম্পর্কে ফিকহবিদ ও মুহাদ্দিসগণ নিম্নরূপ সমন্বয় সাধন করেছেন।

(এক) ফিকহে শাফিঈ ও ফিকহে মালেকী মতে গৃহীত বিতর নামাযের দু'আ কুনূতটি হযরত হাসান ইবন আলী (রা) থেকে 'কুনূতুল বিতর' হিসেবে উল্লেখ করা হলেও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এ দু'আটিকে ফজর নামাযের কুনূতে নাযিলা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যথা ঃ

وَحَدِيْثُ ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدُ الْمَقْبُرِىِ عَنْ اَبِىْ ......
قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ فِى الرَّكْعَةِ

৬ মিরকাত, খ. ২, পৃ. ১৫৮।

www.pathagar.com

الثَّانِيَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ - اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ اِلٰى اٰخِرِهِ . رواه الترمذى نقله ملا على القارى فى المرقات لشرح المشكوة المجلد الثانى .

ইবনে আবু ফুদায়েকের হাদীস তিনি আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ আল-মাকবুরী থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, হযরত নবী (সা) ফজর নামাযের দ্বিতীয় রাক'আতের রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করে উভয় হাত উপরে উঠিয়ে এ দু'আ পড়তেন আল্লাহুম্মাহদিনী (শেষ পর্যন্ত)।[৭]

এ প্রসঙ্গ কথা হচ্ছে যে হাদীস বর্ণনার হযরত হাসান (রা) এর চেয়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এর গুরুত্ব অনেক বেশী। সে হিসাবে মুহাদ্দিসগণ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এর বর্ণনাকে প্রধান্য দিয়ে এ দু'আটিকে কুনূতে নাযিলার দু'আ হিসাবে স্থান দিয়েছেন।

এ ছাড়া ও হযরত হাসান (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সনদটি সমালোচিত। যেমন আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেছেন

اِنَّ فِىْ سَنَدِ هٰذَا الْحَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ شُمْرِ الْجُعْفِىِّ اَحَدُ تَوَضَّاعِيْنَ اَلْكَذَّابِيْنَ .

এ হাদীসটির সনদে উমার ইবন শামর আল-জু'ফী নামক বর্ণনাকারী নিঃসন্দেহে হাদীস জালকারী ও মিথ্যাবাদীদের এক জন।[৮]

এরূপ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের সনদটিও মুহাদ্দিসীনে কেরাম এর সমালোচিত। যথা উপমহাদেশের অন্যতম ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুর রউফ দানাপুরী (র) বলেছেন ঃ

হযরত ইমাম শাফিঈ (র) এর পূর্ণ নির্ভরযোগ্য দলীল ইবন আবু ফুদায়কের বর্ণনা। তিনি আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ আল-মাকবুরী থেকে এবং তিনি হযরত আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) "আল্লাহুম্মাহদিনী পড়েছেন" অথচ আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ মাকবুরী মুনকারুল হাদীস, যা দলীল হিসাবে গ্রহণ যোগ্য নয়।[৯]

উক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে হানাফী ফকীহগণ মতামত দিয়েছেন যে, "আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তায়ীনুকা" শিরোনামের দু'আ, কুনূতটিই বিতর নামাযের মাসনূন দু'আ, যেমন মোল্লা আলী আল-কারী (র) বলেছেন–

فَعِنْدَنَا الْمُوَقَّتُ فِىْ الْقُنُوْتِ هُوَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ (الخ) وَعِنْدَنَا لَيْسَ عَلَى الْوُجُوْبِ بَلْ عَلٰى وَجْهِ السُّنَّةِ - كَمَا اَشَارَ اِلَيْهِ فِى الدُّرِّ بِقَوْلِهٖ

৭. আল্লামা মোল্লা আলী আল-কারী, মিশকাত শরীফের শরাহ মিরকাত, খ. ২, পৃ. ১৬৫।

৮. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী (প্রাগুক্ত), ৫ম খ. পৃ. ৪৩৭।

৯. আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহুস সিয়ার, পৃ. ১২৮।

www.pathagar.com

وَيَسُنُّ الدُّعَا الْمَشْهُوْرَةُ . كذا فى المرقات لعلى القارى المجلد الثانى - ص ١٢٥

অতএব আমাদের মতে সুন্নাতের সুনির্ধারিত দু'আ, হচ্ছে,"আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তায়ীনুকা" শিরোনামের দু'আ, তবে এটা ওয়াজিব হিসাবে নয়; বরং সুন্নাত হিসাবে। যেমন আদ-দুররুল মুখতার প্রণেতা তাঁর বক্তব্যে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, এ প্রসিদ্ধ দু'আটি পড়াই সুন্নাত।[১০]

ফিকহে হানাফীর দু'আ, কুনূতের স্বপক্ষে শাইখুল হিন্দ আল্লামা মাহমূদ হাসান (র) বলেন,

قَالَ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِيْ الْعَمَلَ بِالْحَدِيْثِ اِنَّ قُنُوْتَ الْاَحْنَافِ لَيْسَ بِثَابِتٍ فِى الْحَدِيْثِ وَغَفَلَ هٰذَا الْمُدَّعِيُ عَمَّا فِى تَفْسِيْرِ الْاِتْقَانِ بِسَنَةٍ قَوِيٍّ اَنَّ قُنُوْتَنَا كَانَتْ سُوْرَةُ الْحَفْدِ وَالْخَلَعِ فِى تَصْحَفِ اُبَيِّ بْنُ كَعْبٍ وَلِهٰذَا نَجِدُ فِيْ بَعْضِ كُتُبِنَا النَّهِيَ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُنُوْتِ لِلْجُنُبِ وَصِيْغَ صِيْغَةُ تُشَابِهُ الْقُرْاٰنِ فَاِنَّ ضِبَعُهَا الْمُتَكَلِّمُ مَعَ الْغَلاَ وُهُوَ شَانُ اَدْعِيَةِ الْقُرْاٰنِ .

হাদীসের উপর আমলের কতিপয় দাবীদার কতেক লোক অভিযোগ করেন যে, ফিকহে হানাফী মতে সমর্থিত দু'আ কুনূতটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। হয়ত এ অভিযোগ কারীগণ তাফসীরে ইতকানে শক্তিশালী সনদে বর্ণিত কুনূতের এ দু'আ সম্পর্কে অবগত নন। এতে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন যে, আমাদের দু'আ কুনূতটি হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা)-এর মুসহাফ গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের 'সুরাতুল হাফদ ওয়াল খালা' নামে একটি সূরা ছিল [যার তিলাওয়াত রহিল (المنسوخ) হলেও দু'আ হিসেবে বিতর নামাযে পাঠ করার নিয়ম রয়ে গেছে] এ কারণে আমাদের ফিকহের কোন কোন কিতাবে আছে যে, যার উপর গোসল করা ফরয সে পবিত্র না হলে, কুনূতের শব্দাবলী তার মুখে পাঠ করা নিষিদ্ধ এবং এ দু'আ কুনূতের শব্দাবলী কুরআনে বর্ণিত দু'আ সমূহের শব্দাবলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

কেননা, এতে প্রথম পুরুষ বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। আর এটাই হচ্ছে কুরআনে বর্ণিত দু'আ সমূহের বৈশিষ্ট্য।[১১]

وَقَالَ عَلِيُ الْقَارِيُ اِنَّ حَدِيْثَ اَبِيْ فُدَيْكِ الَّذِيْ هُوَ النَّصُّ فِيْ مَطْلُوْبِهِمْ ضَعِيْفٌ . كما المرقات المجلد الثانى ، ص١٢٥

মোল্লা আলী আল-কারী (র) বলেছেন, তাদের দাবীর পক্ষে আবূ ফুদাইকের রিওয়ায়েতকৃত হাদীসটি দুর্বল।[১২]

---

১০. মোল্লা আলী কারী, মিরকাত, খ. ২, পৃ. ১৬৫।

১১. তিরমিযী শরীফের ভূমিকা, তাবারীরে শাইখুল হিন্দ, আসাহহুল মাতাবি।

১২. মোল্লা আলী কারী, মিরকাত, খ. ২, পৃ. ১৬৫।

www.pathagar.com

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বুঝা যায় যে, শাফিঈ মাযহাবের গৃহীত দু'আ কুনূতটির তুলনায় হানাফী মাযহাবে গৃহীত দু'আ কুনূতটি দলীলের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। তবে ফিকহে শাফিঈর বর্ণিত কুনূতের সনদ সম্পর্কে অভিযোগের ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিস ঐকমত্যে উপনীত হতে পারেননি। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটির সনদের উপর অভিযোগ থাকলেও একই হাদীস হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে তার সনদের উপর তেমন কোন অভিযোগ বর্তায়নি। তদুপরি উক্ত দু'আর শব্দাবলীর অর্থগত ব্যাপকতা ও মাধুর্য্য সর্বমহলে স্বীকৃত, এ'জন্য হানাফী আলেমগণ ফিকহ্ শাফিঈর দু'আ কুনূতটিট কুনূতে নাযিলা হিসেবে পাঠ করে থাকেন। যেমন আল্লামা আবুল হাসান (র) বলেন ঃ

اللهم اهدنى الخ متعلق بالقنوت النازلة كما فى بدائع الصنائع .

"আল্লাহুম্মা ইহদিনী ... শিরোনামের দু'আটি কুনূতে নাযিলার সাথে সম্পৃক্ত এটাই "বাদাউস-সানায়ি, কিতাবে বর্ণিত আছে।[১৩]

শুধু তা-ই নয়। কুনূত সম্পর্কিত হাদীস দু'টি প্রায় সমশ্রেণীর হওয়ার কারণে হানাফী মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেছেন ঃ

اَنَّهُ لاَ يُوَقَّتُ فِى الْقُنُوْتِ شَىْءٌ وَفِىْ غَيْرِهِ مِنْ مَّوَاضِعِ الدُّعَاءِ كَالطَّوَافِ وَغَيْرِهِ . كما فى مرقات المفاتيح لعلى القارى

বিতর নামাযের দু'আ কুনূত নির্দিষ্ট করা যায় না। যেমন হজ্জের ন্যায় অন্যান্য দু'আর স্থানসমূহে দু'আর শব্দাবলী নির্দিষ্ট করা নেই।[১৪]

তবে অধিকাংশ হানাফী ফকীহের মতে দু'আ কুনূত নির্ধারিত করতে হবে। যেমন আবু জাফর তাহাভী (র) বলেন ঃ

اِنَّ دُعَاءَ الْقُنُوْتِ يُوَقَّتُ لاَنَّهُ رُبَّمَا يَجْرِىْ عَلَى اللِّسَانِ مَا كَلاَمَ النَّاسِ اِذْ لَمْ يُوَقَّتْ فَيُفْسِدُ الصَّلٰوةَ . كما فى المرقات

অবশ্যই দু'আ কুনূত সুনির্ধারিত হতে হবে, নতুবা নামাযের মধ্যে মুসল্লির মুখ থেকে (كَلاَمَ النَّاس) মানুষের মুখ নিঃসৃত স্বাভাবিক বাক্যাবলী সাদৃশ্যমান কথা বের হয়ে নামায ফাসিদ করে দিবে।[১৫] এ জন্য বিজ্ঞ ফকীহগণ ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে ঃ

لاَ يُوَقَّتُ فِى الْقُنُوْتِ شَىْءٌ اِلاَّ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ الخ كما فى المرقات

কুনূতের জন্য "আল্লাহুমা ইন্না নাস্তায়ীনুকা..., ব্যতীত অন্য কোনো দু'আ. নির্ধারণ করা যাবে না।[১৬]

---

১৩. আল্লামা আবুল হাসান, তানযীমুল আশতাত, ১খ., পৃ. ৪৩।

১৪. মোল্লা আলী আল-কারী, মিরকাত, প্রাগুক্ত।

১৫. মিরকাত, প্রাগুক্ত।

১৬. মিরকাত, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

বিষয়টি সার্বিক গবেষণার নিরিখে বলা যায় যে, বিতর নামাযের দু'আ কুনূতের উভয় দু'আই বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। বিতর নামাযে দু'আ কুনূত পাঠ করা ওয়াজিব উক্ত ওয়াজিব আদায়ের জন্য হানাফী ফিকহ মতে "আল্লাহুমা ইন্না নাস্তায়ীনুকা" শিরোনামের দু'আটি মাসনূন দু'আ।

এটি পড়লে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে, এটাই উত্তম। তবে কেউ যদি দ্বিতীয়টি অর্থাৎ "আল্লাহুমা ইহ্‌দিনী" শিরোনামের দু'আ পড়ে তাতেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

দু'আ কুনূত রুকূর পূর্বে পড়া সুন্নাত

ইসলামী শরী'আত বিতর নামাযে দু'আ কুনূত পড়া ওয়াজিব এবং তা তৃতীয় রাক'আতের রুকু'র পূর্বে পড়া সুন্নাত। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ أُبَيِّ بْنُ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ .

رواه أبو داؤد فى سننه ج ١ ، كتاب الصلوة ص ٢٠٢ ونقله ظفر أحمد العثمانى فى اعلاء السنن ج ٧ رجاله كلهم ثقات باب وجوب القنوت فى جميع السنن ومحله قبل الركوع ص ٧٣

হযরত উবাই ইবন কা'বা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বিতর নামায আদায় করতেন, তিনি রুকূর পূর্বে (قبل الركوع) দু'আ কুনূত পড়তেন।

উপরোক্ত হাদীসটি কোন প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, বিতর নামাযে রুকূত পূর্বে দু'আ কুনূত পাঠ করা সুন্নাত।[১৭]

এ বিষয়ে আরো কয়েকটি হাদীস নিম্নে পেশ করা গেল ঃ

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَاَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوْا يَقْنُتُوْنَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ . اعلاء السنن ، رقم الحديث ١٦٩١ ، ج ٧ ، ص ٧٨

ইব্রাহীম নাখঈ আলকামা হতে বর্ণনা করেছেন যে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ এবং হযরত নবী (সা)-এর সাহাবীগণ রুকুর পূর্বে দু'আ কুনূত পাঠ করতেন।[১৮]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ اَنَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ الْقُنُوْتَ فِى الْوِتْرِ وَاجِبٌ فِىْ رَمَضَانَ وَغَيْرِه قَبْلَ الرُّكُوْعِ

أخرجه ظفر أحمد العثمانى ، فى اعلاء السنن ، رقم الحديث ١٦٠٤

১৭. টিকা ঃ আবূ দাউদ-সুলায়মান ইব্‌ন আশা'আস, সুনানে আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, কিতাবুস-স্বালাত, পৃ. ২০২।
(খ) যাফর আহমাদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বর্ণনা কারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য, অধ্যায়-সারা বৎসর কুনূত পড়া ওয়াজিব হওয়া ও কুনূত পাঠের স্থান রুকুর পূর্বে, পৃ.৭৩

১৮. ই'লাউস, সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস ১৬৯১, পৃ. ৭৮।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) হাম্মাদ (র) থেকে, তিনি ইব্রাহীম (র) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ যে, রমযান মাসে এবং অন্যান্য মাসে ভিতর নামাযে রুকু'র পূর্বে দু'আ কুনূত পড়া ওয়াজিব।[১৯]

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ وَيَجْعَلُ الْقُنُوْتَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ .

أخرجه ظفر أحمد العثمانى فى اعلاء السنن ، نفس المراجع ج ٦ ص ٨٠ ، ورواه النسائى فى سنن النسائى ج ١

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) তিন রাক'আত বিশিষ্ট বিতর নামায আদায় করতেন এবং রুকু'র পূর্বে দু'আ, কুনূত পাঠ করতেন।[২০]

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَنَتَ فِىْ الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ . رواه النسائى كتاب الصلوة باب الوتر . ص ١٩١

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, যে, নবী করীম (সা) বিতর নামাযে রুকূর পূর্বে দু'আ কুনূত পাঠ করতেন।[২১]

উপরোক্ত হাদীসসমূহ স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, "বিতর নামাযের দু'আ কুনূত তৃতীয় রাক'আতের রুকুর পূর্বে পাঠ করা সুন্নাত। এটিই ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এবং হানাফী ফকীহগণের অভিমত।

এ বিষয়ে আরো বহু হাদীস বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে তন্মধ্যে দু'টি নিম্নরূপ ঃ

عَنْ عَاصِمِ الاَحْوَالِ قَالَ سَأَلْتُ مَالِكَ عَنِ الْقُنُوْتِ فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ اَوِ الْوِتْرِ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْ بَعْدَهُ قَالَ بَلْ قَبْلَهُ . أخرجه ظفر أحمد فى إعلاء السنن .

(ক) হযরত আসিমুল আহ্ওয়াল (র) বলেন, আমি ইমাম মালিককে ফজর অথবা বিতর নামাযের দু'আ, কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম তা রুকূর আগে না পরে পাঠ করতে হবে? তিনি বললেন, বরং রুকুর আগে।[২২]

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَوْتَرَ النَّبِىَّ ﷺ بِثَلَاثٍ فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ . رواه النسائى

১৯. ই'লাউস-সুনান প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৬০৪, পৃ. ৮৭

২০. ই'লাউস-সুনান প্রাগুক্ত হাদীস নং ১৬৯৭, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৪
নাসাঈ আহমাদ ইবন শায়াইব, সুনানে নাসায়ী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০।

২১. আহমাদ ইব্ন শুয়াইব, সুনানে নাসায়ী কিতাবুস-সালাত বাতুল বিতর, পৃ. ১৯১।

২২. ই'লাউসা সুনান, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

(খ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) তিন রাক'আত বিতর নামায পড়েছেন, তাতে তিনি রুকূর পূর্বে দু'আ কুনূত পাঠ করেছেন।[২৩]

তবে এ ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস এমনও আছে যার বক্তব্যে রুকূর পর দু'আ কুনূত পাঠ করার কথা বলা হয়েছে, এ কারণে ইমাম শাফিঈ রুকুর পড়ে কুনূত পড়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لاُقَرِّبَنَّكُمْ صَلاَةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِيْرَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُوْا لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَلْعَنُ الْكَافِرِيْنَ . رواه البخارى نقله الملا على القارى فى المرقات ج ٢ ص ١٢٥

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামাযের ন্যায় নামায আদায় করে দেখাব। তিনি ফজরের শেষ রাক'আতে 'সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদাহ' বলার পর কুনূতের দু'আ পড়তেন, এবং তাতে মু'মিনদের জন্য দু'আর ও কাফিরদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করতেন।[২৪]

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّدْعُوْا لاَحَدٍ اَوْ عَلٰى اَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ .

رواه كذا فى مشكوة المصابيح بالوتر .

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কারো কল্যাণের অথবা কারো অকল্যাণের জন্য দু'আ, করতে ইচ্ছে করতেন, তখন রুকূর পর কুনূত পাঠ করতেন।[২৫]

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ . رواه أبو جعفر الطحاوى شرح معانى فى الاثار فى باب القنوت .

(গ) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) রুকূর পরে কুনূত পড়েছেন।[২৬]

عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُ هُنَّ فِىْ وِتْرِى اِذَاَ رَفَعْتُ رَأسِى وَلَمْ يَبْنَ الاَّ السُّجُوْدُ .

رواه الترمذى . ج ١ ، ص ١٠٦ وقال هذا حديث حسن لا يعرف فى القنوت شيئا اَحْسَنَ مِنْ هذه.

২৩. নাসাঈ প্রাগুক্ত

২৪. মোল্লা আলী আল-কারী, মিরকাত, ২খ., পৃ. ১৬৫।

২৫. শায়েখ ওয়ালীউদ্দীন, মিশকাতুল সাহাবীহ, কিতাবুস-সালাত বিতর,

২৬. আবু জাফর তাহাভী, শরাহ মা'আনিল আসার আলকুনূত।

www.pathagar.com

(ঘ) হযরত হাসান ইবন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন, যেন আমি সেগুলো বিতর নামাযের রুকূ হতে মাথা উত্তোলন করে পাঠ করি–যখন সিজ্‌দা বাদে আর কিছু অবশিষ্ট না থাকে।[২৭]

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ اٰخِرِ الْوِتْرِ . رواه أبو جعفر الطحاوى فى شرح معانى الاثار .

(ঙ) সুয়াইদ ইবন গাফালা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আমি হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমার (রা) ও হযরত উসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা) এঁদের সকলের থেকে শুনেছি যে, নবী করীম (সা) বিতর নামাযের শেষ প্রান্তে দু'আ কুনূত পড়েছেন।[২৮]

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِيْ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

أخرجه الملا على القارى فى المرقات عن المشكوت ، ج ٢ ، ص ١٦٤

(চ) হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) এক মাস ফজর, যুহর, আসর, মাগরিব এবং এশার নামাযে 'সামিআল্লাহু লি-মান হামিদাহ', বলে কুনূত পাঠ করেছেন।[২৯]

উপরোক্ত হাদীসসমূহের বক্তব্যে রুকুর পরে দু'আ কুনূত পাঠ করা প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু পূর্বে উদ্ধৃত হাদীসসমূহের বক্তব্যে রুকূর পূর্বে দু'আ কুনূত পড়ার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ এ ধরনের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে হাদীসসমূহের মর্মার্থ নির্ণয়ের জন্য, সমন্বয় করণের নীতি অবলম্বন করে প্রমাণ করেছেন যে, বিতর নামাযে দু'আ কুনূত রুকুর পূর্বে পড়া সুন্নাত এবং কুনূতে নাযিলা রুকুর পর পড়া সুন্নাত। বিষয়টির পর্যালোচনা নিম্নরূপ ঃ

(ক) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনাকৃত হাদীসটির প্রেক্ষাপট ছিল কুনূতে নাযিলা, এ কারণে রুকূর পর 'সামিআল্লাহু-লি-মান হামিদা', বলে কুনূত পড়ার কথা বলা হয়েছে,–প্রসঙ্গটিতে বিতর নামাযের কথা আদৌ উল্লেখ নেই। বরং বলা হয়েছে (مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ) ফজরের নামায হতে। আরো বলা হয়েছে ঃ

فَيَدْعُوْا لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَلْعَنُ الْكَافِرِيْنَ

অতঃপর মু'মিনদের কল্যাণের দু'আ, করেছেন, এবং কাফিরদের প্রতি লান'ত করেছেন। এ থেকে হাদীসটি কুনূতে নাযিলার বিষয়টি যে বর্ণিত হয়েছে, তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে।

---

২৭ আবূ ঈসা তিরমিযী, সুনান, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১০৬
ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান। দু'আ কুনূতের ব্যাপারে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কোনো হাদীস আমার জানা নেই।

২৮. অবূ জাফর তাহাবী (র) শারহে মা'আনিল আসার, প্রাগুক্ত।

২৯. মোল্লা আলী-আল-কারী, মিরকাত ফী শারহ মিশকাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪।

www.pathagar.com

(খ) আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসটি ও কুনূতে নাযিলা প্রসংগে এসেছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّدْعُوْنَ لاَحَدٍ اَوْ يَدْعُوْ عَلٰى اَحَدٍ

যখন কারো কল্যাণের জন্য অথবা কারো অকল্যাণের জন্য দু'আ করার ইচ্ছে করতেন..., অতএব এ হাদীসটি ও বিতর নামায প্রসঙ্গে নয়।

(গ) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি এখানে অসম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–এ হাদীসটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় অন্য স্থানে (شَهْرًا) একটি শব্দ আছে, অর্থাৎ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا

তিনি (সা) রুকূর পরে এক মাস কুনূত পড়েছেন, অথচ দু'আ, কুনূত সবসময় পড়ার হুকুম, যা বিতর নামাযে রুকূর পূর্বে পাঠ করতে হয়। সুতরাং, এ হাদীসটিও কুনূতে নাযিলা বিপদকালীন সময়ে পঠিত একটি সাময়িক দু'আ প্রসংগে বর্ণিত হয়েছে।

(ঘ) হযরত হাসান ইবন আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটির বক্তব্যে 'আল্লাহুম্মা-ইহ্‌দিনী, শিরোনামের দু'আটি বিতর নামাযে পড়ার কথা উল্লেখ আছে। অথচ এ দু'আটি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ফজর নামাযে কুনূতে নাযিলা হিসেবে পাঠ করেছেন বলে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন।

দু'জন বিশিষ্ট সাহাবী (রা) থেকে একটি দু'আ, সম্পর্কে বর্ণনার এ বিভিন্নতা নিরপণে মুহাদ্দিসগণ সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে বলেছেন যে, হাদীস সংরক্ষণ ও হাদীস বর্ণনা ক্ষেত্রে হযরত হাসান (রা)-এর চেয়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর প্রধান্য সর্বজনস্বীকৃত। অতএব এটিও বিতর নামাযের দু'আ, কুনূত নয়; বরং ফজর নামাযে পঠিত কুনূতে নাযিলার দু'আ।

(ঙ) হযরত সুয়াইদ ইবন গাফালা (রা) বর্ণিত হাদীসটিতে বলা হয়েছে।

قَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ فِىْ اٰخِرِ الْوِتْرِ

হযরত নবী (সা) বিতর নামাযের শেষে দু'আ কুনূত পড়েছেন। এখানে মুহাদ্দিসগণ আখিরুল বিতর অর্থাৎ বিতর নামায শেষে, এ বাক্যাংশের দু' প্রকার অর্থ বয়ান করে মত-ভিন্নতার সমন্বয় সাধন করেছেন।

(এক) اٰخِرُ الْوِتْرِ বিতর নামাযের শেষ প্রান্তে অর্থ তিন রাক'আত বিশিষ্ট নামাযের তৃতীয় রাক'আতের রুকূতে গমণের পূর্ব সময়কে বুঝান হয়েছে। কেননা তা নামাযের শেষ ভাগে অবস্থিত।

(দুই) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার আল্লামা মোল্লা আলী আল-কারী (র) তাঁর 'মিরকাত' গ্রন্থে বলেছেন যে, اٰخِرُ الْوِتْرِ অর্থাৎ সালামের পর।

অর্থাৎ বিতর নামাযের সমাপ্তি সূচক সালাম ফিরানোর পর। যেমন তিনি বলেন ঃ

كَمَا فِىْ رِوَايَةٍ مـرك فِىْ اِحْدٰى رِوَايَاتِ النَّسَائِىْ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهٖ . كذا فى المراقات .

যেমন মিরক এর বর্ণনা মতে নাসাঈ শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখ আছে এ দু'আটি বিতর নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পড়েছেন।[৩০]

অতএব এ দু'আটি ও বিতর নামাযের তৃতীয় রাক'আতে পাঠযোগ্য কুনূতের দু'আ নয়। বিষয়টি সার্বিক পর্যালোচনা করে বলা যায় যে-ফিকহ হানাফী মতে তিন রাক'আত বিশিষ্ট বিতর সামায যা এশার পর এবং সুবহে সাদিকের পূর্বে আদায় করা ওয়াজিব, উক্ত বিতর নামাযেও দু'আ কুনূত তৃতীয় রাক'আতের রুকূতে গমনের পূর্বে পাঠ করা সুন্নাত। এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো তার বলিষ্ঠ প্রমাণ দিচ্ছে।

কিন্তু শাফিঈ ও মালিকী মাযহাবে প্রতি রমযান মাসের শেষ পক্ষের দিন ফজর নামাযের দ্বিতীয় রাক'আতের রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করে তাদের নির্ধারিত দু'আ কুনূত ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে স্বশব্দে এবং ইমাম মালিক (র)-এর মতে নিঃশব্দে পাঠ করার নিয়ম আছে।

তবে হানাফী ফকীহ ও বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ হাদীসের পর্যালোচনা দ্বারা ফজর নামাযের কুনূত রহিত (المنسوخ) হয়ে গেছে বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কাজেই বিষয়টি যখন মানসূখ হয়ে গেছে তখন রুকূর আগে বা রুকূর পরে পাঠ করার কোনো প্রশ্ন থাকছে না।

আর ইসলাম ও মুসলমানদের যে কোনো এলাকায় বিপদ মুসীবতে সমকালীন আলিমগণ কুনূতে নাযিলা পাঠ করতে পারেন। তা ফজর নামাযে দ্বিতীয় রাক'আতের রুকূর পড়ে দাড়িয়ে পাঠ করার বিধান। তবে তা একাধারে এক মাস কালের অধিক না হওয়া সুন্নাত। যেহেতু হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক মাস পড়ে আল্লাহ্র হুকুমে বন্দ করে দিয়ে দিলেন।

ফযর নামাযে দু'আ কুনূত পড়া সুন্নাত নয়, ফজর নামাযের শেষ রাক'আতে নিয়মিত দু'আ কুনূত পড়া সুন্নাত নয়

এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قُلْنَا لاَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّ قَوْمًا يَزْعَمُوْنَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِى الْفَجْرِ فَقَالَ كَذَبُوْا اِنَّمَا قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلٰى اَحْيَاءٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ . رواه أبو داؤد فى سننه ج ١ ص ٢٠٣

হযরত আসিম ইবন সুলাইমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, এক দল লোক ধারণা পোষণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফজর নামাযে নিয়মিত দু'আ কুনূত পড়েছেন। এর প্রতি উত্তরে তিনি বললেন যে, তারা মিথ্যে কথা বলেছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) মাত্র এক মাস মুশরিকদের কতিপয় সম্প্রদায়ের অকল্যাণের জন্য ফজর নামাযে কুনূত পড়েছেন।[৩১]

উপরোক্ত হাদীস থেকে কোনরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, ফজর নামাযে নিয়মিত সারা বছর কুনূত পাঠ করা সুন্নাত নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) মাত্র এক মাস ফজর নামাযে কুনূত পাঠ করে ছিলেন এবং তা ছিল কুনূতে নাযিলা।

---

৩০. মোল্লা আলী আল-কারী, আল-মিরকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

৩১. আবূ দাঊদ-সুলায়মান ইবন আশআস, সুনানে আবূ দাঊদ, প্রথম খণ্ড, সালাত, ২০৩।

www.pathagar.com

এটাই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। এ বিষয়ে আরো কতিপয় হাদীস নিম্নে পেশ করা গেল ঃ

عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْجَعِىْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ قُلْتُ لاَبِىْ يَا اَبَتِ اِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَخَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَخَلْفَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَخَلْفَ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَخَلْفَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ هَهُنَا بِالْكُوْفَةِ قَرِيْبًا مِّنْ خَمْسِ سِنِيْنَ اَفَكَانُوْا يَقْنُتُوْنَ فِى الْفَجْرِ فَقَالَ اَىْ بُنَىَّ مُحْدَثٌ .

رواه أبو عيس الترمذى فى جامعه وقال حسن صحيح ج ١ ، ص ٥٣

হযরত আবূ মালিক সা'দ আশজাঈ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতা হযরত তারিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে আমার পিতা, আপনি যথাক্রমে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) হযরত উমার (রা) এবং হযরত উসমান (রা)-এর পেছনে মদীনায় মসজিদে নববীতে বহু বছর পর্যন্ত নামায আদায় করেছেন এবং এ কূফা নগরীতে হযরত আলী (রা)-এর পেছনে প্রায় পাঁচ বছর পর্যন্ত নামায আদায় করেছেন, তাঁরা কি ফজর নামাযে নিয়মিত কুনূত পাঠ করেছেন ? প্রতি উত্তরে তিনি আমাকে বললেন-বৎস! এটা বিদ্'আত।[৩২] অর্থাৎ ফজর নামাযে নিয়মিত কুনূত তাঁরা কেউই পড়েননি, এখন যারা পড়ছে তাঁরা সুন্নাতের খিলাপ একটি গর্হিত বিদ্'আত কাজ করে গেছে।

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَدْعُ عَلٰى حَىٍّ مِّنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ رواه أبو جعفر الطحاوى فى شرح معانى الاثار ورواه أبو داؤد فى سننه

হযরত কাতাদাহ (র) সূত্রে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) (ফজর নামাযের) রুকুর পর এক মাস কুনূত পড়েছেন। তখন তিনি আরব দেশের একটি সম্প্রদায়ের অকল্যাণের দু'আ করছিলেন। অতঃপর তিনি কুনুত পড়া পরিত্যাগ করেছেন।[৩৩]

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ صَحِبَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَنَتَيْنِ فِى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فَلَمْ يَرَهُ قَانِتًا فِى الْفَجْرِ . رواه أبو جعفر الطحاوى فى شرح معانى الاثار ج ١ ، ص ١٤٨

৩২. আবূ ঈসা তিরমিযী, জামে তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩। তিনি বলেন হাদীসটি হাসান সহীহ; যাফর আহম্মাদ উসমানী, ই'লাউস সুনান হাদীস নং ১৭১৮ আবূ জাফর তাহাভী, শারহে মা'আনিল আসার, পৃ. ১৪৬।

৩৩. আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত।
আবূ জাফর তাহাভী, শারহে মা'আনিল আসার, বাবুল কুনূত, পৃ. ১৪৮,

www.pathagar.com

হযরত সুওয়ায়দ ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি স্বদেশে অবস্থান ও বিদেশ ভ্রমণ উভয় অবস্থায় দু'বছর পর্যন্ত হযরত উমার (রা)-এর সাথে অবস্থান করেছেন। কিন্তু তিনি কোনো সময়ই তাঁকে ফজর নামাযে কুনূত পড়তে দেখেননি। এ হাদীসটি ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসান (র) ও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) স্বীয় উস্তাদ হাম্মাদ ইবন আবূ সুলায়মান (র) থেকে আর তিনি হযরত ইব্রাহীম নাখঈ (র) হতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটির সনদ নির্মল অর্থাৎ বিশুদ্ধ (সহীহ)।[৩৪]

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَكَانَا لاَ يَقْنُتَانِ فِي الْفَجْرِ . رواه أبو جعفر الطحاوى فى شرح معانى الاثار . ج ١ ، ص ١٤٨

হযরত সাঈদ ইবন যুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর পেছনে নামায আদায় করেছি, তাঁরা ফজর নামাযে কুনূত পড়তেন না।[৩৫]

عَنْ غَالِبِ بْنِ فَرْقَدِ الطَّحَّانِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ شَهْرَيْنِ فَلَمْ يَقْنُتْ فِيْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ . نقله ظفر أحمد العثمانى فى اعلاء السنن وقال اسناده حسن ج ٦ ، ص ١٠٥ رقم ترتيب الحديث : ١٧٣٣

হযরত গালিব ইবন ফারকাদ আত-তাহহান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস ইবন মালিকের সংস্পর্শে দু'টি মাস অবস্থান করেছি। কিন্তু তিনি ফজর নামাযে কুনূত পড়েন নি।[৩৬]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقْنُتُ فِيْ صَلاَةِ الصُّبْحِ اِلاَّ اَنْ يَدْعُوْ لِقَوْمٍ اَوْ عَلٰى قَوْمٍ . نقله ظفر أحمد العثمانى فى إعلاء السنن ، رقم الحديث ١٧١٥ ، قال صاحب التنقيح سند هذا الحديث صحيح .

২. (ক) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ফজর নামাযে কুনূত পড়তেন না। তবে যদি কোনো সম্প্রদায়ের কল্যাণ অথবা কোনো দলের অকল্যাণের জন্য দু'আর পড়ার প্রয়োজন হত, (তখন তিনি তা পড়তেন।)[৩৭]

৩৪. যাফর আহমাদ উসমানী, ইলা'উস-সুনান, হাদীস নং ১৭৩৩, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ১-৫।

৩৫. শারহে মা'আনিল আ'সার, পৃ. ১৪৮।

৩৬. যাফর আহমাদ উসমানী, ই'লাউস-সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৭৩৩। এর সনদ উত্তম।

৩৭. যাফর আহমাদ উসমানী, ই'লাউস-সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস ক্রমিক -১৭১৫; তানকীহ লেখক বলেছেন-এ হাদীসটির সনদ সহীহ।

www.pathagar.com

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَقْنُتْ فِى الْفَجْرِ قَطُّ اِلاَّ شَهْرًا وَاحِدًا لَمْ يُرْ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ اِنَّمَا قَنَتَ فِىْ ذٰلِكَ الشَّهْرَ يَدْعُوْ عَلٰى نَاسٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ . نقله ظفر الحد العثمانى فى اعلاء السنن ج ٦ ، ص ، ١٠٥ ، رقم الحديث ١٧٣٢

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাস্উদ (র) থেকে বর্ণিত, যে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) মাত্র এক মাস ব্যতীত কখনও ফজর নামাযে কুনূত পড়েন নি। এর আগে বা পরে তাঁকে কোনো সময় ফজর নামাযে দু'আ, কুনূত পড়তে দেখা যায়নি, তবে এ একটি মাস যাবৎ তিনি মুশরিক সম্প্রদায়ের কিছু লোকের অকল্যাণের দু'আ করেছিলেন।[৩৮]

উপরোক্ত হাদীসগুলো কোনোরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই স্পষ্ট প্রমাণ করছে যে, ফজর নামাযে কুনূত পড়া সুন্নাত নয়। ফযরের শেষ রাক'আতে মাত্র এক মাস পর্যন্ত বিশেষ কারণে কুনূতে নাযিলা পাঠ করা হয়েছিল। সুতরাং কুনূতে রাতিবা বা নিয়মিত সব সময় ফজর নামাযে কুনূত পড়া সুন্নাতের খিলাফ, এটাই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত।

তবে উল্লিখিত হাদীসসমূহের বর্ণনাকারী সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আনাস ইবন মালিক (রা), হযরত আবূ হুরায়রা (রা) প্রমুখ থেকে এমন কয়েকটি হাদীসও বর্ণিত হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, ফজর নামাযে কুনূত পড়া সুন্নাত। বর্ণিত হাদীসগুলো নিম্নরূপ ঃ

عَنِ الرُّبَيْعِ بْنِ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ جَالِسًا فَقِيْلَ لَهُ اِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا فَقَالَ مَا زَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْنُتُ فِىْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا .

رواه أبو جعفر الطحاوى فى شرح معانى الاثار ونقله ظفر أحمد العثمانى فى اعلاء السنن ج ٦ وقال هذا حديث صحيح لا .... عليه رقم الحديث ١٧٣٢

হযরত রুবাঈ ইবন আনাস (রা) বলেছেন, আমি আমার পিতা হযরত আনাস ইবন মালিক (র)-এর সান্নিকটে বসাছিলাম, তখন তাঁকে বলা হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাত্র এক মাস ফজর নামাযে কুনূত পড়েছেন। একথা শুনে হযরত আনাস (রা) বললেন, যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুনিয়া থেকে বিদায় না নেয়া পর্যন্ত সব সময় ফজর নামাযে কুনূত পড়েছেন।[৩৯]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَدْعُوْا بِهٰذَا

---

৩৮. যাফর আহমাদ উসমানী, ই'লাউস্ সুনান, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৫।

৩৯. আবু জাফর তাহাবী, শারহে মা'আনিল আসার; যাফর আহমাদ উসমানী, ই'লাউস-সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস ১৭৩২, হাদীসটির সনদ সহীহ এবং পরিচ্ছন্ন।

www.pathagar.com

الدُّعَاءَ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِىْ مَنْ تَوَلَّيْتَ الخ . رواه الترمذى

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী (সা) যখন ফজরের দ্বিতীয় রাক'আতের রুকু হতে মাথা উত্তোলন করতেন তখন তিনি দু'হাত উত্তোলন করে শব্দ করে এ দু'আটি পড়তেন ঃ আল্লাহুম্মাহদিনী ফীমান হাদাইতা... থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত।[৪০]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لاَنَا اَقْرَبُكُمْ صَلاَةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُوْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ . رواه البخارى

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি তোমাদেরকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামাযের অনুরূপ নামায আদায় করে দেখাচ্ছি,অতঃপর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ফজর নামাযের দ্বিতীয় রাক'আতে সামি'আল্লাহু লি-মান হামিদাহ্ বলে রুকূ' থেকে দাঁড়িয়ে কুনূত পড়তেন তথা মু'মিনদের জন্য কল্যাণ কামনা করতেন আর কাফিরদের প্রতি লা'নত করতেন।[৪১]

আলোচনার প্রথম দিকে উদ্ধৃত হাদীসগুলোর সাথে পরবর্তী তিনটি হাদীসের বক্তব্যে (المتن) ভিন্নতা দেখা যায়। এ কারণে মুজতাহিদগণের মধ্যে হযরত ইমাম শাফিঈ (র) ফজর নামাযে স্বশব্দে দু'আ কুনূত পড়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন-এরূপ হযরত ইমাম মালিক (র) ফজর নামাযে নিঃশব্দে কুনূত পড়ার অভিমত দিয়েছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ উক্ত বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলোর সমন্বয় সাধন করে বলেছেন যে, ফজর নামাযে নিয়মিত কুনূত পড়া সুন্নাত নয়, বরং ঐ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীসই কুনূতে নাযিলা পাঠ সংক্রান্ত। তাঁরা বলেছেন ঃ

(এক) ফজর নামাযে দু'আ পড়া সংক্রান্ত প্রথম হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এ হাদীসটি তাঁর পরবতী জীবনে বর্ণনা কৃত নিম্নলিখিত হাদীস দ্বারা রহিত (المنسوخ) হয়ে গেছে।

عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ قُلْنَا لاَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ قَوْمًا يَزْعَمُوْنَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِى الْفَجْرِ فَقَالَ كَذَبُوْا اِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا وَاحِدًا يَدْعُوْ عَلٰى اَحْيَاءٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

قال اعلاء السنن القارى فى مرقاة المفاتيح فهذا عن انس رضى الله عنه صريح فى مناقضة رواية جعفر عنه وانه منسوخ. كذا فى المرقاة ج ٢، ص ١٩٥

হযরত আসিম ইবন সুলায়মান বলেন, আমরা হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করে ছিলাম, এক দল লোক বলছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজর নামাযে সব সময় কুনূত পড়তেন। তিনি

---

৪০. তিরমিযী, প্রাগুক্ত।

৪১. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল বুখারী সহীহ, প্রাগুক্ত।

বললেন, তারা মিথ্যা বলছে, রাসূলুল্লাহ (সা) মাত্র এক মাস ফজর নামাযে কুনূত পড়েছেন। তিনি তখন মুশরিকদের কয়েকটি গোত্রের প্রতি লা'নতের দু'আ করছিলেন।[৪২]

وَقَالَ صَاحِبُ الْمِرْقَاةِ وَلِهٰذَا لَمْ يَكُنْ اَنَسٌ نَفْسُهُ يَقْنُتُ فِى الصُّبْحِ كما رواه الطبرانى كذا فى المرقاة ج ٢ ، ص ١٦٦

মিরকাত প্রণেতা আরো বলেছেন, যে এ জন্যই হযরত আনাস (রা) নিজে ফজর নামাযে কুনূত পড়তেন না যেমন তাবারানী বর্ণনা করেছেন।[৪৩]

(দুই) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে ফজর নামাযে কুনূত পড়ার দু'টি হাদীসের জবাব নিম্নরূপ ঃ (ক)

وَقَالَ صَاحِبُ الْمِرْقَاتِ اَمَّا قُنُوْتُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ الْمَرْوِىُّ فَاِنَّمَا اَرَادَ بَيَانَ اَنَّ الْقُنُوْتَ وَالدُّعَاءَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَعَلَى الْكَافِرِيْنَ قَدْ كَانَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ اَنَّهُ مُسْتَمِرٌّ لاِعْتِرَافِهِمْ اَنَّ الْقُنُوْتَ الْمُسْتَمِرَّ لَيْسَ يُسَنُّ فِيْهِ الدُّعَاءِ لِهٰؤُلاَءِ وَعَلٰى هٰؤُلاَءِ فِىْ كُلِّ صَبَاحٍ - المرقاة . ص ١٦٦

মিরকাত প্রণেতা বলেন, ফজর নামাযে কুনূত পড়া প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ কথার বিবরণ প্রদান করা যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মু'মিনদের কল্যাণের এবং কাফিরদের অকল্যাণের দু'আ করতেন। তাঁর অর্থ এ নয় যে, প্রত্যেক ফজরেই করতেন। কেননা, এ কথা সকলেই স্বীকার করে যে প্রত্যহ ফজরে মু'মিনদের কল্যাণে ও কাফিরদের অকল্যাণের জন্য দু'আ করা সুন্নাত নয়।[৪৪]

(খ) মিরকাত প্রণেতা আরো বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ফজর নামাযে কুনূতে নাযিলার হাদীস বর্ণিত আছে।[৪৫]

وَقَالَ الشَّيْخُ الْعَلاَّمَ ظَفَرُ اَحْمَدُ اَلْعُثْمَانِىْ قُلْتُ اَحَادِيْثُ اَنَسٍ الْمُخْرَجَةَ فِى الصِّحَاحِ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلٰى تَخْصِيْصِ الْقُنُوْتِ بِالنَّازِلَةِ وَلَمْ يَكُنْ اِلاَّ شَهْرًا وَاحِدًا .

আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী (র) বলেন যে, হযরত আনাস (রা) থেকে সিহাহ্ সিত্তায় যত হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে সবগুলোই প্রমাণ করে যে, তা কুনূতে নাযিলার সাথে সম্পৃক্ত। যার কুনূতে নাযিলা এক মাসের বেশী পড়া হয়নি।[৪৬]

---

৪২. মোল্লা আলী কারী, মিরকাতুল মাফাতীহ, ২খ. পৃ. ১৬৫। আনাসের এ হাদীসটি সুস্পষ্টভাবে বুঝাচ্ছে তার থেকে পূর্বে রিওয়ায়াত কৃত হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে।

৪৩. মিরকাত, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১৬৬।

৪৪. মিরকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।

৪৫. মিরকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬। অত্র নিবন্ধের প্রথম দিকে সে হাদীসটি অনুবাদ সহ উদ্ধৃত হয়েছে।

৪৬. যাফর আহমাদ, ই'লাউস-সুনান, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

وَقَالَ اَبُوْ جَعْفَرُ الطَّحَاوِىُ اَمَّا حَدِيْثُ اَنَس فَقَدْ رُوِىَ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ ، مَا زَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْنُتُ فِى الْفَجْرِ اِلاَّ شَهْرًا وَاحِدًا حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا . رواه الطحاوى

রাসূলুল্লাহ (সা) দুনিয়া পরিত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত মাত্র এক মাস ব্যতীত সব সময় ফজর নামাযে কুনূত পড়েছেন।[৪৭]

وَقَالَ ظَفَرُ اَحْمَدُ الْعُثْمَانِىْ وَيُمْكِنُ اَنْ يُّحْمَلَ الْقُنُوْتُ عَلٰى اِطَالَةِ الْقِيَامِ لِلْقِرَأَةِ الَّذِىْ قَالَ فِيْهِ النَّبِىُّ ﷺ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ وَهٰذَا هُوَ الْقُنُوْتُ الَّذِىْ مَا زَالَ عَلَيْهَا حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا فَانَّهُ ﷺ كَانَ يُطِيْلُ صَلاَةَ الْفَجْرِ اَزْيَدَ مِنَ سَائِرِ الصَّلٰوَاتِ وَيَقْرَأُ فِيْهَا مِنَ السِّتِّيْنَ اِلَى الْمَائَةِ . إعلاء السنن ج ٦ ، ص ٩٧ تحت رقم الحديث ١٧١٦

কুনূত শব্দটি ফজর নামাযের কিরা'আত পড়ার জন্য দাঁড়ান অবস্থা (القيام) কে দীর্ঘ করার অর্থে নেয়ার সম্ভাবনা আছে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে নামাযে দাঁড়ান অবস্থা (القيام)-কে দীর্ঘ করা হয় সে নামায সর্বাধিক ফযীলত ও মর্যাদাপূর্ণ। আর এ হচ্ছে সে দীর্ঘ সময় দাঁড়ান, যা রাসূলুল্লাহ (সা) দুনিয়া ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত করেছেন, কেননা, তিনি সকল নামাযের চেয়ে ফজর নামাযকে দীর্ঘায়িত করতেন এবং এ নামাযে ষাট হতে এক শত আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন।[৪৮]

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِىْ هَدْىِ خَيْرِ الْبَشَرِ فَنَحْنُ لَمْ نَشُكْ وَلاَ نَرْتَابُ اَنَّهُ ﷺ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِى الْفَجْرِ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا وَهٰذَا اَىْ طُوْلُ الْقِيَامِ لِلْقِرَاءَةِ قُنُوْتٌ بِلاَ رَيْبٍ . اعلاء السنن ج ٦ ص ٩٧ فى شرح رقم الحديث ١٧١٦

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র) তাঁর প্রণীত 'হাদীসে খাইরুল বাশার' নামক কিতাবে বলেছেন যে এ ব্যাপারে আমাদের কোনই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সন্দেহ নেই, যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দুনিয়া ত্যাগ করা পর্যন্ত ফজর নামাযে যে কুনূত পড়েছেন তার অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি দীর্ঘ কিরা'আত পড়ার জন্য দাঁড়ান অবস্থাকে দীর্ঘায়িত করেছেন এবং এটাই হচ্ছে এখানে কুনূতের অর্থ তাতে কোনই সন্দেহ নেই।[৪৯]

বিষয়টি সার্বিক পর্যালোচনা প্রতীয়মান হয়, যে, ফজর নামাযে কুনূত পড়া সুন্নাত নয়, সে সকল হাদীসে ফজর নামাযে কুনূত পড়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সবই ছিল কুনূতে

৪৭. আবু জাফর তাহাভী, প্রাগুক্ত।

৪৮. যাফর আহমাদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খ. পৃ. নং ৯৭ হাদীস ক্রমিক ১৭১৬-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে।

৪৯. যাফর আহমাদ উসমানী, ই'লাউস, সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস ক্রমিক, ১৭১১ এর আলোচনা প্রসঙ্গে।

www.pathagar.com

নাযিলা সম্পর্কে। তবে হযরত আনাস (রা) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ফজর নামাযে কুনূতে নাযিলার হাদীস বর্ণনা করা সত্ত্বেও পরবর্তী সময় ফজর নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) আমরণ কুনূত পড়েছেন বলে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন সে সকল হাদীসের অর্থ কুনূতে নাযিলাও নয় আর ফজর নামাযে সব সময় নিয়মিত কুনূত পড়াও নয়, বরং সে সকল হাদীসে কুনূত (القنوت) শব্দের অর্থ (طول القيام) দীর্ঘ সময় নামাযে দাঁড়িয়ে থাকা যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ "তোমরা নামাযে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাকে দীর্ঘ কর", আর নামাযে দাঁড়ান অবস্থার আমল হচ্ছে কিরা'আত পড়া। সুতরাং ফজর নামাযে যত বেশী সময় দাঁড়িয়ে থাকা যায়, ততই কিরা'আত দীর্ঘ হয়। কিরা'আত দীর্ঘ হলে নামাযের মর্যাদাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পবিত্র কুরআনে সে জন্য ফজর নামায প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا .

"এবং ফযরের কুরআন পাঠ ও, নিশ্চয়ই ফজরের কুরআন পাঠে ফিরিশতাদের উপস্থিতি থাকে।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৮) এ আয়াত দ্বারা ফজর নামাযে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে নামাযে দীর্ঘ কিরা'আত পড়ার আদেশ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, নিশ্চয়ই ফজর নামাযের কিরা'আত শোনার জন্য দিবা নিশিতে আগমনকারী উভয় দল ফিরিশ্তা উপস্থিত থাকেন। এ বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যে ফজর নামাযে কুনূত পড়তেন তার অর্থ "দীর্ঘ সময় নামাযে দণ্ডায়মান থেকে দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করা" প্রমাণিত হয়। অতএব এ ব্যাখ্যা থেকে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত দু'টি হাদীস ও হযরত আনাস (রা) থেকে উদ্ধৃত শেষ হাদীসটি রহিত বলার প্রয়োজন পড়ে না। প্রাসঙ্গিক হাদীসগুলো দ্বারা যেখানে কুনূতে নাযিলা উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তা যথার্থ মনে করতে হতো আর যে সকল হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা) ফজর নামাযে আজীবন কুনূত পড়তেন বলা হয়েছে–তার অর্থ দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে দীর্ঘ কিরা'আত পড়া মেনে নিলে হাদীসগুলোর মধ্যে চমৎকার সমন্বয় সাধিত হয় এবং ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ফিকহে হানাফীর সিদ্ধান্ত সর্বোত্তম বলে প্রমাণিত হয়।

কুনূতে নাযিলা শুধু ফজর নামাযে সুন্নাত

বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের মুসলমান বা ইসলামী রাষ্ট্র কোনো বাইরের শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে বা কোনো সংকটের সম্মুখীন হলে, ইসলামী শরী'আতে ফজর নামাযের দ্বিতীয় রাক'আতের রুকূতে যাওয়ার পূর্বে বা পরে দাঁড়ানো অবস্থায় ইমাম স্বশব্দে কুনূত নাযিলা পাঠ করবেন এবং মুক্তাদীগণ আমীন আমীন বলবেন। এ ভাবে স্বপক্ষের কল্যাণ ও মুক্তি এবং বিপক্ষের অকল্যাণ বা ধ্বংস কামনা করা সুন্নাত। তবে এ কুনূতে নাযিলা প্রতিটি বিপদ মুসীবতের ক্ষেত্রে মাত্র এক মাস পড়া যাবে। এক মাসের অধিক সময় তা পাঠ করা সুন্নাতের খিলাফ, যদিও সংশ্লিষ্ট বিপদ মুসিবত উক্ত সময়ের মধ্যে বিদূরিত না হয়ে বরং দীর্ঘায়িত হতে থাকে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মাদানী জীবনে হিজরী চার সনের সফর মাসে কয়েকটি হৃদয় বিদারক ঘটনার প্রেক্ষিতে ফজর নামাযে কুনূতে নাযিলা পাঠ করে ছিলেন। তা আরম্ভের দিন থেকে এক মাস পাঠ করার পর পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের একখানা আয়াত নাযিল হয়, যার প্রেক্ষিতে তিনি তখনকার মত কুনূতে নাযিলা পাঠ করা ছেড়ে দেন। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِى لِحْيَانَ اسْتَمَدُّوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عَدُوٍّ فَاَمَدَّهُمْ بِسَبْعِيْنَ مِنَ الاَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّيْهِمُ الْقُرَّاءَ فِىْ زَمَانِهِمْ كَانُوْا يَحْتَطِبُوْنَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّوْنَ بِاللَّيْلِ حَتّٰى كَانُوْا بِبِئْرِ مَعُوْنَةَ فَقَتَلُوْهُمْ وَغَدَرُوْا بِهِمْ فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوْ فِى الصُّبْحِ عَلٰى اَحْيَاءٍ مِّنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِى لِحْيَانَ . رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان، اصح المطابع ج ٢ ، ص ٥٨٦

(এক) হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রা'ল, যাক্ওয়ান, ও উসাইয়া এবং লিহ্ইয়ান গোত্রের লোকেরা তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যিহাদ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে সাহায্যের আবেদন করে ছিল, তখন তিনি সত্তর জন আনসারী সাহাবী (রা)-কে পাঠিয়ে তাদের সাহায্য করলেন। আমরা মুসলমানগণ এ আনসারী সাহাবীগণকে সে যামানায় কারী নামে অভিহিত করতাম (তাঁরা সকলেই মসজিদে নববীর অবস্থিত সুফ্ফায় বসবাস করতেন) তাঁরা দিবাভাগে জঙ্গল হতে কাঠখড়ি সংগ্রহ করতেন, আর রাতভর নামায পড়তেন। তাঁরা যখন বীরে মা'উনা নামক স্থানের উপকণ্ঠে উপনীত হলেন তখন দূরাচার গোত্রগুলো সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতারণা করল এবং ঐ আনসারী সাহাবীগণকে নির্মমভাবে হত্যা করল। রাসূলুল্লাহ (সা) এ সংবাদ পেয়ে দারুণভাবে মর্মাহত হলেন। তিনি অবর্ণনীয় মনঃকষ্টে আরবের ঐ পাষণ্ড গোত্র তথা রা'ল, যাকওয়ান ও উসাইয়া এবং লিহ্ইয়ানের প্রতি আল্লাহ্ লা'নত (অভিশাপ) কামনা করে ফজর নামাযে এক মাস পর্যন্ত কুনূতে নাযিলা পড়লেন।[৫০]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّدْعُوْ عَلٰى اَحَدٍ اَوْ لاَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَرُبَمَا قَالَ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ - اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَالِيْدَيْنَ وَلِيْدٍ . وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطَأتَكَ عَلٰى مُضَرَ - وَاجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ ، يَجْهَرُ بِذٰلِكَ وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ بَعْضِ صَلٰوتِهِ فِى الْفَجْرِ

---

৫০. (ক) ইমাম বুখারী (র) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল, আল-জামেউস-সহীহ, কিতাবুল মাগাযী পরিচ্ছেদ গাজওয়া রা'ল, যাকওয়ান, দ্বিতীয় খ. পৃ. ৫৮৬, আসাহ্ হুল মাতাবি'।

(খ) القنوت শব্দটির কয়েকটি অর্থ আছে যথা الطاعة আনুগত্য السكوت নীরবতা طول القيام فى الصلوة নামাযে দীর্ঘ সময় দাঁড়ায়ে থাকা الاتصات عن الكلام কথা না বলে চুপ থাকা, الدعاء দু'আ, করা, الذكر আল্লাহকে স্মরণ করা। الدعاء المخصوص বিশেষ শব্দাবলী সম্বলিত 'দু'আ, পাঠ করা, এখানে শেষ অর্থ নেয়া হয়েছে।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী ফী-শারহে বুখারী, ২খ. পৃ. ৪২৪।

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا لاَحْيَاءِ الْعَرَبِ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٍ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ ﴾ .

رواه البخارى كتاب التفسير ، باب ليس لك من الامر شئ ج ٢ ، ص ٦٥٥ اصح المطالع كراچى ، سورة ال عمران ٣ : ١٢٨

(দুই) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, যে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কারো অকল্যাণের অথবা কারো কল্যাণের জন্য দু'আ করতে ইচ্ছা করতেন তখন তিনি (ফজর নামাযের দ্বিতীয় রাক'আতের) রুকূর পরে কুনূত (নাযিলা) পড়তেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) প্রায় সময়ে এ'রূপ কথাও বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ আল্লা হুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু, বলা শেষে বলতেন ঃ হে আল্লাহ! ওয়ালিদ ইবন ওয়ালিদ, সালামা ইবন হিশাম এবং আয়্যাশ ইবন রাবিয়াকে মুক্তি দিন।"

হে আল্লাহ! মুদার গোত্রের প্রতি আপনার দলন কঠোর করুন, আর তাদেরকে হযরত ইউসুফ (আ)-এর যামানার দুর্ভিক্ষের সমতুল্য মহা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন করুন। তিনি এ দু'আ, স্বশব্দে উচ্চারণ করতেন, এবং বিশেষ নামাযে অর্থাৎ ফজর নামাযে এ দু'আ, করতেন, হে আল্লাহ! আপনি আরবের অমুক অমুখ গোত্রের প্রতি লা'নত (অভিসম্পাৎ) বর্ষণ করুন, তিনি এ'ভাবে দু'আ করছিলেন, এ সময় এক দিন আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করলেন ঃ

"তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন, অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন, এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই, কারণ তারা যালিম।"[৫১]

উপরোক্ত হাদীস দু'টি কোনো রূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ব্যতিরেকেই স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুর প্রতি লা'নত কামনা করে ফজর নামাযে কুনূতে নাযিলা পাঠ করা এক মাসের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাত। প্রয়োজনে বিশ্বের যে কোনো মুসলিম জন গোষ্ঠী ফজর নামাযে এরূপ কুনূতে নাযিলা পাঠ করে সুন্নাতের উপর আমল করতে পারে। এটাই হচ্ছে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। এ বিষয়ে আরো কয়েকটি হাদীস নিম্নরূপ ঃ

اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ قَانِتًا فِى الْفَجْرِ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا اِلاَّ شَهْرًا وَاحِدًا قَنَتَ يَدْعُوْا عَلٰى حَىٍّ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ . لَمْ يُرَ قَانِتَانِ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ . رواه محمد فى كتاب الاثار وقال ابن امير الحاج هذا سند لاغبار عليه ونقله ظفر أحمد العثمانى فى اعلاء السنن ومرسل الثقات مقبول عند الجمهور . باب فى حكم قنوت الفجر ص : ١٠٥ رقم الحديث ١٧٣٢

---

৫১. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখরী, সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুত-তাফসীর ২খ., পৃ. ৬৫৫, সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১২৮।

www.pathagar.com

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) হাম্মাদ ইবন সুলায়মান (র) থেকে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ (র) ইব্রাহীম নাখঈ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, যে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর দুনিয়া ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত মাত্র এক মাস ব্যতীত ফজর নামাযে কুনূত পড়তে দেখা যায়নি, তিনি সে কুনূত পড়েছিলেন মুশরিকদের একটি গোত্রের অকল্যাণ কামনা করে। এর আগে বা পরে কোনো সময় তাঁকে এভাবে কুনূত (নাযিলা) পড়তে দেখা যায়নি।[৫২]

عَنْ عَـاصِمٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّمَـا قَنَتَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْفَجْرِ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلٰى اُنَاسٍ قَتَلُوْا اُنَاسًا مِّنْ اَصْحَابِه يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاُ .

رواه البخارى ونقله ظفر أحمد العثمانى فى إعلاء السنن ، رقم الحديث ١١ باب القنوت فى الفجر لم يكن الا .....

হযরত আসিম (র) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফজর নামাযে এক মাস পর্যন্ত এ জন্য কুনূত (নাযিলা) পড়েছেন যে, তিনি তখন এমন লোকদের প্রতি লা'নতের দু'আ করছিলেন যাঁরা কারী বলে পরিচিত তাঁর এমন এক দল সাহাবীকে (নির্মমভাবে) হত্যা করেছিল।[৫৩]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَـالَ كَـانَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقْنُتُ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ اِلاَّ اَنْ يَّدْعُوْا لِقَوْمٍ اَوْ عَلٰى قَوْمٍ نَقَلَهُ ظَفَرُ اَحْمَدُ الْعُثْمَانِىْ فِىْ إعلاءالسنن ج ٦ وقال صاحب التنقيح ان سند هذا الحديث صحيح وهو نص فى ان القنوت (اى فى الفجر) مختص بالنازلة رقم الحديث ١٧١٥

(পাঁচ) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কারো কল্যাণ অথবা কারো অকল্যাণ কামনা করা ব্যতীত কোনো সময়ে ফজর নামাযে কুনূত পড়েন নি।[৫৪]

উপরোক্ত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শত্রুপক্ষের অকল্যাণ কামনায় ফজর নামাযে কুনূতে নাযিলা পাঠ করেছেন এবং এক মাস পর্যন্ত পাঠ করার পর সূরা আলে

---

৫২. (ক) ইমাম মুহাম্মাদ (র) এ হাদীসটি তাঁর কিতাবুল আসারে বর্ণনা করেছেন এবং ইবন আমীরুল হাজ্জ নামক হাদীস বিশারদ বলেছেন, এ হাদীসের সনদে কোনো মলিনতা নেই, বিভিন্ন যোগ্য রাবীর হাদীসে মুরসাল গৃহীত।
(খ) যাফর আহমাদ উসমানী তদীয় ই'লাউস সুনানে ও হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, ৬ষ্ঠ খ. পৃ. ১০৫। হাদীস ক্রমিক ১৭৩২।

৫৩. বুখারী, প্রাগুক্ত,
(খ) যাফর আহমাদ উসমানী, প্রাগুক্ত, হাদীস ১৭১১।

৫৪. (ক) যাফর আহমাদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, ৬ষ্ঠ খ. হাদীস নং ১৭১৫।
(খ) তানকীহ কিতাবের প্রণেতা বলেছেন–এ হাদীসের সনদ সহীহ, এবং হাদীসটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, ফজর নামাযে কুনূত, পড়া হয়। বিপদ-আপদ সংক্রান্ত কারণেই।

www.pathagar.com

ইমরানের ১২৮ নং আয়াত নাযিল হলে তিনি ঐ কাফির গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে কুনূত পড়া বন্ধ করে দেন। আরো লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় মুশরিকদের দ্বারা অবরুদ্ধ কয়েক জন মুসলমানের মুক্তির জন্যও কুনূতে নাযিলা পাঠ করেছিলেন। তাও তিনি ফজর নামাযের দ্বিতীয় রাক'আতে একই নিয়মে পড়েছিলেন, তাঁর দু'আর বরকতে কিছু দিনের মধ্যে তাঁরা অবরোধ মুক্ত হয়ে হিযরত করে মদীনায় চলে আসেন। তখন তিনি তাদের মুক্তির জন্য পাঠকৃত কুনূত পড়াও ছেড়ে দেন। তবে হাদীস পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, কুনূতে নাযিলা পাঠ করা সাময়িকভাবে রহিত হয়েছিল, হযরতের ইন্তিকালের পর খুলাফা-ই-রাশেদুনের যামানায় কুনূতে নাযিলা পঠিত হয়েছে তারাও বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে ফজর নামাযেই কুনূত পড়েছেন। তা থেকে কুনূতে নাযিলা প্রয়োজনের সময় ফজর নামাযে পাঠ করা সুন্নাত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস এখনও আছে যা দ্বারা অন্যান্য নামাযেও কুনূত পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীসগুলো নিম্নরূপ ঃ

عَنْ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِى الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ . رواه الطحاوى فى شرح معانى الاثار .

হযরত আবদুর রহমান ইবন আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত, তাঁর কাছে হযরত বারা ইবন আযিব (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) ফজর এবং মাগরিব নামাযে কুনূত পাঠ করতেন।[৫৫]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺكَانَ اِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْاٰخِيْرَةَ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ مِنْ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ رَبِيْعَةَ اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ . رواه البخارى

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত যে, হতে মাথা উত্তোলন করে বলতেন, হে আল্লাহ ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদ ও সালমা ইবন হিশাম এবং আয়্যাশ ইবন রাবিয়াকে মুক্তি দিন–হাদীসটি শেষ পর্যন্ত।[৫৬]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ فَيَدْعُوْ عَلٰى اَحْيَاءِهِنَّ بَنِىْ سُلَيْمٍ عَلٰى رَعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ يُؤَمُّ مَنْ خَلْفَهُ رواه أبو داؤد

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) লাগাতার এক মাস পর্যন্ত যুহর, আসর, মাগরিব ও এশা এবং ফজর নামাযে শেষ রাক'আতের রুকু

৫৫. আবু জাফর তাহাভী, শারহি মা'আনিল আসার, প্রাগুক্ত।

৫৬. বুখারী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

থেকে সামি'আল্লাহু লি-মান হামিদাহ বলে কুনূত (নাযিলা) পড়েছেন, তাতে তিনি বনী সুলাইম গোত্রের অধঃস্তন শাখা রা'ল, যাক্ওয়ান, উসাইয়া এর অকল্যাণের দু'আ করতেন আর তাঁর পেছনের মুক্তাদীগণ আমীন বলতেন।[৫৭]

উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে জানা গেলো যে, কুনূতে নাযিলা ফজরসহ অন্যান্য নামযেও রাসূলুল্লাহ (সা) পাঠ করেছেন। মুহাদ্দিসগণ এ ধরনের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে মর্মার্থ নির্ণয়ের জন্য সমন্বয় সাধনের নীতি অবলম্বন করেছেন। আলোচ্য হাদীসগুলোতে সে নীতি প্রয়োগ করে বলেছেন, হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ رواه أبو داؤد

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এক মাস কুনূত পড়েছেন–তারপর তা পরিত্যাগ করেছেন। এ হাদীসে বর্ণিত ثم تركه-এর দু' প্রকার অর্থ নেয়া যেতে পারে।

(ক) تَرَكَهُ فِى الْاَرْبَعِ دُوْنَ الْفَجْرِ ফজর বাদে অন্য চার ওয়াক্ত নামাযে কুনূত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন।

(খ) সকল নামাযে কুনূত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন অথবা যে সকল গোত্রের অকল্যাণ কামনায় কুনূত পড়তেন তাদের গোত্রে ছেড়ে দিয়েছেন।

এ প্রেক্ষিতে (شرح السنن) শারহুস-সুনান, কিতাবে উল্লেখ আছে ذَهَبَ الْاَكْثَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنْ لاَّ يَقْنُتَ فِى الصَّلٰوَاتِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ

এ হাদীসের কারণে বেশীরভাগ আলিম বলেছেন কোনো নামাযেই কুনূতে নাযিলা পড়া যাবে না।[৫৮]

قَالَ الْحَازِمِىْ فِى كِتَابِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوْخِ اَنَّهُ رُوِىَ الْقُنُوْتُ فِى الْفَجْرِ عَنِ الْخُلَفَاءِ الْاَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ وَمِثْلِ عَمَّارِ بْنَ يَاسَرٍ . وَاُبَىْ بْنِ كَعْبٍ وَاَبِى مُوْسٰى الاَشْعَرِىْ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَاَنَسٌ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِى وَمُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ وَعَائِشَةَ وَقَالَ ذَهَبَ اِلَيْهِ اَكْثَرُ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِيْنَ . نقله الملا على القارى فى مرقاة المفاتيح . ج ٢ ، ص ١٦٥

আল্লামা হাযিমী (র) 'নাসিখ ওয়াল মানসূখ' কিতাবে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের পর ফজর নামাযে কুনূত নাযিলা পাঠ করা চার খলীফা (রা) এবং অন্যান্য সাহাবী যথা- হযরত আম্মার ইবন ইয়াসার (রা), হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা), হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা), হযরত ইবন আব্বাস (রা), হযরত আবূ হুরায়রা (রা), হযরত বারা ইবন আযিব (রা), হযরত আনাস (রা), হযরত সাহল ইবন সা'দ (রা) ও হযরত মুয়াবিয়া ইবন আবূ

৫৭. আবূ দাঊদ, প্রাগুক্ত।

৫৮. মোল্লা আলী আল-কাবী, মিরকাতুল মাফাতীহ, ২খ., পৃ. ১৬৫।

www.pathagar.com

সুফিয়ান (রা) এবং হযরত আয়েশা (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। তিনি আরো বলেছেন অধিক সংখ্যক সাহাবী এবং তাবিঈর মাযহাব ঐটাই।[৫৯]

وَقَالَ الْمُلاَّ عَلِيْ الْقَارِيْ فِيْ مِرْقَاةِ الْمَفَاتِيْحِ اَيْضًا وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَنَتَ عِنْدَ مُحَارَبَةِ الصَّحَابَةِ مُسَيْلَمَةَ وَعِنْدَ مُحَارَبَةِ اَهْلِ الْكِتَابِ وَكَذٰلِكَ قَنَتَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَذٰلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي مُحَارَبَةِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَمُعَاوِيَةُ فِيْ مُحَارَبَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ . المرقاة ، ج ٢ ، ص ١٦٧ باب يفصل الثانى القنوت

উল্লিখিত 'মিরকাতুল মাফাতীহ' কিতাবে আরো বলা হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মুসাইলামা কায্যাবের সাথে সাহাবা-ই-কিরাম এর যুদ্ধের সময় এবং আহলে কিতাব রুমীদের সাথে যুদ্ধের সময়, এরূপ হযরত উমার (রা) তাদের সাথে যুদ্ধের সময়, এবং হযরত আলী (রা) মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে সিফ্ফীনের যুদ্ধের সময় এবং হযরত মু'আবিযা (রা) ও একই যুদ্ধের সময় কুনূতে নাযিলা পাঠ করেছেন।[৬০]

অতএব সাহাবীগণের সম্মিলিত আমল দ্বারা সংকটকালীন সময় সর্বোচ্চ এক মাস করে কুনূতে নাযিলা পাঠ করা প্রমাণিত হয়। বিষয়টি সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের তরফ থেকে বিভিন্ন সময় সংকটময় সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, মুসলমানগণ যথাযথ প্রতিরোধ করেছেন এবং কুনূতে নাযিলা পাঠ করে আল্লাহ্‌র দরবারে সাহায্য কামনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জীবনে একাধারে এক মাস পর্যন্ত তা পাঠ করেছেন, প্রধানত তিনি তা ফজর নামাযেই পাঠ করেছেন, কিন্তু ঘটনার হৃদয় বিধারকতায় উদ্বিগ্ন অবস্থায় কোনো সময় অন্যান্য নামাযেও পাঠ করেছেন।

পরবর্তী সময় সাহাবা ও তাবিয়ীগণ যখন কুনূতে নাযিলা পাঠ করার প্রয়োজন মনে করেছেন–তখন তাঁহা ফজর নামাযে পাঠ করেছেন এবং এর উপর কার্যত ইজ্‌মা তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লামা ইশফাকুর রহমান বলেন ঃ

وَاَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلٰى جَوَازِ الْقُنُوْتِ النَّازِلَةِ بَعْدَ النَّسْخِ المذكور حاشية سنن أبى داؤد اشفاقى .

নবী করীম (সা)-এর যামানায় মানসূখ হবার পর কুনূতে নাযিলা জায়িয এ বিষয় উম্মাতের আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছে, তাবিঈদের পরবর্তী মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ এর উপর আমল করে আসছেন, এতে করে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কুনূতে নাযিলা পাঠ করা ফজর নামাযের সুন্নাত নয়। বরং সাময়িক প্রয়োজনে কুনূতে নাযিলা পাঠ করতে হলে তার মাসনূন।

৫৯. মোল্লা আলী আল-কারী, মিরকাতু মাফাতীহ, প্রাগুক্ত, ২খণ্ড, পৃ. ১৬৫।

৬০. মিরকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

www.pathagar.com

সময় হচ্ছে ফজর নামায। ফজর নামাযের গুরুত্ব অধিক, তা দিবা নিশি আগত ফিরিশ্তা কুলের সম্মেলন সময়, দু'আ, কবুলের উত্তম মুহূর্তে। এ আলোচনা দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কুনূতে নাযিলা বা সাময়িক কুনূত যদি পাঠ করতে হয় তবে তা ফজর নামাযে যথা নিয়মে পাঠ করা সুন্নাত, এতে ইমামগণের মত বিভিন্নতা নেই।

হাদীসগুলোর পর্যালোচনায়, এ কথাও স্থির হলো যে, কুনূতে নাযিলা ফজর নামাযের দ্বিতীয় রাক'আতের রুকূ' থেকে দাঁড়িয়ে ইমাম স্বশব্দে পাঠ করবেন এবং মুক্তাদীগণ নিঃশব্দে আমীন আমীন বলবেন। আর বিতর নামাযের কুনূতে রাতিবা, তৃতীয় রাক'আতের রুকূতে গমণের পূর্বে তাক্‌বীর বলে হাত উত্তোলন করে তাহরীমা বেঁধে ইমামও মুক্তাদী উভয়ই নিঃশব্দে পাঠ করবেন–যেমন তারাবীহ নামাযের পর জামা'আতের সাথে বিতর পড়া হয়।

কুনূতে নাযিলার মাসনূন দু'আ

রাসূলুল্লাহ (সা) যে সকল দুষ্ট দূরাচার ও চরম প্রতারক মুশরিক গোত্রের উপর আল্লাহ্‌র না'নত কামনায় কুনূতে নাযিলা পাঠ করেছিলেন; তাদের গোত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। আর মক্কার মুশরিকদের দ্বারা অবরুদ্ধ হিজরতে বাধাপ্রাপ্ত সাহাবীগণের নাম ও পিতার নাম উল্লেখ করে তিনি কুনূত পড়েছেন। প্রাসংগিক আলোচনায় পেশকৃত হাদীসগুলো তার প্রমাণ বহন করে।

অতএব পরবর্তী যুগে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেখানে যে শত্রুপক্ষ বিপর্যয় ও শান্তি ভংগের কাজ করবে, যুগের আলিম ও মুসলমানগণ তাদের গোত্রগত অথবা ব্যক্তিগত নাম উল্লেখ করে কুনূতে নাযিলা পাঠ করলে তা সুন্নাত সম্মত হবে। তাতে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না।

তবে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, যেন কুনূতের শব্দাবলী كــلام الناس মানুষের মুখনিঃসৃত কথার সদৃশ্য না হয়। কারণ মানুষের মুখের কথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দাবলী দ্বারা নামাযের মধ্যে দু'আ করা হলে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে।

এ জন্য ফকীহগণ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত দু'আটি কুনূতে নাযিলা হিসেবে পাঠ করা সুন্নাত বলে মতামত দিয়েছেন। হাদীসটি নিম্নরূপঃ[৬১]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ "اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ" . رواه الترمذى ايضا عن الحسن بن على

৬১. আবূ ঈসা তিরমিযী জামি', হযরত আসান ইবন আলী (রা) হতে বর্ণিত, আবূ ঈসা (র) হাদীসটিকে হাসান (উত্তম) বলেছেন এ কুনূতের দু'আ, হিসেবে এর চেয়ে উত্তম কিছু আমার জানা নেই।

www.pathagar.com

رضى الله عنه ج ١ ، باب ما جاء فى قنوت الوتر وقال أبو عيسى رضى الله عنه هذا حديث حسن لا نعرف فى القنوت شيئا احسن من هذه .

এখানে হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে স্পষ্ট ফজর নামাযে পড়ার কথা উল্লেখ থাকায় ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর অনুসারী ফিক্বহবিদগণ এটাকে কুনূতে নাযিলার দু'আ হিসেবে গ্রহণ করেছেন ঃ এ বিষয়ে মুহাক্কিক কয়েকজন আলিমের মতামত নিম্নরূপ ঃ

(এক) بَدَائِعُ الصَّنَائِع নামক কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লামা আবুল হাসান (র) বলেছেন-

اللّهم اهدنى فيمن هديت الخ متعلق بالقنوت النازلة نقله فى تنظيم الاشتات ج ١ ، ص ٤٣٠

নাযিলার সাথে সম্পর্ক যুক্ত।[৬২]

(দুই) আল্লামা আবদুর রউফ দানাপুরী (র) বলেছেন,

ابن القيم نے كہا كہ حضرت ابو هريرة رضـ كى روايت كرده دعا قنوت نازلة كے وقت پڑهنا سنت مستمره هے نقله فى اصح السير فى هدى خير البشر - باب القنوت

ইবনুল কাইয়্যিম (র) বলেছেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনাকৃত দু'আটি কুনূতে নাযিলার সময় পড়া যুগযুগ ধরে চলে আসা স্বীকৃত সুন্নাত।[৬৩]

তবে বিজ্ঞ আলেমগণ كلام الناس তথা মানুষের মুখের কথার সাথে সাদৃশ্যমান না হয়ে হাদীসের বাণীর সাথে সাদৃশ্যমান হয় এমন ভাষায় সমকালীন ইসলামও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফিরদের দলগত নাম উল্লেখ করে কুনূতে নাযিলা পাঠ করতে পারবেন। তাতে ফিকহে হানাফী মতে কোন বাধা নেই।

অবশ্য কুনূতে নাযিলার শব্দাবলী সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপক অর্থবোধক হতে হবে, এবং যেহেতু তা ফজরের ফরয নামাযের মধ্যে পড়তে হয় সে জন্য এর পরিমাণ সুরাতুল ফাতিহার পরিমাণের চেয়ে দীর্ঘ না হওয়া উত্তম।[৬৪]

বিতর নামায ফাওত হয়ে গেলে এর কাযা ওয়াজিব

ইসলামী শরী'আতে বিতর নামায ফাওত হলে, তা কাযা করা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই।

---

৬২. আল্লামা আবুল হাসান (র), তানযীমুল আশতাত, ১ম খ. পৃ. ৪৩০, মাকতাবা-ই-দেওবন্দ।

৬৩. আবদুর রউফ, আসাহ্-হুস-সিয়ার ফী হাদিয়ে খাইরিল বাশার, কুনূত পরিচ্ছেদ।

৬৪. "ঈদ এবং জুমু'আর নামাযের দ্বিতীয় খুতবায় এবং পবিত্র হজ্জের খুৎবায় আমভাবে ইয়াহুদ, নাসারা ও মুশরিকীনদের দলগত নাম উচ্চারণ করে তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করার প্রচলন আছে–তা কুনূতে নাযিলার পর্যায় ভুক্ত নয়-তবে হাদীসের ভাষ্যে ঃ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْعُوْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَيَدْعُوْ عَلَى الْكَافِرِيْنَ রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদের কল্যাণ এবং কাফির সম্প্রদায়গুলোর অকল্যাণের দু'আ, করতেন। এ'ভাবে দু'আ, করাও সুন্নাত বলে বিবেচিত। কিন্তু নিয়মিত প্রত্যেক ফরয নামায বাদ বা প্রত্যহ ফজর নামায বাদ এভাবে দু'আ করা জায়িয হলেও তা সুন্নাত নয়।

www.pathagar.com

ফিকহ্ হানাফী মতে বিতর নামায আদায় করা ওয়াজিব এবং তা ফওত হয়ে গেলে কাযা করাও ওয়াজিব। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম শাফিঈ (র)-এর নিকট বিতর নামায আদায় করা সুন্নাত, কিন্তু তা ফওত হয়ে গেলে কাযা করা ওয়াজিব।

ইমাম শাফিঈ (র) এক অন্য এক বর্ণনা মতে বিতর নামায আদায় করা ফরয। কিন্তু ফওত হয়ে গেলে তা কাযা করা ওয়াজিব।

এতে প্রমাণ করে যে বিতর নামাযকে যাঁরা সুন্নাত বলেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, এ নামায সুন্নাহ অর্থাৎ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু যেহেতু তা ফওত হলে তার কাযা করা তারা ওয়াজিব বলেন। এতে বুঝা যায় যে-তাদের কাছে বিতর নামায বিশ্বাসগত দিক দিয়ে সুন্নাত, কিন্তু কার্যগত দিক দিয়ে ওয়াজিব। আর ইমাম শাফিঈ (র)-এর যে বর্ণনায় ফরয বলা হয়েছে তা বিশ্বাসগত ফরয নয় বরং কার্যগত ফরয। অতএব, বিতর নামায ফওত হলে, তা কাযা করা ওয়াজিব, তাতে ফকীহগণের মতামতের কোনো বিভিন্নতা নেই। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰه بْنِ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهٖ فَلْيُصَلِّ اِذَا اَصْبَحَ . رواه الترمذى وقال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل الكوفة الى هٰذَا الْحَدِيْثِ وَقَالُوْا يُوْتِرُ الرَّجُلُ اِذَا ذَكَرَ وَاِنْ كَانَ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ . رواه الترمذى الوتر ج ١ ، ص ١٠٦

হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়িদ ইবন আসলাম তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ "কেউ বিতর নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়লে (যদি ঘুমের কারণে তা ফাওত হয়ে যায়) তবে ভোর হয়ে সূর্যোদয় হয়ে গেলেও যখন স্মরণ হবে তখন তা কাযা করে নিতে হবে।"

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেছেন যে, ঐ হাদীসটি দলীল হিসেবে গ্রহণ করে কূফাবাসী কতক আলিম (হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেছেন, কারো যখন স্মরণ হবে তখন সে বিতর নামায পড়ে নিবে যদিও তা সূর্যোদয়ের পরে হয়।[৬৫]

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ قَامَ عَنْ وِتْرِهٖ اَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهٖ اِذَا اَصْبَحَ اَوْ ذَكَرَهُ .

---

৬৫. (ক) আবূ ঈসা তিরমিযী আল জামে' লিল তিরমিযী, আবওয়াব সালাত, বাবুল বিতর, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৬

(খ) الوتر। শাব্দিক অর্থ-বি-জোড় সংখ্যা। ফিকহ হানাফী মতে এশা নামাযবাদ সুবহ সাদিকের পূর্বে এক সালামে তিন রাক'আত বিতর নামায পড়া ওয়াজিব। ইমাম মুহাম্মাদ (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ এ নামাযকে সুন্নাত বলেন, কিন্তু কাযাগতভাবে ওয়াজিব বলেন। ইমাম শাফিয়ী (র)-এর মতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে দু'বার সালাম ফিরিয়ে তিন রাক'আত নামায আদায় করা সুন্নাত বা ফরয। অর্থাৎ তার থেকে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

رواه ابن ماجه كتاب الصلوة باب من نام عن وتر او نسية ج ١ ، ص ٨٣ ، قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ونقل فى صحيحه ابن الحبان عن شيخه .

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, কে বিতর নামায না পড়ে ঘুমিয়ে গেলে বা ভূলক্রমে তা ফাওত হয়ে গেলে তা কাযা পড়ে নিতে হবে। ভোর হয়ে গেলে বা যখন স্মরণ করতে পারবে, তখন কাযা করবে।[৬৬]

(খ) হাকিম আবূ আবদুল্লাহ বলেছেন, হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের হাদীস গ্রহণের শর্তের নিরিখে সহীহ।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَاَوْتِرُوْا مَا اَصْلَ الْقُرْاٰنِ . رواه أبو داؤد وفى سنن أبى داؤد ج ١ ، ص ٢٠٠

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ বে -জোড় (একক) তিনি বে-জোড় (সংখ্যক) নামাযকে ভাল বাসেন। অতএব হে পবিত্র কুরআনের ধারকগণ। তোমরা বে-জোড় (বিতর) নামায আদায় করো।[৬৭]

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِىِّ اَنَّهُ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَّ كُمْ بِصَلٰوةٍ هِىَ خَيْرٌ مِّنْ حُمُرِ النَّعَمِ مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ الْوِتْرُ .

رواه أبو داؤد وقال هذا سند صحيح ج ١ ، ص ١-٢

হযরত খারিজা ইবন হুযাফাহ আল-আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ অবশ্যই মহান আল্লাহ তোমাদের এমন এক নামায দিয়ে সাহায্য করেছেন যা তোমাদের জন্য লাল বর্ণের উট (প্রাপ্তি)-এর চেয়ে অনেক উত্তম তা এশা নামায বাদ সুবাহি সাদিক বিকশিত হয়ে যাবার মধ্যবর্তী সময় পড়ে নিতে হবে। জেনে রেখো তা হচ্ছে বিতর (নামায।) ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ।[৬৮]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرُ فَلَيْسَ مِنَّا اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا . رواه أبو داؤد فى سننه .

---

৬৬. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন মাজা সুনান-ই ইবন মাজা কিতাবুস-সালাত অধ্যায়, বিতর নামায না পড়ে নিদ্রা গেলে বা ভুলে গেলে, ১ম খ., পৃ. ৮৩

৬৭. আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আশ'আস, সুনানে আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০০।

৬৮. আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আশ'আস, প্রাগুক্ত, সুনানে আবূ দাউদ, ১ম খ. পৃ. ২০১।

www.pathagar.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবন বুরাইদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন-বিতর নামায অপরিহার্য। অতএব যে ব্যক্তি বিতর নামায পড়ে না সে আমাদের দল ভুক্ত নয়। বিতর নামায অপরিহার্য যে ব্যক্তি বিতর নামায পড়ে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়, বিতর নামায অপরিহার্য, যে ব্যক্তি বিতর নামায পড়ে না সে-আমাদের দলভুক্ত নয়।[৬৯]

عَنْ اَبِىْ بُصْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ زَادَ كُمْ صَلَاةً اَلَا وَهِىَ الْوِتْرُ فَصَلُّوْهَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ . رواه أبو داؤد

হযরত আবূ বুসরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি নামায বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। স্মরণ রেখো তা হচ্ছে বিতর নামায, এশা বাদ এবং সুবাহি সাদিক উদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে তোমরা তা আদায় করে নিবে।[৭০]

উপরোক্ত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে সকল মাযহাবের ফিকহ্ মতে বিতর নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়। এ নামায সুন্নাহ তথা হাদীসে রাসূল দ্বারা নির্দেশিত হলেও এর স্থান সুন্নাতের উর্দ্ধে। পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা নির্দেশিত না হলেও এ নামায রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভাষ্যে মহান আল্লাহ্ই-তাঁর উম্মাতের জন্য বৃদ্ধি করে দিয়েছেন এতে করে এ নামায পাঁচ ওয়াক্ত নামযের সমতুল্য ফরয না হলেও ফরযের প্রায় সমশ্রেণী ভুক্ত অর্থাৎ ওয়াজিব নামায বলে ঘোষিত হয়েছে। কোনো নফল বা সুন্নাত নামাযের সাথে এর তুলনা নেই, বরং রাসূলুল্লাহ (সা) এ নামাযকে ফরয নামাযের সাথে তুলনা করে ইরশাদ করেছেন اَلْوِتْرُ مِثْلُ الْمَغْرِبِ। বিতর নামায মাগরিবের নামাযের মতই। অধিকন্তু হাদীসের ভাষ্যে فَصَلُّوْا। এবং ইত্যাদি আদেশসূচক শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়াজিব নির্দেশ করে।

এরূপ উপলক্ষে উল্লিখিত একটি হাদীসে নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ زَادَكُمْ صَلَاةً এ, থেকে বিতর নামায আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত ফরয নামায তুল্য বোঝা যায়। অতএব এ নামায কোনো কারণবশত ফাওত হয়ে গেলে তা কাযা করা সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব। বিষয়টি সম্পর্কে বিশুদ্ধ ফকীহগণ নিম্নরূপ বিশ্লেষণ করেছেন ঃ

قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ اَلْوِتْرَ وَاجِبٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَقَالَا سُنَّةٌ لِظُهُوْرِ اَثَارِ السُّنَنِ فِيْهِ حَيْثُ لَايُكَفِّرُ جَاحِدُهُ وَلَا يُوَذَّنُ لَهُ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ زَادَ كُمْ صَلَاةً اَلَاوَهِىَ الْوِتْرُ فَصَلُّوْا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ وَقَوْلُهُ ﷺ فَصَلُّوْا اَمْرٌ وَالْاَمْرُ لِلْوُجُوْبِ وَلِهٰذَا يَجِبُ الْقَضَاءِ

ومعنى قول الصاحبين انه سنة لانه وجوبه ثبت بِالسُّنَّةِ وَاَنَّهُ يُوَدِّى وَقْتَ الْعِشَاءِ فَاكْتَفَى بِاَذَانِهِ وَاِقَامَتِهِ اَنْتَهِىْ

---

৬৯. আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আশ'আস, প্রাগুক্ত, ১ম খ., পৃ. ২০০।

৭০. আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আশ'আস, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

الهداية ج ١ ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الوتر ، ص ١٤٤ كتبخان رشيده ، ديوبند .

(এক) হিদায়া কিতাব প্রণেতা বলেন, হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে বিতর নামায ওয়াজিব। তবে সাহিবাইন (র) বলেন, তা সুন্নাত। কেননা এতে সুন্নাতের অনেক লক্ষণ পরিস্ফুটিত। যেমন এর অমান্যকারীকে কাফির বলে ফাতওয়া দেয়া হয় না এবং (ফরয নামাযের ন্যায়) এ নামাযের জন্য আযান দেয়া হয় না।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর দলীল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী ঃ

انَّ اللّٰهَ زَادَكُمْ صَلاَةً اَلاَ وَهِىَ الْوِتْرَ فَصَلُّوْهَا الخ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য একটি নামায বৃদ্ধি করে দিয়েছেন, মনে রেখো, তা হচ্ছে বিতর নামায। তোমরা এশাবাদ সুবহে সাদিক বিকশিত হবার পূর্বে এ নামায আদায় করবে।" এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী فَصَلُّوْا আদেশসূচক, এবং ইলমে ফিকহের মূলনীতি মতে আদেশসূচক বাক্য এখান ওয়াজিব করণার্থে নির্দ্ধারিত। অতএব তা ফাওত হলে কাযা করা ওয়াজিব হবে। তবে সাহিবাইন (র)-এর অভিমতে তা সুন্নাত। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিতর নামায ওয়াজিব হওয়া হাদীসে রাসূল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং এটা এশার নামাযের ওয়াক্তে আদায় করতে হয় এবং এর জন্য এশার নামাযের আযান ও ইকামত-ই-যথেষ্ট হয়।[৭১]

وَقَالَ الطَّحَاوِىْ تَجِبُ الْقِرَأَةُ فِىْ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ وَاَعْلٰى دَرَجَةً مِّنَ السُّنَّةِ حَتّٰى يَجِبُ الْقَضَا بِتَرْكِهَا نَاسِيًا اَوْ عَمَدًا وَاِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ وَلاَ يُوَدِّى عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ يَجُوْزُ اِلاَّ بِنِيَّةِ الْوِتْرِ دُوْنَ التَّطَوُّعِ وَسَائِرِ السُّنَنِ وَلَوْ كَانَتْ سُنَّةً لَكَفَيْهَا نِيَّةُ السُّنَّةِ . شرح معانى الاثار ، باب الوتر

(দুই) ইমাম তাহাভী (র) বলেন, বিতর নামাযের তৃতীয় রাক'আতে ও সূরা ফাতিহার সাথে কিরা'আত মিলান ওয়াজিব। এতে বুঝা যায় যে, বিতর নামায ফরয নয়–কেননা ফরয নামাযের তৃতীয় রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তে হয়। কিন্তু এ নামায সুন্নাত নামাযের উর্দ্ধে। কেননা ভুলক্রমে বা স্বেচ্ছায় তরক করলে এ নামায কাযা করা ওয়াজিব হয়। কিন্তু সুন্নাত নামায ফাওত হলে তার কাযা করা ওয়াজিব নয়। এমন কি বিতর নামায ফাওত হবার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও তার কাযা করা ওয়াজিব।

আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, বিনা ওযরে বিতর নামায জীবজন্তুর পিঠে বা চলমান যানবাহণে আরোহণ অবস্থায় কিবলা বিমুখ হয়ে আদায় করা যাবে না। অথচ নফল এবং অন্যান্য সুন্নাত নামায সে অবস্থায় আদায় করার অনুমতি আছে।

৭১. বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আল মারগীনানী আল-হিদায়া, ১ম খণ্ড, কিতাবুস-সালাতি, বাবুল বিতর, পৃ. ১৪৪, কুতুবখানা রশীদিয়া, দেওবন্দ।

www.pathagar.com

তা ছাড়া বিতর নামায নিয়্যতের সাথে আদায় করতে হবে, বিতরের নিয়্যত না করলে বিতর আদায় হবে না। অথচ নফল এবং সব ধরনের সুন্নাত নামায সুন্নাত বা নফল নিয়্যতে আদায় করলে তা আদায় হয়ে যায়। এতে করে প্রমাণ হয় যে, বিতর নামায সুন্নাত নয়, বরং সুন্নাতের উর্দ্ধে-অর্থাৎ ওয়াজিব। কাজেই তা ফাওত হলে, কাযা করা ওয়াজিব হবে।

وَقَالَ الشَّيْخُ اَبُوْ الْحَسَنِ وَاضَافَةُ الزِّيَادَةِ اِلَى اللّٰهِ وَالسُّنَنُ تُضَافُ اِلَى الرَّسُوْلِ ﷺ فَالزِّيَادَةُ تَتَصَوَّرُ فِى الْوَاجِبَاتِ لاَنَّهَا مَحْصُوْرَةٌ بِخِلاَفِ النَّوَافِلِ فَانَّهُ لاَ نِهَايَةَ لَهَا وَالزِّيَادَةُ اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ اِذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الْمَزِيْدِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْوُجُوْبُ وَالزِّيَادَةُ اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ اِذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الْمَزِيْدِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْوُجُوْبُ وَصِيْغَةُ الاَمْرِ تَدُلُّ عَلَى الْوُجُوْبِ فَيَجِبُ الْقَضَاءُ . تنظيم الاشتات ج ١ ، ص ٤٢

(তিন) মুহাদ্দিস শাইখ আবুল হাসান (র) বলেছেন, হাদীসটিতে নামায বৃদ্ধি করণ বাক্যটি আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্বন্ধযুক্ত, অথচ সুন্নাতসমূহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে থাকে। অতএব আল্লাহ কর্তৃক বৃদ্ধি করণ সুন্নাতের উর্দ্ধে ফরযের প্রায় সম জাতীয় অর্থাৎ ওয়াজিব হবে। কেননা ফরয বা ওয়াজিব সীমাবদ্ধ তার সংখ্যা গণনা করা যায়। কিন্তু নফল-এর কোনো সীমা সংখ্যা নেই।

বৃদ্ধি করণ প্রমাণিত হবে যখন তা আর উপর বৃদ্ধি করা রয়েছে তার সম জাতীয় হয়। আর তা হচ্ছে ওয়াজিব হওয়া যা ফরযের সম জাতীয়। আর আমর তথা আদেশসূচক বাক্য দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎ বিতর নামায ওয়াজিব, সুতরাং তা ফাওত হলে কাযা করা ওয়াজিব হবে।[৭২]

وَفِىْ الْمِرْقَاتِ وَمَذْهَبُ اِلَى حَنِيْفَةَ اَنَّهُ يَجِبُ قَضَاءُ الْوِتْرِ حَتّٰى لَوْ كَانَ الْمُصَلِّىْ صَاحِبُ التَّرْتِيْبِ وَصَلَّى الصُّبْحَ قَبْلَ قَضَاءَ الْوِتْرِ ذَاكِرًا لَمْ يَصِحِّ الْفَجْرَ .

(চার) 'মিরকাতুল মাফাতীহ' গ্রন্থে আছে, ইমাম আযম হযরত আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব হলো, বিতর নামায ফাওত হলে তা কাযা করা ওয়াজিব, এমনকি যদি কোনো লোকের বিতর নামায ফাওত হয়ে যায়, তবে তার উপর নামাযের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। তাই স্মরণ থাকা সত্ত্বেও যদি সে বিতর নামায কাযা আদায় না করে ফজর নামায আদায় করে তবে তার ফজর নামাযের শুদ্ধ হবে না, আগে বিতর কাযা করে পুনরায় ফজর নামায পড়তে হবে।[৭৩]

৭২. আল্লামা আবুল হাসান, তানযীমুল আশআত, ১ম খ., পৃ. ৪২০।

৭৩. মোল্লা আলী আল-কারী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

জুমু'আর নামাযের সময়

জুমু'আর নামাযের সময় যুহরের নামাযের সময়েরই অনুরূপ। সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ার সাথে সাথেই জুমু'আর নামাযের সময় শুরু হয়।

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীস সমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ .

قال أبو عيس حديث انس حديث حسن صحيح .

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) সূর্য হেলে গেলে জুমু'আর নামায আদায় করতেন।[১]

عَنْ سلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيْطَانِ فَيْئٌ . رواه الامام أبو داؤد ورواه الامام مسلم

হযরত সালামা ইবন আক্‌ওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে জুমু'আর নামায আদায় করে নিজ নিজ গৃহ ফিরে যেতাম অথচ তখনো দেয়ালের ছায়া পড়তো না।[২]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيْحُ نَوَاضِحَنَا قُلْتُ اَيَّةَ سَاعَةٍ قَالَ زَوَالَ الشَّمْسِ رواه النسائى وأيضا رواه الطبرانى فى الاوسط واسناده حسن ، كذا فى التلخيص الخبير .

হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে জুমু'আর নামায আদায় করে ঘরে ফিরে যেতাম এবং আমাদের জন্তু জানোয়ারকে একটু

---

১. ইমাম বুখারী, আসসহীহ, কিতাব আল জুমু'আহ, কুতুবখানা রশীদীয়্যা, দিল্লী ১৩৭৭ হি. খ. ১, পৃ. ১২৩; ইমাম আবূ দাঊদ, আস সুনান, কিতাব আল-জুমু'আহ, আল মাতবা আল মজীদী, কানপুর (ইন্ডিয়া), ১৯৫৫, খ. ১, পৃ. ১৫৫; ইমাম তিরমিযী, সুনান, বাব ঃ ওয়াকতুল জুমু'আহ, কুতুবখানা রশিদীয়্যা, দেওবন্দ, খ. ১, পৃ. ১১২।

২. সুনান আবূ দাঊদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃষ্ঠা ১৫৫; ইমাম নাসায়ী, আল-সুনান, কিতাব আল জুমু'আহ, আল কিতাব, দেওবন্দ, তা. কি. খ. ১, পৃ. ১৫৬; ইমাম মুসলিম, সহীহ, কুতুবখানা রাশীদিয়্যাহ দিল্লী, অধ্যায় ঃ ওয়াকতু সালাতিল জুমু'আ, খ. ১, পৃ. ২৮৩।

www.pathagar.com

বিশ্রাম দিতাম। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটি কোন সময়? তিনি বললেন সূর্য যখন হেলে যেত।[৩]

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُكَبِّرُ بِالْجُمْعَةِ وَنَقِيْلُ بَعْدَ الْجُمْعَةِ .

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কোনরূপ দেরী না করে প্রথম ওয়াক্তেই জুমু'আর নামায পড়ে নিতাম এবং নামাযের পর বিশ্রাম করতাম।[৪]

জুমু'আর নামাযের সময় যুহরের নামাযের শেষ সময় পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে।

قَالَ بِشْرِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَلْدَةَ صَلَّى بِنَا اَمِيْرُ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ لاَنَسٍ كَيْفَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّ الظُّهْرَ .

বিশর ইবন সাবিত বলেন, আবূ খালদাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, (বসরার) আমীর (হাকাম ইবন আবী উকাইল আস-সাকাফী) আমাদেরকে নিয়ে (ইমামতি করে) জুমু'আর নামায আদায় করলেন। (তিনি খুতবা দান করতেন বলে জুমু'আর নামায শেষ ওয়াক্তে উপনীত হত।) অতঃপর আনাস (রা) -কে মহানবী (সা) কিভাবে যুহর নামায আদায় করতেন?

كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاَةِ وَاِذَا اشْتَدَّا الْحُرُّ اَبْرَدْ بِالصَّلاَةِ يَعْنِىْ الْجُمُعَةَ

যখন ঠাণ্ডা অধিক হতো তখন মহানবী (সা) কোনরূপ কাল বিলম্ব না করে প্রথম ওয়াক্তেই জুমু'আর নামায সম্পন্ন করতেন, আর যখন সূর্যের তাপ বেড়ে যেত তখন সূর্যের তাপ কমে গেলে জুমু'আর নামায সম্পন্ন করতেন।[৫]

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে জুমু'আর নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পর জুমু'আর নামাযের কাযা করা জায়িয নয়। এ ক্ষেত্রে যুহরের নামায কাযা পড়তে হবে। কারণ, মূলত এটি হল যুহরের ওয়াক্ত। আর যুহরের ওয়াক্তে যুহরের নামাযই ফরয। যেহেতু জুমু'আর নামায আদায় করার কারণে যুহরের নামায যিম্মা হতে রহিত হয়ে যায়, তাই জুমু'আর নামায আদায় করতে না পারলে যুহরের নামাযই যিম্মায় চলে আসে। ফলে কোন কারণবশত জুমু'আর নামায পড়তে না পারলে যুহরের নামায আদায় করা ওয়াজিব।[৬] শুধু তাই নয়; যদি জুমু'আর নামায আদায় করা অবস্থায় নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তবে হানাফী ফকীহদের মতে যেহেতু জুমু'আর নামাযের সময় অবশিষ্ট নেই তাই জুমু'আর নামায বাতিল হয়ে যাবে, যদি মুসল্লী তাশাহহুদ পড়া অবস্থায় থাকে তবুও।

৩. সুনান আল নাসাঈ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৬।

৪. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৩।

৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৪।

৬. আল-কাসানী, আলা উদ্দীন আবূ বকর ইবন মাসঊদ আল-হানাফী, কিতাবু বাদায়ি আল সানায়ি ফী তারতীব আল শারায়ি, দার আল কিতাব আল আরবী, বৈরুত, ১৯৮২, খ. ১, পৃ. ২৫৭।

www.pathagar.com

গ্রামে জুমু'আর নামায জায়িয নয়

হানাফী ফকীহদের মতে জুমু'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার এবং তা আদায় করা সহীহ হওয়ার অন্যতম শর্ত হল সংশ্লিষ্ট স্থানটি 'শহর' (مصر) হওয়া। সুতরাং যারা শহরে (المصر) অথবা শহরতলী তথা শহর সংলগ্ন এলাকায় (توابع المصر) বসবাস করে তাদের উপর জুমু'আর নামায ওয়াজিব। যারা গ্রামে (القرية) অবস্থান করে তাদের উপর জুমু'আর নামায ওয়াজিব নয় এবং গ্রামে জুমু'আর নামায আদায় করা সহীহও নয়।[৭]

এ প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীসগুলো প্রণিধানযোগ্য।

فَقَدْ صَحَّ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لاَ جُمُعَةَ وَلاَ تَشْرِيْقَ اِلاَّ فِىْ مِصْرٍ جَامِعٍ .

(أخرجه أبو عبيد باسناد صحيح اليه موقوفا ورواه عبد الرزاق فى مصنفه .

হযরত আলী (রা) হতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত। স্বয়ং সম্পূর্ণ শহর مصر جامع ব্যতীত জুমু'আর নামায এবং তাশরীক নেই (এর এক অর্থ ঈদের নামায, আবার ৯ই যিলহজ্জ্ব তারিখের পরবর্তী তিন দিনকেও তাশরীফ অথবা ইয়াওমুত তাশরীফ বলা হয়, মু'জাম আল-ওয়াসীত পৃ. ৪৮০) নাই।[৮]

عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لاَ جُمُعَةَ وَلاَ تَشْرِيْقَ وَلاَ فِطْرَ لاَ اَضْحٰى اِلاَّ فِىْ مِصْرٍ جَامِعٍ اَوْ مَدِيْنَةٍ عَظِيْمَةٍ . رواه ابن أبى شعيبة فى مصنفه مرفوعا على علىّ وكذلك رواه عبد الرزاق .

২. হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন স্বয়ং সম্পূর্ণ শহর কিংবা বড় কোন শহর ব্যতীত অন্য কোথাও জুমু'আর নামায, তাশরীফ এবং ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায নেই।[৯]

শহর (مصر), স্বয়ং সম্পূর্ণ শহর (مصر جامع) ও এর শহরতলীর (توابع المصر) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হানাফী ফকীহগণ নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন ঃ

ইমাম আযম আবূ হানীফার (র) প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী শহর (مصر) বলতে সেই স্থানকে বুঝানো হয় যা একটি বড় নগরী, যেখানে অনেক অলি-গলি ও বাজার বিদ্যমান, যেখানে একজন আমীর (প্রশাসক) ও একজন কাযী (বিচারক) থাকেন, যাঁরা মজলুমের উপর সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম এবং সেখানকার সমস্যাগ্রস্ত লোকজন তাদের সমস্যাদির সমাধানকল্পে

---

৭ আল্-কাসানী, আলা উদ্দীন আবূ বকর ইবন মাসঊদ আল্ হানাফী, কিতাবু বাদায়ি আল সানায়ি ফী তারতীব আল শারাঈ, দার আল কিতাব আল আরবী বৈরুত, ১৯৮২, খ. ১, পৃ. ২৬।

৮. ইবন হাযম আল আন্দুলসী, আবূ মুহাম্মদ আলী ইবন আহমদ, আল-মুহাল্লা, দারুল জিল, বৈরুত, তা. বি. খ. ৫, পৃ. ৫২।

৯. আবদুর রহমান আল-জাযিরী, কিতাব আল ফিকহ আলা আল-মাযাহিব আল-আরবা'আহ, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৯৭২, খ. ১, পৃ. ৩৭৯।

www.pathagar.com

এঁদের নিকট আগমন করেন।[১০] ইমাম কারখীর মতে শহর বলতে সেই স্থানকে বুঝানো হয়, যেখানে দণ্ডবিধি কার্যকর হয় এবং আইন কানূন বাস্তবায়িত হয়।[১১] হানাফী ফকীহদের মতে যেখানে নামাযের উপযুক্ত সকল অধিবাসী এলাকার বড় মসজিদে সমবেত হলে সেখানে তাদের স্থান সংকুলান হয় না বলে অন্য মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন হয় তাকে শহর বলে।[১২] ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে স্বয়ং সম্পূর্ণ শহর (المصر الجامع) বলতে সেই স্থানকে বুঝানো হয় যেখানে একজন আমীর (প্রশাসক) ও একজন কাযী (বিচারক) থাকেন, যাঁরা আইন কানূন বাস্তবায়ন করেন এবং দণ্ডবিধি কার্যকর করেন।[১৩] কোন কোন হানাফী ফকীহ মনে করেন স্বয়ং সম্পূর্ণ শহর হল সেই স্থানের নাম, যেখানে সকল পেশার লোক নিজদের পেশা পরিবর্তন ব্যতীত বছরের পর বছর স্ব স্ব পেশা নিয়ে বসবাস করতে পারেন।[১৪] অপর দিকে শহরতলী বা শহর সংলগ্ন এলাকা (توابع المصر) বলতে সেই স্থানকে বুঝানো হয়, যা শহরের সাথে সংযুক্ত ও সন্নিহিত এবং যেই স্থানে অবস্থান করে শহরের আযানের আওয়ায শুনা যায়।[১৫]

হানাফী ফকীহগণ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) হতে রিওয়ায়াত করেন যে, শহর কেবল একস্থানে কেন্দ্রীয়ভাবে জুমু'আর নামায আদায় করতে হবে। অবশ্য যদি শহরের মাঝখানে কোন নহর বা খাল থাকে তবে এর উভয় প্রান্তের মসজিদে জুমু'আর নামায আদায় করা জায়িয। তাঁদের মতে জুমু'আর নামায হল ইসলামের একটি অন্যতম নিদর্শন (شعائر)। তাই -এর বহিঃপ্রকাশের উপযুক্ত স্থান হল শহর।[১৬]

জুমু'আর নামায ফরয হওয়া বিষয়ে আল-কুরআনের যে, আয়াত নাযিল হয় তা হল ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ‏.

"হে ঈমানদারগণ, জুমু'আর দিবসে যখন নামাযের জন্য আহবান জানানো হবে তখন তোমরা আল্লাহ্র যিকরের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর। এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে পার।"[১৭]

সূরা আল-জুমু'আর উক্ত আয়াতে البيع (ক্রয় বিক্রয়) এবং ১১শ আয়াতে দুইবার تجارة (ব্যবসায় বাণিজ্য) শব্দের উল্লেখ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, জুমু'আর নামায আদায়ের জন্য ব্যবসায়িক সমাগমস্থল হওয়া জরুরী, যা কেবল শহর কিংবা শহর সংলগ্ন এলাকায়ই বিদ্যমান। এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবা যুগে মুসলমানগণ অনেক দেশ ও অঞ্চল জয়

১০. আল কাসানী, বাদায়ি আল সানায়ি খ. ১, পৃ. ২৬০; মুহাম্মদ আনওয়ার কাশ্মিরী, ফয়যুল বারী আলা সহীহ আল বুখারী, রব্বানী বুক ডিপু, দিল্লী, তা. বি. খ. ২, পৃ. ৩৩০।

১১. আল কাসানী, বাদায়ি' আল সানায়ি, খ. ১, পৃ. ২৫৯।

১২. বাদায়ি আল সানায়ি, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৯-২৬০; ফয়যুল বারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২৯।

১৩. শায়খ বুরহান ইদ্দীন মুরগিনানী, আল-হিদায়া, কুতুবখানা রশিদীয়্যা, দিল্লী, তা. বি., খ. ১, প্রথম ভাগ, প্র. ১৪৮।

১৪. বাদায়ি আল সানায়ি, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬০।

১৫. বাদায়ি আল সানায়ি, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬০।

১৬. বাদায়ি আল-সানায়ি', প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৯।

১৭. সূরা আল-জুমু'আহ, ৬৩ ঃ ৯।

www.pathagar.com

করেছেন, কিন্তু কোথাও গ্রামে জুমু'আর নামায আদায় করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।[১৮] এ ছাড়াও হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُوْنَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنَ الْعَوَالِيْ .

নবী (সা)-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা নিজ নিজ বাড়ী ঘর হতে এবং 'আওয়ালী' অঞ্চল হতে একের পর এক জুমু'আর নামায আদায় করার জন্য (মসজিদে নববীতে) আগমণ করতো।[১৯] উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবা কিরাম মদীনার পূর্ব দিকে অবস্থিত দু' মাইল দূর হতে শুরু করে আট মাইল দূর পর্যন্ত প্রসারিত আওয়ালী অঞ্চল হতে জুমু'আর নামায আদায় করার জন্য মসজিদে নববীতে আগমন করতেন, অথচ সেখানে জুমু'আর নামায কায়েম করতেন না। যদি গ্রামে জুমু'আর নামায আদায় করা জায়িয হত তবে অবশ্যই তাঁরা সেখানে জুমু'আর নামায আদায় করতেন এবং এজন্য এতদূর পথ অতিক্রম করে মসজিদে নব্বীতে আসতেন না। সুতরাং হানাফী ফকীহদের মতে গ্রামে জুমু'আর নামায জায়িয নয়। নিম্নে দু'টি হাদীসে দেখা যায় যে, গ্রামে (قرية) জুমু'আর নামায আদায় করা হয়েছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّ اَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي الْاِسْلَامِ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ لَجُمُعَةٌ جُمِّعَتْ بِجُوَاثِىْ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ قَالَ عُثْمَانُ قَرْيَةٌ مِّنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ .

হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদে জুমু'আর নামায অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ইসলামের সর্বপ্রথম জুমু'আর নামায অনুষ্ঠিত হয় বাহরাইনের 'জুওয়ানা' নামক স্থানে। উসমান বলেন ঃ এটি হল আবদুল কায়স গোত্রের অবস্থানের স্থান।[২০]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُوْنُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حَكِيْمٍ اِلَى ابْنِ شِهَابٍ وَاَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرٰى هَلْ تَرٰى بِاَنْ اُجَمِّعَ وَرُزَيْقٌ عَامِلٌ اَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيْهَا جَمَاعَةٌ مِّنَ السُّوْدَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ عَلٰى اَيْلَةَ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَنَا اَسْمَعُ يَأْمُرُهُ اَنْ يُجَمِّعَ .

---

১৮. বাদায়ি' আল্-সানায়ি', প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৯।

১৯. ইমাম বুখারী, আস সহীহ, কিতাব আল্-জুমু'আহ, কুতুবখানা রশীদীয়্যা, দিল্লী, ১৩৭৭ হি., খ. ১, পৃ. ১২৩; ইমাম আবূ দাউদ, আল্-সুনান, কিতাব আল্-জুমু'আহ, আল্-মাতবা আল্-মজিদী, কানপুর (ইণ্ডিয়া)। ১৯৫৫, খ. ১, পৃ. ১৫১।

২০. ইমাম বুখারী, আস সহীহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২২; ইমাম আবূ দাউদ আল সুনান, প্রাগুক্ত খ. ১, পৃ. ১৫৩।

www.pathagar.com

ইবন উমর (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের সকলেই দায়িত্বশীল। রাইস আরো বৃদ্ধি করে বলেন ঃ ইউনুস বলেছেন, রুযাইক ইবন হাকীম হযরত ইবন শিহাবের নিকট লেখেন—এ সময় আমি ইবন শিহাবের সাথে ওয়াদী আল-কুরায় ছিলাম, আপনার মতে আমি কি এখানে জুমু'আর নামায পড়ার ব্যবস্থা করব? রুযাইক তখন সেখানে জমি চাষাবাদ করত এবং সুদানের একদল লোক ছাড়াও সেখানে অন্যান্য লোকজন থাকত। রুযাইক সেই সময় আইলা নামক স্থানের আমীর ছিলেন। ইবন শিহাব তাঁকে জুমু'আর নামায কায়েম করার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ আমি নিজে শুনেছি।[২১]

হানাফী ফকীহদের جُوَاثٌ এবং وَدِى الْقُرٰى সম্পর্কে قرية শব্দ ব্যবহার করা হলেও মূলত এ দু'টি ছিল শহর। ইসলামের প্রাথমিক যুগে القرية শব্দটি البلدة العظيمة কথা বড় শহর ও নগর অর্থেই প্রয়োগ করা হত। উদাহরণ স্বরূপ আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ উল্লেখ করা যেতে পারে।

وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا .

"আপনি সেই বসতির লোকদের নিকট জিজ্ঞেস করুন, যেখানে আমরা ছিলাম।" (সূরা ইউসুফ, ১২ : ৮২)

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِىَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِىْ اَخْرَجَتْكَ - اَهْلَكْنٰهُمْ

"আর এমন অনেক জনপদ বিলীন হয়ে গিয়েছে, যেগুলো তোমার সেই জনপদ হতে অনেক বেশি শক্তিসম্পন্ন ছিল যা তোমাকে বহিষ্কৃত করেছে।" (সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ১৩)

وَقَالُوْا لَوْلاَ نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ .

"তারা বলে এই কুরআন উভয় শহরের বড় লোকদের মধ্য হতে কারো উপর নাযিল হয় নি কেন?" (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩১)

উক্ত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে القرية বলতে মিসরকে , দ্বিতীয় আয়াতে من قريتك বলতে মক্কাকে এবং তৃতীয় আয়াতে قريتين বলতে মক্কা ও তায়িফকে বুঝানো হয়েছে, যার সবগুলোই হল শহর।[২২]

কি পরিমাণ দূর হতে জুমু'আর শরীক হওয়া জরুরী

যেই মসজিদে জুমু'আর নামায অনুষ্ঠিত হয় সেই মসজিদের আশেপাশে কিংবা এর সন্নিহিত এলাকায় অবস্থানকারীদের উপর জুমু'আর নামায আদায় করা ওয়াজিব। কেবল শহরে কিংবা শহর সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারীদের উপরই তা ওয়াজিব, দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারীদের উপর নয়।[২৩] সুতরাং কেউ যদি জুমু'আর মসজিদ সংলগ্ন লোকায় বসবাস করে এবং সে মুকীম হয় তা হলে তাকে উক্ত মসজিদে এসে জুমু'আর নামায আদায় করতে হবে। দলীল ঃ

عَنْ عَطَاءَ اِذَا كُنْتَ فِىْ قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنُوْدِىَ بِالصَّلاَةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَحَقٌّ عَلَيْكَ اَنْ تَشْهَدَهَا .

২১. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২২।

২২. বাদায়ি' আল্-সানায়ি', প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৯।

২৩. মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী, ফয়যুল বারী আলা সহীহ আল-বুখারী, রব্বানী বুক ডিপো,দিল্লী, তা. বি. খ. ২, পৃ. ৩৩৩।

www.pathagar.com

হযরত আতা (র) হতে বর্ণিত, যদি তুমি এমন কোন অঞ্চলে অবস্থান কর যেখানে জুমু'আর নামায অনুষ্ঠিত হয়, অতঃপর জুমু'আর দিন সেখানে জুমু'আর নামাযের আযান দেওয়া হয়, তা হলে তোমার কর্তব্য হবে তাতে উপস্থিত হওয়া ।[২৪]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُوْنَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنَ الْعَوَالِيْ .

নবী (সা)-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ লোকজন নিজ নিজ বাড়ি ঘর হতে এবং আওয়ালী অঞ্চল হতে একের পর এক জুমু'আর নামায আদায় করার জন্য মসজিদে নব্বীতে আগমন করতেন।[২৫]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْجُمُعَةُ عَلٰى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ .

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি মহানবী (সা) হতে বর্ণনা করেন। মহানবী (সা) বলেন, যারা আযানের আওয়াজ শুনতে পায় তাদের সকলের উপর জুমু'আর নামায ওয়াজিব।[২৬]

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ .

"আল্লাহ্ তা'আলা বলেন হে ঈমানদারগণ, জুমু'আর দিবসে নামাযের জন্য আহবান জানানো হবে তখন তোমরা আল্লাহ্র যিকরের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হও।"[২৭]

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যাদের বসত বাড়ি হতে জুমু'আর মসজিদের দূরত্ব এই পরিমাণ হয় যে, জুমু'আর নামায আদায় করার পর তারা সন্ধ্যার পূর্বেই নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারে, তাদের জন্য জুমু'আর নামাযে শরীক হওয়া ওয়াজিব।[২৮] তবে শর্ত হল এই সব মুসল্লী তাদের রাজস্ব, খাজনা ইত্যাদি উক্ত মসজিদ যেই অঞ্চলে অবস্থিত সেই অঞ্চলের প্রশাসনের নিকট আদায় করে থাকেন।[২৯]

হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, সাহাবীগণ 'আওয়ালী' অঞ্চল হতে মসজিদে নব্বীতে এসে জুমু'আর নামাযে অংশগ্রহণ করতেন। 'আওয়ালী' হল মদীনার

২৪. ইমাম বুখারী, আল সহীহ, কিতাব আল জুমু'আহ, কতুবখানা শরীদীয়্যা, দিল্লী, ১৩৭৭ হি. খ. ১, পৃ. ১২৩।

২৫. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১২৩; ইমাম আবূ দাউদ আস-সুনান কিতাব আল-জুমু'আহ, আল মাতবা আল মজীদী, কানপুর (ইণ্ডিয়া), ১৯৫৫, খ. ১, পৃ. ১৫১।

২৬. সুনান আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫১।

২৭ সূরা জুমু'আহ, ৬৩ ঃ ৯।

২৮. ইমাম ইবন হাজার আল আসকালানী, ফাতহুল বারী বি শরাই সহীহ আল-বুখারী, দারুল মারিফাহ, বৈরুত, তা. বি., খ. ২, পৃ. ৩৮৫।

২৯. সুনান আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, হাশিয়া ফখরুল হাসান কৃত আল তালীক আল-মাহমূদ, খ. ১, পৃ. ১৫১।

www.pathagar.com

পূর্বে দিকে দু'মাইল দূর হতে আট মাইল দূরবর্তী পর্যন্ত প্রসারিত একটি পল্লীর নাম। উচভূমি হওয়ায় তাকে আওয়ালী উঁচু অঞ্চল বলা হতো। উক্ত হাদীসের উপর ভিত্তি করে হানাফী ফকীহগণ মত প্রকাশ করেন যে, জুমু'আর মসজিদ হতে ১ ফারসাখ তথা ৩ মাইল (৫.০৪০ কিঃ মিঃ) দূরবর্তীতে অবস্থান মুসল্লীগণ জুমু'আর নামাযে শরীক হবেন।[৩০]

জুমু'আর উভয় খুতবার বিধান

জুমু'আর নামাযে দু'টি খুতবা প্রদানের বিধান রয়েছে। প্রথম খুতবা সম্পন্ন করার পর ইমাম মিম্বারে বসবেন। অতঃপর দ্বিতীয় খুতবা দিবেন। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

بَابُ كَمْ يَخْطُبُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَالَسْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَا رَأَيْتُ يَخْطُبُ اِلاَّ قَائِمًا وَّيَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ يَخْطُبُ الْخُطْبَةَ الْاٰخِرَةَ .

অনুচ্ছেদ ঃ কয়টি খুতবা প্রদান করা হবে ঃ হযরত জাবির ইবন সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর বিভিন্ন মজলিসে উপস্থিত থাকতাম। আমি তাঁকে দেখেছি যে, তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন, অতঃপর বসতেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খুতবা দিতেন।[৩১]

بَابُ الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا .

قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিবসে দুই খুতবার মাঝখানে বসা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) দুই খুতবা দান করতেন এবং উভয় খুতবার মাঝখানে বসতেন।[৩২]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوْسٍ .

হযরত আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়িয়ে দু'টি খুতবা দিতেন। আর উভয় খুতবার মাঝখানে বসার মাধ্যমে দুই খুতবার মধ্যে পার্থক্য করতেন।[৩৩]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُوْمُ كَمَا تَفْعَلُوْنَ الْاٰنَ .

---

৩০. আবদুর রহমান আল জাযিরী, আল ফিক্‌হ আলা আল-মাযাহির আল-আরবা'আহ, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৯৭২, খ. ১, পৃ. ৩৮২।

৩১. ইমাম নাসাঈ, আল সুনান কিতাব আল জুমু'আহ, দার আল কিতাব, দেওবন্দ, তা. বি., খ. ১, পৃ. ১৫৯।

৩২. ইমাম বুখারী, আল সহীহ, কিতাব আল জুমু'আহ, কুতুবখানা রশিদীয়্যা, দিল্লী, ১৩৭৭ হি. খ. ১, পৃ. ১২৩।

৩৩. সুনান আল নাসায়ী, প্রাগুক্ত, খ. ১, ১৫৯।

www.pathagar.com

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) হতে বর্ণিত, নবী (সা) দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন, অতঃপর বসতেন, অতঃপর দাঁড়াতেন, যেমনটি তোমরা বর্তমানে করে থাক।[৩৪]

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জুমু'আর প্রথম খুতবা ওয়াজিব। আর দ্বিতীয় খুতবা হল প্রথম খুতবার تتمه বা পরিপূরক। কেননা খুতবার উদ্দেশ্য হল উপস্থিত মুসল্লীদেরকে উপদেশ দান ও ধর্মীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে অবহিতকরণ, যা প্রথম খুতবা দ্বারাই অর্জিত হয়।[৩৫] হানাফী ফকীহগণ খুতবাকে ওয়াজিব ও জুমু'আর শর্ত হওয়ার সপক্ষে নিম্নোক্ত দলীল উপস্থাপন করেন।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ .

মহান আল্লাহ বলেন, জুমু'আর দিবসে যখন নামাযের জন্য আহবান জানানো হয় তখন তোমরা আল্লাহ্র যিকরের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হও।[৩৬] জুমু'আর নামাযের পূর্বে প্রদত্ত খুতবাও ذكر الله তথা আল্লাহ্র যিকরের অন্তর্ভুক্ত। অথবা ذكر الله বলে খুতবাকেই বুঝানো হয়েছে। যার প্রতি দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং জুমু'আর খুতবা ওয়াজিব ও জুমু'আ সহীহ হওয়ার পূর্বশর্ত।[৩৭]

عَنْ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُمَا قَالاَ : اِنَّمَا قُصِرَتِ الصَّلٰوةَ لاَجَلِ الْخُطْبَةِ .

হযরত উমর (রা) ও হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন খুতবার কারণেই জুমু'আর নামায সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।[৩৮]

হানাফী ফকীহদের মতে যুহরের চার রাক'আত ফরয নামাযের মধ্যে জুমু'আর ক্ষেত্রে দু'রাক'আত নামায রহিত করা হয়েছে জুমু'আর খুতবার কারণে। এ দু'রাক'আত নামায ছিল ফরয। সুতরাং ফরযের পরিবর্তে যা প্রবর্তন করা হবে তা ফরযের মর্যাদা সম্পন্ন হওয়াই যুক্তিযুক্ত। যুহরের নামাযের পরিবর্তে জুমু'আর নামাযের প্রবর্তন শরী'আতের স্পষ্ট বিধান দ্বারা প্রমাণিত। আর এ বিধান খুতবা সহ প্রবর্তিত হয়েছে। খুতবা যেহেতু নামাযের অভ্যন্তরে পড়ার বিধান হিসাবে প্রবর্তিত হয় নি, তাই এটি ফরয নয়। কিন্তু যেহেতু এটি জুমু'আর নামাযের পূর্বশর্ত তাই প্রথম খুতবা ওয়াজিব।[৩৯]

৩৪. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৫।

৩৫. আবুল হাসান, তানযীম, আল-আশতাত লি হাল্লি আহাদীসা আল মিশকাত, মাকতাবা আল হাসান ১৯৮৬, খ. ১, পৃ. ৪৬১।

৩৬. সূরা আল জুমু'আহ ৬৩ : ৯।

৩৭ আল কাসানী, আলা উদ্দীন আবূ বকর ইবন মাসউদ আল হানাফী, কিতাবু বাদায়ি আল ছানায়ি ফী তারতীব আল শারায়ি, দার আল কিতাব আল আরবী বৈরুত, ১৯৮২, খ. ১, পৃ. ২৬২।

৩৮. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬২।

৩৯. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬২।

www.pathagar.com

খুতবা দান কালে মসজিদে প্রবেশকারী তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বে না

জুমু'আর দিবসে জুমু'আর নামাযের খুতবা দানের অব্যবহিত পূর্বে প্রদত্ত আযানের পর হতে নামায শেষ করা পর্যন্ত মসজিদের অবস্থানকারী মুসল্লীগণ কোন প্রকার কথাবার্তা বলবে না, উচ্চবাচ্য করবেনা কোন নামায পড়বে না, এসময় অন্য কোন মুসল্লী উচ্চস্বরে আওয়াজ করলে তাকে চুপ করতে বলাও ঠিক নয়। এ সময় খতীবের খুতবা দান ও তা শ্রবণ ব্যতীত অন্য কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

بَابُ الْاِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ وَاِذَا قَالَ لِصَاحِبِهٖ اَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا قَالَ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يُنْصِتُ اِذَا تَكَلَّمَ الاِمَامُ .

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَنْصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ . وَفِى الباب عن ابن أبى أوفى وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه أهل العلم .

জুমু'আর দিন ইমামের খুতবা দানের সময় অন্যকে চুপ করানো বিষয়ক অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ তার সাথীকে (অন্য মুসল্লীকে) বলে, চুপ থাক, তা হলে সে একটি অর্থহীন কাজ করল। সালমান ফারসী (রা) মহানবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন—যখন ইমাম কথা বলবে তখন চুপ থাকবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জুমু'আর দিনে যদি তোমার সাথীকে (অন্য মুসল্লীকে) বল "চুপ থাক".-অথচ ইমাম তখন খুতবা দিচ্ছেন তা হলে তুমি একটি অর্থহীন কাজ করলে।[৪০]

رَوَى الطَّبْرَانِىُّ مِنْ حَدِيْثِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَفَعَهُ : اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ وَالْاِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلاَ صَلاَةَ وَلاَ كَلاَمَ حَتّٰى يَفْرُغَ الْاِمَامَ .

ইমাম তাবারানী (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) হতে মারফূ হাদীস রিওয়ায়াত করেন ঃ ইমাম মিম্বারে থাকা অবস্থায় তোমাদের কেউ যদি মসজিদে প্রবেশ করে তবে ইমাম খুতবা দান সম্পন্ন না করা পর্যন্ত সে কোন নামায পড়বে না, কোন কথা বলবে না।[৪১]

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَفَعَهُ لاَ تُصَلُّوْا وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ .

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে মার'ফূ সূত্রে বর্ণিত ইমাম খুতবা দান কালে তোমরা নামায পড়বে না।[৪২] হানাফী ফকীহদের মতে ইমাম খুতবা দানের জন্য মিম্বারে উঠার

---

৪০. ইমাম বুখারী, আল সহীহ, কিতাব আল জুমু'আহ, কুতুবখানা শরীদীয়্যা, দিল্লী, ১৩৭৭ হি. খ. ১. পৃ. ১২৭-১২৮।

৪১. ইমাম ইবন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী বিশারহি সহীহ আল-বুখারী, দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, তা. বি., খ. ২. পৃ. ৪০৯।

৪২. প্রাগুক্ত, খ. ২. পৃ. ৪১১।

www.pathagar.com

পর হতে জুমু'আর নামায সম্পন্ন করা পর্যন্ত মুসল্লীদের কোন কথা বলা মাকরূহ তাহরিমী। চাই তা যিকর হোক, কিংবা দু'আ হোক, কিংবা দরূদ হোক অথবা পার্থিব কোন কথা হোক।[৪৩] সাহিবাইন তথা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে ইমাম খুতবা দানের জন্য মুসল্লীদের সামনে হাজির হওয়ার পর হতে খুতবা সম্পন্ন করা পর্যন্ত কোন কথা বলা কিংবা নামায পড়া মাকরূহ।[৪৪] ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ইমাম খুতবা দানের জন্য মুসল্লীদের সামনে হাজির হওয়ার পর হতে কোন কথা বলা কিংবা নামায পড়া নিষেধ।[৪৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا অর্থাৎ যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা তা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং চুপ থাকবে। (সূরা আল আরাফ, ৭ ঃ ২০৪) খুতবা যেহেতু আল-কুরআনের অংশ থকে, আর তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায তা শুনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। সুতরাং ওয়াজিবের মর্যাদা সম্পন্ন উক্ত আয়াতের নির্দেশ অনুসরণ না করে তাহিয়্যাতুল মসজিদের ন্যায় সুন্নাত নামায আদায় করা জায়িয নয়।[৪৬] তা ছাড়া মহানবী (সা)-এর বাণী ঃ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَنْصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম খুতবা দানের সময় কেউ কথা বললে তাকে চুপ করিয়ে দেওয়ার মত সৎ উপদেশ দানও নিষিদ্ধ। অথচ চুপ করিয়ে দেওয়ার বিষয়টি সামান্যতম সময়ের ব্যাপার মাত্র সুতরাং এর চাইতেও অধিক সময় ব্যয় করে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করা সন্দেহতীতভাবে নিষিদ্ধ হবে।[৪৭]

ইমাম আল-কাসানী আল-হানাফী (র)-এর মতে খুতবা দানের সময় যেইসব মুসল্লী ইমামের কাছাকাছি অবস্থান করবেন তাদের জন্য খুতবা শুনা ওয়াজিব, আর যারা একটু দূরে অবস্থান করার কারণে খুতবা শুনতে না পান তাদের জন্য চুপচাপ থাকা ওয়াজিব।[৪৮] তবে খুতবা দান কালে মহানবী (সা)-এর নাম উচ্চারিত হলে মনে মনে দরূদ শরীফ পড়বে। কারণ এটি খুতবা শ্রবণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়।[৪৯] এ সময় কোন মুসল্লীর পক্ষ হতে কোন অপছন্দনীয় আচরণ পরিলক্ষিত হলে হাতের ইশারার সংশোধন করতে হবে।[৫০]

খুতবা দান কালে মসজিদে প্রবেশকারীর জন্য তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা নিষিদ্ধ হওয়া বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত উল্লেখযোগ্য ঃ

وَفِىْ رِوَايَةٍ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِىِّ اَنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ اَقْبَلَ اِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُوْذِىْ اَحَدًا فَاِنْ لَّمْ يَجِدِ الاِمَامَ خَرَجَ صَلّٰى مَا بَدَالَهُ

৪৩. আবদুর রহমান আল জাযিরী, কিতাব আল-ফিকহ আলা আল-মাযাহিব আল-আরবা'আহ, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৯৭২, খ. ১, পৃ. ৩৯৭।

৪৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯৭।

৪৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯৮।

৪৬. আল-কাসানী, আলা উদ্দীন আবূ বকর ইবন মাসউদ আল হানাফী, কিতাবু বাদায়ি আল সানায়ি ফী তারতীব আল শারায়ি, দার আল কিতাব আল আরবী, বৈরুত, ১৯৮২, খ. ১, পৃ. ২৬৪।

৪৭. ফাতহুল বারী, খ. ২, পৃ. ৪০৯।

৪৮. আল-কাসানী, কিতাবু বাদায়ি আল সানায়ি খ. ১, পৃ. ২৬৪।

৪৯. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬৪।

৫০. কিতাব আল-ফিকহ আলা আল-মাযাহিব আর আরবা'আহ, খ. ১, পৃ. ৩৯৮।

www.pathagar.com

وَاِنْ وَجَدَ الْاِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ وَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ حَتّٰى يَقْضِىَ الْاِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلَامَهُ .

হযরত নাবীশা আল-হুযালী হতে বর্ণিত, কোন মুসলিম যখন জুমু'আর দিবসে গোসল করে, অতঃপর মসজিদে আগমন করে, কোন মুসল্লীকে কষ্ট দেয় না, যদি সে দেখতে পায় যে, ইমাম তখনো খুতবা দানের জন্য বের হয়নি, সে তার ইচ্ছে মত নামায পড়বে। আর যদি দেখতে পায় যে, ইমাম খুতবা দানের জন্য বের হয়েছেন তবে সে বসে পড়বে এবং ইমাম জুমু'আর নামায ও তাঁর বক্তব্য (খুতবা) সম্পন্ন না করা পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং চুপ থাকবে।[৫১]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اَلصَّلَاةُ وَالْاِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ مَعْصِيَةٌ

হযরত উকবা ইবন আমির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ইমাম মিম্বারের উপর থাকা অবস্থায় নামায পড়া গুনাহের কাজ।[৫২]

عَنْ مُجَاهِدٍ رح اَنَّهُ كَرِهَ اَنْ يُّصَلِّىَ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ .

হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি ইমামের খুতবা দানের সময় মুসল্লীদের নামায পড়া মাকরূহ মনে করতেন।[৫৩]

عَنْ عَطَاءٍ رح قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَكْرَهَانِ الْكَلَامَ اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

হযরত আতা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন হযরত ইবন উমর ও ইবন আব্বাস (রা) ইমাম জুমু'আর দিনে মুসল্লীদের সামনে হাজির হওয়ার পর হতে মুসল্লীদের কোন কথা বলা মাকরূহ মনে করতেন।[৫৪]

ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাকের মতে খুতবা দান কালে মসজিদে প্রবেশকারী সংক্ষেপে দু'রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বে। দলীল ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطْفَانِىُّ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ : اَصَلَّيْتَ شَيْئًا ؟ قَالَ لَا قَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ مِنْهُمَا .

---

৫১. আবুল হাসান, তানযীম আল-আশতাত লি হল্লি হাদীস আল-মিশকাত, মাকতাবা আল হাসান ১৯৮৬, খ. ১, পৃ. ৪৬৩।

৫২. আবূ জাফর আল তাহাভী আল-হানাফী, শারহু মা'আনী আল-আসার, আল মাকতাবা আল আশরাফিয়্যা, দেওবন্দ, তা. বি., খ. ১, পৃ. ২১৭।

৫৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৭।

৫৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৭।

www.pathagar.com

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন—হযরত সুলাইক গাতফানী (রা) আগমন করলেন। এমতাবস্থায় মহানবী (সা) খুতবা দিচ্ছিলেন। মহানবী (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি কোন নামায পড়েছ? তিনি বললেন না। মহানবী (সা) বললেন, তুমি সংক্ষেপে দু'রাক'আত নামায পড়ে নাও।[৫৫]

এ ছাড়াও ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম নাসাঈ (র) হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তবে তাঁরা মহানবী (সা) নিকট আগমনকারী সাহাবী হযরত সুলাইক গাতফানী (রা)-এর নাম উল্লেখ না করে جَـــاءَ رَجُلٌ (জনৈক ব্যক্তি আগমন করেছেন) বলে রিওয়ায়াত করেছেন।[৫৬]

হানাফী ফকীহগণ উক্ত হাদীসের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেন ঃ

মহানবী (সা) হযরত সুলাইক গাতফানী (র)-কে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়তে বলে তিনি খুতবা দান বন্ধ রাখেন।

অথবা মহানবী (সা) খুতবা শুরু করার প্রক্কালে উক্ত সাহাবীর আগমন ঘটে। এমতাবস্থায় হাদীস উদ্ধৃত وَرَسُوْلُ اللّٰهِ يَخْطُبُ এর অর্থ হবে وَكَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَنْ يَّخْطُبَ অর্থাৎ মহানবী (সা) খুতবাদানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

অথবা দুই খুতবার মধ্য বিরতির সময় তাঁর আগমন ঘটে।

অথবা ইমামের জুমু'আর খুতবা দান কালে কথা বলা ও নামায পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

অথবা মহানবী (সা) তাঁকে যে দু' রাক'আত নামায পড়তে বলেছিলেন তা তাহিয়্যাতুল মসজিদ ছিল না, তা ছিল ফজরের কাযা নামায।

অথবা মহানবী (সা) যে খুতবা প্রদান করছিলেন তা জুমু'আর খুতবা ছিল না। সম্ভবত এটি ছিল অন্য কোন উপলক্ষে প্রদত্ত খুতবা।[৫৭]

অথবা হাদীসটি وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا শীর্ষক আল-কুরআনের আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে যায়।[৫৮]

হযরত সুলাইক আল-গাতফানী (রা) -কে যে নামায পড়ার নির্দেশ দানের বিধান পরবর্তীতে মানসূখ হয়ে যায় নিম্নোক্ত হাদীসটি তার প্রমাণ বহন করে।

৫৫. আবূ দাঊদ, সুনান, কিতাব আল-সালাত, ইমাম খুতবা দান অবস্থায় কোন লোক মসজিদে প্রবেশ করা অধ্যায়, আল মাতবা আল মাজিদী, ইণ্ডিয়া, ১৯৫৫, খ. ১, পৃ. ১৫৯।

৫৬. সহীহ আল বুখারী, খ. ১, পৃ. ১২৭; ইমাম নাসাঈ, সুনান কিতাব আল-জুমু'আহ, দাব আল কিতাব দেওবন্দ, তা.বি. খ. ১, পৃ. ১৫৭।

৫৭. ফাতহুল বারী, খ. ২, পৃ. ৪০৯-৪১০।

৫৮. কিতাবু বাদায়ি আল সানায়ি, খ. ১. পৃ. ২৬৪।

www.pathagar.com

عَنْ اَبِیْ الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا اِلٰی جَنْبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطّٰی رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْلِسْ فَقَدْ اٰذَيْتَ اٰنَيْتَ .

হযরত আবু যাহরিয়্যা (র) হতে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবন বুসর (রা) হতে রিওয়ায়ত করে বলেন, আমি জুমু'আর দিবসে তাঁর পাশে বসা ছিলাম। তখন তিনি বলেন জনৈক ব্যক্তি জুমু'আর দিবসে লোকজনের ঘাড়ের উপর দিয়ে অগ্রসর হল। মহানবী (সা) তাঁকে বললেন, তুমি বসে পড়। কারণ তুমি লোকজনকে কষ্ট দিয়েছ এবং মসজিদে দেরীতে এসেছ।[৫৯]

৫৯. ইমাম আবূ জাফর আল তাহাভী, শারহু মা'আনী আল-আসার, খ. ১, পৃ. ২১৫।

www.pathagar.com

সফর অবস্থায় নামায কসর করা ওয়াজিব

ইসলামী শরী'আতে সফর অবস্থায় নামায কসর[১] করার বিধান রয়েছে। এ ব্যাপারে ফকীহ্গণের মাঝে দ্বিমত নেই। বরং এ ব্যাপারে ফকীহ্দের ইজ্মা রয়েছে। সফরের অবস্থায় নামাযে কসর করা ওয়াজিব কি, না, এ সম্পর্কে হাদীসের বক্তব্যে বিভিন্নতা থাকলেও অধিকাংশ হাদীসের বক্তব্য (المتن) প্রমাণ করে যে, সফর অবস্থায় নামায কসর করা ওয়াজিব। এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ يَعْلَى ابْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَقَدْ اَمِنَ النَّاسِ فَقَالَ عُمَرُ : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ ؟ فَقَالَ : «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ» أخرجه : مسلم وأبو داؤد ، والنسائى

ইয়ালা ইবন উমায়্যা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বললাম : আল্লাহ্র বাণী : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : (যদি তোমাদের আশংকা হয় যে কাফিরগণ তোমাদের জন্য ফিৎনা সৃষ্টি করবে তবে, সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। (৯৪ ঃ ১০১)। আর এখন তো মানুষ (কাফিরদের ফিৎনা থেকে) নিরাপদ আছে, তখন উমর (রা) বললেন "আমিও সে ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করেছি, তুমি যে ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করেছো। তাই আমি সে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন। "এ হল একটি দান বিশেষ, যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে প্রদান করেছেন। অতএব তাঁর দানকে কবুল করে নাও।"[২]

উল্লেখিত হাদীসে কসর নামাযকে গ্রহণ করার ব্যাপারে আদেশসূচক বাক্য (فاقبلوا) ব্যবহার করা হয়েছে। আর যেহেতু আদেশসূচক বাক্য ওয়াজিব বুঝায়। অতএব সফর অবস্থায় কসর করা ওয়াজিব। এটিই ইমাম আযম আবূ হানাফী (র) ও হানাফী ফকীহ্গণের অভিমত।[৩] এ ব্যাপারে আরো বহু হাদীস রয়েছে, তা থেকেও এ ব্যাপারে সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন ঃ

১, কসর অর্থ সংক্ষেপ করা, ছোট করা, খাটো করা, শরী'আতের পরিভাষায় সফর অবস্থায় ফরয নামায চার রাক'আতের পরিবর্তে দুই রাক'আত আদায় করাকে কসর বলা হয়।

২. সুনানু নাসাঈ, অধ্যায় : সফরে সালাত কাসর করা, বঙ্গানুবাদ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১০০১, ২খ, পৃ. ২৯৯।

৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম অবস্থায় সালাত দু'রাক'আত করে ফরয করা হয়। তারপর সফরের সালাত সে ভাবেই স্থায়ী থাকে এবং মুকীম অবস্থায় সালাত (চার রাক'আত) পূর্ণ করা হয়েছে। যুহরী (র) বলেন, আমি উরওয়া (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, (মিনায়) আয়েশা (রা) কেন সালাত পূর্ণ আদায় করলেন ? তিনি বললেন, উসমান (রা) যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন, আয়েশা (রা) ও তা গ্রহণ করেছেন।

www.pathagar.com

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الصَّلاَةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَانِ، فَأَقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ : فَمَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ ؟ قَالَ : « تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ » . رواه البخارى وأبو داؤد .

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম অবস্থায় সালাত দু' রাক'আত করে ফরয করা হয়, তারপর সফরের সালাত সেভাবেই স্থায়ী থাকে এবং মুকীম অবস্থায় সালাত (চার রাক'আত) পূর্ণ করা হয়েছে। যুহরী (র) বলেন, আমি উরওয়া (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। (মিনায়) আয়েশা (রা) কেন সালাত পূর্ণ আদায় করলেন? তিনি বললেন, উসমান (রা) যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন, আয়েশা (রা)-ও তা গ্রহণ করেছেন।

عَنْ ابْنِ عَمَرَ قَالَ : صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ لاَ تَزِيْدُ فِى السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعُثْمَانَ رضى الله عنه كذالك رواه البخارى صحيح البخارى : أبواب تقصير الصلاة باب من لم يتطوع فى السفر دبر الصلاة وقبلها .

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্যে থেকেছি, তিনি সফরে দু'রাক'আতের অধিক আদায় করতেন না। আবূ বকর, উমর, ও উসমান (রা)-এর রীতিও তাই ছিল।[৪]

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « صَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، مَنْ تَرَكَ السُّنَّةَ كَفَرَ » رواه ابن حزم بسند صحيح ، « عمدة القارى » (٣-٥٤٨)

হযরত ইব্‌ন ইমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, সফরের নামায দুই রাক'আত। যে এই সুন্নাত পরিত্যাগ করল সে কুফ্‌রী করল।[৫]

---

৪. সহীহ বুখারী, সালাতে কসর করার অধ্যায়সমূহ, অনুচ্ছেদ ; সফরকালে ফরয সালাাতের আগে ও পরে নফল সালাত আদায় না করা, বঙ্গানুবাদ, ই, ফা, বা। ২খ, পৃ. ২৮৬। সহীহ মুসলিম শরীফে হাদীসটি নিম্নরূপ এসেছে।

صَحِبْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللّٰهُ ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللّٰهُ ، وَصَحِبْتُ عمرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللّٰهُ ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللّٰهُ ، وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ : «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»

আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে সফর করেছি। কিন্তু তিনি ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি দু'রাক'আতের অতিরিক্ত আদায় করেন নি। আমি আবূ বকর (রা) সঙ্গেও থেকেছি, তিনিও তার ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত দু'রাক'আতের অতিরিক্ত পড়েননি। আমি উসমান (রা)-এর সঙ্গেও ছিলাম। তিনিও ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত দু'রাক'আতের অতিরিক্তি আদায় করেননি। আর আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আর্দশ।" (সহীহ মুসলিম, সালাতুল অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মুসাফীরের সালাত এবং কসর, বাঙ্গানুবাদ. ইফা. বা. ১৯৯১. ৩খ, পৃ. ৫)

৫. উমদাতুল কারী, (বৈরুত : দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, তা. বি.) ৭খ, পৃ. ১৩৩।

www.pathagar.com

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَضَ اللّٰهُ صَلَاةً عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا، وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَ فِىْ الْخَوْفِ رَكْعَةً . رواه مسلم

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমাদের নবী (সা)-এর জবানে আল্লাহ্ পাক মুকীম অবস্থায় নামাযকে চার রাক‘আত সফর অবস্থায় দুই রাক‘আত এবং যুদ্ধে ভীতিকর (খাওফ) অবস্থায় এক রাক‘আত করে ফরয করেছেন।[৬]

উপরোক্ত হাদীসগুলো স্পষ্টই নির্দেশ করছে যে, সফর অবস্থায় কসর করা ওয়াজিব। কেউ যদি তা ছেড়ে দেয় তবে তা জায়িয হবে না। এই মতের সমর্থনে আরও অনেক হাদীস রয়েছে।[৭] উল্লেখযোগ্য হাদীসে উল্লেখিত আয়াতের একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা সহ কতিপয় হাদীস ও দলীল এমনও রয়েছে যাতে সফর অবস্থায় কসর করা অত্যাবশ্যক নয় বলে বাহ্যত প্রতীয়মান হয়।[৮]

নিম্নে তা তুলে ধরা হলো, আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا .

---

৬. সহীহ মুসলিম, সালাত অধায়, অনুচ্ছেদ মুসাফিরের সালাত এবং কসর, ৩খ. পৃ. ৩।

৭. যেমন : (ক)

عن ابن عباس رضى الله عنه قال فمن صلى فى الصفر اربعًا كمن صلى فى الحضر ركعتين قلت : فى الصحيح بعضه، رواه أحمد وفيه حميد بن على العقيل، قال الدار قطنى : لا يحتج به وذكره ابن حبان فى الثقات، مجمع الزوائد» (١-٢٠٤) مختصراً، قلت : فقال ابو زرعة : كوفى لا بأس به، ولم يذكر البخارى فيه جرحًا ، كذا فى تعجيل المنفة» (ص : ١٠٦) الحديث حسن .

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, সফর অবস্থায় চার রাক‘আত পড়ল সে ব্যক্তির মত যে মুকীন অবস্থায় দু'রাক‘আত পড়ল, (হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে। আব্ন হিব্বানের মতে এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য দ্র. মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১খ, পৃ. ২০৪)।
এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে যেমনিভাবে মুকীম অবস্থায় চার রাক‘আতের পরিবর্তে দুই রাক‘আত পড়া জায়িয নয় তেমনিভাবে সফর অবস্থায় ও দুই রাক‘আতের পরিবর্তে চার রাক‘আত পড়া জায়িয নয়।
(খ)

وعن : ابراهيم ، ان ابن مسعود رضى الله عنه قال : «من صلى فى السفر أربعًا أعاد الصلاة» رواه الطبرانى فى «الكبير» وإبراهيم لم يسمع عن ابن مسعود ، «مجمع الزوائد» (١-٢٠٤) قلت : ولكن مراسيله عنه صحاح كذا ذكره ظفر أحمد عثمان رحمه الله عليه فى اعلاء السنن ج ٧ ، ص : ٢٦٧)

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, সফর অবস্তায় চার রাক‘আত পড়ল তাকে ঐ নামায পুনরায় পড়তে হবে। তারারানী আল মু‘জামুল কবীর, হাইসামী প্রাগুক্ত)। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে কসর করা ওয়াজিব। অন্যথায় তিনি সেই নামাযকে পুনরায় পড়তে বলতেন না ?

৮. ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ (র)-এর মতে সফর অবস্থায় কসর আদায় করার অবকাশ (রুখসত) আছে তাদের নিকট সফর অবস্থায় কসর করা ওয়াজিব নয়, পূর্ণ করাই শ্রেয়।
দ্র. ইমাম নব্বী, শারহে সহীহ মুসলিম (বৈরুত : দারু ইয়াহ ইয়ায়িত তুরাসিল ‘আরবী ১৩৪৭ হি./১৯২৯ ইং) ৫খ, পৃ. ১৯৪।

www.pathagar.com

"আর তোমরা যখন দেশ বিদেশে সফর করবে তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে কাফিররা তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে তবে সালাত সংক্ষিত করিলে তোমাদের কোন দোষ নেই।" (৪ : ১০১)।

এ আয়াতের ভাষ্য অনুসারে কেউ কেউ দাবী করেন যে, উক্ত আয়াতে যেহেতু কসর আদায় করা গুনাহ্ নয় বলা হয়েছে সেহেতু কসর আদায় করা রুখসতী হুকুম অত্যাবশ্যকীয় এবং ওয়াজিব হুকুম নয়। কিন্তু এই দাবী যথাযথ নয়, এর কয়েকটি কারণ রয়েছে :

১. আল্লামা (র) আলূসী তাফসীর রূহুল মা'আনীতে বলেন, যেহেতু সাহাবায়ে কিরাম চার রাক'আত আদায় অভ্যস্ত ছিলেন, সেহেতু তাঁদের ধারণায় এ রকম মনে হচ্ছিল যে, কসর আদায় করা ত্রুটিপূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ কাজ। তাই চিত্তের প্রশান্তি তথা আত্মিক শান্তি প্রদানের ভিত্তিতে এখানে لا جناح 'কোন দোষ নেই' বলা হয়েছে।

২. অথবা উপরোক্ত বক্তব্যের বলা যায় যে, لا جناح শব্দ দ্বারা ওয়াজিব না হওয়া সাব্যস্ত হবে না। কেননা, অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا "সুতরাং যে কেউ কা'বাগৃহের হজ্জ কিংবা উমরা সম্পন্ন করলো এই দুইটির তাওয়াফ করতে তার কোন পাপ নেই।" (বাকারা ঃ ১৫৮-২)

উক্ত আয়াতে لا جناح শব্দ থাকা সত্ত্বেও তাওয়াফ করা আহনাফের নিকট ওয়াজিব এবং শাফিঈ (র)-এর নিকট ফরয। মোটকথা কসরের আয়াতে 'لا جناح' (দোষ নেই) উল্লেখ থাকা কসর ওয়াজিব নয় বুঝায় না। যে সব হাদীস থেকে বাহ্যত নামাযে কসর করা রুখসত বলে প্রতীয়মান হয়। তা নিম্নরূপ ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ حَتّٰى اِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ قَصَّرْتَ وَاَتْمَمْتَ وَاَفْطَرْتَ وَصُمْتَ قَالَ اَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ وَمَا عَابَ عَلَىَّ (سنن نسائى كتاب تفسير الصلاة فى السفر باب المقام الذى يقصر بمثله الصلاة)

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উমরার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে রওয়ানা হয়ে মক্কায় পৌছে বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক আপনি সালাত সংক্ষিপ্ত আদায় করেছেন আর আমি পরিপূর্ণ আদায় করেছি। আপনি রোযা রাখেন নি, কিন্তু আমি রোযা রেখেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি ভালই করেছ হে আয়েশা! তখন তিনি আমাকে কোনরূপ দোষারোপ করেননি।[৯]

অনুরূপ একটি বর্ণনা দ্বারা কুতনীতেও পাওয়া যায়। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِى عُمْرَةٍ فِىْ رَمْضَانَ اَفْطَرَ وَصُمْتُ وَقَصَّرَ وَاتْمَمْتُ فَقُلْتُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَفْطَرْتُ وَصُمْتُ وَقَصَّرْتَ وَاَتْمَمْتُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةَ একবার নবী করীম (সা) রমযান মাসে উমরার অবস্থায় রোযা ভেঙ্গে ফেলেন। এবং আমি রোযা রাখি। আর তিনি কসর নামায পড়লেন, আমি পূর্ণ নামায পড়লাম। অতঃপর বললাম, আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গ

৯. সুনান নাসাঈ শরীফ, বঙ্গানুবাদ. ইফা. বা. অধ্যায় : সফরে সালাত সংক্ষিপ্ত করা অনুচ্ছেদ, যতটুকু দূরত্বে সালাত সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করা যায়, ২য় খ, পৃ. ৩০৬।

www.pathagar.com

হোক। আপনি রোযা ভেঙ্গে ফেলেছেন, আমি রোযা রেখেছি আপনি কসর পড়েছেন, আমি পূর্ণ নামায পড়েছি। তখন তিনি বললেন, হে আয়েশা তুমি ভালই করেছ।[১০]

উল্লেখিত হাদীসের আলোকে দাবী করা হয় যে, সফর অবস্থায় কসর না করে পূর্ণ নামায আদায় করা ও জায়িয। যদি জায়েয নাই হত তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কেমন করে বললেন যে, 'তুমি ভালই করেছ' উল্লেখ্য যে, মাহাদ্দিসীনে কিরাম এ হাদীস সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নিম্নে তা বর্ণনা করা হল।

১. এ হাদীসটির সনদ নিয়ে অনেকেই সমালোচনা করেছেন। বিশেষত এর সনদে আলা ইব্ন যুহাইর নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। যার সম্পর্কে ইব্ন হাব্বান বলেন যে, তার রিওয়ায়াত যদি কোন সিকাহ্ তথা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণনার বিপরীত হয় তবে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। ইব্ন হাযম (র) বলেন যে, এ হাদীসে ভাল কিছু নেই তিনি এটা সমালোচিত, ইব্ন নাহ্বী এই হাদীসের সনদ প্রত্যাখ্যান করেছেন।[১১]

২. ইবনুল আল্লামা কায়্যিম (র) বলেন, আমি শায়খুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়া (র)-এর নিকট শুনেছি তিনি বলেছেন, এই হাদীসের বক্তব্যটি হযরত আয়েশা (রা)-এর উপর মিথ্যাচারের নামান্তর আর হযরত আয়েশা (রা) মহানবী (সা.)-এর সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের নামাযের বরখেলাফ কিছু করেননি। অর্থাৎ নামায পুরা করার ব্যাপারে আয়েশা (রা) থেকে যে বর্ণনা রয়েছে তা সঠিক নয়। কেননা হযরত আয়েশা (রা) হতেই অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "নামায দুই রাক'আত করেই ফরয করা হয়। যা সফর অবস্থায় ঠিক রাখা হয় আর মুকীম অবস্থায় বাড়িয়ে দেয়া।[১২]

ইব্ন কাসীর-এর বর্ণনায় ইব্ন আসীরের বরাতে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রা)। সফরে নবী করীম (সা)-এর সাথে ছিলেন না[১৩] অতএব হাদীসটির বক্তব্য প্রশ্ন সাপেক্ষ।

৩. অথবা বলা হবে যে, এখানে সূক্ষ্ম একটি পদ্ধতির অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। আর তা হলো 'আমি মাতবূ (অনুসরণীয়) আর তুমি তাবে' (অনুসারী) আমাকে জিজ্ঞাসা ব্যতীত ইজতিহাদের মাধ্যমে তুমি এ কাজ করেছ এটা খুব ভালই করেছ। একথা অস্বীকার করা বুঝায় সমর্থন করা বুঝায় না।

তৃতীয়ত, হযরত উসমান (রা) এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি মিনায় দু' রাক'আতের পরিবর্তে পূর্ণ চার রাক'আত সালাত আদায় করেছেন।[১৪] তাই দাবী করা হয় কসর করা ওয়াজিব হলে তিনি তা করতেন না। ফলে সফর অবস্থায় চার রাক'আত পড়াও জায়িয।

উল্লেখ্য যে, মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ দাবীর যৌক্তিকতায় প্রশ্ন তুলেছেন। হজ্জ অবস্থায় হযরত উসমান (রা) তাঁর খিলাফতের শেষ সময়ে মিনায় কেন চার রাক'আত নামায আদায় করলেন ? তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন ঃ

---

১০. সুনান দারা কুতনী, ইমাম দারাকুতনী (র) বলেন হাদীসটির সনদ হাসান।

১১. উসমানী, প্রাগুক্ত।

১২. সহীহ বুখারী আরো দ্র. উসমানী, প্রাগুক্ত।

১৩. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, ফয়যুল বারী, ২খ. পৃ. ৩৯৫।

১৪. এ বর্ণনাটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে, দ্র. বুখারী সালাতে কসর করা অধ্যায় অনুচ্ছেদ ' মিনায় সালাত, বঙ্গানুবাদ ই.ফা.বা. ২ খণ্ড, পৃ. ২৮০।

www.pathagar.com

১. সে বছর অনেক আরব বেদুইন নওমুসলিম হজ্জ করতে এসেছিল। তাই হযরত উসমান (রা) তাদেরকে নামায শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে চার রাক'আত আদায় করেছেন। যেন তারা এ ধারণা করতে না পারে যে সফর ও ইকামত উভয় অবস্থায় দুই রাক'আত নামাযই ফরয।

২. তিনি ছিলেন মানুষের সর্বোচ্চ কর্তৃতের অধিকারী খলিফা। তাই তাঁর কর্তৃত্ব গোটা দেশব্যাপী। এ জন্য তিনি মক্কাকেও তার নিজস্ব অঞ্চল বলে মনে করেছিলেন। তাই তিনি এরূপ করেছেন।

৩. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে মিনায় জনবসতি ছিল না। কিন্তু হযরত উসমান (রা)-এর সময়ে সেখানে অনেক ঘর-বাড়ী গড়ে উঠে। তাই হযরত উসমান (রা) হয়ত মনে করেছিলেন, সফর অবস্থায় থাকলে কসর করতে হবে কিন্তু জনবসতিতে থাকলে তা করতে হবে না।

৪. হযরত উসমান (রা) পূর্বে নিজেই মক্কায় বসবাসকারী ছিলেন। তাই তিনি মক্কায় দারুল খিলাফাহ হিসাবে গ্রহণ করে সেখানে অবস্থানের সংকল্প করেছিলেন। যে জন্য তিনি পুরো নামায আদায় করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। তবে এ ব্যাখ্যাটা সমালোচিত।[১৫]

৫. মিনায় বা মক্কায় হযরত উসমান (রা)-এর পরিবার পরিজন কেউ কেউ অবস্থান করছিলেন আর মুসাফির যখন কোন জায়গায় অবস্থান করে এবং বিয়ে করে কিংবা কোন জায়গায় তার স্ত্রী অবস্থান করে সেখানে তিনি মুকীমের ন্যায় পূর্ণ নামায আদায় করবেন। মসুনাদে আহমাদে এইরূপ একটি বর্ণনার সন্ধান পাওয়া যায়। যেখানে বলা হয়েছে ঃ

صَلَّى عُثْمَانُ بِأَهْلِ مِنًى أَرْبَعًا، وَقَالَ : يَاأَيُّهَا النَّاسُ ! لَمَّا قَدِمْتُ تَأَهَّلْتُ بِهَا ، وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِذَا تَأَهَّلَ الرَّجُلُ بِبَلْدَةٍ فَإِنَّهُ يُصَلِّيْ بِهَا صَلَاةَ مُقِيْمٍ .

হযরত উসমান (রা) মিনাবাসীদের সাথে চার রাক'আত নামায আদায় করেন এবং বলেন, হে লোক সকল! আমি যখন আসলাম তখন এখানেই স্বপরিবারে থাকার ইচ্ছা করলাম। অর্থাৎ বিয়ে-শাদী করে নিলাম। তখন নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যখন কোন ব্যক্তি কোন শহরে স্বপরিবারে থাকার ইচ্ছা করে তখন সে ওখানে মুকীমদের মতই সালাত আদায় করবে।[১৬]

৬. হযরত উসমান (রা)-এর ঐ কাজটিকে অনেক প্রখ্যাত সাহাবী মেনে নিতে পারেননি। সে জন্য দেখা যায় যে, বিষয়টি যখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদের নিকট উত্থাপন করা হয় তখন তিনি 'ইন্নালিল্লাহি' পড়েছিলেন।[১৭] অনুরূপভাবে আনাস (রা) কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে পূর্ণ নামায আদায় করতে দেখে বলেছিলেন ঃ

قبح الله الوجوه ، فوالله ما اصابت السنة ، ولا قبلت الرخصة .

---

১৫. যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, খ. ৭, পৃ. ২৭০।

১৬. উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭০।

১৭. উসামানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০।

www.pathagar.com

"আল্লাহ্ ঐ সকল চেহারা মলিন করে দিন তারা সুন্নাহ সঠিকভাবে অনুসরণ করেনি, রুখসতকেও তারা গ্রহণ করেনি"।[১৮] এ সব কথা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, কসর না করা মাকরুহ এবং মুসাফিরের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত রুখসতকে গ্রহণ করা তথা কসর করা ওয়াজিব।[১৯]

চতুর্থত, কসর করাকে যারা ওয়াজিব বলেন না তারা সাওমের উপর কিয়াস করেন। সফর অবস্থায় রোযা রাখা যেমনিভাবে ইখ্তিয়ারভুক্ত তেমনিভাবে কসর করা বা চার রাক'আত পড়া তা নামাযী ব্যক্তির ইখ্তিয়ারভুক্ত। কিন্তু উলমায়ে কিরামে এ যুক্তিও খণ্ডন করে দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য হল এ ধরনের কিয়াস যথাযথ নয়। কেননা, চার রাকআত নামাযের দ্বিতীয়ার্ধ দুই রাক'আত কাযা করতে হয় না এবং তা তরক করার কারণে গুণাহ্ও হয় না। আর এ হল নফল হওয়ার আলামত। পক্ষান্তের সাওমের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা কাযা করতে হয়।[২০]

মোটকথা মহানবী (সা) সর্বদা সফর অবস্থায় কসর করেছেন। তাই কসর করা ওয়াজিব।

কসরের নামায ভয়ভীত অবস্থায় নামাযের সাথে সম্পর্কিত নয়

দুই রাক'আত কসর করার নিয়ম ভীতিকর অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নয়। যে ভীতিকর অবস্থায় থাকলে চার রাক'আতের জাগায় দুই রাক'আত পড়া যাবে অন্যাথায় নয়। বরং সকল অবস্থায় সফরে কসর করার নিয়ম প্রযোজ্য। হানাফী মাযহাবসহ ইমামগণের এটাই মত। হাদীস থেকেও এর পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়।

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ بِمِنٰى اَكْثَرُ مَا كَانَ النَّاسَ وَامَنَهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ . رواه النسائى فى كتاب تقصير الصلوة فى السفر، باب الصلوة بمنى .

হারিসাহ ইব্ন ওয়াহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী পাক (সা,) আমাদের নিয়ে মিনায় দু' রাক'আত সালাত আদায় করেন। তখন মানুষ সংখ্যায় অধিক ছিল ও নিরাপদ অবস্থায় ছিল।[২১]

২. হাদীসটি বুখারী শরীফে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ امَنَ مَا كَانَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ . رواه البخارى

নবী করীম (সা) নিরাপদ অবস্থায় আমাদের নিয়ে মিনায় দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন।[২২]

---

১৮. হাইসামী, মাজমা'উয যাওয়ায়িদ, ১ খ., পৃ. ২০৪।

১৯. উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১।

২০. বুরহান উদ্দীন আলী ইব্ন আবূ বকর (র), আল-হিদায়া, বঙ্গানুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সং, ২০০৩, ১ খ., পৃ. ১৫১।

২১. সুনানে নাসাঈ, অধ্যায় সফরে সালাত সংক্ষিপ্ত করা, অনুচ্ছেদ : মিনায় সালাত আদায় করা, বঙ্গানুবাদ ই. ফা. বা. ২০০২, ২খ, পৃ. ৩০৩।

২২. সহীহ বুখারী, অধ্যায় : সালাতে কসর করা, অনুচ্ছেদ ; মিনায় সালাত ২ খ, পৃ. ২৮০।

www.pathagar.com

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ اَرَاَيْتَ اِقْصَارَ النَّاسَ الصَّلاَةَ الْيَوْمِ وَاِنَّمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ فَقَدْ ذَهَبَ ذٰلِكَ الْيَوْمُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ . (رواه مسلم والترمذى وابن ماجه وأبو داؤد)

৩. ই'য়ালা ইবন উমায়্যা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বললাম, বর্তমানে লোকেরা নামায কসর করছে, অথচ আল্লাহ্‌র নির্দেশ যদি তোমরা কাফিরদের হামলার আশংকা কর, তবে তোমরা নামায কসর হিসেবে আদায় করতে পার। বর্তমানে ঐ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। তখন উমর (রা) বলেন, তুমি সে বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করছ এ ব্যাপারে আমিও বিস্মিত হয়েছিলাম। আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ছিলেন, এটা আল্লাহ্‌র তরফ হতে তোমাদের জন্য দান স্বরূপ কাজেই তোমরা তাঁর দান গ্রহণ কর।[২৩]

আল্লামা আইনী (র) উল্লেখ করেন যে, যারা ধারণা করে কসর করা ভীতিকর অবস্থা বা যুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে নির্দিষ্ট উপরোক্ত হাদীসগুলো তাদের এই মতকে সমর্থন করে না।[২৪]

ইমাম আবূ জাফর (র) স্বীয় তাফসীরে একসূত্রে হযরত আয়েশা (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে,

عَنْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ فِىْ السَّفَرِ اَتِمُّوْا صَلاَتَكُمْ فَقَالُوْا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ فِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِىْ حَرْبٍ وَكَانَ يَخَافُ فَهَلْ تَخَافُوْنَ اَنْتُمْ .

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, সফরে তোমরা পূর্ণ নামায পড়বে। লোকজন বলল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফরে দুই রাক'আত নামায আদায় করতেন। তখন আয়েশা (রা) বললেন নবী করীম (সা) তখন যুদ্ধারত অবস্থায় ছিলেন। তাই তিনি ভীতিকর অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু তোমরা কি ভয় পাও ?[২৫]

আল্লামা আইনী (র) এই হাদীসের উত্তরে বলেন, পূর্বে বর্ণিত হারিস ইব্ন ওয়াহাবের হাদীসটির বক্তব্য অত্র আবূ জাফর বর্ণিত হাদীসটির বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে।[২৬] কারণ নিরাপদ অবস্থায় ও মুসাফিরের জন্য দু'রাক'আত নামাযে কথা উপরোক্ত হাদীসে স্পষ্টত বলা হয়েছে। এছাড়া তারা দলীল হিসেবে পূর্বে উল্লেখিত একটি আয়াতও পেশ করেন। তা হল :

২৩. আবূ দাউদ, অধ্যায় : সালাত পরিভ্রাজকের অনুচ্ছেদ : নামাযের বিধানসমূহ, মুসাফিরের নামায ই. ফা. বা. বঙ্গানুবাদ, সং ১৯৯২, ২খ, পৃ. ১৭৩।

২৪. আইনী, উমদাতুল কারী, ৭খ, পৃ. ১২১।

২৫. উমদাতুল কারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

২৬. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

اِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يُّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا . الاية .

"আর তোমরা যখন দেশ বিদেশ সফর করবে তখন কাফিররা তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে বলে তোমাদের আশংকা হলে সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই।" (৪ : ১০১)

বলা হয় যে, এই আয়াতে কসরের নামাযকে ভয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ উলামায়ে কিরাম এই ব্যাখ্যাকে মেনে নেননি। তাঁরা বলেন যে, আয়াতে إن خفتم বাক্যাংশে "إن" শব্দটি শর্তব্যঞ্জক নয়। বরং অবস্থা (ظرف) ব্যঞ্জক।[২৭]

এছাড়া উপরোক্ত ভীতিকর অবস্থাকে প্রধানত কসর করার উপলক্ষ বলা হয়। কিন্তু সাধারণত সফর অবস্থাতেও স্থান, সময় পরিবেশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছু না কিছু সংকট থেকেই যায়। যে জন্য মহানবী (সা) অভীতিকর অবস্থায়ও সফর অবস্থায় কসর চালু রাখেন। যা প্রথমোক্ত সব কয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। মহানবী (সা) নিজেই হযরত উমর (রা)-এর সংশয় ও অস্পষ্টতা দূর করেছিলেন। সুতরাং কসরের নামায শুধু ভীতিকর অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। অথবা বলা হয় যে, কসর করার বিধানটি ঐসব বিধান সমূহের আওতাভুক্ত যা কোন কারণ বশত প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু পরে ঐ কারণ দূর হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ঐ সব বিধান অবশিষ্ট থেকে যায়। যেমন মুশরিকদের সামনে বীরত্ব প্রকাশের কারণে তাওয়াফে রমল করার হুকুম প্রবর্তিত হয়েছিল। যদিও মক্কার বিজয়ের পর সেই কারণটি দূর হয়ে গিয়েছে, তথাপি রমলের বিধান বাকী রয়ে গেছে।[২৮]

এছাড়া ইবন হাজার আসকালানীর বর্ণনা মতে মি'রাজের রাত্রিতে মাগরিব ব্যতীত অন্যান্য নামায দু' রাক'আত করে ফরয করা হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে ফজর ব্যতীত সকল ওয়াক্তের নামায হিজরতের পর পরই চার রাক'আত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু ঐ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর সফর অবস্থায় কমিয়ে ফেলা হয়। অনুরূপভাবে ইবনুল আসীরের মতে কসর চতুর্থ হিজরীতে প্রচলিত হয়। দওলাবীর মতে ২য় হিজরীতে রবিউল-সানীতে প্রচলিত হয়। আল্লামা সুহাইলির মতে হিজরতের প্রায় এক বছর পর। কারোও মতে চল্লিশ দিন পর। অপর দিকে হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস থেকেই বলা হয়েছে যে, সফর অববস্থায় পূর্বের দু'রাক'আতই বহাল রাখা হয়েছে। তাহলে ভীতিকর অবস্থার আয়াতের মাধ্যমে উক্ত হুকুমটি রহিত হয়নি বলেই আমরা ধরে নিতে পারি। বস্তুত মহানবী (সা) কোন সাহাবীর পক্ষ থেকেও এমন কোন রিওয়ায়াত নেই যে, মাদানী যুগে মুসাফিরের নামায চার রাক'আত ছিল।[২৯] যা হযরত আয়েশা (রা.)-র বর্ণনা থেকেও বুঝা যায়।

এছাড়া উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, কসরের জন্য উপরোক্ত আয়াত দ্বারা শর্তারোপ করা হলে এ বিধানটি একাধিকবার রহিত হয়েছে বলেও ধরে নিতে হলে। যা কোন আলিম দাবী করেন না।[৩০]

---

২৭. মোঃ বদরে আলম, মীরাঠী, হাসিয়াতুল-বদর আস্-সারী ইলা ফায়যিল বারী, দেওবন্দ, তা.বি. ২খ, পৃ. ৩৫২।

২৮. আইনী, উমতাদুল কারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

২৯. মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী, ফাতহুল মুলহিম আলা শারহে সহীহ মুসলিম, করাচী, আল-মাকতাবাহ আর রাশিদিয়া, তা.বি, ২খ, র্ফ. ২৫০।

৩০. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

সুতরাং কসরের নামায ভীতিকর অবস্থার সাথে সম্পৃক্তি বা শর্তারোপকৃত নয়। সাধারণভাবেই সফর অবস্থায় মহানবী (সা) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে কসরের বিধান প্রচলিত ছিল এবং এখনও প্রচলিত আছে।

স্বাভাবিক গতিতে তিন দিন তিন রাত্র চলার পথ 'সফরের দূরত্ব'

পদব্রজে বা উটে চড়ে স্বাভাবিক গতিতে ৩ দিন তিন রাত্রি[৩১] ভ্রমণের সমপরিমাণ দূরত্বে[৩২] কোন স্থানের ভ্রমণের নিয়্যতে নিজ আবাসিক এলাকা অতিক্রম করলে নামায কসর করতে হবে। এটাই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মত, আর এ মতেই পোষণ করতেন হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা), সুয়ায়েদ ইব্ন গাফালাহ, শা'বী, নাসাঈ, সাওরী, ইব্ন যুবায়ের, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র)। এক বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) ও ইমাম মালিক (র) হতে ও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই মতের সমর্থনে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে প্রচুর হাদীস বর্ণিত পাওয়া যায়। যার মধ্যে কয়েকটি কিয়াসমূলক। তথা অন্য বিষয়ের সঙ্গে তুলনামূলক। হাদীসে আছে ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تُسَافِرُ الْمَرْاَةُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اِلاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ ٠

رواه البخارى فى ابواب تقصير الصلاة باب فى كم يقصر الصلاة

ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা) বলেছেন, কোন মহিলাই যেন মাহরাম পুরুষকে সঙ্গে না নিয়ে তিন দিনের সফর না করে।[৩৩]

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ يَكُوْنَ ثَلاَثَةَ اَيَّامُ فَصَاعِدًا اِلاَّ وَمُعْرِضًا اَبُوْهَا او اِبْنِهَا اَوْ زَوْجِهَا اَوْ اَخُوْهَا اَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا ،

أخرجه مسلم (ص : ٤٣٤) وعزاه فى نيل الاوطاد إلى الجماعة الا البخارى والنسائى وكذا إعلاء السنن لظفر أحمد العثمان (٢٤٢/٧)

---

৩১. অবশ্য দিনরাতের সবটুকু সময় চলা উদ্দেশ্য নয় বরং দিবাভাগে চলা উদ্দেশ্য নয়। বরং দিবাভাগের চলাই উদ্দেশ্য। কেননা রাত্র তো হলো বিশ্রামের জন্য, তদ্রূপ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলাও উদ্দেশ্য নয়, কেননা মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আবার সাওয়ারী জানোয়ারের পক্ষেও তা সম্ভব নয়। বরং স্বাভাবিক বিশ্রাম নিয়ে পথ চলা উদ্দেশ্য।

৩২. অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম লোকজনের হিসাব করার সুবিধার্থে মাইল দ্বারা দূরত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং বলেছেন, যে ধরনের পথ চলার কথা বলা হয়েছে। তাতে একজন মানুষ দিনে সাধারণত : ষোল মাইল পথ অতিক্রম করতে পারে। সুতরাং সফরের শরী'আত নির্ধারিত দূরত্ব হলো আটচল্লিশ মাইল। যা প্রায় ৮৯ কিলোমিটারের সমপরিমাণ রাস্তা। (দ্র. আব্দুল হামীদ মাহ্মূদ তাহমায, আল-ফিকহুল হানাফী ফী সাওবিহিল-জাদীদ, ফিকহুল ইবাদাত, দামেশক, দারুল কলম, ১৪১৯ হি: ১৯৯৮ ইং খ. পৃ. ৩১০)। আর ফারসাখ (فرسخ) হিসেবে সফরের দূরত্ব ১৬ ফারসাখ (فرسخ) এবং ১ ফারসাখ এর দূরত্ব হল তিন মাইল, এই হিসাবেও মোট দূরত্ব হয় তিন দিনের ভ্রমণে ৪৮ মাইল।

৩৩. বুখারী, ২য় খ, পৃ. ২৮১।

www.pathagar.com

যে মহিলা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে তা জন্য হালাল হারাম, তিন দিনের সফর করা যদি না তার সাতে তার পিতা বা পুত্র বা স্বামী কিংবা ভাই অথবা মাহ্‌রাম পুরুষ থাকে।[৩৪]

এ হাদীস দ্বারা তিন দিনের সফরকে দূরত্বের ন্যূনতম মাত্রা হিসাবে দেখানো হয়েছে।

এমনিভাবে মুসাফিরের জন্য মোজার উপর মাসেহ করার অনুমতি তিন দিন তিন রাত্রি প্রধান করার বিষয়টি ইশারা করে যে, সফরের দূরত্ব কমপক্ষে তিন দিন তিন রাত্রি।

এর সমর্থনে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল :

عن عبد الرّحمن بن أبى بكرة عن أبيه ان رسول اللّه ﷺ وقت فى المسيح على الخفين ثلاثة ايام واليا ليهن للمسافر، وللمقيم يوم وليلة رواه ابن حبان فى صحيحه الزيلعى ، نصب الراية (ج ١ ، ص : ٨٧) وقال الطحاوى فى معانى الاثار (ج ١ ، ص ١٥٠) قد تواترت الاثار عن رسول اللّه ﷺ فى المسح على الخفين للمسافر ثلاثة ايام ولياليها ، وللمقيم يوم وليلة اهـ .

হযরত আব্দুর রহমান ইবন আবু বাকরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মোযার উপর মাসেহ্ করার ব্যাপারে মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত্রি সময় কাল এবং মুকীমের জন্য একদিন এক রাত্রি পর্যন্ত সময়কাল নির্ধারণ করেছেন।[৩৫]

عن شريح بن هانى عن عائشة ، قال : أتيتها أسألها عن المسح على الخفين ، فقالت با بابن أبى طالب فاساله ، فسألناه ؟ فقال جعل رسول اللّه ﷺ ثلاثة أيام وليا ليهن للمسافر ... (أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة ، باب التوقيت فى المسح على الخفين)

শুরাইহ ইব্‌ন হানী হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন এবং বলেন, মোজার উপর মাসেহ করার মাস'আলা জানার জন্য আমি একবার হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে হাযির হই। অতঃপর তিনি বলেন, তোমার উচিত এ ব্যাপারে আলী ইব্‌ন আবু তালিবের কাছে যাওয়া এবং তাকে প্রশ্ন করা। অতঃপর আমি তার কাছে গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করি। তিনি বলেন এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত্রি নির্ধারণ করেছেন।[৩৬]

এই মর্মে ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত একটি সরাসরি হাদীসও পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ :

---

৩৪. সহীহ মুসলিম।

৩৫. হাদীসটি সহীহ ইব্‌ন হিব্বানে বর্ণিত আছে। দ্র: যায়লাই, নাসবুর-রায়াহ, ১খ, পৃ.৮৭। ইমাম তাহাভী শারহে মা'আনিলি আসারে উল্লেখ করেন যে, এই রূপ হাদীসটি মুতাওয়াতির (তথা এতসংখ্যক রাবী বর্ণনা করেন যে, যার মাঝে কোন মিথ্যার কোনরূপ অবকাশ নেই)। (দ্র: যাফর আহমদ উস্‌মানী, ই'লাউস্ সুনান, ৭খ, পৃ. ২৩৬।

৩৬. সহীহ মুসলিম শরীফ, তাহারাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, মোযার উপর মাসেহ করার সময়সীমা, ২খ, পৃ. ৪৮।

www.pathagar.com

عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى كَمْ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : اَتَعْرِفُ السُّوَيْدَاءَ ؟ قُلْتُ لَا ، وَلٰكِنِّيْ قَدْ سَمِعْتُ بِهَا قَالَ : هِيَ ثَلَاثُ لَيَالٍ قَوَاصِدَ ، فَاِذَا خَرَجْنَا اِلَيْهَا قَصَرْنَا الصَّلَاةَ .

رواه الامام محمد بن الحسن فى الاثار له (ص : ٣٤، ٣٥) وفى « آثار السنن » إسناده صحيح اهـ (٢-٦٢) وقال ظفر أحمد العثمانى : رجاله ثقات من رجال الصحيحين .

আলী আব্‌ন রাবী'আ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)-কে প্রশ্ন করি যে, কতদূর সফরে সালাত কসর করা হতে ? তিনি বলেন, তুমি কি সুওয়াইদা (السويداء)[৩৭] সম্পর্কে জান ? আমি বললাম জিনা। তবে আমি শুনেছি। অতঃপর তিনি বলেন : "এটা হল তিন রাত্রির দূরত্বের (সফর)। যখন আমরা এভাবে বের হই তখন নামায কসর করি।[৩৮] এছাড়া সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ঃ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُقَصِّرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِيْ اَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا . كذا ذكره البخارى فى صحيحه فى أبواب تقصير الصلاة باب فى كم يقصر الصلاة الخ .

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) চার 'বুরদ' অর্থাৎ ষোল পারসাখ দূরত্বে কসর করতেন এবং সাওম পালন করতেন না।[৩৯] আল্লামা আইনী (র) উল্লেখ করেন যে, এক বারীদ বার মাইল দূরের পথ। এবং এক ফারসাখ সমান তিন মাইল।[৪০] এ-ই হিসাবে ও চার বরীদে ৪৮ (আটচল্লিশ) মাইল এবং ষোল ফারসাখে ও আটচল্লিশ মাইল হয়ে থাকে। এ ছাড়া ইমাম মালিক (র)-এর গ্রন্থ মুয়াত্তায় বর্ণিত আছে,

عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَكِبَ إِلَى رِيْمٍ ، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِيْ مَسِيْرِهِ ذٰلِكَ - قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ نَحْوُ مِنْ اَرْبَعَةِ بُرُدٍ - رواه الإمام المالك فى المؤطأ .

সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) বর্ণনা করেন 'তাঁহার পিতা সাওয়ারীতে আরোহন করে 'রীম' নামক স্থানে যান এবং তিনি এতটুকু পথ ভ্রমণে নামায কসর পড়েছেন। ইয়াহইয়া (র) বলেন, মালিক (র) বলেছেন, উক্ত স্থানটির দূরত্ব অন্তত চার বারীদ হবে।[৪১]

৩৭. সুওয়াইদা হল মদীনার কাছে একটি স্থানের নাম।

৩৮. যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস-সুনান, খ ৭, পৃ. ২৩৮।

৩৯. সহীহ বুখারী, সালাতে কসর করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : কত দিনের সফরে সালাত কসর করবে, ২খ, পৃ. ২৮১।

৪০. আইনী, প্রাগুক্ত, ৭খ, পৃ. ১২৫।

৪১. মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র) অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮২, ১খ, পৃ. ২০৪।

www.pathagar.com

মুয়াত্তা মালিকে আরেকটি হাদীস এভাবে বর্ণিত আছে যে,

عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ : اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ، رَكِبَ إِلٰى ذَاتِ النُّصُبِ ، فَقَصَرَا الصَّلاَةَ فِىْ مَسِيْرِهِ ذٰلِكَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَبَيْنَ ذَاتِ النُّصُبِ وَالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعَةُ بُرُدٍ .

সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) হতে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) সাওয়ার হয়ে 'যাতুন-নুসুব (ذات النصب) নামক স্থানের দিকে গমণ করেন। তিনি তার এই পরিমাণ যাত্রায় নামায 'কসর' পড়লেন। ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন, মালিক (র) বলেছেন, 'যাতুন-নুসুব' ও মদীনার মধ্যে ব্যবধান হল চার বারীদ।[৪২]

মোটকথা চার বারীদ সমান দূরত্ব প্রায় তিন দিনের পথ। কোন কোন হাদীসে স্পষ্টতই তা উল্লেখ আছে। যেমন ইব্‌ন জারীর তাবারী (র) হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে এক বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে,

تُقْصَرُ الصَّلاَةُ فِىْ مَسِيْرَةِ ثَلاَثِ لَيَالٍ . كذا فى كنز العمال ، ج ٤ ، ص : ٢٣٩

তিন রাত্রির সফরে নামায কসর করা যাবে।[৪৩] অনুরূপভাবে ইব্রাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, হযরত সুয়াইদ ইব্‌ন গাফলাহ (রা)[৪৪] থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

اِذَا سَافَرْتَ ثَلٰثًا فَاقْصُرْ . (رواه محمد بن الحسن فى « الجمع » واسناده صحيح ، كذا فى آثار السنن ، ج ٢، ص : ١٤)

যখন তুমি তিন দিনের সফর করবে তখন কসর করবে।[৪৫]

এইভাবে এসব হাদীস ও মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণ করে যে, তিনদিনের সফরের পথই শরী'আত নির্ধারিত সফর। এটি ইমাম তাহাভীর দাবীকে যথার্থ বলে প্রমাণ করে। যেখানে তিনি বলেছিলেন, সফরের দূরত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্ত ছিল তিন রাত্রির সফর যে ব্যাপারে সকল বর্ণনায় ঐক্যতান ঘটেছে।[৪৬]

---

৪২ মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র), প্রগুক্ত।

৪৩. হাদীসটি 'কানযুল উম্মাল' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়, দ্র: ৪খ, পৃ' ২৩৯। যাফর আহমদ উসমানী বলেন যে, এই হাদীসটির সনদ সম্পর্কে নিশ্চিত না হলেও তা অন্যটির সমর্থক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭)।

৪৪. কেউ কেউ হযরত সুয়াইদ ইব্‌ন গাফলাহকে সাহাবী বলে দাবী করেছেন। আবার কেউ কেউ মহানবী (সা.)-এর সাথে নামায আদায় করেছেন বলে দাবী করেছেন। তবে এ রিওয়ায়াতটি সহীহ না হলেও নিঃসন্দেহে তিনি তাবিঈ ছিলেন। এবং বলা যায় মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায়, মুসলমান ছিলেন। আর এ ধরনের ব্যক্তির কথা সাহাবীদের কথার মতই–আমাদের নিকট দলীল স্বরূপ। (ই'লাউস্-সুনান, ৭খ, পৃ. ২৪৭)।

৪৫. আসারুস সুনান, ২খ, পৃ. ৬৪।

৪৬. যাফর আহমদ উসমানী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

অপর দিকে এমন কিছু বর্ণনা ও পাওয়া যায়, যা তেকে সফরের দূরত্ব ৪৮ মাইলের কম কিংবা তিন দিন তিন রাত্রি সফরের সমপরিমাণ অপেক্ষা কম বুঝা যায়। এই রূপ বর্ণনা করেন কোন কোন আলিম সফরের দূরত্ব নির্ধারণ বিভিন্ন প্রকার মতামত ব্যক্ত করেছেন।

এমন কি কোন কোন বর্ণনায় কসরের দূরত্ব তিন মাইল উল্লেখ আছে বলে দাবী করা হয়। যাহেরীগণ এমতই পোষণ করেন। এরূপ বর্ণনা হিসাবে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করা হয়।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে ঃ

كان النبى ﷺ اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ شعبة الشاك قصر . رواه مسلم وفى رواية أبى داؤد يصلى ركعتين

নবী করীম (সা) যখন তিন মাইল (বর্ণনাকারীর শু'বার সন্দেহ) কিংবা তিন ফারসাখ সফরে বের হতেন তখন কসর করতেন।[৪৭] অপর এক বর্ণনায় আছে,

عَنْ اَنَسٍ ابْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَبِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ . متفق عليه .

আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে মদীনায় যুহরের সালাত চার রাক'আত আদায় করেছি এবং যুল-হুলাইফায় আসরের সালাত দু'রাক'আত আদায় করেছি।[৪৮] 'আত তা'লীকুস্-সাবীহ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যুল-হুলাইফা থেকে মদীনার দূরত্ব তিন মাইল।[৪৯] কিন্তু মুহাদ্দেসীনে কিরাম এ ধরনের বর্ণনার বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

প্রথমোক্ত হাদীসটির উত্তরে বলা হয় যে, যেখানে বর্ণনাকারী নিজেই দূরত্বের পরিমাপে সন্দেহ করেছেন। কাজেই এর দ্বারা তিন মাইল হওয়ার কথা নিশ্চিতভাবে দাবী করা যথাযথ নয়। এছাড়া আবু উমর (র) বলেন উপরোক্ত হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াযীদ হানায়ী থেকে বর্ণিত, যিনি বসরার প্রসিদ্ধ শায়খ। তিনি এমন কোন বিষয় বর্ণনা করতে পারেন না যা অধিকারংশ সাহাবী ও তাবিঈগণের বর্ণনার পরিপন্থী। আইনীর মতে অথবা এও হতে পারে যে, মহানবী (সা) দূরে কোথাও সফরের ইচ্ছা করে বের হলেন, অতঃপর তিন মাইল অতিক্রম করার পর কসর করার ইচ্ছা করলেন, আর হযরত সেখানে নামাযের সময় সমাগত হল, তখন তিনি কসর করেন।

দ্বিতীয় হাদীসের উত্তরে মুহাদ্দিসনে কিরাম বলেন যে, মাইল হিসাবে মদীনা থেকে যুল-হুলাইফার দূরত্ব সম্পর্কে মতভেদ আছে। আইনীর বর্ণনা অনুসারে কাযী আয়ায (র) বলেন, উভয়ের দূরত্ব সাত মাইল, ইবন কারাকূলের মতে ছয় মাইল, কিন্তু তা সত্ত্বেও মহানবী (সা) মক্কায় হজ্জের উদ্দেশ্য বের হয়েছিলেন। যুল-হুলায়ফাই তার শেষ গন্তব্য ছিল না বরং মক্কায় যাওয়ার পথে যুল-হুলায়ফা পৌঁছতেই আসরের নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যায় এবং সেখানে তিনি

---

৪৭. সহীহ্ মুসলিম।

৪৮. সহীহ্ বুখারী, বঙ্গানুবাদ, ই. ফা. বা. ২খ, পৃ. ২৮২। হাদীসটি সহীহ মুসলিম শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। অন্য এক সনদে হযরত উমর (রা) থেকে ও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে। আইনী, প্রাগুক্ত, ৭খ, প্র. ১১৯।

৪৯. মাওলানা আবুল হাসান (র), তানযীমুল আশ্তাত, চট্টগ্রাম, মাকতাবাতুল হাসান, ১খ, পৃ. ৪৪৮।

www.pathagar.com

কসর আদায় করেন।[৫০] অতএব পূর্বোক্ত হাদীসসমূহের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে সফরের দূরত্ব ন্যূনতম ৪৮ মাইল বা স্বাভাবিক গতিতে পদব্রজে কিংবা উটে চড়ে তিন দিনের পথের সমান।

১৫ দিন পর্যন্ত অবস্থানের নিয়্যতে না করলে কসর করতে হবে

সফরের হুকুম অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি কোন শহরে বা কোন স্থানে পনের দিন বা তার বেশী থাকার নিয়্যত করে। যদি এর কম সময় থাকার নিয়্যত করে তাহলে কসর করবে। এটা ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত।[৫১]

এ বিষয়ে মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা) মক্কায় অবস্থায়কালীন আমল এবং সাহাবায়ে কিরামদের বক্তব্য ও আমল কেই দলীল হিসাবে পেশ করা হয়। নিম্নে তা প্রদত্ত হল ঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالا اذَا قَدِمْتَ بَلْدَةَ وَاَنْتَ مُسَافِرَ وَفِىْ نَفْسِكَ اَنْ تُقِيْمَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَاكْمِلْ الصَلاَةَ بِهَا وَاِنْ كُنْتَ مُسَافِرُ وَفِىْ نَفْسِكَ اَنْ تُقِيْمَ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمًا فَاكْمِلْ الصَّلاَةَ بِهَا وَاِنْ كُنْتَ لاَ تَدْرِىْ مَتَّى تَظْعِنَ فَاقْصُرْهَا . (رواه الطحاوى ، وكذا فى عمد القارى للعينى ١١٧/٧)

১. ইবন আব্বাস ও ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, যখন তুমি কোন শহরে যাও এবং মুসাফির হও আর তথায় ১৫দিন অবস্থানের নিয়্যত কর তাহলে নামাযকে পূর্ণ আদায় করবে। আর যদি তুমি কখন প্রস্থান করবে তা অবগত না হও তাহলে নামাযকে কসর করবে।[৫২]

২. ইবন উমর (রা) থেকেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে :

عن مجاهد ان ابن عمر رضى الله عنه كان اذا اجمع على إقامة خمسة عشر يومًا اتم الصلاة .

মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ইব্‌ন উমর (রা) যখন কোথাও ১৫ দিন অবস্থানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতেন তখন নামায পূর্ণ আদায় করতেন।

---

৫০. আইনী, প্রাগুক্ত, ৭খ, পৃ. ১৩১-১৩২।

৫১. আইনী, উমদাতুল-কারী, ৭খ, পৃ. ১১৬।
উল্লেখ্য যে, মুসাফির হওয়ার ন্যূনতম সময়সীমা নির্ধারণে প্রচুর মতামত পাওয়া যায়।। এ ক্ষেত্রে আল্লামা আইনী (র) বাইশটি মত উল্লেখ করেছেন। (প্রাগুক্ত)। অনুরূপভাবে ইবন রুশদ তাঁর 'বিদায়াতুল-মুজতাহিদ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আবূ উমর এক্ষেত্রে প্রায় এগারটি মতামত বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে তিনটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। (১) মালেকী ও শাফিঈ মাযহাব মুসাফির চার দিন একামতের নিয়ত করলেই পূর্ণ নামায আদায় করবে। (২) ইমাম আহমদ ও দাউদ যহেরীর মাযহাব মতে চার দিনের চেয়ে বেশী সময়ের ইকামত করলে পূর্ণ নামায আদায় করবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা ও সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মাযহাব মতে ১৫ দিনের ইকামতের নিয়্যত করলে পূর্ণ নামায আদায় করবে। (শাব্বীর আহমদ উস্‌মানী, ফাতহুল মুলহিম শারহ মুসলিম, ২খ, পৃ. ২৫৪)।

৫২. তাহাভী শরীফ।

www.pathagar.com

৩. ইব্‌ন উমর (রা)-এর আরেকটি বর্ণনা রয়েছে 'কিতাবুল আসার লি মুহাম্মদ' নামক কিতাবে

قال قال اذا كنت مسافر فوطنت نفسك على اقامة خمسة عشر يوما فاتمم الصلاة ان كنت لا تدرى فاقصر الصلاة .

তিনি বলেন যখন তুমি কোথাও মুসাফির হও এবং তথায় ১৫ দিন অবস্থানের ইচ্ছা পোষণ কর তাহলে নামায পূর্ণ করবে আর যদি কে (কতদিন) পোষণ কর তাহলে নামায কসর করবে।[৫৩]

৪. আল্লামা আইনী আরেকটি হাদীস হাশীম (র) থেকে বর্ণনা করেন, যিনি দাউদ ইব্‌ন আবু হিন্দ (র) থেকে তিনি হযরত ইবনুল মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণণা করেছেন। তিনি বলেন,

اِذَا اَقَامَ الْمُسَافِرُ خَمْسَ عَشَرَةَ لَيْلَةً اَتَمَّ الصَّلٰوةَ وَمَا كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَلْيُقْصِرْ .

'যখন মুসাফির পনের রাত্র অবস্থান করবে তখন সে পূর্ণ নামায আদায় করবে। আর যখন এর চেয়ে কম সময় অবস্থান করবে তখন কসর করবে।[৫৪] অবশ্য ইবন আব্বাস (রা) এর কোন কোন বর্ণনায় মহানবী (স.) মক্কায় ১৯ দিন অপর এক বর্ণনায় ১৮ দিন, আরেক বর্ণনায় ১৭ দিনের অবস্থানের উল্লেখ আছে।[৫৫] তবে পনের দিনের রেওয়ায়াতেটি অধিক শক্তিশালী এবং সর্বনিম্ন। তাই পনের দিন ধরাই শ্রেয়।

অপর দিকে যারা কসর করার সর্বোচ্চ সময় কাল চার দিন বা তিন দিন বলেন তারা মহানবী (সা)-এর উমরা অবস্থায় মক্কায় তিন অবস্থান করার বর্ণনাটি দলীল হিসেবে পেশ করেন। কিন্তু উলামায়ে কিরামের মতে এটা যথাযথ নয়। কারণ এর পর তিনি মিনায় এসেও কসর করেছেন। অতএব উপরোক্ত বর্ণনাটি দ্বারা কসরের সময় কাল নির্ধারণ করা যায় না। ইমাম তাহাভী (র) বলেন ইমাম শাফিঈ (র) চার দিন সময় পান বলে ইজ্‌মার খিলাফ কথা বলেছেন। তাঁর পূর্বে এমন কথা কেই বলেন নি যে, চার দিন পর মুকীম হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে হযরত আনাস (রা) থেকে একটি বর্ণনা আছে যে, মহানবী (সা) মক্কায় দশ দিন অবস্থান করেন।[৫৬] তবে এটা বিদায় হজ্জের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। আর উপরোক্ত ইব্‌ন আব্বাস (র) এর বর্ণনাটি মক্কা বিজয় কালীন ঘটনাও সাথে সংশ্লিষ্ট।

---

৫৩. আইনী, উমাদাতুল কারী, শারাহি সহীহিল বুখারী , ৭খ, পৃ. ১১৬।

৫৪. প্রাগুক্ত।

৫৫. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত।

৫৬. বুখারী, বঙ্গানুবাদ ই. ফা. বা. ২খ, পৃ. ২৭৯।

www.pathagar.com

ঈদের নামায ওয়াজিব

ইসলামে দুই ঈদের[1] নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ঈদের নামায আদায় করার বিধান কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে তা সুন্নাত না ওয়াজিব এ সম্পর্কে হাদীসের বক্তব্যে বিভিন্নতা থাকলেও অধিকাংশ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে ঈদের নামায ওয়াজিব।

এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰه عَنْه كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالاَضْحٰى اِلَى الْمُصَلّٰى فَاَوَّلُ شَىْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلٰوةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلٰى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ . أخرجه الامام البخارى فى صحيحه ، كتاب العيدين ، ج ١، ص ١٣١ [2]

হযরত আবু সাঈদ[3] খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) ঈদুল-ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে যেতেন, প্রথমে তিনি নামায পড়তেন, এরপর মানুষের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন, মানুষ কাতারে বসা থাকত, তিনি তাদের সামনে ওয়াজ করতেন, তাদেরকে উপদেশ দিতেন এবং আদেশ করতেন, (ইমাম বুখারী, আস সহীহ, অধ্যায় ঃ ঈদাইন, পরিচ্ছেদ ঃ খুরুজ ইলাল মুসাল্লা বিগাইরি মিমবারিন, প্রকাশক ঃ আসাহহুল মাতাবি', ভারত, খণ্ড ১. পৃ. ১৩১)

উল্লিখিত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, নবী করীম (সা) প্রতি বছর নিয়মিত ঈদের নামায আদায় করতেন। আর যে আমল রাসূলুল্লাহ (সা) একাধারে করেছেন তা ওয়াজিব[4]। সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈদের নামায ওয়াজিব।

---

১. ঈদ (عود) শব্দ থেকে উদগত হয়েছে। আরবী ভাষায় এর অর্থ ঘুরে আসা। ঈদ প্রতি বছর ঘুরে ঘুরে আসে বলে ঈদকে ঈদ বলা হয়। (শারহু মুসলিম লিনববী, আসাহহুল মাতাবি' খ. ১ পৃ. ২৮৯) ঈদের নামাযের পূর্বে গোসল করা, মিসওয়াক করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, উত্তম পোষাক পরিধান করা, সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ইত্যাদি (ঈদুল ফিতরের ক্ষেত্রে) সুন্নাত (শায়খুল ইসলাম মুরগীনানী আল-হিদায়া, দেওবন্দ কুতুব খানা রশীদিয়া, খণ্ড. ১, পৃ. ১৭২)

২ (كان) শব্দটি (مداومت) লাগাতার বা সর্বদা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আরবী ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞ ইবনে হাজিব (র) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি আরবদের একটি বাক্য উদাহরণ হিসেবে পেশ করেন। (كَانَ حَاتِمٌ يَقْرِىْ الضَّيْفَ) হাতিম সর্বদা অতিথিদের আপ্যায়ণ করতেন (আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, অধ্যায়ঃ ঈদাইন, অনুচ্ছেদ ঃ ওজুবু সালাতিল ঈদাইন, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল-ইসলামিয়্যাহ , ১৪১৫ হি. , খণ্ড. ৮, পৃ. ৮৬)

৩. তাঁর নাম সা'দ ইব্ন মালিক ইব্ন সিনান, উহুদের যুদ্ধের সময় তিনি ছোট ছিলেন, এরপর তিনি বারটি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি হুজুর (সা) এবং অনেক সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (ইবনে হাজার, (র) তাহযীবুত তাহযীব, প্রকাশক, আব্দুত তাওয়াব একাডেমী, খণ্ড, ৩ পৃ. ৪১৬)

৪. হাদীস বর্ণনাকারীদের (سند) বিশ্বস্ততা অকাট্য না হলে অথবা হাদীসের মূল বক্তব্য (متن) সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট না হলে অর্থাৎ সনদ অথবা মতন এর যে কোন একটিতে সামান্য দুর্বলতা থাকলে এ হাদীস দ্বারা ওয়াজিব এবং সুন্নাত প্রমাণিত হয়। শায়খ ইউসুফ বানূরী, মা'আরিফুস সুনান, করাচী, এইচ এম সাঈদ কোং, খণ্ড ১, পৃ. ৫৯।

www.pathagar.com

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ اَنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِىْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّىْ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا .أخرجه الامام البخارى فى صحيحه -كتاب العيدين -ج - ١ ص ١٣١ [৫]

হযরত বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। নবী করীম (সা)-কে আমি খুতবায়[৬] বলতে শুনেছি, আজ এই দিনে প্রথমে আমরা নামায পড়ব, এরপর গিয়ে আমরা কুরবানী করব, যে এরূপ করল সে আমাদের বিধান অনুযায়ী আমল করল। (সহীহ বুখারী, প্রগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ১৩১)।

উক্ত হাদীসে ঈদের নামাযকে শরী'আতের বিধান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হুজুর (সা)-এর ধারাবাহিক আমল শরী'আতের বিধান হলে তা অবশ্যই ওয়াজিব হবে।

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَقَالَ مَا هٰذَانِ الْيَوْمَانِ فَقَالُوْا كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهَا يَوْمَ الْاَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ . رواه أبو داؤد -ج - ١ ص ١٦١ اصح المطابع .

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসার পর দেখলেন যে মদীনাবাসীরা দুইদিন খেল তামাশার উৎসব পালন করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ দু'দিন কি করা হয়? উত্তরে তারা বলল, জাহিলিয়াতের[৭] যুগে আমরা এ দু'দিন উৎসব পালন করতাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য এর পরিবর্তে এর চেয়ে উত্তম দু'টি দিন দান করেছেন,[৮] ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর, (আবূ দাঊদ সুলাইমান ইবন আস-সিজিসতানী, সুনানু আবি দাঊদ, আসাহহুল মাতাবি' ভারত, খণ্ড ১, ১৬)

যেকোন জাতি কোন উৎসব পালন করলে তা ধারাবাহিকভাবে পালন করে থাকে। কখনো এর ব্যতিক্রম হয় না। উল্লিখিত হাদীসে জাহিলিয়াতের উৎসবের স্থলে ঈদের বিধান করার কথা বলা হয়েছে। তাই ঈদের নামায ধারাবাহিকভাবে পড়ার বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, যা একথা প্রমাণ করে যে, ঈদের নামায ওয়াজিব।

---

৫. এখানে সুন্নাত শব্দ দ্বারা শরী'আতের বিধান বুঝানো উদ্দেশ্য হুজুর (সা) ফিক্‌হী পরিভাষায় সুন্নাতকে বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৮, পৃ. ৮৪।

৬. জুমু'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য এবং আদায় সহীহ হওয়ার জন্য যে সব শর্ত রয়েছে ঈদের নামাযেও তা শর্ত। তবে খুতবা শর্ত নয়। কেউ ঈদের নামাযে খুতবা পাঠ না করলে নামায সহীহ হবে কিন্তু সুন্নাত তরক করার গুনাহ্ হবে। ইবনে নুজাইম শায়খ যাইনুদ্দীন, আল-বাহরু রাইক, বাব, ঈদাইন, এইচ, এম সাঈদ কোং করাচী, খণ্ড ২, পৃ. ১৫৮।

৭. জাহিলীয়া যুগে নওরোজ ও মিহিরজান দুই দিন উৎস পালন করা হত, (শায়খ খলীল আহমাদ সাহারানপুরী, বজলুল মাযহুদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, খণ্ড ৬, পৃ. ১৫৯)।

৮. দ্বিতীয় হিজরীতে সর্বপ্রথম ঈদুল ফিতরের নামায পড়া হয়। যে বছর রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছে। বাযলুল মাজহুদ, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৬, পৃ. ১৫৮।

www.pathagar.com

عَنْ قَتَادَةَ (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قَالَ صَلٰوةُ الْاَضْحٰى وَالنَّحْرُ نَحْرُ الْبُدْنِ . أخرجه الطبرى تفسير الطبرى ج -١٢ ص ٧٢٣ دار الكتب بيروت لبنان وسنده صحيح - إعلاء السنن ج -٨ ص : ٨٤

হযরত কাতাদা (রা)[৯] থেকে বর্ণিত, (সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর, এবং কুরবানী কর (সূরা কাউসার) উক্ত আয়াতের তাফসীরে তিনি বলেন, সালাত অর্থাৎ ঈদুল আযহার নামায পড় এবং কুরবানী অর্থাৎ পশু কুরবানী কর। (ই'লাউস সুনান প্রাগুক্ত, খণ্ড ৮, পৃ. ৮৪)

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন শরীফে[১০] (উক্ত তাফসীর অনুযায়ী) ঈদের নামায পড়ার আদেশ করা হয়েছে। সুতরাং ঈদের নামায ওয়াজিব।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَنْحَرُ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّىَ فَاُمِرَ اَنْ يُّصَلِّىْ ثُمَّ يَنْحَرُ . أخرجه الطبرى فى تفسير الطبرى ج : ١٢ ص : ٧٢٢ دار الكتب بيروت لبنان وسنده صحيح أعلاء السنن ج : ٨ ، ص : ٨٤

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) নামাযের পূর্বে কুরবানী করতেন। অতঃপর তিনি প্রথমে নামায পড়ার ও পরে কুরবানী করার আদেশ প্রাপ্ত হন।

উক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, হুজুর (সা) ঈদের নামাযের জন্য আদেশ প্রাপ্ত হয়েছেন। সুতরাং ঈদের নামায ওয়াজিব। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ঈদের নামায ওয়াজিব বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য ফকীহগণের মধ্যে কারো মতে ঈদের নামায সুন্নাতে মু'আক্কাদা। এ বিষয়ে তাঁদের পক্ষ থেকে নিম্নে বর্ণিত হাদীস প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়।

طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِىَّ صَوْتِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ يَسْئَلُ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلٰوتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ [১১] أخرجه مسلم ، ج : ١ ص : ٣٠

---

৯. কাতাদা ইবন নু'মান ইবন যায়িদ, ৬৫ বছর বয়সে তিনি ২৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। হযরত উমর (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। তাহযীবুত তাহযীব, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৮, পৃ. ৩২১।

১০. (وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلٰى) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ) উক্ত আয়াত থেকে ঈদুল ফিতরের কথা প্রতীয়মান হয়। যেহেতু উক্ত আয়াতে চাঁদ দেখার সময় এবং ঈদগাহে যাওয়ার সময় তাকবীর বলা অর্থে সকলে একমত। আর এগুলো ঈদের নামাযের ভূমিকা।
তাই ভূমিকা প্রমাণিত হলে মূল বিষয় অবশ্যই প্রমাণিত হয়, কারণ মূল বিষয় ছাড়া ভূমিকা হয় না। (ই'লাউস সুনান প্রাগুক্ত, খণ্ড ৮, পৃ. ৮৩)।

১১. (الا ان تطوع) হাদীসের এ অংশটুকু দ্বারা ফকীহগণ দলীল পেশ করেন যে, নামায রোযা বা কোন আমল শুরু করলে তাপূর্ণ করা ওয়াজিব। (ইমাম নববী, শারহু মুসলিম, আসাহহুল মাতবি', ভারত, কিতাবুল ঈমান, খণ্ড ১, পৃ. ৩০)

www.pathagar.com

হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এলোমেলো চুলে নজদবাসী একলোক আসল, আমরা তার কথার গুঞ্জরন শুনছিলাম, তবে বুঝতে পারছিলাম না, লোকটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসল। তখন সে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করল, তার উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, লোকটি বলল, আমার উপর কি এ ছাড়া অন্য কিছু আবশ্যক ? নবী (সা) বললেন, না। তবে নফল নামায। (মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, আসসহীহ লি মুসলিম, আসাহহুল মাতাবি, ভারত, কিতাবুল ঈমান, খণ্ড ১, পৃ. ৩০)

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ব্যতীত সকল নামায নফল অর্থাৎ ওয়াজিব নয়। তাঁদের মতে ঈদের নামায সম্পর্কে হাদীসে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে ঈদের নামায ওয়াজিব হবে না। তবে হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈদের নামায ওয়াজিব হওয়ার সাথে উক্ত হাদীসের কোন সংঘাত নেই।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে উল্লিখিত লোকটি গ্রামীণ ছিল, গ্রামীণ মানুষের উপর ঈদের নামায ওয়াজিব নয়।

সুতরাং ঈদের নামায এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়। উল্লিখিত হাদীসে দৈনিক নামাযের কথা বলা হয়েছে, ঈদের নামায বার্ষিক, সুতরাং ঈদের নামায বিষয়ে এ হাদীস প্রযোজ্য নয়। ঈদের নামাযের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেক হাদীসে এত ব্যাপক আলোচনা হয়েছে যে, ফরযের পর্যায়ে পালনীয় মনে হয়। কেউ কেউ ঈদের নামায ফরযে কিফায়া বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে ফকীহগণ ফরযের পর্যায়ের অকাট্য দলীল অনুপস্থিত থাকায় ঈদের নামায ওয়াজিব বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যে সব ফকীহ ঈদের নামায সুন্নাতে মু'আক্কাদা বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, গুরুত্বের দিক থেকে তার সাথে ওয়াজিবের মৌলিক পার্থক্য নেই। তাঁদের মতে ফরয ও সুন্নাতের মাঝে ওয়াজিবের স্তর নেই, এ হিসেবে তাঁরা ওয়াজিবকেও সুন্নাত বলে অভিহিত করেন।

ঈদের নামাযে তাকবীর ছয়টি

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর রয়েছে। এ বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে কারো দ্বিমত নেই। তবে অতিরিক্ত তাকবীর কয়টি ? এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ফকীহগণের মধ্যে থেকে কেউ বলেন, প্রথম রাক'আতে ছয় তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর, কেউ বলেন, প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর। কেউ প্রথম রাক'আতে তিন তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে তিন তাকবীরের কথা বলেন। এ ছাড়া এ বিষয়ে আরো মতামত রয়েছে।[১২] উল্লেখযোগ্য মতামত তিনটি। ১১ তাকবীর, ১২ তাকবীর ও ৬ তাকবীর।

১২. উল্লিখিত তিনটি অভিমত ছাড়া আরও সাতটি অভিমত রয়েছে। (১) প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর দ্বিতীয় রাক'আতে সাত তাকবীর (২) প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমার পর কিরা'আতর পূর্বে ছয় তাকবীর দ্বিতীয় রাক'আতে কিরা'আতের পর পাঁচ তাকবীর (৩) প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া চার তাকবীর দ্বিতীয় রাক'আতে চার তাকবীর (৪) প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর কিরা'আতের পূর্বে দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর কিরা'আতের পর (৫) ঈদুল ফিতরে প্রথম রাক'আতে ছয় তাকবীর দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর। ঈদুল আযহার প্রথম রাক'আতে তিন তাকবীর, দ্বিতীয় রাক'আতে দুই তাকবীর (৬) ঈদুল ফিতরে এগার তাকবীর ঈদুল আযহায় নয় তাকবীর (৭)) প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর কিরা'আতের পর, দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর কিরা'আতের পর, (শায়খ খলীল আহমদ সাহারানপুরী, বাযলুল মাজহুদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরূত, খণ্ড ৬, পৃ. ১৮৩

www.pathagar.com

এ বিষয়ে হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈদের নামাযের তাকবীর ছয়টি। হাদীসমূহ ঃ

اَخْبَرَنِى اَبُوْ عَائِشَةَ جَلِيْسٌ لاَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ اَبَا مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِىْ الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى كَانَ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا تَكْبِيْرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُزَيْفَةُ صَدَقَ . رواه أبو داؤد ، ج : ١ ص : ١٦٣

فيه أبو عائشة قال فى تهذيب قال ابن حزم وابن القطان مجهول (بذل المجهود ج : ٦ ص : ١٩٠) قال الحافظ فى تهذيب التهذيب رواعنه مكحول وخالد بن معدان وكذا قال فى الخلاصة فارتفعت الجهالة برواية اثنين عن (بذل ٦-١٩٢)

আবূ আয়েশা (হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাথী) বলেন, সাঈদ ইবনে আস হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) ও হযরত হুযায়ফা ইবন ইয়ামান (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের তাকবীর কিভাবে বলতেন ? আবূ মূসা (রা) বললেন, তিনি চার তাকবীর বলতেন, জানাযার নামাযের তাকবীরের মত। হুযায়ফা (রা) বললেন, আবূ মূসা সঠিক বলেছেন। (আবূ দাঊদ, খণ্ড ১, পৃ. ১৬৩)

উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দুই ঈদের নামাযের তাকবীর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলোর মধ্যে চার তাকবীর জানাযার তাকবীরের মত, প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমাসহ চার তাকবীর, অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর দ্বিতীয় রাক'আতে রুকুর তাকবীরসহ চার তাকবীর, অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি যা প্রমাণ করে ঈদের নামাযে তাকবীর ছয়টি, এর সমর্থনে আরো অনেক হাদীস রয়েছে। যেমন ঃ

اِنَّ الْقَاسِمَ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا وَّاَرْبَعًا ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ حِيْنَ اَنْصَرَفَ فَقَالَ لاَ تَنْسَوْا تَكْبِيْرَ الْجَنَائِزِ وَاَشَارَ بِاَصَابِعِهٖ وَقَبَضَ اِبْهَامَهُ

أخرجه الطحاوى وقال حسن الاسناد * إعلاء والسنن ج : ٨، ص : ١٠٣

* وابن يوسف وابن حمزة واوضين والقاسم كلهم اهل رواية معروفون بصحة الرواية اورده فى كتاب الزيادات .

আবূ আব্দুর রহমান কাসেম বলেন, আমাকে নবী (সা)-এর জনৈক সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে নিয়ে নবী করীম (সা) ঈদের দিন নামায পড়লেন এবং

www.pathagar.com

চারটি করে তাকবীর বললেন। এরপর তিনি আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন, অতএর বললেন। তোমরা ভুলে যেও না,[১৩] জানাযার তাকবীরের মত এবং তিনি বৃদ্ধাংগুলি বন্ধ করে বাকী আংগুলগুলো দিয়ে ইশারা করে দেখালেন। (আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, আবওয়াবুল ঈদাইন, বাবু কাইফিয়াতি সালাতিল ঈদাইন, খণ্ড ৮, পৃ. ১০৩)

উক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি।

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالاَسْوَدِ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْعِيْدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا اَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَائَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ وَفِى الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ فَاذَا فَرَغَ كَبَّرَ اَرْبَعًا ثُمَّ رَكَعَ . رواه عبد الرزاق فى مصنف ج : ٣ ، ص ٢٩٣ من مشورات المجلس العلمى للشيخ حبيب الرحمن الاعظمى، واسناده صحيح ، اعلاء السنن . ج : ٨ ، ص : ١٠٦

আলকামা ও আসওয়াদ থেকে বর্ণিত, ইবনে মাসঊদ (র) দুই ঈদের নামাযে নয় তাকবীর বলতেন, চার তাকবীর কিরা'আতের পূর্বে। এরপর তাকবীর বলে রুকূতে যেতেন, দ্বিতীয় রাক'আতে কিরা'আত শেষ করে চারটি তাকবীর বলতেন এবং রুকূতে যেতেন। (ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৮, পৃ. ১০৬)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ التَّكْبِيْرُ فِىْ الْعِيْدِ اَرْبَعًا كَالصَّلٰوةِ عَلَى الْمَيِّتِ .
رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات (مجمع الزوائر) اعلاء السنن . ج : ٨ ، ص : ١٠٦

হযরত আব্দুল্লাহ[১৪] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈদের নামাযের তাকবীর চারটি জানাযার নামাযের মত। (প্রাগুক্ত, ই'লাউস সুনান, খণ্ড ৮, পৃ. ১০৬।

উল্লিখিত হাদীস দু'টি হযরত ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। একটিতে তাঁর আমলের বর্ণনা, অপরটিতে তাঁর বক্তব্য (قول) এর বর্ণনা। এ ছাড়াও হযরত ইবন মাসঊদ (রা) থেকে ঈদের নামাযের তাকবীর সম্পর্কে আরও হাদীস রয়েছে। ঈদের নামাযের তাকবীরের সংখ্যা ও পদ্ধতি সম্পর্কে তার সকল হাদীসের বক্তব্য এক। অর্থাৎ প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমার পর কিরা'আতের পূর্বে তিনটি তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে কিরা'আতের পর তিনটি তাকবীর। দুই কিরা'আতের মাঝে কোন অতিরিক্ত তাকবীর নেই। যে সকল ফকীহ ঈদের নামাযে তাকবীর ছয়টি বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তারা হযরত ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فَاجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ عَلٰى اَنْ يَّجْعَلُوْا اَمْرَهُمْ عَلٰى اَنَّ يَّجْعَلُوْا التَّكْبِيْرَ عَلَى الْجَنَائِزِ مِثْلَ التَّكْبِيْرِ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ اَرْبَعُ تَكْبِيْرَاتٍ

১৩. উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদের নামাযে আমল করে দেখিয়েছেন, মৌখিক বলেছেন, জানাযার তাকবীরের মত বলে উদাহরণ দিয়েছেন। হাতের চার আংগুল দিয়ে ইশারা করে বুঝিয়েছেন, যা ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি বলে প্রমাণ করে।

১৪. আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ, প্রাগুক্ত, ই'লাউস সুনান খণ্ড ৮, পৃ. ১০৬।

www.pathagar.com

فَاَجْمَعَ اَمْرَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ . شرح معانى الاثار باب التكبير على الجنائز كم هو ، ج : ١ ، ص : ٢٨٦

হযরত ইব্‌রাহীম থেকে বর্ণিত (দীর্ঘ হাদীসের শেষ অংশ) (সাহাবীগণ) এক মত হলেন যে, জানাযার নামাযের তাকবীর ঈদুল ফিতরের নামাযের তাকবীরের মত চার তাকবীর। উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, জানাযার নামাযের চার তাকবীরের বিষয়ে সাহাবীগণের ঐকমত্য হওয়ার পূর্বেই ঈদের নামাযের চার তারকবীরের বিষয়ে তাঁদের ঐকমত্য ছিল। ঈদের নামাযের চার তাকবীরের ব্যাখ্যা বিভিন্ন হাদীসে করা হয়েছে। প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমার পর অতিরিক্ত তিন তাকবীর। দ্বিতীয় রাক'আতে রুকূর তাকবীরের পূর্বে অতিরিক্ত তিন তাকবীর। সুতরাং সাহাবীগণের ঐক্যমত (اجماع) একথা প্রমাণ করে যে, ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি। ঈদের নামাযের তাকবীর সম্পর্কে এর বিপরীতে কিছু হাদীসও রয়েছে। নিম্নে এগুলো উল্লেখ করা হল ঃ

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَبَّرَ فِى الْعِيْدَيْنِ فِى الْاُوْلٰى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَائَةِ وَفِى الْاٰخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَائَةِ .

رواه الترمذى كتاب العيدين ، باب التكبير فى العيدين ج : ١ ، ص : ١١٩ فيه كثير بن عبد الله قال الشافعى ذاك احدا الكذابين اواحد اركان الكذب عن ابن معين ليس بشئ قال النسائى والدار قطنى متروك الحديث

[১৫]কাসীর ইবন আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে, তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) দুই ঈদের নামাযে প্রথম রাক'আতে কিরা'আতের পূর্বে এবং দ্বিতীয় রাক'আতে কিরা'আতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর বলেছেন। (তিরমিযী, কিতাবুল ঈদাইন, বাবুত তাকবীর ফিলঈ দাইন, খণ্ড ১, পৃ. ১৯৯ মাকতাবা রশীদিয়া দিল্লী)

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى فِى الْاُوْلٰى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ وَفِى الثَّانِيَةِ خَمْسًا . رواه أبو داؤد كتاب العيدين باب التكبير فى العيدين ج : ١ ، ص : ١٦٣ وفيه ابن لهيعة قال الشوكانى وفى اسناده ابن لهيعة وهو ضعيف بذل المجهود ج : ١ ، ص ١٨٥ ، مداد هذا الحديث ابن لهيعة وقد ضعفه جماعة بذل المجهود ج : ٦ ، ص ١٨٦

১৫. ইমাম তিরমিযী (র) কাসীর ইবন আব্দুল্লাহর এ হাদীসকে হাসান হাদীসের মধ্যে (তাকবীরের বিষয়ে) বেশী গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কাসীর ইবন আব্দুল্লাহ দুর্বল (ضعيف । রাবী) একারণে মুহাদ্দিসগণ ইমাম তিরমিযী (র)-এর এ অভিমতকে গ্রহণ করেননি (দ্র. প্রাগুক্ত, ই'লাউস সুনান, খণ্ড ৮, পৃ. ১০৭)

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযে প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর বলতেন।[১৬] (আবূ দাঊদ, খণ্ড ১, পৃ. ১৬৩)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّكْبِيْرُ فِى الْفِطْرِ سَبْعٌ فِى الْاُوْلٰى خَمْسٌ فِى الْاٰخِرَةِ وَالْقِرَائَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا . (أبو داؤد ، ج : ١ ، ص ١٦٣)

[১৭]হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল 'আস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেন, ঈদুল ফিতরের তাকবীর প্রথম রাক'আতে সাতটি দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচটি উভয় রাক'আতে কিরা'আত তাকবীরের পর। (আবূ দাঊদ, খণ্ড ১, পৃ. ১৬৩) যে সকল ফকীহগণ ঈদের নামাযে তাকবীর বারটি এবং এগারটি বলেন, উল্লেখিত হাদীসমমূহকে তাঁরা দলীল হিসেবে পেশ করেন, যে সকল ফকীহগণ বার তাকবীরের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমাকে সাত তাকবীরের বাইরে গণ্য করেছেন। এগার তাকবীরে অভিমত ব্যক্ত কারীগণ প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমাকে সাত তাকবীরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু এসব হাদীসে এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। এগার ও বার তাকবীরের স্বপক্ষে অনেকে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তাকবীরকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। ঈদের নামাযের তাকবীর সম্পর্কে হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা কয়েক ধরনের রয়েছে। আব্দুল মালেক ইবন আবু সুলায়মানের এক বর্ণনা অনুযায়ী তের তাকবীর, প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর, দ্বিতীয় রাক'আতে ছয় তাকবীর, বায়হাকী আব্দুল মালিক আবু সুলায়মানের বর্ণনায় বার তাকবীর বলেছেন, ইকরিমা থেকে এক বর্ণনায় হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর ঈদের নামাযের তাকবীর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি বলেন, নয় তাকবীর বলবে, অথবা এগার তাকবীর অথবা তের তাকবীর। (বাযলুল মাজহুদ, খণ্ড ৬, পৃ. ১৮৮) ইবন হযম হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর তাকবীর আব্দুল্লাহ ইবন হারিস থেকেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত ইবন আব্বাস (রা) ঈদের দিন প্রথম রাক'আতে চার তাকবীর বলেছেন, এরপর কিরা'আত পড়েছেন ও রুকূ (সিজদা) করে দাঁড়িয়েছেন। এরপর কিরা'আত পাঠ করে তিনটি তাকবীর বলেছেন রুকূর তাকবীর ব্যতীত।[১৮] (বাযলুল মাজহুদ, খণ্ড ৬, পৃ. ১৮৮) হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর তাকবীরের এ বর্ণনাটি বিস্তারিত ও হযরত ইবনে মাসঊদ (রা)-এর বর্ণনার সাথে এর মিল রয়েছে। হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা যেহেতু একই ধরনের পাওয়া যায়নি তাই তাঁর

---

১৬. ইমাম তিরমিযী (র) কিতাবুল ইলালে উল্লেখ করেন যে, ইমাম বুখারী (র) এ হাদীসকে যাঈফ বলেছেন, প্রাগুক্ত বাযলুল মাজহুদ, খণ্ড, ৬, পৃ. ১৮৫।

১৭. উক্ত হাদীস আমর ইবন শুয়াইব বর্ণিত। আমর ইবন শু'আইব এর বর্ণনায় (اضطراب) আছে। বায়হাকী এর বর্ণনা দিয়েছেন। এ ছাড়া উক্ত হাদীসে বিতর্কিত বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান তায়েফী সম্পর্কে আবূ হাতিম ও নাসাই বলেন, পূর্ণ বিশ্বস্ত নয়। ইবনে জাওযী তায়েফীকে যয়ীফ (ضعيف) বলেছেন। প্রাগুক্ত, বাযলুল মাজহুদ, খণ্ড ৬, পৃ. ১৮৬।

১৮. হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে আরেকটি বর্ণনা যা হযরত ইবন মাসঊদ (রা)-এর বর্ণনার সাথে মিল রয়েছে। (বাযলুল মাজহুদে (খণ্ড ৬, পৃ. ১৮৮) বর্ণনা করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবন তারিফ থেকে বর্ণিত যে, হযরত ইবন আব্বাস (রা) আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়েন। তিনি নয় তাকবীর বলেন, প্রথম রাক'আতে পাঁচ তাকবীর, দ্বিতীয় রাক'আতে চার তাকবীর। দুই রাক'আতের কিরা'আত মিলিয়ে পড়েন। মাঝে কোন কিরা'আত পড়েননি।

www.pathagar.com

থেকে বর্ণিত তাকবীরসমূহ এগার তাকবীর, ওবার তাকবীরের মতামত এর জন্য মজবুত দলীল বলে প্রমাণিত হয় না।

শায়খ খলীল আহমদ (র) সাহারানপুরী বাযলুল মাজহূদে উল্লেখ করেছেন যে, ইবন রুশদ বলেন, (তাকবীরের) এ মাস'আলায় সকল ফকীহ সাহাবীগণের বক্তব্য-কে গ্রহণ করেছেন। কেননা এ বিষয়ে কোন হাদীস নবী (সা) থেকে সঠিকভাবে প্রমাণিত[১৯] নয়। তাই যে সকল ফকীহ ঈদের নামাযে তাকবীর ছয়টি বলেন তাঁরা হযরত ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত তাকবীরকে দালিলিক মূল ভিত্তি বলে গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবন মাসঊদ (রা)-র ঈদের নামাযের তাকবীর সম্পর্কে বর্ণনা সমূহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা গ্রহণযোগ্য বলে বুঝা যায়। কারণ হযরত ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত তাকবীরের বর্ণনাসমূহে তাকবীরের সংখ্যা ও পদ্ধতি এক অর্থাৎ সকল বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম রাক'আতে অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি এবং দ্বিতীয় রাক'আতে অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি, অর্থাৎ ঈদের নামাযে তাকবীর ছয়টি, তাকবীর রচনার পদ্ধতি হচ্ছে প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমার পর কিরা'আতের পূর্বে তাকবীর বলবে, দ্বিতীয় রাক'আতে রুকূর পূর্বে কিরা'আতে পর তাকবীর বলবে। দুই কিরা'আতের মাঝখানে কোন তাকবীর নেই। যে সকল ফকীহ ছয় তাকবীরের অভিমত গ্রহণ করেছেন তারা ইবন মাসঊদ (রা)-এর তাকবীর বলার পদ্ধতিকেও গ্রহণ করেছেন।[২০]

হযরত ইবন মাসঊদ (রা)-এর তাকবীরের বর্ণনাতে ছয়টি তাকবীরের কথা বলা হয়েছে। এ ব্যপারে কারো দ্বিমত নেই–এর চেয়ে বেশী তাকবীরের বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে, যেহেতু সাধারণ নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর নেই, তাই যা কম ও বিতর্কিত নয় তা গ্রহণযোগ্য হবে। সাহাবীগণের অনেকে এমত পোষণ করেছেন। যেমন আবূ মূসা আশ'আরী (রা), হুযায়ফা (রা), ইবন আব্বাস (রা) আবূ মাসঊদ বদরী (রা), আবূ হুরায়রা (রা), আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বারা ইবন আযিব (রা) ও উকবা ইবন আমির (রা)। তাহাবী শরীফে উল্লিখিত জানাযার তাকবীর বিষয়ক হাদীস অনুযায়ী হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত আমলে সাহাবীগণ একমত (اجماع) প্রকাশ করেন যে, জানাযার তাকবীর ঈদের নামাযের তাকবীরের[২১] মত চার তাকবীর। যাদ্বারা প্রতি রাক'আতে অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি প্রমাণিত হয়। সুতরাং ঈদের নামাযের তাকবীর বিষয়ক হাদীসসমূহ পর্যালোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈদের নামাযে তাকবীর ছয়টি।

সালাতুল ইস্‌তিসকা

ইসতিসকা (استسقاء) আরবী শব্দ ঃ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পানি বা পানীয় চাওয়া, ইসলামী শরী'আতে খরা বা দুর্ভিক্ষের সময় আল্লাহ্‌র কাছে বৃষ্টির জন্য দু'আ করা, ফকীহগণ

---

১৯. ইবনুল জাওযীর তাহকীক অনুযায়ী ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) বলেন, ঈদের নামাযের তাকবীর সম্পর্কে নবী (সা) থেকে কোন সহীহ হাদীস প্রমাণিত হয়নি (প্রাগুক্ত, বাযলুল মাজহূদ, খণ্ড ৬, পৃ. ১৮৭)।

২০. অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে দুই রাক'আতের কিরা'আতের কিরাআত মিলিয়ে পড়া-মাঝখানে তাকবীর না বলা একথা (موالاة) প্রধান্য লাভ করে, তাকবীর অর্থ আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করা প্রশংসা করা। এ জাতীয় বিষয় প্রথম রাক'আত কিরা'আতের পূর্বে ও দ্বিতীয় রাক'আতে কিরা'আতের পরে থাকে। যেমন সানা পাঠ করা দু'আ কুনুত পড়া। শায়খ হাদীস জাকারিয়া, আওন্যামুল মামালিক, দারুল ফিকর বৈরূত, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৫৫।

২১. ইমাম আযম আবূ হানীফা ও মালিক (রা)-এর মতে ঈদের নামাযের তাকবীর ভুলবশত ছুটে গেলে সাহু সিজদা দিবে (বড় জামা'আতে সাহু সিজদা দিতে হয় না।) হানাফীগণের ফিকহের আলোচনায় ঈদের নামাযের তাকবীরকে ওয়াজিব বলা হয়েছে। প্রাগুক্ত, আউজাযুল মাসালিক, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৫৬।

www.pathagar.com

বলেন, দুর্ভিক্ষ বা খরাকালীন সময় দু'আ করা সুন্নাত। এ বিষয়ে সকলে একমত। তাদের মধ্যে কেউ নামাযের মাধ্যমে দু'আ করার কথা বলেন, কেউ দু'আকে ইসতিসকার মুল আমল বলেন। এর দলীল হিসেবে সূরা নূহ এর ১০ ও ১১ নং আয়াত (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ مِدْرَارًا) (আমি বললাম, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো মহাক্ষমাশীল, তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন,)-কে পেশ করেন, এ অভিমত অনুযায়ী নামায পড়া ইস্তিসকার জন্য জায়িয। তবে ইস্তিসকার মূল বিষয় হচ্ছে দু'আ-যা উল্লিখিত আয়াত প্রমাণ করে, আল্লাহ্ পাক ক্ষমতা চাওয়ার ভিত্তিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত এর অঙ্গীকার করেছেন। সুতরাং যেভাবে দু'আ করলে আল্লাহ কবুল করবেন বলে তিনি পথ নির্দেশনা দিয়েছেন সেভাবে আমাদের দু'আ করতে হবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, দু'আর মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে বৃষ্টি চাওয়া সুন্নাত। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আর মাধ্যমে আল্লাহ কাছে বৃষ্টি চেয়েছেন। যেমন ঃ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهٗ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِىْ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمْعَةِ اِلَى الْجُمْعَةِ . رواه مالك فى المؤطا (ما جاء فى الاستسقاء) ج : ١ ، ص ٦٧ فيصل فبليكيشن

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত।[২২] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে একটি লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! (দুর্ভিক্ষে) জীবজন্তু মরে যাচ্ছে, সকল পথ বন্ধ[২৩] হয়ে আসছে। আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আ করলেন। অতঃপর এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ পর্যন্ত আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ হল। উক্ত হাদীসে দু'আ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ্র কাছে বৃষ্টি চেয়েছেন, যেহেতু কুরআন শরীফে ক্ষমা চাওয়া (দু'আ) দ্বারা বৃষ্টি পাতের অঙ্গীকার আছে এবং রাসূল (সা) দু'আ দ্বারা বৃষ্টি চেয়েছেন, সুতরাং দু'আর মাধ্যমে বৃষ্ট চাওয়া সুন্নাত।

এ সম্পর্কে আরো হাদীস রয়েছে। যেমন ঃ

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اسْتَسْقَى قَالَ اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيْمَتَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ . رواه مالك فى المؤطا (ما جاء فى الاستسقاء) ص ٦٧

আমর ইবন শু'আইব থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বৃষ্টির জন্য দু'আ করতেন বলতেন, হে আল্লাহ, আপনার বান্দাদেরকে এবং আপনার সৃষ্ট প্রাণীদেরকে বৃষ্টিদান করুন। আপনার করুণা ছড়িয়ে দিন। আপনার মৃত শহর জীবিত করুন।

২২. বুখারী ও মুসলিমে ইসমাঈলের বর্ণনায় এ হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। যে, এক লোক জুমু'আর দিন মসজিদে প্রবেশ করল। হুজুর (সা) তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছেলেন—বুখারী খণ্ড ১, পৃ. ১৩৮। মুসলিম খণ্ড ১, পৃ. ২৯৩ আসাহ্হুল মাতাবি'।

২৩. খাদ্যাভাবে উট দুর্বল হওয়ার করণে, ফসল উৎপাদন না হওয়ায় মানুষের কাছে খাদ্য না থাকায় অথবা কম থাকায়, আওজাযুল মামালিক, খণ্ড ৪, পৃ. ৭৫।

www.pathagar.com

উক্ত হাদীসে রাসূল (সা) দু'আর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের কাছে বৃষ্টি চেয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, ইসতিসকার জন্য যে সকল ফকীহ নামাযের মাধ্যমে দু'আ করার কথা বলেন, তাদের সমর্থনেও হাদীস রয়েছে। যেমন ঃ

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِيْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ بِالْقِرَائَةِ فِيْهِمَا وَحَوَّلَ رِدَائَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ . رواه الترمذى . ج : ١ ، ص ١٢٤

আব্বাদ ইবন তামীম তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বৃষ্টির জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যে মানুষের সাথে বের হলেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে দু' রাক'আত নামায পড়লেন। উভয় রাক'আতে তিনি জোরে কিরা'আত পড়লেন, এবং তিনি তাঁর চাদর[২৪] উল্টালেন ও কিবলামুখী হয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। (তিরমিযী, খণ্ড ৬, পৃ. ১২৪)

উক্ত হাদীসে রাসূল (সা) ইসতিসকার নামায পড়েছেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ফকীহগণের মধ্য থেকে অনেকে ইসতিসকার নামাযকে সুন্নাত বলেন। উক্ত হাদীসে চাদর উল্টানোর কথা বলা হয়েছে। সুতরাং ইসতিসকার নামাযে চাদর উল্টানোকেও তাঁরা সুন্নাত বলেন। তবে চাদর শুধু ইমাম উল্টাবে নাকি মুকতাদীও উল্টাবে এ বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, শুধু ইমাম চাঁদর উল্টাবেন। কেননা হাদীসে কেবল রাসূলুল্লাহ্ (সা) চাদর উল্টিয়েছেন বলে উল্লেখ রয়েছে। কেউ বলেন, ইমাম মুকতাদী উভয়ই চাদর উল্টাবে। তাঁরা হযরত আহমদ (র)-এর মুস্নদে উল্লিখিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। (হাদীসের বক্তব্য) ثُمَّ تَحَوَّلَ اِلَى الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَائَهُ فَقَلَبَهُ ظَهْرَ الْبَطْنِ وَتَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ[২৫] অতঃপর তিনি কিবলামুখী হলেন এবং তার চাদর উল্টালেন অর্থাৎ চাদরে উপরিভাগ ভিতরে দিলেন অন্যান্য মানুষও তার সাথে চাদর উল্টাল। যে সকল ফকীহ শুধু ইমাম চাদর উল্টাবেন বলে অভিমত বক্তে করেন তাঁরা উক্ত হাদীস সম্পর্কে বলেন, হাদীসে (تحول الناس) বলা হয়েছে। এর অর্থ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কিবলার দিকে ঘুরলেন তখন অন্যান্য মানুষও তাঁর সাথে কিবলার দিকে ঘুরল। হুজুর (সা) চাদর উল্টালে সাহাবীগণের এ বিষয়ে অনুসরণ করা জরুরী নয়। কারণ সব বিষয়ে মুকতাদীর ইমামের অনুসরণ করতে হয় না।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে ইস্তিসকার নামাযকে ঈদের নামাযের মত বলা হয়েছে। এ কারণে কেউ কেউ ইস্তিসকার নামাযে ঈদের নামাযের মত তাকবীর বলার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অন্যান্য ফকীহগণ বলেন, ইস্তিসকার নামাযে ঈদের নামাযের মত তাক্বীর নেই। হাদীসে এ নামাযকে ঈদের নামাযের মত[২৬] বলা

---

২৪. চার কোনা বিশিষ্ট চাদর হলে নিচের দিককে উপরের দিকে উপরের দিককে নিচের দিকে উল্টাবে। গোলচাদর হলে ডান দিককে বাম দিককে বাম দিককে ডান দিকে উল্টাবে, (প্রাগুক্ত, বাযলুল মাজহুদ, খণ্ড ৬, পৃ. ২০৮।

২৫. কোন কোন বর্ণনায় (تحول)-এর স্থলে (حَوَّلَ) শব্দ বর্ণনা করা হয়েছে। এটা ভুল, সঠিক শব্দ (تَحَوَّلَ) (আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, ইদরাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ করাচি, খণ্ড ৮, পৃ. ১৫১।

২৬. বায়হাকীতে ইসতিসকার নামায সম্পর্কে একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, হুযূর (সা) ইসতিসকার নামাযে প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর, দ্বিতীয় রাকা'আতে পাঁচ তাকবীর বলেছেন। উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী মুহম্মাদ ইবন আব্দুল আজীজকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল (ضعيف) বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, মুনকারুল হাদীস, নাসাঈ বলেন, মাতরুকুল হাদীস। আবূ হাতিম বলেন, যাঈফুল হাদীস। প্রাগুক্ত ই'লাউস সুনান, খণ্ড ৮, পৃ. ১৫৫।

www.pathagar.com

হয়েছে এ কারণে যে এতে আযান ও ইকামাত, নেই এবং ঈদের নামাযের মত এখানে দুই রাক'আত নামায যেহরী কিরা'আতে ময়দানে পড়া হয়। এর স্বপক্ষে তাবারানীতে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। (ولم يكبر فيهما الا تكبيرة) ইসতিসকার দুই রাক'আত নামাযে কেবল এক তাকবীর বলা হয়েছে। (অর্থাৎ অতিরিক্ত তাকবীর নেই) ই'লাউস সুনান খণ্ড ৮, পৃ. ১৫৫।

সুতরাং ইসতিসকার নামাযে ঈদের নামাযের তাকবীরের মত তাকবীর নেই এ অভিমত প্রাধান্য লাভ করে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) সম্পর্কে অনেক মনে করেন যে তিনি ইসতিসকার নামাযের বিপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।প্রকৃতপক্ষে ইসতিসকার নামাযকে ইমাম আবূ হানীফা (র) জায়িয মনে করেন।তবে তিনি কুরআন হাদীসের তাহকীক অনুযায়ী দুর্ভিক্ষের কারণ ও তার প্রতিকারকে গুরুত্ব দিয়েছেন। হাদীসে বিভিন্ন গুনাহর কারণে খরা-দুর্ভিক্ষ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঃ কোন জাতি ওজনে কম দিলে দীর্ঘকাল খরা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়, মালের যাকাত না দিলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, গুনাহর কারণেই বিপদ আসে এবং তাওবা দ্বারা বিপদ দূর হয়। কুরআন শরীফে সূরা নূহতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের কাছে (গুনাহ সমূহের) ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করেন এবং (গুনাহর এর কারণে) যে বৃষ্টি বন্ধ ছিল তা তিনি বর্ষণ করবেন। হুযুর (সা) দুর্ভিক্ষ খরায় বৃষ্টির জন্য দু'আ করেছেন বলে বহু হাদীসে উল্লেখ আছে। যেহেতু গুনাহর কারণে বৃষ্টি বন্ধ হয় এবং তাওবা ইসতিগফার দ্বারা আল্লাহ পাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তাই হুজুর (সা) বৃষ্টির জন্য নামায না পড়ে কেবল দু'আ করেছেন এবং এতেই বৃষ্টি হয়েছে। তাই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার মূল কারণ গুনাহ থেকে ক্ষমা চেয়ে দু'আ করাকে ইসতিসকার মূল আমল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। হুজুর (সা) বৃষ্টির জন্য দু'আ করেছেন, যা অনেক হাদীসে উল্লেখ আছে। ইসতিসকার এ দু'আকে তিনি সুন্নাত বলেন। যেহেতু হাদীসে উল্লখ আছে যে, ইসতিসকার জন্য হুজূর (সা) নামায পড়েছেন। তাই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর নিকট ইসতিসকার নামায পড়া জায়িয। সুতরাং খরা-দুর্ভিক্ষ বৃষ্টি সম্পর্কে কুরআন শরীফের আয়াত হাদীসের তথ্য অনুযায়ী দু'আ করা ইসতিসকার সুন্নাত। কেউ কেউ বলেন, ইসতিকার বিষয়ে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত একক অভিমত। তাঁর এ অভিমতের সাথে কেউ একমত নন। কিন্তু তাহকীক দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ অভিমত তাঁর একার নয়। হযরত উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি ইসতিসকার উদ্যেশ্যে গমণ করেন। এবং তিনি জামা'আতের সাথে নামায আদায় করেননি। বরং মিম্বরে উঠে আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করেন। এর বেশী কিছু করেননি। লোকেরা বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন। আপনি ইসতিসকার নামায পড়লেন না। তিনি বললেন, আসমানের মেঘ রাশির জন্য দু'আ করেছি যা দ্বারা বৃষ্টি বর্ষিত হবে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন (استغفروا ربكم....)। হযরত আলী (রা) সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি ইসতিসকার দু'আ করেছেন অথচ নামায পড়েননি। ইবন আবু শায়বার বর্ণনায় বলা হয়। ইবরাহীম মুগীরা ইবন আব্দুল্লাহ সাকাফীর সাথে ইসতিসকায় গমন করলেন। ইবরাহীম মুগীরাকে নামায পড়তে দেখে তিনি চলে আসেন। সুতরাং অভিমত তাঁর একার নয় হযরত উমর (রা) হযরত আলী (র) ইবরাহীম প্রমুখ মনীষীগণও এর স্বপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

www.pathagar.com

সালাতুল ইস্‌তিস্‌কা আদায়ের নিয়ম

সালাতুল ইসতিসকা[১] আদায়ের নিয়ম অন্যান্য সালাতের মতই। জামা'আতের সাথে কিংবা একাকী, ঈদগাহে খোলা ময়দানে কিংবা মসজিদে বা ঘরে সর্বাবস্থায় সর্বস্থানে পড়া যাবে। গ্রামবাসী, শহরবাসী, আবাসী ও প্রবাসী সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য[১] এ সালাতটি নামায আদায়

১. ইসতিসকা (استسقاء)-এর আভিধানিক অর্থ হলো, বৃষ্টি প্রার্থনা করা, পরিতৃপ্তির দু'আ করা। শরী'আতের পরিভাষায়, ইসতিসকার সংজ্ঞা হলো দেশের দুর্ভিক্ষ, উষরতা, খরা পরিস্থিতি দূরীকরণ এবং মানুষ, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, শস্য-ফসলাদির প্রাণবন্ততা ও সজীবতা অর্জনের উদ্দেশ্যে শরী'আত নির্দেশিত বিশেষ পদ্ধতিতে মহান আল্লাহর দরবারে বৃষ্টির দু'আ করা। ইসতিসকা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত। হযরত নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় দুর্ভিক্ষ ও খরা পরিস্থিতির চরম শিকার হলে তিনি তাদেরকে ইসতিসকার উপদেশ প্রদান করেন। সে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই কালামে পাকে ইরশাদ হচ্ছে ঃ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ঃ "আমি বললাম, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি তো মহা ক্ষমাশীল... (সূরা নূহ ঃ ১০, ১১)

(আল্লামা ইউসুফ বিন্নোরী, মা'আরিফুস মুনান, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ সাহারানপুর, ভারত ঃ পরিচ্ছেদ ঃ সালাতুল ইসতিসকা, খণ্ড. ৪ পৃ. ৪৯১)

আল্লামা শামী রাদ্দুল মুহতারে বলেন, ইসতিসকার আভিধানিক অর্থ হলো বৃষ্টির দু'আ করা। পরিভাষায় ইসতিসকা বলা হয়,ভীষণ প্রয়োজনের মুহূর্তে–অর্থাৎ বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া, জীবজন্তুকে পানি পান করানো এবং ক্ষেত খামার পানি সেঁচের জন্য নদীনালা খালকূপ, পুকুর ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট নয় এরূপ অবস্থায় বিশেষ পদ্ধতিতে বৃষ্টির প্রার্থনা করা। মুহীত ঃ কুহুস্তানী। তালখীসুল হাবীরে (১/১৪৯) বলা হয়েছে, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ইসতিসকা করা যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত সালাতুল ইসতিসকা আদায় করতেন না।

(আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস মুনান, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামিয়া, করাচী, পাকিস্তান পরিচ্ছেদ, দু'আ এবং সালাতের মাধ্যমে ইসতিসকা, খণ্ড ৮, পৃ. ১৯১)

মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শারাফ নববী (৬৩১-৬৭৬) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে (১/২৯২) এবং কিতাবুল উম্ম-এর সূত্রে শারহুল মুহাযযাবে বলেন, ইসতিসাকা তিন প্রকার।

১. সালাতবিহীন শুধু দু'আর মাধ্যমে ইসতিসকা।
২. জুমু'আর খুৎবায় কিংবা অন্যান্য ফরয নামাযসমূহের পর ইসতিসাকার দু'আ করা।
৩. দু'রাকা'আত সালাত খুৎবাসহ আদায়ের মাধ্যমে ইসতিসকা করা।

তবে এর পূর্বপ্রস্তুতি স্বরূপ বেশী করে দান খায়রাত করা, রোযা রাখা, গীবত ও শেকায়াত বর্জন। সৎকাজ পালন এবং অসৎকাজ পরিহার করা উত্তম। শারহুল মুহাযযাবে বলা হয়েছে, প্রথমটি সর্বনিম্ন পর্যায়ের দ্বিতীয়টি মধ্যম আর তৃতীয়টি সর্বোত্তম। এটি গ্রামবাসী, শহরী, আবাসী, প্রবাসী সকলের জন্য সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। (আল্লামা বিন্নোরী, মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৯১)

ইসতিসাকার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃষ্টির জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করা। এটি দু'ভাবে হতে পারে। শুধু দু'আর মাধ্যমে, কিংবা সালাতের মাধ্যমে এর উভয়টি শরী'আত সম্মত এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত, কিন্তু এতদুভয়ের মাঝে প্রধান দিকটি হলো দু'আ করা। এ কারণে হানাফী ফকীহগণ বলেন, সালাতুল ইসতিসকা মুস্তাহাব পর্যায়ের। এটি সুন্নাতে মু'আক্কাদা নয়। (মা'আরিফুস সুনান, প্রাগুক্ত)। আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী ঃ বাদাইউস সানায়ি ঃ মাকতাবায়ে নাঈমিয়া দেওবন্দ, পরিচ্ছেদ, ইসতিসকা, খণ্ড ১, পৃ. ৬৩২।

সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ না হওয়ারে কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে সর্বমোট ছয়বার ইসতিসকার আমল করা হয়েছে। তন্মধ্যে শুধু একবার ইসতিসকার জন্য সালাত আদায় করেছেন ; বাকি সবগুলোতে শুধু দু'আর মাধ্যমেই ইসতিস্কা করেছেন।

বুখারী শরীফে (১/১৩৮) বর্ণিত রয়েছে, হযরত আনাস ইবন মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) জুমু'আর খুৎবা পাঠরত ছিলেন। এমতবস্থায় অনেক ব্যক্তি এসে বলতে লাগল, ইয়া

www.pathagar.com

করা জায়িয এরূপ যে কোন সময় পড়া যাবে। অবশ্য সূর্য উদিত হওয়ার পর সালাতুল ঈদ আদায়ের সময়ে আদায় করা মুস্তাহাব ও সুন্নাত।[৩]

সালাতুল ইসতিসকা দু'রাক'আত উচ্চেস্বরে কিরা'আতের মাধ্যমে আদায় করবে। অতঃপর মানুষের সম্মুখীন হয়ে খুৎবা পাঠ করবে। অবশ্য ইমাম মুহাম্মদের মতে এক খুৎবা আর ইমাম আবূ ইউসুফের মতে দুই খুতবা পাঠ করবে। খুৎবায় সাল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব, মাহাত্ম্য, প্রশংসা এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করবে এবং সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা

রাসূলাল্লাহ! বৃষ্টি বন্ধ, আমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে বৃষ্টির দু'আ করুন। অতঃপর তার দু'আয় বৃষ্টি শুরু হল। এভাবে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টি হতে লাগল। অতঃপর সে কিংবা অন্য কেউ বলে উঠল ইয়া রাসূলাল্লাহ! দু'আ করুন, আল্লাহ যেন এ বৃষ্টি আমাদের উপর থেকে সরিয়ে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের উপর নয়, আমাদের আশেপাশে। রাবী বলেন, কি আশ্চার্য! তখন দেখতে পেলাম মেঘমালা ডানে-বামে কেটে গিয়ে আশেপাশের বসতীতে বৃষ্টিপাত হচ্ছে কিন্তু মদীনাবাসীদের উপর হচ্ছেনা। (আবু আবদুল্লাহ ইসমাঈল বুখারী, সহীহ বুখারী। রশীদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, পরিচ্ছেদ, মিম্বারে দাড়িয়ে ইসতিসকার বর্ণনা প্রসঙ্গে, খ. ১, পৃ. ১৩৮)
অনুরূপ হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে প্রায় অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট জনৈক বেদুইন এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন এক সম্প্রদায় থেকে এসেছি (দু'র্ভিক্ষ ও পানি শূণ্যতার দরুন) যাদের গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে এখন আর রাখাল নেই যে তাদের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে আনবে। দানা-পানি নাথাকায় তাদের উট জীর্ণশীর্ণতার দরুন লেজটিও নাড়াচাড়া করতে সক্ষম নয়। অতঃপর তিনি মিম্বারে উঠে আল্লার প্রশংসা করে এ দু'আ পড়লেন, اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا طَبْقًا غَدَقًا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ হে আল্লাহ! আমাদের এরূপ বৃষ্টি দান করুন যা আমাদের জন্য সাহায্যকারী, পরিতৃপ্তকারী, প্রবল ও সর্বব্যাপী এবং শস্য ফসলাদি তৃণলতাকে সজীবকারীরূপে বিবেচিত হবে। এবং তা অতি শীঘ্রই বর্ষিত হবে। এরপর বৃষ্টি হতে লাগল। যেই তাঁর নিকট এসেছে একথা বলেছে, আমরা বৃষ্টিতে সিক্ত হয়েছি। (ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মাজাহ, সুনান ইবন মাজাহ, মমাকতাবায়ে রশীদিয়া দিল্লী। পরিচ্ছেদ, ইসতিসকার দু'আ, খণ্ড. ১, পৃ. ৯১)
উপরোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে ইসতিসকার মূল পদ্ধতি হলো আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে অপারগতা অক্ষমতা প্রকাশ করে বিনয়ের সাথে বৃষ্টির প্রার্থনা করা। হযরত উমর (রা)। এর আমল দ্বারা বিষয়টি আরো সুদৃঢ় হয়। শা'বী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা হযরত উমর (রা) ইসতিসাকার উদ্দেশ্যে বের হলেন, তাতে শুধু ইস্তিগফার (আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা) করেছেন। লোকেরা বলল, আমরা তো আপনাকে ইসতিসকা করতে দেখিনি। বললেন, যে সকল তারকার মাধ্যমে সাধারণত বৃষ্টিপাত হয় আমি সেগুলোর দ্বারা বৃষ্টি চেয়েছি অতঃপর এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও অতঃপর তার নিকট তাওবা কর। (আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী ঃ ই'লাতিস্ সুনান ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামিয়া ঃ করাচী, পাকিস্তানঃ পরিচ্ছেদ ঃ সালাত ও দু'আর মাধ্যমে ইসতিসকা, খণ্ড ৮, পৃ. ১৮২ হাদীস নং ২১৭০)
হযরত উমর (রা) এখানে ইস্তিগফারকে বৃষ্টির তারকার সাথে উপমা দিয়েছেন এমর্মে যে, যেমনি বৃষ্টির তারকার মাধ্যমে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে তেমনি ইস্তিগফারের মাধ্যমে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। অর্থাৎ ইসতিসকার জন্য ইস্তিগফার ও দু'আই যথেষ্ট।

২ আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী, মা'আরিফুস সুনান মাকতাবায়ে দেওন্দ, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৯২, পরিচ্ছেদ সালাতুল ইসতিসকা

৩. (ক) আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৮, পৃ. ১৮৩ (সূত্র ফাতওয়া আলামগীরা, খণ্ড ১, পৃ. ৯৮)
(খ) আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী, বাদাইউস সানায়ি, মাকতাবায়ে নু'মানিয়া, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত, অধ্যায় : সালাত পরিচ্ছেদ : ইসতিসকা, খণ্ড ১, পৃ. ৬৩৪।

www.pathagar.com

প্রার্থনা করবে। খুতবার কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর স্বীয় পরিধানের কাপড় (চাদর, কুর্তা ইত্যাদি) উল্টে দিবে। চাদর হলে ডান কাঁধের অংশ বাম কাঁধে আর বাম কাঁধের অংশ ডান কাঁধে এবং উপরের অংশ নিচে আর নিচের অংশ উপরে কারে দিবে। কুর্তা বা আলখিল্লা হলে উপরের দিকে ভিতরে আর ভিতরের দিক উপরে করে পরিধান করবে খুতবা শেষ করে মানুষের দিকে পিঠ করে কিবলামুখী হয়ে যাবে। অতঃপর দাঁড়ানো অবস্থায় ইসতিসকার দু'আয় নিমগ্ন হয়ে পড়বে। মুসল্লীগণ সকলেই দু'আ এবং খুতবা সর্বাবস্থায় কিবলামুখী হয়ে থাকবে ইসতিসকায় দু'হাত উত্তোলন করে দু'আ করবে।

এটি হলো, হানাফী মাযহাব মোতাবিক সালাতুল ইসতিসকা আদায়ের যথাযথ নিয়ম। অবশ্য এ ক্ষেত্রে দু'আ ও খুতবা সালাতের আগেও করা যেতে পারে অথবা পরেও হতে পারে। চাদর উল্টানো খুতবার শুরুতে মাঝে ও শেষে এমনকি দু'আর মাঝেও করার অবকাশ রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : شَكَى النَّاسُ إِلٰى رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ قَحُوْطَ الْمَطَرِ فَامَرَ مِنْبَرَ فَوضَعَ لَهُ فِى الْمُصَلّٰى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُوْنَ فِيْهِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قَالَ انَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِنْخَارَ الْمَطَرَ عَنْ إِبَانَ زَمَانِهِ عَنْكُمْ ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ تَدْعُوْهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰه لاَ الٰهَ الاَّ اَنْتَ اَنْتَ الْغَنِىُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءِ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا إِلٰى حِيْنَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ فِىْ الرَّفْعِ حَتّٰى بَدَا بَيَاضُ ابْطَيْهُ ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَّبَ اَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعِ يَدَيْهِ . ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلّٰى رَكَعَتَيْنِ فَاَنْشَا اللّٰهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ اَمْطَرَتْ بِاذْنِ اللّٰهِ فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدِهِ حَتّٰى سَالَتْ السُّيُوْلُ فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِ ضَحِكَ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنِّى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ .

www.pathagar.com

قال أبو داؤد (١/٤٥٥) هذا حديث غريب اسناده جيد اهـ وقال النووى فى الاذكار : اسناد صحيح : ورواه أبو عوانة فى صحيحه وصححه أيضًا أبو على بن السكن التلخيص الحبير ١/١٤٩ وفى الدراية صححه ابن حبان والحاكم .

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অনাবৃষ্টির অভিযোগ পেশ করল। তাঁর নির্দেশক্রমে একটি মিম্বার তৈরী করে ঈদগাহে (নামায প্রাঙ্গনে) রাখা হলো লোকদের নির্দিষ্ট একদিন সেখানে উপস্থিত হওয়ার ওয়াদা দিলেন। আয়েশা বলেন, সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা) সূর্যের কিনারা প্রকাশ পাওয়া মাত্রই ঘর থেকে বের হয়ে যান এবং মিম্বারে বসে আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনা ও প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা আমার নিকট তোমাদের দেশের দুর্ভিক্ষ ও খরা এবং বহু দিন ধরে অনাবৃষ্টির-অভিযোগ করেছেন । অথচ মহান আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিকট প্রার্থনার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি ঐ প্রার্থনা কবুল করার অঙ্গিকারও করেছেন। অতঃপর বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহরই যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু এবং কর্মফল দিবসের মালিক। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। হে আল্লাহ! আপনিই একমাত্র আল্লাহ। আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আপনি অভাবমুক্ত আর আমরা সব অভাবী-(আপনার মুখাপেক্ষী)। অতএব আমাদের বৃষ্টি দিন। আপনি যা বর্ষণ করবেন তা আমাদের শক্তির কারণ এবং দীর্ঘ সময়ের পাথেয় স্বরূপ করে দিন।

অতঃপর নবী করীম (সা) স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করে দীর্ঘক্ষণ উঠিয়ে রাখলেন। এমনকি এতে তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা প্রকাশ পেল। এরপর লোকদের দিকে পেছনে রেখে দাঁড়িয়ে নিজের পরিহিত চাদরখানি উল্টে দিলেন কিংবা ঘুরিয়ে দিলেন তখনও তিনি স্বীয় হস্তদয় উত্তোলন করে রেখেছিলেন। অতঃপর লোকদের অভিমুখী হয়ে মিম্বার থেকে অবতরণ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় কররেন। সালাত শেষ হওয়ার পর আল্লাহর কুদরতে একটি মেঘখণ্ড সৃষ্টি হয়ে তা গর্জন করতে ও বিদ্যুত চমকাতে লাগল এবং আল্লার হুকুমে তা বর্ষণ করতে লাগল। তিনি মসজিদে আসতে আসতে পানির স্রোতধারা প্রবাহিত হতে শুরু করল। লোকদের নিজ নিজ বাড়িতে দ্রুততার সাথে ছুটাছুটি দেখে তিনি হেঁসে দিলেন। এতে তাঁর মাড়ির দাঁতগুলোও স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চই আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আর আমি হলাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।[৪]

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِى قَالَ فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَه وَاسْتَقْبَلَ .... يَدْعُوْا ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَه ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ .

---

৪. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬, হাদীস নং ২১৭৬।

www.pathagar.com

رواه البخاری ١/ ١٤٠ وفی لفظ ١/ ١٤٠ له استسقی فصلی رکعتین وقلب رداءه

হযরত আব্বাস ইবন তামীম থেকে বর্ণিত। তার চাচা (রা) বলেন, যে দিন রাসূলুল্লাহ (সা) ইসতিসকার উদ্দেশ্যে নামায প্রাঙ্গনে (ঈদগাহে) গেলেন সেদিন দেখতে পেলাম যে, তিনি লোকদের দিকে স্বীয় পৃষ্ঠদেশ স্থাপন করে কেবলামুখী হয়ে প্রার্থনা করছেন! অতঃপর পরনের চাদরটি উল্টে দিলেন এরপর আমাদের নিয়ে দু রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তাতে কির'আত জোরে পড়েছেন।[৫] (বুখারী)

عَنْ هِشَامْ بْنِ اسْحَاقَ وَهُوَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَرْسَلَنِيْ الْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ وَهُوَ اَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَسْأَلُهُ اسْتِسْقَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُهُ فَقَالَ : انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مُبْتَدِلاً مُتَوَاضِعًا ، مُتَضَرِّعًا حَتّٰى اَتَى الْمُصَلّٰى فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهِ وَلٰكِنْ لَمْ يَزَلْ فِيْ الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيْرِ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّى فِيْ الْعِيْدِ . رواه الترمذی وقال حسن صحيح ، وفی نصب الراية ١/ ٧٣ رواه ايضًا ابن حبان فی صحيحه .

হিশাম ইবন ইসহাক –ইবন আব্দুল্লাহ ইবনে কিনানাহ–তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা মদীনার গভর্ণর ওয়ালীদ ইবন উকবা আমাকে হযরত ইবন আব্বাসের নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইসতিসকা সম্পর্কে জেনে আসার জন্য প্রেরণ করলেন। আমি তাঁর নিকট গেলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অতি সাধারণ পোষাক পরিধান করে বিনীতভাবে ও সকাতর প্রার্থনাকারীরূপে বের হয়ে ঈদগাহে হাজির হতেন। এরপর তিনি (মিম্বারে ওঠে) তোমাদের গতানুগতিক খুতবা পাঠ করতেন না বরং আল্লাহর মহিমা প্রকাশ পূর্বক মিনতির স্বরে দু'আয় নিমগ্ন থাকতেন। অতঃপর ঈদের ন্যায় দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন।"[৬] তিরমিযী ঃ ১/৭৩

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِيْ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلاَ اَذَانٍ وَاقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللّٰهُ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ ثُمَّ قَلَّبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ الاَيْمَنَ عَلَى الاَيْسَرِ وَالاَيْسَرَ عَلَى الأَيْمَنِ .

---

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩, হাদীস নং ২১৭৫।

৬ ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮-১৮৮৯, হাদীস নং ২১৭৭।

www.pathagar.com

(وهذه كيفية القلب قال به محمد فى مؤطاه) قال السندى : وفى الزوائد اسناده صحيح ، ورجاله ثقات : ١٩٨/١

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ইসতিসকার (বৃষ্টির দু'আ) উদ্দেশ্যে বের হলেন, অতঃপর আমাদের নিয়ে আযান ইকামত ছাড়া দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং এর পর আমাদের সামনে খুৎবা পেশ করলেন। এতে তিনি আল্লাহর নিকট বৃষ্টির দু'আ করলেন, এবং হাত উত্তোলন করে কিবলার দিকে মুখী হলেন। অতঃপর পরিধানের চাদরটি উল্টে দিলেন অর্থাৎ ডান কাঁধের অংশ বাম কাঁধে আর বাম কাঁধের অংশ ডান কাঁধে দিলেন।[৭] আল্লামা সিন্দী বলেন, এটির সনদ সহীহ। এবং এর সনদের সকল কারী সিকা (নির্ভরযোগ্য)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ وَصْفِ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِيْ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ وَصَلَّى بِاَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ قَرَأَ فِيْ الْأُوْلَى اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَالثَّانِيَةُ وَالضُّحَى ثُمَّ قَلَّبَ رِدَاءَهُ لِتَنْقَلِبَ السَّنَةَ ثُمَّ حَمِدَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ اللّٰهُمَّ ضَاحَتْ بِلَادُنَا . . . . .

হযরত ইবন আব্বাস (রা) নবী করীম (সা)-এর সালাতুল ইসতিসকার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, নবী করীম (সা) ইসতিসকার উদ্দেশ্যে বের হলেন। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীরের সাথে সাহাবীদের নিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন, কির'আত জোরে পড়েছেন। প্রথম রাক'আতে সূরা তাকবীর দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা দোহা। অতঃপর অবস্থা বিবর্তনের উদ্দেশ্যে স্বীয় পরিধানের চাদরটি উল্টে দিলেন। এরপর আল্লার প্রশাংসা ও গুণাবলী বর্ণনার পর স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করে এ দু'আ পড়লেন[৮].......।

কানযুল উম্মাল গ্রন্থকার বলেন, এ হাদীসের সনদের রাবী মনে সকলেই সিকা (নির্ভরযোগ্য)।

উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ের মাঝে সালাতুল ইসতিকার নিয়ম উল্লেখ রয়েছে। তাতে আগে সালাত অতঃপর খুতবা অতঃপর দু'আর কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রথমোক্ত হাদীসত্রয় থেকে প্রতিভাত হয়, আগে খুৎবা ও দু'আ অতঃপর সালাতের পালা আসবে। এজন্য হানাফী ফকীহগণ বলেন, সালাতুল ইসতিসকা সালাত, দু'আ ও খুতবার সমষ্টির নাম। হাদীসসমূহের এটি আদায়ের পদ্ধতি বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো বিশেষ কোন ধরন সুন্নাত নয়। বরং এতে আমলগুলো আগ পর করার অবকাশ রয়েছে। যেভাবেই আদায় করুক ইসতিসকা আদায়

৭. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

৮. আল্লামা তকী উসমানী, দরসে তিরমিযী, দারুল কিতাব দেওবন্দ, পরিচ্ছেদ, সালাতুল ইসতিসকা: খণ্ড, ২ পৃ. ৩৪০।

www.pathagar.com

হয়ে যাবে। কেননা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর নিকট নিজেদের অক্ষমতা, অপারগতা, বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে মিনতির স্বরে বৃষ্টির প্রার্থনা করা। কিন্তু হানাফী মাযহাব কর্তৃক বর্ণিত নিয়ম হলো সর্বোত্তম। কেননা হাদীসে সালাতুল ইসতিসকাকে উপমা দেওয়া হয়েছে সালাতুল ঈদের সাথে, সালাতুল জুমু'আর সাথে নয়। সালাতুল জুমু'আর খুৎবা আগে সালাত পরে এবং খুৎবা ব্যতীত সালাতুল জুমু'আ সহীহ হয় না, পক্ষান্তরে সালাতুল ঈদে খুতবা সালাতের পরে পড়া হয়ে থাকে এবং খুতবা ব্যতীত তা সহীহ। তেমনি সালাতুল ইসতিকা খুতবা ছাড়া সহীহরূপে আদায় হয়ে যাবে। সুতরাং সালাতুল ঈদের ন্যায় তাতেও খুৎবা সালাতের পর হওয়া বাঞ্ছনীয়।[৯]

সালাতুল ইসতিসাকা সম্পর্কে ফাতাওয়া আলমগীরী ইত্যাদির সূত্রে বর্ণিত নিয়ম ও তারতীবের হিকমত হলো এই যে, উদ্দেশ্য সাধণার্থে প্রয়োজনকে সামনে রেখে আগে সালাত আদায় করাই হচ্ছে সালাতুল হাজতের দাবী। সালাত এবং দু'আর মাঝে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ দু'আই ইবাদতের মূল। দু'আর পূর্বে আল্লাহর মাহাত্ম্য প্রশংসা, এবং তার নিকট অক্ষমতা মিনতি ও বিনয় প্রকাশ্য এবং নিজেদের গুনাহ খাতা ক্ষমা প্রার্থনা করা বাঞ্ছনীয়। যেহেতু সালাতের পরে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত বা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনার ফলে গাফিলতি অমনোযোগিতা সৃষ্টি হতে পারে, সেহেতু তা দূরীকরণের লক্ষ্যে এবং দু'আর ভূমিকা পালনার্থে সালাতের পরপর খুতবা হওয়া বাঞ্ছনীয়। আগে খুতবা পড়ে সালাতের পর পর দু'আ করলে অমনোযোগিতার সাথে দু'আ হবে যা আল্লাহর দুরবারে কাবুল হওয়ার আশা খুবই ক্ষীণ। বরং হাদীসে এরূপ অবস্থায় দু'আ কবুল না হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে।[১০]

সালাতুল ইসতিসকার তাকবীরে যায়িদ (বাড়তি তাকবীর) নেই

হানাফী ফকীহগণ বলেন, সালাতুল ইসতিসকায় অন্যান্য সালাতের ন্যায় শুধু একটি তাকবীরে তাহরীমা হবে। এতে বাড়তি তাকবীর (তাকবীরাতে যায়িদাহ) নেই। হিশাম ইবন ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের এ বাক্যটি وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّىْ فِى الْعِيْدِ "এবং ঈদের নামাযের ন্যায় দু'রাক'আত নামায আদায় করেছেন"– দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, ইসতিসকার দু'রাক'আত সর্বদিক থেকে এমনকি বাড়তি তাকবীরের ক্ষেত্রেও ঈদের দু'রাক'আতের ন্যায়। যেমনটি কোন কোন ফকীহের ধারণা।

হানাফী ফকীহগণ বলেন, সালাতুল ঈদের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে কিরা'আত জোরে পড়া, রাক'আতের সংখ্যা, সালাত খুতবার আগে হওয়া খোলা প্রাঙ্গণে সমবেত হওয়া ইত্যাদির দিক থেকে। এর দ্বারা তাকবীরাতে যায়িদা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়।[১১] কিন্তু ইমাম বায়হাকী, হাকিম, ও দারা কুতনী কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস থেকে প্রতিভাত হয় যে, সালাতুল ইসতিসকার তাকবীরাতে যায়িদা রয়েছে।

---

৯. আবু জাফর তাহাভী, শারহে মা'আনিউল আসার, মাকাতাবায়ে আশরাফিয়া দেওবন্দ, ভারত, পরিচ্ছেদ ঃ ইসতিসাকার পদ্ধতি এবং তাতে সালাত আছে কি নেই, খণ্ড ১, পৃ. ২২৭।

১০. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

১১. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০, ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

www.pathagar.com

হাদীসটি হলো ঃ

আব্দুর রহমান ইবন আউফ থেকে বর্ণিত, তালহা বলেন, একদা মারওয়ান আমাকে ইসতিসকার পদ্ধতি জেনে আসার জন্য হারত ইবন আব্বাসের নিকট প্রেরণ করলেন। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, ইসতিসকার নিয়ম সালাতুল ঈদের মতই। তবে রাসূলুল্লাহ (সা) ইসতিসকার মধ্যে স্বীয় চাদর উল্টাতে গিয়ে ডান কাঁধের অংশ বাম কাঁধে এবং বামকাঁধের অংশ ডান কাঁধে রেখেছেন। এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর দিয়ে পাঠ করলেন (সূরা আ'লা) দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা গাশিয়াহ তিলাওয়াত করে পাঁচটি তাকবীর দিলেন।" হাকিম বলেন হাদীসটির সনদ সহীহ কিন্তু বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেননি। (যায়লাঈ, ১/৩৩৩)

ইমাম যায়লাঈ দু'ভাবে এর উত্তর প্রদান করেছেন।

প্রথমত, এ হাদীসখানা দুর্বল, কেননা এর সনদে মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আযীয সম্পর্কে ইমাম বুখারীর মন্তব্য হলো, সে মুনকারুল হাদীস (منكر الحديث)। ইমাম নাসাঈ বলেন, সে মাতরুকুল হাদীস (متروك الحديث)। আবু হাতিম বলেন, সে যাইফুল হাদীস (ضعيف الحديث) অর্থাৎ হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। তার কোন হাদীস সঠিকও যথাযথ নয় ইবন হিব্বান কিতাবুয্-যু'আফায় বলেন, সে প্রমাণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য নয়। ইবন কাত্তান স্বীয় গ্রন্থে বলেন, আব্দুল আযীযের তিন ছেলে মুহাম্মদ, আব্দুল্লাহ ও ইমরান। এরা প্রত্যেকেই দুর্বল। এদের পিতা আব্দুল আযীযের অবস্থা অজ্ঞাত। একারণে হাদীসটি ত্রুটিযুক্ত, অতএব তা প্রমাণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত, তাবারাণী কর্তৃক বর্ণিত মু'জামুল আওসাতের একটি হাদীস এর বিপরীত রয়েছে। হাদীসটি হলো, হযরত আনাস ইবন মালিক বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ইসতিসকার উদ্দেশ্যে সালাতের পূর্বে খুৎবা প্রদান করলেন। কিবলামুখী হলেন, স্বীয় চাদর উলটিয়ে নিলেন। অতঃপর মিম্বার থেকে অবতরণ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। কিন্তু তাতে শুধু একটি তাকবীর প্রদান করেন। অনুরূপ হযরত ইবন আব্বাস (রা) নবী করীম (সা)-এর সালাতুল ইসতিসকার পদ্ধতির যে বিবরণ প্রদান করেছেন তাতেও তাকবীরাতে যায়িদার কথা উল্লেখ নেই। তাছাড়া ইসতিসকা সম্পর্কীয় অন্যান্য হাদীসের মধ্যে বাড়তি তাকবীরের উল্লেখ নেই। যদি হতো তাহলে সাহাবায়ে কিরাম নিজ নিজ বর্ণনায় এটা স্পষ্ট করে দিতেন।[১২]

তাহবীলে রিদা—চাদর উল্টানোর হুকুম

হানাফী ফকীহগণ বলেন, সালাতুল ইসতিসাকায় অনাবৃষ্টি অবস্থা পরিবর্তনের পর বৃষ্টি নামার শুভ লক্ষণ গ্রহণপূর্বক পরিধানের চাদর কিংবা রুমাল উল্টে দেওয়া মুস্তাহাব ও সুন্নাত। হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) দুর্ভিক্ষ অবস্থা পরিবর্তিত হওয়ার উদ্দেশ্যে চাদর উল্টে পরিধান করলেন। হযরত আনাসের অপর বর্ণনায় তাবারানীর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে। নবী করীম (সা) চাদর উল্টে পরিধান করেছেন যাতে দুর্ভিক্ষ সজীবতায়,

১২. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০।

www.pathagar.com

রূপান্তরিত হয়। অনুরূপ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইসতিসকা করত স্বীয় চাদর ঘুরিয়ে দিয়েছেন।[১৩]

কিন্তু তাহবীলে রিদা কিভাবে করবে, কে করবে, কখন করবে ? এসম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, ইমাম সাহেব, খুতবার। শুরু অংশ পাঠ করার পর তাহবীলে রিদা করবে। চাদরটি চারকোণ বিশিষ্ট হলে তার উপরের অংশ নিচে দিবে আর নিচের অংশ উপরে দিবে। আর যদি গোলাকৃতি হয় তাহলে ডান কাঁধের অংশ বামকাঁধে আর বামকাঁধের অংশ ডানকাঁধে দিবে আর যদি এটি ঢিলাডালা লম্বা আস্তীন বিশিষ্ট জামা কিংবা আলখিল্লা হয় তাহলে ভিতরের অংশ উপরে আর উপরের অংশ ভিতরে করে দিবে। অতএব অবশ্য তাহবীলে রিদা খুতবার শুরুতে মাঝেও শেষেও করার অবকাশ রয়েছে। হানাফী ফকীহগণের মতে তাহবীলে রিদা শুধু ইমামের জন্য সুন্নাত ও মুস্তাহাব। কেননা এতদসংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহে এ আমলটি শুধু ইমাম করেছেন বলে বর্ণিত রয়েছে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) করেছেন। অতএব এর সাথে মুক্তাদীর কিয়াস সঠিক নয়।[১৪]

কিন্তু আল্লামা যায়লাঈ নসবুর রায়ায় বলেন (২/২৪৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ কর্তৃক বর্ণিত এহাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে। মুক্তাদীরাও তার সাথে তাহবীলে রিদা করেছে।

হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَأَيْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اسْتَسْقَى بِنَا اَطَالَ الدُّعَاءَ وَاَكْثَرَ الْمَسْئَلَةَ قَالَ : ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَقَلَّبَهُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ وَتَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ .

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) ইসতিসকার দীর্ঘ দু'আ করলেন এবং খুব বেশী করে প্রার্থনা করলেন। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে স্বীয় চাদর ঘুরিয়ে দিলেন অর্থাৎ উপরের দিক ভিতরে আর ভিতরের দিক উপরে দিলেন। তাঁর সাথে লোকেরাও تحول করল।

আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী এর উত্তরে বলেন যে, تحول এর অর্থ হলো ঘুরে যাওয়া আবর্তিত হওয়া। অর্থাৎ তিনি কিবলীমুখী হওয়ার সাথে সাথে মুসল্লীরাও কিবলার দিকে ঘুরে গেল। এ অর্থ নয় যে তারাও রাসূলের সাথে তাহবীলে রিদার আমলে শরীক হয়েছে। কেননা تحول ও تحويل এতদুভয়ের অর্থে বিরাট ব্যবধান রয়েছে تحول এর অর্থ تحويل দ্বারা করা ঠিক হবেনা। তবে এখানে এ প্রশ্ন হতে পারে যে, লোকেরা তো প্রথম থেকেই কিবলামুখী ছিল অতএব নবী করীম (সা) খুৎবা থেকে ফারিগ হয়ে লোকদের থেকে ফিরে কিবলামুখী হওয়ার সময় তারা আবার কিভাবে ফিরলেন ?

১৩. ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

১৪. দরসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১।

www.pathagar.com

এর উত্তর হলো, বক্তৃতা ও খোৎবা শ্রবণের সময় লোকেরা সাধারণত ইমামের দিকে ফিরে বসে তাদের অনেকেই ইমামের দিকে মুখ করতে যেয়ে এরূপভাবে বসে যে, কিবলার দিকে পুরোপুরি মুখ থাকেনা যা আমরা প্রতিনিয়ত জুমু'আর খুতবায় প্রত্যক্ষভাবে দেখে থাকি। তদ্রূপ সালাতুল ইসতিসকার খুতবায় লোকদের অবস্থা এমনি ছিল। যখন নবী করীম (সা) খুতবা থেকে ফারিগ হয়ে কিবলামুখী হলেন তখন সকলেই সঠিকভাবে কিবলামুখী হয়ে বসল এটাই হলো وتحول الناس معه এর যথোচিত ব্যাখ্যা। কেননা লোকদের তাহবীলে রিদার বিষয় বাস্তব হলে সালাতুল ইসতিসকা সম্পর্কীয় অপরাপর হাদীসে রাসূলের তাহবীলে রেদার পাশাপাশি মুসল্লীদের তাহবীলে রিদার বিবরণ থাকত। অথচ কোন সাহাবীর সালাতুল ইসতিসকার বিবরণে তা পাওয়া যায় না। বুঝা গেল এটি ইমামেরই আমল,[১৫] মুসল্লীদের নয়।

১৫. প্রাগুক্ত, ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪, ১৮৫।

www.pathagar.com

সালাতুল খাওফ আদায়ের নিয়ম

সালাতুল খাওফ আদায়ের বৈধ অনেক পদ্ধিতি[1] রয়েছে। তন্মধ্যে উত্তম পদ্ধতি হল, যুদ্ধরত প্রথম দলটি ইমামের সাথে এক রাক'আত সালাত আদায় করে চলে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় দল দ্বিতীয় রাক'আত ইমামের সাথে পড়ে চলে যাবে। এরপর প্রথম দলটি এসে নিজেদের সালাত পূর্ণ করবে। অতঃপর দ্বিতীয় দলটি এসে তাদের সালাত পূর্ণ করবে। এর প্রমাণ ঃ

رَوَى ابنُ أَبِيْ شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اٰدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِيْ بَعْضِ اَيَّامِهِ فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بِازَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوْا وَجَاءَ الْاٰخِرُوْنَ فَصَلَّى هُمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً .

قال المحقق اسناده صحيح على شرط الشيخين أخرجه ابن أبى شيبة ٢/٤٦٤ ومسلم ٨٣٩-٣٠٦ والنسائى فى المجتبى ٣/١٧٣ والبيهقى ٣/٢٦٠-٢٦١ من طريق يحى بن ادم بهذا الاسناد ...١٠٠ مسند الامام أحمد بن حنبل ١/٤٧٢ ، ..... ارساله بيروت ليبنان - المطبعه اولى ١٤١٦-١٩٩٦م

ইবন আবু শায়বা - - - - - ইবন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন এক দিন সালাতুল খাওফ আদায় করেছিলেন। তাঁর সাথে একটি দল দাঁড়িয়ে ছিল। আর একটি দল দাঁড়িয়েছিল শত্রুর সম্মুখে। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের সাথে থাকা দলটি নিয়ে এক রাক'আত আদায় করলেন অতঃপর তাঁরা চলে গেলেন। পরবর্তীগণ এলেন অতঃপর তাদেরকে

১. যখন কোন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি দাঁড়ায় তখন ইমাম সাহেব তাঁর যুদ্ধরত (যদি লোকেরা এক ইমামের বাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে সালাত আদায় করবেন। এই সালাতকে সালাতুল খাওফ বলে। এর বিস্তারিত পদ্ধতি হিদায়া গ্রন্থকার নিম্নরূপ লিখেছেন ঃ এক দল শত্রুদের সম্মুখীন থাকবে। আর একটি দল থাকবে পিছনে। ইমাম সাহেব পিছনের দলটি নিয়ে এক রাক'আত তথা একটি রুকূ দু'টি সিজ্দা আদায় করবেন। তিনি যখন দ্বিতীয় সিজ্দা করে মাথা উত্তোলন করবেন তখন এই দলটি শত্রুর সম্মুখে চলে যাবে। আর অপর দলটি ইমামের পেছনে চলে আসবে। তাদের নিয়ে ইমাম একটি রুকূ ও দু'টি সিজ্দা করবেন এবং তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবেন। কিন্তু মুক্তাদীগণ সালাম ফিরাবেন না। তারা পুনরায় যেয়ে শত্রুর সম্মুখে দাড়াবেন। প্রথম দলটি এসে একাকী একটি রুকূ দু'টি সিজ্দা করবেন কিরা'আত ছাড়া। (কারণ, তারা লাহিক) তারা তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরিয়ে শত্রুর সম্মুখে চলে যাবেন। অতঃপর পরবর্তী দলটি এসে একটি রুকূ' ও একটি সিজ্দা করবেন কিরা'আত সহকারে। (কারণ, তারা মাসবূক) অতঃপর তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবেন।

www.pathagar.com

নিয়ে তিনি এক রাক'আত আদায় করলেন। এরপর উভয় দল এক এক রাক'আত করে আদায় করল।"[২]

ইবন আবু শায়বার উক্তি মতে গুন্দুর-শুবা-আলী ইবন যায়িদ-ইউসুফ ইবন মিহ্রান-ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৩]

এই পদ্ধতিটিই ইবন আব্বাস (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত সনদে ইবন আবু শায়বা-ওয়াকী-সুফিয়ান-আবূ বকর ইবন আবিল জাহম সাখবারা আল-আযদা উবায়দুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উতবা-ইবন আব্বাস তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বনী সুলাইম অঞ্চলে জি কারাদ নামক স্থানে আমাদের নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেছিলেন[৪]---------। (ঐ)

اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ رحمه اللّٰهُ (كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فِى صَلاَةِ الْخَوْفِ قَالَ : اِذَا صَلّٰى الْاِمَامُ بِاَصْحَابِهِ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَ الْاِمَامُ بِاَصْحَابِهِ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَ الْاِمَامُ وَطَائِفَةٌ بِاَزَاءِ الْعَدُوِّ فَيُصَلِّ الْاِمَامُ بِالطَّائِفَةِ الَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ تَنْصَرِفُ الطَّائِفَةُ الَّذِيْنَ صَلُّوْا مَعَ الْاِمَامِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّتَكَلَّمُوْا حَتّٰى يَقُوْمُوْا فِىْ مَقَامِ اَصْحَابِهِمْ وَتَاْتِىْ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَيُصَلُّوْنَ مَعَ الْاِمَامِ الرَّكْعَةَ الْاُخْرٰى ثُمَّ يَنْصَرِفُوْنَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّتَكَلَّمُوْا حَتّٰى يَقُوْمُوْا فِىْ مَقَامَ اَصْحَابِهِمْ وَتَاْتِىْ الطَّائِفَةُ الْاُوْلٰى حَتّٰى يَصَلُّوْا رَكْعَةً وُحْدَانًا ثُمَّ يَنْصَرِفُوْنَ فَيَقُوْمُوْنَ مَقَامَ اَصْحَابِهِمْ وَتَاْتِىْ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى حَتّٰى يَقْضُوْا الرَّكْعَةَ الَّتِىْ بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ وُحْدَانًا .

رواه محمد فى كتاب الاثار ص ٣٥، ثم قال محمد أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن عبد اللّه فى عباس مثل ذالك اهـ قلت الحارث هذا مقبول من اتباع الناهين كما فى التقريب ص ٢٦٩ فالاسناد منقطع وهو ما لا يدرك الذى إعلاء السنن ج ٨ ص : ١٦١

ইমাম আবু হানীফা..... ইবরাহীম নাখঈ সালাতুল খাওফ সম্পর্কে বলেন, যখন ইমাম তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সালাত আদায় করবেন, তখন তাদের একটি দল ইমামের সাথে দাঁড়াবে। আর একটি দল দাঁড়াবে শত্রুর বিপরীতে অতঃপর ইমাম সাহেব তাঁর সঙ্গী দলটি নিয়ে এক রাক'আত পড়বেন। অতঃপর যে দলটি ইমামের সাথে সালাত আদায় করেছে তারা কোন

২ মুসান্নাফ ইবন আবু শায়বা, পৃ. ১০৩৭ ; আবুল ওয়াফা আফগানী টীকা ঃ কিতাবুল আসার, লিল ইমাম মুহাম্মদ (র), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা. ৫০৭, প্রকাশক ঃ আল-মাজলিসুল ইলমী, সিমলাক, ডাভিল, বিলসার, গুজরাট, ভারত ও জোহান্সবার্গ, পোষ্ট বক্স ১. দক্ষিণ আফ্রিকা, চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৯৫ ইংরেজি।

৩. মুসান্নাফ ইবন আবু শায়বা, পৃষ্ঠা ১০৪০, সূত্র প্রাগুক্ত।

৪. আবুল ওয়াফা অল-আফগানী, আরবী টীকা কিতাবুল আসার, পৃষ্ঠা ৫০৭।

www.pathagar.com

প্রকার কথাবার্তা না বলে এখান থেকে ফিরে গিয়ে দাড়াবে তাদের সাথীদের স্থলে। আর দ্বিতীয় দলটি ফিরে চলে আসবে। এই দলটি এসে ইমামের সাথে অপর রাক'আতটি আদায় করবে। এরপর তারা কোন কথাবার্তা না বলে তাদের সাথীদের স্থলে দাড়াবে এবং প্রথম দলটি চলে আসবে। এসে একাকী পরবর্তী এক রাক'আত আদায় করবে। অতঃপর তারা ফিরে যাবে। তারপর তারা তাদের সঙ্গীদের স্থানে দাড়াবে এবং দ্বিতীয় দলটি এসে তাদের যে রাক'আতটি অবশিষ্ট ছিল সেটি একাকী আদায় করবে।[৫]

ইমাম মুহাম্মদ (র) কিতাবুল আসারে (পৃ. ৫০৫-৫০৬, باب صلوة الخـــوف হাদীস নং ১৯৫), ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) হতে হাম্মাদ সূত্রে হানাফী মাযহাবের সপক্ষে ইব্রাহীমের একটি আসার বর্ণনা করার পর লিখেছেন,

اَخْبَرْنَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَ ذٰلِكَ .

এই হাদীসটি মুনকাতি। হাফিয (র) আল-আসার গ্রন্থে হারিস ইবন আব্দুর রহমান (র) সম্পর্কে বলেন, আমার ধারণা তিনি হচ্ছেন ইবন আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ ইবন সা'দ আবু যুবাব আদ্-দাউসী। তিনি মদীনার অধিবাসী। আত্-তাহযীবে তার জীবনী রয়েছে। যদি এ রাবী তিনিই হয়ে থাকেন, তাহলে ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত তার হাদীসটি মুনকাতি, তা সূত্র পরম্পরায় মারফূ' নয়, বিচ্ছিন্ন। মাঝখানে মুজাহিদ প্রমুখের সূত্র বাদ পড়েছে। এখানে হারিস দ্বারা আবূ হিনদ হারিস ইবনে আব্দুর রহমান দালানীও উদ্দেশ্য হতে পারে। এমতাবস্থায়ও সূত্র বিচ্ছিন্ন থাকবে। মাঝখানে আবু যিবয়ানের সূত্র এসে যাবে। সারকথা হারিস দ্বারা যে কেউ উদ্দেশ্য হোক না কেন চাই আবু যুবার দাওসী হোক অবা অবু হিনদ দালানী উভয়ের হাদীসই নির্ভরযোগ্য। আর সনদে বিচ্ছিন্নতার যে বিষয়টি রয়েছে আবু যিবয়ান অথবা মুজাহিদের সূত্র চূড়ান্ত হওয়ার ফলে এটা কোন ক্ষতিকর নয়। তাছাড়া, এই সূত্র বিচ্ছিন্নতা পাওয়া যাচ্ছে প্রথম যুগে। কাজেই এটা ক্ষতিকারক নয়। এ কারণে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) কর্তৃক এই হাদীস ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সামনে বর্ণনা করা এবং ইমাম মুহাম্মদ কর্তৃক এই রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করার পর وَبِهٰذَا كُلِّهٖ نَاْخُذُ তথা এসবই আমরা গ্রহণ করি উক্তি করা এ কথার প্রমাণ যে, তাদের নিকট এই রেওয়ায়াতটির গ্রহণযোগ্য তার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না-।[৬]

উক্ত পদ্ধতি ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর কিতাবুল আসারে হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে মাওকূফ সূত্রেও বর্ণিত আছে। কিন্তু রিওয়ায়াতটি যুক্তির আলোকে অনুধাবন যোগ্য নয় বলে মাওকূফ হওয়া সত্ত্বেও মারফূ' হাদীসের পর্যায়ভুক্ত।

ইমাম আবু বকর আল-জাস্সাস (র) 'আহকামুল কুরআন'-এ এই পদ্ধতিটি হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন ঃ

৫. (পূর্বোক্ত কিতাবুল আসারে আবুল ওয়াফা আফগানীর টীকা, পৃষ্ঠ ৫০৬ দ্রষ্টব্য)

৬ বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ দরসে তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫২-৩৫৬, মূলঃ মাওলানা তকী উসমানী, সংকলক ঃ মাওলানা রশীদ আশরাফ সাইফী, ইসলাহী কুতুবখানা দেওবন্দ, তা. বি.।

www.pathagar.com

خُصَيْفُ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فِىْ حَرَّةِ بَنِىْ سُلَيْمٍ صَلاَةَ الْخَوْفِ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَانَ الْعَدُوُّ فِىْ غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَصَفَّ مَعَهُ صَفًّا وَاَخَذَ صَفُّ السِّلاَحِ وَاسْتَقْبَلُوْا الْعَدُوَّ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِىْ مَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعَ الصَّفُّ الَّذِىْ مَعَهُ ثُمَّ تَحَوَّلَ الصَّفُّ الَّذِيْنَ صَفُّوْا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَخَذُوْا السِّلاَحَ وَتَحَوَّلَ الْاٰخَرُوْنَ فَقَامُوْا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَرَكَعَ النَّبِىُّ ﷺ وَرَكَعَ وَسَجَدَ وَسَجَدُوْا ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِىُّ ﷺ فَذَهَبَ الَّذِيْنَ صَلُّوْا مَعَهُ وَجَاءَ الْاٰخَرُوْنَ فَقَضُوْا رَكْعَةً فَلَمَّا فَرَغُوْا اَخَذُوْا السِّلاَحَ وَتَحَوَّلَ الْاٰخَرُوْنَ وَصَلُّوْا رَكْعَةً فَكَانَ لِلنَّبِىِّ ﷺ رَكْعَتَانِ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَةً رَكْعَةً .

أحكام القران الجصاص ج ٢ ص ٣١٦ باب صلوة الخوف.

খুসাইফ (র) আবূ উবাইদা (র) সূত্রে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বনী সুলাইমের কালো প্রস্তরময় ভূমিতে সালাতুল খাওফ আদায় করেছিলেন। তিনি কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলেন। শত্রুরা ছিল কিবলার বিপরীত দিকে। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে একটি দল কাতারে দাড়িয়েছিল। আর একটি দল ছিল সশস্ত্র। তারা ছিল শত্রুমুখী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাতের তাকবীর বললেন। সাথে সাথে তাঁর সঙ্গে কাতারবন্দী সবাই তাকবীর বললেন। অতঃপর তিনি ও তাঁর সঙ্গী সবাই রুকু' করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে যারা কাতারবন্দী ছিলেন তাঁরা কাতার থেকে ফিরে এসে অস্ত্র ধারণ করলেন। পরবর্তীগণ ফিরে এলেন। তাঁরা এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কাতারে দাঁড়িয়ে গেলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) রুকূ করলেন। তাঁরাও রুকূ' করলেন। তিনি সিজ্দা করলেন। তাঁরাও সিজ্দা করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাম ফিরালেন। তাঁর সালামান্তে যাঁরা এতক্ষণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সালাত আদায় করেছিলেন তারা চলে গেলেন। এলেন পরবর্তীগণ। তারা এসে এক রাক'আত আদায় করলেন। সালাত থেকে তাঁরা অবসর হয়ে অস্ত্র ধারণ করলেন। ফিরে চলে এলেন পরবর্তীগণ। তাঁরা এসে এক রাক'আত আদায় করলেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হল দু'রাক'আত, আর কাওমের (সাহাবীগণের) হল এক রাক'আত এক রাক'আত।[৭]

২. সালাতুল খাওফের তিনটি পদ্ধতি বিভিন্ন-রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম পদ্ধতিটি হল এক দল ইমামের সাথে এক রাক'আত পড়বে, দ্বিতীয় দল শত্রুর বিপরীতে দাঁড়াবে। যখন ইমাম সিজ্দা করবেন তখন প্রথম দলটি স্বীয় দ্বিতীয় রাক'আত

---

৭. নাসবুর রায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫০-২৫১, বাবু সালাতিল খাওফ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন-১৯৯৬, ইবনে উমর (রা)-এর রিওয়ায়াতে মূল পদ্ধতিটি বর্ণিত হয়েছে। (ই'লাউস সুনান, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৬০, মুদ্রণ ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ দ্রষ্টব্য)

www.pathagar.com

তখনই পূর্ণ করবেন। আর ইমাম সাহেব এতক্ষণ সময় দাঁড়িয়ে অপেক্ষমান থাকবেন। অতঃপর দ্বিতীয় দলটি আসবে। তখন ইমাম এই দলটিকে নিয়ে এক রাক'আত পড়ে সালাম ফিরাবেন এবং সে দলটি মাসবুকের মত স্বীয় দ্বিতীয় রাক'আত পূর্ণ করবে। এই পদ্ধতি হযরত সাহল ইবনে আবু হাসমাহ (রা)-এর রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত। এই হাদীসটি মারফু' এবং মাওকূফ উভয় সূত্রে বর্ণিত এবং বিশুদ্ধতম। এজন্য শাফিঈ মতাবলম্বীগণ এ পদ্ধতিটিকে উত্তম সাব্যস্ত করেন।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হল, ইমাম প্রথম দলটিকে নিয়ে রাক'আত এক রাক'আত নামায পড়বেন এবং সিজদার পর ঐ দলটি স্বীয় নামায পূর্ণ করার পূর্বেই যুদ্ধ ফ্রন্টে চলে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় দলটি আসবে। ইমাম তাদেরকে নিয়ে দ্বিতীয় রাক'আত পড়ে সালাম ফিরাবেন। অতঃপর এই দলটি স্বীয় নামায তখনই পূর্ণ করে যুদ্ধ ফ্রন্টে চলে যাবে। তারপর প্রথম দলটি এসে স্বীয় দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করবে। আবূ দাউদ শরীফে (১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৬, باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة)-এর বিস্তারিত বয়ান রয়েছে। নাসায়ী শরীফেও (১ম খণ্ড, পৃ. ২২৯, সালাতুল খাওফ অধ্যায়ে) এ প্রসঙ্গে রিওয়ায়াত রয়েছে।

তৃতীয় পদ্ধতিটি প্রথমেই আমরা বর্ণনা করেছি। এটি ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও তাঁর অনুসারীদের মত।

ইমাম আবূ দাউদ, ইমরান ইবনে মাইসারা, ইবনে ফুযাইল সূত্রে খুসাইফের এই রিওয়ায়াতটি এভাবে বর্ণনা করেছেন।

عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ فَقَامُوْا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَصَفٌّ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَةً ثُمَّ جَاءَ الْاٰخَرُوْنَ فَقَامُوْا مَقَامَهُ فَاسْتَقْبَلَ هٰؤُلاَءِ الْعَدُوَّ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِىُّ ﷺ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ هٰؤُلاَءِ فَصَلُّوْا لاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوْا ثُمَّ ذَهَبُوْا فَقَامُوْا مَقَامَ اُوْلٰئِكَ مُسْتَقْبِلِىْ الْعَدُوِّ وَرَجَعَ اُوْلٰئِكَ اِلٰى مَقَامِهِمْ فَصَلُّوْا لاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوْا .

وروى نحو هذا فى سند أحمد ٢٦/٦ توسة الرساله بيروت لبنانى ١٩٩٦م ثم قال المحقق صحيح وهذا اسناد ضعيف لانقطاعه وذكر توثيق بعض وتضعف بعض فى خصيف ثم قال وقال ابن عدى اذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه ورواياته - وأخرجه أبوداؤد ١٢٤٥ والطحاوى فى شرح معانى الاثار ٣١١/١ والبيهقى ج ١ السنن ٢٦١/٣

www.pathagar.com

من طرق عن خصيف به والرواية فى سنن أبى داؤد ج ١ ، ص ١٧٦، ١٧٧ باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة ثم يسلم الخ .

ইমাম আবূ দাউদ (র) এ হাদীস সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য না করে নিরবতা অবলম্বন করেছেন। অনুরূপ একটি রিওয়ায়াত মুসনাদে আহমাদে (৬/২৬, মুদ্রণ, মুওয়াস্সাতুর রিসালা বৈরুত-১৯৯৬ ইং) বর্ণিত হয়েছে মুহাম্মদ ইবনে ফুযাইল সূত্রে।

এই রিওয়ায়াতটিও আমাদের মাযহাব মুতাবিক। অবশ্য একটি অংশে হানাফীদের মাযহাবের সাথে কিছুটা বিরোধ রয়েছে। কারণ, তাতে দ্বিতীয় দলটি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে যে, এটি নবী করীম (সা)-এর সাথে এক রাক'আত পড়ার পর তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ ফ্রন্টে চলে যাওয়ার পরিবর্তে নিজেদের দ্বিতীয় রাক'আত এই স্থানেই পূরণ করেছেন। কিন্তু খুসাইফের দ্বিতীয় এই রিওয়ায়াতটির বিপরীতে প্রথম রিওয়ায়াতটি প্রাধান্যযোগ্য। কারণ, প্রথম দলটি সালাতের প্রথমাংশ পেয়েছে, আর দ্বিতীয় দলটি পায়নি। অতএব, দ্বিতীয় দলটির জন্য প্রথম দলটির পূর্বে সালাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া জায়িয নয়। তাছাড়া প্রথম দলটির জন্য হুকুম ছিল দু'রাক'আত দু'স্থানে আদায় করা। অতএব, দ্বিতীয় দলটির জন্য হুকুম হল, এক স্থানে আদায় না করে এ সালাতটি দু'স্থানে আদায় করা। কারণ, সালাতুল খাওফের নিয়ম হল দু'টি দলের মাঝে সমান ভাবে বিভক্ত আকারে সালাত আদায় করা।

كذا قال أحمد بن على الجصاص رحمه الله تعالى فى أحكام القران ج ٢ ص ٣١٦

এরূপভাবে ইমাম তিরমিযী (র) হযরত ইবন উমর (রা)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ

انَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى صَلاَةَ الْخَوْفِ بِاِحْدٰى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَّالطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَقَامُوْا فِىْ مَقَامِ اُوْلٰئِكَ وَجَاءَ اُوْلٰئِكَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً اُخْرٰى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ هٰؤُلاَءِ فَقَضُوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هٰؤُلاَءِ فَقَضُوْا رَكْعَتَهُمْ .

(قال ابو عيسى) وحديث ابن عمر رضى الله عنه حديث حسن صحيح وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبى ﷺ نحو . ترمذى ج ١ ، ص ١٠٠

এখানে সালাতুল খাওফ আদায়ে উপরোক্ত পদ্ধতির সম্ভাবনাও রয়েছে। কারণ এখানে হাদীসে বলা হয়েছে فَقَامَ هؤُلاَءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هؤلاء فقضوا رَكْعَتَهُمْ এখানে প্রথম هؤلاء দ্বারা প্রথম দলটির দিকে ইঙ্গিত হয়ে উপরোক্ত পদ্ধতি প্রমাণিত হয়। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা)সহ অন্যদের রিওয়ায়াতগুলো এই পদ্ধতিটিকেই প্রধান্য দেয়।

www.pathagar.com

হযরত হুযায়ফা (রা) তাবারিস্তানে এক দল সাহাবী নিয়ে সালাতুল খওফ আদায় করেছিলেন উপরোক্ত পদ্ধতিতে। কেউ এ পদ্ধতির বিরোধিতা করেননি। হুযাইফা (রা)-এর বিরুদ্ধে কোন কথা বলেননি। এতে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত যে পদ্ধতিটি আমরা গ্রহণ করেছি সেটি উত্তম। তাছাড়া আমরা যেসব সাহাবীর হাদীস বর্ণনা করেছি সেগুলোতে পারস্পরিক কোন বিরোধ নেই।

روى النَّسَائِىْ فِىْ الْمُجْتَبٰى ٣/١٧٢، ١٧٣ وَابْنُ حَبَّانَ بِرَقَمْ ٢٨٦٨ عَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ هٰذَا لَفْظُهُ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِاِحْدٰى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَّالطَّائِفَةُ الْأُخْرٰى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَقَامُوْا وَقَامَ اَصْحَابُهُ مُقْبِلِيْنَ عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَ اُوْلٰئِكَ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِىُّ ﷺ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمُ النَّبِىُّ ﷺ وَمَضٰى فَقَامُوْا مَقَامَ أَصْحَابِهِ مُقْبِلِيْنَ عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَ اُوْلٰئِكَ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِىُّ ﷺ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمُ النَّبِىُّ ﷺ وَقَضٰى هٰؤُلَاءِ رَكْعَةً وَهٰؤُلَاءِ رَكْعَةً (وروى فى معنى هذا الحديث فى سند أحمد ٤٢١/١٠ موسسة الرسالة بيروت لبنان ١٩٩٦م وقال المحقق اسناده صحيح على شرط الشيخين)

(بدائع الصنائع فى ترتيب الشرايع - مكتبة زكريا ديوبند سهارنبور - الهند - طبعة جديده - ج ١ ص : ٥٥٧)

মোটকথা, সালাতুল খাওফের উপরোক্ত পদ্ধতিটি এজন্যও প্রাধাণ্যযোগ্য যে, এটি কুরআন কারীমের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল এবং তারতীবের অনুকূল। কুরআনের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল হওয়ার কারণ হল, কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ .

"এবং তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে ও তাদের সঙ্গে সালাত কায়েম করবে তাদের একদল যেন তোমার সাথে দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাদের সিজ্‌দা করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর এক দল যারা সালাতে শরীক হয়নি, তারা তোমার সঙ্গে যেন সালাতে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে।" (সূরা নিসা ঃ ১০২)

এখানে প্রথম সম্পর্কে বলা হয়েছে فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَائِكُمْ এতে প্রথম দলটিকে সিজ্‌দার পর পিছনে হটার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব, এখানে আমাদের উপরোক্ত পদ্ধতি

www.pathagar.com

ছাড়া তথা দ্বারা দ্বিতীয় দলটির দিকে ইঙ্গিত হতে পারে না। এমনিভাবে তারতীবের অধিক অনুকূল হওয়ার কারণ হল উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন না করা হলে প্রথম দলটি ইমামের পূর্বেই সালাত থেকে অবসর হয়ে যায়। যা স্বাভাবিক তারতীবের পরিপন্থী। আর আমাদের বর্ণিত পদ্ধতিতে যদিও সালাতের মাঝে যাতায়াত বেশী হয়, কিন্তু তাতে ইমামতির মূল বিষয়ের পরিপন্থী কিছু নেই। স্বাভাবিক নিয়মেরও খেলাফ নয় এবং কুরআনে কারীমের বাহ্যিক শব্দেরও পরিপন্থী নয়। মোটকথা, ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও তাঁর শিষ্যগণ যে মত অবলম্বন করেছেন এটি শক্তিশালী প্রমাণাদির আলোকে প্রমাণিত। এটাই ইমাম সুফিয়ান সাওরী, হাম্মাদ ইবন আবু সুলাইমান ও ইবরাহীম নাখঈ (র)-এর মাযহাব।

www.pathagar.com

কুসূফ ও খুসূফের নামায

আভিধানিকভাবে كُسُوْف শব্দের অর্থ পরিবর্তন হওয়া। خُسُوْف শব্দের অর্থ ধসে যাওয়া পরিভাষিকভাবে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ كسوف অর্থ সূর্যগ্রহণ ও خُسُوْف শব্দটি চন্দ্রগ্রহণের অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১] সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহর অপার-অসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ।[২] তাঁর কুদরতের স্বীকৃতি স্বরূপ এ নামায প্রবর্তিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কিয়ামত দিবসে গোটা সৌরজগৎ নিষ্প্রভ হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। সে ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা স্মরণ করে আল্লাহর ইবাদতে ব্যাপৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয় বিধায় এ নামায বিধান দেওয়া হয়েছে।[৩]

কুসূফ ও খুসূফ নামাযের হুকুম

অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে খুসূফের নামায সুন্নাতে মু'আক্কাদা, তবে কিছু সংখ্যক হানাফী ফিকাহিবিদের মতে এটা ওয়াজিব। ইমাম মালিক (র) এটাকে জুমু'আর সমতুল্য আখ্যায়িত করেছেন।[৪] চন্দ্রগ্রহণের নামায শাফিঈ এবং হাম্বলীদের মতে সূর্যগ্রহণের নামাযের মত সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ, তবে অধিক সংখ্যক হানাফী ফিকাহবিদের মতে নফল।[৫] মুকিম, মুসাফির, মহিলা নির্বিশেষে সবার জন্য কুসূফ নামাযের একই বিধান।[৬]

কুসূফ নামাযের সুন্নাতসমূহ

১. কুসূফ নামায আদায়ের জন্য গোসল করা।[৭]

---

১. ওয়াহবাতুজ জুহাইলি, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিয়াতুহ, দারুল ফিকর, দামেশক-১৯৯৬, সালাত অধ্যায়, কুসূফ অনুচ্ছেদ, খণ্ড ২, পৃ. ৩৯৫।

২ সূর্যগ্রহণ ঃ চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে পরিভ্রমণ করছে। কোন সময় চন্দ্র যদি সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে এসে পড়ে সরল রেখা তৈরী করে তখন পৃথিবীর একাংশে সূর্যের আলো বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ঐ স্থান হতে সূর্যকে আংশিক বা পূর্ণভাবে দেখা যায় না। এটিই সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ-পৃথিবী ও চন্দ্র তাদের নিজ কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করা কালে কিছুক্ষণের জন্য সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র একই সরল রেখায় অবস্থান করে। এর ফলে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয় এবং কিছুক্ষণের জন্য চাঁদকে দেখা যায় না। এটাই চন্দ্রগ্রহণ।

৩. আল্লামা তাকী উসমানী, দারসে তিরমিযী, মাওলানা রশীদ আশরাফ সংকলিত দেওবন্দ : বাংলা ইসলামী একাডেমী, খণ্ড ২. পৃ. ৩৪২-৩৪৩।

৪. আল্লামা ইবন হাজর আস্‌কালানী ফাতহুল বারী, মিসর, মাকতাবাতু মিসর ২০০১ ইং, কুসূফ অধ্যায়; কুসূফের নামায অনুচ্ছেদ, খণ্ড ২, পৃ., ৭৪৮।

৫. আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া-আদিল্লাহু, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ৪০৯।

৬ আল-মাওসু'আতুল ফিকহিয়া, ফিকহ্ বিশ্বকোষ, ওয়াজারাতুল আওকাফ, কুয়েত ১৯৯২ ইং, সালাত অধ্যায়, কুসূফ অনুচ্ছেদ খণ্ড ২৭, পৃ. ২৫৫।

৭ আল্লামা মুহাম্মদ আমীন ইবন উমর ইবনে আবদুল আজীজ আবিদীন, আদ-দেমশ্‌কী মৃত্যু-১২৫ হিঃ, হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন, বাইরুত, দারু ইহয়াসিত তুরাসিল আরবী- ১৯৯৮, তাহারাত অধ্যায়, গোসল অনুচ্ছেদ, খণ্ড ১, পৃ. ২৭৮।

www.pathagar.com

২. ঈদের মাঠে অথবা জামে মসজিদে কুসূফের নামায পড়া।[৮] কেননা, রাসূলে পাক (সা) মসজিদে সালাতুল কুসূফ আদায় করেছেন।[৯]

৩. নামাযের আগে পরে বেশি বেশি যিকির, ইস্‌তিগফার, তাক্‌বীর পাঠ করা। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করছেন ঃ

فَاذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَادْعُوْا اللّٰهَ وَكَبِّرُوْا وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا .

তোমরা যখন এই সব দৃশ্য তথা সূর্যগ্রহণ দেখবে তখন আল্লাহর কাছে দু'আ করবে, তাকবীর পাঠ করবে, নামায পড়বে, দান করবে।[১০]

৪. কুসূফ নামাযের জন্য আহ্বান করা এবং الصلوة جامعة বলে ঘোষণা প্রদান করা। অর্থাৎ আসুন নামায হচ্ছে। তবে কোন আযান-ইকামত হবে না। আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ نودى ، ان الصلوة جامعة

আবদুল্লাহ ইবন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক (সা)-এর জীবদ্দশায় যখন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল তখন 'নামায হচ্ছে' এই বাক্য দিয়ে (সূর্যগ্রহণের নামাযের জন্য) আহ্বান করা হয়েছিল।[১১]

৫. জামা'আতের সাথে আদায় করা। কেননা, আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে :

قالت خسفت الشمس فى حياة رسول الله ﷺ فخرج رسول الله ﷺ إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه .

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলে পাক (সা)-এর জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ হয়েছিল তিনি তখন মসজিদের দিকে গেলেন, নামাযে দাঁড়ালেন, তাক্‌বীর বললেন এবং জনগণ তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হলেন।[১২]

কেন্দ্রীয় শাসক অথবা বিচারক কিংবা জুমু'আর নামাযের ইমামই ইমামতি করবেন। এদের অনুপস্থিতিতে প্রত্যেকে নিজে দু' রাক'আত অথবা চার রাক'আত নামায আদায় করবেন।[১৩]

৬. পূর্ণ সূর্য গ্রহণের সময়কে আল্লাহর ইবাদতে অতিবাহিত করার উদ্দেশ্যে কিরা'আত ও দু'আ যে কোন একটি লম্বা করা।[১৪]

৮.. আল্লামা শেখ আহমদ তাহতাবী, হাশিয়াতুত তাহতাবী, আলা-মারাকিল ফালাহ, মীর কুতুবখানা, তা বি., সালাত অধ্যায়, কুসূফ অনুচ্ছেদ, খণ্ড ১, পৃ. ২৯৮।

৯. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়া, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২৭, পৃ. ২৫৪।

১০. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (ফাতহুল বারী) কায়রো, মাকতবা মিসর ২০০২, কুসূফ অধ্যায়, সূর্যগ্রহণ হলে দান করা প্রসংগে অনুচ্ছেদ, হাদীস নং ১০৪৪, খণ্ড ২, পৃ. ৭৫২।

১১. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (সহীহ আল-বুখারী) মাকতাবা মিসর ২০০২, কুসূফ অধ্যায়, কুসূফ নামাযের জন্য আহ্বান অনুচ্ছেদ, হাদীস নং ১০৪৫, খণ্ড ২, পৃ. ৭৫৭।

১২. আল-ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম (শারহুন নববী) মুআচ্ছাছাতুল মুখতার ২০০১, কুসূফ অধ্যায়, কুসূফ নামাযের অনুচ্ছেদ, খণ্ড ৬, পৃ. ২১১।

১৩. হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ৬২।

১৪ শায়খুল ইসলাম মুরগীনানী, হিদায়া, কুতুবখানায়ে রাশিদিয়া, তা. বি., খণ্ড ১, পৃ. ১৫৫।

www.pathagar.com

৭. রুকূ সিজ্‌দা লম্বা করা।[১৫] ৮. ইমাম কিবলামুখী হয়ে বসে অথবা দাঁড়িয়ে জনগণকে সামনে রেখে দু'আ করবেন।[১৬]

উল্লেখ্য, খুসূফ তথা চন্দ্রগ্রহণের নামাযের জন্য আগে-পরে যিকির, ইসতিগফার, তাকবীর, দু'আ ছাড়া আর কোন সুন্নাত নেই। কেননা, খুসূফের নামায জাম'আতবিহীন ও আহ্বান ছাড়া নিজ নিজ ঘরে আদায় করা হয়।

কুসূফ ও খুসূফ নামাযের সময়

সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ শুরু ও শেষ হওয়ার মধ্যবর্তী সময় হচ্ছে কুসূফ ও খুসূফের নামাযের সময়। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক (সা) ইরশাদ করেন :

ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما من ايات الله يخوف الله بهما عباده فاذا رايتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا .

কারও জন্ম বা মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ হয় না, বরং এটা আল্লাহ্‌র নিদর্শন। এর দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। তোমরা যদি চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ দেখ তবে আল্লাহ্‌র যিকির করতে থাক চন্দ্র বা সূর্য পুনরায় আলোকিত হওয়া পর্যন্ত।[১৭]

অতএব সূর্যগ্রহণের পর সূর্য পুণর্বার আলোকিত হয়ে গেলে বা সূর্যগ্রহণ অবস্থায় সূর্য অস্ত হয়ে গেলে কুসূফের নামাযের সময় শেষ হয়ে যাবে। তদ্রূপ হয়ে গেলে খুসূফের নামাযের সময় শেষ হয়ে গেলে খুসূফের নামাযের সময় শেষ হয়ে যাবে। কেউ কুসূফের নামায আদায় করেছেন, তবে সূর্যগ্রহণ এখনো শেষ হয়নি তা হলে কুসূফের নামায আর পড়তে হবে না। তবে দু'আ, যিকিরে লিপ্ত থাকবেন।[১৮] কেউ সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ অবস্থায় নামায শুরু করেছেন তবে নামায শেষ হওয়ার আগে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে, তা হলে বাকি নামায আদায় করে নিতে হবে।[১৯]

মাকরূহ সময়ে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হলে তখন কুসূফ বা খুসূফের নামায পড়ার হুকুম

যে সব সময়ে নফল নামায পড়া মাকরূহ সে সব সময়ে সূর্যগ্রহণ হলে বা চন্দ্রগ্রহণ হলে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে শুধু দু'আ ও ইস্তিগফার করা হবে, কুসূফের নামায পড়া যাবে না।[২০] অতএব সূর্য মধ্যাকাশে স্থির হলে বা আসরের পরে ও সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় সূর্যগ্রহণ হলে বা রাত শেষ হয়ে ফজর শুরু হওয়ার সময়ে চন্দ্রগ্রহণ হলে কুসূফ ও খুসূফের নামায পড়া যাবে না। ইমাম মালিক (র)-এর এক রেওয়ায়েত মতে ঈদ ও ইসতিস্কার নামাযের মত শুধু সূর্য স্থির হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কুসূফের নামাযের সময়। শাফিঈদের মতে

---

১৫. হাসিয়াতুত তাহ্‌তাবী, আলা-মারাকিল ফালাহ, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ২৯৮।

১৬. প্রাগুক্ত।

১৭. সহীহ মুসলিম শরীফ (শারহুন নববী), প্রাগুক্ত, কুসূফ অধ্যায়, কুসূফ নামাযের অনুচ্ছেদ, হাদীস নং ৯০১/৬, খণ্ড ৬, পৃ. ২১২।

১৮. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়া, প্রাগুপ্ত, সালাত অধ্যায়, কুসূফ অনুচ্ছেদ, খণ্ড ২৭, পৃ. ২৫৪।

১৯. প্রাগুক্ত।

২০. হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, সালাত অধ্যায়, কুসূফ অনুচ্ছেদ, খণ্ড ৩, পৃ. ৬২।

www.pathagar.com

সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ যখনই হবে তখনই কুসূফ ও খুসূফের নামায মাকরূহ সময় হলেও পড়া যাবে।[২১]

কুসূফ ও খুসূফ নামায আদায়ের নিয়ম

ঈদ অথবা জুমু'আর ইমামের ইমামতিতে আযান-ইকামত ব্যতীত ঈদগাহ অথবা জুমু'আ মসজিদে জামা'আতের সাথে কুসূফের জন্য দু'রাক'আত নামায আদায় করতে হবে। ইমামের অবর্তমানে চার রাক'আত পড়া উত্তম।[২২] চন্দ্রগ্রহণের সময় জামা'আত ব্যতীত নিজ নিজ ঘরে দু'রাক'আত অথবা চার রাক'আত খুসূফের নামায আদায় করা হবে।[২৩] কুসূফ নামায প্রত্যেক রাক'আতে একটি রুকূ, না একাধিক রুকূ এ বিষয়ে হাদীসের বর্ণনায় (المتن) বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তবে এ বিষয়ে লিপিবদ্ধ হাদীসগুলোর বক্তব্য পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, কুসূফ নামাযের প্রত্যেক রাক'আত একটি রুকূ।

বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ

عن نعمان بن بشير ان النبى ﷺ قال : اذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها . وفى اعلاء السنن "رواه النسائى (٢١٩/١) وسكت عنه ولفظه فى التلخيص الحبير (١٤٦/١) صليتموها من المكتوبة ركعتين وأخرجه أحمد والحاكم وصححه ابن عبد البر" . العلامة ظفر أحمد العثمانى ، إعلاء السنن ، ادارة القران والعلوم الاسلامية ، ١٤١٧ هـ ، كتاب : الصلوة ، باب الكسوف ، رقم الحديث : ٢١٥٧ ، الجزء الثامن ، الصفحة : ١٦٨

হযরত নু'মান ইব্‌ন বাশীর থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন : সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হলে তোমরা ফজরের নামাযের ন্যায় নামায পড়বে। নাসাঈ শরীফ, খণ্ড ১, পৃ. ২১৯। আত-তালখীসুল হাবীর গ্রন্থে (খণ্ড ১, পৃ. ১৪৬) বর্ণিত বাক্য নিম্নরূপ ঃ "তোমরা ফরযের ন্যায় দু'রাক'আত নামায পড়বে"। উক্ত হাদীসটি আহমাদ, হাকিমও বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবদুল বার উক্ত হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২৪]

উক্ত হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ করছে যে, কুসূফ নামাযের প্রত্যেক রাক'আতে ফজরের ফরয নামাযের ন্যায় একটি রুকূ'। স্বাভাবিক নিয়মে এ নামায আদায় করতে হবে। নতুন কোন আমল সংযোজন করে আদায় করার প্রয়োজন নেই। এটিই ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও হানাফী ফকীহগণের অভিমত। এ ব্যাপারে আরো বহু হাদীস থেকেও সমর্থন পাওয়া যায়।

---

২১. আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ৪০৪।

২২. হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ৬২।

২৩. আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ৪০৯।

২৪. ইমাম আবূ আবদুর রহমান আন-নাসায়ী, সুনানে নাসাঈ (ফজল আহমদ কর্তৃক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা) দারুল ইশা'আত, উর্দু বাজার, করাচী, পাকিস্তান, কুসূফ অধ্যায়, ভিন্ন ধরনের (কুসূফের) নামায অনুচ্ছেদ, হাদীস নং- ১৪৯২, খণ্ড ১, পৃ. ৪৬৮।

www.pathagar.com

عن محمود بن لبيد قال : كسفت الشمس يوم مات ابراهيم بن رسول الله ﷺ : فقالوا كسفت الشمس لموت ابراهيم رضى الله عنه فقال رسول الله ﷺ : ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله عز وجل، الاو انهما لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ، فاذا رايتموها كذلك فافزعوا الى المساجد ، ثم قام فقرأ فيما نرى بعض الكتاب ثم ركع ثم اعتدل ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل فى الاولى ، رواه أحمد (٥:٤٢٨) ورجاله الصحيح (مجمع الزوائد ١:٢٤٤).

হযরত মাহমূদ ইব্‌ন লাবীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যেদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পুত্র ইব্রাহীম (রা) মৃত্যুবরণ করেন সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তাই লোকেরা পরস্পর বলাবলি করছিল, ইব্রাহীম (রা)-এর মৃত্যুতে সূর্যগ্রহণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের এরূপ মন্তব্য শুনে বললেন, সূর্য ও চাঁদ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অন্যতম। সাবধান! কারো জীবন ও মৃত্যুতে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা কখনো অনুরূপ কিছু অবলোকন করলে অনতিবিলম্বে মসজিদের গমন করবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) নামায আরম্ভ করে কুরআন পাঠ করলেন। যা আমাদের কাছে কুরআনের একটি বড় অংশ মনে হয়েছে। অতঃপর রুকূ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, অতঃপর দু'টি সিজ্‌দা সম্পন্ন করে দাঁড়ালেন এবং প্রথম রাক'আতের অনুরূপ আমল দ্বিতীয় রাক'আতে করলেন।[২৫]

عن قبيصة الهلالى قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ ، فخرج فزعا يجر ثوبه ، وانا معه يومئذ بالمدينة ، فصلى ركعتين ، فاطال فيهما القيام ، ثم انصرف وانجلت فقال : انما هذه الايات يخوف الله به عز وجل فاذا رايتموها فصلوا كاحدث صلاة صليتموها من المكتوبة . وفى إعلاء السنن رواه أبو داؤد (١:٤٦١) وسكت عنه هو والنذرى وفى الليل (٣:٢٢٢) رجاله رجال الصحيح العلامة ظفر أحمد العثمانى ، إعلاء السنن ، ادارة القران والعلوم الاسلامية ١٤١٧ هـ، كتاب : الصلوة ، باب الكسوف ، رقم الحديث : ٢١٥٤ ، الجزء الثامن ، الصفحة : ١٦٥

হযরত কাবিসা আল-হিলালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। আমি তাঁর সাথে মদীনায় ছিলাম। তিনি আপন কাপড় আগলে ধরে অস্থির হয়ে বের হলেন এবং দু'রাক'আত নামায পড়লেন। তিনি উভয় রাক'আতের কিয়াম দীর্ঘায়িত করেছিলেন। অতঃপর তিনি প্রত্যাবর্তন করেন এবং সূর্য গ্রহণমুক্ত হয়ে আলোক উদ্ভাসিত হয়। নামায শেষে তিনি বলেছিলেন, এগুলো আল্লাহর নিদর্শন। এগুলো দ্বারা তিনি ভীতি প্রদর্শন

২৫. আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান, সালাত অধ্যায়, কুসূফ অনুচ্ছেদ, করাচী, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামিয়া, ১৪১৭ হিজরী, হাদীস নং ২১৫৩, খণ্ড ৮. পৃ. ১৬৪।

www.pathagar.com

করেন। সুতরাং তোমরা এরূপ কিছু অবলোকন করলে ফজরের ফরয নামাযের ন্যায় নামায পড়বে।[২৬]

عن أبى بكرة رضى الله عنه قال : كنا عند النبى ﷺ فانكسفت الشمس فقام رسول الله يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال ﷺ : ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد فاذ رائتموها فصلوا وادعوا حتى يكشف مابكم .

হযরত আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা নবী করীম (সা)-এর নিকটেই ছিলাম। সূর্যগ্রহণ হলে রাসূলুল্লাহ (সা) আপন চাদর টেনে ধরে মসজিদে প্রবেশ করেন। আমরাও মসজিদে প্রবেশ করি। অতঃপর আমাদের নিয়ে তিনি দু'রাক'আত নামায পড়েন। পরিশেষে সূর্য আলোক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : নিশ্চয় কারো মৃত্যুতে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা তা অবলোকন করলে নামায পড়তে থাক এবং দু'আ করতে থাক। যে পর্যন্ত না তোমাদের উপর আপতিত বিপদ বিদূরিত হয়।[২৭]

عن عبد الرحمن بن سمرة قال انا ارمى باسهمى فى حياة رسول الله ﷺ اذا انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت لانظرن الى ما يحدث لرسول الله ﷺ فى انكساف الشمس اليوم فانتهيت اليه وهو رافع يديه يدعوا ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلى عن الشمس فقراء سورتين وركع ركعتين وفى عمدة القارى وأخرجه الحاكم ولفظه وقرا سورتين فى ركعتين وقال صحيح الاسناد الشيخ الامام العلامة بدر الدين العينى المتوفى سنة : ٨٥٥ هـ عمدة القارى دار احياء التراث ، بيروت ، لبنان ، الجزء السابع ، الصفحة : ٦٣

হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় একবার আমি আমার তীরধনুক নিয়ে অনুশীলন করছিলাম। হঠাৎ সূর্যগ্রহণ দেখা দিল। আমি তীরধনুক রেখে দিলাম এবং মনে মনে বললাম, আজকের সূর্যগ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ (সা) কি করেন তা আমার দেখতে হবে। যখন আমি গিয়ে পৌছলাম তখন তিনি হাত তুলে দু'আ করছিলেন এবং তাকবীর, হামদ ও তাহলীলে মশগুল ছিলেন। তারপর সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন দু'টি সূরা পড়লেন এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন।[২৮]

---

২৬. ইমাম আবূ দাঊদ সুলাইমান ইবনে আশ'আস সিজিস্তানী, সুনানে আবূ দাঊদ শরীফ, ই'তিকাদ পাবলিকেশন্স হাউস ১৯৯৩, কুসূফ অধ্যায়, দু' রুকূ, তিনি রুকূ বর্ণনা অধ্যায়, হাদীস নং ১১৭২, খণ্ড ১, পৃ. ৪৪৫।

২৭. বুখারী শরীফ প্রাগুক্ত, কুসূফ অধ্যায়, কুসূফ নামায অনুচ্ছেদ, হাদীস নং ১০৪০, খণ্ড ২, পৃ. ৭৪৭।

২৮. আল-ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম মু'আস্সাসাতুল মুখতার ২০০১, কুসূফ অধ্যায়, কুসূফ নামাযের জন্য আহ্বান অনুচ্ছেদ, হাদীস নং- ৯১৩/২৫, খণ্ড ৬, পৃ. ২২৬।

www.pathagar.com

উপরোক্ত হাদীসগুলো কোন প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই স্পষ্ট নির্দেশ করছে যে, কুসূফ নামায অন্যান নামাযের মতই এক প্রকার নামায। বিশেষত ফজরের ফরযের ন্যায় আদায় করার জন্য নবী করীম (সা) নির্দেশ দিয়েছেন। নতুন কোন আমল সংযোজন করে নতুন পদ্ধতিতে আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বরং সাধারণ নিয়মে কুসূফ নামায আদায়ের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে কতিপয় হাদীস এমনও আছে যেগুলোতে কুসূফ নামাযের প্রত্যেক রাক'আত দু'রুকূ বা তিন রুকূ বা একাধিক রুকূর বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন :

عن عائشة رضى الله عنها النبى ﷺ فى صلوة الخسوف بقراته فاذا فرغ من قراءته كبر فركع واذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم يعاود القراءة فى صلوة الكسوف أربع ركعات فى ركعتين وأربع سجدات وفى عمدة القارى ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم فى الكسوف عن محمد بن مهران مختصرا وأخرجه أبو داؤد وفيه عن عمرو بن عثمان عن الوليد مختصرا وأخرجه النسائى فيه عن عمرو بن عثمان بطوله وهو اتم الروايات وعن اسحاب بن ابراهيم عن الوليد به مختصرا وأخرجه الترمذى عن محمد بن ابان عن ابراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن عروة عن عائشة ان النبى (ص) صلى صلوة الكسوف وجهر بالقراءة فيها قال هذا حديث صحيح ، الامام العلامة بدر الدين العينى ، عمدة القارى (السابق) الجزء السابع ، الصفحة : ٩٢

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সূর্যগ্রহণের নামাযে উচ্চস্বরে কিরা'আত পাঠ করলেন এবং কিরা'আত শেষ করে রুকূ করলেন এবং রুকূ থেকে যখন উঠতে লাগলেন তখন বললেন (سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد)। তারপর পুনরায় কিরা'আত পড়তে লাগলেন। উক্ত সূর্যগ্রহণের নামাযে চারটি রুকূ ছিল, অথচ এই নামায দুই রাক'আত ও চার সিজ্দা বিশিষ্ট ছিল।[২৯]

এ হাদীসে প্রত্যেক রাক'আতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'রুকূ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। এটি হচ্ছে ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রা)-এর মাযহাব ও অভিমত।

عن عائشة رضى الله عنها ان النبى (ص) صلى ست ركعات بسجدات .

২৯. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী কায়রো, মাকতবা মিসর ২০০২, কুসূফ অধ্যায়, কুসূফ নামাযে উচ্চস্বরে কিরা'আত পাঠ অনুচ্ছেদ, হাদীস নং ১০৬৫, খণ্ড ২, পৃ. ৭৮০।

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সূর্যগ্রহণের নামায আদায় করলেন ছয়টি রুকূ ও চারটি সিজ্দার মাধ্যমে। (চারটি সিজ্দার মাধ্যমে। (চারটি সিজ্দার অর্থ হল দু'রাক'আত)[৩০]

এ হাদীসে প্রতি রাক'আত রুকূর সংখ্যা তিনটি বর্ণিত হয়েছে। এটি হচ্ছে ইমাম কাতাদা, ইমাম আতা ইবনে আবু রাবাহ, ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই-এর অভিমত।

عن ابن عباس قال صلى رسول الله ﷺ صلاة الخسوف فقام فافتتح ثم قرا ثم ركع ثم رفع رأسه فقرا ثم ركع ثم رفع راسه فقرا ثم ركع ثم رفع راسه فقرا ثم ركع ثم سجد ثم فعل مثل ذلك مرة اخرى اخرجه الطحاوى وفى إعلاء السنن عن ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله (ص) صلى فى كسوف الشمس والقمر ثمانى ركعات (اى ركوعات) فى أربع سجدات بقرا فى كل ركعة ، رواه الدار قطنى فى سننه (١٨٨:١) وفى نصب الراية (٢٢٩:١) اسناده جيد سكت عنه عبد الحق فى احكامه ثم ابن القطان بعده وقال ثابت بن محمد الزاهد (الراوى فى هذا السند) صدوق ، العلامة ظفر أحمد العثمانى ، إعلاء السنن (السابق) الجزء الثامن الصفحة : ١٦٤)

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কুসূফ নামায নিম্নোক্তভাবে আদায় করেছেন। প্রথমে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করেন, তারপর কিরা'আত পাঠ করে রুকূ করেন। অতঃপর মাথা উত্তোলন করে (পুনরায়) কিরা'আত পাঠ করে রুকূ করেন। অতঃপর মাথা উত্তোলন করে পুনরায় কিরা'আত পাঠ করে রুকু করেন। অতঃপর মাথা উত্তোলন করে কিরা'আত পাঠ করে পুনরায় করেন। অতঃপর সিজ্দা করেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে প্রথম রাক'আতের অনুরূপ আমল করেন।[৩১]

এ হাদীসে প্রত্যেক রাক'আতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রুকূর সংখ্যা ৪টি বর্ণিত হয়েছে। এটি হচ্ছে তাউস ইবন কায়সান, হিরার ইবন আবিসাতি, আবদুল মালিক ইবন জুরাইজ-এর অভিমত।

(বিভিন্ন ইমামদের মাযহাবসমূহ তাহাবী শরীফের উপর ইমাম মুহাদ্দিস আইয়ুব মাজাহিরী কর্তৃক লিখিত হাশিয়াতে আন-নুখাবুল আফকার থেকে নকল করে বর্ণনা করা হয়েছে।)[৩২]

এ ছাড়া হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় (المتن) প্রত্যেক রাক'আতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রুকূর সংখ্যা পাঁচটি[৩৩] কোন কোন বর্ণনায় যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যগ্রহণ শেষ হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত

৩০. আল-ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, মুআস্সাছাতুল মুখতার ২০০১, কুসূফ অধ্যায়, কুসূফ নামায অনুচ্ছেদ, হাদীস নং -০০০/৭, খণ্ড ৬, পৃ. ২১২।

৩১. আবূ জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-আজদী আল-মিসরী আত-তাহাবী (রা) মৃত্যু ৩২১ হি. শারহু-মা'আনিল আসার, ভারত, সাদ বুক ডিপো দেওবন্দ, তা.বি. সালাত অধ্যায়, কুসূফ অনুচ্ছেদ, খণ্ড ১ম, পৃ. ২২৮।

৩২. শারহু মা'আনিল আসারের উপর ইমাম মুহাদ্দিস আইয়ুব মাজাহিরী কর্তৃক লিখিত হাশিয়া, দেওবন্দ, সা'দ বুক ডিপো, কুসূফ অধ্যায়, খণ্ড ১, পৃ. ২২৭-২২৮।

৩৩. যেমন উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে পাঁচটি রুকূ বুঝা যাচ্ছে। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

কোন নির্ধারিত সংখ্যা ছাড়া রুকূ সিজ্‌দা করতে থাকা[৩৪] এরকম উল্লেখও পাওয়া যায়। পরস্পর বিরোধী বক্তব্যে কতিপয় হাদীস এমন রয়েছে যেগুলোর বর্ণনাসূত্র নির্ভরযোগ্য; উল্লেখ হাদীস শাস্ত্রের আলোকে বিশ্বস্ততায় উত্তীর্ণ। এতে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি। তবে পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের মাঝে সমন্বয় সাধন এবং অগ্রাধিকার দেওয়ার বিভিন্ন কারণকে সামনে রেখে হানাফীগণ কুসূফের নামায সাধারণ নামাযের মত দু'রাক'আত দু'রুকূ বিশিষ্ট এই অভিমত গ্রহণ করেছেন।

পরস্পর বিরোধী হাদীসের মধ্যে সমন্বয় এবং অগ্রাধিকারের কারণ

১. অতিরিক্ত রুকূ প্রমাণকারী হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা ও দু'রাক'আতে দু'রুকূ প্রমাণকারী হাদীসের অগ্রাধিকারের কারণ হিসাবে বাদায়িউস সানায়ে গ্রন্থকার এবং হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী ও হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র) উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক আদায়কৃত কুসূফ নামায ছিল এক ব্যতিক্রমধর্মী, ঘটনাবহুল বৈশিষ্টমণ্ডিত নামায। এতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়। সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে ধরতে দেখেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বাভাবিক নামাযের ব্যতিক্রম এ নামাযে কিয়াম দীর্ঘায়িত করেছেন। এক রাক'আতে একাধিক রুকূ' করেছেন। তাঁর এ সকল রুকূ নামাযের অংশ ছিল না বরং শোকরের সিজ্‌দার ন্যায় তাখাশ্‌শুর (ভয়-বিহ্বল জনিত) রুকূ ছিল। যা স্বাভাবিক রুকূর চেয়ে অনেক দীর্ঘ ছিল। সংগত কারণে কোন কোন বর্ণনাকারী সাহাবী অতিরিক্ত রুকূগুলোকে নামাযের অংশ মনে করেননি এবং তা বর্ণনাও করেননি। কোন কোন বর্ণনাকারী সাহাবী এগুলোকে নামাযের অংশ গণ্য করেছেন এবং তা বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদায়কৃত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কুসূফ নামাযে অতিরিক্ত রুকূগুলোও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বৈশিষ্ট্য, যা একান্তভাবে তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত। অতএব কুসূফ নামাযের অতিরিক্ত রুকূ উম্মাতের জন্য প্রযোজ্য নয়। উম্মত এই বিশেষ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় প্রত্যেক রাক'আতে একটি রুকূ করতে হবে।[৩৫]

২. কাবিসা আল-হিলালী (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে কুসূফ নামায আদায়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা) সুস্পষ্ট ভাষায় সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى بِهِمْ فَقَرَاَ سُوْرَةً مِّنَ الطُّوْلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَّسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَرَأَ سُوْرَةً مِّنَ الطُّوْلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكْعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ يَدْعُوْ حَتّٰى انْجَلٰى كُسُوْفُهَا ·

আবূ দাঊদ সুলাইমান বিন আস-আস সিজিস্তানী, সুনানে আবূ দাঊদ, দিল্লি, ইতেকাদ পাবলিকেশন্স হাউস, কুসূফ অধ্যায়, কুসূফ অধ্যায়, রুকূর বর্ণনার অনুচ্ছেদ, হাদীস নং ১১৬৯, খণ্ড ১, পৃ. ৪৪৩।

৩৪. যেমন এখানে ইবনে আব্বাস (সা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهَ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ لَوْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فِى الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ لَرَكَعَ وَسَجَدَ فَهٰذَا سَعْدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهُ لَوْتَجَلَّتْ لَهُ الشَّمْسُ فِى الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ لَرَكَعَ وَسَجَدَ وَالرَّابِعَةُ هِىَ الْاُوْلٰى مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ·

আবূ জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-আযদী আল-মিসরী আত-তাহাবী (রা) মৃত্যু ৩২১ হি. শারহু-মা'আনিল আসার, ভারত, সা'দ বুক ডিপো দেওবন্দ তা. বি., সালাত অধ্যায়, কুসূফ অনুচ্ছেদ, খণ্ড ১ম, পৃ. ২২৯।

৩৫. দারসে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, সালাত অধ্যায়, কুসূফ অনুচ্ছেদ, খণ্ড ২, পৃ. ৩৪৮।

www.pathagar.com

فاذا رايتموها فصلوا كاحدث صلاة صليتموها من المكتوبة .

"তোমরা তা অবলোকন করলে ফজরের ফরয নামাযের ন্যায় নামায পড়বে।"[৩৬]

এ হাদীসে অতিরিক্ত রুকূর নির্দেশ না দিয়ে এবং (صلوا كما رايتموني اصلى) "তোমরা যে রকম নামায পড়তে আমাকে দেখেছ সেভাবে নামায পড়" এটা না বলে ফজরের ফরয নামাযের মত নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, অতিরিক্ত রুকূ তাঁরই বিশেষত্ব। উম্মতের জন্য যদি অতিরিক্ত রুকূ করা আবশ্যিক হত তা হলে তিনি ফজরের নামাযের মত নামায পড়ার নির্দেশ দিতেন না; বরং তাঁর মত নামায পড়ার নির্দেশ দিতেন।

৩. হাদীস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ মূলনীতি হল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্তিমূলক হাদীস তথা কাওলী এবং কর্মমূলক হাদীস তথা আমলী হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব হলে উক্তিমূলক হাদীসকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। দুই রাক'আতে দুই এর অধিক রুকূ প্রমাণ করে সেই রকম কর্মমূলক হাদীস থাকলেও উক্তিমূলক কোন হাদীস নেই। অথচ দুই রাক'আতে দুই রুকূ প্রমাণিত হয় সে রকম উক্তিমূলক এবং কর্মমূলক দুই ধরনের হাদীসই পাওয়া যাচ্ছে। অতএব যে হাদীসগুলো দু'রাক'আতে দুই রুকূ প্রমাণ করে সেসব হাদীসকেই অগ্রাধিকার দেয়া অধিক বাঞ্ছনীয়।

কুসূফ ও খুসূফ নামাযের কিরা'আত

কুসূফ নামাযের কিরা'আত ইমাম আযম আবূ হানীফা (র), ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে চুপে চুপে পড়া হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মদ (র), ইমাম আহমদ (র)-এর মতে উচ্চস্বরে কিরা'আত পড়া হবে।[৩৭]

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র), ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফিঈ (র)-এর দলীল হচ্ছে ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস ঃ

عن ابن عباس رضى الله صليت مع النبى ﷺ الكسوف فلم اسمع منه حرفا من القراءة . وفى إعلاء السنن عن ابن عباس رضى الله عنهما قال صليت الى جنب رسول الله ﷺ يوم كسفت الشمس فلم اسمع ل قراءة ، رواه الطبرانى فى معجمه (نصب الراية ، ٢٣:١) وفى اثار السنن (١١٤:٢) اسناده حسن . العلامة ظفر أحمد العثمانى ، إعلاء السنن ، (السابق) رقم الحديث ، ٢١٥٩ ، الجزء الثامن ، الصفحة : ١٧ .

হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। আমি রাসূলে পাক (সা)-এর পিছনে সূর্যগ্রহণের নামায পড়েছি, কিরা'আতের একটি শব্দও শুনতে পাইনি।[৩৮] এই রকমভাবে সামূরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

صلى بنا رسول الله صلى فى كسوف لا نسمع له صوتا وفى عمدة القارى : رواه الترمذى وأبو داؤد والنسائى وابن ماجة والطحاوى أخرجه من

৩৬. ইমাম আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনে আস'আস সিজিস্তানী, সুনানে আবূ দাউদ শরীফ, ইতিকাদ পাবলিকেশন্স হাউস ১৯৯৩, কুসূফ অধ্যায়, দু'রুকূ, তিন রুকূ বর্ণনা অধ্যায়, হাদীস নং ১১৭২, খণ্ড ১, পৃ. ৪৪৫।

৩৭. হিদায়া, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ১৫৫।

৩৮. শারহু মা'আনিল আসার, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ২৩১।

www.pathagar.com

اربع طرق صحاح وقال الترمذى هذا حديث صحيح ، الامام بدر الدين العينى ، عمدة القارى (السابق) الجزء السابع ، الصفحة : ٩٢)

রাসূলে পাক (সা) আমাদেরকে নিয়ে সূর্যগ্রহণের নামায আদায় করেছেন, তবে তাঁর কোন আওয়াজ শোনা যায়নি।[৩৯]

ইমাম আবূ ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মদ (র) ও ইমাম আহমদ (র)-এর দলীল হচ্ছে, আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদস ঃ

عن عائشة رضى الله عنها جهر النبى ﷺ فى صلوة الخسوف بقراءته فاذا فرغ من قراءته كبر فرفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم يعاود القراءة فى صلوة الكسوف أربع ركعات فى ركعتين وأربع سجدات .

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সূর্যগ্রহণের নামাযে উচ্চস্বরে কিরা'আত পাঠ করলেন এবং কিরা'আত শেষ করে রুকূ করলেন এবং রুকূ থেকে যখন উঠতে লাগলেন তখন বললেন سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد। তারপর পূর্ণরায় কিরা'আত পড়তে লাগলেন। উক্ত সূর্যগ্রহণের নামাযে চারটি রুকূ ছিল, অথচ এই নামায দুই রাক'আত ও চার সিজ্‌দা বিশিষ্ট ছিল।[৪০]

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর পক্ষ থেকে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা হচ্ছে–এখানে كسوف শব্দটি চন্দ্রগ্রহণের জন্য ব্যবহার হয়েছে। কারণ كسوف চন্দ্রগ্রহণকেও বলা হয়। উল্লেখ্য যে, খুসূফ তথা চন্দ্রগ্রহণের নামাযে কিরা'আত রাতের নামায হিসাবে চুপে চুপে বা উচ্চস্বরে যে ভাবে ইচ্ছা পড়া যাবে। কেননা, খুসূফ রাতের নফল নামায।[৪১] ইমাম শাফিঈ (র) ও ইমাম মালিক (র)-এর মতে চন্দ্রগ্রহণের নামাযের কিরা'আত উচ্চস্বরে পড়া উত্তম।[৪২]

কুসূফের নামাযের খুতবা

উক্ত নামাযের পরে ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে জুমু'আ ও ঈদের খুতবার মত দু'টি খুত্‌বা দেওয়া সুন্নাত। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র), ইমাম মালিক (র) ও ইমাম মালিক (র) ও ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে এই নামাযের পরে কোন খুতবা নেই। তবে ইমাম মালিক (র)-এর মতে এই নামাযের পরে হামদ-সালাতসহ জনগণের উদ্দেশ্যে নসিহত করা মুস্তাহাব।[৪৩]

ইমাম শাফিঈ (র)-এর দলীল হচ্ছে, আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ঃ

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت خسفت الشمس فى عهد رسول الله ﷺ فصلى رسول الله ﷺ بالناس فقام فاطال القيام ثم ركع

৩৯. সুনানে নাসাঈ শরীফ, প্রাগুক্ত, কুসূফ অধ্যায়, কুসূফ নামাযের কিরা'আত উচ্চস্বরে না পড়া প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদ, খণ্ড ১, পৃ. ৪৭১।

৪০. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী কায়রো, মাকতবা মিসর ২০০২, কুসূফ অধ্যায়, কুসূফ নামাযে উচ্চস্বরে কিরা'আত পাঠ অনুচ্ছেদ, হাদীস নং ১০৬৫, খণ্ড ২, পৃ. ৭৮০।

৪১. হিদায়া, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১ম, পৃ. ৮৬।

৪২. আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ৪০২।

৪৩. প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ৪১৬।

www.pathagar.com

فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام وهو دون القيام الاول ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الركوع الاول ثم سجد فاطال السجود ثم فعل فى الركعة الثانية مثل ما فعل فى الاولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا . وفى عمدة القارى ورجاله قد ذكروا غير مرة مختصرا على قوله الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا الامام بدر الدين العينى ، عمدة القارى (السابق) الجزء السابع ، السفحة : ٦٩

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর রুকূ' করলেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে রুকূ' করার পর দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তবে এই দাঁড়ানোটা পূর্বের চেয়ে একটু কম। তারপর রুকূ' করলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকূতে থাকলেন। তবে এই রুকূ' পূর্বের চেয়ে একটু কম। তারপর সিজ্দায় গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে সিজ্দায় থাকলেন। তার দ্বিতীয় রাক'আত প্রথম রাক'আতের মতই আদায় করলেন। তারপর লোকদের দিকে ফিরলেন। তখন সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করলেন, আল্লাহ্র প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন এবং বললেন ঃ চন্দ্র সূর্য আল্লাহর নিদর্শন, কারো মৃত্যু বা জীবনের কারণে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হয় না। তোমরা যদি এই রকম চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ দেখা তা হলে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করতে থাক, তাকবীর পাঠ কর, নামায পড়, দান-খয়রাত কর।[৪৪]

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র), ইমাম মালিক (রা), ইমাম আহমাদ (র)-এর দলীলও হচ্ছে উল্লিখিত হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসের এই অংশ যে ঃ فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا অর্থাৎ তোমরা যখন আল্লাহ তা'আলার এই সব নিদর্শন দেখবে তখন আল্লাহ্র কাছে দু'আ কর, তাকবীর পাঠ কর, নামায পড়, দান-খয়রাত কর।

উক্ত হাদীসে খুতবা দেওয়ার ব্যাপারে কোন নির্দেশ নেই। তবে উক্ত হাদীসে রাসূলে পাক (সা) খুতবা প্রদান করেছেন বলে যে উল্লেখ আছে হানাফীদের পক্ষ থেকে তার ব্যাখ্যা হচ্ছে যে, কিছু কিছু মানুষের ধারণা ছিল যে–রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তনয় ইব্রাহীমের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে। উক্ত ধারণা খণ্ডন করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে যাওয়ার পর উক্ত খুতবা প্রদান করেন। বাস্তবে কুসূফ নামাযের সুন্নাত হিসাবে যদি উক্ত খুতবা দিতেন তা হলে সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে যাওয়ার পর উক্ত খুত্বা দিতেন না এবং প্রচলিত খুতবার নিয়মানুযায়ী মাঝখানে বসতেন। এ থেকে বুঝা যায়, কুসূফ নামাযের সুন্নাত হিসাবে রাসূলুল্লাহ (সা) উক্ত খুতবা প্রদান করেননি। এই খুতবা উক্ত নামাযের সুন্নাত নয়।[৪৫]

---

৪৪. বুখারী শরীফ, প্রাগুক্ত, কুসূফ অধ্যায়, সূর্যগ্রহণ হলে দান করা অনুচ্ছেদ হাদীস নং ১০৪৪, খণ্ড ২, পৃ. ৭৫২।

৪৫. হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা-মারাকিল ফালাহ্, প্রাগুক্ত, সালাত অধ্যায়, কুসূফ অনুচ্ছেদ, খণ্ড ১, পৃ. ২৯৮।

www.pathagar.com

জানাযার নামায আদায়ের নিয়ম

জানাযার নামায আদায়ের নিয়ম হল, মৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক বা নারী ইমাম সাহেব তার বুক বরাবর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর নিয়্যত করত 'আল্লাহু আকবার' বলে দুই হাত কিবলামুখী করে কান বরাবর উত্তোলন করবে এবং নামাযে হাত বাঁধার ন্যায় হাত বাঁধবে। এবার হাদীসে বর্ণিত কোন সানা পড়েব। যেমন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ .

এরপর দ্বিতীয় তাকবীর বলবে, কিন্তু হাত তুলবে না। দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ পাঠ করবে। যেমন ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

এরপর তৃতীয় তাকবীর বলবে, কিন্তু হাত তুলবে না এবং নিজের জন্য, মৃত ব্যক্তির জন্য ও সকল মুসলমানের জন্য দু'আ করবে। যেমন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا ، وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ .

এছাড়া হাদীসে অন্যান্য দু'আ বর্ণিত আছে, সহীহ বর্ণনা থেকে নিয়ে সেগুলোর কোনটিও পড়া যেতে পারে। অবশ্য মৃত ব্যক্তি যদি নাবালেগ শিশু হয়, তা হলে উপরোল্লেখিত ইস্তিগফার সম্বলিত দু'আ পরিবর্তে নিম্নোক্ত দু'আ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا ، وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا ، وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا .

এরপর হাত তোলা ব্যতীত চতুর্থ তাকবীর বলে দু'দিকে সালাম ফেরাবে।[১]

---

১. ক. বুরহানুদ্দীন মুরগীনানী (র) ৫৯৩ হি ঃ হিদায়া. মাকতাবাতু শারিকাতিল ইসলামিয়্যা, মুলতান খণ্ড ১, পৃ. ১৮০; খ. ইবনুল হুমাম (র)৮৬১ হি. ঃ ফাতহুল কাদীর, দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরাবী, খণ্ড ২,

www.pathagar.com

১. ইমাম দাঁড়নোর স্থান

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) থেকে প্রসিদ্ধ বর্ণনানুসারে ইমাম মৃত ব্যক্তির বুক বরাবর দাঁড়াবে, মায়্যিত পুরুষ হোক বা মহিলা হোক।

এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِيْ نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا - رواه البخارى فى صحيحه ١٧٧/١، والجماعة .

'সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর পেছনে এমন এক মহিলার জানাযার নামায পড়েছি যে নিফাস অবস্থায় (সন্তান প্রসবের সময়) মারা গিয়েছিল, তখন তিনি ঐ মহিলার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।[২]

আর মাঝ বরাবরের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইমাম সারাখ্সী (র) ৪৯০ হি.) তাঁর সুবিখ্যাত 'মাবসূত' কিতাবে বলেন ঃ

الصدر هو الوسط، فإن فوقه يديه ورأسه ، وتحته بطنه ورجليه ، السرخسى فى المبسوط ٦٦/٢

'বুকই হল মধ্যবর্তী স্থান কারণ এর উপরে রয়েছে হাত এবং মাথা, আর নিচে হল পেট ও পা'।[৩]

এছাড়া যুক্তি ও এ মতের পক্ষে সমর্থন করে। কেননা বুকই হল কলবের স্থান, আর কলবেই মু'মিনের ঈমান থাকে তাই সে বরাবরই দাঁড়ানো উচিত।

তবে এ ব্যাপারে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। তা হল, ইমাম পুরুষ ব্যক্তির মাথা বরাবর দাঁড়াবে আর মহিলার মাঝ বরাবর দাঁড়াবে।

হাদীসের আলোকে এ মতটি ও বেশ প্রমাণিত। কারণ এ ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস রয়েছে।

তা হল হযরত আনাস (রা)-এর একটি দীর্ঘ বর্ণনা। আর অংশবিশেষ নিম্নরূপ ঃ

قَالَ اَبُوْ غَالِبٍ ... فَلَمَّا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ قَامَ اَنَسٌ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَاَنَا خَلْفَهُ لاَ يَحُوْلُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ شَيْئٌ ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ

পৃ.-৮৫-৮৬। গ. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ হালাবী র. (৯৫৬ হি.) ঃ মুনতাকাল আবহুর, দারুল কাতুবিল ইসলামিয়্যা বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮ ইং, খণ্ড-১, পৃ.-২৭০। ঘ. আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ (১০৭৮ হি.) ঃ মাজমাউল আনহুর, প্রাগুক্ত।

২ ইমাম বুখারী র. ২৫৬ হি. ঃ সহীহ, কিতাব الجنازة বাব اين يقوم المرءة والرجل আশরাফী বুক ডিপো দেওবান্দ, খণ্ড-১, পৃ-১৭৭।

৩. সারাখ্সী (৪৯০ হি.) ঃ মাবসূত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, প্রথম মুদ্রণ ১৯৯৩ ইং, খণ্ড ২, পৃ. ৬৬।

www.pathagar.com

لَمْ يُطَوِّلْ وَلَمْ يُسْرِعْ ثُمَّ ذَهَبَ يَقْعُدُ ، فَقَالُوْا يَا اَبَا حَمْزَةَ الْمَرْأَةُ الاَنْصَارِيَّةُ ، فَقَرَّبُوْهَا وَعَلَيْهَا نَعْشٌ اَخْضَرُ ، فَقَامَ عِنْدَ عَجِيْزَتِهَا فَصَلّٰى عَلَيْهَا نَحْوَ صَلاَتِه عَلَى الرَّجُلِ ثُمَّ جَلَسَ ، فَقَالَ الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ : يَا اَبَا حَمْزَةَ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى عَلَى الْجَنَازَةِ كَصَلاَتِكَ ، يُكَبِّرُ عَلَيْهَا اَرْبَعًا ، وَيَقُوْمُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجِيْزَةِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ... الخ - رواه أبو داؤد فى سننه ٩٩/٢ وسكت عنه ، وقال الترمذى : حديث أنس حديث حسن ، وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا ٢٠٠/١

আবু গালিব (র) বলেন, . . . যখন জানাযা রাখা হল তখন আনাস (রা) দাঁড়ালেন এবং তার জানাযার নামায আদায় করলেন। আমি তাঁর পেছনেই ছিলাম, আমাদের দু'জনের মাঝে আর কেউ ছিল না। তিনি মৃত ব্যক্তির মাথা বরাবর দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং চার তাকবীর দিয়েছিলেন, এ ক্ষেত্রে তিনি নামায খুব লম্বাও করেননি আবার খুব দ্রুতও পড়েননি। এরপর তিনি বসতে গেলে সবাই বলল, হে আবূ হামযা! (হযরত আনাসের উপনাম) একজন আনসারী মহিলার লাশ রয়েছে। অতঃপর তারা তাকে হযরত আনাস (রা)-এর কাছাকাছি রাখল, তখন তার খাটটি সবুজ কাপড়ে ঢাকা ছিল। আনাস (রা) লাশের নিতম্ব (কোমর) বরাবর দাঁড়ালেন অতঃপর তিনি যেভাবে পুরুষ ব্যক্তির নামায পড়েছেন সেভাবে তার (মহিলার) নামাযও আদায় করলেন, তারপর বসলেন।

আলা ইব্ন যিয়াদ (র) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হামযা! রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি এভাবে জানাযার নামায পড়তেন যেভাবে আপনি পড়েছেন যে, চার তাক্বীর দিতেন পুরুষের মাথার কাছে দাঁড়াতেন আর মহিলার কোমর বরাবর দাঁড়াতেন ? হযরত আনাস বললেন, হ্যা! ...'।[৪]

হাদীসটি বর্ণনাকারীগণ সকলে নির্ভরযোগ্য। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে حسن (হাসান) পর্যায়ের বলেছেন।[৫] আল্লামা আইনী (র) এবং আল্লামা আসকালানী (র) ও হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৬]

---

৪. ক. ইমাম আবু দাউদ (র) ২৭৫ হি. ঃ সুনান, কিতাব الجنازة বাব اين يقوم الامام من الميت إذا صلى এ ইচ. এম. সাঈদ কোম্পানী করাচী, খণ্ড-২, পৃ.-৯৯। খ. ইমাম তিরমিযী র. ২৭৯ হি. ঃ সুনান, কিতাব ابواب الجنازة বাব باب ماجاء اين يقوم الإمام من الرجل والمرءة ইয়াসীর নদীম কোং দেওবন্দ, খণ্ড ১, পৃ.-২০০।

৫. প্রাগুক্ত।

৬ আইনী (র) (৮৫৫ হি.) ঃ উমদাতুল কারী, ইহয়াউত তুরাসিল আরাবী বৈরুত, খণ্ড ৮, পৃ. ১৩৭, ইবন হাজার আসকালানী (র) (৮৫২ হি.) ঃ ফাতহুল বারী, দারুর রাইয়ান কায়রো দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৭ ইং খণ্ড ৩, পৃ. ২৩৯; আযীমাবাদী র. (১৩২৯ হি.) আউনুল মা'বুদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা বৈরুত, খণ্ড ৮, পৃ. ৩৪১।

www.pathagar.com

এ হাদীসে পুরুষের মাথা বরাবর দাঁড়ানোর কথা উল্লেখ রয়েছে। এ হাদীস থেকে বলা যায় যে, পুরুষের মাথা বরাবর দাঁড়ানোই উত্তম। তবে মহিলার ব্যাপারে সামুরা ইবনে জুনদুব (রা)-এর হাদীসে মাঝ বরাবর দাঁড়ানোর কথা রয়েছে। এবং হযরত আনাসের হাদীসে কোমর বরাবর দাঁড়াবার কথা বর্ণিত হয়েছে।

হাদীস দু'টিকে পরস্পর বিপরীত মনে করার কোন কারণ নেই। কারণ কোমর তো শরীরের মাঝ বরাবরই। এটিও ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর একটি অভিমত। ইমাম আযম আবূ হানীফার এ দ্বিতীয় অভিমতটির পক্ষে যেহেতু হাদীসের সার্বিক সমর্থন পাওয়া যায়, তাই এ মতটি গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। একারণেই ইমাম তাহাভী (র) (৩২১ হি) ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর এ দ্বিতীয় মতটিই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

والرواية التى يقوم فيها من الرجل بحذاء رأسه ومن المرأة بحذاء وسطها أحب إلينا لما شهدها من الاثار التى رويناها عن رسول الله ﷺ ذكره المنبجى فى اللباب ٣٤٢/١ ، نقلا عن الإمام الطحاوى ، وفى شرح معانى الاثار له . ٣١٦/١ .

ইমাম আযম আবু হানীফা (র) থেকে-যে বর্ণনায় রয়েছে পুরুষের মাথা বরাবর দাঁড়াবে আর মহিলার মাঝ বরাবর দাঁড়াবে, সে বর্ণনাটিই আমাদের দৃষ্টিতে বেশী পছন্দনীয়। কারণ, এর সমর্থনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস রয়েছে, যা আমরা বর্ণনা করলাম'।[৭]

২. জানাযার নামাযে তাকবীরের সংখ্যা

জানাযার নামাযে তাকবীরের সংখ্যা হল চারটি । বহু হাদীস থেকে তা প্রমাণিত। যেমন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَعٰى النَّبِىُّ ﷺ اِلَى الصَّحَابَةِ النَّجَاشِىَّ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوْا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا ، أخرجه البخارى فى صحيحه ١٧٢/١

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) সাহাবায়ে কিরামকে নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ শুনালেন এবং সামনে এগিয়ে দাঁড়ালেন সাহাবায়ে কিরাম তাঁর পেছনে কাতার বন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি চার তাকবীরে নামায পড়লেন।[৮]

عَنْ اَنَسٍ فِىْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ ، قَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ : يَا اَبَا حَمْزَةَ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ عَلَى الْجَنَازَةِ كَصَلَاتِكَ ، يُكَبِّرُ عَلَيْهَا اَرْبَعًا ،

৭ ক. আলী ইবন যাকারিয়া মামবাজী (র) হি. আললুবাব, মাকতাবায়ে গাফুরিয়া আসেমিয়া করাচী, খণ্ড ১, পৃ. ৩৪২। খ. ইমাম তাহাবী র. (৩২১ হি.) শারহু মা'আনিল আসার, কিতাব الجنازة বাব الرجل يصلى على الميت اين ينبغى ان يقوم মাকতাবায়ে থানভী, দেওবন্দ খণ্ড ১, পৃ. ৩১৬।

৮. ইমামা বুখারী (র), সহীহ বুখারী, কিতাব الجنازة বাব الصفوف على الميت আশরাফী বুক ডিপো দেওয়বন্দ, খণ্ড ১, পৃ. ১৭৬।

www.pathagar.com

وَيَقُوْمُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجِيْزَةِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ... الخ ، رواه أبو داؤد فى سننه ٩٩/٢ وسكت عنه ، وقال الترمذى حديث أنس حديث حسن .

২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে আছে আলা ইবন যিয়াদ (র) আনাস (রা)-কে বলেন, হে আবু হামযা, রাসূলুল্লাহ (সা) কি এভাবেই জানাযার নামায পড়তেন যেভাবে আপনি পড়েছেন যে, চার তাকবীর দিতেন, পুরুষের মাথা বরাবর আর মহিলার কোমর বরাবর দাঁড়াতেন ? হযরত আনাস জবাবে বললেন হ্যা।...[৯]

عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَنَ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ اَرْبَعًا وَخَمْسًا وَّسِتًّا وَّسَبْعًا وَثَمَانِيًا ، حَتّٰى جَاءَ مَوْتُ النَّجَاشِىِّ فَخَرَجَ اِلَى الْمُصَلّٰى ، فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا ، ثُمَّ ثَبَتَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى اَرْبَعٍ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ، اَخْرَجَه اِبْنُ عَبْدِ البر فى كتاب الاستذكار ٢٣٩/٨ واستدل به وهو إمام مجتهد وليس فى الإسناد شيء ينكر .

৩. আবূ বক্‌র ইবন সুলায়মান ইবন আবু হাস্‌মা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) জানাযার নামাযে চার তাকবীর, পাঁচ তাকবীর, ছয় তাকবীর দিতেন, সাত তাকবীর দিতেন। আবার কখনো তিনি আট তাকবীর বলতেন। শেষ পর্যন্ত যখন নাজাশীর ইন্তিকালের খবর এল তখন তিনি ময়দানে বের হলেন, মানুষ তাঁর পেছনে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) সে নামাযে চার তাকবীর দিয়েছেন। এর পর থেকে তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত চার তাকবীরের উপরই তাঁর আমল বহাল ছিল।[১০]

উল্লেখিত হাদীসগুলোর ভাষ্য থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, জানাযার নামায চার তাকবীরেই হবে। এটিই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। তবে রাসূলুল্লাহ (সা) বিশেষ কোন কারণে কখনো কখনো চারের অধিক তাক্‌বীর দিয়েছেন বলেও কেউ কেউ চারের অধিক তাক্‌বীর দিতেন।[১১]

এ সম্পর্কে ইমাম ইবন আবদুল বার (র) বলেন ঃ

اتفق الفقهاء أهل الفتوى بالامصار على أن التكبير على الجنائز أربع لازيادة ، على ما جاء فى الأثار المسندة من نقل الأحاديث الثقات ،

---

৯. সুনানে আবু দাউদ, প্রাগুক্ত

১০. ইবন আব্দুল বার (র) (৪৬৩ হি.) ঃ আল ইসতিযকার, মু'আস্‌সাতুর রিসালা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৩ ইং, খণ্ড ৮, পৃ. ২৩৯।

১১. ইমাম আবূ দাউদ সুনান, কিতাব الجنازة বাব التكبير على الجنازة এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানী করাচী, খণ্ড ২, পৃ. ১০০।

www.pathagar.com

وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم ولايعرج عليه ، الاستذكار ٢٣٩/٨

বিভিন্ন দেশের ফাতওয়াবিদ ফুকাহায়ে কিরাম এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, জানাযার নামাযের তাকবীর চারটি, এর বেশী নয়। এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিভিন্ন হাদীস রয়েছে। তাকবীরের সংখ্যার ব্যাপারে-এর বাইরে যে মত রয়েছে, তা আইম্মায়ে কিরামের দৃষ্টিতে (شاذ) অগ্রহণযোগ্য। আজকাল সে মতের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করা হয় না এবং তাকে কোন গুরুত্বও দেয়া হয় না।[১২]

এ ক্ষেত্রে ইবন আব্দুল বার (র) একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন,

إذا كان السلف فى مسألة على قولين أو أكثر ثم أجمع أهل عصر فى أفاق المسلمين بعدهم على قول من أقاويلهم وجب الاحتمال عليه، والوقوف عنده والرجوع إليه المصدر السابق .

সালফ তথা পূর্ববর্তী মনীষীদের (সাহাবী ও তাবিঈনের) মাঝে যদি কোন মাস'আলা নিয়ে দ্বিমত বা আরো বেশী মত থাকে এবং পরবর্তীতে কোন এক যুগে সকল এলাকার আহলে ইলম সেসব মতের কোন একটির ব্যাপারে একমত হয়ে যান, তাহলে সে মতের অনুসরণ করা জরুরী হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় কোন মতের সুযোগ থাকে না।' ।[১৩]

এ ইজমা বা ঐক্যমতই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর যুগে। ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন ঃ

إن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمسا وستا وأربعا حتى قبض النبى ﷺ ثم كبروا بعد ذلك فى ولاية بكر حتى قبض أبو بكر رضى الله عنه، ثم ولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ففعلوا ذلك فى ولايته ، فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : إنكم معشر أصحاب محمد ﷺ أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبى ﷺ حين قبض فيأخذون به ، ويرفضون ما سوا ذلك ، فنظروا ، فوجدوا أخر جنازة كبر عليها رسول الله ﷺ أربعا ، انتهى عند المحدثين ، ورواه عبد الرزاق فى مصنفه عن عامر بن ومرسل النخعى حجة عند المحدثين ، ورواه عبد الرزاق فى مصنفه عن عامر بن شقيق عن أبى وائل ٤٧٩/٣

---

১২. ইবন আব্দুল বার (৪৬৩ হি.) আল-ইসতিসকার, মু'আসসাসাতুর রিসালা, ১৯৯৩ ইং, খণ্ড ৮, পৃ. ১২৯।

১৩. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

উল্লেখিত বর্ণনাটির মর্মার্থ হল, কোন কোন সাহাবী যেহেতু তাকবীরের সংখ্যার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতেন, তাই হযরত উমর (রা) হাদীসের আলোকে সবার ঐকমত্যে চার তাকবীরে জানাযার নামায পড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।[১৪]

অতএব বলা যায় যে, চার তাকবীরে জানাযার নামায আদায় করা ইজ্‌মা উপর প্রতিষ্ঠিত।

৩. জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া

জানাযায় নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন বলে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই।[১৫]

আর সাহাবায়ে কিরাম এব্যাপারে দু'ধরনের মত পোষণ করতেন। কোন কোন সাহাবীর মত হল, প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পড়বে। আর কোন সাহাবীর মতে প্রথম তাক্‌বীরের পর হামদ ও সানা সম্বলিত যে কোন দু'আ পড়বে, আর সে হিসেবে সূরা ফাতিহাও পড়তে পারে। এ ক্ষেত্রে কোন দু'আ বা সূরা নির্দিষ্ট নেই।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (র) ইবন আব্বাস (রা) উসমান ইবন হুনাইফ (র) ও আবূ উলামা উমামা ইবনে সাহল ইবন হুনাইফ প্রমুখ সূরা ফাতিহা পড়তেন। পক্ষান্তরে ইবন উমর, আবূ হুরায়রা (রা) ও ফাযালা ইবন উবায়েদ (রা) প্রমুখ সাহাবী সূরা ফাতিহা পড়তেন না।

ইমাম আযম আবূ হানীফা ও হানাফী ইমামগণ ঐসকল সাহাবায়ে কিরামের মত গ্রহণ করেছেন যাঁরা সূরা ফাতিহা পড়তেন না বা পড়াকে জরুরী মনে করতেন না। প্রথম মতটি গ্রহণ না করে দ্বিতীয়টি গ্রহণ করার অনেকগুলো দলীল রয়েছে। নিম্নে সেগুলো প্রদত্ত হল ঃ

عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْمُقَبِّرِىِّ اَنَّهُ سَاءَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَيْفَ تُصَلِّى عَلَى الْجَنَازَةِ ؟ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : أَنَا لَعَمْرُ اللّٰهِ أُخْبِرُكَ ، اَتْبَعُهَا مِنْ أَهْلِهَا فَأِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَمَدْتُ اللّٰهَ ، وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ ، ثُمَّ اَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَّتِكَ كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اَنْتَ.. الخ ، انتهى ، أخرجه مالك فى الموطأ ، ورجاله ثقات اثبات.

আবূ সাঈদ মাকবুরী (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন আপনি জানাযার নামায কিভাবে আদায় করেন ? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাকে এব্যাপারে

---

১৪. আবূ হানীফা র. (১৫০ হি.) কিতাবুল আসার, কিতাব الجنائز বাব الصلاة على الجنائز আররাহীম একাডেমী করাচী, পৃ. ২১৩; আব্দুর রায্‌যাক (২১১ হি.) মুসান্নাফ, কিতাব الجنائز বাব التكبير على الجنائز, ইদারাতুল কুরআন, করাচী, খণ্ড ৩, পৃ. ৪৭৯।

১৫. অবশ্য এক্ষেত্রে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়, দু'টিই ভিত্তিহীন। একটি হযরত জাবির (রা)-এর উদ্ধৃতিতে, অপরটি হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতিতে। ইবন আবদুল বার (র) প্রথমটি উল্লেখ করে বলেন ليس بثابت عن جابر 'হাদীসটি জাবির (রা) থেকে প্রমাণিত নয়'। অর্থাৎ জাবির (রা) এ হাদীসটি বর্ণনাই করেননি। আল-ইসতিযকার, খণ্ড ৮, পৃ. ২৬৪। আর দ্বিতীয় বর্ণনাটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, ইবন আব্বাস (রা) থেকে এ বর্ণনাটি সহীহ নয়। তাঁর থেকে সহীহ বর্ণনা হল ঃ من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب, সুনানে তিরমিযী, খণ্ড ১. পৃ. ১৯৮, ফাতহুল বারী, খণ্ড ৩, পৃ. ২৪৩।

www.pathagar.com

জানাব। মৃত ব্যক্তির বাড়ী থেকে তার পেছনে পেছনে আমি আসি। যখন লাশ রাখা হয় তখন আমি তাকবীর বলি, এরপর আল্লাহ্ তাআলার হামদ-সানা পড়ি। আতঃপর দরূদ পাঠ করি, এরপর এ দু'আ পড়ি اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك ، كان يشهد أن لا إله إلا أنت الخ[১৬]

عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ فى الصلاة على الجنازة ، انتهى . رواه مالك فى الموطأ بأصح الأسانيد فى إطلاق .

'নাফির বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) জানাযার নামাযে কোন সূরা পাঠ করতেন না'।[১৭]

قال : مالك فى الصلاة على الجنازة : إنما هو - أى صلاة الجنازة الدعاء، وإنما فاتحة الكتاب ليس بمعمول بها فى بلدنا ، انتهى - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ٢٦٢/٨

মালিক (র) বলেন, জানাযার নামায হল দু'আ আমাদের মদীনায় জানাযার নামাযে ফাতিহা পড়ার কোন রেওয়াজ নেই।[১৮]

সাহাবায়ে কিরামের পর সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র), আতা ইবন আবু রাবাহ (র) সালিম ইবন আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রা)সহ তাবিঈ ফকীহগণ এ মতটি গ্রহণ করেছেন।[১৯]

মক্কার তাবিঈ ফকীহ ইব্ন আবু রাবাহকে জানাযার নামাযে সূরা পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন। ما سمعنا بهذا 'জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার কথা আমরা শুনিইনি'।[২০] তেমনিভাবে বকর ইবনে আব্দুল্লাহ (র) ও মায়মূন (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তাঁরা বলেন, জানাযার নামাযে সূরা পাঠ করার কথা আমরা শুনিনি'।[২১]

মক্কা, মদীনা ও কূফার শীর্ষস্থানীয় এসকল তাবিঈর উপরোক্ত উক্তিগুলো থেকে প্রমাণিত হয়, জানাযার নামাযে সূরা পাঠ না করার আমলটিই সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈনের মাঝে বেশী ব্যাপক ছিল।

৪. ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিম্নোক্ত উক্তিটি, যাতে জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার উল্লেখ রয়েছে, সেটিও প্রমাণ করে যে, তখনকার সময়ে সূরা ফাতিহা না পড়ার আমলটিই ব্যাপক ছিল।

১৬, ইমাম মালিক, কিতাব الجنائز বাব ما يقول المصلى على الجنازة, মাকতাবায়ে থানভী, দেওবন্দ, পৃ. ৭৯।

১৭. প্রাগুক্ত।

১৮. ইবন আব্দিল বার (র), আল ইসতিযকার, মু'আস্সাসাতুর রিসালা, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৯৩ ইং খণ্ড ৮, পৃ. ২৬২।

১৯. ইবনে আবী শাইবা (২৩৫ হি.) মুসান্নাফ, কিতাব الجنائز বাব من قال ليس على الجنازة قراءة খণ্ড ৩, পৃ. ১৮২-১৮৩, আব্দুর রাযযাক র. (২১১ হি.) মুসান্নাফ কিতাব الجنائز বাব القراءة والدعاء فى الصلاة على الميت খণ্ড ৩, পৃ. ৪৮৮-৪৯৩।

২০. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, প্রাগুক্ত।

২১. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلٰى جَنَازَةٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ اَخَذْتُ بِيَدِهٖ فَسَاَلْتُهُ، فَقُلْتُ : تَقْرَأُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اِنَّهُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ ، انتهى رواه النسائى فى سننه ، والحديث صحيح ثابت .

তালহা ইবন আব্দুল্লাহ (র) বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর পেছনে এক বার জানাযার নামায আদায় করেছি, নামাযে তাঁকে সূরা ফাতিহা পড়তে শুনতে পেলাম। তাই যখন নামায শেষ হল তখন আমি তাঁর হাত চেপে ধরলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি-জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েন ? জবাবে তিনি বললেন, হ্যা! এটাই ঠিক এবং এটাই তরীকা'।[২২]

এ বর্ণনা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, ইবন আব্বাস (রা) জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার তরীকাটিকেই সঠিক মনে করতেন। পাশাপাশি তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ (র) যিনি শীর্ষস্থানীয় তাবিঈনের একজন, তিনি এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করছেন যার মুখোমুখি ইতিপূর্বে তিনি হননি। তাই যখন ইবন আব্বাস (রা)-কে সূরা ফাতিহা পড়তে শুনেছেন তখন এ সম্পর্কে তাঁর প্রশ্ন জেগেছে তাই নামায শেষ করেই তাঁর হাত চেপে ধরেছেন এবং আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, আপনি কি জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েন ?

ইবন আব্বাস (রা)-এ আমলটিকে انه حق وسنة বলে আখ্যায়িত করার কারণে অনেকে একে مرفوع বা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমল মনে করেন। উল্লেখ্য, এ শব্দ কখনো কখনো مرفوع বা রাসূলের আমল বা উক্তিকে বুঝালেও সব সময় তা বুঝায় না। বিশেষত যখন কোন মাস'আলার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মাঝে মতবিরোধ থাকে, তখন যিনি যে মতটিকে প্রাধান্য দেন সেটিকে তিনি সুন্নাত বা পালনীয় মনে করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জীবনে শত সহস্র জানাযার নামায আদায় করেছেন, কিন্তু কোন একটি সহীহ বর্ণনার এমন স্পষ্ট পাওয়া যায় না যে, তিনি তাতে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করেছেন। তাই শুধু إنه سنة ভিত্তিতে এটিকে রাসূলের আমল বলার কোন সুযোগ নেই।

এছাড়া এমন কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় যেগুলোতে জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার আদেশ রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর কোনটিই বর্ণনা সূত্রের বিবেচনায় দলিল হওয়ার যোগ্য নয়। কোনটি মাউযূ (জাল), কোনটি একেবারে যাঈফ।[২৩]

অনেকে অজ্ঞতাবশত لاصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب হাদীসটি দ্বারা দলিল দেয়। এটি মারাত্মক একটি ভুল। এ নামায দ্বারা জানাযার নামায কখনো উদ্দেশ্য নয়। আইম্মায়ে কিরামের মধ্যে যাঁরা জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার প্রবক্তা তাঁরা এ হাদীস দ্বারা দলিল দেননি। ইমাম বুখারী (র) তাঁর কিতাবের অন্য জায়গায় এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু জানাযায়

২২. ইমাম নাসায়ী, সুনান, কিতাব الجنائز বাব (الدعاء (فيها এইচ. এম. সাঈদ কোম্পনী করাচী, খণ্ড. ১, পৃ. ২১৮।

২৩. বর্ণনাসূত্রগুলোর জন্য দেখুন যথাক্রমে, মু'জামে কাবীর, তাবারানী ও সুনানে ইবন মাজাহ।

www.pathagar.com

ফাতিহা পড়ার দলিল দিয়েছেন ইবন আব্বাস (রা)-এর আমল ও হাসান বসরী (র)-এর আমল দিয়ে। তাছাড়া পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যাপারে আরো কত হুকুম রয়েছে যার কোনটিই আমরা এ ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করি না, তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমল ব্যতীত এ হাদীসটিকে জানাযার নামাযের সাথে মিলিয়ে দেয়া একান্তই অযৌক্তিক। তাই এ হাদীসটি জানাযার নামাযের ক্ষেত্রে দলিল হতে পারে না।

শুধু প্রথম তাকবীরের সাথে হাত উত্তোলন করা

উপরোক্ত বিষয়ে একাধিক হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

১. সুনানে তিরমিযী এক হাদীস রয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَبَّرَ عَلٰى جَنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ وَوَضَعَ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى ، انتهى ، رواه الترمذى فى سننه ٢٠٦/١ وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . انتهى ما قاله الترمذى ، وفيه أبو فروة يزيد بن سنان ، ضعفه أحمد وابن معين ، وفيه يحى بن يعلى ايضا ضعيف -

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকবীর বলে উভয় হাত উত্তোলন করেছেন এবং তা শুধু প্রথম তাকবীরেই করেছেন। অতঃপর তিনি তার ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতেন'।[২৪]

২. দারাকুতনী (র) বর্ণনা করেন ঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِىْ اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ . رواه الدار قطنى فى سننه ٧٥/ ٢، وسكت عنه، وفيه الفضل بن سكن، قال العقيلى : إنه مجهول، كذا في التعليق المغني ٧٥/٢

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জানাযার নামাযে প্রথমবার তাকবীরের সাথে উভয় হাত উত্তোলন করতেন, এরপর আর হাত তুলতেন না।[২৫]

সনদের বিবেচনায় হাদীস দু'টি যাঈফ হলেও যেহেতু মাস'আলার মূলভিত্তি এগুলোর উপর নয়, বরং সাহাবায়ে কিরাম ও পূরবর্তীদের আমলের উপর, তাই এগুলোকে সমর্থক দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব সাহাবা ও তাবঈনের আমলের ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবে

২৪. ইমাম তিরমিযী (র), সুনান, কিতাব الجنائز বাব رفع الدين على الجنازة, ইয়াসির নাদীম এণ্ড কোম্পানী দেওবন্দ, খণ্ড ১, পৃ. ২০৬।

২৫. ইমাম দারাকুতনী (৩৮৫ হি.) সুনান, কিতাব الجنائز বাব وضع اليمنى على হাদীস একাডেমী পাকিস্তান, খণ্ড ২, পৃ. ৭৫।

www.pathagar.com

শুধুমাত্র একবার হাত তোলার কথা বলা হয়, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) ইবন আব্বাস (রা) ইবরাহীম নাখাঈ (র)[২৬] হাসান ইবন উবায়দুল্লাহ (র) ও সুয়াইদ ইবন গাফালা (র) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।[২৭]

পক্ষান্তরে জানাযার নামাযে একাধিক বার হাত তোলার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে কোন বর্ণনা নেই।

সানা, দরূদ ও দু'আ

পূর্বে আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। সে হাদীসে তিনি জানাযার নামায এভাবে শিখিয়েছেন যে, প্রথমে হামদ-সানা করবে। সে হিসেবে হানাফী মাযহাব হল, প্রথম তাকবীরের পর হামদ-সানা সম্বলিত যেকোন মাসূর দু'আ পড়া যেতে পার। যেমন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ .

পরে দরূদ পড়বে। সে হিসেবে হানাফী মাযহাব হল, দ্বিতীয় তাকবীরের পর যেকোন মাসূর দরূদ পড়া যেতে পরে। যেমন ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

তারপর জানাযার নামাযে মৃত ব্যক্তি ও জীবিতদের জন্য ইস্তিগফার সম্বলিত দু'আ শিখিয়েছেন। এছাড়া অন্যান্য হাদীসে আরো অনেকগুলো দু'আ বর্ণিত রয়েছে। সে হিসেবে হানাফী মাযহার হল, তৃতীয় তাকবীরের পর সে দু'আগুলোর যেকোন একটি পড়া যেতে পারে[২৮]। যেমন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا ، وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ .

দু'দিকে সালাম ফিরান

এক্ষেত্রে দু'টি হাদীস রয়েছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) অন্যান্য নামাযের সালামের ন্যায় জানাযার নামাযেও দু'দিকে সালাম ফেরাতেন।

---

২৬. ইমাম আব্দুর রাযযাক (র) ঃ মুসান্নাফ, কিতাব الجنائز বাব رفع اليدين فى التكبير على الجنازة ইদারাতুল কুরআন করাচী, খণ্ড ৩ পৃ. ৪৭০।

২৭. ইবন আবী শায়াবা (র) ঃ মুসান্নাফ, কিতাব الجنائز বাব الرجل يرفع يديه فى দারুল ফিকর, খণ্ড-৩, পৃ.- ১৮০-১৮১।

২৮. ইমাম তিরমিযী (র) ঃ কিতাব الجنائز বাব ما يقول فى الصلاة على الميت সুনান, ইয়াসির নাদীম এণ্ড কোম্পানী দেওবন্দ, খণ্ড ১, পৃ. ১৯৮, ইমাম নাসাঈ (র) ঃ সুনান, কিতাব الجنائز বাব الدعاء (فيها) সাঈদ কোম্পানী করাচী, খণ্ড ১, পৃ. ২১৮।

www.pathagar.com

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الْهَجَرِىِّ قَالَ : اَمَّنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ اَوْفٰى عَلٰى جَنَازَةِ ابْنَتِهٖ ، فَكَبَّرَ اَرْبَعًا فَمَكَثَ سَاعَةً حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهٗ سَيُكَبِّرُ خَمْسًا ، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَشِمَالِهٖ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا لَهٗ : مَا هٰذَا ؟ قَالَ : اِنِّىْ لَا اَزِيْدُكُمْ عَلٰى مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ... الخ أخرجه البيهقى فى سننه ٤٣/٤، قال النووى فى المجموع ١٩٩/٥ : قال الحاكم فى المستدرك : حديث صحيح - يعنى هذا الحديث .

ইবরাহীম হাজারী (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) তাঁর এক মেয়ের জানাযায় আমাদের ইমামতি করেছেন। চার তাকবীরের পরে তিনি কিছুক্ষণ দেরি করেছেন। আমরা ভেবেছি তিনি হয়তো পঞ্চম তাকবীর দেবেন। কিন্তু তা না করে তিনি ডানে বামে সালাম ফেরালেন। নামায শেষে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি আমল ? (চতুর্থ তাকবীরের পর দেরী করা)[২৯] তিনি বললেন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যা করতে দেখেছি তার চেয়ে বেশী কিছু করিনি'।[৩০]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِىْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ ثَلَاثُ خِلَالٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهُنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ ، إِحْدَاهُنَّ التَّسْلِيْمُ عَلَى الْجَنَازَةِ مِثْلَ التَّسْلِيْمِ فِى الصَّلَاةِ . رواه البيهقى فى سننه ٤٣/٤ ، قال النووى فى المجموع /١٩٨ ٨ : حديث عبد اللّٰه هو ابن مسعود رواه البيهقى بإسناد جيد .

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, তিনটি এমন আমল ছিল যা রাসূলুল্লাহ (সা) করতেন। কিন্তু আজকাল মানুষ তা ছেড়ে দিয়েছে। তার একটি হল, তিনি জানাযার নামাযে এমনভাবে সালাম ফেরাতেন যেভাবে অন্যান্য নামাযে সালাম ফেরাতেন'।[৩১]

উভয় হাদীসের ভাষ্যই স্পষ্ট। নামাযে যেভাবে ডানে-বামে দু'বার সালাম ফেরানো হয় তেমনিভাবে জানাযার নামাযেও দু'দিকে সালাম ফেরানো জরুরী।

---

২৯. চতুর্থ তাকবীরের পর সাথে সাথে সালাম ফেরানোই নিয়ম, তবে কোন কোন বর্ণনায় সালাম ফেরানোর আগে ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار বা অন্য দু'আ পড়ার উল্লেখ রয়েছে বিধায় কোন কোন হানাফী ইমাম একে মুস্তাহাব বলেছেন। ফাতহুল কাদীর, খণ্ড ২, পৃ. ৮৬।

৩০. ইমাম বায়হাকী (র) (৪৫৮ হি.), সুনান, কিতাব الجنائز। বাব باب من قال يسلم عن يمينه وشماله দারুল ফিকর, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৩। খ. ইমাম নববী ঃ আল যামুম, ইহয়াউত্ তুরাসিল আরাবী, ১৯৯৫ ইং, খণ্ড ৫, পৃ. ১৯৯

৩১. ক. ইমাম বায়হাকী র. সুনান, দারুল ফিকর, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৩।
খ. আল যামুম, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

গায়েবানা জানাযা জায়িয নয়

জানাযার নামায আদায় করা ফরযে কিফায়া। যারা জীবিত তাদের একটি জামা'আত জানাযার নামায আদায় করলে সবার পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যায়। এটি জীবিতদের উপর মৃত ব্যক্তির হক। এ বিষয়গুলোতে কারো কোন দ্বিমত নেই। তবে মৃত ব্যক্তির লাশ সামনে না থাকলে তার জানাযার নামায পড়া শরী'আত সম্মত কি না এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

এ ব্যাপারে কারো কারো দ্বিমত থাকলেও সাহাবা, তাবিঈন ও পরবর্তী মুজতাহিদ ইমামগণের অধিকাংশের মতে গায়েবানা জানাযা শরী'আত স্বীকৃত কোন বিধান নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসে এটি কোন স্বীকৃত বিধান হিসেবে প্রকাশ পায়নি।

এক্ষেত্রে প্রদত্ত দলীলসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যামানায় তাঁর অনুপস্থিতিতে শত শত সাহাবায়ে কিরাম আত্মীয় স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর ইন্তিকাল হয়েছে, কিন্তু (শুধু মাত্র একটি ঘটনা ব্যতীত যা বিশেষ কারণে হয়েছিল) তাঁদের গায়েবানা জানাযার নামায রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো পড়েননি। বা সাহাবায়ে কিরামকেও এমর্মে কোন আদেশ করেননি।

একটি স্বতঃসিদ্ধ কথা হল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে কোন একটি আমল করার মত (باعث) পরিস্থিতি ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও যদি তিনি তা না করেন এবং কাউকে করতে না বলেন তাহলে সে আমলটি শরী'আতের কোন অংশ হিসেবে বিবেচিত হয় না।

ইমাম ইবনুস সাম'আনী (র) বলেন,

اذَا تَرَكَ الرَّسُوْلَ ﷺ شَيْئًا وَجَبَ عَلَيْنَا مُتَابَعَتُهُ فِيْهِ .

'যদি রাসূলুল্লাহ (সা) কোন কাজকে ছেড়ে দেন তা হলে এক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করে আমাদের জন্য সে কাজ থেকে বিরত থাকা জরুরী'।[৩২]

খোদ রাসূলে কারীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ - أخرجه مسلم فى صحيحه .

যে এমন কোন আমল করবে যার ভিত্তি আমাদের শরী'আতে নেই তা বর্জনযোগ্য।[৩৩] তাই গায়েবানা জানাযার আমলটিও শরী'আতের অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।

২. খিলাফতে রাশেদার যুগে পৃথিবীর আনাচে কানাচে, হাজার হাজার সাহাবায়ে কিরামের ইন্তিকাল হয়েছে কিন্তু দারুল খিলাফতের পক্ষ থেকে কখনো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে তাঁদের কারো

৩২. মুহাম্মদ ইবন আলী আশ্‌শাওকানী, ইরশাদুল ফুহূল, দারুল কুতূবী আল জুমহুরিয়্যা ১৯৯২ ইং, খণ্ড ১, পৃ. ১৮৬।

৩৩. ইমাম মুসলিম (র) (২৬১ হি.) সহীহ, কিতাব الجنائز। বাব الاحكام الباطلة ورد محدثات الامور। এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানী করাচী, খণ্ড-২ পৃ.-৭৭।

www.pathagar.com

গায়েবানা নামাযের ব্যবস্থা করা হয়নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, খোলাফায়ে রাশেদীনও গায়েবানা জানাযার নামাযকে আদায়ের কোন বিধান মনে করতেন না।

৩. ব্যক্তিগত উদ্যোগেও সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের কোন বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনের ইন্তিকালের খবর পেয়ে গায়েবানা নামায পড়তেন না। এতে বুঝা যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম এ গায়েবানা জানাযাকে শারঈ কোন হুকুম মনে করতেন না।

অতএব বর্তমানে যে পরিস্থিতিতে গায়েবানা জানাযার নামাযের প্রশ্ন উঠে, সে পরিস্থিতি যেহেতু নবী করীম (সা)-এর যুগে বিদ্যমান ছিল, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে বিদ্যমান ছিল, এরপরও তাঁরা গায়েবানা নামায পড়েননি। তাই গায়েবানা জানাযার নামাযকে শরী'আতের কোন বিধান বলে দাবি করার সুযোগ থাকে না। তাই ইমাম আযম আবূ হানীফা ও তাঁর মাযহাবের ইমামগণসহ অধিকাংশ আইম্মায়ে কিরাম গায়েবানা জানাযার নামাযকে না জায়িয বলেন।

পক্ষান্তরে কেউ কেউ গায়েবানা জানাযার নামাযকে শরী'আতের একটি বিধান মনে করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের দলিল হল, রাসূলুল্লাহ (সা) হাবশা দেশের বাদশাহ নাজাশীর গায়েবানা নামায আদায় করেছেন। জাবির (রা) বর্ণনা করেন ঃ

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى اَصْحَمَةَ النَّجَاشِيْ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا وَفِىْ لَفْظٍ قَالَ : تُوُفِّىَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِّنَ الْحَبْشِ ، فَهَلُمُّوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوْفٌ . انتهى أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحهما .

নবী করীম (সা) আসহামা নাজাশীর জানাযার নামায পড়েছেন এবং তা চার তাকবীরে পড়েছেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি ইরশাদ করেন, আজ হাবশার এক সৎ ব্যক্তি ইন্তেকাল করেছেন, তোমরা এসো এবং তাঁর জানাযার নামায আদায় কর। জাবির (রা) বলেন, অতঃপর আমরা তাঁর পেছনে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) নাজাশীর জানাযার নামায পড়লেন। আমরা তখন কয়েক কাতার লোক ছিলাম'।[৩৪]

তাঁরা বলেন যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা) গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করেছেন, তাই এটি শরী'আতের একটি বিধান।

পর্যালোচনা

গায়েবানা জানাযার দলিল হিসেবে যে হাদীসগুলো পেশ করা হয় তন্মধ্যে উল্লেখিত হাদীসটিই সহীহ। এটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে। এছাড়া আরো যেসব হাদীস পেশ করা হয়ে থাকে সেগুলোর ব্যাপারে মুহাদ্দিস ইমামগণের জোর আপত্তি রয়েছে। উসূলে হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো বিচার-বিশ্লেষণ পরে করা হবে। প্রথমত উল্লেখিত সহীহ

---

৩৪. ইমাম বুখারী (২৫৬ হি.) সহীহ বুখারী, কিতাব الجنائز। বাব الصفوف على الجنازة। আশরাফী বুক ডিপো দেওবন্দ, খণ্ড ১, পৃ. ১৭৬। ইমাম মুসলিম (২৬১ হি.) সহীহ মুসলিম, কিতাব الجنائز। আশরাফী বুক ডিপো দেওবান্দ, খণ্ড ১, পৃ. ৩০৯।

www.pathagar.com

হাদীসটি গায়েবানা জানাযার নামাযের বৈধতাকে প্রমাণ করে কি না সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

১. প্রথমত যে বিষয়টি বিবেচনায় আনা দরকার তা হল, নবী (সা) জীবনে শত শত গায়েবানা জানাযার নামাযের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সহীহ বর্ণনাসূত্রে একটি মাত্র ঘটনা কেন পাওয়া যায় ? তা'হলে নিশ্চয় নাজাশীর ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জানাযার নামায পড়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইবন আবদুল বার (র) বলেন ঃ

اكثر أهل العلم يقولون : إن ذلك خصوص للنبى ﷺ

অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম বলেন, এ ঘটনাটি রাসূলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল'। (ইবনে আবদুল বার (র) (৪৬৩ হি), আল ইসতিযকার দামেশ্‌ক ১৪১৮ হি. খণ্ড ৮, পৃ.-২৩৩)

২. আইম্মায়ে কিরাম বলেন, নাজাশীর দেশে তিনি একাই মুসলমান ছিলেন। তাঁর জানাযার নামায পড়ার মত আর কেউ সেখানে না থাকার সম্ভাবনাই প্রবল ছিল। তাই কোন যোগাযোগ মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ জানিয়েছেন এবং তাঁর নামায আদায় করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

এর সমর্থনে মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজাহ-এর বর্ণনাটি উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ : اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اَخَاكُمْ مَاتَ بِغَيْرِ اَرْضِكُمْ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ . أخرجه ابن ماجه فى سننه ، ورجاله ثقات .

হুযায়ফা ইবনে উসায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমাদের এক ভাই (নাজাশী) এমন এক জায়গায় মৃত্যুবরণ করেছে যা তোমাদের এলাকা নয় (অর্থাৎ যা মুসলমানদের দেশ নয়)। তাই তোমরা এসো এবং তাঁর জানাযার নামায পড়।[৩৫]

এ হাদীসে بغير أرضكم শব্দ থেকে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেখানে তোমাদের মত কেউ নেই যে তাঁর নামায পড়বে। তাই তোমরাই সে দায়িত্ব আদায় কর। ইবন আবদুল বার (র) বলেন ঃ

دلائل الخوص فى هذه المسألة واضحة، لا يجوز أن يستدل فيها مع النبى ﷺ غيره .

এ মাস'আলাটি নবী কারীম (সা)-এর সাথে খাস হওয়ার দলিলগুলো স্পষ্ট। তাই তাঁর এ আমল দিয়ে অন্যের জন্য দলিল পেশ করা জায়িয হবে না।[৩৬]

৩. আইম্মায়ে কিরাম মনে করেন, যেভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বাহ্যিক কোন মাধ্যম

---

৩৫. ইমাম ইবন মাজাহ (২৭৫ হি.) সুনান, কিতাব الجنائز বাব ما جاء فى الصلاة على النجاشى কদীমী কুতুবখানা করাচী, পৃ. ১১০

৩৬. প্রাগুক্ত খণ্ড-৮, পৃ.-২৩৩।

www.pathagar.com

ছাড়াই কুদরতীভাবে নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ তাঁর রাসূলকে জানিয়েছেন, তেমনিভাবে তাঁর জানাযা (লাশ)-কেও কুদরতীভাবে রাসূলের সামনে হাজির করে দিয়েছেন এবং জানাযা সামনে রেখেই তিনি নামায আদায় করেছেন।

ইমরান ইবন হুসাইন (রা)-এর একটি বর্ণনা থেকেও এর প্রমাণ মেলে। ইবন হিব্বান (র) বর্ণনা করেন ঃ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : فَقَامُوْا فَصَفُّوْا خَلْفَهُ ، وَهُمْ لاَ يَظُنُّوْنَ إِلاَّ أَنَّ الْجَنَازَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ . أخرجه ابن حبان فى صحيحه وليس فى الحديث ما ينكر .

সাহাবায়ে কিরাম কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং তাঁরা এটাই মনে করছিলেন যে, জানাযা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে উপস্থিত রয়েছে।[৩৭]

এছাড়া ইবন-আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয় ঃ

كُشِفَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَنْ سَرِيْرِ النَّجَاشِيِّ حَتَّى رَاهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ .

নাজাশীর জানাযার খাট এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাঝের হেজাব (পর্দা) দূর করে দেওয়া হয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তা সরাসরি দেখেছেন এবং তাঁর জানাযার নামায আদায় করেছেন।[৩৮]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, নাজাশীর গায়েবানা জানাযা বিশেষ কারণে পড়া হয়েছে এবং তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য খাস ছিল। আর এজন্যই তাঁর প্রিয় খুলাফায়ে রাশেদীনসহ সাহাবায়ে কিরামের পবিত্র জামা'আত এ আমলটিকে শরী'আতের কোন বিধান মনে করেননি।

রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক নজাশীর গায়েবানা নামায পড়ার ব্যাখ্যা দেওয়ার একটি কারণ এটিও যে, এক দিকে একটি জানাযার গায়েবানা নামায পড়া, আর অপর দিকে শত শত অনুপস্থিত মায়্যিতের গায়েবানা নামায না পড়া। দু'টি বিপরীত আমলের সমন্বয় সাধন এ ব্যাখ্যার মাধ্যমেই সম্ভব হয়।

যাঁরা গায়েবানা জানাযার প্রবক্তা তাঁরা নবী জীবনে আরো দু'একটি গায়েবানা জানাযা নামাযের উদাহরণও পেশ থাকেন। এর একটি হল ঃ

আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বিলেন, নবী কারীম (সা) 'তাবুকে' অবস্থানকালে মুয়াবিয়া ইবন মুয়াবিয়া মুযানী নামক এক সাহাবী মদীনায় ইন্তেকাল করেন তখন তিনি তাঁর জানাযার নামায আদায় করেছেন।[৩৯]

---

৩৭. বরাতে, শাওকানী (১২৫০ হি.) নাইলুল আওতার, দারুল ফিকর বৈরুত ১৪১৪ হি. ঃ খণ্ড-৪, পৃ.-৮০।

৩৮. প্রাগুক্ত।

৩৯. বর্ণনটি বিস্তারিত দেখুন, ইবনুল আসীর (৬৩০ হি.) উসদুল গাবাহ্ দারুল মা'রিফা বৈরুত (১৪১৮ হি.) খণ্ড ৪, পৃ. ১৫৮।

www.pathagar.com

গায়েবানা জানাযার প্রবক্তাদের কেউ কেউ হাদীসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করলেও সনদ সম্পর্কে যাঁদের অবগতি রয়েছে তাঁরা এ হাদীসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেন না। কারণ এর সনদে আলা ইবন যায়িদ নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছে। যার ব্যাপারে হাদীস জাল করার অভিযোগ রয়েছে।[৪০]

আর যদি বর্ণনাটিকে সহীহ হিসেবে মেনেও নেয়া হয়, তা হলে হাদীসে একথা স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, লাশ এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাঝে সকল পর্দাকে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং লাশের খাটিকে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তা সরাসরি দেখতে পেয়েছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদি এমন কোন ঘটনা ঘটেও থাকে তা হলে তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মু'জিযার কারণে হয়েছে যা অন্যদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস রয়েছে, তা নিম্নরূপ ঃ মূতার যুদ্ধে হযরত যায়িদ ইবন হারিসা (রা), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) ও জাফর ইবন আবু তালিব (রা) শাহাদাত বরণ করলে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় থেকেই তাঁদের গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করেছেন। গায়েবানা জানাযার প্রবক্তাদের অনেকেই হাদীসটি প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন না। কারণ হাদীসটি ওয়াকেদীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। আর মুহাদ্দিসীনের দৃষ্টিতে তিনি যাঈফ-দুর্বল। আরেকটি কারণ হল, হাদীসটি মুত্তাসিলও নয়। এ দুই কারণে অনেকেই হাদীসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেন না। শামসুল হক আযীমাবাদী (র) তার 'আউনুল মাবূদ' কিতাবে বলেন ঃ

الحديث مرسل والواقدى ضعيف جدا .

'হাদীসটি মুরসাল, আর ওয়াকেদী মারাত্মক ধরনের যাঈফ'।[৪১]

এছাড়াও হাদীসের ভাষ্য থেকে একথা স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের লাশগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন। শুধু তাঁদের লাশই নয়, পুরা যুদ্ধের ময়দানই তাঁর সামনে তুলে ধরা হয়েছে। আর তিনি তা দেখে দেখে সাহাবায়ে কিরামকে খবর দিচ্ছিলেন।

এ হাদীসটিকে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট যে, যুদ্ধের ময়দানে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, সবাইকে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু নামায আদায় করেছেন জাফর ইবন আবু তালিব ও যায়িদ ইবন

---

৪০. হাদীসটি উল্লেখ করে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম নববী (র) বলেনঃ

واما حديث العلاء بن زيد ، ويقال ابن زيد عن انس حديث ضعيف ضعفه الحفاظ، منهم البخارى فى تاريخه، والبيهقى، واتفقوا على ضعف العلاء هذا، وانه منكر الحديث .

'আলা ইবন যায়িদের হাদীসটি যাঈফ। হাদীসের হাফিযগণ একে যাঈফ সাব্যস্ত করেছেন। তাদের মধ্যে ইমাম বুখারী (র)-ও তাঁর 'আততারীখ' কিতাবে যাঈফ বলেছেন এবং ইমাম বায়হাকী (র)ও। আইম্মায়ে কিরাম যাঈফ হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন এবং এব্যাপারেও একমত পোষণ করেছেন যে, আলা একজন 'মুনকারুল হাদীস' পর্যায়ের বর্ণনাকারী'। (আল-মাজমু ইহয়াওততুরাসিল আরাবী ১৯৯৫ ইং খণ্ড-৫, পৃ. ২১১-২১২। ইবনুল কায়্যেম (র) বলেন ঃ

لا يصح حديث صلاته ﷺ على معاوية بن معاوية انتهى – كذا فى نيل الاوطار . المصدر السابق .

'রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক মুয়াবিয়া ইবন মুয়াবিয়ার জানাযার নামায পড়া সম্পর্কীয় হাদীস বা বর্ণনাটি সহীহ নয়'। (নাইলুল আওতার, প্রাগুক্ত) ইমাম যাহাবী র. ও ৭৪৭ হি. অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। (প্রাগুক্ত)

৪১. খণ্ড ১, পৃ. ১৮৬।

www.pathagar.com

হারিসা এবং এ থেকেও একথা স্পষ্ট যে, গায়েবানা জানাযার নামায কোন ব্যাপক শারঈ বিধান নয় বরং বিশেষ কারণে বিশেষ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) তা আদায় করেছেন।

উপরোক্ত দলিলগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনে দু'তিনটি গায়েবানা জানাযার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা তাঁর মুবারক সত্তার সাথে নির্দিষ্ট ছিল এবং নির্দিষ্ট থাকার আলামত সে বর্ণনাগুলোতেই রয়েছে যেগুলো দলিল হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

এছাড়া একটি মাত্র ঘটনা ব্যতীত বাকীগুলো প্রমাণিত নয়। পক্ষান্তরে শত শত গায়েবানা জানাযার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিনি সেগুলো পড়েননি। পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কিরামও এটিকে শারঈ বিধান হিসেবে গ্রহণ করেননি। তাই ইমাম আযম আবু হানীফা ও হানাফী ইমামগণের মতে এ আমলটি জায়িয নয়।

www.pathagar.com

তারাবীহ্‌র নামায বিশ রাক'আত সুন্নাত

রামাযান মাসে তারাবীহ্‌র[১] নামায পড়া ইসলামী শরী'আতে সুন্নাত। এতে যেমন কারো দ্বিমত নেই তদ্রূপ তারাবীহ্‌র নামায বিশ রাক'আত হওয়ার ব্যাপারেও প্রায় সবাই একমত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের আমল এটাই প্রমাণ করে যে, তারাবীহর নামায বিশ রাক'আত সুন্নাত। এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَقُوْمُ مِنْ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ . رواه البيهقى فى «المعرفة» وصححه العلامة السبكى فى «شرح المنهاج» (التعليق الحسن ٢ : ٥٤-٥٥) وفى لفظ له من طريق اخر قال : كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً قَالَ : وَكَانُوْا يَقْرَأُوْنَ بِالْمِئِيْنَ وَكَانُوْا يَتَوَكَّئُوْا عَلٰى عَصِيِّهِمْ فِيْ عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ . وصححه والنووى فى «الخلاصة» وابن العراقى فى «شرح التقريب» والسيوطى فى «المصابيح» كذا فى اثار السنن و«التعليق الحسن» أيضًا .

হযরত সায়িব ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা হযরত উমর (রা)-এর যুগ থেকে বিশ রাক'আত (তারাবীহ) ও বিতর আদায় করি।" এই হাদীসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, ...সাহাবায়ে কিরাম তারাবীহ্‌র নামাযে মিঈন সূরাসমূহ তিলাওয়াত করতেন। সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা, সূরা মায়িদা, সূরা আন'আম ও সূরা আ'রাফ–এই সাত সূরার পরে উল্লেখিত এগার সূরা অর্থাৎ 'সূরা আনফাল,

---

১. তারাবীহ্ (التراويح) শব্দটি বহুবচন, একবচন হলো তারবীহা (ترويحة)-এর অর্থ হচ্ছে একবার আরাম করা, ইবন মানসূর আল-আফরীকী, লিসানুল আরব, বাইরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯০ ঈ. খণ্ড ২ পৃ. ৪৬২। যেহেতু প্রত্যেক চার রাক'আতের পর এ নামাযে কিছুক্ষণ আরাম করা হয়, এ জন্যই এ নামাযকে তারাবীহ্ (আরাম)-এর নামায হিসাবে নামকরণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রত্যেক চার রাক'আতকেও রূপক অর্থে তারবীহা বলা হয়। কেননা এ নামাযে প্রত্যেক চার রাক'আতের পরপর কিছুক্ষণ আরামের বৈঠক করা হয়, আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আয়নী (র), আল বিনায়া, নাওয়াফেল অধ্যায়, কিয়ামু শাহরে রামাযান পরিচ্ছেদ, কোয়েটা, আল-মাকতাবাতুল গাফ্ফারিয়া, ১৯৯৯ ঈ, খণ্ড ২, পৃ. ৫৫৫০। উল্লেখ্য, সাহাবায়ে কিরামের যুগেই এ নামাযের মধ্যে আরাম করা হতো বলে এ নামাযকে তারাবীহর নামায বলে নামকরণ করা হয়। হাফিয ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র) ফাত্‌হুল বারী, কিতাবু সালাতিত্ তারাবীহ, বাইরুত, দারুল ফিকর, ২০০০ ঈ. খণ্ড ৪, পৃ. ৭৭৮।

www.pathagar.com

সূরা তাওবা, সূরা ইউনুস, সূরা হূদ, সূরা ইউসুফ, সূরা রা'দ, সূরা ইব্রাহীম, সূরা হিজ্‌র, সূরা নাহ্‌ল, সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা কাহ্‌ফ তিলাওয়াত করতেন। এমনকি হযরত উসমান ইবন আফ্‌ফানের যুগে তাঁরা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর কষ্ট লাঘব করার জন্য লাঠিতে ভর করে দাঁড়াতেন।[২]

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত উমর (রা)-এর যুগ থেকেই সাহাবায়ে কিরাম তারাবীহ্‌র নামায বিশ রাক'আত আদায় করতেন।

এজন্যই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র), ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফিঈ (র) ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)সহ অন্যান্য প্রায় সকল মুজতাহিদ ইমাম তারাবীহ্‌র নামায কমপক্ষে বিশ রাক'আত হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। এমনকি অধিকাংশ সাহাবা, তাবিঈন ও তাবে-তাবিঈনের আমলও তারাবীহর নামায বিশ রাক'আত পড়ার উপরেই ছিল।[৩]

অবশ্য, ইমাম মালিক (র) বিশ রাক'আতের সাথে আরো ১৬ রাক'আতসহ মোট ৩৬ রাক'আতের অভিমতও ব্যক্ত করেছেন।[৪] তবে মালিকীদের নিকট বিশ রাক'আতের অভিমতই প্রাধান্য প্রাপ্ত।[৫]

উপরোক্ত হাদীস ছাড়াও আরো বহু হাদীসে তারাবীহ্ বিশ রাক'আত হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِيْ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ فِيْ رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً ؛ رواه مالك وقال النبوى : إسناده مرسل قوى .

---

২ মা'রিফাতুস্ সুনানি ওয়াল আসার, দ্র. আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাইস সুনান, তারাবীহ অধ্যায়, করাচী, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়া, ১৪১৫ হি., হাদীস নং ১৮২১, খণ্ড ৭, পৃ. ৬৯-৭০।

৩. ইমাম আবূ যাকারিয়া মুহিউদ্দীন আন নবভী, শারহুল মুহায্যাব, সালাতুত তাতাউও অধ্যায়, বাইরুত, দারুল ফিকর, ২০০০ ঈ, খণ্ড ৪, পৃ. ৩৮ ও ইমাম কুদামাহ, আল-মুগনী, সালাতুত তারাবীহ, বাইরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৭ ঈ. খণ্ড ১, পৃ. ৮৩৪-৮৩৫।

৪. ইমাম মালিক ইবন আনাস ঃ আল মুদাউওয়ানাতুল কুব্‌রা, কিয়ামু রামাদান অধ্যায়, বাইরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯১ ঈ., খণ্ড ১, পৃ. ১৯৩। শাইখ আবদুর রহমান আল-জাযীরী (র) বলেন, হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয (মৃ. ১০১ হি.)-এর যুগে মদীনায় তারাবীহ্ ৩৬ রাক'আত পড় শুরু হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল, মক্কাবাসীদের সমান ফযীলত লাভ করা। কেননা, মক্কাবাসীগণ তারাবীর প্রত্যেক চার রাক'আতের বিরতিতে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে থাকেন। এদিকে লক্ষ্য করে হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয (র) মনে করলেন, আমাদেরও প্রত্যেক চার রাক'আত পর তাওয়াফের পরিবর্তে চার রাক'আত নফল পড়া উচিত। এ হিসাবে তারাবীর বিশ রাক'আতের সাথে প্ররো ১৬ রাক'আতসহ প্রচলন তখন মসজিদে নববীতে শুরু হয়। অবশ্য, শাইখ আবদুর রহমান আল-জাযীরী বলেন, অতিরিক্ত ১৬ রাক'আতকে তারাবীহ হিসাবে নামকরণ না করাই ভাল, শাইখ আবদুর রহমান আল-জাযীরী, আল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, কিতাবুস সালাত, সালাতুত তারাবীহ, কায়রো ঃ আল-মাকতাবুস সাকাফী, তা. বি., খণ্ড ১, পৃ. ২৬৫।

৫. শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়্যা, আওজামুল মাসালিক, কিয়ামু রামাদান অধ্যায়, সাহারানপুর, মাকতাবায়ে ইলমিয়্যা, তা. বি., খণ্ড, পৃ. ৩৯৬-৩৯৭।

www.pathagar.com

হযরত ইয়াযীদ ইবন রূমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর যুগে (বিশ রাক'আত তারাবীহ্ ও তিন রাক'আত বিতরসহ) মোট ২৩ রাক'আত নামায আদায় করতেন।[৬]

عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَمَرَ رَجُلاً يُّصَلِّيْ بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً ، رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى « مصنفه » وإسناده مرسل قوى كما قاله النيموى فى « أثار السنن » وفى والتعليق الحسن » : قال : حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن يحى بن سعيد فذكره ، قلت : رجاله ثقات لكن يحى بن سعيد الأنصارى لم يدرك عمر . اهـ

হযরত ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এক ব্যক্তিকে বিশ রাক'আত তারাবীহ্ পড়ানোর জন্য নির্দেশ দিলেন।[৭]

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رَفَيْعٍ قَالَ : كَانَ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فِيْ رَمَضَانِ بِالْمَدِيْنَةِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَيُوْتِرُ بِثَلاَثٍ . أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة فِى « مصنفه » وقال النبوى : اسناده مرسل قوى « أثار السنن » وفى « التعليق الحسن » قال : حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عبد العزيز بن رفيع فذكره ، قلت : عبد العزيز لم يدرك أبيا . اهـ

হযরত আবদুল আযীয ইবন রুফাই (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা) সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে মদীনায় রামাযান মাসে বিশ রাক'আত তারাবীহ্ ও তিন রাক'আত বিতর পড়াতেন।[৮]

---

৬ ইমাম মালিক, আল-মুওয়াত্তা, কিয়ামু রামাদান অধ্যায়, দেওবন্দ, আশরাফী বুক ডিপো, তা. বি., পৃ. ৪০ ও আল্লামা মুহাম্মদ ইবন আলী আন্‌নীমভী, আসারুস সুনান, আত্‌তারাবীহ বিইশরীনা রাক'আতান অধ্যায়, মুলতান, মাকতাবায়ে ইমদাদিয়া, তা. বি. পৃ. ২৫৩।
শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন, মুহাদ্দিসীন এ বিষয়ে একমত যে, মুওয়াত্তার রিওয়ায়াতগুলো ইমাম মালিক ও তাঁর মতের অনুসারীদের নিকট সহীহ। এছাড়া অন্যান্য মত অনুযায়ী তার মধ্যে যে সকল مرسل ও منقطع রিওয়ায়াত রয়েছে, সেগুলোও অন্য সনদ দ্বারা متصل হওয়ার কারণে সহীহ হিসাবে গণ্য। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, (র) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, বাবু তাবাকাতি কুতুবিল হাদীস, দেওবন্দ ঃ মাতবায়ে আশরাফী, ১৩৭৩ হি., খণ্ড ১, পৃ. ১৩৩।

৭. ইমাম আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবু শায়বা আল-মুসান্নাফ, কিতাবু সালাতিত তাতাউও, কাম ইউসাল্লী ফী রামাযান মিন রাক'আতিন, বাইরুত, দারুল ফিক্‌র, ১৯৮৯ ঈ., খণ্ড ২, পৃ. ২৮৫, ও আসারুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩।

৮. মুসান্নাফে ইবন আবু শায়বা, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ২৮৫ ও আসারুস্ সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩।

www.pathagar.com

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ . أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة فى «مصنفه» والكشى فى «مسنده» والبغوى فى «معجمه» والطبرانى فى «الكبير» له والبيهقى فى «مسنده» كذا فى «التعليق الحسن» وقال فى «إعلاء السنن» : ورجاله كلهم ثقات إلا ابراهيم بن عثمان جدا أبى بكر بن أبى شيبة فضعفه الجمهور وقال ابن عدى : له أحاديث صالحة وهو خير من ابراهيم بن أبى حية ... وهو حسن الحديث (فكان ابراهيم بن عثمان أيضًا حسن الحديث بالطريق الأولى عنده ، وهو مؤيد بعمل الخلفاء والصحابة وأهل العلم والأمة المسلمين شرقًا وغربًا جيلاً بعد جيل)... فالحق آن الأ ثر اذ لم يكن صحيحًا فلا أقل من أن يكون حسنًا ، اهـ بزيادة ما بين الهلالين .

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রামাযান মাসে বিশ রাক'আত (তারাবীহ) ও বিতর আদায় করতেন।[৯]

উপরোল্লেখিত হাদীসগুলো কোন ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ব্যতিরেকেই অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এ কথা প্রমাণ করে যে, তারাবীর নামায বিশ রাক'আত। অধিকন্তু, হযরত উমর

---

৯. মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ২৮৬ ও আত-তা'লীকুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪ ও ই'লাউস্ সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৭, পৃ. ৮২-৮৩। মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী (মৃ. ১৩২৩ হি.) বলেন, হাদীসটি সনদের দিক থেকে যাঈফ হলেও সাহাবায়ে কিরামের আমল, তাবিঈন ও অন্যান্য ফকীহগণের আমল এর অনুকূলে থাকার কারণে হাদীসটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়। মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী, (র) ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া, দেওবন্দ, গুলিস্তান কিতাব ঘর, ১৯৮৭ ঈ., পৃ. ৩৭৯। আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী (১৯০৮-১৯৭৭) বলেন, হাদীসটি হযরত উমর (রা) ও তাঁর পরবর্তী যুগ থেকে উম্মাতের আমলপুষ্ট থাকার কারণে তার সনদগত দুর্বলতার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। শায়খ ইউসুফ বান্নৌরী (র), মা'আরিফুস সুনান, দেওবন্দ আল মাকতাবুল আশরাফিয়া, তা. বি., খণ্ড ৫, পৃ. ৫৪৭।
এছাড়া ইমাম বায়হাকী (মৃ. ৪৫৮ হি.) বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে।
انَّهُ ﷺ صَلَّى بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكَعْةً بِعَشْرِ تَسْلِيْمًا لَيْلَتَيْنِ وَلَمْ يَخْرُجْ فِيْ الثَّالِثَة . النبووى نسبة الى «البنوز اصبور، بتقديم الموجدة التحتانية ، بالتخفيف كما هو المعروف الخ نفحة العبر ص : ٢٦٨ طبع المجلدى العلمى ....
রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে ১০ সালামে ২০ রাক'আত তারাবীহ দুই রাত পড়িয়েছিলেন। অতঃপর তৃতীয় রাত্রিতে আর হুজরা থেকে বের হননি। (দ্র. মুল্লা আলী কারী (র), মিরকাতুল-মাফাতীহ, কিতাবুস সালাত, কিয়ামু শাহরে রামাদান অধ্যায়, দেওবন্দ, বাংলা ইসলামিক একাডেমি, ১৯৯৪ ঈ., খণ্ড ৩, পৃ. ৩৮২) এই হাদীসটিও সনদের দিক থেকে যাঈফ। কিন্তু সব মিলে হাদীসটি উসূলে হাদীসের পরিভাষা হিসাবে-এর পর্যায়ে পড়ে। এ জন্যই আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী (র) বলেছেন যে, হাদীসটি সহীহ না হলেও হাসান থেকে কম নয়। ই'লাউস সুনান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৭. পৃ. ৮৩।

www.pathagar.com

(রা)-এর যুগেই তারাবীহ্ বিশ রাক'আত হওয়ার উপর উম্মাতের 'ইজ্মা' তথা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

পক্ষান্তরে, উপরোক্ত ইজ্মার বিপরীতে কতিপয় লোক এ মত পোষণ করে যে, তারাবীর নামায বিশ রাক'আত নয় বরং আট রাক'আত। তাদের এ মতটি মূলত নির্ভর করে একটি সহীহ্ হাদীসের ভুল ব্যাখ্যার উপর এবং কয়েকটি যাঈফ হাদীসের উপর। নিম্নে সে হাদীসগুলো উল্লেখ করে সেগুলোর ব্যাপারে কিঞ্চিত আলোকপাত করা হল।

আট রাক'আতের প্রথম দলীল ঃ

عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ ، فَقَالَتْ : مَا كَانَتْ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلَا فِىْ غَيْرِهِ عَلَى اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّىْ أَرْبَعًا فَلَا تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلَا تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثَلَاثًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوتِرَ قَالَ : يَا عَائِشَةُ اِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِىْ . رواه البخارى ومسلم .

হযরত আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান থেকে (রা) বর্ণিত। তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামায কেমন ছিল ? উত্তরে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রামাযান কিংবা অন্যান্য মাসে ১১ রাক'আতের বেশি নামায আদায় করতেন না, প্রথমে ৪ রাক'আত এমনভাবে আদায় করতেন যে সেগুলোর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা তুমি জিজ্ঞাসা করবে না অর্থাৎ বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। অতঃপর আরো ৪ রাক'আত এমনভাবে আদায় করতেন যে ঐগুলোর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতাও তোমাকে বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। অতঃপর তিনি ৩ রাক'আত (বিতর) আদায় করতেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি বিত্রের পূর্বে নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়েন ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে আয়েশা! আমার দু'চোখ নিদ্রামগ্ন হয় বটে কিন্তু অন্তর কখনো নিদ্রামগ্ন হয় না।[১০]

উক্ত হাদীসে বিত্র বাদে যে বাকী আট রাক'আতের কথা বলা হয়েছে তা বাস্তবে তাহাজ্জুদের রাক'আতের সংখ্যা, তারাবীহর নয়। এ সম্পর্কে বর্ণিত দলীলগুলোকে সামনে রেখে চিন্তা করলে এটাই ফুটে উঠে যে, উক্ত হাদীসটি তাহাজ্জুদ সম্পর্কে, তারাবীহ সম্পর্কে নয়। নিম্নে এ বিষয়ে কয়েকটি দলীল উল্লেখ করা হলো ঃ

১. উল্লেখিত হাদীসের শব্দের মধ্যে চিন্তা করলেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হাদীসটি তাহাজ্জুদ সম্পর্কে, কেননা হযরত আবূ সালামার প্রশ্ন ছিল রামাযানের রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর

---

১০. ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, তাহাজ্জুদ অধ্যায়, কিয়ামুন নবী বিল লাইল ফী রামাদান ওয়া গাইরিহী পরিচ্ছেদ, দেওবন্দ, আশরাফী বুক ডিপো. তা বি. খণ্ড ১, পৃ. ১৫৪, ও ইমাম মুসলিম, আস সহীহ, সালাতুল লাইল পরিচ্ছেদ, দেওবন্দ, আশরাফী বুক ডিপো, তা. বি. খণ্ড ১, পৃ. ২৫৪।

www.pathagar.com

নামায কেমন ছিল। বলা বাহুল্য, রামাযানের রাতে দুই ধরনের নামায হয়ে থাকে, তারাবীহ (খ) তাহাজ্জুদ, হযরত আবূ সালামা (র) প্রশ্ন কোন নামায সম্পর্কে ছিল তা প্রশ্নে উল্লেখ না থাকলেও হযরত আয়েশা (রা) উত্তর দিতে গিয়ে যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তাতে চিন্তা করলেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর প্রশ্ন তাহাজ্জুদের ব্যাপারেই ছিল।

কেননা উত্তরে বলা হয়েছে যে, مَا كَانَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلَا فِيْ غَيْرِهِ الخ অর্থাৎ রামাযান ও গাইরে রামাযান কোন মাসেই এই এগার রাক'আতের বেশি পড়তেন না।

আর এটা সর্বজনজ্ঞাত যে, গাইরে রামাযানে অর্থাৎ রমযান ছাড়া অন্যান্য মাসে তারাবীহ নেই, অতএব উক্ত সংখ্যাটি ঐ নামাযের ব্যাপারেই প্রযোজ্য হবে, যা রামাযানেও আছে এবং গাইরে রামাযানেও আছে। আর সেটি হলো তাহাজ্জুদ।[১১]

২. হাদীসের বড় বড় ইমামগণ উক্ত হাদীসকে তাঁদের কিতাবে তারাবীহর অধ্যায়ে উল্লেখ না করে তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, এতে বুঝা যায়, যে, উক্ত হাদীসকে তাঁরাও তারাবীহর নয় বরং তাহাজ্জুদ হাদীস বলেই গণ্য করেন।[১২]

স্বয়ং হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হি.) ও উক্ত হাদীসকে তাহাজ্জুদের হাদীস হিসাবে গণ্য করে তাহাজ্জুদ ও বিত্‌রের মোট সংখ্যা এগার হওয়ার হিকমত বর্ণনা করেছেন।[১৩]

৩. উক্ত হাদীসের শেষাংশে বর্ণিত শব্দসমূহ হচ্ছে ঃ

فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ الخ .

হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি বিত্‌র পড়ার পূর্বে নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়েন? উক্ত প্রশ্নটি তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তারাবীহর ক্ষেত্রে নয়।

কেননা, তারাবীহর ক্ষেত্রে এটা হতে পারে না যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আট রাক'আত তারাবীহ পড়িয়ে নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়বেন আর সাহাবায়ে কিরাম বিতর পড়ার জন্য তাঁর পিছনে বসে অপেক্ষা করতে থাকবেন, আর বাস্তবে এমনটি হলেও সেটা পুরুষদেরই বেশি জানা

---

১১. মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানুভী, আহসানুল ফাতাওয়া, কিতাবুস সালাত, তারাবীহ পরিচ্ছেদ, রিসালাহ লামাআতুল মাসাবীহ, করাচী এইচ. এম, সাঈদ কোম্পানী, ১৪১৭ হি. খণ্ড ৩, পৃ. ৫৩০।

১২. আহসানুল ফাতাওয়া, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩, পৃ. ৫৩০।

১৩. হাফিয ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র) বলেন, আমার নিকট প্রতিভাত হচ্ছে যে, তাহাজ্জুদ ও বিত্‌রসহ রাত্রের নামায এগার রাক'আত হওয়ার হিকমত হলো, দিনের যুহর, আসর ও মাগরিব মিলে যে মোট এগার রাক'আত ফরয হয় সেগুলোর সাথে নফলের সংখ্যাগত সামঞ্জস্য বিধান করা, আর তাহাজ্জুদ ও বিত্‌রের সংখ্যা অপর রিওয়ায়াতে যে-তের বর্ণিত হয়েছে সে হিসাবে উপরোক্ত এগার রাক'আত ফরযের সাথে ফজরের দুই রাক'আতকে গণ্য করতে হবে। তাহলেই দিনের ফরয ওরাত্রের নফলের সংখ্যার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা, আর তাহাজ্জুদ ও বিত্‌রের সংখ্যা অপর রিওয়ায়াতে যে তের বর্ণিত হয়েছে সে হিসাবে উপরোক্ত এগার রাক'আত ফরযের সাথে ফজরের দুই রাক'আতকেও গণ্য করতে হবে। তাহলেই দিনের ফরয ও রাত্রের নফলের সংখ্যার মাঝে সামঞ্জস্য সাধিত হয়ে যাবে। ফাতহুল বারী কিতাবুত্ তাহাজ্জুদ, প্রাগুক্ত, খণ্ড, ৩, পৃ. ৩২৮-৩২৯।

www.pathagar.com

থাকার কথা। কেননা, তাঁরাই সামনের কাতারগুলোতে নামায আদায় করে থাকতেন। অথচ তাঁদের থেকে এ ধরনের কোন বর্ণনা নেই। অতএব হাদীসটি তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেননা, তাহাজ্জুদ নামায রাসূলুল্লাহ (সা) ঘরে একাকী পড়তেন। এবং তার মধ্যে কখনও কখনও তিনি বিত্র পড়ার পূর্বে শুয়ে পড়তেন। বিষয়টি হযরত আয়েশা (রা)-এর গোচরিভূত হলে এতে তাঁর প্রশ্নের উদ্রেক হয় এবং তিনি তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উত্থাপন করেন।[১৪]

৪. সব চেয়ে বড় কথা হলো, হযরত আয়েশা (রা)-এর উক্ত হাদীসে তারাবীহর নামাযই উদ্দেশ্য বলে ধরা হলে, হাদীসটি নিম্নবর্ণিত ঐ সকল হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক ও বিরোধপূর্ণ হয়ে যাবে, যেগুলোতে রামাযান মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বেশি বেশি ইবাদত করা, বিশেষ করে নামাযের গুণগত ও সংখ্যাগত ব্যবধান বেড়ে যাওয়া, এমনকি সারারাত্র জাগ্রত থেকে নামায পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

নিম্নে এ সংক্রান্ত কতিপয় হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রামাযান মাস আসলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা মুবারকে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেত, নামায বেড়ে যেত তিনি দু'আর মধ্যে বেশি বেশি কান্নাকাটি করতেন ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন।[১৫]

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রামাযানের শেষ দশ দিন আসলে রাসূলুল্লাহ (সা) সারা রাত্র জেগে ইবাদত করতেন ও পরিবারবর্গকেও জাগ্রত করে দিতেন।...[১৬]

হযরত আবূ যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রামাযানের ২৩ তারিখে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত নামায পড়ালেন। এরপর ২৫ তারিখে অর্ধেক রাত্র পর্যন্ত এবং ২৭ তারিখে পুরা রাত্র নামায পড়ালেন। এমনকি ঐ রাত্রে আমরা সাহরী খাওয়ার সময়ও না পাওয়ার আশংকাবোধ করছিলাম। (সংক্ষিপ্ত)[১৭]

এখানে আমাদের বুঝা দরকার যে, রামাযান মাসেও যদি অন্যান্য নামাযের ন্যায় বিত্র বাদে ৮ রাক'আতের বেশি নামায না পড়ে থাকেন তাহলে অন্যান্য মাসের তুলনায় রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায বেড়ে যেত, বিশেষ করে শেষ দশ রাত্রে সারা রাত্র জেগে নিজেও ইবাদত করতেন ও পরিবার বর্গকেও জাগ্রত করে দিতেন", এ হাদীসগুলোর তো কোন অর্থ থাকছে না, অতএব সব মাসেই এগার রাক'আতের পূর্বোক্ত হাদীস নিশ্চয় এমন কোন বিশেষ নামায সম্পর্কে যা নবী কারীম (সা) সব মাসেই মোটামোটি একই নিয়মে আদায়

১৪. আহসানুল ফাতাওয়া, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩, পৃ. ৫৩০।

১৫. ইমাম বায়হাকী (র) শু'আবুল ঈমান, বাবুস সিয়াম, ফাযাইলু শাহরি রামাদান, বাইরুত, কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৯৯০ ঈ., খণ্ড. ৩, পৃ. ৩১০, হাদীস নং ৩৬২৫ ও ইমাম জালালুদ্দীন আস সুয়ূতী, আদ দুররুল মানসূর, সূরায়ে বাকারা ঃ ২, আয়াত ১৮৫, বাইরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৯৯০ ঈ. খণ্ড.-১, পৃ. ৩৩৭।

১৬. বুখারী শরীফ। দ্র. ইমাম ইবনুল আসীর আল জযরী, জামিউল উসূল, কিতাবুস সালাত, কিয়ামু শাহরি রামাদান পরিচ্ছেদ, বাইরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮৩ ঈ., খণ্ড ৬, ১১৪।

১৭. নাসাঈ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফ। দ্র. জামিউল উসূল, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৬, পৃ. ১২০-১২১।

www.pathagar.com

করতেন, আর তা হলো তাহাজ্জুদ, কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) রামাযান ও অন্যান্য মাসে অধিকাংশ সময়ই তাহাজ্জুদ নামায আট রাক'আত পড়তেন।

বলা বাহুল্য, এখানে হযরত আবূ সালামার (র)-এর প্রশ্ন রামাযানের তাহাজ্জুদ সম্পর্কেই ছিল, যেহেতু অন্যান্য রিওয়ায়াতে রামাযানে রাসূলুল্লাহ (সা) বেশি বেশি নামায পড়তেন বলে বর্ণিত হয়েছে। তাই হযরত আবূ সালামার প্রশ্ন জাগল যে, রামাযান উপলক্ষে তাহাজ্জুদের রাক'আতের সংখ্যাত বৃদ্ধি পেত কি না।

সে প্রক্ষিতেই তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে রামাযানের তাহাজ্জুদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। হযরত আয়েশা (রা) ও সে হিসাবেই তাঁকে তাহাজ্জুদের সংখ্যা বর্ণনা করেন যে, রামাযান ও গাইরে রামাযানের (অধিকাংশ সময়) তাহাজ্জুদের সংখ্যা আট রাক'আত ছিল। রামাযান উপলক্ষে তাহাজ্জুদের রাক'আতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত না।[১৮]

অতএব এই হাদীসের সাতে তারাবীহর নামাযের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। এই হাদীস দ্বারা তারাবীহর নামায আট রাক'আত হওয়ার দলীল পেশ করা হাদীসের জ্ঞানে অপরিপক্কতার পরিচায়কও বটে।

উল্লেখ্য, বর্ণনাটি তো মূলত তাহাজ্জুদের ব্যাপারেই। তবে তাহাজ্জুদ হিসাবেও হাদীসটি আক্ষরিক অর্থে নয়। বরং এগার রাক'আতও অধিকাংশ সময়ের আমল, মাঝে মধ্যে এতেও বেশ কম হতো।

তাহাজ্জুদের অনূর্ধ্ব এগার রাক'আত আক্ষরিক অর্থে নয়

হযরত আয়েশা (রা)-এর উক্ত হাদীসকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা হলে এই হাদীসটি ঐ সকল হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যাবে যেগুলোতে রাক'আতের সংখ্যা এর চেয়ে বেশি বা কম উল্লেখ করা হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবে হযরত আয়েশা, ইব্ন আব্বাস (রা)সহ আরো অনেক সাহাবী থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তাহাজ্জুদের রাক'আতের সংখ্যা ৭,৯,১১,১৩,১৫ ও ১৭ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।[১৯]

এই বৈপরিত্যের কারণেই হাদীসটিকে কেউ কেউ মুযতারাব (مضطرب) হিসাবেও আখ্যায়িত করেছেন।[২০]

অবশ্য, এর বিপরীতে অনেকেই এ ক্ষেত্রে সমন্বয় করন-এর নীতি অবলম্বন করে বলেছেন যে, আট রাক'আতের হাদীসে অধিকাংশ সময়ের আমলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর মাঝে মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেয়ে বেশি বা কমও পড়তেন অন্যান্য হাদীসগুলোতে সেটাই প্রতিফলিত হয়েছে। অতএব এখন আর হাদীসগুলোর মাঝে কোন বিরোধ থাকছে না।[২১]

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল যে, আট রাক'আত তাহাজ্জুদও সব সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। বরং মাঝে মধ্যে এতেও ব্যতিক্রমও ঘটত।

১৮. আহসানুল ফাতাওয়া, কিতাবুস সালাত, তাররাবীহ পরিচ্ছেদ, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩, পৃ. ৫৩০।

১৯. জামিউল উসূল, কিতাবুস সালাত, সালাতুল লাইল অনুচ্ছেদ, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৬, পৃ. ৭৭-১০৮।

২০. ফাতহুল বারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, বাবু কাইফা কানা সালাতুন নবীঈ, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩, পৃ. ৩২৮।

২১. ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩।

www.pathagar.com

আট রাক'আতের পক্ষে অপর একটি দলীল বিস্ময়কর ঃ

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ ، فَلَمَّا كَانَتِ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِى الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا اَنْ يَّخْرُجَ فَلَمْ يَخْرُجْ ، فَلَمْ نَزَلْ فِيْهِ حَتّٰى اَصْبَحْنَا ثُمَّ دَخَلْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اجْتَمَعْنَا الْبَارِحَةَ فِى الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ تُصَلِّيْ بِنَا فَقَالَ : اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ يُّكْتَبَ عَلَيْكُمْ. رواه الطبرانى فى «الصغير» ومحمد بن نصر المروزى فى «قيام الليل» وابن خزيمة وابن حبان فى «صحيحهما» وفى إسناده لين .

২. হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রামাযান মাসে একদা আমাদেরকে নিয়ে আট রাক'আত নামায ও বিত্‌র পড়লেন. . .।[২২]

হযরত জাবির (রা)-এর উক্ত হাদীসটি যাঈফ (ضعيف)। কেননা, তার একজন বর্ণনাকারীর নাম ঈসা ইব্‌ন জারিয়াহ। ইমাম আবূ দাঊদ (র)-সহ অনেকেই তাকে منكر الحديث বা তার রিওয়ায়াতকৃত হাদীসের মধ্যে مناكر রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। আবার অনেকেই তাকে যাঈফ রাবীদের মধ্যে গণ্য করেছেন।[২৩] অতএব উক্ত হাদীসটি যাঈফ হওয়ার কারণে তা আট রাক'আতের স্বপক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করার উপযোগী নয়।

এছাড়া উক্ত হাদীসকে সহীহ হিসাবে মেনে নেওয়া হলেও তা দ্বারা তারাবীহ নামায সব সময়ের জন্য আট রাক'আত বলে প্রমাণিত হয় না। কেননা তা ইত্তেফাকী (اتفاقى) তথা কোন এক দিনের বিচ্ছিন্ন আমলও হতে পারে।[২৪] আর ঐ এক দিনও শুধু যে আট রাক'আত পড়েছেন তারও প্রমাণ এখানে নেই। কেননা এর আগে পরেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো নামায পড়তে পারেন। কেননা, জামা'আতের আগে বা পরে রাসূলুল্লাহ (সা) অনেক সময় একাকী আরো নামায পড়তেন, যেমনটি হযরত আনাস (রা) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত একটি হাদীসে পাওয়া যায় যে,

একবার রাসূলুল্লাহ (সা) রামাযানের রাত্রে নামায পড়ছিলেন। অতঃপর কিছু লোকজন এসে তাঁর পিছনে ইক্তিদা করে নামায পড়ল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে ছোট ছোট কিরা'আতে নামায পড়ালেন। এরপর তিনি গৃহে প্রবেশ করে একাকীভাবে কিছুক্ষণ নামায পড়লেন। অতঃপর আবার বের হয়ে ছোট ছোট কিরা'আতে কিছুক্ষণ নামায পড়ালেন।[২৫]

---

২২. আসারুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮-২৪৯।

২৩. হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (র), তাহযীবুত তাহযীব, বাইরুত, দারুল ফিক্‌র, ১৯৯৫ ঈ., খণ্ড ৬, পৃ. ৩২৫-৩২৬ (রাবী নং ৫৪৮১)

২৪. ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া, প্রাগুক্ত, ৩৭৯।

২৫. হাফিয নূরুদ্দীন আল-হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, কিতাবুস সিয়াম, বাব নং ২৫, বাইরুত দারুল ফিকর, ১৯৯৪ ঈ., খণ্ড ৩, পৃ. ৪০৩।

www.pathagar.com

এছাড়া রামাযান মাসে সারা রাত্র জেগে ইবাদত করা এবং নামায পড়ার পূর্বোক্ত হাদীসমূহ দ্বারা এই সম্ভাবনাই প্রকট হয় যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ আট রাক'আতের পূর্বে বা পরে আরো নামায পড়েছেন। কেননা সারা রাত্র মাত্র ৮ রাক'আত নামায পড়লে তার কিয়াম, রুকূ ও সিজ্‌দা অত্যন্ত দীর্ঘ হতো যা সাহাবায়ে কিরাম অবশ্যই বর্ণনা করতেন। অথচ এ ধরনের কোন বর্ণনা হাদীসের কিতাবে নেই।[২৬]

অতএব হাদীসটি শুধু যে সনদগত দিক থেকেই যাঈফ তাই নয়। বরং এমনিতেও অন্যান্য হাদীসের দিকে লক্ষ্য করে চিন্তা করলে তা আট রাক'আতের মধ্যে তারাবীহকে সীমাবদ্ধ করার স্বপক্ষে দলীল হতে পারে না।

আট রাক'আতের পক্ষে তৃতীয় আরেকটি দলীল হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ يُوْسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ قَالَ : اَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيْمًا الدَّارِىَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنْ يَقُوْمَا لِلنَّاسِ بِاِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَكَانَ الْقَارِىْ يَقْرَاءُ بِالْمُئِيْنَ حَتّٰى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعَصَامِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَّا نَنْصَرُ اِلاَّ فِىْ فُرُوْعِ الْفَجْرِ- رواه مالك وسعيد بن منصور وابو بكر بن أبى شيبة وإسناده صحيح .

৩. হযরত সায়িব ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) উবায় ইবন কা'ব (রা) এবং তামীমে দারী (রা)-কে নির্দেশ দেন তারা যেন লোকদেরকে নিয়ে এগার রাক'আত নামায আদায় করেন।[২৭]

তৃতীয় দলীলের পর্যালোচনা

উক্ত হাদীসটিও মুযতারাব (مضطرب) হওয়ার কারণে দলীল হিসাবে পেশ করার উপযোগী নয়। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানুভী (র) বলেন, হযরত উমর (রা)-এর যুগে তারাবীহ মোট কত রাক'আত পড়া হতো, তার উল্লেখ হযরত সায়িব ইবন ইয়াযীদ (রা)-এর উক্ত হাদীসে পাওয়া যায়। হযরত সায়িব (রা) থেকে উক্ত হাদীসখানা তাঁর তিনজন শিষ্য বর্ণনা করেন ঃ (১) হারিস ইব্‌ন আবদুর রহমান (২) ইয়াযীদ ইব্‌ন খুযায়ফা (৩) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ।

প্রথম রাবী অর্থাৎ হযরত হারিস-এর রিওয়ায়াত 'উমদাতুল কারী'-এর মধ্যে ইব্‌ন আবদুর বারর-এর বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে হযরত উমর (রা)-এর যুগে বিত্‌র ছাড়া তারাবীহ বিশ রাক'আত পড়া হতো বলে উল্লেখ করা হয়।[২৮]

---

২৬. ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া, প্রাগুক্ত, ৩৭৮, ৩৭৯।

২৭. আসারুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯-২৫০।

২৮. উমদাতুল কারী, খণ্ড ১১, পৃ. ১২৭। দ্র. আপ কে মাসাঈল আওর উনকা হল, নামাযে তারাবীহ, দেওবন্দ, কুতুবখানা নাঈমিয়া, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৮।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় রাবী হযরত ইয়াযীদ ইবন খুযায়ফা (র)-এর তিন শাগরিদ ঃ (১) ইব্ন আবু যীব (২) মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (৩) ইমাম মালিক। এঁদের প্রত্যেকেই সর্বসম্মতিক্রমে তারাবীহ নামায বিশ রাক'আত হওয়ার কথা বর্ণনা করেন।

ইব্ন আবু যীব (র)-এর রিওয়ায়াত বাযহাকীর সুনানে কুবরাতে বর্ণিত হয়েছে। যাতে হযরত উমর ও উসমান (রা)-এর যুগে সাহাবায়ে কিরাম তারাবীহ বিশ রাক'আত আদায় করতেন বলে উল্লেখ করা হয়। উক্ত রিওয়ায়াতকে ইমাম নববী, ইবনুল ইরাকী ও হাফিয সুয়ূতী (র) সহীহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[২৯]

এরপর মুহাম্মদ ইব্ন জাফর-এর রিওয়ায়াতও বায়হাকী (র) তাঁর অপর কিতাব 'মা'রিফাতুস সুনানে ওয়াল আসার'-এ বর্ণনা করেছেন, তাতেও তারাবীহ বিশ রাক'আত পড়ার কথাই উল্লেখ হয়েছে। এই সনদকেও ইমাম সুবকী ও মুল্লা আলী কারী হানাফী (র) সহীহ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৩০]

এছাড়া ইমাম মালিকও ইয়াযীদ ইব্ন খুযায়ফা (র) থেকে তারাবীহ বিশ রাক'আত হওয়ার কথা বর্ণনা করেন, যা হাফিয ইব্ন হাজার (র) 'ফাতহুল বারী'-তে ও আল্লামা শাওকানী (র) 'নাইলুল আওতার'-এ উল্লেখ করেন।[৩১]

হযরত যায়িব (র)-এর তৃতীয় রাবী মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ-এর বর্ণনার মধ্যে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ইযতিরাব তথা বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

১. মু'আত্তার মধ্যে ইমাম মালিক (র) মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা) হযরত উবায় ও তামীমে দারীকে এগার রাক'আত পড়ানোর নির্দেশ প্রদান করেন।[৩২]

উল্লেখ্য, এটাই আমাদের আলোচ্য হাদীস যে ব্যাপারে আমরা পর্যালোচনা করছি।

২. ইব্ন ইসহাক (র) মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফের সূত্রে তারাবীহ্ তের রাক'আত হওয়ার কথা বর্ণনা করেন।[৩৩]

৩. দাঊদ ইব্ন কায়স (র) মুহাম্মদ ইবন ইউসুফের সূত্রে তারাবীহ ও বিত্‌র মোট ২১ রাক'আত বলে বর্ণনা করেন।[৩৪]

উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, হযরত সাইব (রা)-এর দুই শাগরিদ হারিস ও ইয়াযীদ ইব্ন খুযায়ফা এবং ইয়াযীদ ইব্ন খুযাফার তিন শাগরিদ এ বিষয়ে একমত

---

২৯. আসারুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।

৩০. আসারুস সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২।

৩১. ফাতহুল বারী খণ্ড ৩, পৃ. ৫৩। দ্র. আপ কে মাসাইল, প্রাগুক্ত,-৩, পৃ. ৪০।

৩২. ইমাম মালিক, মু'আত্তা, মা জাআ ফী কিয়ামি রামাদান অধ্যায়, দেওবন্দ, আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, তা. বি. পৃ. ৪০।

৩৩. ফাতহুল বারী, খণ্ড ৪, পৃ. ২৫৪। দ্র. আপ কে মাসাঈল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

৩৪. হাফিয আবদুর রায্যাক আস সান'আনী (র) আল-মুসান্নাফ, কিতাবুস সিয়াম, বাবু কিয়ামে রামাদান, বাইরুত, আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি., খণ্ড ৪, পৃ. ২৬০, হাদীস নং ৭৭৩০।

www.pathagar.com

যে, হযরত উমর (রা) সাহাবায়ে কিরামকে জামা'আতেও সাথে বিশ রাক'আত আদায় করার নির্দেশ দেন।

পক্ষান্তরে তৃতীয় শাগরিদ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফের রিওয়ায়াত এ ব্যাপারে মুযতারিব, কেউ তার থেকে এগার কেউ তের ও কেউ বিত্‌রসহ মোট একুশ রাক'আতের কথা বর্ণনা করেছেন, বিধায় হাদীসটি মুযতারিব (مـــضطرب)। আর উসূলে হাদীসের নীতি অনুসারে (مضطرب) হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যায় না।

অতএব মুহাম্মদ ইবন ইউসুফের উক্ত রিওয়ায়াতটি মুযতারিব (مـضطرب) হওয়ার কারণে তা আট রাক'আতের স্বপক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করার উপযোগী নয়। এর বিপরীতে হযরত হারিস ও ইয়াযীদ ইব্‌ন খুযায়ফা (র)-এর রিওয়ায়াত যাতে তারাবীর নামায ২০ রাক'আত বলা হয়েছে সেটিই সনদ ও উম্মাতের আমল উভয় দিক থেকেই ত্রুটিমুক্ত হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য ও অগ্রগণ্য।[৩৫]

আর যদি মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফের এগার রাক'আতের উক্ত হাদীস কোন প্রকারে ধর্তব্যের উপযোগী বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে ১১ ও ২৩ উভয় ধরনের হাদীসের মধ্যে ইমাম বায়হাকী (র) কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতিতেই সমন্বয় করতে হবে। তিনি বলেন, উভয় রিওয়ায়াতের মাঝে সমন্বয় এভাবে সম্ভব যে, হযরত উমর ফারূক (রা)-এর যুগে সাহাবায়ে কিরাম সর্বপ্রথম এগার রাক'আত আদায় করতেন। এর কিছু দিন পর ২০ রাক'আত তারাবীহ ও তিন রাক'আত বিত্‌রের উপর আমল শুরু হয়।(والله اعلم)[৩৬]

ইমাম বায়হাকী (র)-এর এ মন্তব্য যে, হযরত উমর ফারূক (রা)-এর যুগে সাহাবায়ে কিরামের সর্বশেষ আমল বিশ রাক'আতের উপরেই ছিল। এর স্বপক্ষে কয়েকটি দলীল (شواهد وقرائن) নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. ইমাম মালিক যিনি মুহাম্মদ ইবন ইউসুফের সূত্রে এগার রাক'আতের হাদীস রিওয়ায়াত করেন, তিনি নিজেও ঐ রিওয়ায়াতটি গ্রহণ করেননি। কেননা, তাঁর মাযহাব হলো তারাবীহ কমপক্ষে বিশ রাক'আত। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, এগার রাক'আতের রিওয়ায়াত স্বয়ং ইমাম মালিকের নিকটও গ্রহণীয় নয়।[৩৭]

২. ইব্‌ন ইসহাক যিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফের সূত্রে এগার রাক'আতের হাদীস রিওয়ায়াত করেন। আল্লামা শাওকানী (র) তাঁর থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (ইবন্ ইসহাক) বলেন, তারাবীহ্‌র রাক'আতের সংখ্যার ব্যাপারে আমি যা কিছু শুনেছি, তার মধ্যে বিশ রাক'আতের রিওয়ায়াতই বেশি সুদৃঢ়।[৩৮]

---

৩৫. আপ কে মাসাইল, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩, পৃ. ৪১।

৩৬. ইমাম বাইহাকী ঃ আস সুনানুল কুবরা, কিতাবুস সালাত, আদাদু রাক'আতিল কিয়াম ফী শাহরে রামাদান অধ্যায়, বাইরুত, দারুল ফিকর, তা. বি. খণ্ড ৪, পৃ. ৬১, হাদীস নং ৪, পৃ. ৬১, হাদীস নং ৪৭২৩।

৩৭. আপ কে মাসাইল, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩, পৃ. ৪২।

৩৮. নাইলুল আওতার, খণ্ড ৩, পৃ. ৫৩; দ্র. আপ কে মাসাইল, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩, পৃ. ৪২।

www.pathagar.com

৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফের এগার রাক'আতের রিওয়ায়াতের চেয়ে হযরত যায়িব ইব্‌ন ইয়াযীদের বিশ রাক'আতের হাদীসের অনুকূলে আরো অনেকগুলো সহীহ রিওয়ায়াত রয়েছে। তন্মধ্য থেকে কয়েকটি রিওয়ায়াত পূর্বেই বিশ রাক'আতের দলীল বর্ণনার সময় উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৯]

এ পর্যন্ত আলোচনার দ্বারা একথা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হলো যে, আট রাক'আতের স্বপক্ষে কোন মজবুত দালীলিক ভিত্তি নেই। উক্ত মতের প্রবক্তাগণ যে সকল দলীল দ্বারা তা প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়ে থাকেন, হয়তো সেগুলো সনদগত মানে উত্তীর্ণ নয় ও দলীল হিসাবে পেশ করার উপযোগী নয় অথবা সেগুলোর মূলপাঠ তারাবীহ সম্পর্কে নয় বরং তাহাজ্জুদ সম্পর্কে।

একটি সন্দেহের অপনোদন

অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন যে, বিশ রাক'আত তারাবীহ্ জামা'আতের সাথে পড়ার প্রচল তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ছিল না। বরং পরবর্তীতে হযরত উমর (রা)-এর যুগে এটি প্রবর্তিত হয়। অতএব যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে ছিল না, বরং পরবর্তীতে প্রবর্তিত হয়েছে তা পালন করা আমাদের জন্য সুন্নাত হবে কেন?

উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলা হয় যে,

এটা সত্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মৌখিকভাবে তারাবীহর রাক'আতের কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেননি। বরং সবাইকে ব্যাপকভাবে এ নামাযের প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং নিজেও পড়েছেন। কিন্তু তিনি কত রাক'আত পড়েছেন এ ব্যাপারে হাদীসে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা রয়েছে। কোন রিওয়ায়াতে বিশ রাক'আত, কোন রিওয়ায়াতে আরো কম, কোন রিওয়ায়াতে সারা রাত্র জেগে ইবাদত করা বা অর্ধেক রাত্র পর্যন্ত ইবাদত করার কথা উল্লেখ রয়েছে।[৪০]

এ জন্যই ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন, "এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা রয়েছে। এবং তিনি এর কোন ফায়সালা দেননি বা কোন রিওয়ায়াতকে প্রাধান্যও দেননি।"[৪১]

আল্লামা ইব্‌ন তায়মিয়া (র) বলেন, "কেউ যদি এটা মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তারাবীহর রাক'আতের ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল, যাতে তিনি বেশ কম করতেন না তাহলে সেটা ভুল হবে।"[৪২]

অতএব এটাই বাস্তব যে, তারাবীহর রাক'আতের সংখ্যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে নির্দিষ্ট ছিল না। তিনি কখনো বেশি, কখনো কম আবার কখনো সারা রাত্রি নামাযে কাটিয়ে দিতেন।

অবশ্য, সাহাবায়ে কিরামের ইজমা তথা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের আলোকে একথা বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমল অধিকাংশ সময় বিশ রাক'আতের উপর ছিল।

---

৩৯. আপ কে মাসাইল, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩, পৃ. ৪২।

৪০. ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮, ৩৭৯ ও মুফতী মুহাম্মদ শফী, ইমদাদুল মুফ্তিয়ীন, কিতাবুস সালাত, তারাবীহ পরিচ্ছেদ, করাচী, দারুল ইশাআত, তা. বি. পৃ. ৩৬২।

৪১. ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র), জামে তিরমিযী, সাওম অধ্যায়, কিয়ামু শাহরে রামাদান পরিচ্ছেদ, দেওবন্দ, আশরাফী বুক ডিপো. তা. বি. খণ্ড ১, পৃ. ১৬৬।

৪২. মিরকাত, কিতাবুস সালাত, কিয়ামু শাহরে রামাদান অধ্যায়, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৮১।

www.pathagar.com

হযরত উমর ফারূক (রা)-এর যুগে তাঁর নির্দেশে সাহাবায়ে কিরাম সর্বসম্মতিক্রমে যে বিশ রাক'আত পড়া শুরু করেন, এ ব্যাপারে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "এটা হযরত উমর (রা) নিজের পক্ষ থেকে করেননি। এবং এ ব্যাপারে তিনি নতুন কিছু উদ্ভাবনকারী ছিলেন না, তাঁর কাছে এর কোন ভিত্তিমূল (أصل) না থাকলে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত কোন কিছু জানা না থাকলে তিনি বিশ রাক'আতের আদেশ দিতেন না।[৪৩]

সুতরাং তাঁর অনুকরণ আমাদের জন্য জরুরী, কেননা, তাঁর অনুকরণ মানে প্রকারান্তরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এরই অনুকরণ করা। উপরন্ত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা বহু ধরনের মতবিরোধ দেখতে পাবে, তখন তোমরা আমার সুন্নাতকে ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে।. . ."[৪৪]

উপরোল্লেখিত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা, আমল ও সম্মতিজ্ঞাপন দ্বারা প্রমাণিত বস্তুসমূহ দ্বীন, সুন্নাত ও অবশ্য পালনীয় হিসেবে সাব্যস্ত হয়, তদ্রুপ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরে খুলাফায়ে রাশিদীনের কথা কর্ম ও সম্মতি দ্বারাও কোন বস্তু একইভাবে দ্বীন, সুন্নাত ও অবশ্য পালনীয় হিসাবে ধর্তব্য হবে।[৪৫]

এ ছাড়া অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, "আমি জানি না যে, আর কতদিন আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকব। অতএব তোমরা আমার পরে আবূ বকর ও উমরের অনুসরণ করবে।"[৪৬]

তদ্রুপ আরো একটি হাদীসে রাসুলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, "যদি আমার পরে কেউ নবী হতো তাহলে সে (সৌভাগ্যবান) ব্যক্তি হতো উমর ইবনুল খাত্তাব।"[৪৭]

এগুলোর প্রত্যেকটি হাদীসই হযরত উমর (রা) প্রবর্তিত কোন বিষয় সুন্নাত ও অবশ্য পালনীয় হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। অধিকন্তু, হযরত উসমান ও আলী (রা)-এর যুগেও এমনকি তৎপরবর্তী দীর্ঘ দেড় হাজার বছর ধরে হারামাইন শরীফাইন মক্কা-মদীনাসহ পৃথিবীর সর্বত্র তারাবীহ কমপক্ষে বিশ রাক'আত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।[৪৮]

স্বয়ং হযরত আলী (রা) নিজেও এক ব্যক্তিকে তারাবীহ্ বিশ রাক'আত পড়ানোর নির্দেশ দেন।[৪৯]

৪৩. সাইয়্যিদ মুরতাযা যাবীদী, ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, নাওয়াফেল অধ্যায়, সালাতুত তারাবীহ, বাইরুত, মুআস্সাসাতুল তারিখিল আরাবী, ১৯৯৪ঈ., খণ্ড-৩, পৃ. ৪১৭।

৪৪. খতীবে তিবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল ই'তিসাম বিল কিতাবে ওয়াস সুন্নাহ, দেওবন্দ ঃ আশরাফী বুক ডিপো. তা. বি. খণ্ড-১, পৃ. ৩০।

৪৫. আল্লামা সরফরায খান সপদর, রাহে সুন্নাত, দেওবন্দ, মাকতাবহয় দামেশ, পৃ. ২৮-৩২।

৪৬. জামি' তিরমিযী, মানাকিব অধ্যায়সমূহ, মানাকিবে আবূ বকর, সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ২০৭।

৪৭. জামি তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড-২, পৃ. ২০৯।

৪৮. শায়খ আতিয়্যাহ মুহাম্মদ সালেম, আত-তারাবীহ আকসারা মিন আলফি আমিন ফী মাসাজিদিন নবী (সা) করাচী, দারা শামযী লিন নশর, তা. বি. পৃ. ৩৭-৪১।

৪৯. মুসান্নাফে ইব্ন আবু শায়বা, কিতাবু সালাতিত তাতাউ ও, কাম ইউসালী ফী রামাযানী মিন. রাক'আতিন, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ২৮৫।

www.pathagar.com

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাত হিসাবে যেমন তদ্রুপ খুলাফায়ে রাশিদীনের হিসাবেও তারাবীহ বিশ রাক'আত সুন্নাত ও অবশ্য পালনীয়।

তারাবীহ বিশ রাক'আত হওয়া এটা 'ইজ্‌মা' দ্বারাও প্রমাণিত। আর 'ইজ্‌মা' তথা উম্মাতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এটাও শরী'আতের বড় দলীল। কোন বিষয় শুধু ইজ্‌মা দ্বারা প্রমাণিত হলেও তার উপর আমল করা উম্মতের জন্য জরুরী ও আবশ্যকীয় হয়ে যায়। অতএব এ হিসাবেও তারাবীহ বিশ রাক'আত সুন্নাত। কেননা এর উপর উম্মতের ইজ্‌মা রয়েছে। নিম্নে বিশ রাক'আতের উপর উম্মাতের 'ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে কতিপয় বড় বড় ইমামের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হলো ঃ

ইমাম তিরমিযী (মৃ. ২৭৯ হি.) বলেন, অধিকাংশ আহলে ইল্‌ম তারাবীহ বিশ রাক'আত হওয়ার পক্ষে।[৫০] মোল্লা আলী কারী হানাফী (মৃ. ১০১৪ হি.) বলেন, সাহাবায়ে কিরামের ইজ্‌মা তথা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, তারাবীহ বিশ রাক'আত।[৫১] হাফিয ইবন কুদামাহ আল-হাম্বলী (মৃ. ৬২০ হি.) বলেন, এটা ইজ্‌মা সমতুল্য।[৫২]

আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহমদ আল-কাসতালানী (র) (মৃ. ৯৩৩ হি.) বলেন, সবাই হযরত উমরের যুগে প্রতিষ্ঠিত বিশ রাক'আত তারাবীহ্‌কে ইজ্‌মার মতই গণ্য করেন।[৫৩] আল্লামা মানসূর ইব্‌ন ইউনুস বাহুতী (মৃ. ১০৪৬ হি.) বলেন, এটা সাহাবায়ে কিরামের যুগেই প্রসিদ্ধি লাভ করে ইজ্‌মা হিসাবে পরিগণিত হয়।[৫৪]

যেহেতু হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَنَّ اللّٰهَ لَا يَجْمَعُ اُمَّتِىْ اَوْ قَالَ : اُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلٰى ضَلَالَةٍ ، وَيَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ . رواه الترمذى

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতকে অথবা তিনি বলেছেন, উম্মাতে মুহাম্মদীকে ভ্রান্তির উপরে একমত করবেন না। ...[৫৫]

অতএব কোন বিষয়ের উপর উম্মাতের একমত হওয়ার অর্থই হলো, হক্ ও হিদায়েত তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। পক্ষান্তরে, ইজ্‌মার বিপরীত কোন মত মানেই হলো, তা ভ্রান্ত ও পরিত্যাজ্য। সুতরাং যেহেতু বিশ রাক'আত তারাবীহর উপর উম্মাতের মৌখিক ও আমলী

৫০. জামি তিরমিযী ঃ সাওম অধ্যায়, কিয়ামু শাহরে রামাদান পরিচ্ছেদ, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ১৬৬।

৫১. মিরকাতুল মাফাতীহ, কিতাবুস সালাত, কিয়ামু শাহরে রামাদান অধ্যায়, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৮২।

৫২. আল-মুগনী ঃ কিতাবুস সালাত, তারাবীহ রাক'আতের সংখ্যা, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৮৩৫।

৫৩. ইরশাদুস সারী, খণ্ড ৩, পৃ. ৪২৬। দ্র. আপ কে মাসাইল, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩, পৃ. ৪৮।

৫৪. কাসফুল কিনা', খণ্ড ১, পৃ. ৩৯২। দ্র. আপকে মাসাইল, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩, পৃ. ৪৯।

৫৫. মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল ই'তিসাম, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩০।

www.pathagar.com

(قـولى وفـعلى) ইজ্‌মা রয়েছে, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, অতএব বিশ রাক'আত তারাবীহর মতই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। আর এর বিপরীত আট রাক'আতের মত ইজ্‌মার পরিপন্থী হওয়ার কারণে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

কেননা, আট রাক'আতের হাদীসের সনদগত দুর্বলতার কথা বাদ দিলেও তা উসূলে হাদীসের পরিভাষা হিসাবে خـبـر الـواحـد[৫৬] মাত্র। আর খবরে ওয়াহিদ (خـبـر الـواحـد) উম্মাতের আমল বর্জিত হলে তার সনদ যত উচ্চ পর্যায়েরই সহীহ হোক না কেন তা গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম মালিক (র) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন হায্‌মকে (মৃ. ১৩২ হি.) তাঁর ভাই আবদুল্লাহ (র) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি অমুক হাদীস অনুযায়ী ফায়সালা করেননি কেন ? তিনি বললেন, তাহলে মানুষের আমল কোথায় ?[৫৭] অর্থাৎ কোন হাদীসের উপর উম্মাতের আমল না থাকলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

হযরত উমর ফারূক (রা) স্বয়ং মিম্বরে বসে আল্লাহর শপথ করে এমন ব্যক্তির কথা শুনতে নিষেধ করে দিলেন, যে উম্মাতের আমলের পরিপন্থী কোন হাদীস বর্ণনা করে।[৫৮]

হযরত ইবরাহীম নাখঈ (র) (মৃ. ৯৬ হি.) বলেন, যদি আমি সাহাবায়ে কিরামকে অযূর মধ্যে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করতে দেখতাম, তাহলে আমিও দুই হাতের কব্জি পর্যন্তই ধৌত করতাম। যদিও আমি কুরআনে কারীমের আয়াত وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ-এর মধ্যে কনুই পর্যন্ত ধোয়ার কথাই তিলাওয়াত করে যেতাম, (অর্থাৎ আয়াতের মধ্যে কনুই পর্যন্ত ধোয়ার কথা থাকলেও সাহাবায়ে কিরামকে কব্জি পর্যন্ত ধৌত করতে দেখলে আমি কব্জি পর্যন্তই ধৌত করতাম।)

কেননা, সাহাবায়ে কিরামকে কখনো কোন সুন্নাত তরকের অপবাদ দেওয়া যায় না। তাঁরাই প্রকৃত জ্ঞানী ও আল্লাহ্‌র রাসূলের অনুকরণে সমগ্র মাখলূক থেকে অগ্রগামী। অতএব বদ দ্বীন ও ব্যক্তি ছাড়া কেউ সাহাবায়ে কিরামের শানে সুন্নাত তরক করার কল্পনা করতে পারে না।[৫৯]

অতএব আট রাক'আতের হাদীস শুধু যে অগ্রহণযোগ্য তা নয় বরং সুন্নাত পরিপন্থীও বটে। কেননা, তারাবীহ আট রাক'আত সুন্নাত হলে সাহাবায়ে কিরাম কখনো এই সুন্নাত বাদ দিয়ে বিশ রাক'আতের উপর ইজ্‌মা তথা ঐক্যমত্য হতে পারতেন না।

---

৫৬. যে হাদীসের রাবী-কোন এক স্তরে মাত্র একজন থাকে তাকে উসূল হাদীসের পরিভাষায় খবরে ওয়াহিদ বলা হয়।

৫৭. কাযী ইয়ায, তারতীবুল মাদারিক, খণ্ড ১, পৃ. ৬৬। দ্র. আসারুল হাদীস আশ শরীফ, শাইখ মুহাম্মদ আওয়ামাহ, কায়রো, দারুস সালাম, ১৪০৭ হি., পৃ. ৬৪।

৫৮. তারতীবুল মাদারিক, খণ্ড ১, পৃ. ৬৬। দ্র. আসারুল হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

৫৯. ইব্‌ন আবু যায়দ আল কাইরওয়ানী, কিতাবুল জামি', পৃ. ১১৭। দ্র. আসারুল হাদীস আশ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, সুন্নাতে খুলাফা ও ইজ্‌মা কখনো সুন্নাতে রাসূল (সা) বিরোধী হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই, যারা সুন্নাতে খুলাফা ও ইজ্‌মা অনুযায়ী আমল করে তারাই প্রকৃতপক্ষে সুন্নাতে রাসূলের অনুসারী।

পক্ষান্তরে, সুন্নাতে খুলাফা ও ইজ্‌মাকে অবজ্ঞা করে সুন্নাতে রাসূলের উপর আমলের দাবী করা মানেই প্রকারান্তরে খুলাফায়ে রাশিদীন ও সাহাবায়ে কিরামকে সুন্নাত বিরোধী হিসাবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা, যা আদৌ কোন মুসলমানের জন্য সমীচীন নয়।

সকল মুজতাহিদ ইমামের বিপরীত কোন মত গ্রহণ করা

আমরা পূর্বোক্ত আলোচনা দ্বারা জানতে পেরেছি যে, আট রাক'আত তারাবীহর অভিমত সালফে সালিহীনদের কোন মুজতাহিদ ইমাম ব্যক্ত করেননি। এমনকি তা কোন মুজতাহিদের মাযহাবও নয়। অতএব যে হাদীস কোন মুজতাহিদ গ্রহণ করেননি ও যে মতের প্রবক্তা কেউ ছিল না, সে হাদীস গ্রহণ করা বা সে মত পোষণ করার অবকাশ শরী'আতে কতটুকু রয়েছে, এ ব্যাপারে নিম্নে কয়েকজন ইমামের বক্তব্য ও বাণী পেশ করা হলো ঃ

ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) (মৃ. ২৪১) বলেন, যে কোন মাস'আলার ব্যাপারে এমন কোন মতামত ব্যক্ত করা পরিহার কর, যা কোন ইমাম থেকে বর্ণিত নেই।[৬০]

হাফিয যাহাবী (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেন, কোন হাদীসের উপর আমল করার জন্য শর্ত হলো, ইমাম আযম আবূ হানীফা, মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল, সাওরী, আওযাঈ, আবূ উবায়দ, ইসহাক (র) বা এ ধরনের কোন এক মুজতাহিদ ইমামের ঐ হাদীসের উপর আমল থাকতে হবে।[৬১]

হাফিয ইব্‌ন রজব হাম্বলী (মৃ. ৭৯৫ হি.) বলেন, যেই হাদীসকে পূর্ববর্তী ইমামগণ সর্বসম্মতিক্রমে ছেড়ে দিয়েছেন যেই হাদীসের উপর আমল করা জায়িয নয়। কেননা, তাঁরা যে এই হাদীসকে ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁরা এ কথা জেনেশুনেই ছেড়ে দিয়েছেন যে, এই হাদীসের উপর আমল করা যাবে না।[৬২]

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (মৃ. ১১৭৬ হি.) বলেন, বর্তমানে যেহেতু এই চার মাযহাব ব্যতীত অন্যান্য সকল হক মাযহাব দুনিয়া থেকে মিটে গেছে, অতএব এই চার মাযহাবের অনুকরণ করার মানেই سـواد اعظم (সাওয়াদে আ'যম-বড় দল)-এর অনুকরণ করা, আর এগুলো ভিন্ন কোন মত গ্রহণ করার অর্থই হচ্ছে বড় দল থেকে বিচ্যুত হওয়া।[৬৩]

---

৬০. মাজমূ ফাতাওয়া ইব্‌ন তাইমিয়া, খণ্ড ১০, পৃ. ৩২০। দ্র. আসারুল হাদীস আশ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

৬১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খণ্ড ১৮, পৃ. ১৯১। দ্র. আসারুল হাদীস আশ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৬২. ফযলু ইলমিস সালাফ, পৃ. ৯। দ্র. আসারুল হাদীস আশ শরীফ। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

৬৩. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ঃ ইকদুল জীদ, (উর্দূ তরজমাসহ) করাচী, কুরআন মহল, তা.বি. পৃ. ৫৬-৫৭।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, সাওয়াদে আ'যম (বড় দল) থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে হাদীসে জাহান্নামের ধমকি পর্যন্ত এসেছে। হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরাশাদ করেন, তোমরা সাওয়াদে আযম-এর অনুকরণ করো। কেননা যে সাওয়াদে আযম থেকে বিচ্যুত হবে সে বিচ্যুতভাবেই জাহান্নামে যাবে।[৬৪]

অতএব আট রাক'আতের উক্ত হাদীস যা কোন মুজতাহিদ ইমাম গ্রহণ করেননি, তা আমাদের জন্যও গ্রহণ করার কোন অবকাশ নেই। অধিকন্তু, আট রাক'আতের মত ইমাম চতুষ্টয়সহ সকল মুজতাহিদ ইমামের মাযহাবের বিপরীত হওয়ার কারণে সাওয়াদে আ'যম থেকেও বিচ্যুত বলে গণ্য হবে, যা হাদীসে বর্ণিত ধমকির আওতায় পড়ে অবশ্যই নিষিদ্ধ হবে।

উল্লেখ্য যে হযরত উমর ফারূক (রা) যখন মসজিদে নববীতে জামা'আতের সাথে তারাবীহ বিশ রাক'আতের প্রবর্তন করেন, তখন অন্যান্য অনেক সাহাবায়ে কিরামই মদীনায় ও অন্যান্য শহরে জীবিত ছিলেন, যাঁরা স্বচক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তারাবীহর আমল প্রত্যক্ষ করেছিলেন, কেননা, হযরত উমর (রা) তাঁর সোনালী খিলাফতের দ্বিতীয় বছরই একাজটি করেছেন।

হাফিয মুহাম্মদ ইবন সা'দ (মৃ. ২৩০ হি.) বলেন, হযরত উমর ফারূক (রা) ১৪ হিজরীর রামাযান মাসে তারাবীহর জন্য সাহাবায়ে কিরামকে এক জামা'আত ভুক্ত করে দেন এবং এ পরওয়ানা লিখে অন্যান্য শহরেও পাঠিয়ে দেন।[৬৫]

উল্লেখ্য, হযরত উমর (রা) যেহেতু তাঁর খিলাফতের প্রারম্ভকালেই একাজটি করেছেন তখন তো মদীনা ও অন্যান্য শহরে বিপুল সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম বিদ্যমান ছিলেন, যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তারাবীহর আমল সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন।

যদি তাঁরা এটিকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাতের পরিপন্থী মনে করতেন, তাহলে তাঁরা অবশ্যই এর প্রতিবাদ করতেন। বিশেষ করে যাঁরা আট রাক'আতের রিওয়ায়াত করেন যদি তাঁরা ঐ রিওয়ায়াতকে তাহাজ্জুদের নামায মনে না করতেন বা তারাবীহকে মোট আট রাক'আতের মধ্যেই সীমিত মনে করতেন, তাহলে তাঁরা অবশ্যই বলিষ্ঠ কণ্ঠে এর প্রতিবাদ জানাতেন এবং হাদীসের কিতাবসমূহে তা বর্ণিত হতো।

কেননা, আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণ করা হবে আর সকল সাহাবায়ে কিরাম তা নিরবে মেনে নিবেন, কোন প্রতিবাদ করবেন না-এটা কখনো হতে পারে না। এমনকি একজন সাহাবীর সামনেও কোন সুন্নাত পরিপন্থী কাজ হবে, আর তিনি তা বরদাশত করে যাবেন, শক্ত হাতে রুখে দাড়াবেন না-এটা অন্তত সাহাবায়ে কিরামের মহান শানে কল্পনা করা যায় না।

যাঁরা সাহাবায়ে কিরামের সুন্নাতের অনুকরণের জযবা ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মহব্বতে আত্মোৎসর্গের ঘটনাবলীর সাথে সামান্যও পরিচিত, তাদের নিকট বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট।

---

৬৪. যে পথ ও মতের উপর অধিকাংশ মুসলমান আছেন

৬৫. মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ই'তিসাম, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩০।

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কিরাম যদি হযরত উমর (রা)-এর যুগে প্রবর্তিত বিশ রাক'আতের জামা'আতকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমল ও সুন্নাতের পরিপন্থী মনে করতেন, তাহলে তাঁরা এর প্রতিবাদে অবশ্যই রুখে দাঁড়াতেন। বিশেষ করে হযরত আয়েশা (রা) তো ১৪ হিজরীতে তারাবীহর জামা'আত প্রবর্তিত হওয়ার পরও আরো সুদীর্ঘ ৪৪ বছর জীবিত ছিলেন। কারণ তাঁর ইন্তিকাল হয়েছিল ৫৮ হিজরীতে।[৬৬]

অতএব তিনি যদি তাঁর ঐ রিওয়ায়াতকে তারাবীহর নামায সম্পর্কিত মনে করতেন, তাহলে সুদীর্ঘ ৪৪ বৎসর তাঁর হুজরার সামনে মসজিদে নববীতে আল্লাহ্র রাসূলুল্লাহ (সা)-এর (সুন্নাতের পরিপন্থী) কোন কাজ হতে থাকলো, আর তিনি নিরবে তা প্রত্যক্ষ করে গেলেন, একটিবারও মুখ খুলে এর প্রতিবাদ জানালেন না। এমন কাজ হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা) করবেন এটাকি আদৌ তাঁর শানে কল্পনা করা যায় ?

অথচ হযরত আয়েশা (রা) নিজেই রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, কেউ এই দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।[৬৭]

অদ্রূপ হযরত জাবির (রা)-এর ইন্তিকাল হয়েছিল ৭৪ হিজরীতে মদীনা শরীফে।[৬৮] অতএব তিনিও ১৪ হিজরীতে বিশ রাক'আতের জামা'আত প্রবর্তিত হওয়ার পর আরো ৬০ বছর জীবিত ছিলেন।

যদি তাঁর ঐ রিওয়ায়াত দ্বারা তারাবীহকে আট রাক'আতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে সুদীর্ঘ ৬০ বৎসর পর্যন্ত বিশ রাক'আত তারাবীহর প্রতিবাদে তাঁর ভূমিকা কি ছিল ? সুন্নাত বিরোধী কোন কাজে চুপ থাকা ও নিরবতা অবলম্বন করা দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীনতা নয় কি ? সাহাবায়ে কিরামের আল্লাহর রাসূলের (সা) মহব্বত ও সুন্নাতের অনুকরণের ইতিহাস আদৌ এ কথাকে সমর্থন করে না যে, তাঁরা সুন্নাত বিরোধী কাজে চুপ থাকবেন। বিশেষ করে হযরত জাবির (রা) নিজেই বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ "সবচেয়ে নিকৃষ্ট বস্তু হলো দ্বীনের মধ্যে নব আবিস্কৃত বস্তু। আর প্রত্যেক বিদ্'আত তথা দ্বীনের মধ্যে নব আবিস্কৃত বস্তুই গুমরাহী।"[৬৯]

হযরত জাবির (রা) এই হাদীস রিওয়ায়াত করবেন আর ৬০ বছর যাবত কোন সুন্নাত পরিপন্থী কাজ নিরবে অবলোকন করে যাবেন কোন প্রতিবাদ করবেন না, এটা কখনো হতে পারে না।

---

৬৬. তাবাকাতে ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৬, পৃ. ৫৭।

৬৭. মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল ই'তিসাম, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১. পৃ. ২৭।

৬৮. হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানী, আল ইসাবা. বাইরুত, দারুল ফিক্র, ১৩৯৮ হি. খণ্ড ১. পৃ. ২১৩।

৬৯. মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল ই'তিসাম, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ২৭।

www.pathagar.com

মোটকথা, তারাবীহর নামায আট রাক'আতের স্বপক্ষে স্পষ্ট কোন সহীহ হাদীস নেই। যেগুলো আছে সেগুলো হয়তো তাহাজ্জুদ সম্পর্কে অথবা সনদগত দিক থেকে যাঈফ ও অগ্রহণযোগ্য, যা পূর্বেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, তারাবীহ বিশ রাক'আত হওয়ার ব্যাপারে অনেকগুলো সহীহ রিওয়ায়াত এবং সর্বোপরি সাহাবায়ে কিরামের ও উম্মাতের 'ইজ্‌মা' এর মত অনেকগুলো সুদৃঢ় দলীল রয়েছে।

অতএব তারাবীহ বিশ রাক'আত হওয়ার ব্যাপারে কোন ধরনের সন্দেহ পোষণ করা বা মতানৈক্য করার মোটেই কোন অবকাশ নেই।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবাঃ/গবেষণা/২০০৫-০৬/৫৫৬৩/(উন্নয়ন)/৩২৫০

www.pathagar.com

গবেষণা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ